উদ্ভিদবিদ্যা



দি নিউ বুক স্টল
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
দি নিউ বুক স্টলের পক্ষে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ পাল
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ রথযাত্রা, ১৩৬৭

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅমলেন্দু পান, এম. এ
রামকৃষ্ণ মুদ্রণালয়
২০৯বি বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০০৬৭

সূচীপত্র

[কোষবিদ্যা]

। সুপ্রজনন বিদ্যা ।

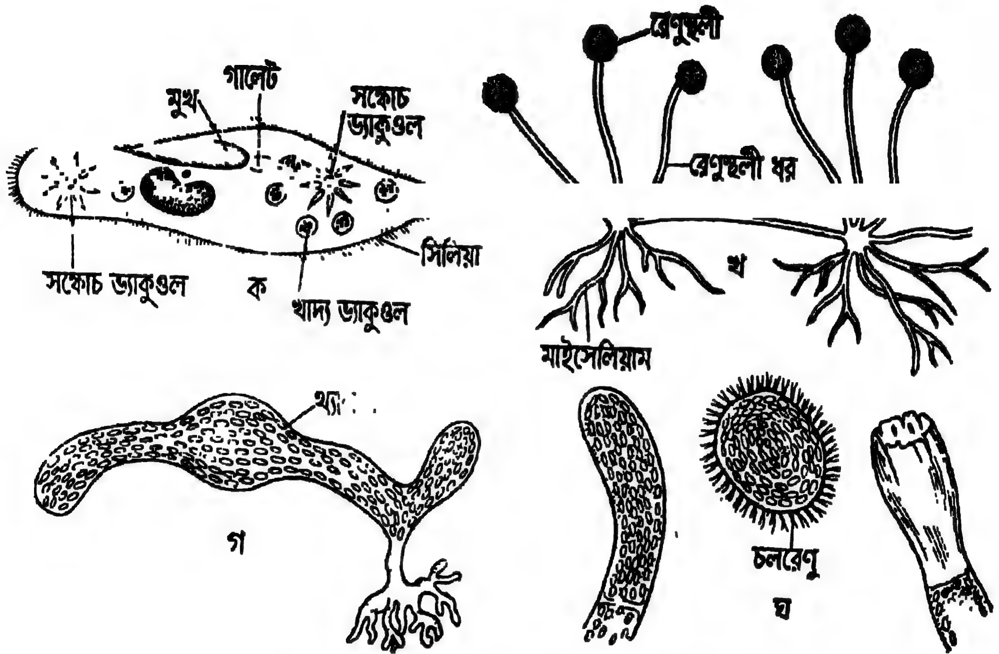
[উদ্ভিদ শারীরবিদ্যা]

বিষয় | পৃষ্ঠা

কোষবিদ্যা

১ কোষবিদ্যা
(Cytology)

কোষবিদ্যা (cytology) জীব বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যাহা হইতে কোষের আভ্যন্তরীণ গঠন প্রণালী ও তাহার কার্যকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। কোষ জীবদেহের মূল ভিত্তিস্বরূপ এবং কার্য সম্বন্ধীয় একক (functional unit)। একটি কোষের গঠন বৈশিষ্ট্য যাহাই হউক না কেন তাহা হইতেছে বিভিন্ন উপাদানে গঠিত স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং সতত পরিবর্তনশীল বস্তু। যখন ইহার পরিবর্তন ক্ষমতা চলিয়া যায় তখন হইতে কোষ একটি ক্ষয়িষ্ণু বস্তুতে পরিণত হয়। এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ ছাড়া অন্যান্য সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর শরীর অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত। এই মতবাদই কোষতত্ত্ব (cell theory) নামে অভিহিত হইয়াছে।

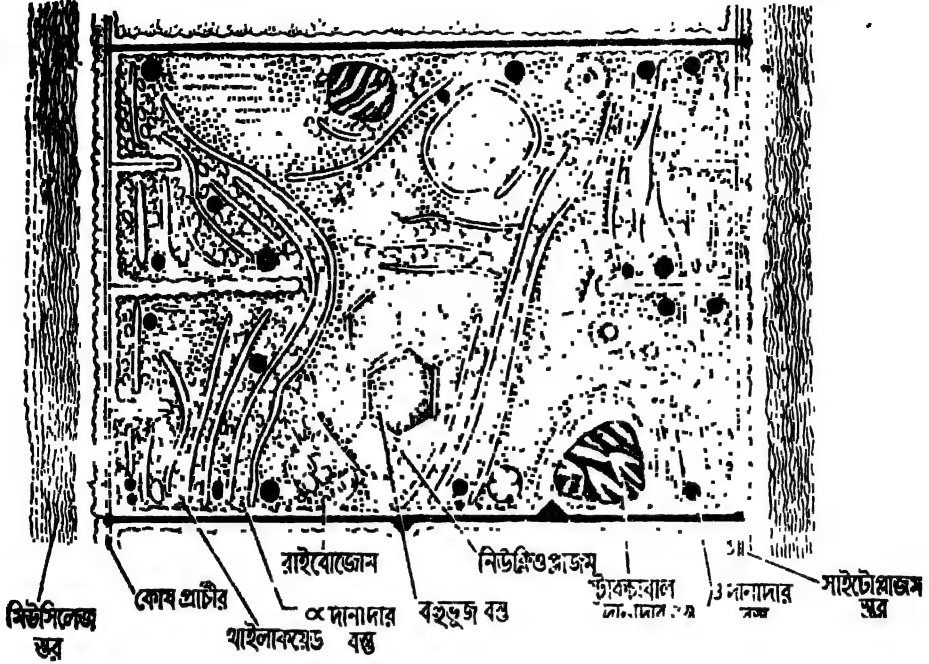


১নং চিত্র—এককোষী এবং সিনোসাইটিক কোষ

(ক) প্যারামেসিয়াম ; (খ) রাইজোপাস ; (গ) ভাউকেরিয়া ; (ঘ) ভাউকেরিয়ার অঙ্গজ জনন।

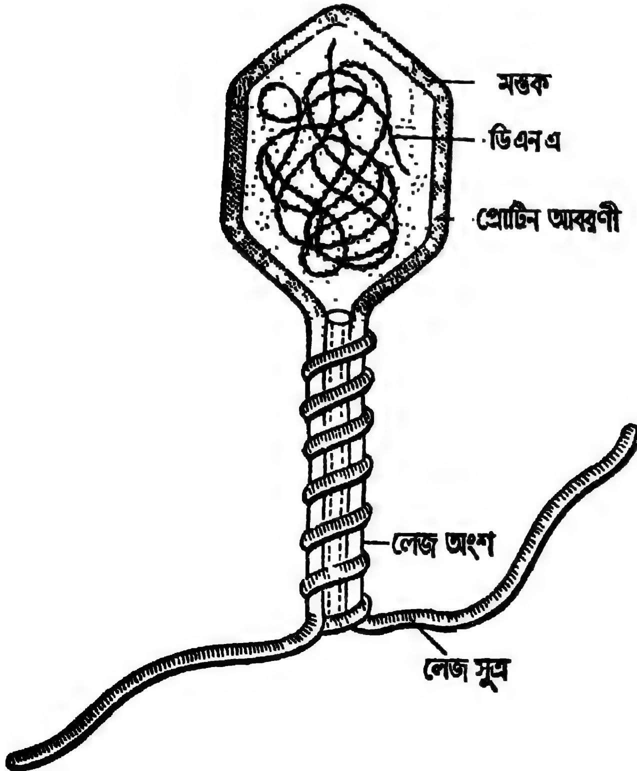
জীব দেহ প্রোটোপ্লাজম দ্বারা গঠিত। এই প্রোটোপ্লাজমই জীবিত বস্তু। কোষ বলিতে সাধারণভাবে একটি পাতলা আবরণীর মধ্যে আবদ্ধ অল্প পরিমাণ প্রোটোপ্লাজমকে বোঝায়। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে একটি নিউক্লিয়াস থাকে (১নং চিত্র)। সিনোসাইটিক কোষের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেখানে কোষটি অনুসূত্রের আকারে লম্বা হইয়া থাকে এবং উহার প্রোটোপ্লাজমের অভ্যন্তরে অনেকগুলি নিউক্লিয়াস অবস্থান করে। আবার, নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের কোষে (সায়ানোফাইসি গোত্রীয় উদ্ভিদ) কোন নিউক্লিয়াস থাকে না (২নং চিত্র)। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে নিউক্লিয়াসের উপাদানসমূহ ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত থাকে। ভাইরাসের ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত ধর্ম পরিলক্ষিত হয়। সেখানে

কোষ অভ্যন্তরে একটি নিউক্লিয়াস বা তাহার একটু অংশ-বিশেষ সামান্য পরিমাণ সাইটো-



২নং চিত্র—একটি আদর্শ প্রোক্যারিয়টিক কোষ

প্লাজম বা কোন সাইটোপ্লাজম ছাড়াই অবস্থান করে (যেমন, ব্যাকটেরিওফাজ) (৩নং চিত্র)। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর জীবকোষে (ইউক্যারিয়টিক কোষ) সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস উভয়ই বর্তমান থাকে। এখনও পর্যন্ত যত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে যে কোষের মধ্যে অবস্থিত নিউক্লিয়াস সকল কিছু জৈবনিক কার্যের মূল উৎস অর্থাৎ ইহাকে জৈবনিক কার্যসমূহের কেন্দ্র-বিন্দু বা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। পরীক্ষার দ্বারা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে নিউক্লিয়াসবিহীন একটি কোষ বেশীক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে না, আবার

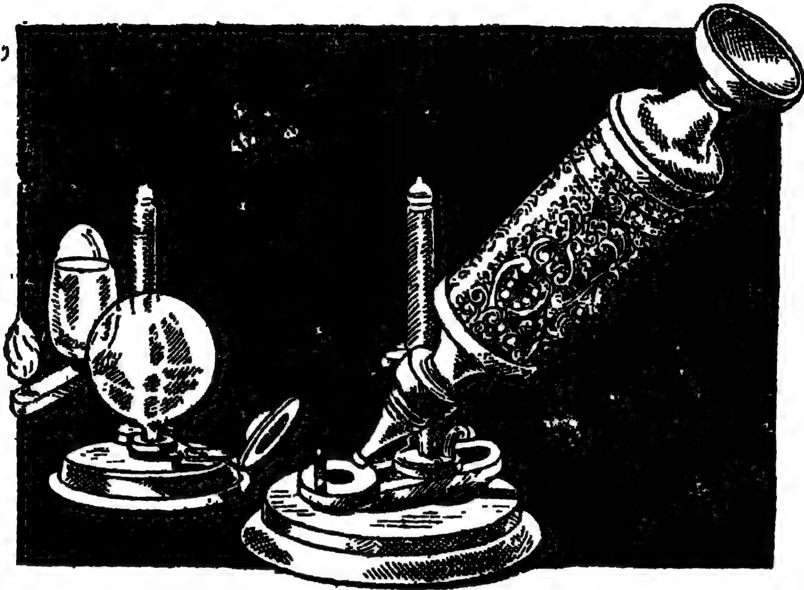


৩নং চিত্র—T_2-ব্যাকটেরিওফাজ

অন্যদিকে, সাইটোপ্লাজমে ছাড়া শুধুমাত্র নিউক্লিয়াস তাহার কার্যক্রম বেশীক্ষণ বজায়

রাখিতে পারে না বা জীবিত থাকিতে পারে না। সুতরাং ইউক্যারিয়টিক কোষে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম উভয় পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল থাকে। নিউক্লিয়াসকে যথাযথ কার্য করিতে হইলে উহাকে সাইটোপ্লাজমের আবরণের মধ্যে থাকিতে হইবে। যদিও নিউক্লিয়াস জৈবনিক কার্য সমূহের কেন্দ্র, তথাপি সাইটোপ্লাজম ছাড়া ইহার স্বাভাবিক কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না।

কোষবিদ্যা বিষয়টির গোড়াপত্তন ও উহার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে এই বিষয়টির সূচনা অষ্টাদশ শতাব্দির বহু পূর্বেই হইয়াছিল। 1656 খ্রীষ্টাব্দে Robert Hooke নামক জনৈক বিজ্ঞানী তৎকালীন প্রাচীন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (৪নং চিত্র) সাহায্যে সর্বপ্রথম শোলার পাতলা ছেদ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে,



৪নং চিত্র—রবার্ট হুকের অণুবীক্ষণ যন্ত্র

ইহার কোষপ্রাচীরগুলি মৌচাকের আকারে কক্ষের ন্যায় সাজান আছে। শোলার এই প্রস্থচ্ছেদের বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি "কোষ" কথাটি উল্লেখ করেন। কিছুকাল পরে তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে সবুজ বর্ণ উদ্ভিদের কোন কোন অংশে এই প্রকার কক্ষে একপ্রকার তরল পদার্থ রহিয়াছে। ইহার কিছুকাল পূর্বেও বিজ্ঞানীগণ রক্তের কোষ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য করেন যে ইহারা একপ্রকার ক্ষুদ্র এবং বিচিত্র প্রাণী। 1670 খ্রীষ্টাব্দে Anton Van Leeuwenhock (আঁতঁ ফাঁ লিউভানহুক্) ব্যাকটেরিয়া, শুক্রাণু এবং সমুদ্র ও বৃষ্টির জলে অবস্থিত প্রোটোজোয়া পরীক্ষা করেন এবং ইহাদের ক্ষুদ্র প্রাণী বলিয়া অভিহিত করেন। 1672 খ্রীষ্টাব্দে Nehemiah Grew যে সকল তথ্যাদি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা হইতে ইহা ধারণা করা যায় যে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র-কক্ষ-যুক্ত দেহের গঠন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। Marcello, Malpighi প্রভৃতি Leeuwenhock-এর সমসাময়িক বিজ্ঞানীগণ ও তৎকালীন ভ্রূণ বিদ্যাবিশারদ ও উদ্ভিদবিদ্যা বিজ্ঞাণীগণ, কোষগুলি কলাতে কিরূপ

সজ্জিত থাকে তাহার সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেন। ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরে উন্নত ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহৃত হয় এবং জীবদেহ গঠনে কোষ ও কলার অবদান উপলব্ধি করা যায়। 1801 হইতে 1809 খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ (de Mirbel, Oken এবং Lamark) স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেন যে, কোষ-সমন্বিত কলাই জীবদেহ গঠনের মূল উপাদান। 1824 খ্রীষ্টাব্দে Henri Joachin Dutrochet (হেনরী ইউয়াকিন ডুট্রোসে) এবং পরবর্তীকালে Turpin এবং Meyers, কোষের আকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া মন্তব্য করেন যে, কোষ শুধুমাত্র আকৃতি গঠনের মূল একক নহে পরন্তু ইহাকে মূল জৈবনিক একক রূপেও গণ্য করা যায়। 1831 খ্রীষ্টাব্দে Robert Brown, Tradescantia উদ্ভিদ কোষে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন। 1832 খ্রীষ্টাব্দে Dumortier শৈবাল কোষে বিভাজন লক্ষ্য করেন। ইহার পর H. VonMohl কোষ বিভাজনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য চিত্রায়িত করেন।

1839 খ্রীষ্টাব্দে Theodor Schwann (প্রাণী বিজ্ঞানী) এবং Matthias J Schleiden (উদ্ভিদ বিজ্ঞানী) নামক বিজ্ঞানীদ্বয় Dutrochet এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ একত্রিত করিয়া একটি তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই তত্ত্বকে 'কোষতত্ত্ব' (cell theory) বলা হয়। কোষতত্ত্বের মূল ব্যাখ্যা হইল যে, সকল জীবদেহই এক বা একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত এবং জীবদেহের মৌলিক অংশের গঠনের দ্বারাই কোষের উৎপাদন হইয়া থাকে। কোষতত্ত্ব প্রবর্তনের সময় কোষের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা ছিল না। Schleiden মনে করিতেন যে একটি কোষের অভ্যন্তরে তাহার নিউক্লিয়াস হইতে আর একটি নূতন কোষের সৃষ্টি হয়। নূতন কোষ সৃষ্টির এই মতবাদ যদিও তাঁহাদের সময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে উহা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং বিশেষত, 1840 খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে বিভিন্ন বিজ্ঞানী যেমন, Von Mohl, Nageli, Remak এবং Rudolf Virchow নির্দিষ্টরূপে প্রমাণ করেন যে একটি পুরাতন কোষ হইতে আর একটি নূতন কোষের উদ্ভব হয়।

1861 খ্রীষ্টাব্দে মাক্স সুল্ৎসে (Max Schultze) কোষকে নিউক্লিয়াস সমেত প্রোটোপ্লাজম বলিয়া বর্ণনা করেন। Robert Hooke যে শোলার কোষের চতুর্দিকে দৃঢ় প্রাচীর নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন তাহা কয়েক প্রকার কোষের বিশেষত্ব। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ প্রাচীর কোষে দেখিতে পাওয়া যায় না। জীবিত কোষের অভ্যন্তরে যে ঘন তরল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উহাকে প্রোটোপ্লাজম নামে অভিহিত করা হয়। ইহার প্রকৃত রাসায়নিক ও ভৌত চরিত্র এবং প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞানীগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে কোষের আণবিক ও আয়নঘটিত গঠন সম্বন্ধে নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তন হয়।

উন্নত প্রকৃতির অণুবীক্ষণ যন্ত্র সৃষ্টির সাথে কোষের আভ্যন্তরিক গঠন ও বিভাজন পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট হয়। ইহার পর হইতে কোষবিদ্যা ও সুপ্রজনন বিদ্যার

ব্যাপক প্রসার ঘটে। Weismann, Flemming, Van Beneden, Boveri, Sutton প্রমুখ বিজ্ঞানীগণের অসাধারণ অবদানের ফলে এই বিষয়টির উত্তোরত্তর উন্নতি সাধন হয়। 1902 খ্রীষ্টাব্দে Sutton মায়োসিস কোষ বিভাজনের যৌক্তিকতা বর্ণনা করেন ও ক্রোমোজোমই বংশগতির ধারক ও বাহক এই তত্ত্বটি উত্থাপন করেন ; ক্রমে, Boveri ও অন্যান্য বিজ্ঞানীগণের গবেষণায় ইহা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপরে উল্লিখিত বিজ্ঞানীগণ ব্যতীত Gregor Johon Mendel এর নাম উল্লেখযোগ্য। 1865 খ্রীষ্টাব্দে তিনি মটর গাছের উপর যে প্রজনন পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহার দ্বারা তিনি দেখাইয়াছিলেন যে মটর গাছের ভিন্ন প্রকৃতির গুণগুলি একটি নির্দিষ্ট গাণিতিক নিয়মে বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়। তাঁহার সময় ক্রোমোজোম ও কোষ বিভাজনের কোন সঠিক ধারণা ছিল না। ঐ সকল পরীক্ষা হইতে মেণ্ডেল যে তত্ত্ব সমূহ পাইয়াছিলেন তাহা হইতে বংশগতি সম্বন্ধে তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন তাহা, সেই সময় কোন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই বা কাহাকেও আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে, বিশেষত 1909 খ্রীষ্টাব্দে De Vries, Correns ও Von Tschermak নামক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী গণমেণ্ডেলের কাজ আবিষ্কার করেন ও ইহাকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভে সহায়তা করেন।

কোষবিদ্যা বিষয়ক ক্রিয়াপদ্ধতি (Cytological techniques)

প্রাচীন অণুবীক্ষণ যন্ত্র অতীব অবিন্যস্ত এবং ইহার বিবর্ধন-ক্ষমতা (magnification) অল্প ছিল। 1590 খ্রীষ্টাব্দে একজন চশমা প্রস্তুতকারক প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বিখ্যাত Galileo Galilei, যিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যায় একটি শ্রেষ্ঠ অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সংস্কার করেন। Robert Hooke এবং Van Leeuwenhock কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রাচীন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধন-ক্ষমতা 275 গুণের মধ্যে হইলেও তাঁহারা কোষ সম্বন্ধে প্রারম্ভিক ধারণা এবং কোষবিদ্যা পাঠের সূচনা করিয়াছিলেন। উন্নত ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের সাথেই কোষের আকৃতি ও কার্য সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর হইয়াছে, এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে জীববিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে। বর্তমান যুগে ইলেকট্রণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের দ্বারা ক্ষুদ্রতম কোষের বিভিন্ন অংশ এমন কি ভাইরাসকেও 1,00,000 বা তদধিক গুণ বিবর্ধিত করিয়া তাহাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

1940 খ্রীষ্টাব্দে Albert Claude নামক বিজ্ঞানী সেণ্ট্রিফিউজ (Centrifuge) যন্ত্রের সাহায্যে কোষকে বিভিন্ন গতিতে আবর্তিত করিয়া নিউক্লিয়াস ও কোষের অন্যান্য উপাদানগুলিকে পৃথক করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই পদ্ধতিতে কোষের উপাদানের রাসায়নিক ও এনজাইম সংক্রান্ত ক্রিয়াপদ্ধতি জানিতে পারা যায়। কোষের রাসায়নিক গঠন জানিবার সময় দেখা যায় যে, ইহার কয়েকটি পদার্থ বিশেষ কয়েক প্রকার রঞ্জক

(stain) পদার্থের সহিত বিক্রিয়া করে। DNA, RNA প্রভৃতিকেও বিশেষ রঞ্জক পদার্থের দ্বারা রঞ্জিত হইতে দেখা যায়। এইরূপে কোষের রাসায়নিক রঞ্জন পদ্ধতির দ্বারা ইহার অভ্যন্তরে কিরূপ পদার্থ বিদ্যমান এবং ইহাদের পরিমাণ কিরূপ তাহা জানিতে পারা যায়।

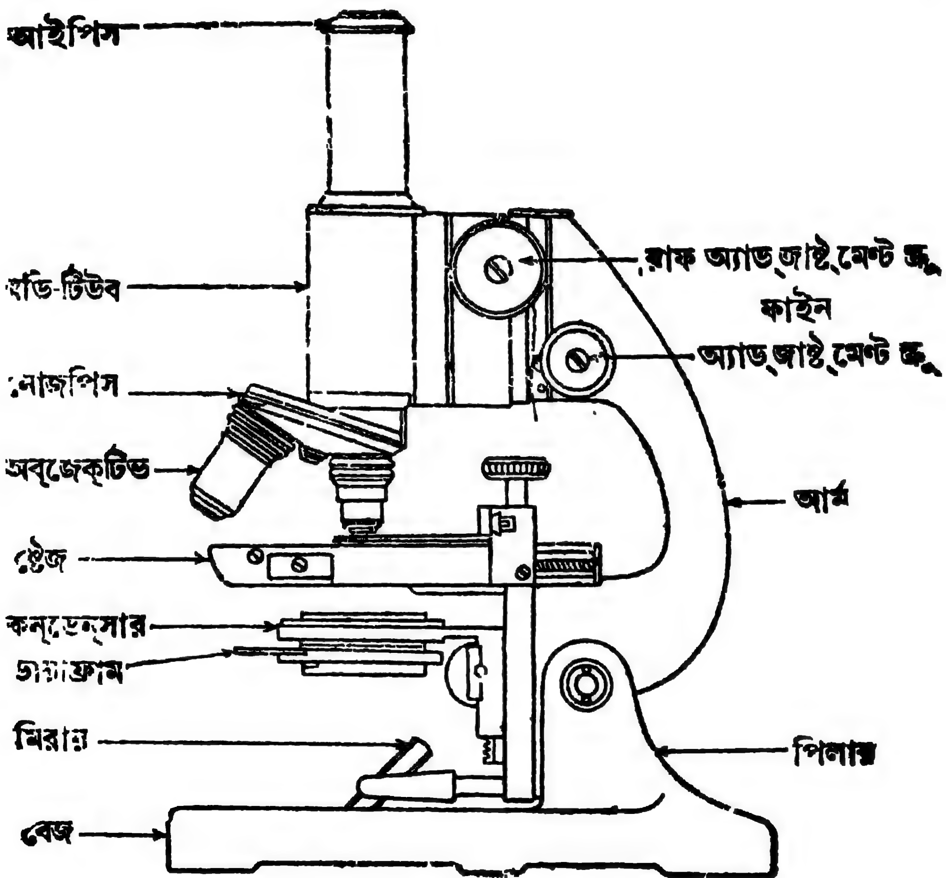
Torbjorn Casperson নামক বিজ্ঞানী আলট্রাভায়োলেট অণুবীক্ষণ যন্ত্র (ultraviolet microscope) আবিষ্কার করেন। ইহা সাইটোফোটোমেট্রিতে (Cytophotometry) ব্যবহৃত হয়। আলট্রাভায়োলেট রশ্মির দ্বারা নিউক্লিক অ্যাসিড অতিরিক্ত রঞ্জক পদার্থ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় যাহা সাধারণ আলোকে সম্ভবপর নহে। নিউক্লিক অ্যাসিডের বিন্যাস, সংশ্লেষ এবং কোষ-মধ্যস্থ জটিল প্রোটিন সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য এই প্রকার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জানিতে পারা যায়।

উল্লিখিত কোষবিদ্যার ক্রিয়াপদ্ধতি দ্বারা জীববিজ্ঞানীগণ কোষের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি যে শুধু জানিতে পারেন তাহাই নহে, ইহার বিভিন্ন গঠনের ক্রিয়াগুলিও অবগত হন।

২

কোষ
The Cell

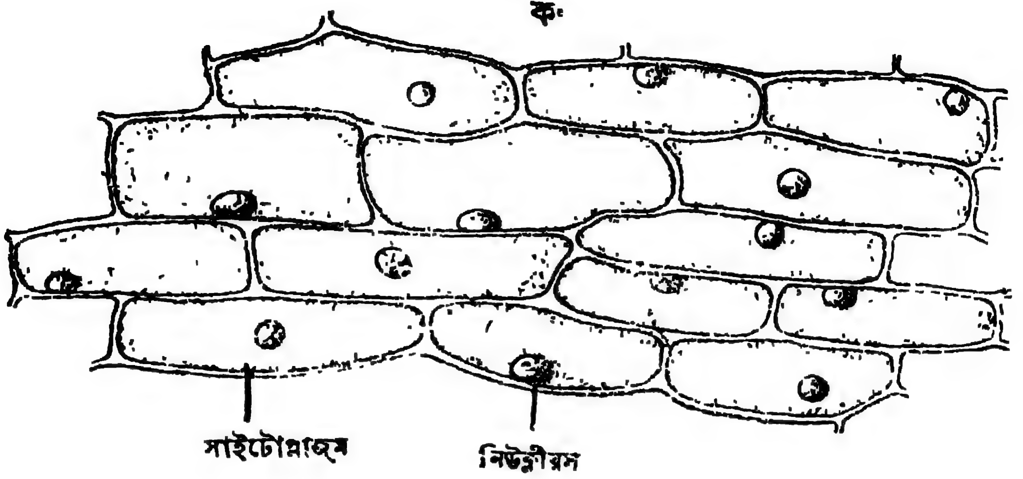
উদ্ভিদের যে-কোন অঙ্গ (যথা মূল, কাণ্ড, পাতা ইত্যাদি) হইতে একটি পাতলা ছেদ লইয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিলে বহু পরস্পর-সংলগ্ন গোলাকার অথবা বহুভুজ-ক্ষেত্রবিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ দেখা যায়। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটি ফাঁকা স্থান এবং উহার চারিদিকে একটি প্রাচীর থাকে ; এই প্রাচীরকে কোষ প্রাচীর (cell wall) বলে। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, ফাঁকা স্থানটি অর্ধ-স্বচ্ছ আঠালো পদার্থে পরিপূর্ণ থাকে ; ইহাকে প্রোটোপ্লাজম (protoplasm) বলে। এই প্রোটোপ্লাজমই উদ্ভিদের প্রাণপদার্থ এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের সুব্যবস্থিত প্রোটোপ্লাজমকে প্রোটোপ্লাস্ট (protoplast) বলে। কোষপ্রাচীর সমেত প্রোটোপ্লাস্টকে কোষ (cell) বলে। কোষপ্রাচীর মৃত পদার্থ ; কোষকে নির্দিষ্ট আকৃতি ও দৃঢ়তা প্রদানের জন্য ইহা

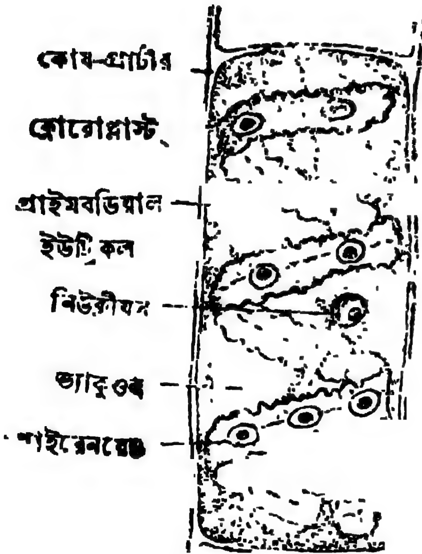


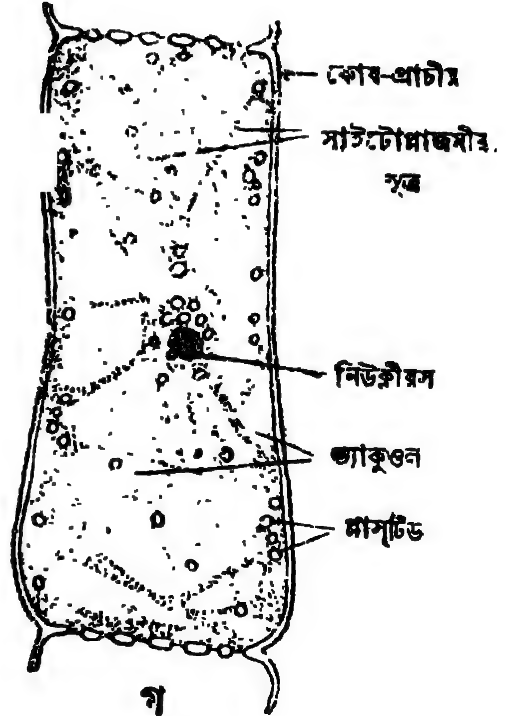
৫নং চিত্র—অণুবীক্ষণ যন্ত্র

প্রোটোপ্লাজম হইতে গঠিত হয়। ইহা কোষের অত্যাবশ্যক অংশ নহে ; কারণ জননকোষের কোন প্রাচীর থাকে না। এইরূপ প্রোটোপ্লাস্টকে নগ্ন (naked) বলে। প্রোটোপ্লাজমই কোষের অত্যাবশ্যক অংশ, কারণ ইহা কোষের প্রাণ ; এইজন্য প্রোফেসার হাক্সলে (Huxley) ইহাকে জীবনের মূল ভিত্তি (physical basis of life) বলিয়াছেন। কোষ হইতে প্রোটোপ্লাজম অদৃশ্য হইলে ইহাকে মৃত (dead) বলে। কোষ উদ্ভিদদেহ

গঠনের মানস্বরূপ। ইট পরস্পর সাজাইয়া যেমন অট্টালিকা প্রস্তুত হয়, সেইরূপ কোষ সাজাইয়া উদ্ভিদের দেহ গঠিত হয়। কোষকে জৈবনিক কার্যের মানস্বরূপ বলা হয়; কারণ, ইহারাই গাছের সকল রকম কাজ করিয়া থাকে। সুতরাং কোষই উদ্ভিদের গঠন ও কার্যের মানস্বরূপ।







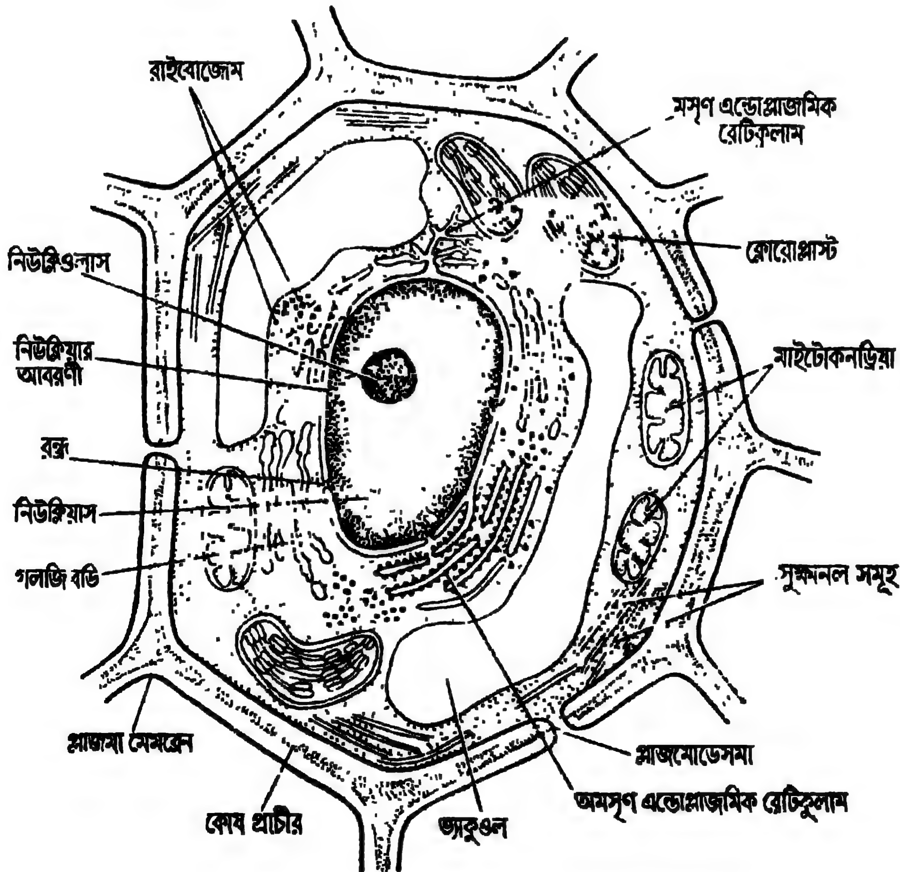
৬নং চিত্র—উদ্ভিদের কোষ:
(ক) পিঁয়াজের শল্কপত্রের কোষ; (খ) স্পাইরোগাইরার কোষ; (গ) স্কোয়াশের রোমের কোষ;

বর্তমানে কোষ (cell) সম্বন্ধে আমাদের যাহা জ্ঞান তাহার মূলে আছে জে. জানসেন ও জেড জানসেন (J. and Z. Janssen) নামক দুইজন ডাচ চশমা-প্রস্তুতকারকের অবদান। ইঁহারাই অণুবীক্ষণ-যন্ত্র (microscope) আবিষ্কার করেন (৫নং

চিত্র)। কোষ (cell) এই নামটি অবশ্য সর্বপ্রথমে দেন একজন ইংরাজ স্থপতিবিদ রবার্ট হুক (Robert Hooke)।

জীব, প্রাণী অথবা উদ্ভিদ যাহাই হউক না কেন, উহার প্রথম জীবনে একটি মাত্র কোষ থাকে। যদি চিরজীবন ধরিয়া ইহার একটি কোষ থাকে, তবে ইহাকে এককোষী (unicellular) বলে; কিন্তু যদি ক্রমশ নূতন নূতন কোষ সৃষ্টি করিয়া ইহা অনেকগুলি কোষযুক্ত হয়, তবে ইহাকে বহুকোষী (multicellular) বলে। সাধারণত নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদেরাই এককোষী হয়; যথা—ইস্ট, ব্যাক্টিরিয়া, ডায়াটম, ডেস্মিড প্রভৃতি। ইহারা সাধারণত এত ক্ষুদ্র হয় যে, ইহাদিগকে শুধু চোখে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে হয়। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদেরা বহুকোষী। নিম্নশ্রেণীর বহুকোষী উদ্ভিদের দেহে একই প্রকার কতকগুলি কোষ থাকে এবং ইহারা প্রায় একই কাজ করে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের নানাবিধ কার্য করিতে হয় বলিয়া উহাদের কোষও বিভিন্ন প্রকার এবং কোষগুলি নানাভাবে সংযুক্ত হইয়া বিবিধ কার্য করে।

প্রাণী অথবা উদ্ভিদের শরীরের গঠন অনুযায়ী কোষের (cell) আকৃতি নানা



৭নং চিত্র—একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষ (ইউক্যারিয়টিক কোষ)

ধরনের হইয়া থাকে। সেইরূপ কোষের মাপও এক মাইক্রনের* কম হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক শত মাইক্রন পর্যন্ত হইতে পারে।

*1 মাইক্রন (1μ) = 0·001 মিলিমিটার

কোষের অংশ (parts of a cell) : একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষের (৭নং চিত্র) দুইটি প্রধান অংশ আছে। **প্রোটোপ্লাজম** (protoplasm) এবং **কোষপ্রাচীর** (cell wall)। প্রোটোপ্লাজমে প্রধানত **নিউক্লিয়াস** (nucleus), **প্লাসটিড** (plastids) ও **সাইটোপ্লাজম** (cytoplasm) থাকে এবং ইহা ব্যতীত সময় সময় **কন্ড্রিয়োসোম** (chondriosome) অথবা **মাইটোকন্ড্রিয়া** (mitochondria), **গলগি বডি** (goigi bodies) **সেন্ট্রোসোম** (centrosomes), **কোষগহ্বর** (vacuoles), এবং **আরগাস্টিক পদার্থ** (ergastic substances) থাকে। **হানস্টাইন** (Hanstein) নামক জীববিজ্ঞানীর মতে আদর্শ প্রোটোপ্লাস্টে জীবন্ত ও সুব্যবস্থিত প্রোটোপ্লাজম ও উহার চারিদিকে একটি প্রাচীর থাকে।

প্রোটোপ্লাজম : Protoplasm

জীবন্ত কোষে প্রোটোপ্লাজম নামক একপ্রকার জটিল জীবিত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে বিজ্ঞানী **হাক্সলে** (Huxley) **জীবনের মূল ভিত্তি** (physical basis of life) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিজ্ঞানী **উইলসন্** (Wilson) বলেন যে প্রোটোপ্লাজম কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের সমষ্টি মাত্র। বিজ্ঞানী **থমসনের** (Thomson) মতে প্রোটোপ্লাজম একটি বিস্ময়কর গতিশীল পদার্থ যাহার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভবপর নহে।

প্রোটোপ্লাজমের ভৌত গঠন অনুযায়ী ইহা ঘন আঠালো, স্থিতিস্থাপক, অর্ধস্বচ্ছ জেলির ন্যায় পদার্থ বিশেষ। ইহা কতকটা দানাদার ও জলের দ্বারা সম্পৃক্ত থাকে; ইহার ঘনত্ব জলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। জল অপসারিত হইলে ইহা আর জৈবনিক কার্য করে না ও ক্রমশ কঠিন হয়।

বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে প্রোটোপ্লাজম নানা প্রকার জটিল এবং বিক্ষিপ্ত পদার্থের সমষ্টি, যাহাদের আকৃতি দানাদার, গোলাকার, সূত্রাকার বা জালিকাকার হইতে পারে এবং আয়তনের তুলনায় ইহারা বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া থাকে। প্রোটোপ্লাজমের মূল উপাদানগুলি মৃত হইলেও সমষ্টিগতভাবে ইহা জীবিত।

রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী প্রোটোপ্লাজম অতি জটিল পদার্থ। ইহার সঠিক উপাদান জানা বিশেষ কঠিন ; কারণ বিশ্লেষণের সময় ইহা মরিয়া যায় এবং মৃত প্রোটোপ্লাজমের উপাদান সজীব প্রোটোপ্লাজমের উপাদান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যাহা হাউক এ পর্যন্ত জানা গিয়াছে যে ইহা কার্বোহাইড্রেট, প্রোটীন, লাইপিড, জল এবং অজৈব লবণ দিয়া গঠিত এবং ইহাদের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক ও সময় সময় ফসফরাস নামক মৌলিক পদার্থ থাকে। প্রোটোপ্লাজমের জলই প্রধান উপাদান, কারণ ইহাতে সমগ্র আয়তনের শতকরা ৫০ হইতে ৭০ ভাগ জল আছে। অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় (continuous phase) ইহা নাইট্রেট, সালফেট, ক্লোরাইড প্রভৃতি নানা প্রকার লবণের দ্রবণ, কিন্তু বিক্ষিপ্ত অবস্থায় (dispersed phase) ইহা প্রধানত কার্বোহাইড্রেট, প্রোটীন, চর্বি প্রভৃতি জৈব পদার্থের সমষ্টি। ইহা পোড়াইলে

অ্যামোনিয়ার গন্ধ নির্গত হয়। সজীব প্রোটোপ্লাজম ঈষৎ ক্ষারীয় অথবা নিরপেক্ষ কিন্তু ইহার কোন আম্লিক ধর্ম নাই। সুরাসার, খনিজ অ্যাসিড এবং তাপ প্রয়োগ করিলে প্রোটোপ্লাজম ডিমের সাদা অংশের মত ঘনীভূত হয়।

প্রোটোপ্লাজমের বিভিন্ন অংশ (Parts of protoplasm) :

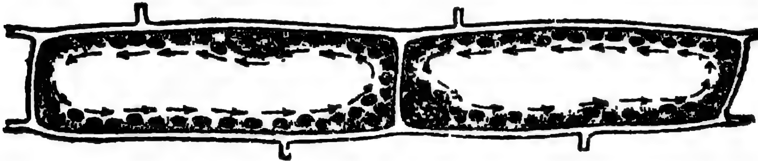
প্রোটোপ্লাজমে তিন প্রকার পদার্থ আছে (৫নং চিত্র) :

১। **নিউক্লিয়াস** (Nucleus)—ইহা প্রোটোপ্লাজমের সর্বাপেক্ষা ঘন অংশ এবং সাধারণত উহার কেন্দ্রে অবস্থিত।

২। **প্লাসটিড** (Plastids)—ইহারা প্রোটোপ্লাজমের ক্ষুদ্র ঘন অংশ। ছত্রাক-জাতীয় উদ্ভিদ ব্যতীত সকল উদ্ভিদে ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়.।

৩। **সাইটোপ্লাজম** (Cytoplasm)—প্রোটোপ্লাজম হইতে উপরোক্ত ঘন অংশগুলি বাদ দিলে যে স্বচ্ছ চটচটে ও বর্ণহীন অংশ পড়িয়া থাকে তাহাকে **সাইটোপ্লাজম** (cytoplasm) বলে।

প্রোটোপ্লাজমের চলন (Movement of protoplasm)—প্রোটোপ্লাজম কখনো স্থির থাকে না সর্বদাই চলাফেরা করে। কোষস্থিত প্রোটোপ্লাজমের চলনকে সাধারণত **আবর্তন** (cyclosis) বলে। এই আবর্তন দুই প্রকার : (১) **প্রবাহগতি** (rotation)—যখন প্রোটোপ্লাজম নিয়মিতভাবে কোষপ্রাচীরের নিচে প্রবাহিত হয়; আবর্তনের পথ সর্বদাই নির্দিষ্ট (৮নং চিত্র) ; যথা—পাতাশেওলা (*Vallisneria*) ; (২) **আবর্তনগতি** (circulation)—যখন প্রোটোপ্লাজম কোন নির্দিষ্ট পথে চলে না,



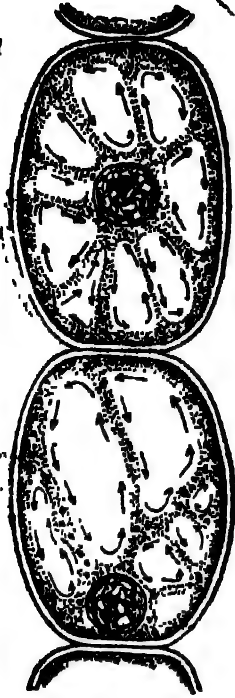
৮নং চিত্র—প্রোটোপ্লাজমের প্রবাহগতি

আঁকাবাঁকা হয়, ট্রাডেসক্যানসিয়ার (*Tradescantia*) পুংকেশরের রোম (৯নং চিত্র)। সাধারণত জলজ গাছে প্রবাহগতি এবং স্থলজ গাছে আবর্তনগতি দেখিতে পাওয়া যায়। নগ্ন প্রোটোপ্লাজমের দুই প্রকার চলন আছে : (a) **অ্যামিবয়েড** (Amoeboid)—যখন সমস্ত নগ্ন প্রোটোপ্লাজম এককোষী প্রাণী আমিবার (*Amoeboid*) মত এক স্থান হইতে অপর স্থানে যায় এবং সর্বদাই বিবিধ আকৃতি ধারণ করে ; যথা—**মিক্সোমাইসিটিস** (Myxomycetes) ; (b) **সিলিয়ারী** (cilliary)—যখন নগ্ন প্রোটোপ্লাজমের এক বা অধিক অংশে **সিলিয়া** (cilia) বা রোম উৎপন্ন হয় এবং উহাদের সাহায্যে এক স্থান হইতে অপর স্থানে যায় ; যথা—মস্ (moss), ফার্ন (fern) প্রভৃতি উদ্ভিদের পুং-জননকোষ।

প্রোটোপ্লাজমের কার্য (Functions of protoplasm)—প্রোটোপ্লাজম জীবনের সকল কাজই করে। প্রোটোপ্লাজমই পোষণ ও অন্যান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পাদন

করে ; ইহার মধ্যেই বিভিন্ন শক্তির বিনিময় হয়। উত্তেজনা, যাহা সজীব পদার্থের বৈশিষ্ট্য, তাহা প্রোটোপ্লাজমের মধ্যেই অবস্থিত। ইহার ভিতরে যে-সকল বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ প্রবেশ করে, তাহাদিগের সংযুক্ত করিয়া নিজের মত পদার্থ (অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজম) গঠন করে। প্রোটোপ্লাজম জননসম্বন্ধীয় সকল কার্যই সম্পন্ন করে।

প্রোটোপ্লাজমের পরীক্ষা (Tests for protoplasm) (১) আইওডিন দ্রবণে ইহা ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে ; (২) ইহাকে নাইট্রিক অ্যাসিডে গরম করিলে হরিদ্রা বর্ণের হয়, কিন্তু ইহাকে ঠাণ্ডা করিয়া অ্যামোনিয়া প্রয়োগ করিলে কমলা রঙের হয় ; ইহাকে **জ্যান্থো-প্রোটীন পরীক্ষা** (Xantho-protein test) বলে ; (৩) ইহাকে পারদের নাইট্রেটের সহিত উত্তপ্ত করিলে সুরকির গুঁড়ার মত রং হয়। ইহাকে বলা হয় **মিলনের পরীক্ষা** (Millon's test) ; (৪) সালফিউরিক অ্যাসিড ও ইক্ষু-শর্করার সংস্পর্শে আসিলে প্রোটোপ্লাজম গোলাপী রঙের হয় ; (৫) ইহা কষ্টিক পটাশ অথবা ইউ-ডি-জ্যাভেলে (সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইটের দ্রব) সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়।



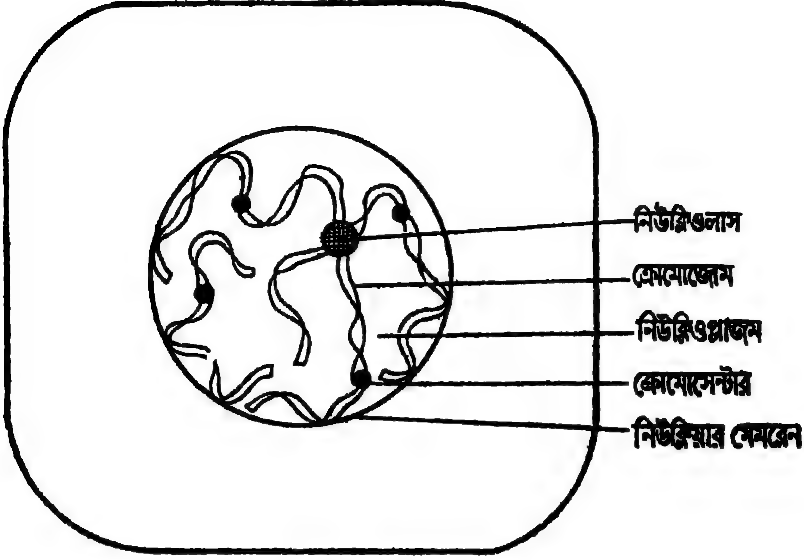
১নং চিত্র—
প্রোটোপ্লাজমের আবর্তনগতি

২। **নিউক্লিয়াস** (Nucleus)—প্রোটোপ্লাজমের একটি বিশিষ্ট অংশকে নিউক্লিয়াস বলে। ইহা সাইটোপ্লাজমের কোন স্থানে অবস্থান করে। সকল জীবিত উদ্ভিদ কোষেই ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ, যথা—নীলাভ সবুজ বর্ণের শৈবাল (Blue green algae or Cyanophyceae) ও ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃত নিউক্লিয়াস দেখা যায় না। নীলাভ সবুজ বর্ণের শৈবালের ক্ষেত্রে অবশ্য ক্রোমাটিন বস্তুগুলি নিউক্লিয়াসের কার্য সম্পন্ন করে।

সাধারণত প্রতি কোষে একটিমাত্র নিউক্লিয়াস দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ছত্রাক, কয়েকটি শৈবাল ও কোন কোন জনন কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে। একটিমাত্র নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষকে এক নিউক্লিয় কোষ (uninucleate cell) ও বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষকে বহু নিউক্লিয় কোষ (multinucleate cell) বলে। দুই প্রকারে কোষ বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত হয় : (১) নিউক্লিয়াস বিভক্ত হইয়া অথবা (২) পরস্পর সংলগ্ন কোষগুলির প্রাচীর বিশ্লিষ্ট হইয়া ; যথা—ক্ষীর নালী (latex vessel)। কোন কোন ক্ষেত্রে অনেকগুলি কোষের প্রস্থ প্রাচীরগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া বহু শাখান্বিত নলের ন্যায় আকার ধারণ করে এবং ইহার সাইটোপ্লাজমে বহু সংখ্যক নিউক্লিয়াস অবস্থান করে এইরূপ আকৃতিকে সিনোসাইট (Coenocyte) বলে। যথা, ভাউকেরিয়া (*Vaucheria*), মিউকর (*Mucor*) প্রভৃতি (১নং চিত্র)।

সাধারণত নিউক্লিয়াস গোলাকার বা উপবৃত্তাকার দেখিতে হয় কিন্তু কোন কোন

ক্ষেত্রে দীর্ঘ, ডাম্বেল আকৃতির (dumbel shaped) বা অর্ধচন্দ্রাকৃতিরও হইতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের আয়তনেরও পরিবর্তন হয়। সাধারণত একবীজপত্রী ও



১০নং চিত্র—নিউক্লিয়াসের গঠন

পাইন শ্রেণীর (coniferae) উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস দেখিতে বেশ বড় হয় কিন্তু ছত্রাকের ক্ষেত্রে ইহা সর্বাপেক্ষা ছোট। ভাজক কলার (meristematic tissue) কোষগুলি দেখিতে ছোট বলিয়া নিউক্লিয়াসটি অপেক্ষাকৃত বড় বলিয়া বোধ হয় কিন্তু কোষটি বড় হইলে ইহাকে আর সেইরূপ দেখায় না।

সাধারণত নিউক্লিয়াস কোষের মধ্যস্থলে অবস্থান করে। ১০নং চিত্রে নিউক্লিয়াসের একটি রেখাচিত্র দেখান হইয়াছে। অনেকগুলি ভ্যাকুওল (vacuoles) থাকিলেও নিউক্লিয়াসকে কোষের কেন্দ্রস্থলে দেখা যাইতে পারে কিন্তু একটিমাত্র বড় ভ্যাকুওল থাকিলে ইহা সাইটোপ্লাজমের বহির্ভাগে কোষ প্রাচীরের দিকে স্থানান্তরিত হয়। অথবা কোষের মধ্যস্থলে থাকিতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস বহির্ভাগে অবস্থিত সাইটোপ্লাজমের সহিত সাইটোপ্লাজমীয় (cytoplasmic stems) সূত্রের দ্বারা সংযুক্ত থাকে।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে প্রোটোপ্লাজমের ন্যায় নিউক্লিয়াসে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক ও যথেষ্ট পরিমাণ ফসফরাস থাকে। নিউক্লিন (Nuclein) নামক একপ্রকার নিউক্লিও প্রোটীন ইহাতে সর্বদাই থাকিতে দেখা যায়। নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটামিন, হিস্টোন প্রভৃতি প্রোটিনের অংশ দ্বারা নিউক্লিন গঠিত।

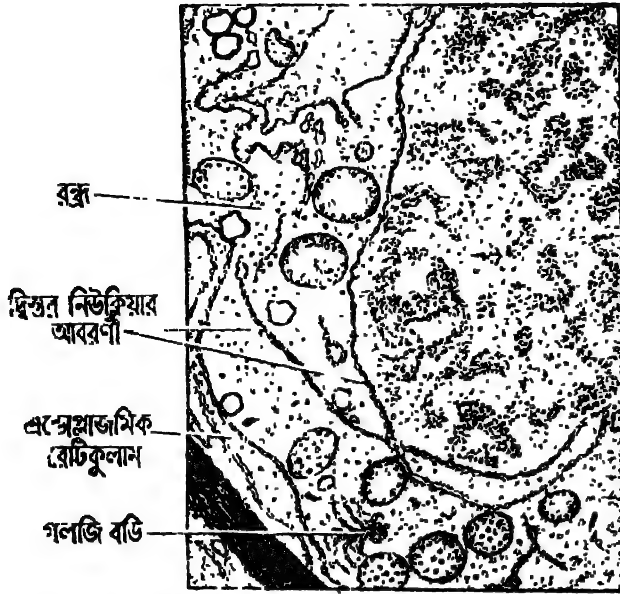
নিউক্লিয়াস কখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপন্ন হয় না। ইহা প্রত্যক্ষভাবে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় অথবা পরোক্ষভাবে অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া নূতন নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে। অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াসটির কোন স্থান সংকুচিত (constriction) হইয়া দুইটি নূতন নিউক্লিয়াস গঠন করে, যাহারা অসমান আকৃতির হইতে পারে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস পুনঃ পুনঃ

বিভক্ত হইলে মাতৃ কোষটি বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত হইতে পারে অথবা নবগঠিত নিউক্লিয়াসগুলির চারিদিকে কোষপ্রাচীর গঠিত হইলে ইহা বহু সংখ্যক কোষে পরিণত হয়। ইহা কারা (*chara*) নামক নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের পর্বমধ্য অন্তর্গত কোষে দেখা যায়।

নিউক্লিয়াসের গঠন (Structure of the nucleus) **:**

উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় বিভাজনের পূর্বাবস্থায় বিশ্রাম নিউক্লিয়াসকে (resting nucleus) পর্যবেক্ষণ করিলে নিম্নলিখিত অংশগুলি দেখা যায় :

নিউক্লিও আবরণ (Nuclear membrane)—ইহা প্রকৃতপক্ষে প্রোটোপ্লাজমীয় স্তর যাহা নিউক্লিয়াস হইতে চতুষ্পার্শ্বস্থ সাইটোপ্লাজমকে পৃথক করে। ইহা দুইটি স্তরের সমষ্টি এবং প্রোটিন ও লাইপিড দ্বারা গঠিত। নিউক্লিও আবরণী সম্পূর্ণ নিচ্ছিদ্র নহে, মাঝেমাঝে ছিদ্র থাকে (১১নং চিত্র)।



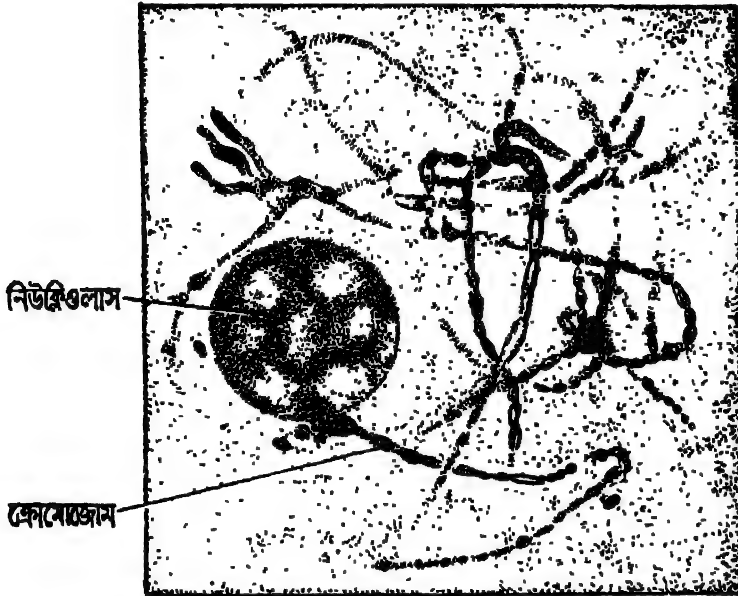
১১নং চিত্র—ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তোলা ভুট্টা গাছের মূলত্রের ভাজক কলা অঞ্চলের একটি কোষের ছবি। দ্বিস্তর নিউক্লিয়ার আবরণী, রন্ধ্র, এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এবং তৎসহ কিছু অসনাক্ত সাইটোপ্লাজমীয় বস্তু দেখা যাইতেছে।

কেরিওলিম্ফ বা **নিউক্লিও-প্লাজম** (Karyolymph or nucleoplasm)—ইহা নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ ঘন জেলির মত অংশ। ইহাতে খাদ্য সঞ্চিত থাকে, যাহা নিউক্লিয়াসের বিভাজনের সময় ব্যবহৃত হয়। ইহাকে **নিউক্লিয়ার স্যাপ** (Nuclear sap) বা **নিউক্লিও হায়ালোপ্লাজম** (Nucleo-hyaloplasm) নামেও অভিহিত করা হয়।

নিউক্লিও জালিকা (Nuclear reticulum)—ইহা নিউক্লিয়াসের প্রধান অংশ এবং অনিয়ত শাখা বিন্যাসযুক্ত কতকগুলি সূক্ষ্ম সুতার জালিকার দ্বারা গঠিত। ইহাতে কতকগুলি দানাদার অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জালিকাকে **ক্রোমাটিন** (chromatin) বলে, যাহা কোষ বিভাজনের সময় সুস্পষ্ট ক্রোমোজমে (chromosomes) পরিণত হয়। কোন নির্দিষ্ট প্রজাতির নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজমের সংখ্যাও নির্দিষ্ট এবং ইহারা পিতামাতার গুণাবলী সন্তান সন্ততিতে বহন করে। দানাদার অংশগুলিকে **ক্রোমোসেন্টার** (chromocentres) বলে যাহা জালিকার অবশিষ্টাংশ হইতে অধিক পরিমাণ রঞ্জক পদার্থ গ্রহণ করে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে ক্রোমাটিন চারিটি প্রধান অণুর সমাবেশ দ্বারা গঠিত। ইহারা হইল যথাক্রমে হিস্টোন (histone) (এক প্রকার প্রোটিন), একটি অধিকতর জটিল প্রোটিন, ডি অক্সি-রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড

বা ডি এন এ (deoxyribose nucleic acid or DNA) এবং রাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড বা আর এন এ (ribose nucleic acid or RNA)। এই অণুগুলির মধ্যে ডি এন এ হইল প্রধান যাহা ডি অক্সি-রাইবোজ, (deoxyribose) ফসফরিক অ্যাসিড (phosphoric acid), থাইমিন (thymine), সাইটোসিন (cytosine) অ্যাডেনিন (adenine) ও গুয়ানিন (guanine) নামক ক্ষুদ্রতর অণু দ্বারা গঠিত।

নিউক্লিওলাস (Nucleolus)—ইহা নিউক্লিয়াসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘন, উচ্চ প্রতিসরণ ক্ষমতা সম্পন্ন (refractive) অংশ এবং ইহাকে সহজেই রঞ্জিত করা যায়। একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের বিশেষ অঞ্চলে ইহা গঠিত হয় বলিয়া ঐ ক্রোমোজোমকে **নিউক্লিওলাস সংগঠক** (nucleolus organizer) বলা হয় (১২নং চিত্র)। সাধারণতঃ নিউক্লিয়াসে নির্দিষ্ট সংখ্যক নিউক্লিওলাস থাকে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার পরিবর্তন



১২নং চিত্র—ভুট্টা গাছের রেণু মাতৃকোষের ১ম মায়োসিস বিভাজন। চিত্রে ৬নং ক্রোমোজোমের সহিত নিউক্লিওলাসের নিবিড় সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে।

হইতে পারে। নিউক্লিওলাসের সঠিক কার্য সম্বন্ধে জানা যায় নাই ; সম্ভবতঃ ইহা প্রোটিন প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করে। অধিকন্তু ইহা প্রোটিন এবং আর. এন. এ. (RNA) দ্বারা গঠিত বলিয়া ইহা নিউক্লিয়াস হইতে সাইটোপ্লাজমে বংশজাত পদার্থ ও সংবাদ সংবহনে অংশগ্রহণ করে।

ক্রোমোসেণ্টার (Chromocentres)—ইহাদের সাধারণতঃ ইণ্টারফেজ নিউক্লিয়াসের সর্বত্র ক্রোমোজোমের সহিত সংলগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রোমোসেণ্টারগুলি কিছুটা স্ফীত বস্তু, এবং যে-সকল রঞ্জক পদার্থ দ্বারা ক্রোমোজোমকে রঞ্জিত করা হয়, সেই রঞ্জক ইহারা গ্রহণ করে। ক্রোমোসেণ্টার ক্রোমোজোমের অংশ কিনা অথবা পৃথক কোন বস্তু সেই সম্বন্ধে একান্ত সঠিকভাবে কিছু জানিতে পারা যায় নাই। কোন

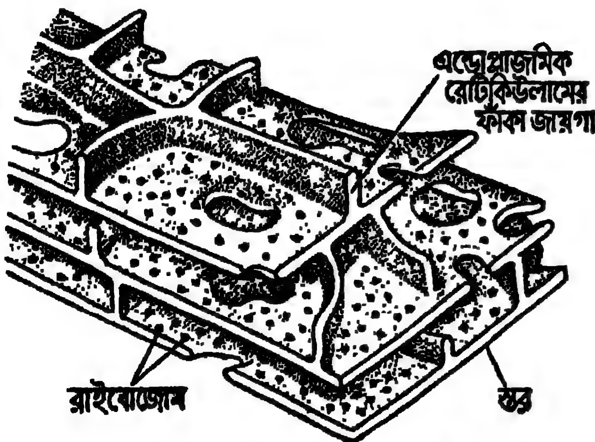
কোন প্রজাতির মধ্যে, যেমন—**ট্রিলিয়াম সেসাইল** (Trillium sessile), ইহার সংখ্যা এবং আকার মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট ; কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট এবং পরিবর্তনশীল। তবে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে সামগ্রিক ভাবে ক্রোমোসেণ্টারের আয়তন (volume) ক্রোমোজোম সংখ্যার সহিত সামঞ্জস্য পূর্ণ থাকে, অর্থাৎ ক্রোমোজোমের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে ইহার আয়তনও বৃদ্ধি হয়।

নিউক্লিয়াসের কার্য (Functions of nucleus) :

নিউক্লিয়াস প্রোটোপ্লাজমের যাবতীয় কার্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং উদ্ভিদের গঠনমূলক বিপাকীয় কার্যে (constructive metabolism) ইহা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। কোষের বৃদ্ধি ও বিন্যাসে ইহা অংশগ্রহণ করে বলিয়া নিউক্লিয়াসকে উদ্ভিদের মস্তিষ্ক বলিয়া বিবেচনা করা হয়। নিউক্লিয়াসকে বংশানুক্রমিক চরিত্রের বাহকরূপে গণ্য করা হয় অর্থাৎ ইহার মাধ্যমে পিতামাতার গুণাবলী সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়।

সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)—নিউক্লিয়াস ব্যতীত স্বল্পাধিক স্বচ্ছ, বর্ণহীন ও জেলীর ন্যায় প্রোটোপ্লাজমীয় অংশকে সাইটোপ্লাজম বলে। ইহা প্রোটোপ্লাজমের অধিকতর স্থান অধিকার করিয়া থাকে এবং নবগঠিত কোষ ইহা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ থাকে।

সাইটোপ্লাজম একপ্রকার স্বচ্ছ তরল পদার্থ দ্বারা গঠিত। ইহাকে **হায়ালোপ্লাজম** (hyaloplasm) বলে। দানাদার আকার ধারণ করিলে ইহাকে **এণ্ডোপ্লাজম** (endoplasm) বলে। ইহার চারিদিকে একটি স্বচ্ছ প্লাজমা স্তর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা দানাদার অংশ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। এই স্তরকে **এক্টোপ্লাজম** (ectoplasm) বা **প্লাজমা স্তর** (plasma membrane) বলে। ইহা সন্নিকটস্থ কোষ প্রাচীর হইতে এণ্ডোপ্লাজমকে পৃথক করিয়া রাখে। অনুরূপ একটি স্বচ্ছ সাইটোপ্লাজমীয় স্তর প্রতি ভ্যাকুওলকে আবৃত করে যাহাকে **টোনাপ্লাজম** (tonoplasm) বলে। এণ্ডোপ্লাজমের দানাদার পদার্থগুলিকে একত্রে **মাইক্রোসোম** (microsomes) বলে। প্লাজমা স্তর হইল আংশিক ভেদক (semi permeable) এবং ইহা অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় (osmosis) অংশগ্রহণ করে। প্লাজমা স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া নিউক্লিও আবরণ পর্যন্ত সমগ্র সাইটোপ্লাজমীয় স্তর একপ্রকার দুইটি স্তরযুক্ত জালিকার ন্যায় অংশ দ্বারা পরস্পর



১৩নং চিত্র—এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম

সংযুক্ত। ইহাকে **এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম** (endoplasmic reticulum) বলে (১৩নং চিত্র)। ইহা নানাবিধ পদার্থ ও এনজাইমের সংবহনে অংশগ্রহণ করে অথবা প্রোটিন সংশ্লেষের স্থান রূপে গণ্য হয়।

সাইটোপ্লাজম প্রধানতঃ সংবাদ সরবরাহ, রক্ষণ কার্য, চলন বা গমন প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করে। ইহা রঞ্জক পদার্থ অথবা নূতন কোষ উৎপন্ন করিতেও অংশ গ্রহণ করে।

ভ্যাকুওল (Vacuoles)—নূতন উৎপন্ন কোষ সর্বদাই সাইটোপ্লাজম দ্বারা পূর্ণ থাকে ; কিন্তু কোষটি আয়তনে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে নূতন করিয়া সাইটোপ্লাজম উৎপন্ন হয় না। সেই কারণে সাইটোপ্লাজমে কতকগুলি ক্ষুদ্র গহ্বরের সৃষ্টি হয় যাহাদের **ভ্যাকুওল** (vacuoles) বলে। পরিণত কোষে ভ্যাকুওলগুলি একত্রিত ও মিলিত হইয়া একটি বড় ভ্যাকুওলের সৃষ্টি করে। এই সময় কোষ প্রাচীরের নিচে সাইটোপ্লাজম একটি পাতলা স্তর গঠন করে। এইরূপ সাইটোপ্লাজমের স্তরে **প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিক্‌ল** (primordial utricle) বলে। ভ্যাকুওলের অন্তর্গত স্থানটি সম্পূর্ণরূপে শূন্য নহে ; ইহা **কোষ রস** (cell sap) নামক একপ্রকার পদার্থ দ্বারা পূর্ণ। ইহাতে নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। কোষ রসের প্রধান উপাদানগুলি হইল ম্যালিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিড প্রভৃতি বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড ও তাহাদের লবণ ও কার্বহাইড্রেট, প্রোটিন প্রভৃতি বিভিন্ন সঞ্চিত পদার্থ (reserve materials) ; নাইট্রেট, সালফেট, ফস্‌ফেট প্রভৃতি বিভিন্ন অজৈব লবণ ; উপক্ষার ট্যানিন প্রভৃতি বর্জ্য পদার্থ (excretory products) এবং বিভিন্ন প্রকার রঞ্জক পদার্থ (colouring matters)।

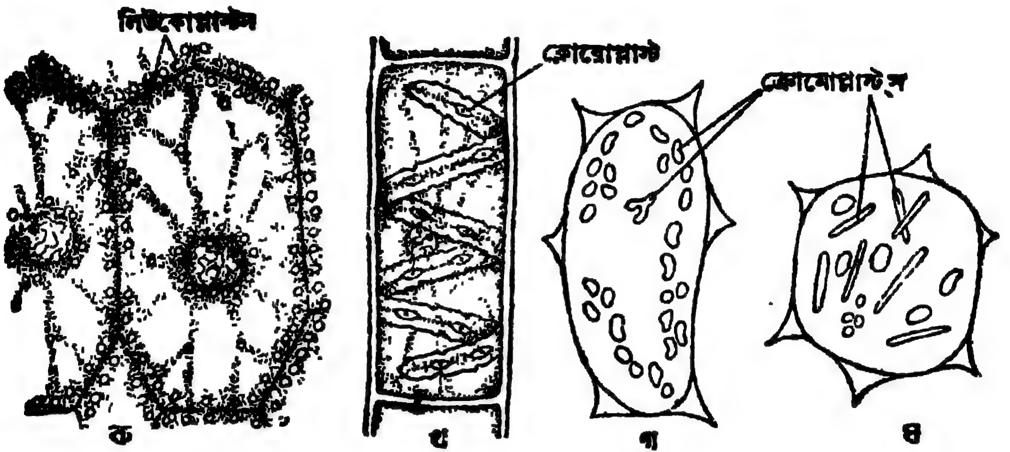
প্লাস্‌টিড (Plastids)—সাইটোপ্লাজমে একপ্রকার ক্ষুদ্র দানাদার অথবা বিভিন্ন আকৃতির পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের **প্লাস্‌টিড** (plastids) বলে।

প্লাস্‌টিডের সংঘটন, উদ্ভব ও গঠন (Occurrence, origin and structure of plasttids)—ছত্রাক, ব্যাক্‌টিরিয়া, মিক্সোমাইসিটিস ও নীলাভ-হরিৎ শেওলা ব্যতীত সকল উদ্ভিদে প্লাস্‌টিড থাকে। ইহারা নবগঠিত কোষে বর্ণহীন ও নিউক্লিয়াসের চারিদিকে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে নিহিত থাকে ; কিন্তু কোষের বৃদ্ধির সঙ্গে নিউক্লিয়াস হইতে দূরে সরিয়া যায় ও নানাবিধ বর্ণ ধারণ করে। ইহারা সাধারণতঃ আকারে ছোট হয়। অধিকাংশ শৈবালের কোষে একটিমাত্র প্লাস্‌টিড থাকে, কিন্তু জিগ্‌নিমাতে (Zygnema) দুইটি ও অধিকাংশ উদ্ভিদে প্লাস্‌টিড থাকে। প্লাস্‌টিড কখনো নূতন করিয়া সৃষ্টি হয় না। সকল সময়ে পূর্বতন প্লাস্‌টিড বিভক্ত হইয়া নূতন প্লাস্‌টিড গঠিত হয়।

প্লাস্‌টিডের প্রকার (Types of plastids) প্লাস্‌টিড সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) **অবর্ণ প্লাস্‌টিড** (Leucoplastids) অর্থাৎ যাহাদের কোন বর্ণ থাকে না ; এবং (২) **বর্ণযুক্ত প্লাস্‌টিড** (Chromoplastids) অর্থাৎ যাহাদের বর্ণ থাকে। কখনো কখনো বর্ণযুক্ত প্লাস্‌টিডকে **ক্রোমাটোফোর** (chromatophore) বলে। বর্ণযুক্ত

প্লাস্টিড আবার দুই রকমের ; সবুজ বর্ণের প্লাস্টিডকে ক্লোরোপ্লাস্ট (chloroplast) এবং সবুজবর্ণ ব্যতীত অপর বর্ণযুক্ত প্লাস্টিডকে ক্রোমোপ্লাস্ট (chromoplast) বলে (১৪নং চিত্র) ।

অবর্ণ প্লাস্টিড বা লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplastids or Leucoplasts)—ইহাদের কোন বর্ণ থাকে না। ইহারা গাছের সেইসকল অংশে থাকে, যেখানে কোন আলোক প্রবেশ করে না ; যেমন—মূল; মৃন্গত কাণ্ড প্রভৃতি। ভাজক কলার কোষেও অবর্ণ-প্লাস্টিড থাকে। ইহারা গোলাকার, মূলাকার বা বেলনাকার হইতে পারে। আলোকের সংস্পর্শে আসিলে ইহারা সবুজ বর্ণের হয় অর্থাৎ ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হয়। অবর্ণ-প্লাস্টিড দুই প্রকার—ছোট ও বড়। ছোট প্লাস্টিডগুলি ক্রমশঃ আকারে বড় হয়; অথবা ইহারা ক্লোরোপ্লাস্টে বা ক্রোমোপ্লাস্টে পরিণত হয়। বড় প্লাস্টিডগুলিকে



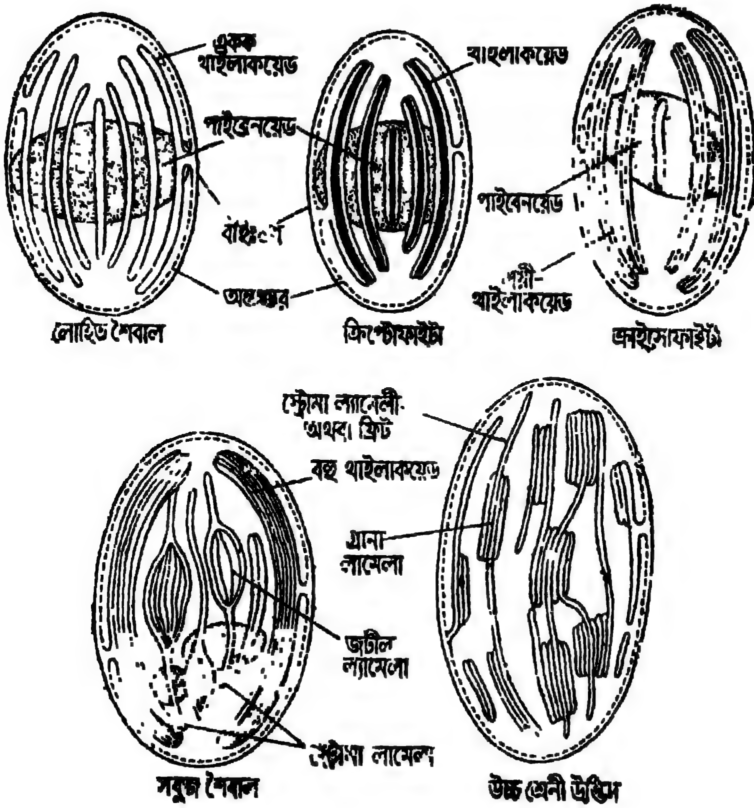
১৪নং চিত্র—বিভিন্ন প্রকারের প্লাসটিড

অ্যামাইলোপ্লাস্ট (amyloplast) বা শ্বেতসার প্রস্তুতকারক বলে, কারণ, ইহারা অন্ধকারে শর্করা হইতে শ্বেতসার প্রস্তুত করে এবং ইহারা রাইজোম (rhizome), কর্‌ম্ (corm) প্রভৃতি মৃন্গত কাণ্ডে সঞ্চিত থাকে।

ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast)—ইহারা সবুজ বর্ণের হয় এবং সাধারণতঃ সকল সবুজ উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত থাকে। ছোট অবর্ণ প্লাস্টিডগুলি আলোক পাইলে সূর্যালোকের প্রভাবে উহাদের দেহে ক্লোরোফিল বা পত্রহরিৎ উৎপন্ন হইয়া ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হয়); সুতরাং গাছের যে সকল অংশ আলো পায় সেই সকল স্থানেই ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণতঃ চ্যাপ্টা চাক্তির মতো, অথবা গোলাকার বা ডিম্বাকার হয়। কিন্তু ইহা সময় সময় অন্য প্রকারেরও হইতে পারে ; যথা; জালিকার মতো, যেমন—ইডোগোনিয়াম (Oedogonium) ; সর্পিল ফিতার মতো, যেমন—স্পাইরোগাইরা (Spirogyra), রশ্মিযুক্ত চাক্তির মতো, যেমন—জিগ্‌নিমা (Zygnema) ; লাটিমের মতো, যেমন—এন্থোসেরস (Anthoceros) ইত্যাদি। কোন কোন নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে ক্রোমাটোফোর (chromatophore) লোহিত বা

পিঙ্গল বর্ণের হয়। ইহাদের ক্লোরোফিল আছে বটে, কিন্তু উহা অন্যান্য বর্ণের দ্বারা আবৃত থাকে।

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে এইরূপ সকল সবুজ উদ্ভিদ মাত্রেই যে ক্লোরোপ্লাস্ট আছে তাহা নহে, নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ, যেমন—নীলাভ-সবুজ শৈবাল (Blue green algae) এবং সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়ার (photosynthetic bacteria) দেহ কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট নাই। এই সকল ক্ষেত্রে ক্লোরোফিল এবং অন্যান্য রঞ্জক বস্তুগুলি (pigments) একধরনের পর্দা বা ল্যামেলীর সহিত অবস্থান করে, উহাদের থাইলাকয়েড (thylakoids) বলে (২নং চিত্র)। সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে অবস্থিত উক্ত প্রক্রিয়ার সহিত যুক্ত বস্তুগুলির আকারে নানা ধরনের হইয়া থাকে। যেমন—রক্তবর্ণ ব্যাকটেরিয়া (purple bacteria), *Rhodomicrobium*-এর মধ্যে ল্যামেলীগুলি, নীলাভ-সবুজ শৈবালের মধ্যে অবস্থিত ল্যামেলীর সমতুল্য। অ-সালফার ব্যাকটেরিয়া



১৫নং চিত্র—বিভিন্ন প্রকারের ক্লোরোপ্লাস্ট

(non-sulphur bacteria) এবং রক্তবর্ণ সালফার ব্যাকটেরিয়ার (purple sulphur bacteria) মধ্যে ক্ষুদ্র বটিকার ন্যায় (vesicular) পর্দা দ্বারা আবদ্ধ বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের ক্রোমাটোফোর বলে। সবুজ সালফার ব্যাকটেরিয়ার (green sulphur bacteria) মধ্যে (*Chlorobium thiosulfatophilum*) রাইবোজোমের ন্যায় একপ্রকার দানাদার বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় যাহার মধ্যে রঞ্জক পদার্থগুলি

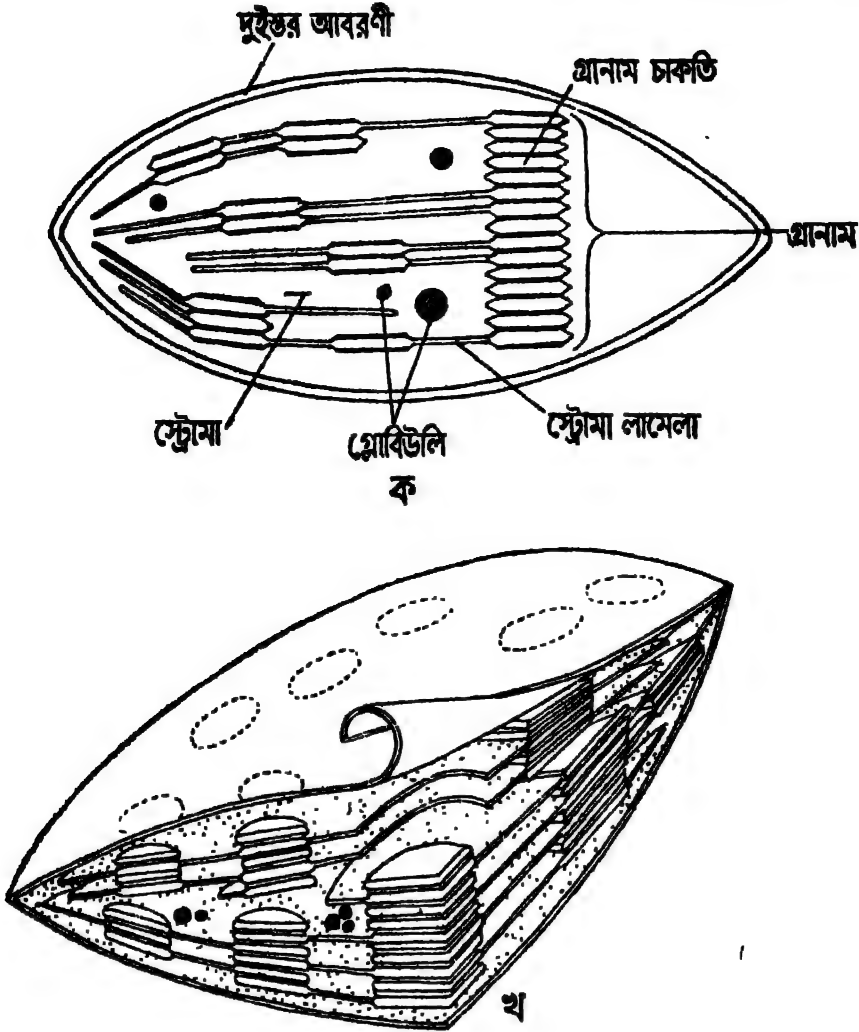
অবস্থান করে। ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে অবস্থিত সবুজ রঞ্জক পদার্থকে ব্যাকটেরিও-ক্লোরোফিল বলে, কারণ, ইহার সহিত উচ্চশ্রেণী উদ্ভিদের কোষে অবস্থিত ক্লোরোফিলের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাকটেরিও-ক্লোরোফিল ছাড়া কিছু ক্যারোটিনয়েড, রঞ্জক পদার্থ ক্রোমোটোফোরের মধ্যে অবস্থান করে।

নীলাভ-সবুজ শৈবাল ছাড়া অন্যান্য শৈবালের ক্ষেত্রে ক্লোরোপ্লাস্টের চারিদিকে একটি দ্বি-স্তর পর্দার আবরণ থাকে এবং উহার অভ্যন্তরে ল্যামেলী বা পর্দা শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সজ্জিত থাকে। লোহিত বর্ণের শৈবালে ল্যামেলীগুলি পরস্পর হইতে পৃথক থাকে ; ক্রিপ্টোফাইটার (Cryptophyta) মধ্যে দুইটি করিয়া হাইলাকয়েড পরস্পর যুক্ত থাকে ; ক্রাইসোফাইটার (Crysophyta) মধ্যে তিনটি বা ততোধিক ল্যামেলা পরস্পর যুক্ত হইয়া অবস্থান করে। সবুজ শৈবাল ও ব্রাওফাইটার মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্টের অভ্যন্তরে ল্যামেলাগুলি পরস্পর গাদা করিয়া রাখার মতো অবস্থায় থাকে (১৫নং চিত্র)।

উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্ট সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে উহাদের গঠন অনেকটা লেন্সের ন্যায় এবং উহারা 1μ হইতে 4μ পর্যন্ত পরিধি বিশিষ্ট হইতে পারে। ক্লোরোপ্লাস্টের দীর্ঘচ্ছেদ (১৬নং চিত্র) পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ইহা সাধারণ সাইটোপ্লাজম হইতে একটি দ্বি-স্তর বিশিষ্ট পর্দা দ্বারা পৃথক অবস্থায় আছে। আবরণটির মধ্যে যে সাধারণ মাধ্যম বা ম্যাট্রিক্স থাকে তাহাকে স্ট্রোমা (stroma) বলে। স্ট্রোমার মধ্যে সমান্তরালভাবে সজ্জিত এবং গাদা করিয়া রাখা অবস্থায় কয়েক জোড়া পর্দা থাকে ; ইহাদিগকে ল্যামেলী (lamellae) বলে। ল্যামেলীর কোন কোন অংশ পরস্পর একের উপর এক, এইভাবে সাজানো থাকে। ল্যামেলীর এই স্তূপাকার অংশটিকে গ্রানাম (granum) বলা হয়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রতিটি গ্রানাম অনেকগুলি গোলাকার স্ফীত চাকতি (disc-like vesicle) লইয়া গঠিত। প্রতিটি চাকতি একজোড়া পর্দা দ্বারা নির্মিত হয়। স্ট্রোমার মধ্যে অবস্থিত গ্রানামগুলি পরস্পরের সহিত পাতলা পর্দা দ্বারা নির্মিত সূক্ষ্ম নলের দ্বারা যুক্ত থাকে। এই নলগুলিকে স্ট্রোমা-ল্যামেলী বা ফ্রেট (stroma lamellae or frets) বলে। স্ট্রোমা-ল্যামেলা ক্লোরোপ্লাস্টের সাধারণ মাধ্যম বা স্ট্রোমার মধ্যে প্রসারিত থাকে। ইহারা প্রোটিন বস্তু দ্বারা গঠিত এবং উহাদের মধ্যে ক্লোরোফিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সহিত জড়িত রঞ্জক পদার্থ যেমন, ক্যারোটিনয়েড এবং ফসফোলিপিড ইত্যাদি থাকে। স্ট্রোমার মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু ইলেকট্রন ঘন (electron dense) বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহাদের গ্লোবিউলি (globuli) বলে। কখন কখন ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে বা উপরে পাইরেনয়েড (pyrenoid) নামক একপ্রকার প্রোটিন জাতীয় পদার্থ সঞ্চিত থাকে ; যথা—সবুজ ও লোহিত বর্ণের শেওলা এবং কোন কোন লিভারওয়ার্ট (Liverwort)।

সম্প্রতিকালে ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে DNA অণু ও রাইবোজোম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে এই দুই বস্তু ও অ্যামিনো-অ্যাসিল ট্রান্সফার RNA (amino-

acyl-t-RNA); অ্যামিনো-অ্যাসিল ট্রান্সফার RNA সিন্থেটেস (amino-acyl-t-RNA synthetase) এবং মেথিওনিল t-RNA (methionyl-t-RNA) ইত্যাদি বস্তু উপস্থিত থাকায় সালোকসংশ্লেষ ব্যতীত, নিজস্ব প্রোটিন, ক্লোরোফিল ,ক্যারোটিন,



১৬নং চিত্র—(ক) উচ্চশ্রেণী উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্টের প্রস্থচ্ছেদ ;
(খ) ক্লোরোপ্লাস্টের একটি ত্রিস্তর চিত্র।

লিপিড এবং শর্করা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় বস্তুগুলি ক্লোরোপ্লাস্টের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়। এই সকল বস্তুগুলির উৎপাদন নিউক্লিয়াসের জিনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ক্লোরোপ্লাস্টের অন্যতম প্রধান কার্য হইল সালোকসংশ্লেষ। এই প্রক্রিয়ায় জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডকে জৈব বস্তুতে পরিণত করিতে আলোর শক্তিকে কাজে লাগানো হয়।

ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast)—ক্রোমোপ্লাস্টের বর্ণ সাধারণতঃ হরিৎ হইতে লাল হয় ; কারণ ইহাতে ক্যারোটিন (কমলা লোহিত) ও জ্যান্থোফিল (হরিৎ) নামক দুই প্রকার ক্যারোটিনয়েড (carotenoid) রং থাকে। ইহারা নানা আকৃতির হয় ; যথা—গোলাকার, লাটিমাকার, কৌণিক, অনিয়তাকার ইত্যাদি। ক্রোমোপ্লাস্ট সাধারণতঃ হরিৎ

ও লাল পুষ্পপত্রের কোষে অথবা হরিৎ, কমলা বা লাল ফলের ত্বকের কোষে থাকে। কখন কখন ইহাকে মূলেও থাকিতে দেখা যায় ; যেমন—গাজর। ক্লোরোপ্লাস্ট হইতে ক্রোমোপ্লাস্ট গঠিত হয়। ক্রোমোপ্লাস্টের কার্য সম্বন্ধে সঠিক জানা নাই। তবে ইহা ফুলের বা ফলের উজ্জ্বল বর্ণের সাহায্যে কীটপতঙ্গ অথবা পশুপক্ষীকে আকৃষ্ট করিয়া যথাক্রমে পরাগযোগ অথবা ফল ও বীজের বিস্তারে সাহায্য করে।

মাইটোকনড্রিয়া (Mitochondria)—সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থিত একপ্রকার দানাদার বস্তু। **মাইটস** কথার অর্থ সূত্র ; এবং **কনড্রিয়ন** কথার অর্থ দানাদার বস্তু। সুতরাং মাইটোকনড্রিয়া বলিতে এইরূপ দানাদার বস্তুসমূহকে বুঝায় যাহারা সূত্রবৎ অথবা দণ্ডাকার। ইহারা ছোট বড় নানা আকারের হইয়া থাকে। কোষের মধ্যে ইহাদের সংখ্যার কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। কোষের আকৃতি ও কার্যের উপর মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা নির্ভর করে। সাধারণভাবে একটি উদ্ভিদ কোষে 50 হইতে 5,000টি মাইটোকনড্রিয়া থাকিতে পারে। তবে প্রাণিকোষের মধ্যে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা সাধারণভাবে উদ্ভিদ কোষ অপেক্ষা অধিক থাকে ; যেমন—অ্যামিবার দেহে 50.000 এবং সী-আর্চিন ডিমের মধ্যে 1,40,000 হইতে 1,50,000 পর্যন্ত মাইটোকনড্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন প্রোটোজোয়ার ক্ষেত্রে এই সংখ্যা 5,00.000 পর্যন্ত হইয়া থাকে। কিছু কিছু শৈবালের দেহকোষে একটিমাত্র মাইটোকনড্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। আকারের দিক হইতে মাইটোকনড্রিয়াগুলি অতি ক্ষুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বেশ বড় আকারের হইয়া থাকে। ইহাদের পরিধি 0 2μ হইতে 2μ পর্যন্ত এবং লম্বায় ·3μ হইতে 40μ পর্যন্ত হইতে পারে।

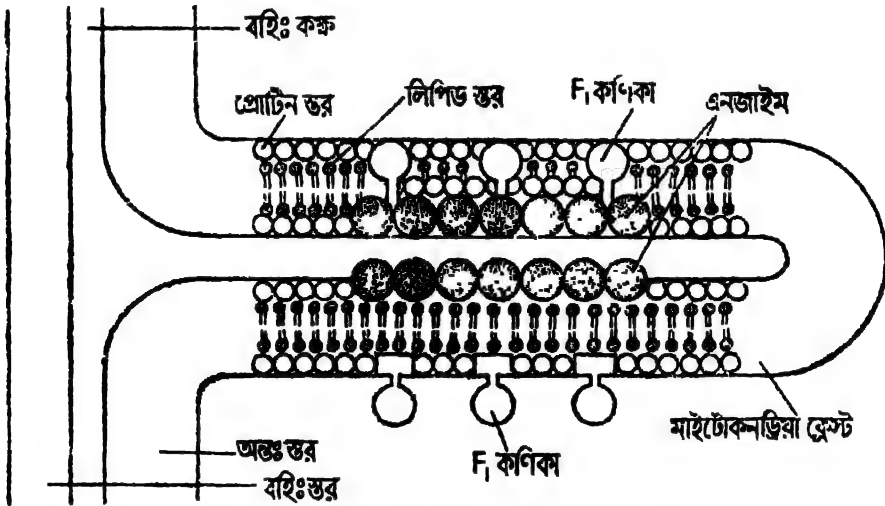
মাইটোকনড্রিয়ার আকার ও ব্যাহ্যিক গঠন যাহাই হউক না কেন, যখন ইহাদের লম্বচ্ছেদ লইয়া ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা হয় তখন সকল ক্ষেত্রেই একই প্রকার অভ্যন্তরীণ গঠন বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় (১৭নং চিত্র)। এবং



১৭নং চিত্র—একটি মাইটোকনড্রিয়ার (মাইটোকনড্রিয়ন) ত্রিস্তর চিত্র

অপরটি ভিতরের। এই দুইটি আবরণীর মধ্যবর্তী স্থানকে **পেরিমাইটোকনড্রিয়াল স্পেস**
সাধারণভাবে, একটি মাইটোকনড্রিয়ার দুইটি আবরণী বা পর্দা থাকে—একটি বাহিরের

বা স্থান (perimitochondrial space) বলা হয়। ইহা 60 হইতে 80 Å চওড়া। ভিতরের পর্দা বা আবরণীটি নিজের কার্যকরী স্থানের বৃদ্ধির জন্য মাইটোকনড্রিয়ার ভিতরের অংশে বারংবার ভাঁজ খাইয়া ছোট ছোট খোপের সৃষ্টি করে। এই ভাঁজগুলি পাতের আকারে দেখিতে। ইহাদের **ক্রিস্টি মাইটোকনড্রিয়েলিস** (cristae mitochondriales) বলে। ক্রিস্টিগুলি মাইটোকনড্রিয়ার ভিতরের অংশে অর্থাৎ ম্যাট্রিক্সের বা মাধ্যমের মধ্যে প্রসারিত থাকে। সুতরাং, ভিতরের পর্দার দুইটি দিক সুস্পষ্ট—একটি দিক, যাহা পেরিমাইটোকনড্রিয়ার দিকে থাকে, তাহাকে সিটোসল (Cytosol) বা সি-ফেস (C-face) বলে; এবং আর একটি দিক, যাহা ম্যাট্রিক্সের দিকে থাকে, তাহাকে ভিতরের ম্যাট্রিক্স দিক (inner matrix) বা এম্-ফেস (M-face) বলে। ক্রিস্টিগুলি সরল অথবা শাখা বিশিষ্ট হইতে পারে। ক্রিস্টির যে পাশ ম্যাট্রিক্সের দিকে থাকে (এম্-ফেস), সেইদিক মসৃণ নয়। উহার গাত্রে বৃন্তযুক্ত ছোট ছোট গোলাকার অংশ যুক্ত থাকে। বৃন্তগুলি 30 A হইতে 35 Å চওড়া এবং 45 Å হইতে 50 Å লম্বা। উহাদের শেষে গোলাকার মস্তকটি 75 Å হইতে 80 Å ব্যাস বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই



১৮নং চিত্র—মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্রিষ্টির আলট্রা চিত্র

ক্ষুদ্র বস্তুগুলিকে (sub-units) এলিমেণ্টারী পার্টিক্লস্ (elementary particles) বা ভিতরের পর্দার ক্ষুদ্র অংশ (inner membrane sub-units) বা অক্সিজোম (Oxysomes) বা এফ১-কণিকা (F_1-particles) বলে। অক্সিজোমগুলি পরস্পর হইতে সমদূরত্বে অবস্থিত (100 Å) থাকে (১৮নং চিত্র)। কিছুকাল পূর্বে জানিতে পারা গিয়াছে যে, এই অক্সিজোমগুলি প্রকৃতপক্ষে বিশেষ ধরনের ATP সিন্থেটেজ এনজাইমের অণু যাহা ATP উৎপন্ন করিতে প্রয়োজন হয়

মাইটোকনড্রিয়ার অভ্যন্তরে অবস্থিত ম্যাট্রিক্স (মাধ্যম) সমপ্রকৃতি সম্পন্ন আনিয়তাকার (amorphous) বস্তু। ইহার মধ্যে লিপিড (25—30%) প্রোটিন (65—70%) DNA অণু (মাইটোকনড্রিয়ার DNA অণুগুলি নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত DNA

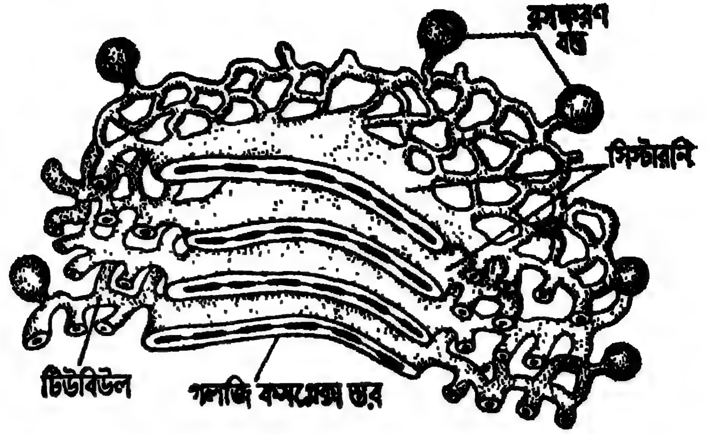
অণু হইতে ভিন্ন ধরনের হয়), t-RNA, রাইবোজোম এবং কিছু দানাদার বস্তু (mitochondrial granules) ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রকার এনজাইম ম্যাট্রিক্সের মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে মাইটোকনড্রিয়ার মধ্যে তাহার নিজস্ব প্রোটিন উৎপাদন কারিগরী বর্তমান আছে। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, মাইটোকনড্রিয়ার নিজস্ব প্রোটিন উৎপাদন, সাইটোপ্লাজমের মধ্যে নিউক্লিয়াসের নির্দেশনায় প্রোটিন উৎপাদন সংগঠন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই কারণেই মাইটোকনড্রিয়াকে প্রায় স্বয়ংশাসিত একটি সংস্থা (semi-autonomous) বলা হয়।

মাইটোকনড্রিয়াকে 'জৈবিক শক্তির উৎস' রূপে গণ্য করা হয়। ইহার মধ্যে ক্রেবের চক্র (ট্রাই-কার্বক্সিলিক অ্যাসিড্ সাইক্ল) সংঘটিত হয় এবং অক্সিডেশান, ডিহাইড্রোজিনেশান; অক্সিডেটিভ্ ফস্ফোরাইলেশান ইত্যাদি বিক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি উৎপন্ন হয়। কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট (চর্বি) ও প্রোটিনের মধ্যস্থিত শক্তি জারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুক্ত হয়। ফসফোরাইলেশান প্রক্রিয়ায় ADP হইতে ATP উৎপন্ন হয়।

মাইটোকনড্রিয়া উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে, যথা—(ক) সাধারণ দেহ গঠন বস্তু অ্যামিনো অ্যাসিড এবং লিপিডস হইতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সৃষ্টি হয় ("de novo" origin) ; (খ) প্লাজমা মেমব্রেন বা এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা হইতে উৎপন্ন হয় ; (গ) একটি মাইটোকনড্রিয়া হইতে বিভাজনের সাহায্যে আর একটি মাইটোকনড্রিয়া উৎপন্ন হয় ; এবং (ঘ) প্রোক্যারিওটিক কোষ (ব্যাকটেরিয়া) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উপরিউক্ত মতবাদগুলির মধ্যে প্রথম দুইটি, অর্থাৎ de novo সৃষ্টি ও প্লাজমামেমব্রেন হইতে সৃষ্টির সপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ না থাকায় বর্তমানে উহাদের বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও অটোরেডিওগ্রাফ পরীক্ষা দ্বারা তৃতীয় মতবাদের সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা দেখা গিয়াছে যে, সাধারণ কোষ বিভাজনের সময় মাইটোকনড্রিয়া বিভক্ত হইয়া দুইটি অপত্য মাইটোকনড্রিয়ায় পরিণত হয়। অপত্য মাইটোকনড্রিয়া পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

গলগি বডি (Golgi body)—গলগি বডি প্রোক্যারিওটিক কোষ ও কিছু ইউক্যারিওটিক কোষ, যেমন—কয়েকশ্রেণীর ছত্রাক, ব্রাওফাইট ও টেরিডোফাইটের শুক্রাণু, পরিণত সিভকোষ ইত্যাদি ব্যতীত সকল কোষে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পিঁয়াজ (onion), লিলি (lily) প্রভৃতি কয়েকটি উদ্ভিদের মূলের অগ্রভাগের কোষে দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ কোষে ইহাদের সংখ্যা কয়েকশো হইতে 25,000 হাজার পর্যন্ত হইতে পারে। সকল প্রাণিকোষে ইহাদের দেখা যায়। প্রাণিকোষে ইহা একাধিক অংশ লইয়া গঠিত হইয়া একটি যৌগিক বা জটিল আকার গঠন করে (১৯নং চিত্র)। ইহাকে গলগি কমপ্লেক্স বলে। ইহাদের সাইটোপ্লাজমে জালিকার ন্যায় দেখায় এবং নিঃসরণে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বা অংগ সংস্থানের দিক হইতে গলগি বডি ও গলগি কমপ্লেক্সের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নাই। ইহা অনেকটা চাকতির আকারের হয়। মাঝামাঝি স্থানে প্লেটের ন্যায় চ্যাপ্টা ছোট ছোট ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

উহাদের সিস্‌টারনি (cisternae) বলে। ইহাদের চারিদিকে সূক্ষ্ম নল (tubules) জালিকাকারে বিস্তৃত থাকে। নলগুলির গাত্রে একধরনের স্ফীতি বা গোলাকার বস্তু (vesicles) আটকানো থাকে।



১৭নং চিত্র—গলগি কমপ্লেক্স

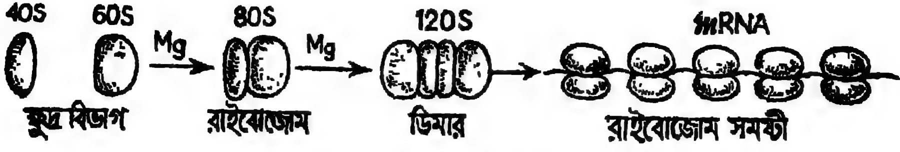
গলগি বডির কার্য (Function of Golgi bodies) :—গলগি বডি প্রধানতঃ উদ্ভিদ কোষে কোষ-প্রাচীর গঠনে সাহায্য করে। কোষ-প্রাচীর প্রস্তুতকারক বস্তু-সমূহ প্লাজমামেমব্রেন (plasma membrane) বরাবর জমা পড়িয়া নির্দিষ্ট কোষপ্রাচীর গঠিত হয়। পেক্‌টিন, হেমিসেলুলোজ ইত্যাদি বস্তুসমূহ গলগি বডির মধ্যে প্রস্তুত হয়। প্রাণিকোষে নানাপ্রকার জারক এন্‌জাইম ও অন্যান্য বস্তু গলগি কমপ্লেক্স হইতে নিঃসরণ হয়। গলগি বডির নিঃসরণকারী গোলাকার স্ফীতি (vesicles) হইতে নিঃসরিত বস্তু প্লাজমামেমব্রেন গঠন করে ও তাহার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

সেণ্ট্রোসোম (Centrosome) :—নিউক্লিয়াস সংলগ্ন ক্ষুদ্র ও গোলাকার পদার্থ যাহা প্রধানতঃ প্রাণিকোষে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে সেণ্ট্রোসোম বলে। প্রতি সেণ্ট্রোসোমে সেণ্ট্রিওল (centriole) নামক একটি বা দুইটি দানাদার অংশ থাকে যাহা সেণ্ট্রোস্‌ফিয়ার (centrosphere) নামক একটি স্বচ্ছ মাধ্যমে অবস্থান করে। প্রতি সেণ্ট্রোসোমের চারিদিকে বিচ্ছুরিত রশ্মির ন্যায় পদার্থ দেখা যায় যাহাদিগকে অ্যাসট্রাল রশ্মি (astral rays) বলে। প্রাণিকোষ ছাড়া কোন কোন উদ্ভিদ কোষে সেণ্ট্রোসোম দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণীর ছত্রাক (Ascomycetes); ফিউকাস (*Fucus*), ডিকটিওটা (*Dictyota*) প্রভৃতি।

নিউক্লিয়াস বিভাজনের সময় সেণ্ট্রোসোম বিভক্ত হইয়া কোষের দুইপ্রান্তে গমন করিয়া দুইটি মেরু গঠন করে এবং মাকু (spindle) গঠনে অংশগ্রহণ করে।

রাইবোজোম (Ribosome) :—সাইটোপ্লাজমে একপ্রকার ক্ষুদ্র অর্ধবৃত্তাকার ঘন পদার্থ দেখা যায়। ইহাদের রাইবোজোম বলে। সাইটোপ্লাজমে এণ্ডোপ্লাসমিক রেটিকুলামের বাহিরেই ইহাদের প্রধানতঃ দেখা যায়। ইহাদের নিজস্ব প্রোটিন ও রাইবো-নিউক্লিক অ্যাসিড (RNA) থাকে এবং প্রোটিন সংশ্লেষে ইহারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। প্রোটিন গঠনের প্রকার অনুযায়ী রাইবোজোমেরও শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। রাইবোজোমের সাধারণতঃ দুইটি অংশ থাকে (Sub-unit)—একটি ছোট ও অন্যটি

অপেক্ষাকৃত বড় ; যেমন 80s রাইবোজোমের দুইটি অংশে একটি 60s ও অন্যটি 40s (২০নং চিত্র)। দুইটি রাইবোজোম একত্রে মিলিয়া ডিমার (Dimer) গঠন করিতে



২০নং চিত্র—রাইবোজোম

পারে, আবার প্রোটিন সংশ্লেষের সময় অনেকগুলি রাইবোজোম একত্র হইয়া **পলিরাইবোজোম** বা **পলিজোম** গঠন করে।

লাইসোজোম (Lysosomes) ঃ—মাইটোকন্ড্রিয়ার ন্যায় সাইটোপ্লাজমে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র গোলাকার পদার্থ দেখা যায় যাহাদের লাইসোজোম বলে। ইহাদের মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়া হইতে ভিন্ন কয়েক প্রকার এন্‌জাইম থাকে। ইহাদের প্রাচীর এক-স্তরযুক্ত ও কোন ক্রিষ্টি থাকে না। এই সকল চরিত্র মাইটোকন্ড্রিয়া হইতে ভিন্ন। উদ্ভিদ কোষে লাইসোজোমকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয় নাই।



কোষ উৎপাদন
(Cell Formation)

নূতন কোষ উৎপাদন জীব জগতের একটি আদর্শগত বৈচিত্র্য। ইহা দ্বারা জীবিত কোষগুলি বিভক্ত হইয়া দুইটি বা ততোধিক নূতন কোষে পরিণত হয়। কোষ উৎপাদনই জীবের বৃদ্ধি এবং গঠনের মূল উৎস।

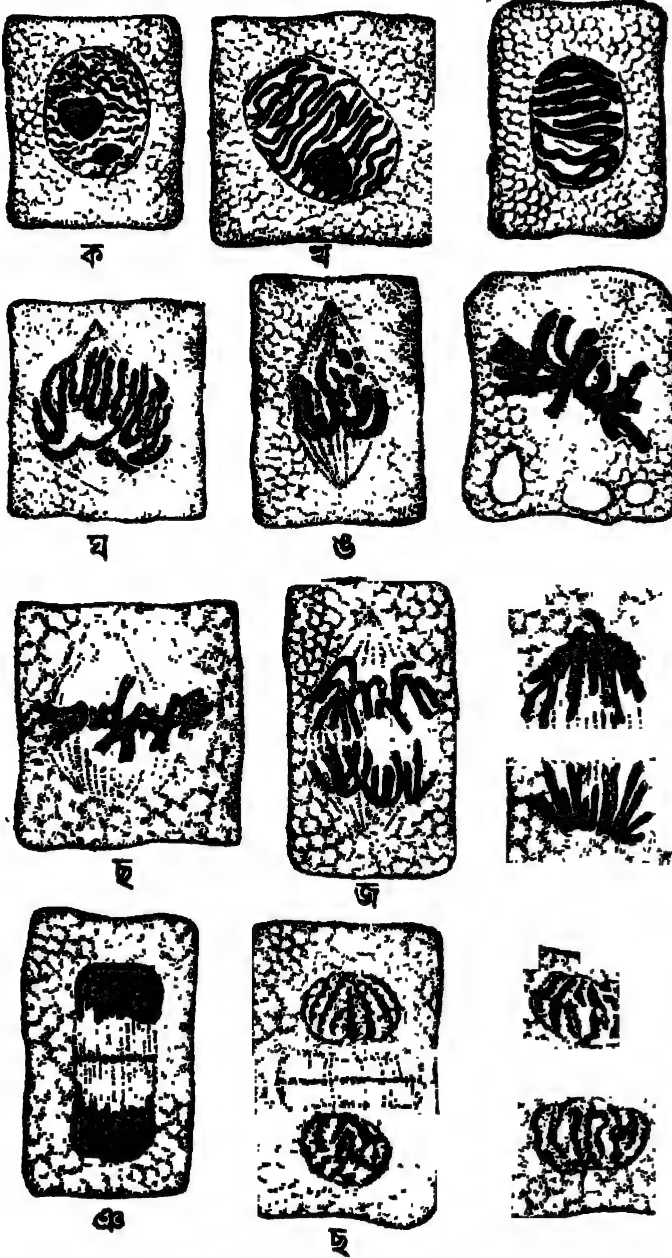
এককোষী জীবের ক্ষেত্রে একটিমাত্র কোষই পুনঃ পুনঃ বিভক্ত হইয়া বহু সংখ্যক এককোষী জীবের সৃষ্টি করে। বহুকোষী জীবের ক্ষেত্রে একটিমাত্র কোষ হইতেই ইহার জীবন চক্রের সূচনা হয় এবং উহা পুনঃ পুনঃ বিভক্ত হইয়া বহু সংখ্যক কোষের সৃষ্টি করে, যেগুলি একত্রিত এবং বিন্যাসিত হইয়া বহুকোষী জীব গঠন করে। দেখা গিয়াছে যে, একটি পরিণত মনুষ্যদেহ প্রায় 10^{14} কোষ দ্বারা গঠিত। কোষ বিভাজন পদ্ধতি প্রধানতঃ দুই প্রকার: যথা মাইটোসিস (mitosis) ও মায়োসিস (meiosis)। মাইটোসিস কোষ বিভাজন উদ্ভিদ দেহের যে সকল কোষে সংঘটিত হয় তাহাদের ভাজক কলা (meristematic tissue) বলা হয়। ইহারা সাধারণ দেহ কোষ। ইহাতে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম উভয়ই অংশ গ্রহণ করে। প্রতি মাইটোসিস বিভাজনে নিউক্লিয়াসের প্রতিটি ক্রোমোজোম দৈর্ঘ্যে দুইটি অংশে বিভক্ত হয় এবং প্রতিটি অপত্য কোষে মাতৃ নিউক্লিয়াসের সমসংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। উৎপন্ন কোষগুলির কতকগুলি ভাজক কলা হিসাবে কার্য করিয়া পুনঃ পুনঃ বিভাজিত হইতে থাকে এবং অবশিষ্ট অপত্য কোষগুলি পৃথকীভূত (differentiation) হইয়া বিভিন্ন প্রকার সমআকৃতিবিশিষ্ট কোষে বিভক্ত ও বিন্যাসিত হইয়া পরিণত উদ্ভিদ দেহ গঠন করে।

অপরদিকে মায়োসিস একটি বিশিষ্ট কোষ বিভাজন পদ্ধতি এবং ইহা দ্বারা যৌন কোষ (germ cells) উৎপন্ন হয়, যাহা যৌন জননে অংশ গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ায় অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেকে পরিণত হয়। সেইজন্য দেহকোষকে বলা হয় ডিপ্লয়েড (diploid) অথবা ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যাবিশিষ্ট কোষ এবং হ্রাসপ্রাপ্ত কোমোজোম সংখ্যাবিশিষ্ট যৌন কোষকে বলা হয় হ্যাপ্লয়েড (haploid)। দুইটি হ্যাপ্লয়েড যৌন কোষের মিলনের ফলে পুনরায় ডিপ্লয়েড কোষের আবির্ভাব ঘটে।

তৃতীয় প্রকার কোষ বিভাজন পদ্ধতিও কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে অ্যামাইটোসিস (amitosis) বলে। Myxophyceae বা একপ্রকার নীলাভ সবুজ-বর্ণের শৈবালের ক্ষেত্রে প্রকৃত নিউক্লিয়াস বা ক্রোমোজোম দেখা যায় না, এবং ইহাদের কোষগুলি সংকোচন (constrication) বা বিভাজনের (fission) দ্বারা বিভক্ত হয়। কোষের নিউক্লিয়াস দুইটি অংশে খণ্ডিত হওয়াকে অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়া বলে।

মাইটোসিস (Mitosis):—মাইটোসিস কোষ বিভাজন (২১নং চিত্র) পদ্ধতি ক্রোমোজোমের লম্বচ্ছেদের ফলে সংঘটিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম

উভয়েই বিভক্ত হয়। নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে কেরিওকাইনেসিস (karyokinesis) এবং সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিন (cytokinesis) বলে। কেরিও-কাইনেসিস প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোমের আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে। এই ক্রোমোজোমগুলি 'জিন' (genes) বা বংশানুগতিক চরিত্র বহন করে। এই সময় প্রতি ক্রোমোজোম দৈর্ঘ্যে দুইটি সমান অংশে খণ্ডিত হইয়া পৃথক হয় এবং কোষের দুই প্রান্তে সরিয়া যায়। ক্রমে সাইটো-প্লাজম বিভক্ত হয় এবং মধ্য প্রাচীর গঠিত হইয়া দুইটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রতি অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার সমান হয়।

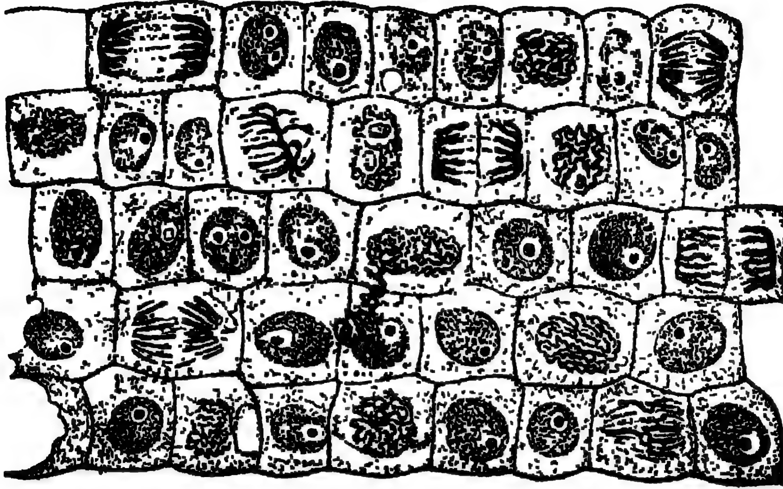


২১নং চিত্র—ক হইতে ঠ পর্যন্ত বিভিন্ন চিত্রে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের বিভিন্ন দশা দেখানো হইয়াছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয় না এবং নিউক্লিয়াস পুনঃ পুনঃ বিভক্ত হইয়া একটি বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষ গঠন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার, অপত্য নিউক্লিয়াসগুলির চতুর্দিকে সাইটোপ্লাজম সঞ্চিত হইয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপত্য কোষ একটি সাধারণ মাতৃকোষের মধ্যে উৎপন্ন হয়।

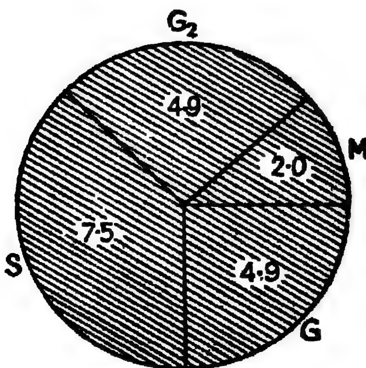
সামগ্রিকভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, যে সকল কোষ পুনঃ পুনঃ বিভাজিত হয় তাহারা মাতৃকোষ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া পুনরায় বিভাজিত হয়। সুতরাং, সমগ্র কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটি একটি চক্রাকারে

আবর্তিত হইতেছে। এই চক্রকে মাইটোটিক চক্র (mitotic cycle) বলে। মাইটোসিস পদ্ধতিকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—ইন্টারফেজ বা অন্তর্বর্তী দশা (interphase) এবং সক্রিয় বিভাজন দশা (active mitosis)। এই দুইটি দশা লইয়া সম্পূর্ণ মাইটোটিক চক্রটি গঠিত। সক্রিয় মাইটোসিস দশায় মাতৃকোষটি দুইটি

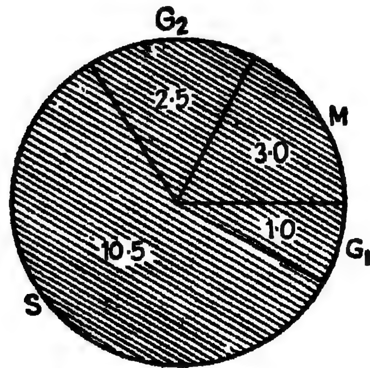


২২নং চিত্র—পিঁয়াজের মূলের ভাজক কলায় মাইটোসিস কোষ বিভাজন

অপত্য কোষে বিভাজিত হয়। এই পদ্ধতির বিভিন্ন বিভাগগুলি পরে বর্ণিত হইয়াছে। ইন্টারফেজ অর্থাৎ অন্তর্বর্তী দশা প্রকৃতপক্ষে দুইটি সক্রিয় বিভাজন দশার মধ্যবর্তী অবস্থা। ইহাকে নিউক্লিয়াসের বিশ্রাম অবস্থাও বলা হয়। কিন্তু বিশ্রাম বলিতে যাহা বোঝায় এই ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য নয় কারণ, এই অবস্থায় নিউক্লিয়াসকে সব থেকে বেশী



ভিসিয়া ফাবা



ট্রাডেসক্যানসিয়া পেলুডোসা

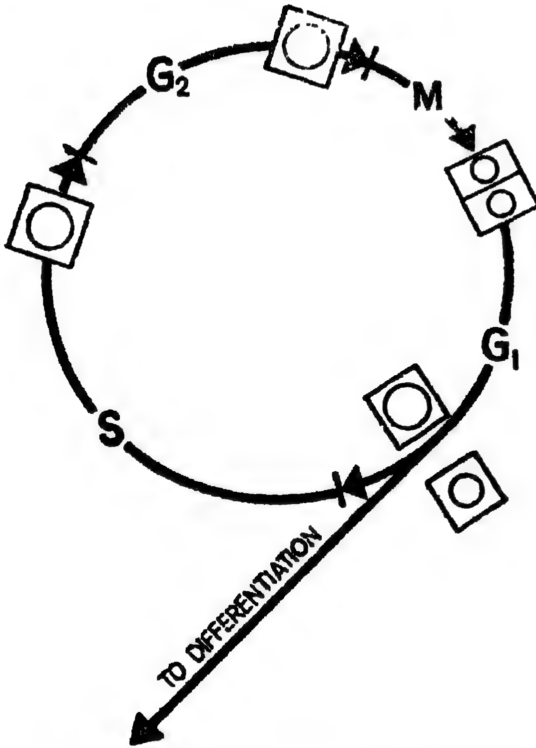
২৩নং চিত্র—বিভিন্ন প্রজাতির মাইটোটিক চক্র

সক্রিয় থাকে, সুতরাং ইহাকে অনুশীলন অর্থাৎ পরবর্তী বিভাজনের প্রস্তুতি অবস্থাও বলা যাইতে পারে। এই প্রস্তুতি পর্ব বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন সময় ধরিয়া চলে। মাইটোটিক চক্রটি সম্পূর্ণ হইতে যত সময় লাগে তার অধিকাংশই এই ইন্টারফেজ দশা।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, *Tradescantia peludosa* (ট্রাডেস্-ক্যানসিয়া পেলুডোসা)-এর মূলে মাইটোটিক চক্রটি সম্পূর্ণ হইতে গড় সময় ১৭ ঘণ্টা; *Vicia faba* (ভিসিয়া ফাবা)-এর গড় সময় ১৯ ঘণ্টা ১৫ মিনিট এবং *Pisum sativum* (পাইসাম স্যাটিভাম) এর গড় সময় ১২ ঘণ্টা লাগে এবং এই সকল ক্ষেত্রে ইণ্টারফেজ দশা যথাক্রমে—১৪ ঘণ্টা, ১৭ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ও ৯ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, ভাজক কলায় অবস্থিত সকল কোষেই একই সময় মাইটোটিক্ চক্র সম্পন্ন হয় না, কোন কোন কোষে অপেক্ষাকৃত কম সময়, আবার কোন কোন কোষে কিছু বেশী সময় ধরিয়া চলে। নিম্নে মাইটোটিক চক্রের দুইটি প্রধান দশার বর্ণনা দেওয়া হইল।

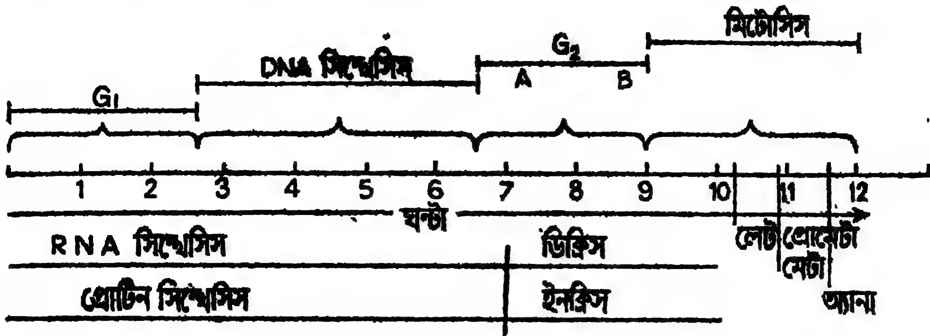
ইণ্টারফেজ দশা (Interphase)

ইণ্টারফেজ দশায় সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস বিপাকীয় কার্যে অত্যন্ত সক্রিয় থাকে। এই সময় উহাদের আকার বৃদ্ধি পায়। ইণ্টারফেজ মাইটোটিক চক্রের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী দশা। ইহাকে তিনটি উপদশায় ভাগ করা হয়, যেমন—G_1-দশা ; S-দশা এবং G_2-দশা। G_1, অর্থাৎ প্রথম বিরাম দশায় (G for gap) DNA ও প্রোটিন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় এন্‌জাইম ও অন্যান্য উপাদান, যেমন—mRNA; tRNA ও rRNA এবং কিছু প্রোটিন উৎপাদন সুরু হয়। S, অর্থাৎ উৎপাদন দশায় (S for synthesis) DNA অণুর নূতন প্রতিলিপি গঠিত হয়, ক্রোমোজোম প্রোটিন, RNA অণু ইত্যাদি উৎপন্ন হইতে থাকে। এই সময় হিস্টোন প্রোটিনও উৎপন্ন হয়। G_2, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিরাম দশায় সাইটোপ্লাজম ও অন্যান্য দানাদার বস্তু সমূহের উৎপত্তি সংক্রান্ত সকল প্রকার বিপাকীয় কার্য চলিতে থাকে। এই তিনটি দশার স্থায়িত্ব কাল উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে, তবে ইহাদের মধ্যে, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই, S-দশার স্থায়িত্বকাল অপেক্ষাকৃত বেশী। ২৪নং চিত্রে একটি মাইটোটিক চক্র দেখানো হইল এবং উহাতে বিভিন্ন দশা ও উপদশা চিহ্নিত হইল। ২৫নং চিত্রে মটর গাছের



২৪নং চিত্র—মাইটোটিক চক্র : M, মাইটোসিস G_1, প্রথম বিরাম দশা ; G_2, দ্বিতীয় বিরাম দশা এবং S, উৎপাদন দশা ; এই দশায় DNA, RNA ইত্যাদি উৎপন্ন হয়

মূলের ভাজক কলায় মাইটোটিক চক্রের একটি রেখাচিত্র অঙ্কিত হইল এবং উহাতে বিভিন্ন উপদশায় ঘটনাবলী দেখান হইল। দ্বিতীয় বিরাম দশা (G_2) সম্পূর্ণ হইবার পরই সক্রিয় মাইটোসিস্ শুরু হইয়া যায়।



২৫নং চিত্র—মটর গাছের মূলের ভাজক কোষে মায়োটিক চক্রের রেখাচিত্র।
চক্রটি সম্পূর্ণ হইতে মোটামুটি ১২ ঘণ্টা সময় লাগে।

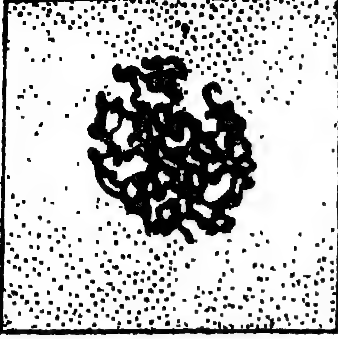
সক্রিয় মাইটোসিস্ প্রক্রিয়া (Active mitosis)—সক্রিয় মাইটোসিস্ প্রক্রিয়ায় পর-পর কতকগুলি ঘটনাস্রোত বহিয়া যায় যাহার ফলে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম উভয়েই বিভক্ত হয়। এই ঘটনাস্রোতগুলিকে যদিও আপাত দৃষ্টিতে পরস্পরের সহিত যুক্ত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি ঘটনাই স্বাধীনভাবে সংঘটিত হয়। এই ঘটনা গুলি হইল নিউক্লিও মেমব্রেন বা নিউক্লিয়াসের আবরণী ও ক্রোমোজোমের গঠন-প্রকৃতির পরিবর্তন, মাকুতন্তু (spindle fibre) গঠন, সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজন, মাকুতন্তুর উপর ক্রোমাটিডের চলন এবং পরিশেষে নূতন অপত্য নিউক্লিয়াস গঠন। ইহার পর সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয় এবং একটি মধ্য প্রাচীর গঠিত হইয়া দুইটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়।

এই সকল ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সক্রিয় কোষ বিভাজন (মাইটোসিস্)-কে চারিটি দশায় ভাগ করা হইয়াছে ; যথা—(ক) প্রোফেজ (prophase), (খ) মেটাফেজ (metaphase), (গ) অ্যানাফেজ (anaphase) এবং (ঘ) টেলোফেজ (telophase)।

(ক) প্রোফেজ (Prophase)

প্রোফেজ দশা আরম্ভের সাথেই মাইটোসিস্ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত (২৬নং চিত্র)। প্রথম দর্শনীয় পরিবর্তন হইল যখন নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার এবং স্থূল ক্রোমোজোমগুলি দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতি ক্রোমোজোম দুইটি সূত্রের ন্যায় অংশ দ্বারা গঠিত যাহাদের ক্রোমাটিড (chromatids) বলে। ক্রোমাটিডগুলি পরস্পর পাশাপাশি অবস্থান করে। ক্রমাগত জল বিয়োজনের ফলে ক্রোমাটিডগুলি ক্রমশঃ কুণ্ডলিত হইতে থাকে, যাহার ফলে ক্রোমোজোমগুলিকে ক্ষুদ্রাকার এবং স্থূল দেখায়। ক্রোমোজোমের secondary constriction বা গৌণ সংকোচ স্থানে যে নিউক্লিওলাস্ অবস্থান করে তাহা প্রফেজের শেষভাগে বিলুপ্ত হয়। নিউক্লিওমেমব্রেনও ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়। Late prophase বা প্রোফেজের সমাপ্তিপথে আরও কতকগুলি দর্শনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময় প্রাণিকোষে সেন্ট্রিওল (centrioles), সেন্ট্রো-

সোম (centrosome), অ্যাস্‌টার (aster) এবং spindle বা মাকুর ন্যায় অংশের আবির্ভাব ঘটে, কিন্তু উচ্চ শ্রেণী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র bipolar spindle বা দুই মেরুযুক্ত মাকুর ন্যায় একটি অংশ গঠিত হইতে দেখা যায়। সাইটোপ্লাজমের পদার্থের কতকগুলি অণু পুনর্বিন্যস্ত হইয়া মাকুর আকার ধারণ করে। ইহা কতকগুলি সূত্রের ন্যায় fibres বা তন্তুর সমষ্টি। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ইহার দুই প্রান্তের তন্তুগুলি অভিসারী হইয়া দুইটি poles বা মেরু সৃষ্টি করে এবং মধ্যের প্রশান্ত অঞ্চলটিকে বলা হয় equator বা বিষুব-অঞ্চল। ক্ষুদ্রাকৃতি ও স্থূল ক্রোমোজোমগুলি তন্তুগুলির প্রভাবে মাকুর ন্যায় অংশের বিষুব-অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমের মাকুর



২৬নং চিত্র—প্রোফেজ

তন্তুর সহিত যুক্ত সেন্ট্রোমিয়ার (centromere) অথবা কাইনেটোকোর (kinetochore) নামক একটি বিশিষ্ট সংযোজক স্থান আছে। ইহাকে প্রাথমিক সংযোজক স্থল নামেও অভিহিত করা হয়। যে তন্তুগুলি ক্রোমাটিডগুলির সহিত যুক্ত তাহাদিগকে tractile fibres বা আকর্ষণ-তন্তু বলে।

(খ) মেটাফেজ (Metaphase)

ক্রোমোজোমগুলি বিষুব-অঞ্চলে স্থানান্তরিত হইলে প্রতি ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড-দ্বয়ের সেন্ট্রোমিয়ারগুলি ঐ অঞ্চলে মেরু-অভিমুখী হইয়া অবস্থান করে। এই দশায়





২৭নং চিত্র—(ক) মেটাফেজ পার্শ্বদৃশ্য ; (খ) মেটাফেজ ক্রোমোজোম ; বৃহৎ দুইটি ক্রোমোজোমের একদিকে গৌণ সংকোচ দেখা যাইতেছে।

(২৭নং চিত্র) ক্রোমাটিডগুলি কুণ্ডলিত না হইয়া মুক্ত অবস্থায় দেখা যায়। মেটাফেজ দশাতেই ক্রোমোজোমগুলির সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টিগোচর হয়। ক্রোমোজোমের আকৃতি,

সংখ্যা ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য ইহাই সর্বোত্তম দশা। সেণ্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোম ইংরাজিতে V, L, J প্রভৃতির ন্যায় অথবা দণ্ডের ন্যায় আকৃতি ধারণ করে।

(গ) অ্যানাফেজ (Anaphase)

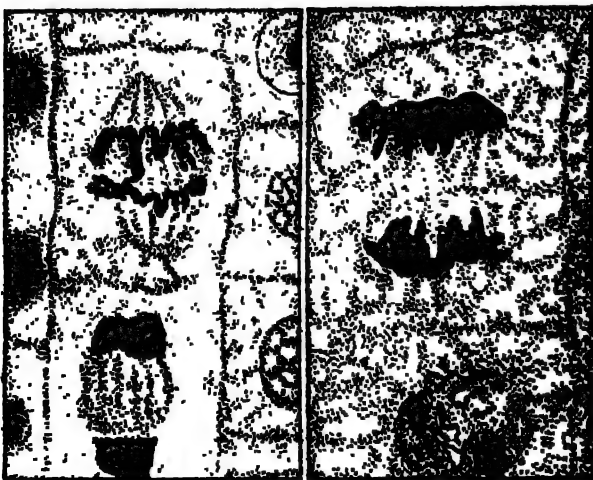
অ্যানাফেজ দশায় (২৮ ও ২৯নং চিত্র) প্রতি ক্রোমাজোমের ক্রোমাটিডদ্বয় পরস্পর পৃথক হইয়া দুইটি মেরুর দিকে অগ্রসর হয় এবং সেণ্ট্রোমিয়ারগুলি সর্বদাই মেরু-অভিমুখী থাকে। এই সময় প্রতি ক্রোমাটিড একটি স্বতন্ত্র ক্রোমোজোমে পরিণত হয়।


২৮নং চিত্র—অ্যানাফেজ দশা

ক্রোমোজোমের এই মেরু-অভিমুখী চলনে দুই প্রকার শক্তি ক্রিয়া করে। তন্তুগুলি প্রোটিনঘটিত পদার্থের দ্বারা গঠিত ও সংকোচনকারী বলিয়া ইহাদের সংকোচনের ফলে ক্রোমাটিডদ্বয় দুই মেরুর দিকে অগ্রসর হয়। দেখা গিয়াছে যে, মাকুর মধ্যাঞ্চলের দৈর্ঘ্য প্রসারণের দ্বারাও ক্রোমাটিডদ্বয়ের চলন সম্ভবপর। ক্রোমাটিডগুলি পৃথক হইলে পর বিষুব-অঞ্চলে RNA-ঘটিত এক প্রকার পদার্থ রাখিয়া যায় যাহা সম্ভবতঃ মাকুর মধ্যাঞ্চল প্রসারণের জন্য দায়ী। ক্রোমাটিডগুলি মেরু অঞ্চলে পেঁছাইলে অ্যানাফেজ দশার সমাপ্তি ঘটে।

(ঘ) টেলোফেজ (Telophase)

টেলোফেজ দশাকে (২৯নং চিত্র) বিপরীত অভিমুখী প্রোফেজ দশাও বলা হয়। ক্রোমোজোমগুলি দুইটি মেরুতে পেঁছাইলে ক্রমশঃ স্বল্প ঘনীভূত হইয়া দীর্ঘ হয়। প্রতি মেরুতে ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয় এবং নূতন nuclear reticulum বা নিউক্লিও জালিকা উৎপন্ন করে। নিউক্লিও মেমব্রেন (Nuclear membrane) ও নিউক্লিওলাস্ (nucleolus) পুনর্গঠিত হয়। এইরূপে মাতৃ-নিউক্লিয়াস দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হয়।



২৯নং চিত্র—(ক) অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ ; (খ) লেট অ্যানাফেজ।

ইনেসিস্ (Cytokinesis)

অধিকাংশ ক্ষেত্রে টেলোফেজ দশার কোন এক পর্যায় হইতেই সাইটোকাইনেসিস্ দশার সূচনা হয়। উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার প্রভেদ দেখা যায়। প্রাণীর ক্ষেত্রে মাকুর বিষুব-অঞ্চলে furrow বা কুঞ্চন দেখা দেয়, যাহা গভীরতর হইয়া ক্রমে দুইটি অপত্য কোষ গঠন করে কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মাকুর বিষুব-অঞ্চল ক্রমশঃ প্রশস্ত হয় এবং তন্তুগুলিও প্রসারিত হইয়া কোষপ্রাচীরকে স্পর্শ করে। তন্তুগুলি ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং ইতিমধ্যে কোষের মধ্যস্থলে বিন্দু বিন্দু পদার্থ সঞ্চিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইয়া একটি কোষ-পাত (cell-plate) প্রস্তুত করে। এই প্রকার পদার্থ গলগি যন্ত্র (golgi apparatus) হইতে গঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। শীঘ্রই ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের সাথে কোষপাত ক্রমে মধ্যচ্ছদা (middle lamella) উৎপন্ন করে। ইহার উপরে প্রোটোপ্লাস্ট হইতে নূতন সেলুলোজ নিঃসৃত হইয়া প্রাথমিক কোষপ্রাচীর সৃষ্টি হয়। এইরূপে মাতৃকোষটি দুইটি অপত্য কোষে বিভক্ত হয়।

মাইটোসিসের বিশেষত্ব (Significance of Mitosis)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উদ্ভিদের দেহ গঠিত হইবার সময় দেহকোষ মাইটোসিস্ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া নূতন কোষ উৎপন্ন করে এবং ইহার নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমগুলি বংশধারায় গুণাবলী বহন করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রতি ক্রোমোজোম অনুদৈর্ঘ্যে দুইটি সমান অংশে বিভক্ত হয়। এইরূপে প্রতি অর্ধ-ক্রোমোজোমের দুইটি দল অপত্য নিউক্লিয়াস দুইটির মধ্যে বণ্টিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অপত্য নিউক্লিয়াসগুলির সহিত মাতৃ-নিউক্লিয়াসের সম আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। শুধু তাহাই নহে, অপত্য নিউক্লিয়াসে মাতৃ-নিউক্লিয়াসের সমসংখ্যক ক্রোমোজোম বর্তমান থাকে। এইজন্য একই প্রজাতির ক্রোমোজোম-সংখ্যা সর্বদাই ধ্রুবক (constant)। ইহাই মাইটোসিসের বিশেষত্ব। ইহা ব্যতীত জীবের একটি বৈশিষ্ট্য হইল বৃদ্ধি। মাইটোসিস্ প্রক্রিয়ায় কোষ-বিভাজনের ফলে যে নূতন কোষের সৃষ্টি হয় তাহার ফলে জীব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

মায়োসিস্ (Meiosis) ৩০নং চিত্র

মায়োসিস্ একটি কোষ-বিভাজন পদ্ধতি যেখানে নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেকে পরিণত হয়। বহু প্রাণীর ক্ষেত্রে নিষেকের প্রারম্ভেই মায়োসিস্ প্রক্রিয়া সংঘটিত হইয়া যৌন কোষ অর্থাৎ শুক্রাণু (sperm) ও ডিম্বাণু (egg) উৎপন্ন হয়। ইহাদের নিষেকের ফলে ডিপ্লয়েড জাইগোট সৃষ্টি হয়। শৈবাল, ছত্রাক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, নিষেকের পরে মায়োসিস্ প্রক্রিয়ায় হ্যাপ্লয়েড রেণু (spores) উৎপন্ন হয়। রেণুগুলি অংকুরিত হইয়া হ্যাপ্লয়েড অথবা লিঙ্গধর উদ্ভিদ (gametophyte) গঠন করে এবং মাইটোসিস্ প্রক্রিয়ায় গ্যামেট (gamete) উৎপন্ন করে। গ্যামেটগুলির যৌন মিলনের ফলে যে জাইগোট সৃষ্টি হয় তাহা মায়োসিস্ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া লিঙ্গ-ধর উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জীবন-চক্র সম্পূর্ণ করিতে দুইটি জনুর প্রয়োজন। নিষেকের পরে ডিপ্লয়েড (diploid) জাইগোটের 2n-সংখ্যক

ক্রোমোজোম থাকে এবং ইহা মায়োসিস্ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া পুনরায় হ্যাপ্লয়েড (haploid) বা n-সংখ্যক ক্রোমোজোমে পরিণত হয়।

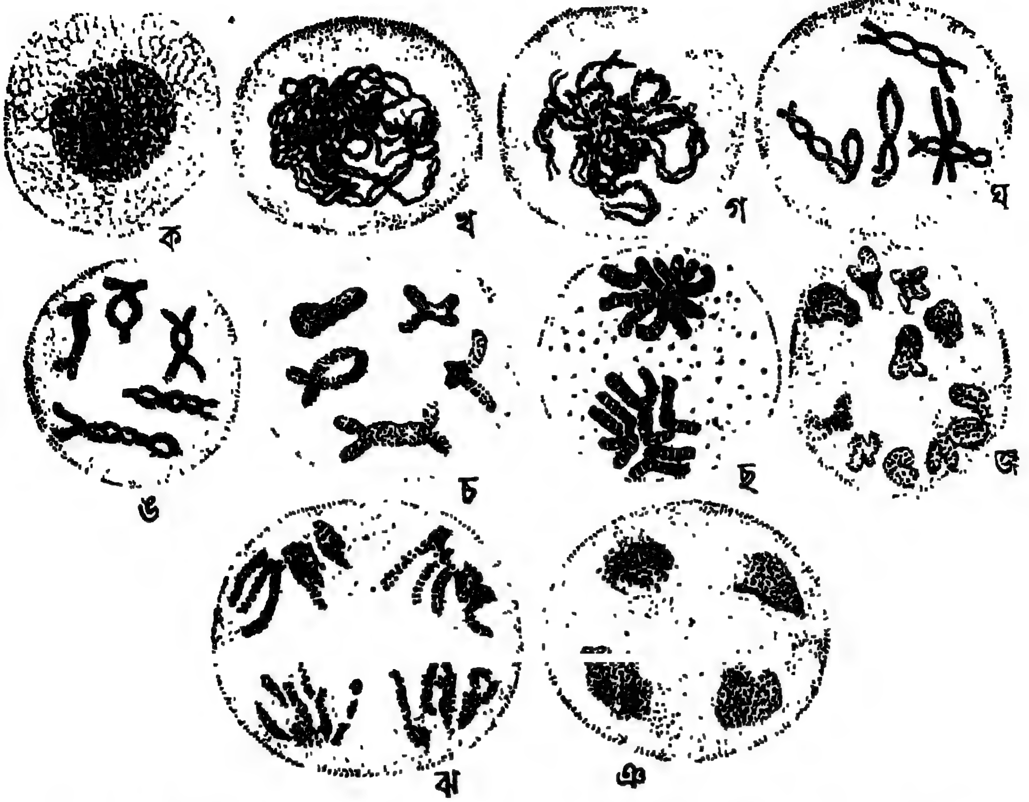
মায়োসিস্ প্রক্রিয়া সংঘটিত হইতে দুইবার নিউক্লিয়াসের বিভাজন প্রয়োজন। প্রথম বিভাজনকে বলে **রিডাক্শনাল** (reductional) অথবা **প্রথম মায়োসিস বিভাজন** (first meiotic division) এবং দ্বিতীয়টিকে বলে **ইকোয়েশনাল** (equational) অথবা **দ্বিতীয় মায়োসিস বিভাজন** (second meiotic division)।

মাইটোসিস ও মায়োসিস প্রক্রিয়ার মূলগত পার্থক্য (Fundamental difference between mitosis and meiosis)—মাইটোসিস ও মায়োসিস প্রক্রিয়ার মূলগত পার্থক্য হইল, মাইটোসিসের ক্ষেত্রে যখন ক্রোমোজোম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে দৃশ্যমান হয়, তখন দেখা যায় যে উহারা লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হইয়া আছে। ক্রোমোজোমের এই লম্বচ্ছেদ মাইটোটিক চক্রের ইণ্টারফেজ দশাতেই সংঘটিত হয় কিন্তু ম য়োসিস প্রক্রিয়ায় ক্রোমোজোমের এই লম্বচ্ছেদ অনেক বিলম্বে অনুষ্ঠিত হয় (প্যাকিটিন উপদশায়); ইহার পরিবর্তে সেখানে দেখায় যায় যে সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর জোড় বাঁধে, ফলে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হইয়া যায়। সমসংস্থ ক্রোমোজোমের (homologous chromosome) এই জোড়-বাঁধার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ডার্লিংটন (Darlington, 1937) বলিয়াছেন যে, ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত জিন (gene) সকল সময় জোড়-বাঁধা অবস্থায় থাকিতে চায়। মাইটোসিসের ক্ষেত্রে ইণ্টারফেজ দশায় ক্রোমোজোমের লম্বচ্ছেদের ফলে যে দুইটি সিস্টার ক্রোমাটিড উৎপন্ন হয়, তাহাদের উপর অবস্থিত জীনগুলি নিজেদের মধ্যে জোড় বাঁধে। মায়োসিসের ক্ষেত্রে, ক্রোমোজোমের লম্বচ্ছেদ একটি বিলম্বিত ঘটনা। সেই কারণে, জীনের এই জোড়-বাঁধার প্রেরণা সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলিকে পরস্পরের নিকটে টানিয়া আনে এবং অবশেষে জোড় বাঁধে। ডার্লিংটনের এই ব্যাখ্যা "প্রিকোসিটি থিওরি" (Precosity theory) নামে পরিচিত।

মায়োসিস প্রক্রিয়ায় সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলির জোড়-বাঁধা সম্পূর্ণ হয় জাইগোটিন উপদশায়। ইহার পর প্যাকিটিন উপদশায় জোড়বন্ধ ক্রোমোজোমগুলির লম্বচ্ছেদ হয়, ফলে, প্রতিটি প্যাকিটিন সূত্র চারিটি ক্রোমাটিড লইয়া গঠিত হয়। এই সময় ক্রোমোজোমগুলির লম্বচ্ছেদ হইলেও সেণ্ট্রোমিয়ার অংশের ছেদ হয় না। এই অবস্থায় আরও একটি ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা হইল ক্রসিং-ওভার (crossing over)। ক্রসিং-ওভার প্রক্রিয়ায় সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলির অ-ভগিনী (non-sister) ক্রোমাটিড-দ্বয় পরস্পরের সহিত নিজ অঙ্গের কিছু অংশ বিনিময় করে। ক্রসিং-ওভারের ফলেই জিনের পুনর্মিশ্রণ সম্ভব হয়। ইহাতে জিনের অবস্থানগত পরিবর্তনের (position effect of gene) জন্যেও কিছু নূতন বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়।

ইহা ছাড়া মাইটোসিস ও মায়োসিস কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের আকৃতিগত কিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন—মাইটোটিক ক্রোমোজোম কুণ্ডলীকরণের ফলে আকারের ছোট ও স্থূল হইলেও মায়োসিসের ক্ষেত্রে কুণ্ডলীকরণ অধিক হয় বলিয়া মায়োটিক ক্রোমোজোম তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী ছোট ও স্থূল হইয়া থাকে।

মাইটোসিস কোষ বিভাজনে মেটাফেজ দশায় সেণ্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় ও পরবর্তী অ্যানাফেজ (anaphase) দশায় ক্রোমাটিড-দ্বয় পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া দুই বিপরীত মেরুর দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু মায়োসিস বিভাজনে প্রথম মেটাফেজ দশায় সেণ্ট্রোমিয়ার



৩০নং চিত্র—ট্রিলিয়াম, মায়োসিসের বিভিন্ন দশা : (ক) জাইগোটিন, (খ) প্যাকিটিন, (গ) ও (ঘ) ডিপ্লোটিন, (ঙ) ডায়াকাইনেসিস, (চ) মেটাফেজ, (ছ) লেট-অ্যানাফেজ, জ-ঞ দ্বিতীয় বিভাজন : (জ) ২য় মেটাফেজ, (ঝ) ২য় অ্যানাফেজ এবং (ঞ) ২য় টেলোফেজ ।

বিভক্ত হয় না, তাই প্রথম অ্যানাফেজে শুধুমাত্র সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া বিপরীত মেরুর দিকে যায়। সুতরাং, মায়োসিস কোষ বিভাজনের প্রথম অ্যানাফেজ সূত্রগুলি দুইটি ভগিনী (sister chromatid) ক্রোমাটিড লইয়া গঠিত হয়, যাহারা পরবর্তী দ্বিতীয় বিভাজনের অ্যান্যাফেজ (দ্বিতীয় অ্যানাফেজ) দশায় পরস্পর হইতে পৃথক হয়।

প্রথম মায়োসিস্ বিভাজন (Meiotic division I)

প্রথম প্রফেজ (Prophase I)

ইহা পাঁচটি দশার সমষ্টি ; যথা—

(ক) **লেপ্‌টোটিন অথবা লেপ্‌টোনিমা দশা (Leptotene or Leptonema stage)**—এই দশায় ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোমগুলি একক অবস্থায় থাকে এবং পরস্পর যুগ্ম দেখায় না। ক্রোমোজোমগুলিকে মাইটোসিসের অ্যানাফেজ অবস্থার ন্যায় দীর্ঘ এবং

পাতলা দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু ক্রোমোজোমগুলি মাইটোসিসের প্রোফেজের ক্রোমোজোম অপেক্ষা অধিকতর দানাদার হইয়া থাকে।

(খ) জাইগোটিন বা জাইগোনিমা দশা (৩১নং চিত্র) (Zygotene or Zygonema stage)—ডিপ্লয়েড কোষের সম-আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর যুগ্ম হইতে আরম্ভ করে। এই সম-আকৃতিবিশিষ্ট যুগ্ম ক্রোমোজোমগুলিকে **সমসংস্থ ক্রোমোজোম** (homologous chromosomes or homologues) বলে। সমসংস্থ ক্রোমোজোমের প্রতিটি যুগ্ম ক্রোমোজোমকে **বাইভ্যালেণ্ট** (bivalent) নামে অভিহিত করা হয়।



৩১নং চিত্র—জাইগোটিন দশা লিলি (Lilium regale) ফুলের পুংরেণু মাতৃকোষে প্রথম মায়োসিস্ বিভাজন

(গ) প্যাকিটিন অথবা প্যাকিনিমা দশা (Pachytene or Pachynema stage)—বাইভ্যালেন্টগুলি স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে থাকে। এই অবস্থার শেষে সুস্পষ্ট সেণ্ট্রোমিয়ার (centromere) দেখা যায়। বাইভ্যালেন্টের প্রতি ক্রোমোজোম অনুদৈর্ঘ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুইটি ক্রোমাটিডে পরিণত হয়। ক্রোমোজোমদ্বয় অনুদৈর্ঘ্যে বিচ্ছিন্ন হইলেও উহাদের সেণ্ট্রোমিয়ার অবিভক্ত থাকিয়া যায়। এই অবস্থায় প্যাকিটিন সূত্র চারিটি ক্রোমাটিড লইয়া গঠিত থাকে। এই সময় নিউক্লিওলাস দৃশ্যমান থাকে এবং উহাদের কয়েকটি বিশেষ ক্রোমোজোমের সহিত যুক্ত থাকিতে দেখা যায়। ক্রোমোজোমের যে অংশের সহিত নিউক্লিওলাস যুক্ত থাকে তাহাকে নিউক্লিওলার অরগানাইজার (nucleolar organizer region) অংশ বলে।



৩২নং চিত্র—প্যাকিটিন দশা ভুট্টা গাছের প্রথম মায়োসিস্ কোষ বিভাজন

সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি জোড় বাঁধার পর পরস্পর দড়ির প্যাঁচের ন্যায় পাকাইয়া অবস্থান করে। এই অবস্থায় পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি নন্-সিস্টার

(অ-ভাগিনী) ক্রোমাটিডের কোন কোন স্থল ভাঙ্গিয়া যায় এবং পুনরায় বিপরীতভাবে অর্থাৎ একটির অংশ অপরটির সহিত এবং অন্যটির অংশ আগেরটির সহিত জুড়িয়া যায়। এই ঘটনা দ্বারা অ-ভাগিনী ক্রোমাটিডদ্বয় পরস্পরের সহিত অংশ বিনিময় করে। এইরূপ অংশ-বিনিময়কে "ক্রসিং-ওভার" (crossing over) বলে। এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, ক্রসিং-ওভার বা ক্রোমাটিডের অংশ বিনিময় কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা হঠাৎ অনুষ্ঠিত কোন দুর্ঘটনা নয়। পরন্তু উহা পূর্ব নির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত ঘটনা যাহার ফলে ক্রোমোজোমের উপর জিনের অবস্থানের পুনর্বিন্যাস ঘটে।

সাম্প্রতিককালে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন তথ্যাদি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ DNA প্রস্তুতকারক উপাদান জাইগোটিন ও প্যাকিটিন দশায় ক্রোমোজোমের সহিত যুক্ত হয়। Stern এবং Hotta ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ক্রোমাটিডের ভাঙ্গা ও পুনরায় জোড়া লাগানোর জন্য যে দুই প্রকার এনজাইম, যথাক্রমে এনডোনিউক্লিয়েজ (endonuclease) এবং লাইগেজ (lygase) প্রয়োজন হয় তাহা প্যাকিটিন দশায় ক্রোমোজোমের সহিত যুক্ত হয়। এই তথ্য ও অন্যান্য প্রমাণাদি হইতে ইহা ধারণা করা হইয়াছে যে, ক্রসিং-ওভার প্রক্রিয়াটি প্যাকিটিন উপদশায় সংঘটিত হয়।

(ঘ) **ডিপ্লোটিন অথবা ডিপ্লোনিমা দশা** (Diplotene or Diplonema stage)—ডিপ্লোটিন দশায় ক্রোমোজোমগুলি দ্রুত কুণ্ডলী পাকাইতে থাকে এবং তাহার ফলে উহারা ক্রমশঃ সংকুচিত হইতে থাকে। ক্রোমোজোমের এই পাকানোর সূচনা সম্বন্ধে কোষ-তত্ত্ববিদদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। কেহ কেহ মনে করেন যে, লেপটোটিন দশা হইতেই ক্রোমোজোম পাকাইতে থাকে কিন্তু অপরদিকে আর এক দল বিজ্ঞানীর মতে ডিপ্লোটিন হইতে পাক খাওয়া শুরু হয়। সে যাহাই হউক, ডিপ্লোটিন হইতে ক্রোমোজোম খুব দ্রুত পাক খাইয়া ছোট হইতে থাকে। এই সময় দুইটি সমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে বিকর্ষণের সূচনা হয়, তাহার ফলে, যে স্থানে ক্রসিং-ওভার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই স্থানে কায়াজমা (chiasma) দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা গিয়াছে যে, প্রতি ক্রোমোজোমের একটি ক্রোমাটিড অপর ক্রোমোজোমের একটি ক্রোমাটিডের সহিত পরস্পর আড়াআড়িভাবে স্থাপিত হইয়া ইংরাজী 'X' অক্ষরের ন্যায় আকার ধারণ করে। ইহাকেই কায়াজমা বলে। সুতরাং, কায়াজমা ক্রসিং-ওভারের প্রতীক চিহ্ন বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ, যখনই কায়াজমা

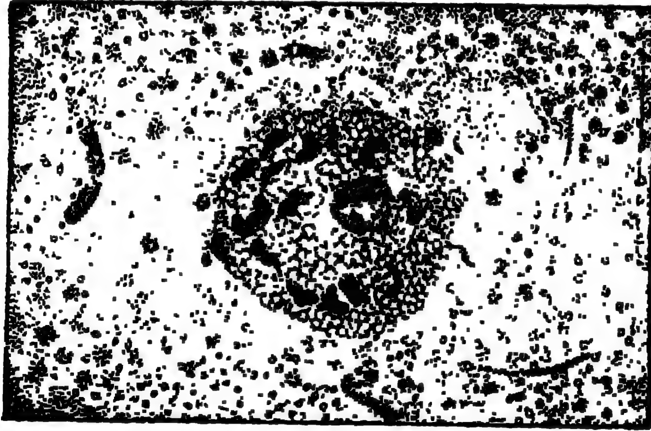


৩৩নং চিত্র—ডিপ্লোটিন দশা
গ্রাসহপার (Grasshopper)

দৃশ্যমান হইবে তখনই বুঝিতে হইবে যে ক্রসিং-ওভার সম্পূর্ণ হইয়াছে (chiasma is the visible sign of crossing-over)।

বিকর্ষণের ফলেই কায়াজমা ক্রমশঃ খুলিতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল হইতে উহা শেষ প্রান্তের দিকে অগ্রসর হয়। একটি বাইভ্যালেণ্ট ক্রোমোজোমের উপর কয়টি স্থানে ক্রসিং-ওভার অনুষ্ঠিত হইবে বা, কয়টি স্থানে কায়াজমা দেখা যাইবে তাহা বহুলাংশে ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। অপেক্ষাকৃত ছোট ক্রোমোজোমে সাধারণতঃ একটি কায়াজমা এবং দীর্ঘ ক্রোমোজোমে একাধিক কায়াজমা সৃষ্টি হইতে পারে। যখনই কায়াজমা দেখা যায়, তখন দুইটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। ক্রোমোজোমের এই দ্বিসূত্র প্রকৃতি হইতেই এই দশার নাম ডিপ্লোটিন হইয়াছে।

(৬) **ডায়াকাইনেসিস** (Diakinesis)—(২৯নং চিত্র) প্রকৃতপক্ষে ডিপ্লোটিন ও ডায়াকাইনেসিস, এই দুইটি দশার মধ্যে পার্থক্য করা খুবই কষ্টকর। কায়াজমার প্রান্তীয় গমন এই দশায় সম্পন্ন হয়। ক্রোমোজোমগুলির কুণ্ডলীকরণ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইবার ফলে ইহারা ক্ষুদ্রাকার হইতে থাকে। ইহার ফলে বাইভ্যালেণ্ট ক্রোমোজোমগুলি অধিকতর গোলাকার হয়। যে সকল বাইভ্যালেণ্টে একটি কায়াজমা থাকে, সেখানে দেখা যায় যে



৩৪নং চিত্র—ডায়াকাইনেসিস

সমসংস্থ ক্রোমোজোম দুইটি একটি প্রান্তে লাগিয়া আছে; আর সেখানে একাধিক কায়াজমা থাকে সেখানে দেখা যায় যে সমসংস্থ ক্রোমোজোম দুইটি উহাদের দুই প্রান্তে জুড়িয়া আছে। কায়াজমার প্রান্ত গমন (terminalization) সকল বাইভ্যালেণ্টে সমভাবে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে বাইভ্যালেণ্টের মাঝামাঝি স্থানে কায়াজমা অবস্থান করিতেছে। এই দশার শেষ ভাগে নিউক্লিওলাস অদৃশ্য হইয়া যায় এবং অবশেষে নিউক্লিও মেমব্রেন বা নিউক্লিয়াসের আবরণী পর্দার বিলোপ সাধন হয়।

প্রথম মেটাফেজ (Metaphase I)

(৩৫ এবং ৩৬ক-নং চিত্র) নিউক্লিও মেমব্রেনের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন এবং মাইটোসিসের ন্যায় মাকুর যথারীতি আবির্ভাবই হইল এই দশার বিশেষত্ব। বাইভ্যালেণ্টগুলি মেটাফেজ প্লেট বা মাকুর বিষুব অঞ্চলে (দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থান) অবস্থান করে। এই সময়ে, প্রতি বাইভ্যালেণ্ট ক্রোমোজোমের যে দুইটি করিয়া অবিভক্ত সেণ্ট্রোমিয়ার থাকে, তাহারা মেটাফেজ প্লেটের উপর সমদূরত্বে এবং মাকুতন্তুর সহিত লম্বভাবে অবস্থিত হয়।



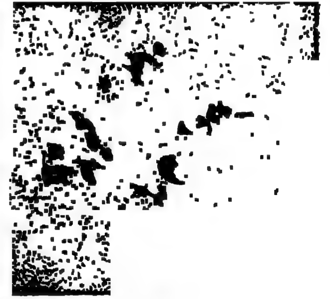
৩৫নং চিত্র—ট্রাডেসক্যানশিয়া প্রথম মায়োসিস্ মেটাফেজ

প্রথম অ্যানাফেজ (Anaphase I)

(৩৬খ-নং চিত্র) যখনই ক্রোমোজোমগুলি মেটাফেজ প্লেট বা বিষুব অঞ্চল হইতে দুই মেরুর দিকে অগ্রহসর হইতে আরম্ভ করে তখনই প্রথম অ্যানাফেজের সূচনা হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রতি যুগ্ম ক্রোমাটিডের সেণ্ট্রোমিয়ারগুলি অবিভক্ত থাকিয়া যায় এবং ইহার ফলে যুগ্ম ক্রোমাটিড সম্পন্ন সম্পূর্ণ ক্রোমোজোমগুলি শুধু বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং, মায়োসিসের প্রথম অ্যানাফেজ দশায় ক্রোমোজোম পৃথকীকরণ সম্পন্ন হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রতি মেরুতে প্রতি ক্রোমোজোম জোড়ার (homologous chromosome group) মধ্য হইতে কেবলমাত্র একটি ক্রোমোজোম উপস্থিত থাকে, অর্থাৎ ডিপ্লয়েড দলের পরিবর্তে হ্যাপ্লয়েড দল উপস্থিত হয়। এইরূপে প্রথম মায়োসিস বিভাজনের অ্যানাফেজ দশায় ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেকে পরিণত হয়। সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি যখন দুই মেরুর দিকে অগ্রসর হয় তখন কায়াজমাগুলি খুলিয়া যায়; ফলে অ-ভগিনী ক্রোমাটিড্‌দ্বয় পরস্পরের বন্ধন হইতে বিযুক্ত হইয়া যায়।



ক



খ

৩৬নং চিত্র—(ক) প্রথম মেটাফেজ দশা ; পার্শ্বদৃশ্য
(খ) প্রথম অ্যানাফেজ দশা

প্রথম টেলোফেজ (Telophase I)

(৩৩ছ-নং চিত্র) নিউক্লিও মেমব্রেন যথারীতি আবির্ভূত হয় এবং ক্রোমোজোমগুলি একত্রিত হইয়া দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠন করে। অল্পক্ষণ পরেই ইহাদের দ্বিতীয়

বিভাজন আরম্ভ হয়। (উদা. Zea mays, Tradescantia sp. etc.)। কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন—Trillium sp. প্রথম অ্যানাফেজ দশার শেষে অর্থাৎ ক্রোমোজোম গুলি মেরুপ্রান্তে পেঁছানোর পর এবং মাকুতন্তুর বিলোপ সাধনের পর, সরাসরি দ্বিতীয় মেটাফেজ দশায় প্রবেশ করে (চিত্র নং-৩৭ক)।

দ্বিতীয় মায়োসিস্ বিভাজন (৩৭নং চিত্র) (Meiotic division II)

এই প্রক্রিয়াকে ইকোয়েশনাল বিভাজনও (equational division) বলা হয়।

দ্বিতীয় প্রোফেজ (Prophase II)

এই অবস্থায় ক্রোমোজোম দ্বি-ক্রোমাটিড অবস্থায় অবস্থান করে। সেন্ট্রোমিয়ার অবিভক্ত থাকে।

দ্বিতীয় মেটাফেজ (Metaphase II)

দুইটি মেরুযুক্ত মাকুর পুনরাবির্ভাব হয় এবং ক্রোমোজোমগুলি বিষুব অঞ্চলে অবস্থান করে। দ্বিতীয় মায়োসিস বিভাজন মাইটোসিস বিভাজনের ন্যায় সম্পন্ন হয়। এই দশার শেষ ভাগে সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় এবং তাহার পরই দ্বিতীয় অ্যানাফেজ দশা শুরু হইয়া যায়।

দ্বিতীয় অ্যানাফেজ (Anaphase II)

প্রতি ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিডগুলি তন্তু বরাবর দুইটি মেরুর দিকে অগ্রসর হয়। সেন্ট্রোমিয়ারগুলি যথারীতি চালিত হইবার ফলে ক্রোমাটিডগুলি বিভিন্ন আকার ধারণ করে।



ক



খ



গ

৩৭নং চিত্র—ট্রিলিয়ামে দ্বিতীয় মায়োসিস্ বিভাজন : (ক) দ্বিতীয় মেটাফেজ; (খ) দ্বিতীয় অ্যানাফেজ; (গ) দ্বিতীয় টেলোফেজ।

দ্বিতীয় টেলোফেজ (Telophase II)

মেরুতে পেঁছাইয়া ক্রোমাটিডগুলি যথারীতি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং এইরূপে একটি নিউক্লিয়াস হইতে দুইবার বিভাজনের ফলে চারিটি অপত্য নিউক্লিয়াস

উৎপন্ন হয়। প্রতি অপত্য নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোমের অর্ধেক অথবা হ্যাপ্লয়েড সংখ্যা থাকে এবং প্রতিটি দলে প্রথম প্রোফেজের প্রতি চারিটি ক্রোমাটিডযুক্ত ক্রোমোজোমের একটি করিয়া ক্রোমাটিড থাকে।

সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis)

অপত্য নিউক্লিয়াসগুলির মধ্যে কোষপ্রাচীর যথারীতি গঠিত হইয়া চারিটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় এবং প্রতি কোষের নিউক্লিয়াসে হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম থাকে।

মায়োসিসের বিশেষত্ব (Significance of Meiosis)

মায়োসিস প্রক্রিয়ার অ্যানাফেজ দশায় ক্রোমোজোমগুলির segregation বা পৃথকীকরণের ফলে হ্যাপ্লয়েড কোষগুলি পিতৃ- এবং মাতৃ-ক্রোমোজোমের বিভিন্ন সংমিশ্রণ প্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু প্যাকিটিন অবস্থায় কায়াজমা (chiasma) গঠনের সময় সমসংস্থ (homologous) পিতৃ- এবং মাতৃ-ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিডগুলির মিলনের ফলে সন্তান-সন্ততির মধ্যেও ঐ সকল পিতৃ- এবং মাতৃ-ক্রোমাটিডগুলির অধিকতর সংমিশ্রণ ঘটে।

ইহা অবিদিত নহে যে, ক্রোমোজোমগুলি জিনের (genes) সমষ্টি এবং কায়াজমা গঠনের সময় ক্রোমাটিডগুলি পরস্পর বিনিময়ের সাথে জিনদলেরও নির্দিষ্ট অবস্থান (linkage)-এর পরিবর্তন ঘটে। ইহার ফলে পিতৃ- এবং মাতৃ-ক্রোমাটিডসম্পন্ন গ্যামেটগুলিও প্রজনন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে। এইরূপ গ্যামেটগুলির মিলনের ফলে বিভিন্ন পরিবৃত্তিসম্পন্ন (variation)-এর সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করে এবং ইহারা প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection)-এর দ্বারা অভিব্যক্তি (evolution)-এর বশবর্তী হয়।

মাইটোসিস ও মায়োসিসের পার্থক্য
(Difference between mitosis and meiosis)

মাইটোসিস	মায়োসিস
১। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় সাধারণতঃ দেহকোষ বিভক্ত হয়।	১। মায়োসিস প্রক্রিয়ায় রেণু ও গ্যামেট মাতৃকোষে সংঘটিত হয়। কোন কোন নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে জাইগোটে মায়োসিস কোষ বিভাজন হইয়া থাকে।
২। অযৌন বা যৌন পদ্ধতিতে বংশ-বিস্তারকারী উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহে এই প্রকার কোষ বিভাজন হইয়া থাকে।	২। কেবলমাত্র যৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তারকারী উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহে এই প্রকার কোষ বিভাজন হইয়া থাকে।

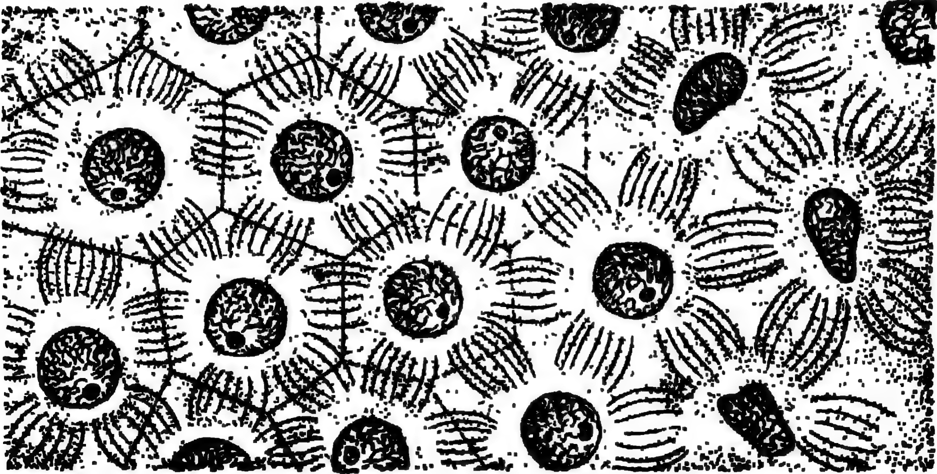
মাইটোসিস	মায়োসিস
৩। মাইটোসিস একটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি একবার মাত্র বিভাজিত হইয়া দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে।	৩। মায়োসিস দুইটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়; অর্থাৎ গ্যামেট মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি পরপর দুইবার বিভাজিত হইয়া চারিটি অপত্য নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে।
৪। মাইটোসিসের পূর্বে ইন্টারফেজ দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়। এই সময় DNA, RNA এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ হয়।	৪। মায়োসিসের পূর্বে ইন্টারফেজ স্বল্পক্ষণ স্থায়ী হয়। নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রথম প্রোফেজ দশায় সম্পন্ন হয়।
৫। উৎপন্ন অপত্য কোষ দুইটি সকল দিক হইতে মাতৃকোষ হইতে অভিন্ন থাকে।	৫। উৎপন্ন অপত্য কোষগুলি মাতৃকোষের অনুরূপ হয় না।
৬। মাতৃকোষ ও অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা একই থাকে।	৬। অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হইয়া যায়।
৭। মাইটোসিসের প্রোফেজ ক্ষণস্থায়ী এবং তাহার কোন উপবিভাগ নাই।	৭। মায়োসিসের প্রোফেজ দশা দীর্ঘতম এবং উহা পাঁচটি উপদশায় বিভক্ত, যথা—লেপ্টোটিন, জাইগোটিন, প্যাকিটিন, ডিপ্লোটিন ও ডায়াকাইনেসিস।
৮। প্রোফেজের সূচনায় ক্রোমোজোমগুলি অণুদৈর্ঘ্যে বিভক্ত থাকে। সেণ্ট্রোমিয়ার অবিভক্ত থাকে।	৮। প্রোফেজের সূচনায় ক্রোমোজোমগুলি অবিভক্ত থাকে।
৯। ক্রোমোজোমের লম্বচ্ছেদ ইন্টারফেজ দশায় সম্পন্ন হয়।	৯। ক্রোমোজোমের লম্বচ্ছেদ প্যাকিটিন উপদশায় সম্পন্ন হয়। সেণ্ট্রোমিয়ার অবিভক্ত থাকে।
১০। সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলির মধ্যে জোড়-বাঁধার জন্য কোনরূপ আকর্ষণ দেখা যায় না।	১০। লেপ্টোটিন উপদশায় সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলির মধ্যে একপ্রকার আকর্ষণ দেখা যায়, যাহার ফলে জাইগোটিন উপদশায় সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর জোড় বাঁধে।
১১। ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়।	১১। জোড় বাঁধার ফলে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেকে পরিণত হয় (হ্যাপ্লয়েড)। এক একটি জোড়-বাঁধা ক্রোমোজোমকে বাইভ্যালেণ্ট বলা হয়।

মাইটোসিস	মায়োসিস
১২। ক্রসিং-ওভার সংঘটিত হয় না এবং কায়াজমাও দেখিতে পাওয়া যায় না।	১২। প্যাকিটিন উপদশায় অ-ভগিনী ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিং-ওভার অনুষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে ডিপ্লোটিন দশায় কায়াজমা দেখিতে পাওয়া যায়।
১৩। প্রোফেজের শেষে নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়াসের আবরণী পর্দা অদৃশ্য হইয়া যায়।	১৩। ডায়াকাইনেসিস দশায় কায়াজমার প্রান্ত-গমন সম্পন্ন হয়। এই দশার শেষভাগে নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়াসের আবরণী পর্দা অদৃশ্য হয়।
১৪। মেটাফেজ ক্রোমোজোম দুইটি ক্রোমাটিড লইয়া গঠিত হয়।	১৪। প্রথম মেটাফেজ ক্রোমোজোম (বাইভ্যালেন্টগুলি) চারিটি ক্রোমাটিড লইয়া গঠিত।
১৫। মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারগুলি বিষুবরেখা অঞ্চলে অবস্থান করে, আর বাহুগুলি মেরুর দুই পাশে প্রসারিত থাকে। এই সময় মাকুর আবির্ভাব ঘটে। প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার দুই মেরু হইতে প্রসারিত দুইটি মাকুতন্তুর সহিত যুক্ত হয়।	১৫। প্রথম মেটাফেজ দশায় সেন্ট্রোমিয়ারগুলি ঠিক বিষুব অঞ্চলে অবস্থান করে না। প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের সহিত একদিক (মেরু) হইতে প্রসারিত মাকুতন্তুর সংযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় মেটাফেজ দশাটি মাইটোসিসের মেটাফেজ দশার অনুরূপ।
১৬। মেটাফেজ দশার শেষ ভাগে সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজিত হয়।	১৬। প্রথম মেটাফেজ দশায় সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় না। দ্বিতীয় মেটাফেজ দশায় সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয়।
১৭। অ্যানাফেজ দশায় মাকুতন্তুর আকর্ষণের ফলে বিচ্ছিন্ন ক্রোমাটিডদ্বয় পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইয়া দুই বিপরীত মেরুর দিকে ধাবিত হয়।	১৭। প্রথম অ্যানাফেজ দশায় মাকুতন্তুর আকর্ষণে সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুই বিপরীত মেরুর দিকে ধাবিত হয়।
১৮। অ্যানাফেজ সূত্র একটিমাত্র ক্রোমাটিড লইয়া গঠিত।	১৮। প্রথম অ্যানাফেজ সূত্র দুইটি ক্রোমাটিড লইয়া গঠিত।
১৯। মাইটোসিসে সকল সময় টেলোফেজ দশা দেখিতে পাওয়া যায়।	১৯। মায়োসিসের সকল ক্ষেত্রে প্রথম টেলোফেজ দশা নাও থাকিতে পারে। সেই সকল ক্ষেত্রে, ক্রোমোজোমগুলি মেরু প্রান্তে উপস্থিত হইয়াই সরাসরি দ্বিতীয় মেটাফেজ দশায় উপস্থিত হয়।

মাইটোসিস	মায়োসিস
২০। টেলোফেজ দশায় শেষ পর্যায় নিউক্লিওলাসের পুনরাবির্ভাব হয়।	২০। প্রথম টেলোফেজ দশায় নিউক্লিওলাস গঠিত হয় না। দ্বিতীয় টেলোফেজ দশায় শেষ পর্যায় নিউক্লিওলাসের পুনরাবির্ভাব হয়।
২১। সাইটোকাইনেসিসে সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হইয়া দুইটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে।	২১। প্রথম টেলোফেজের শেষে সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হইতে পারে, আবার নাও হইতে পারে। ফলে মায়োসিসের প্রথম বিভাজনের শেষে দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস অথবা ক্ষেত্র বিশেষে দুইটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়।
২২। দ্বিতীয় বিভাজন নাই	২২। মায়োসিসের দ্বিতীয় বিভাজন মাইটোসিসের অনুরূপ।

অবাধ কোষগঠন (৩৮নং চিত্র) (Free cell formation)

এই প্রক্রিয়ার সময় নিউক্লিয়াস জটিলভাবে বিভক্ত হইয়া দুইটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এইরূপে কয়েকবার পুনঃ পুনঃ



৩৮নং চিত্র—অবাধ কোষগঠন

বিভক্ত হইয়া অসংখ্য নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয় ও মাতৃকোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকে। সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক নিউক্লিয়াসের চারিদিকে সাইটোপ্লাজম জমা হয়। এইরূপে মাতৃকোষের মধ্যে বহু নগ্ন কোষ গঠিত হয়। অবশেষে মাতৃকোষের প্রাচীর বিশ্লিষ্ট হইয়া কোষগুলি বাহিরে আসে। কোন কোন সময় নগ্ন কোষগুলি গোলাকার হয় এবং প্রত্যেকটি কোষের চারিদিকে কোষপ্রাচীর গঠিত হয়।

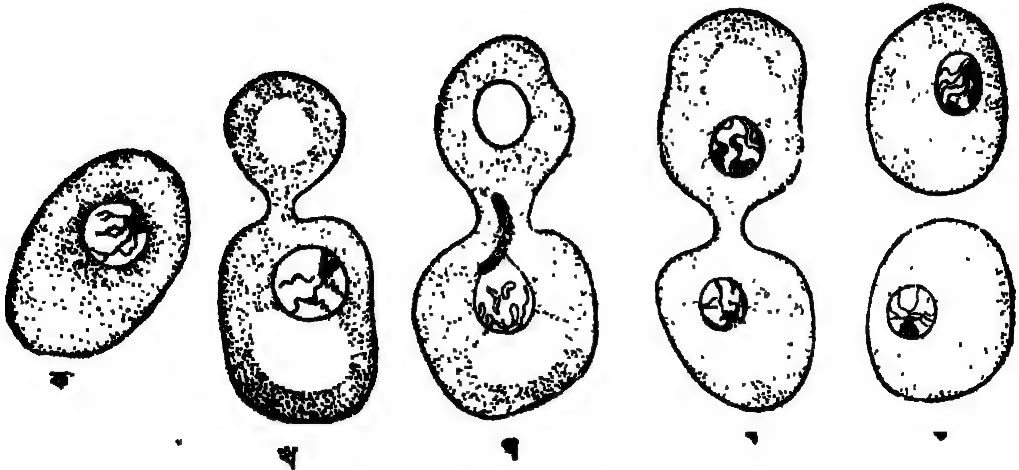
এইরূপে বহু কোষ মাতৃকোষের মধ্যে উৎপন্ন হয়। মাতৃকোষের প্রাচীর বিদীর্ণ হইয়া বা ফাটিয়া গিয়া কোষগুলি বাহিরে আসে।

মুকুলোদ্গম বা গেমেশন (Budding or Gemmation)

এইপ্রকার কোষবিভাগ এককোষী ঈস্টের vegetative reproduction বা অঙ্গজ জননের সময় দেখা যায়। মুকুলোদ্গমের সময় কোষপ্রাচীরের উপর মুকুলের মতো একটি অংশ উদ্গত হয় এবং ক্রমশঃ বড় হয়। ইতিমধ্যে নিউক্লিয়াস বিভক্ত হইয়া দুইটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে এবং ইহার মধ্যে একটি নিউক্লিয়াস কিছু সাইটোপ্লাজমসহ ক্রমবর্ধমান মুকুলের মধ্যে প্রবেশ করে। এই প্রবেশের পর সংযোজন স্থান ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া দুইটি পৃথক কোষ উৎপন্ন করে। এইপ্রকার কোষ গঠন এত দ্রুত হয় যে, অল্পক্ষণের মধ্যে অসংখ্য কোষ উৎপন্ন হয়।

সংশ্লেষ ও নিষেক (৩৯নং চিত্র) (Conjugation & Fertilization)

এক প্রকার কোষগঠন যৌন জননের সময় হইয়া থাকে। যৌন জননের সময় দুইটি নগ্ন জননকোষ বা গ্যামেট (gamete) মিলিত হইয়া জাইগোট (zygote) উৎপন্ন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে জননকোষগুলিকে স্ত্রী- ও পুং-জননকোষে পৃথক করা যায়। পুং-জননকোষকে শুক্রাণু (spermatozoid) এবং স্ত্রী-জননকোষকে ডিম্বাণু (ovum or oosphere) বলে। একই প্রকার জনন কোষের মিলন হইলে,

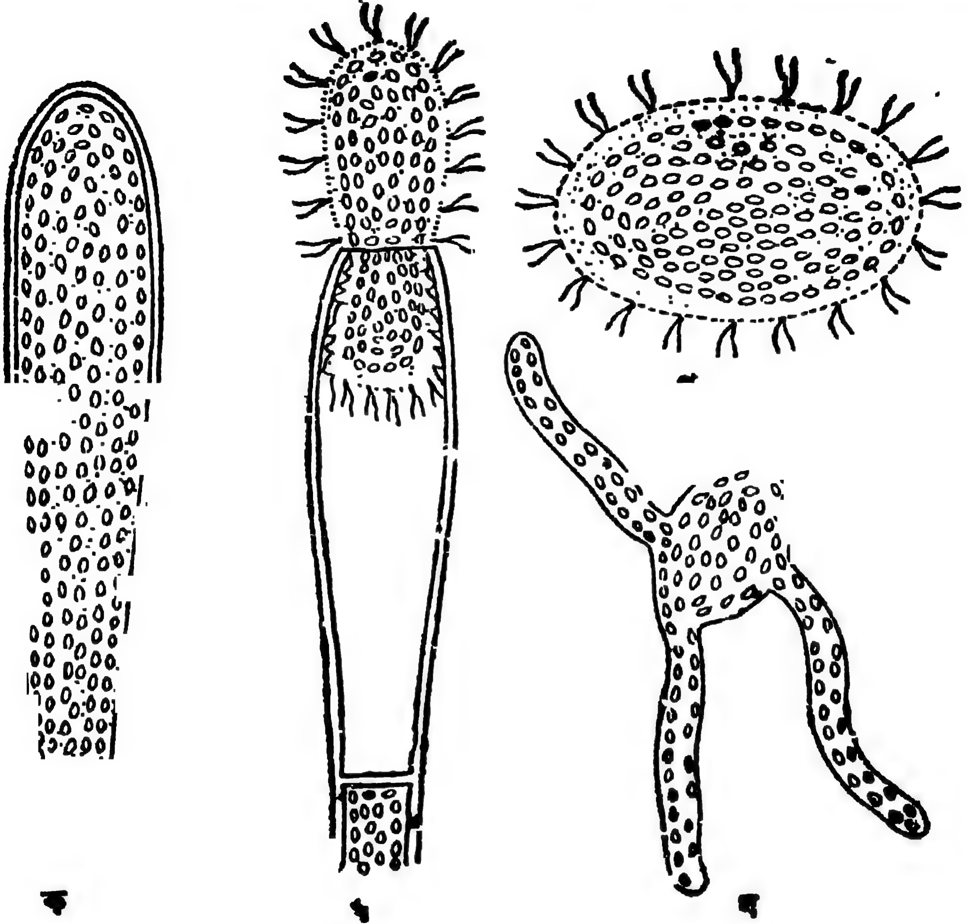


৩৯নং চিত্র—মুকুলোদ্গম

প্রক্রিয়াটিকে সংশ্লেষ (conjugation) বলে। অপরপক্ষে স্ত্রী- ও পুং-জননকোষের মিলন হইলে, ইহাকে নিষেক (fertilization) বলে। উভয় প্রকার মিলনের ফলে যে কোষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে জাইগোট (zygote) বলে। জাইগোট সংশ্লেষ প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হইলে, ইহাকে জাইগোস্পোর (zygospore) বলে, কিন্তু নিষেক প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হইলে তাহাকে উস্পোর বা ডিম্বাণু (oospore) বলে।

পুনর্ভবন (Rejuvenescence) ৪০নং চিত্র

এই প্রক্রিয়া দ্বারা পুরাতন প্রোটোপ্লাস্ট পুনরায় নবীন ও কার্যক্ষম হয়। কোষ পুরাতন হইলে প্রোটোপ্লাস্ট কোষপ্রাচীর হইতে সঙ্কুচিত হইয়া কোষের কেন্দ্রস্থলে আসে। পরে কোষপ্রাচীর বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রোটোপ্লাস্ট কোষের বাহিরে আসে, ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে



৪০নং চিত্র—পুনর্ভবন

কিছুক্ষণ জলে চলাফেরা করিয়া অবশেষে স্থির হয়, এবং ইহার চারিদিকে কোষপ্রাচীর গঠন করে। এই প্রকার কোষগঠন ভাউকিরিয়া (Vaucheria) নামক শৈবালে দেখা যায়। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে পুরাতন কোষ হইতে নবীন কোষ গঠিত হয় বটে কিন্তু উহার কোন ফ্ল্যাজেলা থাকে না।

অপুংজনি (Parthenogenesis)

সময় সময় অ্যাজাইগোস্পোর (azygospore) নামক বিশেষ স্পোর দ্বারা জনন হয়। সংশ্লেষ বিফল হইলে কোন একটি জননকোষ হইতে অথবা নিষেক বিফল হইলে ইহা স্ত্রী-জননকোষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই প্রকার জননকে অপুংজনি (parthenogenesis) বলে। ইহা সাধারণত মিউকর (Mucor) স্পাইরোগাইরা (Spirogyra) প্রভৃতি উদ্ভিদে দেখা যায়।

8 ক্রোমোজোম
(Chromosomes)

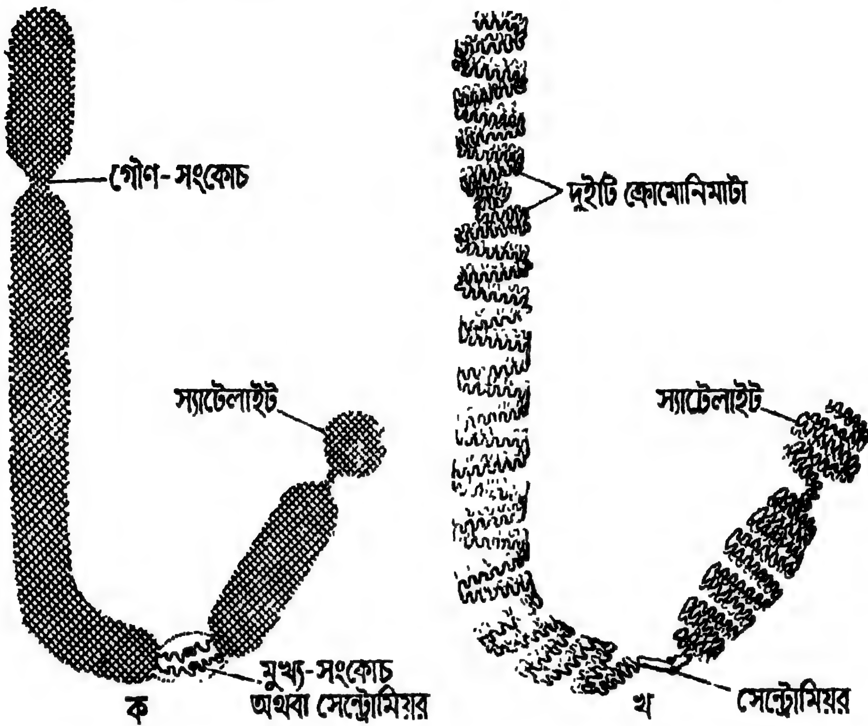
কোন একটি নিউক্লিয়াস লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহার চারিদিকে একটি আবরণী পর্দা এবং অভ্যন্তরে নিউক্লিয় রস রহিয়াছে। কিন্তু যখন নিউক্লিয়াসটিকে স্থিরীকৃত (fixation) করার পর রঞ্জক পদার্থ দ্বারা রঞ্জিত করা হয় তখন আবরণী পর্দার অভ্যন্তরে একটি জালিকার ন্যায় বিস্তৃত অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূতার ন্যায় বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাকে ক্রোমোনিমা বলে (একবচনে ক্রোমোনিমাটা)। ক্রোমোনিমার সংখ্যা বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন। কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিও-জালিকা বা ক্রোমাটিন জালিকা নির্দিষ্ট সংখ্যক সূত্রে প্রকাশিত হয়। এই সূত্রগুলিকে তখন ক্রোমোজোম বলা হয়। ক্রোমোজোম নিউক্লিওপ্রোটিন দ্বারা গঠিত এবং বংশগতির ধারক ও বাহক।

ক্রোমোজোম কথার অর্থ হইল রঙীন দেহ (chrom—coloured ; soma—body)। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে W. Waldeyer নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত রঞ্জিত বস্তুগুলিকে ক্রোমোজোম নামে অভিহিত করেন। তবে Waldeyer-এর পূর্বে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, E. Strasburger সর্ব প্রথম কোষ বিভাজনের সময় এক ধরনের সূত্রের ন্যায় বস্তুর আবির্ভাব লক্ষ্য করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে W. Fleming ক্রোমোজোমের লম্বচ্ছেদ বর্ণনা করেন এবং নিউক্লিয়াসের রঞ্জক গ্রহণকারী অংশগুলিকে ক্রোমাটিন বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহার পর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে E. G. Balbiani, Chironomus-এর লার্ভায় স্যালিভারি গ্লাণ্ডে ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে W. Roux সর্বপ্রথম এই মত প্রকাশ করিলেন যে সম্ভবতঃ বংশগতির ধারাবাহিকতার সহিত ক্রোমোজোমের কোথাও কোন যোগসূত্র আছে। ইহার পর বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে W. S. Sutton, T. Boveri এবং T. H. Morgan প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ক্রোমোজোমের সহিত বংশগতির ধারাবাহিকতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে E. Heitz, B. Kaufmann, A. E. mirsky এবং H Ris প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ ক্রোমোজোমের অঙ্গসংস্থান, ও রাসায়নিক গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

বর্তমানে, সুপ্রজনন বিদ্যার ছাত্রদের নিকট ক্রোমোজোমের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে ক্রোমোজোমের উপরই বংশগতির একক অর্থাৎ জীন অবস্থিত। সুতরাং কোষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিশেষত ক্রোমোজোম তত্ত্ব—ইহার গঠন বৈচিত্র্য, প্রতিলিপি গঠন, স্পিণ্ডল তন্তুর উপর উহাদের চলন ও পৃথকীকরণ পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞান সুপ্রজনন বিদ্যার অন্তর্নিহিত নীতিসমূহ ও তত্ত্বসমূহ বুঝিতে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া, ক্রোমোজোম সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিভিন্ন প্রজাতি ও গণের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নিরূপণেও যথেষ্ট সাহায্য করে। শুধু তাহাই নয়,

বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক বিচার এবং শ্রেণীবন্ধকরণের কাজে বহু কঠিন সমস্যার সমাধান ক্রোমোজোমের গঠন প্রকৃতি ও তাহাদের কাজের ধারার তত্ত্বগত জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে।

সকল জীবেই একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। ভিন্ন প্রজাতির ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম সংখ্যা ভিন্ন হইতে পারে; আবার অনেক ক্ষেত্রে একও হইয়া থাকে। সুতরাং বিভিন্ন শ্রেণী, গণ বা প্রজাতির মধ্যে সম্পর্ক, অর্থাৎ তাহারা পরস্পরের সহিত



৪১নং চিত্র—ক্রোমোজোমের নকশা চিত্র: (ক) বহিরাকৃতি (খ) আভ্যন্তরীণ আকৃতি।

কতটা সম্পর্কযুক্ত তাহা ক্রোমোজোম সংখ্যার উপর নির্ভর করে না বা ক্রোমোজোম সংখ্যার সাহায্যে নিরূপণ করা হয় না। যাহা কিছু রহস্য সবই ক্রোমোজোমের বা আরও নির্দিষ্ট রূপে ধরিলে, জীনের রাসায়নিক গঠন ও উহার আপেক্ষিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদ জগতে ক্রোমোজোম সংখ্যা নানা প্রকার হইয়া থাকে, যেমন, নিউরোস্পোরায় (Neurospora sp.) একটি মাত্র ($n=1$) ক্রোমোজোম, অপরদিকে আবার সব থেকে বেশী সংখ্যক ক্রোমোজোম দেখা যায় অফিওগ্লসাম্ (Ophioglossum sp.) নামক একটি ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে ($2n=1272$)। নিউরোস্পোরা একটি মোল্ড ছত্রাক এবং হ্যাপ্লয়েড। সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে, কম্পোসিটী (Compositae) গোত্রভুক্ত একটি উদ্ভিদে, যথা, হ্যাপ্লোপ্যাপাস গ্র্যাসিলিস্ (Haplopappus gracilis) সব থেকে কম সংখ্যক ক্রোমোজোম লক্ষ্য করা গিয়াছে ($2n=4$)। মনে রাখিতে হইবে যে এই উদ্ভিদটি ডিপ্লয়েড এবং উচ্চ শ্রেণীভুক্ত।

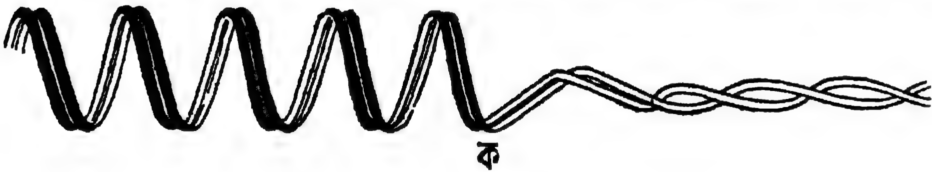
ক্রোমোজোমের আকৃতি (Chromosome structure)

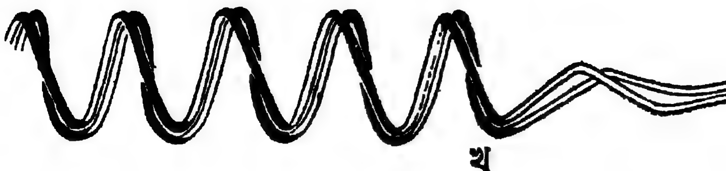
ক্রোমোজোমের গঠন, আকার এবং অঙ্গসংস্থান প্রধানত মাইটোটিক মেটাফেজ-ক্রোমোজোম হইতে স্থির করা হয়। কোষ বিভাজনের ইণ্টারফেজ দশায় ক্রোমোজোম সূত্রগুলি সংকোচন-প্রসারণশীল ক্রোমাটিন সূত্র হিসাবে অবস্থান করে। মেটাফেজ দশায় সূত্রগুলি সঙ্কুচিত হইয়া দণ্ডাকার ও স্থূল হয়। এই সময় উহাদের অঙ্গসংস্থান সুস্পষ্ট হয়। সাধারণভাবে প্রতিটি ক্রোমোজোম (মেটাফেজ দশায়) লম্বালম্বি বিভক্ত থাকে। এই এক একটি ভাগকে ক্রোমাটিড বলে। প্রতিটি ক্রোমাটিড কমপক্ষে আরও দুইটি ক্রোমোটিন সূত্র লইয়া গঠিত থাকে। উহাদের প্রতিটিকে ক্রোমোনিমা বলা হয় (Vejdovsky 1912) ; আবার ক্ষেত্রবিশেষে ক্রোমোনিমা দুইটি, তিনটি অথবা চারিটি সূত্র লইয়া গঠিত হইতে পারে।

প্রতিটি ক্রোমোনিমা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাদার অংশ লইয়া গঠিত হয়। ঐ দানাদার অংশগুলিকে ক্রোমোমিয়ার বলা হয় (Balbiani 1875)। ক্রোমোমিয়ারগুলি একটি সূক্ষ্ম সূত্রের উপর মালার ন্যায় সজ্জিত থাকে। দুইটি ক্রোমোমিয়ারের মাঝের যোগসূত্রকে মধ্যবর্তী ক্রোমোমিয়ার সূত্র বলা হয়। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে ক্রোমোনিমা সূত্রের কোন কোন স্থান অত্যধিক কুণ্ডলীকৃত হইয়া দানাদার আকৃতি প্রাপ্ত হয় (Ris 1945)। অপরদিকে Kaufmann (1948)-এর মতে ক্রোমোনিমা সূত্রের স্থানে স্থানে ক্রোমাটিন বস্তু জমা হইয়া দানাদার আকৃতির সৃষ্টি করে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পর্যবেক্ষণে প্রথম মতের অনুকূলে সমর্থন পাওয়া গিয়াছে।

ক্রোমোনিমা সূত্রগুলি পরস্পর কুণ্ডলী পাকাইয়া অবস্থান করে ; সাধারণভাবে দুই ধরনের কুণ্ডলী (coil) দেখিতে পাওয়া যায়, যথা (৪২নং চিত্র) :

(ক) **প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলী** (Plectonemic coil) —যখন ক্রোমোনিমা সূত্রগুলি পরস্পর দড়ির পাকের ন্যায় পাকাইয়া থাকে, তখন সেই পাককে প্লেক্টোনেমিক





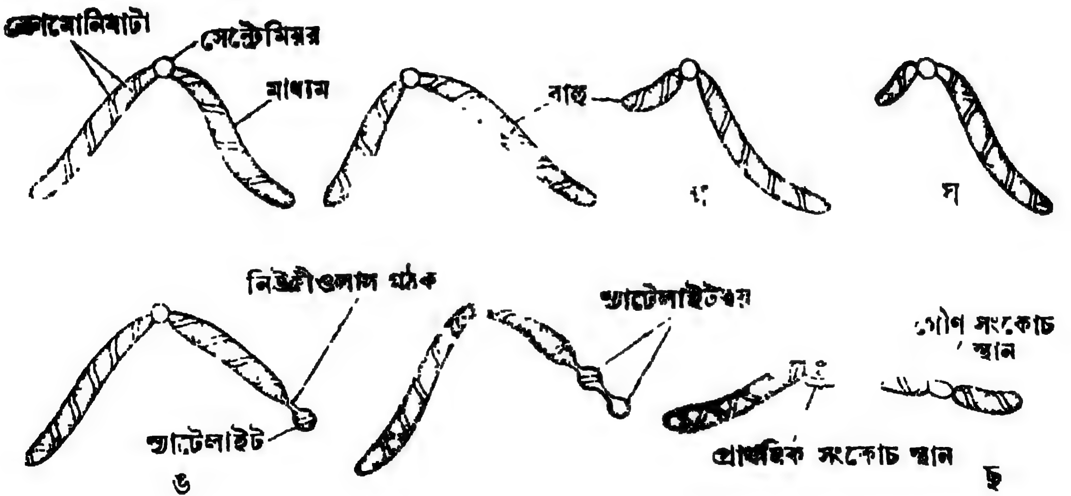
৪২নং চিত্র—ক্রোমোজোমের দুই প্রকার কুণ্ডলী দেখান হইয়াছে : (ক) প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলী এবং (খ) প্যারানেমিক কুণ্ডলী।

কুণ্ডলী বলা হয়। এই প্রকার পাক হইতে ক্রোমোনিমাগুলি সহজে আলাদা করা যায় না।

(খ) **প্যারানেমিক কুণ্ডলী** (Paranemic coil)—যখন ক্রোমোনিমা সূত্রগুলিকে পরস্পরের কুণ্ডলী হইতে সহজেই আলাদা করা যায়, তখন সেইরূপ পাককে প্যারানেমিক কুণ্ডলী বলে।

এই দুই প্রকার কুণ্ডলী ছাড়াও কোষ বিভাজনের সময় আরও বিভিন্ন ধরনের কুণ্ডলী দেখিতে পাওয়া যায়। কোষ তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদের বিভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। যেমন, বৈশিষ্ট্য-সূচক (standard), সংরক্ষিত (relic) অথবা আপেক্ষিক (relational) কুণ্ডলী ; প্রধান ও অ-প্রধান কুণ্ডলী (Major and minor coil) ইত্যাদি। ক্রোমোনিমটা একটি ম্যাট্রিক্স বা মাধ্যমের মধ্যে অবস্থান করে এবং ঐ মাধ্যমের চতুর্দিকে একটি সূক্ষ্ম আবরণ (পেলিকল) থাকে—পূর্বেকার এই ধারণা বর্তমান অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণে কোন সমর্থন পাওয়া যায় নাই।

মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোমের উপর সাধারণত একটি খাঁজ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐস্থান কোন রঞ্জক বস্তু গ্রহণ করিয়া রঞ্জিত হয় না, ফলে, উহা একটি ফাকা জায়গা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ক্রোমোজোমের এই অঞ্চলে স্পিণ্ডল তন্তু বা মাকুতন্তু যুক্ত হয় বলিয়া ইহাকে **সেণ্ট্রোমিয়ার** বা **মুখ্য সংকোচ-অঞ্চল** (Centromere or Primary Constriction) বলা হয়। সেণ্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর ক্রোমোজোমের আকৃতি বা গঠন নির্ভর করে (৪৩নং চিত্র)। সেণ্ট্রোমিয়ারের দুই পার্শ্বে অবস্থিত ক্রোমোজোমের

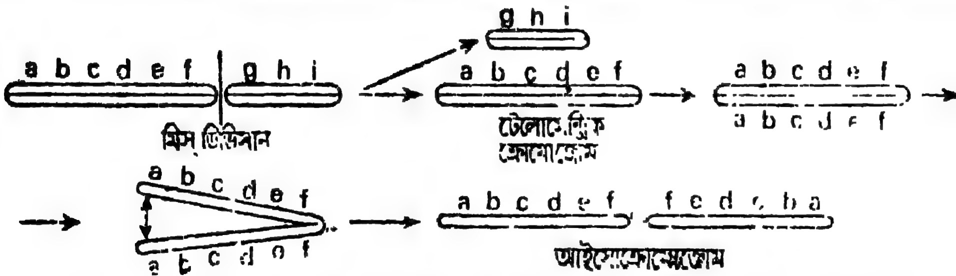


৪৩নং চিত্র—বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোজোম : (ক) মেটাসেন্ট্রিক, (খ) সাবমেটাসেন্ট্রিক, (গ) ও (ঘ) সাবটারমিনাল ; (ঙ), (চ) ও (ছ) বিভিন্ন ধরনের গৌণ সঙ্কোচযুক্ত ক্রোমোজোম। (ঙ) স্যাট-ক্রোমোজোম, (চ) দুইটি স্যাটেলাইটযুক্ত ক্রোমোজোম এবং (ছ) সাধারণ গৌণ সংকোচযুক্ত ক্রোমোজোম।

অংশকে বাহু (arm) বলা হয়। যখন সেণ্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের ঠিক মধ্য স্থানে অবস্থিত হয়, অর্থাৎ, ক্রোমোজোমের দুইটি বাহু যখন পরস্পর সমান হয় তখন, সেইরূপ ক্রোমোজোমকে **মেটাসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম** (Metacentric Chromosome) বলা হয়। মেটাসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম অ্যানাফেজ দশায় মাকুতন্তুর উপর চলাকালীন ইংরাজী অক্ষর

'V'-এর ন্যায় দেখিতে হয়। যদি সেণ্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের ঠিক মধ্য স্থলে না থাকিয়া একটু পাশে সরিয়া অবস্থান করে, অর্থাৎ একটি বাহু অপর বাহু হইতে অপেক্ষাকৃত সামান্য ছোট হয়, তখন সেইরূপ ক্রোমোজোমকে **সাবমেটাসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম** (Sub-metacentric Chromosome) বলে। সেণ্ট্রোমিয়ার যদি ক্রোমোজোমের এক পার্শ্বে থাকে, অর্থাৎ সেণ্ট্রোমিয়ারের পর যদি একদিকের বাহু খুব সামান্য থাকে তাহা হইলে সেইরূপ ক্রোমোজোমকে **সাবটারমিনাল ক্রোমোজোম** (Sub-terminal Chromosome বলা হয়। এইরূপ ক্রোমোজোম মাকুতন্তুর উপর চলাকালীন ইংরাজী অক্ষর "J" আকৃতির ন্যায় হয়। যে ক্রোমোজোমে সেণ্ট্রোমিয়ার এক প্রান্তে অবস্থান করে সেই ক্রোমোজোমকে **টেলোসেণ্ট্রিক** বা **অ্যাক্রোসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম** (Telocentric or acrocentric Chromosome) বলে। প্রকৃত অর্থে টেলোসেণ্ট্রিক বা অ্যাক্রোসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোমে সেণ্ট্রোমিয়ারের পর ক্রোমোজোম বাহুর কোন অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেইরূপ দেখা যায় না, সামান্যতম ক্রোমোজোম বাহু থাকিয়া যায়। সেই কারণে, প্রকৃত টেলোসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম খুবই বিরল। টেলোসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম অ্যানাফেজ দশায় একটি দণ্ডের ন্যায় অবস্থান করিয়া মেরুর দিকে ধাবিত হয়।

ডার্লিংটন ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম লক্ষ্য করিলেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে, সেণ্ট্রোমিয়ারে লম্বচ্ছেদ না হইয়া প্রস্থচ্ছেদ হইতেছে। সেণ্ট্রোমিয়ারের এই প্রস্থচ্ছেদকে তিনি মিস্‌-ডিভিসান (misdivision) অ্যাখ্যা দিলেন। ইহার ফলে একটি ক্রোমোজোম হইতে দুইটি টেলোসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোমের উৎপত্তি হইতে পারে। তিনি ইহাও লক্ষ্য করিলেন



৪৪নং চিত্র—সেণ্ট্রোমিয়ারের মিসডিভিসানের ফলে উৎপন্ন টেলোসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম হইতে আইসোক্রোমোজোমের উৎপত্তি।

যে এইরূপে উৎপন্ন টেলোসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোমগুলি স্বাভাবিক ক্রোমোজোমরূপে অবস্থান করিতেছে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে উহারা **আইসো-ক্রোমোজোমে** পরিণত হইয়া যাইতেছে (৪৪নং চিত্র)। সুতরাং আইসো-ক্রোমোজোম (Isochromosome) হইতেছে একটি মেটাসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম যাহার দুইটি বাহু শুধুমাত্র যে পরস্পর সমান তাহা নয়, উহাদের একটি অপরটির যেন ঠিক আয়নার প্রতিবিম্ব (mirror image)।

সেণ্ট্রোমিয়ার বা মুখ্য সংকোচ-অঞ্চল (Centromere or Primary Constriction):

সেণ্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেণ্ট্রোমিয়ারের সহিত মেটাফেজ দশায়, স্পিণ্ডল বা মাকুতন্তুর সংযোগ স্থাপিত হয় এবং ফলে বিচ্ছিন্ন ক্রোমো-

টিড্দ্বয় দুই মেরুর দিকে ধাবিত হইতে পারে ও অবশেষে নিউক্লিয়াসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। সেণ্ট্রোমিয়ার না থাকিলে ক্রোমোজোমের অস্তিত্ব লোপ পায়; কারণ, মাকুতন্তুর সহিত যুক্ত হইতে না পারিলে ক্রোমোজোমের চলন সম্ভব হয় না, ফলে অপত্য নিউক্লিয়াসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে না পারিয়া ক্রোমোজোমের অবলুপ্তি ঘটে। উপরের যে ধরনের সেণ্ট্রোমিয়ারের কথা উল্লেখ করা হইল তাহা ক্রোমোজোমের কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া তাহাদের স্থানিক বা সীমাবদ্ধ সেণ্ট্রোমিয়ার (Localized centromere) বলা হয়। বহু উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ আছে যেখানে একাধিক সেণ্ট্রোমিয়ার দেখা যায়; যখন ক্রোমোজোমে একটি সেণ্ট্রোমিয়ার থাকে, সেই ক্রোমোজোমকে **মনোসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম** (Monocentric chromosome); দুইটি সেণ্ট্রোমিয়ার থাকিলে **ডাইসেণ্ট্রিক** (dicentric); এবং দুই-এর অধিক থাকিলে **পলিসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম** (Polycentric chromosome) বলে। গম গাছের কয়েকটি প্রজাপতির (Triticum sp.) মধ্যে দুইটি সেণ্ট্রোমিয়ার এবং কলাগাছের কয়েকটি প্রজাপতির (Musa sp.) মধ্যে দুই-এর অধিক সেণ্ট্রোমিয়ার দেখিতে পাওয়া যায়। পলিসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোমের একাধিক স্থানে মাকুতন্তুর সংযোগ স্থাপন হয় বলিয়া ক্রোমাটিড্দ্বয় পরস্পর সমান্তরালভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুই মেরুর দিকে ধাবিত হয়। ইহা ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন, **লুজুলা পারপিউরিয়া** (Luzula purpurea), জানকেসী (zuncaceae) গোত্রভুক্ত উদ্ভিদ, **অ্যাসকারিস মেগালোসেফালা** (Ascaris megalocephala) নামক এক প্রকার প্রাণী, ইত্যাদি ডিফিউজ সেণ্ট্রোমিয়ার (Diffuse centromere) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের উপর কোন সংকোচ স্থান লক্ষিত হয় না। এই ধারণা করা হয় যে, সেণ্ট্রোমিয়ার বস্তুসমূহ সমগ্র ক্রোমোজোমের উপর বিস্তৃত থাকে; এবং সেই কারণে কোন নির্দিষ্ট স্থানের পরিবর্তে সমগ্র ক্রোমোজোমটি মাকুতন্তুর সহিত অনুদৈর্ঘ্য সংযুক্ত হয় ও অ্যানাফেজ দশায় মাকুতন্তুর উপর দিয়া মেরু অঞ্চলে পৌঁছায়।

মনোসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোমে, ক্রোমোজোম ভাঙ্গিয়া গেলে, ভগ্ন অংশে যদি সেণ্ট্রোমিয়ার না থাকে, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব লোপ পায়। কিন্তু ডিফিউজ সেণ্ট্রোমিয়ারের ক্ষেত্রে ভগ্ন অংশও একটি ক্রোমোজোমরূপে অবস্থান করিতে পারে। **লুজুলা পারপিউরিয়ার** ক্রোমোজোম সংখ্যা $2n=6$। কিন্তু **লুজুলা গণটির** অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে অধিক সংখ্যক ক্রোমোজোম দেখা যায়, যেমন, $2n=12$, 24, 48 এবং 96। এই স্থলে একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল যে ক্রোমোজোম সংখ্যার বৃদ্ধি সাথে ইহাদের আকারও ক্রমশ ছোট হইয়া গিয়াছে। সেই কারণে ইহা ধারণা করা হইয়াছে যে, বিশেষত লুজুলার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টি (speciation) ক্রোমোজোম ভগ্নকরণ পদ্ধতির (Fragmentation) দ্বারা হইয়াছে।

পূর্বে যখন সেণ্ট্রোমিয়ার গঠন সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা ছিল না, তখন ইহার আকৃতি ও কি কি বস্তু বা উপাদান হইয়া সেণ্ট্রোমিয়ার অঞ্চল গঠিত

তাহার সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণ নানা প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। ব্যাখ্যাগুলি নিম্নরূপ :—

(ক) মধ্যস্থলে একটি ক্রোমাটিক্ বস্তুকে ঘিরিয়া অ্যা-ক্রোমাটিক বস্তুর অবস্থান।

(খ) অনেকগুলি জিনের সংমিশ্রণে সেণ্ট্রোমিয়ার গঠিত (ডার্লিংটন, 1940)

(গ) অপেক্ষাকৃত ঘন তরল বস্তুর সমন্বয়।

(ঘ) ক্রোমোনিমা সূত্রের একটি বিশেষ অংশ (জিনোনিমা)।

সম্প্রতিকালে, Tjio এবং Leven নামক বৈজ্ঞানিকদ্বয় অক্সিকুইনোলিনের (Oxyquinolene) সাহায্যে সেণ্ট্রোমিয়ারের গঠন প্রকৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন (৪৩নং চিত্র) তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, মেটাফেজ ক্রোমোজোমে সেণ্ট্রোমিয়ার চারিটি ক্রোমোমিয়ার লইয়া গঠিত হয়। দুইটি করিয়া ক্রোমোমিয়ার পরস্পরের সহিত একটি সূক্ষ্ম সূত্রের দ্বারা যুক্ত থাকে। যুক্ত ক্রোমোটিডদ্বয়, অন্যদিকে, দুই ক্রোমোজোম বাহুর সহিত সূক্ষ্ম সূত্রের সাহায্যে যুক্ত থাকে।



৪৩নং চিত্র—সেণ্ট্রোমিয়ারের গঠন

ডিফিউজ সেণ্ট্রোমিয়ারকে কেন্দ্রীভূত সেণ্ট্রোমিয়ার গঠনের প্রারম্ভিক অবস্থা বলা যাইতে পারে। উদ্ভিদ জগতে ক্রোমোজোম অভিব্যক্তির সহিত সেণ্ট্রোমিয়ারের অভিব্যক্তিরও একটি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মিক্সোফাইসিস নামক নীলাভ-সবুজ শৈবালের ক্ষেত্রে প্রকৃত নিউক্লিয়াস দেখা যায় না, ইহার পরিবর্তে সেখানে সেণ্ট্রাল বডি (Central body) বিদ্যমান। ইহাদের কোন ক্রোমোজোম থাকে না। কিন্তু DNA, প্রোটিন প্রভৃতি বংশগতি-জনিত পদার্থ আছে। ঐ সকল পদার্থসমূহ কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান না করিয়া সাইটোপ্লাজমে পরিব্যাপ্তি লাভ করে। ইহাকেই ক্রোমোজোম অভিব্যক্তির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে বংশগতির পদার্থ সমূহ একত্র হইয়া সূত্রাকারে ক্রোমোজোম দেহ গঠন করে। কিন্তু তখনও কর্ম-ভিত্তিক অঙ্গসংস্থান সম্পূর্ণ হয় নাই। সেণ্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের সারাদেহে পরিব্যাপ্ত (Diffused condition) রহিয়াছে। যেমন, কসমেরিয়াম ও অন্যান্য শৈবাল এবং লুজুলা ইত্যাদি। ইহার পর আমরা দেখিতে পাই যে সেণ্ট্রোমিয়ার বস্তু ক্রোমোজোমের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া পলিসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম গঠন করে এবং তাহার পর ক্রমে ডাইসেণ্ট্রিক ও অবশেষে মনোসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোমের সৃষ্টি হয়।

গৌণ সংকোচ (Secondary constriction)—প্রাথমিক বা মুখ্য সংকোচ ছাড়া ক্রোমোজোমে আরও একটি সংকোচ স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে গৌণ সংকোচ বলে। এই গৌণ সংকোচ একটি ক্রোমোজোমের পক্ষে অপরিহার্য না হইলেও তাহা একটি কোষের ক্রোমোজোম সমষ্টির পক্ষে অপরিহার্য। কারণ গৌণ সংকোচের কার্য হইল নিউক্লিওলাস গঠন করা (Gates and others)। সংকোচ স্থানের পর

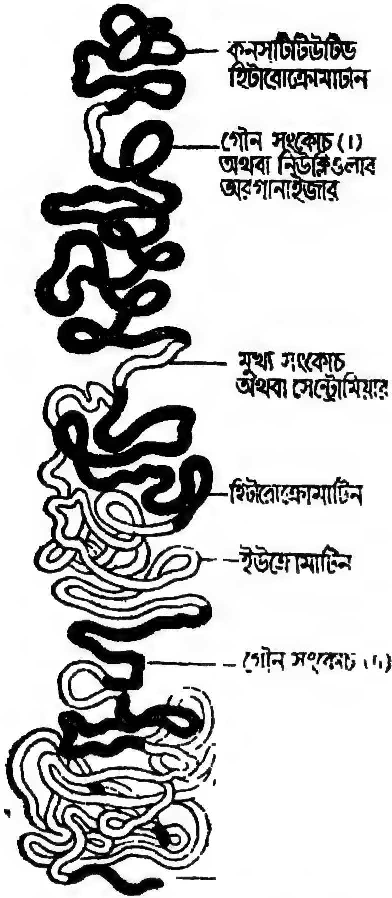
যদি ক্রোমোজোম বাহু খুব সামান্য বর্তমান থাকে এবং তাহা অতি সূক্ষ্ম সূত্রের সাহায্যে মূল বাহুর সহিত সংযুক্ত থাকিয়া একটু দূরে অবস্থান করে তাহা হইলে সেইরূপ ক্ষুদ্র বাহুকে স্যাটেলাইট বলে এবং ঐ প্রকার স্যাটেলাইট যুক্ত ক্রোমোজোমকে স্যাট-ক্রোমোজোম বলে (৪৩ ঙ-নং চিত্র)। অনেক ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমে একাধিক গৌণ সংকোচ দেখিতে পাওয়া যায়।

যে বস্তু হইতে নিউক্লিওলাস গঠিত হয় তাহাকে "নিউক্লিওলার অরগ্যানাইজার" (Neucleolar organiser) বলা হয়। বৈজ্ঞানিক Klingstedt-এর মতে এই বস্তুটি একটি বিশেষ ধরনের হিটারোক্রোমাটিন যাহাকে **নিউক্লিওলার হিটারোক্রোমাটিন** নামে অভিহিত করা হয়। বস্তুটির কার্যক্রম সাধারণত টেলোফেজ দশা হইতে শুরু হয়। স্থিরকৃত (fixed) মেটাফেজ ক্রোমোজোমে গৌণ-সংকোচ অংশটি সাধারণত সম্প্রসারিত দেখা যায়। ইহার কারণ, সম্ভবত, রাসায়নিক দ্রব্যের পূর্ব-প্রয়োগের (Pre-treatment) জন্য ক্রোমোনিমা সূত্রের কুণ্ডলী, ঐ অংশে খুলিয়া যায় এবং তাহার ফলে সংকোচ স্থানটি প্রসারিত হইয়া পড়ে। কিন্তু সেণ্ট্রোমিয়ার অংশের এইরূপ কোন আচরণ লক্ষ্য করা যায় না। দুইটি সংকোচ-স্থানের এইরূপ আচরণবিধি উহাদের গঠন পার্থক্য নির্দেশ করে।

ইউক্রোমাটিন ও হিটারোক্রোমাটিন (Euchromatin and Heterochromatin (৪৬নং চিত্র) :

ক্রোমোজোম যে বস্তুর দ্বারা গঠিত তাহাকে ক্রোমোটিন বলে। DNA, নিউক্লিও প্রোটিন ও অন্যান্য বস্তুর সংমিশ্রণে যে বস্তুটি (ক্রোমোনিউক্লিক অ্যাসিড) গঠিত হয় তাহাকেই ক্রোমাটিন বলে। ক্রোমাটিন দুই প্রকার ; যথা, ইউক্রোমাটিন এবং হিটারো-ক্রোমাটিন। বৈজ্ঞানিক Heitz (1928) ক্রোমাটিনের এই দুইটি সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহার মতে ইউক্রোমাটিন এমন একটি বস্তু যাহা টেলোফেজ দশায় অদৃশ্য (dispersed) হইয়া যায় ; অপরদিকে, হিটারোক্রোমাটিন ইণ্টারফেজ ও প্রারম্ভিক প্রোফেজ দশায় সংঘবদ্ধ বা ঘনীভূত অবস্থায় থাকিয়া ক্রোমোসেণ্টার (Chromocentres) গঠন করে। Pontecorvo রঞ্জক গ্রহণের বৈসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই দুই ক্রোমাটিনের মধ্যে পার্থক্য ঠিক করিয়াছেন। তাঁহার মতে হিটারোক্রোমাটিন অংশ যে সময় রঞ্জক গ্রহণ করে ইউক্রোমাটিন অংশ সেই সময় রঞ্জক গ্রহণ করে না। সাধারণত সক্রিয় মাইটোসিসের সময় ইউক্রোমাটিক অংশ অধিক পরিমাণে রঞ্জক গ্রহণ করিয়া বেশী উজ্জ্বল হয়। রঞ্জক গ্রহণ ছাড়াও কার্যের দিক হইতেও ইউক্রোমাটিন ও হিটারোক্রোমোটিনের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। হিটারোক্রোমাটিন অংশে তুলনামূলকভাবে ইউক্রোমাটিন অংশ অপেক্ষা 2 হইতে 3 গুণ অধিক DNA থাকে ; কিন্তু এই অংশের DNA সক্রিয় থাকে না অর্থাৎ প্রোটিন ও RNA সংশ্লেষ (transcription) বন্ধ থাকে। শুধু তাহাই নয়, হিটারোক্রোমাটিন অংশে DNA সংশ্লেষ ইউক্রোমাটিন অংশ হইতে ভিন্ন সময় সম্পন্ন হয়।

হিটারোক্রোমাটিন সাধারণত মুখ্য ও গৌণ সংকোচের দুই পার্শ্বে অবস্থিত থাকে। ইহা ক্রোমোজোমের শেষ প্রান্তে (telomere) বা ক্রোমোজোম দেহের যে কোন স্থানে (intercalary) অবস্থিত হইতে পারে। কখনও কখনও সম্পূর্ণ ক্রোমোজোম দেহ হিটারোক্রোমাটিন দ্বারা গঠিত হইতে পারে, যেমন x ও y ক্রোমোজোম। প্রধানত দুই প্রকার হিটারোক্রোমাটিন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, কন্স্টিটিউটিভ্ ও ফ্যাকালটেটিভ্ হিটারোক্রোমাটিন। (Constitutive and Facultative Heterochromatin)। ফ্যাকালটেটিভ্ হিটারোক্রোমাটিন সাধারণত উদ্ভিদ কোষে দেখিতে পাওয়া যায় না।



৪৬নং চিত্র—কনসটিটিউটিভ্ হিটারোক্রোমাটিনের একটি নকশা চিত্র। ক্রোমোজোমসূত্রের কালো রঙ করা অংশ হিটারোক্রোমাটিন এবং বর্ণহীন অংশ ইউক্রোমাটিন দ্বারা গঠিত।

(ক) **কন্স্টিটিউটিভ্ হিটারোক্রোমাটিন**—সাধারণ হিটারোক্রোমাটিন যাহা প্রায় সকল ক্রোমোজোমে দেখা যায়। ইহা সেন্ট্রোমিয়ার, গৌণ সংকোচ, টেলোমিয়ার, ক্রোমোজোম বাহুর অন্তর্বর্তী স্থান, ব্যাণ্ড অঞ্চল ইত্যাদি স্থানে অবস্থান করে। এই প্রকার হিটারোক্রোমাটিনে DNA সংশ্লেষ অপেক্ষাকৃত দেরীতে (G_2) সম্পন্ন হয়।

(খ) **ফ্যাকালটেটিভ্ হিটারোক্রোমাটিন**—ইহা প্রয়োজন অনুসারে হিউক্রোমাটিনে রূপান্তরিত হইতে পারে এবং এক ধরনের নিয়ামক বা নিয়ন্ত্রক হিসাবে কার্য করে। ইহা অপ্রত্যক্ষ ভাবে প্রজাতির যৌন পার্থক্য নিয়ন্ত্রণের সহিত যুক্ত।

ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন

(Chemical structure of Chromosome)

ক্রোমোজোমের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া উহা কোন্ কোন্ বস্তু দ্বারা গঠিত তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। ক্রোমোজোম প্রধানত চারিপ্রকার বৃহৎ অণু দ্বারা গঠিত। এই অণুগুলি হইল : DNA, অর্থাৎ ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (Deoxyribonucleic) ; RNA, অর্থাৎ রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (Ribonucleic acid), স্বল্প আণবিক ওজন বিশিষ্ট বেসিক, প্রোটিন, যথা, হিস্টোন (Histone) এবং অধিক

আণবিক ওজন বিশিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত জটিল, অ্যাসিডিক্ প্রোটিন, যাহাকে অনেক সময় রেসিডুয়াল প্রোটিনও বলা হয়, যথা, ট্রিপ্টোফেন (Tryptophane) ঃ কোন কোন শুক্রাণুর ক্রোমোজোমে হিস্টোনের পরিবর্তে উহার সমগোত্রীয় প্রোটিন, প্রোটামিন থাকে। এই সকল বস্তু ছাড়াও লিপিড, ক্যালসিয়াম (Ca^{++}), ম্যাগনেসিয়াম (Mg^{++}), আয়রণ (Fe^{++}) এবং DNA প্রস্তুতকারক এন্‌জাইম DNA-পলিমারেজ পাওয়া যায়।

ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত যাহা কিছু জানিতে পারা গিয়াছে তাহার পিছনে বিজ্ঞানী Mirsky এবং Ris ও তাঁহাদের অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দের অবদান অপরিসীম। প্রধানত এই দুই বিজ্ঞানী ও অন্যান্য সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় বর্তমানে ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠনের একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া গিয়াছে। ক্রোমোজোমকে নিউক্লিয়াস হইতে পৃথক করিয়া উহার রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে সেখানে শতকরা 60 হইতে 90 ভাগ (60 to 90%) DNA এবং হিস্টোন লবণের ন্যায় যৌগ গঠন করিয়া অবস্থান করে। বিভাজিত হইতেছে এইরূপ কোষে এই দুই বস্তু (DNA ও হিস্টোন) প্রায় সমপরিমাণে পাওয়া যায়। RNA ও অ্যাসিডিক প্রোটিন, DNA-হিস্টোনের ন্যায় আরও একটি বৃহৎ যৌগ লবণ অণু গঠন করে। অধিক আণবিক ওজন বিশিষ্ট অ্যাসিডিক প্রোটিনের পরিমাণ কোষের ধরনের উপর নির্ভর করে। এই ধরনের প্রোটিন ক্রোমোজোমের শতকরা 5 হইতে 50 ভাগ পর্যন্ত অংশ গঠন করিয়া থাকে। RNA, অ্যাসিডিক প্রোটিনের সহিত যৌগ লবণ গঠন করিলেও উহার পরিমাণ কোষের বিপাকীয় অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেমন, থাইমাস (Thymus) কোষে মোট অ্যাসিডিক প্রোটিনের শতকরা 3 ভাগ (3%) এবং লিভার (Liver) কোষে শতকরা 12 ভাগ (12%) আর এন এ। নিউক্লিও-হিস্টোনের পরিমাণ কোষের বিপাকীয় অবস্থার উপর নির্ভর করে না। ইহার পরিমাণ কোষের মধ্যে মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে, শুধু তাহাই নয়, ক্রোমোজোম সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত উহার পরিমাণও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়।

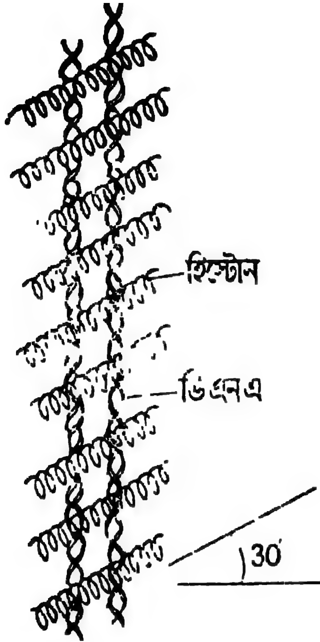
সুতরাং ক্রোমোজোমের রাসায়নিক সংগঠনের দিক হইতে দেখা যাইতেছে যে এখানে প্রধানত দুইটি বৃহৎ অণু (macromolecule) আছে ঃ নিউক্লিও-হিস্টোন যৌগ (nucleo-histone complex) এবং RNA-অ্যাসিডিক প্রোটিন যৌগ (RNA-acidic protein complex)। DNA-হিস্টোন যৌগ ক্রোমোজোমের মূল দেহ গঠনে সহায়তা করে। ক্রোমোজোমের সূত্রবৎ আকৃতিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের কিছু ভূমিকা রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়, কারণ নিষ্কর্ষণ প্রক্রিয়ায় এই দুই ডাই-ভ্যালেন্ট ক্যাটায়ন ক্রোমোজোম হইতে বহিষ্কার করিলে তাহার সাংগঠনিক অবস্থা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ ক্রোমোজোম টুকরো টুকরো হইয়া যায়।

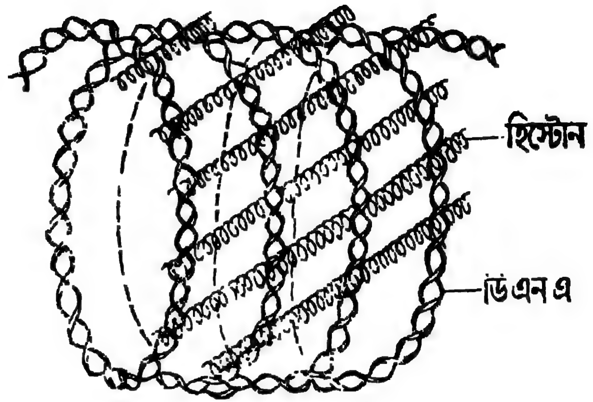
হিস্টোন প্রোটিনের মধ্যে লাইসিন (Lysine) ও আরজিনিন (Arginine) এই দুই অ্যামিনো অ্যাসিডের মাত্রা অধিক থাকে। ইহা বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে, মটরশুটি-

গাছের কোষে প্রায় সাত প্রকার হিস্টোনের উপস্থিতি জানিতে পারা গিয়াছে। নিম্নে হিস্টোনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :—

(ক) হিস্টোনের আণবিক ওজন খুবই অল্প

(খ) হিস্টোন পজিটিভ্ চার্জ যুক্ত কিন্তু DNA নেগেটিভ চার্জ যুক্ত। DNA ও হিস্টোন একত্রে যৌগ লবণ গঠন করে বলিয়া পরস্পরের ভারসাম্য রক্ষা হইয়াছে।





৪৭নং চিত্র—ডি এন এ ও হিস্টোনের সম্ভাব্য পারস্পরিক অবস্থান

(গ) হিস্টোনের দুইটি প্রধান অংশ লাইসিন ও আরজিনিন্। ইহাদের সহজে পৃথক করা যায়। এই দুই অ্যামিনো অ্যাসিড পুষ্ট অংশ একই অনুপাতে থাকিলেও ইহাদের পরিমাণ সকল হিস্টোন অণুর মধ্যে নির্দিষ্ট নয়। উপরন্তু কোষের বিপাকীয় অবস্থার উপর ইহাদের যে কোন একটির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। বিজ্ঞানী Ansley (1957, 1958) দেখাইয়াছেন যে সাধারণত ক্রোমোজোমের জোড় বাঁধার সময় (homologus pairing) লাইসিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) DNA যখন তাহার অনুলিপি গঠন করে সেই সময় হিস্টোনও তাহার অনুলিপি গঠন করে।

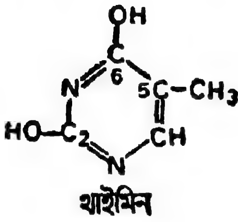
(ঙ) হিস্টোন, নিউক্লিক অ্যাসিডের ঘন সন্নিবেশে সাহায্য করে কারণ, নিষ্কর্ষণ (extraction) পদ্ধতির দ্বারা হিস্টোনকে DNA-হিস্টোন যৌগ হইতে পৃথক করিলে DNA-এর দৈর্ঘ্য প্রায় দ্বিগুণ হইতে দেখা যায় (৪৭নং চিত্র)।

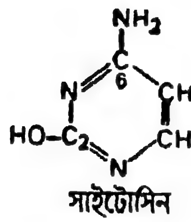
(চ) বিজ্ঞানী Stedman (Stedman and Stedman, 1951)-এর মতে হিস্টোন জিনের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণ মেসেঞ্জার-RNA (*m*-RNA) প্রস্তুতকরণে বাধাদানের মাধ্যমে ঘটিয়া থাকে। বিজ্ঞানী Bonner এবং তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ (Huang and Bonner, 1962) মটরশুঁটি গাছে হিস্টোনের এই প্রকার কার্য লক্ষ্য করিয়াছেন।

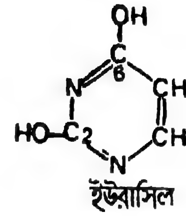
কিন্তু ভাইরাসের ক্ষেত্রে হিস্টোন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে কার্য করে। সেখানে হিস্টোনের অনুরূপ প্রোটিন রাইবোজোমের সহিত জটিল যোগ গঠন করিয়া DNA-এর কার্য নিয়ন্ত্রণ করে।

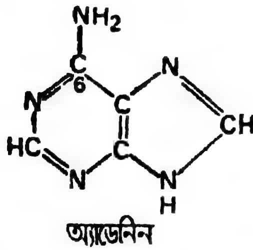
নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid)

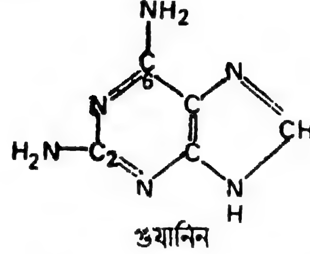
দুই প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায়—DNA এবং RNA ; ডি অক্সিরাইবো-নিউক্লিক অ্যাসিড সংক্ষেপে ডি এন এ (DNA) এবং রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড সংক্ষেপে আর এন এ (RNA)। DNA সকল সময় নিউক্লিয়াসের মধ্যে পাওয়া যায় কিন্তু RNA প্রধানত সাইটোপ্লাজমের মধ্যে পাওয়া যায়। নিউক্লিক অ্যাসিড দীর্ঘ-সূত্রের ন্যায়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে ইহাকে অনেকটা পাকান দড়ির মত দেখায়। ইহা ফসফেট ও 5-কার্বন শর্করা অণু দ্বারা গঠিত। শর্করার পাশে একটি ক্ষুদ্র নাইট্রোজেন-জনিত উপাদান লাগান থাকে। এই নাইট্রোজেন-জনিত উপাদানকে 'বেস'







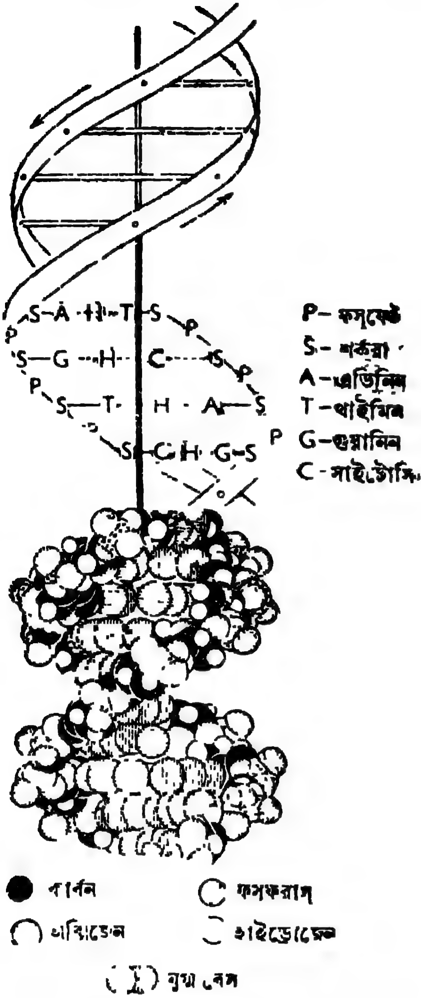




৪৮নং চিত্র—বিভিন্ন ধরনের বেস যাহা আর এন এ ও ডি এন এ অণুর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

বলা হয়। DNA ও RNA-এর রাসায়নিক গঠন প্রকৃতির মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। DNA-এর মধ্যে যে শর্করা তাহা ডি-অক্সিরাইবোজ জাতীয় এবং RNA-এর মধ্যে যে শর্করা তাহা শুধু রাইবোজ জাতীয়। এই দুইটি নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে আরও একটু পার্থক্য দেখা যায়। তাহা হইল, ইহাদের নাইট্রোজেন-জনিত উপাদান বেসের মধ্যে। এই দুই প্রকার অ্যাসিডের মধ্যে, অ্যাডিনিন (Adenine), গুয়ানিন (Guanine) এবং সাইটোসিন (Cytosine), এই তিন প্রকার সাধারণ বেস আছে। কিন্তু DNA-এর মধ্যে যে চতুর্থ বেসটি আছে তাহা হইল, থাইমিন (Thymine) এবং RNA-এর মধ্যে ইউরাসিল (Uracil)। অ্যাডেনিন ও গুয়ানিনকে পিউরিন (Purine) বেস এবং থাইমিন (ইউরাসিল) সাইটোসিনকে পিরিমিডিন (Pyrimidin) বেস বলে (৪৮নং চিত্র)।

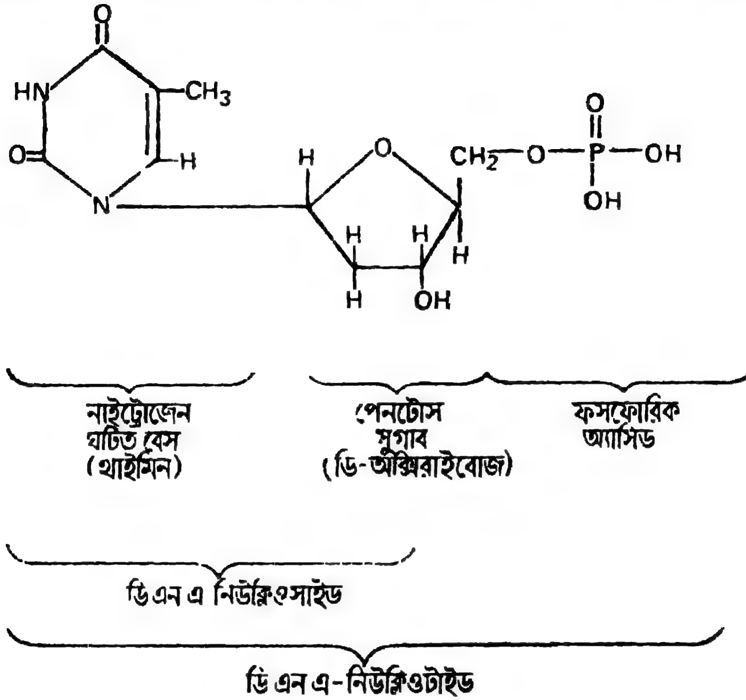
DNA-এর গঠন প্রণালী (Structure of DNA)—সাধারণভাবে DNA একটি দীর্ঘ, শৃঙ্খলের ন্যায়, অ-শাখ (শাখা-হীন) পলিমেরিক অণু রূপে অবস্থান করে। ইহার গঠন প্রণালীর সমাধানের পিছনে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অপরিসীম অবদান রহিয়াছে। বিজ্ঞানী Wilkins এবং তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ, Frankling এবং Gosling প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ DNA-অণুর (molecule) X-ray বিচ্ছুরণ চিত্রের বিশ্লেষণ করেন, কিন্তু এই বিচ্ছুরণ চিত্রের কিছু কারিগরী ত্রুটির জন্য তাঁহারা DNA-এর গঠন সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা করিতে পারেন নাই। তবে এই বিশাল অণুর মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন পরমাণুগুলির মধ্যে যে কিছু স্থান সংক্রান্ত সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত দেন। পরবর্তীকালে, ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে James D. Watson এবং Francis H. C. Crick উন্নত ধরনের X-ray বিচ্ছুরণ (diffraction) চিত্রের সাহায্যে তাঁহাদের বিখ্যাত "দ্বি-সূত্র-প্যাঁচাল" (Double helical) গঠন প্রকৃতি বিশদভাবে বিবৃত করেন (৪৯নং চিত্র)। Watson এবং Crick-এর DNA অণুর গঠন প্রকৃতির ব্যাখ্যা অন্যান্য পরীক্ষার, যেমন, এনজাইমের সাহায্যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ, তেজস্ক্রিয় বস্তুর (radioactive substances) সাহায্যে পরীক্ষা, প্রভৃতি দ্বারা অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

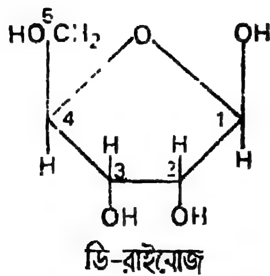


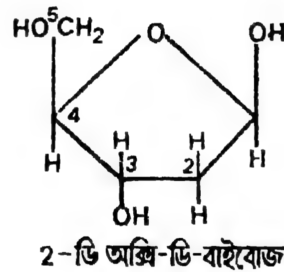
৪৯নং চিত্র—Watson and Crick-এর মতে একটি DNA অণুর আকৃতি

ওয়াটসন ও ক্রীকের রচিত নকশা (model) অনুসারে DNA অণু দুইটি সূত্রের (শৃঙ্খল) সমষ্টি। এই শৃঙ্খল দুইটি পরস্পরকে প্যাঁচাইয়া অবস্থান করে। এইরূপে অবস্থান কালে উহাদের একটির বেস অপরটির বেসের সহিত একটি নির্দিষ্ট নিয়মে যথোপযুক্ত স্থানে যুক্ত থাকে। প্রতিটি DNA শৃঙ্খল (chain) সাধারণভাবে, চারি প্রকার নিউক্লিওটাইড বা মনোমার (nucleotides or monomers) লইয়া গঠিত। এই নিউক্লিওটাইডগুলিকে ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিওটাইড (de-oxyribo nucleotides) বলা হয়। বেসের নামানুসারে নিউক্লিওটাইডগুলির বিভিন্ন নামকরণ করা হইয়াছে, যেমন, ডি-অক্সিথাইমিডিলেট (৫০নং চিত্র), ডি-অক্সিসাইটিডিলেট, ডি-অক্সিগুয়ানাইলেট ও ডি-অক্সিঅ্যাডেনাইলেট। এই চারি প্রকার নিউক্লিওটাইড একের পর এক সারিবদ্ধ-

ভাবে এবং যে-কোন নিয়মে সজ্জিত হইয়া এক দিকের শৃঙ্খল গঠন করে। প্রতিটি নিউক্লিওটাইড, একটি ফসফেট (PO_4) একটি 5-কার্বনযুক্ত শর্করা ও একটি নাইট্রোজেন জনিত বেস লইয়া গঠিত হয়। 5-কার্বনযুক্ত শর্করার একদিকে 5নং কার্বনের সহিত ফসফেট (এস্টার লিংকেজের সাহায্যে) যুক্ত থাকে এবং অপরদিকে ইহার 1নং কার্বনের সহিত যে কোন একটি (চারিটির মধ্যে) নাইট্রোজেন-জনিত বেস যুক্ত থাকে। DNA অণুর এক দিকের শৃঙ্খলের মধ্যে নিউক্লিওটাইডগুলি পরস্পর ফসফেট গ্রুপের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। অর্থাৎ একটি নিউক্লিওটাইডের ফসফেট গ্রুপ অপর নিউক্লিওটাইডের





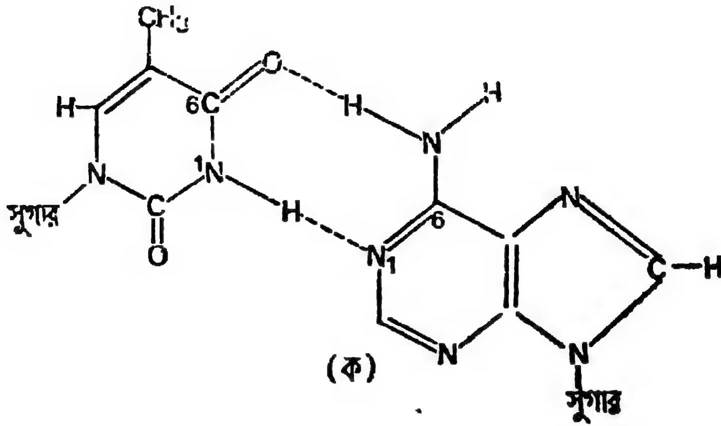


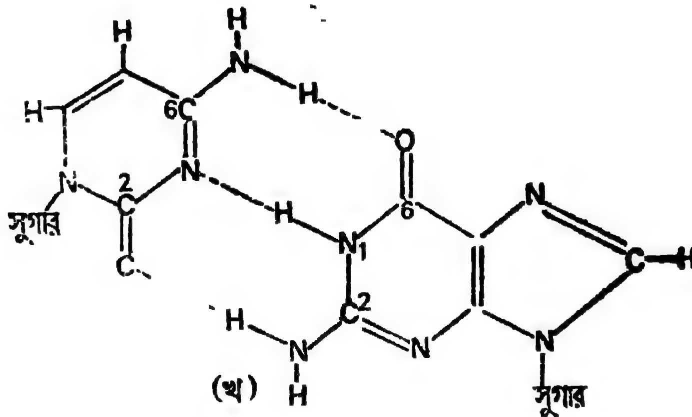
৫০নং চিত্র—একটি নিউক্লিওটাইড ডি-অক্সি-থাইমিডিডেট ও দুই প্রকার শর্করা : ডি-রাইবোজ এবং 2-ডি-অক্সি-ডি-রাইবোজ।

5-কার্বনযুক্ত শর্করার 3নং কার্বনের সহিত যুক্ত থাকে। এইরূপে ফসফেট ও শর্করার সাহায্যে DNA অণুর এক দিকের শৃঙ্খলের বা সূত্রের মূল কাঠাম তৈরী হয়। এইরূপ দুইটি সূত্র পরস্পর বেসগুলির মাধ্যমে যুক্ত হইয়া একটি DNA অণু গঠন করে। DNA অণুর এই নকশাকে একটি "পাক-খাওয়া" মই-এর সহিত তুলনা করা যাইতে

পারে যাহার দুই পাশ ফসফেট ও শর্করা দ্বারা প্রস্তুত এবং "পাদানি" হাইড্রোজেন দ্বারা যুক্ত দুইটি বেস। অসংখ্য মনোমার বা নিউক্লিওটাইড দ্বারা গঠিত হয় বলিয়া DNA-কে একটি পলিমেরিক বা পলিনিউক্লিওটাইড অণু বলা হয়।

DNA অণুর দ্বি-সূত্র পাকান নকশার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল যে একটি শৃঙ্খলের যে স্থলে অ্যাডেনিন বেস থাকে উহার বিপরীত শৃঙ্খলের ঠিক সেই স্থলে থাইমিন বেস থাকে; এবং যে স্থলে গুয়ানিন থাকে বিপরীত দিকে সেই স্থলে সাইটোসিন থাকে (RNA অণুর ক্ষেত্রে থাইমিনের পরিবর্তে ইউরাসিল A-U, থাকে)। সুতরাং একটি শৃঙ্খলের অ্যাডেনিন বেসের সহিত অপর শৃঙ্খলের থাইমিনের (A-T) এবং গুয়ানিনের সহিত অপর



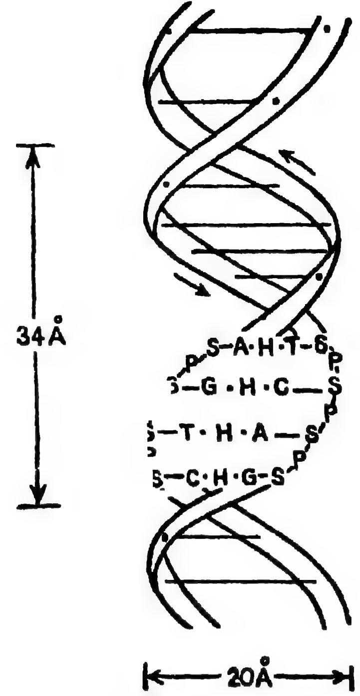


৫১নং চিত্র—ডি এন এ অণুর মধ্যে দুই জোড়া স্বাভাবিক বেসের মধ্যে স্থাপিত হাইড্রোজেন বণ্ড। (ক) থাইমিন ও অ্যাডেনিন এবং (খ) সাইটোসিন ও গুয়ানিন

শৃঙ্খলের সাইটোসিনের (G-C) হাইড্রোজেন বণ্ড স্থাপিত হয়। এই কারণে একটি নির্দিষ্ট DNA নমুনায় অ্যাডেনিনের মোলার পরিমাণ (molar amount) সকল সময় থাইমিনের মোলার পরিমাণের সহিত এবং গুয়ানিনের মোলার পরিমাণ সাইটোসিনের মোলার পরিমাণের সহিত সমান হয় অর্থাৎ A=T এবং G=C।

কতগুলি নিউক্লিওটাইড বা মনোমার লইয়া একটি DNA অণু গঠিত হয়, তাহার কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নাই। ইহার সংখ্যা একটি প্রজাতি হইতে অন্য প্রজাতির

মধ্যে তফাৎ থাকিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সংখ্যা 200,000টি বলিয়া অনুমান করা হয়। DNA-এর একটি শৃঙ্খলে বেসের ক্রম (sequence) যেমন খুশী হইতে পারে কিন্তু যখনই তাহা একটি শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হইল তখন অপর শৃঙ্খলে ইহার ঠিক বিপরীত বেস-ক্রম ধার্য হইয়া যায়। ধরা যাক, একটি DNA অণুর একটি শৃঙ্খলের বেস-ক্রম যথাক্রমে GATCATTA...... ইত্যাদি, এই ক্ষেত্রে অপর শৃঙ্খলের বেস-ক্রম সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়, ইহা যথাক্রমে CTAGTAAT......ইত্যাদি। অর্থাৎ একটি শৃঙ্খলের বেস-ক্রম জানা গেলে অপর শৃঙ্খলের বেস-ক্রম কি হইবে তাহা সহজেই বলিয়া দেওয়া বা অনুমান করা সম্ভব হয়।



৫২নং চিত্র—Watson-Crick-এর ডি এন এ নকশায় অবস্থিত দুইটি সুগার-ফসফেট (—P—S—P—) শৃঙ্খলের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখান হইয়াছে।

DNA অণুর দুইটি শৃঙ্খল পরস্পর বিপরীত-ভাবে জোড় বাঁধে এবং এই অবস্থানে তাহারা পরস্পরকে এইরূপে প্যাঁচাইয়া থাকে যে পাক না খুলিয়া দুইটি শৃঙ্খল আলাদা হইতে পারে না। শৃঙ্খলে অবস্থিত বেসগুলি দীর্ঘ অক্ষের (long axis) উপর লম্বভাবে সজ্জিত থাকে। বেসগুলির মধ্যে দূরত্ব 3.4 Å এবং যেহেতু DNA অণুর একটি সম্পূর্ণ পাক 34 Å দীর্ঘ অতএব ঐ অঞ্চলের মধ্যে কেবলমাত্র 10টি বেস থাকিতে পারে। দুইটি শৃঙ্খলের মধ্যে দূরত্ব 20 Å। জোড়বদ্ধ বেসের (A—T ও G—C) মধ্যে একটি পিউরাইন ও অপরটি পিরিমিডিন। দুইটি বেসের মধ্যে যে হাইড্রোজেন বণ্ড স্থাপিত হয়, সেই সম্পর্কে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে এখানে যে ধরনের বণ্ড দেখা যায় তাহা স্বাভাবিক নয়, অনেকটা কোভ্যালেণ্ট বণ্ডের ন্যায় হইলেও ইহা খুবই দুর্বল।



ক্রোমোজোম সংখ্যার পরিবর্তন
(Variation in Chromosome Number)

আমরা জানি যে সকল প্রজাতির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। একটি গণের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে কোন কোন প্রজাতির মধ্যে একই সংখ্যক ক্রোমোজোম আছে; আবার কোন কোন প্রজাতির মধ্যে এই সংখ্যা নানারকম, অর্থাৎ পূর্বের প্রজাতিগুলি হইতে কিছু কম বা কিছু বেশী। শুধু তাহাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে এই সংখ্যা অন্যদের গুণিতকরূপে অবস্থিত। আমরা আরও জানিয়াছি, সাধারণ ক্ষেত্রে উদ্ভিদের সোমাটিক বা দেহকোষে জননকোষ বা গ্যামেটের তুলনায় দ্বিগুণ সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। সেই জন্য সোমাটিক কোষগুলিকে ডিপ্লয়েড (diploid) এবং জনন কোষগুলিকে হ্যাপ্লয়েড (haploid) বলা হয়। দুইটি হ্যাপ্লয়েড গ্যামেটের মিলনের ফলেই (যৌনজনন) ডিপ্লয়েড জাইগোট (Zygote) উৎপন্ন হয়। সুতরাং একটি ডিপ্লয়েড প্রজাতির নিউক্লিয়াসে সকল সময় দুইটি হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম দল বা গোষ্ঠী উপস্থিত থাকে।

বর্তমানে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে; জীন (gene) ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত। সোমাটিক বা দেহকোষে প্রতিটি ক্রোমোজোম দুইবার করিয়া থাকে বলিয়া ঐ দুই জোড়া ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত প্রতিটি জীনও দুইবার করিয়া থাকে। এই দুইটি জীন পরস্পর অনুরূপ (homozygus) হইতে পারে, আবার উহাদের একটি প্রবলগুণ সম্পন্ন (dominant) এবং অন্যটি প্রচ্ছন্ন-গুণ সম্পন্ন (recessive) হইতে পারে (heterozygous)। এই প্রকার দুইটি জীনের একটিকে অপরটির অ্যালিল বলা হয়। জীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একক। প্রতি হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম-দলের উপর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের এককেরও একটি দল অবস্থান করে। হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম-দলের উপর অবস্থিত জীনের এই দলকে জীনোম (genome) বলা হয়। হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম দলে যেমন প্রতিটি ক্রোমোজোম একবার করিয়া থাকে, তেমনি জীনের এই দলে বা একটি জীনোমের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির একক সমূহ একবার করিয়া থাকে।

জীনোম বলিতে এইরূপ একদল জীনকে বুঝায় যাহারা বেসিক ক্রোমোজোম দলের উপর অবস্থান করে এবং যাহারা যৌথভাবে একটি কোষের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় জৈবনিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। একটি হ্যাপ্লয়েড কোষে, যেমন, গ্যামেটে বা লিঙ্গধর এককোষী বা লিঙ্গধর বহুকোষী উদ্ভিদের দেহকোষে, ক্রোমোজোমের একটি দল থাকে বলিয়া সেখানে জীনোমও একটি। সাধারণ দেহকোষে বা ডিপ্লয়েড কোষে ক্রোমোজোমের দুইটি দল থাকে বলিয়া সেখানে জীনোমের

সংখ্যাও দুই। হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা যেমন 'n' অক্ষর দ্বারা নির্দেশ করা হয়, অনুরূপভাবে জীনোমের সংখ্যা ও প্রকৃতি A, B, C ইত্যাদি ইংরাজী অক্ষর দ্বারা নির্দেশ করা হইয়া থাকে। অতএব হ্যাপ্লয়েড কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা n হইলে উহার জীনোম হইবে A, অনুরূপভাবে ডিপ্লয়েড কোষে ($2n$) জীনোম হইবে AA ইত্যাদি।

অসম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ জীনোমের হ্রাস-বৃদ্ধি—কোন প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা $2n=16$ ($n=8$) হইলে বুঝিতে হইবে ঐ প্রজাতির দেহকোষে (somatic cell) দুইটি সম্পূর্ণ জীনোম রহিয়াছে। ধরা যাক উহা AA। এক্ষণে, ঐ সংখ্যার উপর যদি কোন উপায়ে একটি ক্রোমোজোম বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উহার সংখ্যা হইবে $2n=17$ ($2n+1$)। সুতরাং এই প্রজাতির কোষে দুইটি সম্পূর্ণ জীনোমের উপর আরও একটি ক্রোমোজোম (যাহা তৃতীয় জীনোমের একটি অংশ মাত্র) যুক্ত হইয়াছে। অপর দিকে আবার যদি একটি ক্রোমোজোম হ্রাস পায় তাহা হইলে উহার সংখ্যা হইবে $2n=15$ ($2n-1$)। এই ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ জীনোমের সহিত আর একটি অসম্পূর্ণ জীনোম যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহাও অসম্পূর্ণ জীনোমের পর্যায়ভুক্ত হইল। এইরূপে অসম্পূর্ণ জীনোম বৃদ্ধি বা হ্রাস হইয়া যথাক্রমে, ($2n+2$) এবং ($2n-2$) প্রজাতির সৃষ্টি হইতে পারে। ক্রোমোজোম সংখ্যা যখন তাহার হ্যাপ্লয়েড সংখ্যার গুণিতকরূপে বৃদ্ধি পায়, তখন সেই বৃদ্ধিতে সম্পূর্ণ জীনোমের বৃদ্ধি হয়, যেমন, n (A)→$2n$ (AA)→$3n$ (AAA)→$4n$ (AAAA)→ইত্যাদি।

উদ্ভিদ জগতে ক্রোমোজোম সংখ্যার এই প্রকার বৃদ্ধি বা হ্রাস একই গণের অধীনে বিভিন্ন প্রজাতি, এমনকি একই প্রজাতির বিভিন্ন প্রকারের (variety) মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন **ড্যাটুরা স্ট্রামোনিয়াম** (*Datura stramonium*) একটি গুল্ম (shrub) জাতীয় উদ্ভিদ যাহার স্বাভাবিক ক্রোমোজোম সংখ্যা হইল $2n=24$; কিন্তু এই প্রজাতির বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে $2n=25$ ক্রোমোজোম দেখিতে পাওয়া যায়। **ক্রিসানথেমাম্** (*Chrysanthemum*) উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ক্রোমোজোম সংখ্যা যথাক্রমে, 18, 27, 36, 45, 54, 72 এবং 90। গম গাছের গণ **ট্রিটিকাম** (*Triticum*) উহার বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ক্রোমোজোম সংখ্যা 14, 28 এবং 42। **ন্যাফালিয়াম** (*Gnaphalium*) একটি বীরুৎ (herb) জাতীয় উদ্ভিদ, সেখানে $2n=14$ ও 28 এবং ব্লুমিয়া (*Blumea* -এর মধ্যে ক্রোমোজোম সংখ্যা, $2n=16$, 18, 20, 22 এবং 36; **সোলানাম** (*Solanum*) ও **নিকোটিয়ানা** (*Nicotiana*) এই দুইটি গণের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন, 24, 48 এবং 72। সকল ক্ষেত্রেই সাধারণ ভাবে ডিপ্লয়েড প্রজাতির গ্যামেটের মধ্যে দেহকোষের তুলনায় অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। গম গাছের ক্ষেত্রেই ধরা যাক, ট্রিট্রিকাম গণভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতিকে তিনটি দলে ভাগ করা যায়; প্রথম দলভুক্ত প্রজাতিগুলি ডিপ্লয়েড ($2n=14$); দ্বিতীয় দলভুক্ত প্রজাতিগুলি টেট্রাপ্লয়েড ($2n=28$) এবং তৃতীয়

দলভুক্ত প্রজাতিগুলি হেক্সাপ্লয়েড ($2n=42$)। নিম্নে প্রদত্ত ছকে ইহা বিশদরূপে দেখান হইল।

দল	প্রজাতি	ক্রোমোজোম সংখ্যা ($2n$)	জীনোম সূত্র
আইনকর্ণ (Einkorn)	ট্রিটিকাম মনোকক্কাম (*Triticum monococcum*)	14	AA
ডিপ্লয়েড ($2n$)	ট্রিটিকাম বায়োটিকাম (*T. bioticum*)	14	AA
ইমার (Emmer)	ট্রিটিকাম ডাইকক্কাম (*T. dicoccum*)	28	AABB
টেট্রাপ্লয়েড ($4n$)	ট্রিটিকাম ডাইকক্কয়ডিস্ (*T. dicoccoides*)	28	AABB
	ট্রিটিকাম ডুরাম (*T. durum*)	28	AABB
	ট্রিটিকাম এসটিভাম (*T. aestivum*)	42	AABBDD
হেক্সাপ্লয়েড ($6n$)	ট্রিটিকাম কম্প্যাক্টাম (*T. compactum*)	42	AABBDD
সাধারণ চাষযোগ্য গম।	ট্রিটিকাম স্পেল্টা (*T. spelta*)	42	AABBDD

ট্রিটিকাম গণে বিভিন্ন দলের প্রজাতিগুলির জনন কোষে যথাক্রমে 7, 14 ও 21টি ক্রোমোজোম থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রে 7-এর গুণিতক যথা, 7×1, 7×2 এবং 7×3। সুতরাং 7 সংখ্যাটি ট্রিটিকাম গণের সর্বনিম্ন ক্রোমোজোম সংখ্যা। ইহাকে বেসিক সংখ্যা বলে। বেসিক সংখ্যা '×' অক্ষর দ্বারা সূচিত করা হয়। অন্যান্য গণের বেসিক সংখ্যা যথা, ক্রিসানথেমাম্ (Crysanthemum), $x=9$; ন্যাফালিয়াম (Gnaphalium), $x=7$; ব্লুমিয়া (Blumea), $x=8$; এবং সোলানাম ও নিকোটিয়ানায় (Solanum and Nicotiana) $x=12$।

ক্রোমোজোমের সংখ্যা পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন সংজ্ঞা—উপরের আলোচনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে ক্রোমোজোম সংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস দুইটি প্রধান পরিস্থিতির উদ্ভব করিতেছে। একদিকে বৃদ্ধি ও হ্রাসকরণে অসম্পূর্ণ জীনোম জড়িত, অপর দিকে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যার গুণিতকরূপে সম্পূর্ণ জীনোমের বৃদ্ধি জড়িত। প্রথম ঘটনাটিকে অ্যানুপ্লয়েডী (Aneuploidy) এবং দ্বিতীয় ঘটনাটিকে ইউপ্লয়েডী (Euploidy) বলা হয়।

অ্যানুপ্লয়েডী (Aneuploidy)—অ্যানুপ্লয়েডী বলিতে আমরা সেই সকল ক্ষেত্র বুঝি যেখানে নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম সংখ্যা তাহার বেসিক সংখ্যার গুণিতকরূপে অবস্থান করে না। সুতরাং অ্যানুপ্লয়েড উদ্ভিদ বা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য হইল যে সেখানে অসম্পূর্ণ জীনোম অবস্থান করে। যখন একটি ডিপ্লয়েড উদ্ভিদে (বা প্রাণী) একটি সম্পূর্ণ জীনোম ও আর একটি জীনোম হইতে একটি ক্রোমোজোম কম থাকে ($2n-1$) তখন সেই উদ্ভিদটিকে **মনোজোমিক** (*monosomic*) উদ্ভিদ বলা হয়। একটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম জুটি অনুপস্থিত হইলে ($2n-2$) সেই অবস্থাকে **নালিজোমিক** (*nullisomic*) বলা হয়। যখন একটি উদ্ভিদে দুইটি সম্পূর্ণ জীনোম ছাড়াও আরও একটি ক্রোমোজোম বেশী থাকে ($2n+1$) তখন তাহাকে **ট্রাইজোমিক** (*trisomic*) উদ্ভিদ বলে। দুইটি সম্পূর্ণ জীনোমের উপর আরও দুইটি একই ধরনের বা সমসংস্থ দলের ক্রোমোজোম থাকলে **টেট্রাজোমিক** (*tetrasomic*) ($2n+2$), কিন্তু এই দুইটি অতিরিক্ত ক্রোমোজোম যদি ভিন্ন সমসংস্থ ক্রোমোজোম দল ভুক্ত হয় তাহা হইলে সেইরূপ সংগঠনকে **ডাবল্ ট্রাইজোমিক** (double trisomic) ($2n+1+1$), বলা হয়।

ইউপ্লয়েডী (Euploidy)—ইউপ্লয়েডী বলিতে সম্পূর্ণ জীনোম বৃদ্ধির ঘটনাকেই বুঝায়। এই ক্ষেত্রে প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা উহার বেসিক সংখ্যার গুণিতকরূপে অবস্থান করে। একটি জীনোম থাকিলে **মনোপ্লয়েড** (monoploid) ; দুইটি জীনোম থাকিলে **ডিপ্লয়েড** (diploid) ; তিনটি জীনোম থাকিলে **ট্রিপ্লয়েড** (triploid) এইরূপে **টেট্রাপ্লয়েড** (tetraploid), **হেক্সাপ্লয়েড** (hexaploid) **অক্টাপ্লয়েড** (octaploid) ইত্যাদি গঠিত হয়। সাধারণভাবে, তিন বা তিনের অধিক সংখ্যক জীনোম যুক্ত হওয়ার ঘটনাকেই **পলিপ্লয়েড** (Polyploid) বলা হইয়া থাকে। পলিপ্লয়েড তিন প্রকার, যথা, **অটোপলিপ্লয়েড** (Autopolyploid), **অ্যালোপলিপ্লয়েড** (Allopolyploid) এবং এনডোপলিপ্লয়েড (endopolyploid) ; সংক্ষেপে ইহাদের শুধুমাত্র অটোপ্লয়েডী, অ্যালোপ্লয়েডী এবং এনডোপ্লয়েডী বলা হয়। অটোপলিপ্লয়েড বলিতে সেই সকল প্রজাতি বুঝায় যাহাদের নিউক্লিয়াসে একই ধরনের বা প্রকৃতির জীনোম পুনঃ পুনঃ অবস্থিত থাকে, যথা, AAA (3n) AAAA (4n) ইত্যাদি।

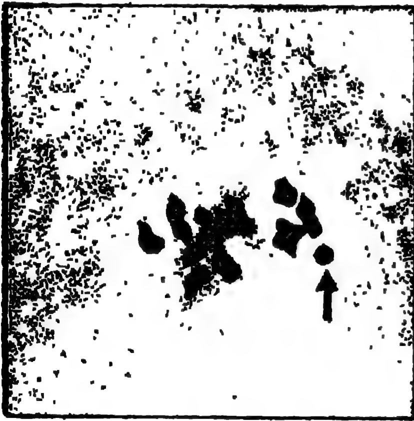
অ্যালোপলিপ্লয়েড বলিতে সেই সকল প্রজাতি বুঝায় যাহাদের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত জীনোমগুলি এক প্রকৃতির হয় না অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির যথা AB (2n), ABC ($3n$), AABBCC ($6n$), AAAABBBB ($8n$) ইত্যাদি।

অ্যানুপ্লয়েডী (Aneuploidy)

মনোজোমিক ও নালিজোমিক (Monosomic and nullisomic) মনোজোমিক জীবের কোষে একটি ক্রোমোজোম অনুপস্থিত থাকে। ডিপ্লয়েড কোষে প্রতিটি ক্রোমোজোম দুইটি করিয়া থাকে বলিয়া উহার ক্রোমেজোম সংখ্যা $2n$। সুতরাং মনোজোমিকের কোষে এই সংখ্যা হইবে $2n-1$, অর্থাৎ একটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম দলে দুইটির পরিবর্তে সেখানে একটি মাত্র ক্রোমোজোম থাকে। একটি সম্পূর্ণ ক্রোমোজোম

অনুপস্থিত থাকে বলিয়া সাধারণত মনোজোমিক খুবই দুর্লভ। কারণ, অসম্পূর্ণ জনন কোষ বা গ্যামেট স্বাভাবিকভাবে কার্য করিতে পারে না বলিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি অনুপস্থিত ক্রোমোজোমটি অতি ক্ষুদ্র হয় তাহা হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষত প্রাণী, অসম্পূর্ণ জনন কোষ জীবিত থাকিয়া বিপরীত গ্যামেটের সহিত মিলিত হইয়া একটি মনোজোমিক জীবের সৃষ্টি করে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ জনন কোষ তাহার কার্যকারিতা বজায় রাখিতে পারে না। সুতরাং উদ্ভিদের মধ্যে যে সকল মনোজোমিকের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা $2n-1$ নয় তাহারা প্রকৃতপক্ষে $4n-1$। সাধারণ তামাক নিকোটিয়ানা ট্যাবেকাম (*Nicotiana tabacum*), গম (*T. aestivum*) ইত্যাদি ক্ষেত্রে মনোজোমিক উদ্ভিদের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ক্রোমোজোম সংখ্যা যথাক্রমে 47 এবং 41।

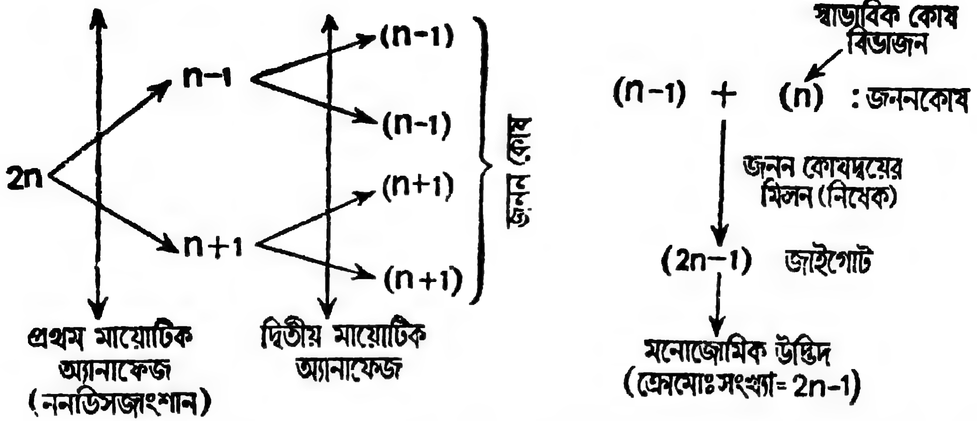
মনোজোমিকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল হ্যাপ্লো-IV ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাস্টার (Haplo-IV type of *Drosophila melanogaster*)। ড্রসোফিলা একধরনের ছোট ছোট মাছি (ফলের মাছি), ইহার চতুর্থ ক্রোমোজোমদ্বয় খুবই ছোট, সেই কারণে অসম্পূর্ণ গ্যামেট (যেখানে চতুর্থ ক্রোমোজোমটি নাই) জীবিত থাকে, ফলে $2n-1$ ক্রোমোজোম বিশিষ্ট মাছির উৎপত্তি হয়। একটি ক্রোমোজোম না থাকার জন্য মনোজোমিক ড্রসোফিলা তাহার অনুরূপ ডিপ্লয়েড বংশধরদের মত স্বাভাবিক হইতে পারে না। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মনোজোমিক ভুট্টার (*Zea mays*) উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।



৫৩নং চিত্র—মনোজোমিক ($2n-1$) ভুট্টাগাছে পুংরেণু উৎপত্তিকালে মায়োসিস কোষ বিভাজন। প্রথম মেটাফেজ দশায় নয়টি বাইভ্যালেন্ট ও একটি মনোভ্যালেন্ট (তীর চিহ্নিত) ক্রোমোজোম দেখা যাইতেছে।

একটি সম্পূর্ণ (n) ও একটি অসম্পূর্ণ ($n-1$) গ্যামেটের বা জনন কোষের মিলনের ফলে $2n-1$ জাইগোটের উৎপত্তি হয়। ($n-1$) গ্যামেট মায়োসিস কোষ বিভাজনের (রিডাকসন ডিভিসান) সময় ননডিসজাংশন (nondisjunction) প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ায় একটি বাইভ্যালেন্টের অন্তর্ভুক্ত ক্রোমোজোমদ্বয় প্রথম অ্যানাফেজ দশায় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন (ডিসজাংশন) না হইয়া একটি মেরুপ্রান্তে গিয়া পেঁছায় এবং অন্যান্য ক্রোমোজোমের সহিত একটি অপত্য নিউক্লিয়াসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। এইরূপে মায়োসিস কোষ বিভাজনের প্রথম অ্যানাফেজ দশায় যে দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয় তাহাদের একটিতে $n-1$ ও অন্যটিতে $n+1$ ক্রোমোজোম থাকে। সুতরাং কোষ বিভাজনের সময় মাকুতন্তুর উপর ক্রোমোজোম চলনের (Chromosome movement) অস্বাভাবিকতার জন্য একটি অতিরিক্ত ক্রোমোজোমসহ এবং আর

একটি, একটি ক্রোমোজোমের অনুপস্থিতিজনিত অসম্পূর্ণ গ্যামেট বা জননকোষের সৃষ্টি হইয়া থাকে।



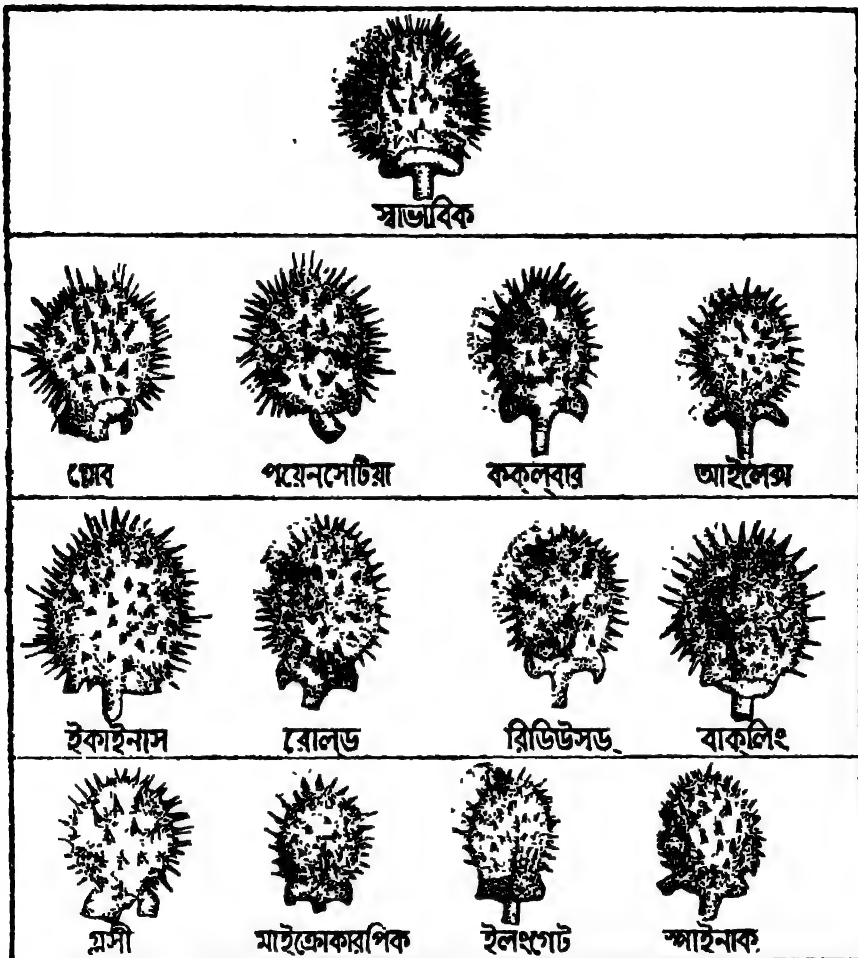
মনোজোমিক উদ্ভিদ বা প্রাণীর গ্যামেট-মাতৃকোষে মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় যখন সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর জোড় বাঁধে (bivalent pairing) এবং বাইভ্যালেণ্ট গঠন করে তখন, যে ক্রোমোজোমটি অনুপস্থিত তাহার জুটি ক্রোমোজোম এককরূপে অবস্থান করে। এইরূপ এককরূপে অবস্থিত ক্রোমোজোমকে মনোভ্যালেণ্ট (monovalent) ক্রোমোজোম বলে (৫৩নং চিত্র)। সুতরাং মনোভ্যালেণ্ট ক্রোমোজোম মনোজোমিক প্রজাতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য যাহা দেখিয়া উহাকে চিহ্নিত করা যায়। এই মনোভ্যালেণ্ট বা ইউনিভ্যালেণ্ট ক্রোমোজোম অ্যানাফেজ দশায় যে-কোন একটি মেরুর দিকে অগ্রসর হইতে পারে ; আবার অনেক সময় ইহাকে কোন মেরুর দিকেই অগ্রসর হইতে দেখা যায় না, ল্যাগার (laggar) হিসাবে মাঝামাঝি স্থানে পড়িয়া থাকে। এই কারণে মনোজোমিক উদ্ভিদে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যামেট বা জনন কোষগুলির মধ্যে স্বাভাবিক জনন কোষের (n-সংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট) তুলনায় অসম্পূর্ণ জনন কোষের ($n-1$ ক্রোমোজোম বিশিষ্ট) সংখ্যা বেশি দেখিতে পাওয়া যায়।

মনোজোমিকের ন্যায় গম গাছে নালিজোমিক (nulisomic) ধরনও দেখিতে পাওয়া যায়। নালিজোমিক গম গাছে 40টি ক্রোমোজোম থাকে। এখানে একটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম জুটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকার জন্য এই উদ্ভিদটি 42টি ক্রোমোজোমযুক্ত স্বাভাবিক প্রজাতির তুলনায় কিছুটা নিস্তেজ ও অনুর্বর।

একটি ক্রোমোজোমের অভাব-জনিত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া উদ্ভিদ-প্রজননবিদগণ ক্রোমোজোমের উপর জীনের অবস্থান সঠিকরূপে নির্ধারণ করিয়া থাকেন।

ট্রাইজোমিক (*Trisomic*)—যখন কোন প্রজাতির নিউক্লিয়াসে দুইটি সম্পূর্ণ জীনোমের উপর একটি ক্রোমোজোম অতিরিক্ত থাকে তখন সেই প্রজাতিকে **ট্রাইজোমিক** প্রজাতি বলা হয়। সুতরাং ট্রাইজোমিক জীবে একটি ক্রোমোজোমের তিনবার পুনরাবৃত্তি ঘটে ($2n+1$)। কোন ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত ক্রোমোজোমটি স্বাভাবিক ক্রোমোজোম না হইয়া অংশ বিনিময়ের (translocation) মাধ্যমে গঠিত হইয়া থাকে।

মনোজোমিক উদ্ভিদ কিছুটা দুষ্প্রাপ্য হইলেও ট্রাইজোমিক উদ্ভিদ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ট্রিটিকাম, নিকোটিয়ানা এবং ড্যাটুরা (Datura stramonium) ইত্যাদি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ট্রাইজোমিক অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। প্রাণীর ক্ষেত্রে ট্রিপ্লো IV ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাসটার (Triplo-IV Drosophila) ট্রাইজোমিকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ড্রসোফিলার এই প্রজাতি-প্রকারটি হ্যাপ্লো-IV প্রকারের ঠিক বিপরীত ঃ এখানে চতুর্থ ক্রোমোজোমটি একবারের পরিবর্তে তিনবার রহিয়াছে। ধুতুরার (ড্যাটুরা) ক্রোমোজোম সংখ্যা $2n=24$ অর্থাৎ 2×12। ইহা একটি ডিপ্লয়েড

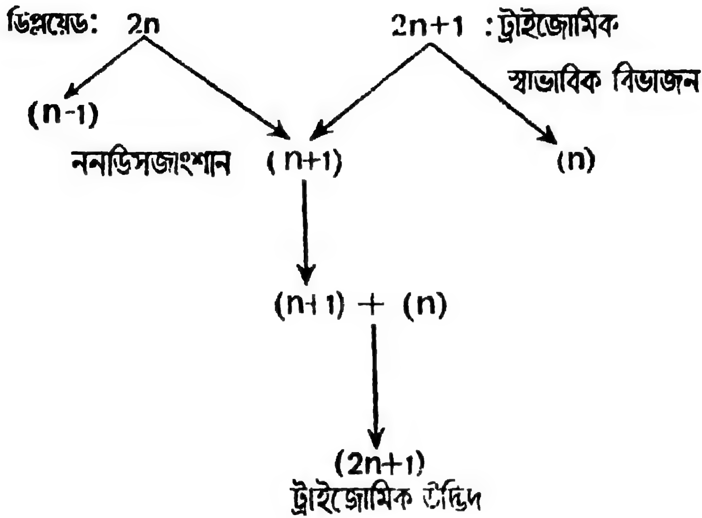


৫৪নং চিত্র—Blakeslee কর্তৃক চিহ্নিত বার প্রকার ট্রাইজোমিক ধুতুরা গাছের ফলের চিত্র।

প্রজাতি। A F. Blakeslee এবং J. Belling, দুই আমেরিকান বিজ্ঞানী এই উদ্ভিদে ট্রাইজোমিকের অবস্থান পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে ড্যাটুরা স্ট্রামোনিয়াম প্রজাতিটির মধ্যে 12 প্রকার বিভিন্ন ট্রাই-জোমিক ($2n=25$) স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রহিয়াছে। এই 12 প্রকার ট্রাইজোমিক বারটি হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোমের জন্য হইয়াছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ক্রোমোজোমের জন্য উদ্ভিদটির কোন বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় কিনা তাহাও এই দুই বিজ্ঞানী বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার

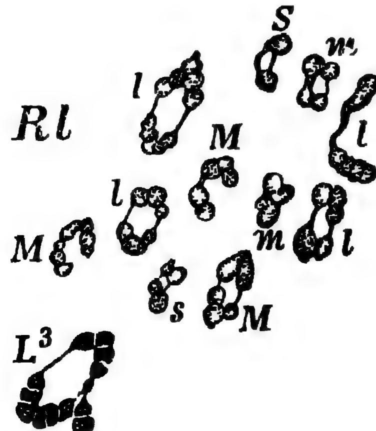
লক্ষ্য করিয়াছেন যে প্রতি ক্ষেত্রেই উদ্ভিদের ফলের (capsule) গঠনে এইরূপ কতকগুলি পরিবর্তন হয় যাহা অতি সহজেই উহাদের চিহ্নিতকরণে সাহায্য করে (৫৪নং চিত্র)। একটি অতিরিক্ত ক্রোমোজোম থাকার জন্যে ট্রাইজোমিক ড্যাটুরার ফলের যে আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন দেখা যায় তাহা হইতে ক্রোমোজোম যে বংশগতির বস্তুসমূহের ধারক ও বাহক তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়।

(n) ও $(n+1)$ ক্রোমোজোম বিশিষ্ট জনন কোষদ্বয়ের মিলনের ফলে একটি ট্রাই-জোমিক $(2n+1)$ উদ্ভিদ বা প্রাণীর উৎপত্তি হয়। $(n+1)$ জনন কোষ একটি



স্বাভাবিক $2n$ উদ্ভিদ হইতে ননডিসজাংশন প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হইতে পারে, আবার, উহা একটি ট্রাইজোমিক উদ্ভিদ হইতে স্বাভাবিক মায়োসিসের ফলে উৎপন্ন হইতে পারে।

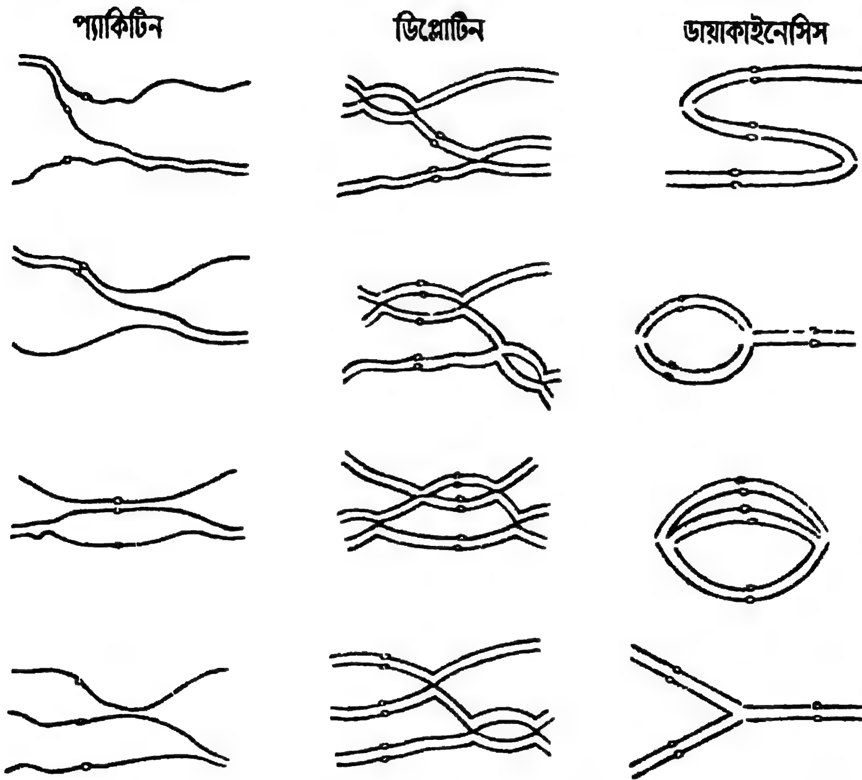
একটি অতিরিক্ত ক্রোমোজোম থাকার জন্য মায়োসিসের প্রোফেজ ও মেটাফেজ দশায়



৫৫নং চিত্র—ট্রাইজোমিক ধুতুরা উদ্ভিদে (*Rl*) মায়োসিস বিভাজনে প্রথম মেটাফেজ দশায় এগারটি বাই-ভ্যালেন্ট ও একটি ট্রাইভ্যালেন্ট (L^3) গঠন হইয়াছে। অতিরিক্ত ক্রোমোজোমটি বৃহৎ ক্রোমোজোম দলভুক্ত। অন্যান্য ইংরাজী অক্ষরগুলি দ্বারা বিভিন্ন আকৃতির ক্রোমোজোম চিহ্নিত করা হইয়াছে।

তিনটি ক্রোমোজোম একত্রে জোড় বাঁধিয়া ট্রাইভ্যালেন্ট গঠন করে (৫৫নং চিত্র)। ড্যাটুরা

কাইনেসিস দশায় ট্রাইভ্যালেণ্ট অন্তর্গত ক্রোমোজোম কিভাবে সজ্জিত হইবে তাহা উহাদের মধ্যে সৃষ্ট কায়াজমার অবস্থানের উপর নির্ভর করে। ৫৬নং চিত্রে কায়াজমা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ক্রোমোজোমগুলির আপেক্ষিক অবস্থান দেখান হইল। প্রথম অ্যানাফেজ দশায় পৃথকীকরণের সময় $2+1$ পদ্ধতিতে তিনটি ক্রোমোজোম দুই মেরুতে যায়, ফলে সকল সময় n ও $n+1$ ক্রোমোজোম সম্বলিত জনন কোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই দুই প্রকার জনন কোষের উৎপাদনের হার সমান হইবার কথা, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিশেষত পুংরেণু সৃষ্টির ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ বা স্বাভাবিক রেণুর (n) উৎপাদন অতিরিক্ত ক্রোমোজোমসহ জনন কোষ বা রেণু অপেক্ষা অধিক হওয়ায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, $n+1$ রেণু জীবিত থাকে



৫৬নং চিত্র—বিভিন্ন ধরনের ট্রাইভালেণ্ট গঠন পদ্ধতি। তিনটি ক্রোমোজোমের একটি শৃঙ্খল; রিং ও রড আকৃতি, তিনটি ক্রোমোজোমই দুই প্রান্তে একত্রে যুক্ত এবং Y-আকৃতি। তিনটি ক্রোমোজোমের প্যাকিটিন দশায় সম্ভাব্য জোড়বদ্ধতা এবং ডিপ্লোটিন দশায় কায়াজমা গঠন দেখান হইয়াছে। ডায়াকাইনেসিস দশায় কায়াজমার প্রান্তায় গমন সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

না, উহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। ড্যাটুরার ক্ষেত্রে 13 ক্রোমোজোমসহ পুংরেণু সম্ভবত অঙ্কুরিত হয় না, অথবা অঙ্কুরিত হইলেও পুংনালি বৃদ্ধি অত্যন্ত মন্থর ও বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না বলিয়া উহা নিষেক কার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হয় 13 ক্রোমোজোম সহ ভ্রূণস্থলী স্বাভাবিকরূপে কার্য করে বলিয়া ড্যাটুরা উদ্ভিদে 12-প্রকার ট্রাইজোমিক খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বিশেষত ড্যাটুরার

ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ক্রোমোজোমটি স্ত্রী জনন কোষের মাধ্যমে বাহিত হয় বলিয়া ট্রাইজোমিক উদ্ভিদের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

অতিরিক্ত ক্রোমোজোমটির প্রকৃতি অনুসারে Blakeslee ট্রাইজোমিককে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন। যে উদ্ভিদে তৃতীয় ক্রোমোজোমটি অন্য দুইটি ক্রোমোজোমের ন্যায় হয় সেই উদ্ভিদকে **প্রাইমারী বা মুখ্য ট্রাইজোমিক** (Primary trisomic) উদ্ভিদ বলে। অতিরিক্ত ক্রোমোজোমটি একই সমসংস্থ দলভুক্ত অন্য দুইটি ক্রোমোজোমের মধ্যে অংশ বিনিময়ের মাধ্যমে গঠিত হইলে তাহাকে **সেকেন্ডারি বা গৌণ ট্রাইজোমিক** (Secondary trisomic) বলে। কিন্তু এই ক্রোমোজোমটি যখন এই দলভুক্ত একটি ক্রোমোজোম এবং আর একটি অসমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে অংশ বিনিময়ের মাধ্যমে তৈরী হয়, তখন তাহাকে **টারশিয়ারি ট্রাইজোমিক** (Tertiary trisomic) বলা হয়।

টেট্রাজোমিক ও ডাবল্ ট্রাইজোমিক (Tetrasomic and double trisomic) —একটি অতিরিক্ত ক্রোমোজোম সহ দুইটি বিপরীত জনন কোষ, $(n+1)$ এবং $(n+1)$, মিলিত হইয়া $2n+2$ অথবা $2n+1+1$ জীবের সৃষ্টি করিয়া থাকে। যদি অতিরিক্ত ক্রোমোজোম দুইটি একই দলভুক্ত হয় অর্থাৎ ডিপ্লয়েড অবস্থায় একটি দলে যদি মোট চারিটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম থাকে তখনই সেই উদ্ভিদ বা প্রাণীকে টেট্রাজোমিক $(2n+2)$ প্রজাতি বলা হয়। কিন্তু অতিরিক্ত ক্রোমোজোম দুইটি যদি ভিন্ন ভিন্ন দলভুক্ত হয় অর্থাৎ ডিপ্লয়েড অবস্থায় দুইটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম দলে যদি তিনটি করিয়া ক্রোমোজোম থাকে তখন সেই উদ্ভিদ বা প্রাণীকে ডাবল্ ট্রাইজোমিক প্রজাতি বলা হয়।

মায়োসিস কোষ বিভাজনে টেট্রাজোমিকের ক্ষেত্রে চারিটি ক্রোমোজোম পরস্পর জোড় বাঁধিয়া টেট্রাভ্যালেন্ট গঠন করে। ডাবল্ ট্রাইজোমিকের ক্ষেত্রে দুইটি দলে ট্রাইভ্যালেন্ট আকৃতি গঠিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই উদ্ভিদের উর্বরতা (fertility) হ্রাস পায় কারণ, স্বাভাবিক (n) সংখ্যক ক্রোমোজোম সহ জনন কোষের উৎপাদন হ্রাস পায়। **ড্যাটুরা স্ট্রামোনিয়াম** এই প্রজাতিটির মধ্যে উপরিউক্ত উভয় প্রকার অবস্থাই $(2n+2$ এবং $2n+1+1)$ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইউপ্লয়েডী (Euploidy)

অটোপলিপ্লয়েডী (*Autopolyploidy*)—একই জিনোমের বারংবার পুনরাবৃত্তি হওয়াকে অটোপলিপ্লয়েডী বলে। De Vries (দ্বি ভ্রীস) প্রথমে **ইনোথেরা ল্যামার্কিয়ানা** (*Oenothera Lamarckiana*) উদ্ভিদের (ইনোথেরার জাইগাস পরিব্যক্তি) মধ্যে অটোপ্লয়েডী লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার দেখা অটোপ্লয়েড প্রজাতিটির ক্রোমোজোম সংখ্যা 14 এর পরিবর্তে ছিল 28টি। তিনি এই অবস্থাকে নূতন প্রজাতির আবির্ভাব বলিয়া উল্লেখ করেন। ঠিক একই ধরনের আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল একজন আমেরিকান বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে। তিনি ড্যাটুরা স্ট্রামোনিয়ামের (*Datura stramonium*) একটি প্রকারের মধ্যে 48টি ক্রোমোজোম লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে গবেষকগণ পরীক্ষার দ্বারা বিভিন্ন প্রকার পলিপ্লয়েডের প্রকৃতিগত ভাবে অবস্থান জানিতে

পারিলেন। বর্তমানে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে পলিপ্লয়েড উদ্ভিদের সৃষ্টি করা সম্ভব হইতেছে। একটি মাত্র জীনোম থাকিলে তাহাকে হ্যাপ্লয়েড, দুইটি জীনোম থাকিলে, ডিপ্লয়েড (AA), তিনটি জীনোম থাকিলে ট্রিপ্লয়েড (AAA); চারিটি জীনোম থাকিলে টেট্রাপ্লয়েড (AAAA), ইত্যাদি বলা হয়।

মনোপ্লয়েডী (Monoploidy) মনোপ্লয়েড জীবে প্রতিটি ক্রোমোজোম একবার করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা সাধারণভাবে পুং ও স্ত্রী জনন কোষে এবং উদ্ভিদের যৌন জণুর (gametophytic generation) মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি মনোপ্লয়েড জীবকে তাহার প্রতিটি ক্রোমোজোমের জন্য মনোজোমিক আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এইদিক হইতে একটি ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ বা প্রাণীকেও তাহাদের প্রতিটি ক্রোমোজোমের জন্য বাইজোমিক বলা যাইতে পারে।

মনোপ্লয়েড সাধারণভাবে তাহাদের ডিপ্লয়েড প্রতিনিধি অপেক্ষা অল্প প্রাণ-শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহারা ক্ষুদ্রাকার এবং প্রায় সম্পূর্ণ অনুর্বর হইয়া থাকে। তবে মনোপ্লয়েড উদ্ভিদ, একজন উদ্ভিদ-প্রজনবিদের নিকট খুবই প্রয়োজনীয় এবং আকর্ষণীয়, কারণ, হ্যাপ্লয়েড অবস্থা হইতে ঐ উদ্ভিদটিকে যদি ক্রোমোজোম দ্বিত্ব-করণের মাধ্যমে (doubling of chromoso.ne) ডিপ্লয়েড করা যাইতে পারা যায় তাহা হইলে উহা সকল বৈশিষ্ট্যে হোমোজাইগাস (homozygous) অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া একটি "পিওর লাইন" (Pure line)-ভুক্ত উদ্ভিদে পরিণত হইবে। এইরূপ একটি "পিওর-লাইন" উদ্ভিদ স্ব-পরাগযোগের দ্বারা প্রজন (breeding) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি করিতে বেশ কিছু বছর লাগিয়া যায়। কিন্তু একটি মনোপ্লয়েড উদ্ভিদকে ডিপ্লয়েড করিয়া "পিওর লাইন" উদ্ভিদ পাইতে একটিমাত্র মরসুমই যথেষ্ট। উন্নততর উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রকল্পে প্রজনের উদ্দেশ্যে একটি "পিওর-লাইন" উদ্ভিদের মূল্য (বিশেষত উন্নত "জার্মপ্লাজম" যোগান হিসাবে) অপরিসীম।

একটি মাত্র জীনোম থাকে বলিয়া হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ আকৃতিগত দিক হইতে ডিপ্লয়েড অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার ও দুর্বল। হ্যাপ্লয়েড গম, বার্লি, ভুট্টা, টম্যাটো ইত্যাদি উদ্ভিদ তাহাদের ডিপ্লয়েড প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়।

প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে একটি হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু এইভাবে সৃষ্টির হার খুবই সামান্য। কৃত্রিম উপায়ে পলিপ্লয়েড যেভাবে সৃষ্টি করা হয় সেই প্রকার কোন উন্নত উপায় এক্ষেত্রে না থাকিলেও নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির সাহায্যে কোন কোন উদ্ভিদের মধ্যে নিষেক কার্যের পূর্বেই ডিম্বকোষের বৃদ্ধি ঘটান যায়। নিষেক ছাড়া যদি একটি ডিম্বকোষ বৃদ্ধি পাইয়া বীজে পরিণত হয় তাহা হইলে সেই বীজটি হইবে হ্যাপ্লয়েড। হ্যাপ্লয়েড বীজ অঙ্কুরিত হইয়া একটি হ্যাপ্লয়েড চারা গাছেরই সৃষ্টি করে। হ্যাপ্লয়েড বীজ উৎপন্ন করার পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ ঃ—

(ক) বিলম্বে পরাগসংযোগ—কোন কোন ক্ষেত্রে বিলম্বে পরাগ সংযোগ হেতু ডিম্ব-কোষ নিষেকের পূর্বেই বৃদ্ধি পাইতে শুরু করে এবং বীজ উৎপন্ন করে। তবে বেশীর

ভাগ ক্ষেত্রে পরাগসংযোগের বিলম্ব হেতু ডিম্বক শুকাইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। গর্ভমুণ্ডে হর্মোন প্রয়োগ করিয়া ডিম্বক-মোচন রোধ করা যায়।

(খ) পরাগরেণুকে বেশীমাত্রায় X-ray প্রয়োগ করিয়া সেই রেণুর দ্বারা পরাগযোগ করিলেও সুফল পাওয়া যায় (উদাহরণ, ট্রিটিকাম মনোকক্কাম)।

(গ) অন্য অর্থাৎ অসম প্রজাতির রেণুর দ্বারা পরাগসংযোগ করিয়া হ্যাপ্লয়েড বীজ উৎপন্ন করা যায়। সোলানাম নাইগ্রাম (Solanum nigrum)-কে সোলানাম লিউটিয়ামের (S. luteum) রেণুর দ্বারা পরাগসংযোগ করিয়া হ্যাপ্লয়েড সোলানাম নাইগ্রাম উদ্ভিদ (কাকমাছি) উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে।

(ঘ) একটি বীজ হইতে দুইটি চারা সৃষ্টির মাধ্যমে (twin method) হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপন্ন করা যায়। এ-ক্ষেত্রে গাছ দুইটি ডিম্বকের মধ্যে অবস্থিত দুইটি ভ্রূণ স্থলী হইতে উৎপন্ন হয়। এই পদ্ধতির দ্বারা হ্যাপ্লয়েড গম, বার্লি ইত্যাদি উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হইয়াছে।



৫৭ নং চিত্র—হ্যাপ্লয়েড বার্লি উদ্ভিদে প্রথম মেটাফেজ হইতে প্রথম অ্যানাফেজ দশায় ক্রোমোজোম পৃথকীকরণ। সাতটি মনোভ্যালেন্ট ক্রোমোজোম অ্যানাফেজ দশায় যথেচ্ছভাবে মেরু অভিমুখে গমন করে। একমাত্র ব্যতিক্রম, নীচের ডানদিকে একটি বাইভ্যালেন্ট গঠিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে। সাতটি রেণু মাতৃকোষে সাত প্রকার ক্রোমোজোম পৃথকীকরণ দেখা যাইতেছে।

হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদে মায়োসিস প্রক্রিয়ার সময় জাইগোটিন দশায় সমসংস্থ ক্রোমোজোমের অনুপস্থিতির জন্য সাইন্যাপ্সিস্ সংঘটিত হয় না, ফলে, বাইভ্যালেন্ট গঠিত হইতে পারে না। সুতরাং মেটাফেজ দশায় প্রতিটি ক্রোমোজোম ইউনিভ্যালেন্ট হিসাবে কোষের মধ্যে সজ্জিত থাকে। ফলে প্রথম অ্যানাফেজ দশায় প্রতিটি ক্রোমোজোম স্বাধীনভাবে যে কোন একটি মেরুর দিকে অগ্রসর হয় (৫৭নং চিত্র)। এক্ষণে ক্রোমোজোমের স্বাধীন সঞ্চরণ মানিয়া লইলে, একটি ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রে, তাহা কোন্ মেরুর অন্তর্গত হইবে সেই সম্ভাব্যতা (Probability) হয় $\frac{1}{2}$। এইরূপে সকল ক্রোমোজোমের পক্ষে সম্ভাব্যতা বিচারে তাহাদের সকলেরই একই মেরুর অন্তর্গত হইবার সুযোগ হইবে $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \cdots \rightarrow n$ অর্থাৎ, $(\frac{1}{2})^n$, এখানে $n =$ ক্রোমোজোম সংখ্যা; সুতরাং ক্রোমোজোম সংখ্যা যত বেশী হইবে, সকল ক্রোমোজোমের পক্ষে একই মেরুর অন্তর্ভুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ জনন কোষ গঠনের সম্ভাবনা ততই কমিয়া যাইবে। এই

কারণে মনোপ্লয়েড উদ্ভিদ অনুর্বর ; এখানে কার্যকরী বীজ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

অটোট্রিপ্লয়েডী (Autotriploidy)—অটোট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদে একই ধরনের তিনটি সম্পূর্ণ জীনোম থাকে। সুতরাং সেখানে প্রতিটি ক্রোমোজোমের তিনবার পুনরাবৃত্তি হয়। এই দিক হইতে বিচার করিলে ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদকে তাহার প্রতিটি ক্রোমোজোমের জন্য ট্রাইজোমিক আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। প্রকৃতিতে ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদের বহু উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

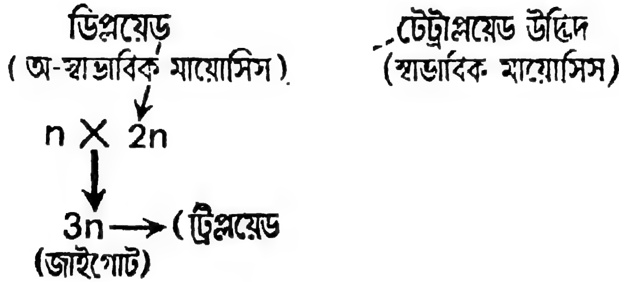
সাধারণভাবে ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদ খুবই তেজী, পুষ্ট, এবং বৃহৎ আকারের হয় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত অতি সহজেই খাপ খাওয়াতেই পারে। ইহাদের জীবনী-শক্তি ডিপ্লয়েড অপেক্ষা অনেক বেশী। ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদে বীজ উৎপাদন বেশী হইতে পারে না, কারণ, মায়োসিস্ অত্যন্ত অনিয়মিত। প্রতিটি ক্রোমোজোম তিনবার করিয়া থাকার জন্যই এইরূপ ব্যতিক্রম। সুতরাং বংশ বিস্তার বীজের মাধ্যমে হইতে পারে না। সেইজন্য অঙ্গজ জনন ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদের মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে দেখা দেয়। রাইজোম ইত্যাদির সাহায্যে বংশের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

প্রাণীজগতে ট্রিপ্লয়েডীর উদাহরণ খুব বেশী দেখা যায় না, তবে ড্রসোফিলা, স্যালাম্যানডার ইত্যাদি প্রাণীদের মধ্যে কিছু ট্রিপ্লয়েডী দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুকাল পূর্বে সুইডেনের একটি পরীক্ষাগারে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করিয়া ট্রিপ্লয়েড ইঁদুর সৃষ্টি করা হইয়াছিল। প্রাণীজগতে ট্রিপ্লয়েডী বিরল হইলেও উদ্ভিদ-জগতে ইহার প্রচুর উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাগানের বিভিন্ন ধরনের ফুল ও ফলের গাছ, জঙ্গলে বড় বড় গাছ, ঘাস ও ঘাসজাতীয় গাছ, বিভিন্ন শস্য ও অন্যান্য গাছের মধ্যে ট্রিপ্লয়েডী অতি সাধারণ ব্যাপার। এই সকল উদ্ভিদ প্রকৃতিগত ভাবে উৎপন্ন হইয়া প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে স্বাভাবিকরূপে বিরাজ করিতেছে। ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদ ডিপ্লয়েড অপেক্ষা অনেক উন্নত ধরনের হয় বলিয়া উদ্ভিদ প্রজনবিদগণ অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদগুলির মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে পলিপ্লয়েডী ঘটাইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে উদ্ভিদ উন্নয়ন প্রকল্পে এই কাজ নিরলস গতিতে চলিতেছে। এই সকল গবেষণাগারে ট্রিপ্লয়েড বীট ($3 \times 9 = 27$), আপেল ($3 \times 17 = 51$) ইত্যাদি উৎপন্ন করা হইয়াছে। এই সকল ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদের মধ্যে শর্করা ও ভিটামিনের পরিমাণ ডিপ্লয়েড অপেক্ষা অধিক পাওয়া গিয়াছে। জাপানের "কিহারা ইনস্টিটিউটে" (Kihara Institute) কৃত্রিম উপায়ে অধিক ফলন যুক্ত ট্রিপ্লয়েড তরমুজ ($3 \times 11 = 33$) উৎপন্ন করা হইয়াছে।

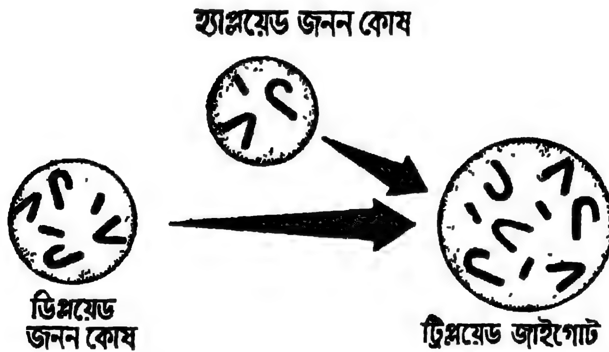
অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পে কৃত্রিম উপায়ে পলিপ্লয়েডী ঘটাইয়া তাহার সুযোগ গ্রহণ করার মধ্যে প্রধান যে বাধা রহিয়াছে তাহা হইল ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদের বীজ ধারনের ক্ষমতার হ্রাস পাওয়া। প্রতিটি ক্রোমোজোম তিনবার করিয়া থাকে বলিয়া মায়োসিসের সময় সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি ট্রাইভ্যালেন্ট গঠন করে (৫৫ নং চিত্র)। অনেক সময় ট্রাইভ্যালেন্ট ভাঙ্গিয়া গিয়া বাইভ্যালেন্ট ও মনোভ্যালেন্ট (ইউনিভ্যালেন্ট) গঠিত হয়। অ্যানাফেজ

দশায় তিনটি ক্রোমোজোমের যে-কোন দুইটি মেরুতে এবং তৃতীয় ক্রোমোজোমটি অন্য মেরুতে যাইবে। ক্রোমোজোমের মেরুপ্রান্তে গমন স্বাধীনভাবে সম্পন্ন হইলে দুই মেরুতে ক্রোমোজোম সংখ্যা যথাক্রমে n ও $2n$-এর মাঝামাঝি যে কোন সংখ্যায় হইতে পারে। n ও $2n$ ক্রোমোজোম বিশিষ্ট জনন কোষই কার্যকর হয়, এবং অতিরিক্ত ক্রোমোজোম বিশিষ্ট জননকোষগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদ অধিকমাত্রায় অনুর্বর।

একটি n ও আর একটি $2n$ ক্রোমোজোম বিশিষ্ট জনন কোষের মিলনের ফলে একটি $3n$ জাইগোটের উৎপত্তি হয়। হ্যাপ্লয়েড (n) জননকোষ একটি ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ



হইতে স্বাভাবিক মায়োসিসের ফলে উৎপন্ন হইতে পারে কিন্তু ডিপ্লয়েড ($2n$) জননকোষ দুইভাবে উৎপন্ন হইতে পারে। প্রথমত ইহা একটি ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ হইতে

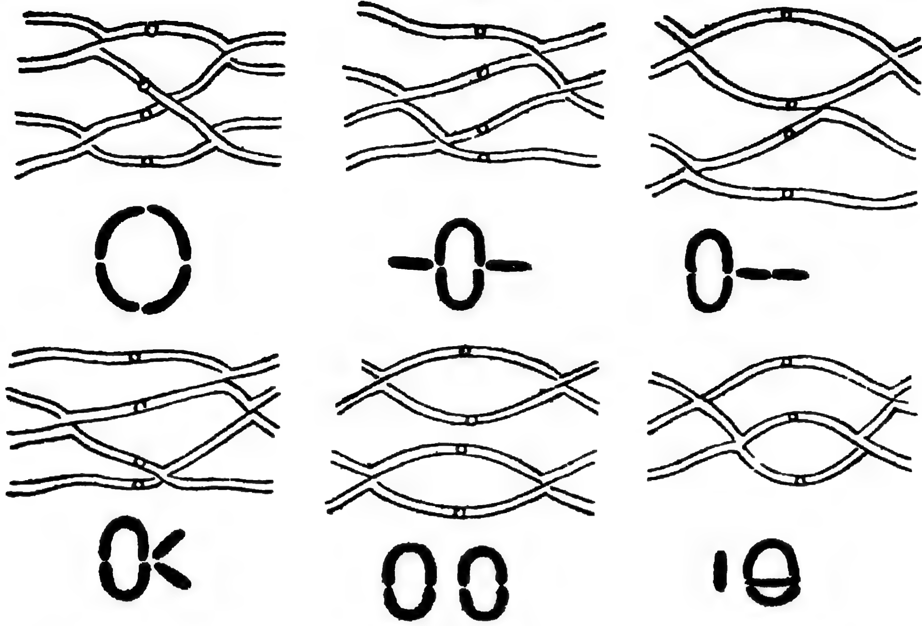


৫৮নং চিত্র—ট্রিপ্লয়েড জাইগোটের উৎপত্তি। দুইটি জীনোম একটি জনন কোষের মাধ্যমে এবং একটি জীনোম অন্য জনন কোষের মাধ্যমে আসিয়া মিলিত হয়।

অস্বাভাবিক মায়োসিস প্রক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হইয়া আসিতে পারে; এবং দ্বিতীয়ত ইহা একটি টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদ হইতে স্বাভাবিক মায়োসিসের মাধ্যমে উৎপন্ন হইয়া আসিতে পারে।

অটোটেট্রাপ্লয়েডী (Autotetraploidy)—টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদে একই জীনোমের চারিবার পুনরাবৃত্তি হয়। সুতরাং প্রতিটি ক্রোমোজোম চারিবার করিয়া থাকে। টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদকে প্রতিটি ক্রোমোজোমের জন্য টেট্রাজোমিক বলা যাইতে পারে। সাধারণভাবে ডিপ্লয়েড অপেক্ষা ইহাদের দেহের গঠন, পাতার আকার, এমনকি ফলের

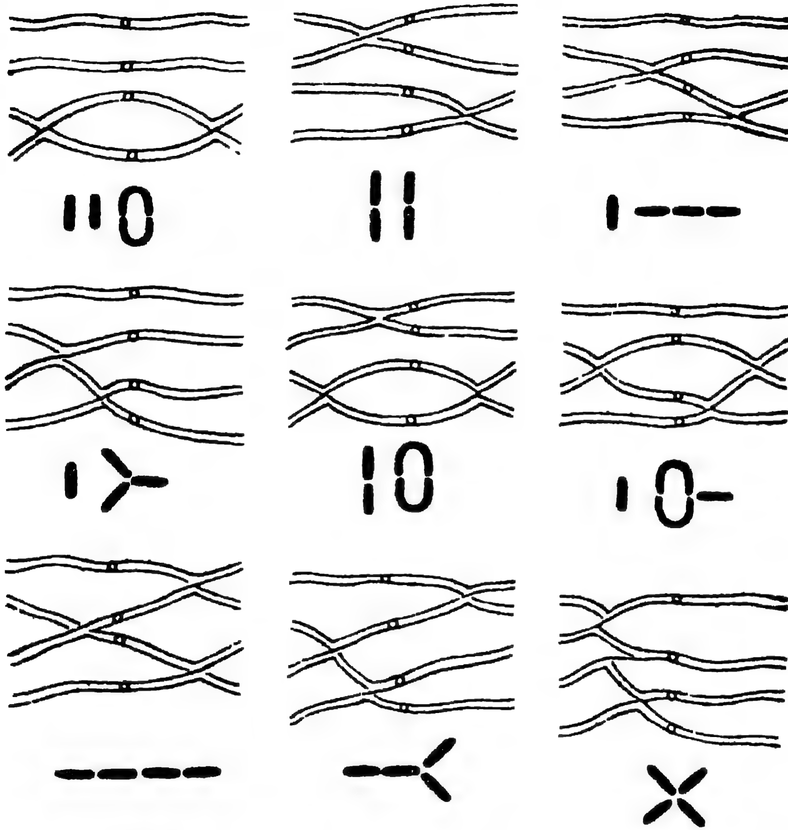
আকারও অনেক বড় হইয়া থাকে, ফলে ডিপ্লয়েড প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে ইহাদের সহজেই বাছিয়া লওয়া যায়। টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদ সহজেই নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে "খাপ-খাইয়ে" নিতে পারে। এই কারণেই পলিপ্লয়েড উদ্ভিদগুলির বিস্তারের ভৌগোলিক সীমারেখা (geographical distribution) ডিপ্লয়েড অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া থাকে।



৫৯নং চিত্র—চারিটি সমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে চারিটি কায়াজমা গঠিত হইলে ডিপ্লোটিন ও পরবর্তী মেটাফেজ দশায় সম্ভাব্য ক্রোমোজোম অবস্থান। এইক্ষেত্রে কায়াজমার সম্পূর্ণ প্রান্তীয় গমন কল্পনা করা হইয়াছে। উপরের লাইন বামদিক হইতে ডানদিকে যথাক্রমে, (ক), (খ) ও (গ) এবং নীচের লাইন (ঘ), (ঙ) ও (চ)

যেহেতু প্রতিটি ক্রোমোজোম চারিবার করিয়া থাকে, সেইজন্যে মায়োসিসের সময় টেট্রাভ্যালেণ্ট গঠন একটি সাধারণ ঘটনা। চারিটি ক্রোমোজোম সূত্রের পরস্পর জোড় বাঁধা এবং কায়াজমার অবস্থানের উপর ডায়াকাইনেসিস দশায় তাহাদের (ক্রোমোজোমগুলির) আপেক্ষিক অবস্থান চিত্রের সাহায্যে বোঝান হইল (৫৯নং চিত্র)। যেক্ষেত্রে চারিটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম "রিং"-এর আকার গঠন করে, সেই স্থলে তাহা রেসিপ্রোক্যাল ট্রান্সলোকেশানের (rcciprocal translocation) ফলে সৃষ্ট "রিং"-এর সহিত ভুল হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকিয়া যায়। প্রতিটি ক্রোমোজোম চারিবার করিয়া থাকে বলিয়াই যে সকল সময় টেট্রাভ্যালেণ্ট গঠন হইবে তাহা নয়, অনেক সময় একটি ট্রাইভ্যালেন্ট ও একটি মনোভ্যালেন্ট তৈরী হইতে পারে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটি বাইভ্যালেণ্ট তৈরী হইতে পারে। তবে প্রকৃত টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদে ট্রাইভ্যালেণ্ট ও মনোভ্যালেণ্ট বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না ; পরিবর্তে কোয়াড্রিভ্যালেণ্ট (quadrivalent) ও বাইভ্যালেণ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ জগতে অটোটেট্রাপ্লয়েডের অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। টেট্রাপ্লয়েড গম, ভুট্টা, পেয়ারা, তুলা, কফি ইত্যাদি উদ্ভিদ কৃত্রিম উপায়ে অথবা প্রকৃতিগতভাবে উৎপত্তি হইয়াছে। ট্রাডেসক্যানসিয়া ভার্জিনিয়ানা (*Tradescantia virginiana*) টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদের ($4\times6=24$) একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে মায়োসিসের সময় দুইটি কোয়াড্রিভ্যালেন্ট ও আটটি বাইভ্যালেন্ট গঠিত হয়। টেট্রাপ্লয়েড টম্যাটোর



৩০নং চিত্র—চারিটির কম কায়াজমা গঠিত হইলে ক্রোমোজোমের সম্ভাব্য অবস্থান: উপরের সারি বামদিক হইতে ডানদিকে যথাক্রমে, (ক), (খ) ও (গ); মধ্যের সারি, (ঘ), (ঙ) ও (চ) এবং নীচের সারি, (ছ), (জ) ও (ঝ)।

ক্ষেত্রে যদিও মায়োসিসের প্রথম প্রোফেজের জাইগোটিন দশায় অনেকগুলি কোয়াড্রিভ্যালেন্ট গঠিত হয়, কিন্তু পরবর্তী দশায় অর্থাৎ ডায়াকাইনেসিস অথবা প্রথম মেটাফেজ দশায় কোয়াড্রিভ্যালেন্ট ভাঙ্গিয়া গিয়া 24টি বাইভ্যালেন্ট গঠিত হয়। সুতরাং কোয়াড্রিভ্যালেন্ট না থাকিলেই উহা যে অটোটেট্রাপ্লয়েড হইবে না তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

ক্রোমোজোমের উপর জীন অবস্থিত। টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদে প্রতিটি ক্রোমোজোম চারিবার করিয়া থাকে বলিয়া প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য অ্যালেলিক জীনও চারিবার করিয়া থাকে। অ্যালেলিক জীনগুলির মিশ্রণ চারি প্রকার হইতে পারে। চারিটি

প্রবলগুণ (dominant gene) AAAA একত্র হইলে, তাহাকে কোয়াড্রুপ্লেক্স (quadruplex), তিনটি প্রবলগুণ ও একটি প্রচ্ছন্নগুণ (recessive gene) AAAa একত্র হইলে তাহাকে ট্রিপ্লেক্স (triplex) ; দুইটি প্রবল ও দুইটি প্রচ্ছন্নগুণে AAaa একত্র হইলে তাহাকে ডুপ্লেক্স (duplex) ; একটি প্রবল ও তিনটি প্রচ্ছন্নগুণে Aaaa একত্র হইলে তাহাকে সিমপ্লেক্স (simplex) এবং চারিটি প্রচ্ছন্নগুণ, aaaa একত্র হইলে তাহাকে নালিপ্লেক্স (nulliplex) বলে।

দুইটি $2n$ ক্রোমোজোম সমেত জনন কোষের মিলনের ফলে একটি $4n$ জাইগোট উৎপন্ন হইতে পারে। $2n$ জননকোষ একটি ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ হইতে অস্বাভাবিক মায়োসিসের ফলে উৎপন্ন হইতে পারে অথবা একটি টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদ হইতে স্বাভাবিক মায়োসিসের মধ্য দিয়া উৎপন্ন হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে আবার ডিপ্লয়েড জাইগোটে ক্রোমোজোম দ্বিগুণিকরণের (Chromosome doubling) মাধ্যমেও একটি টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদের জন্ম হইতে পারে $2n \longrightarrow 4n$।

অ্যালোপলিপ্লয়েডী (Allopolyploidy)--অ্যালোপলিপ্লয়েড উদ্ভিদ বলিতে সেই সকল উদ্ভিদকে বোঝায় যাহাদের মধ্যে গুণিতকরূপে অবস্থিত ক্রোমোজোম-গোষ্ঠীগুলির পরস্পরের মধ্যে কোন মিল থাকে না। অর্থাৎ ঐ ক্রোমোজোম গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন জীনোমের অন্তর্গত। এইরূপ উদ্ভিদ, দুইটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যৌন জনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। যেহেতু দুইটি প্রজাতির জীনোম আলাদা সুতরাং নূতন সংকর উদ্ভিদটি ডিপ্লয়েড অবস্থায় সম্পূর্ণ অনুর্বর হয়। এইরূপ হইবার কারণ মায়োসিসের সময় ক্রোমোজোমগুলির হোমোলোগ (সমসংস্থ জুরি) না থাকায় বাই-ভ্যালেন্ট গঠিত হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ উদ্ভিদের ক্রোমোজোম যখন দ্বিগুণ হইয়া যায়, অর্থাৎ $2n$ হইতে $4n$ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহা স্বাভাবিক ডিপ্লয়েডের ন্যায় আচরণ করে।

দুইটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রজনের মাধ্যমে তাহাদের ক্রোমোজোম একত্রে যুক্ত হইয়া প্রকৃতিতে পলিপ্লয়েড উদ্ভিদের সৃষ্টি হইতেছে – এই তত্ত্ব 1917 খ্রীষ্টাব্দে O. Winge প্রকাশ করেন। ধরা যাক, দুইটি প্রজাতি যাহাদের প্রত্যেকের ক্রোমোজোম সংখ্যা $n=8$. কিন্তু উহাদের জীনোম আলাদা। সুতরাং উহাদের ক্রোমোজোম গোষ্ঠীর মধ্যে কোন মিল নাই। ইহাদের জীনোম যথাক্রমে A ও B অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করিলে (A ও B পৃথকভাবে আটটি করিয়া ক্রোমোজোম সূচিত করিতেছে) ডিপ্লয়েড প্রজাতি দুইটি হইবে যথাক্রমে AA ও BB। এই দুইটি প্রজাতির মিলনে যে সংকর উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় তাহার জীনোম হইবে AB এবং ক্রোমোজোম সংখ্যা $2n=16$। Winge ধরিয়া লইলেন যে, সংকর উদ্ভিদের দেহ গঠনের কোন এক অবস্থায় (সম্ভবত জাইগোট অবস্থায়) উহার ক্রোমোজোম দ্বিগুণ হইয়া একটি পলিপ্লয়েড উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। যেমন, AB$\longrightarrow$AABB। প্রথম অবস্থায়, অর্থাৎ ডিপ্লয়েড অবস্থায়, উহার বীজ উৎপন্ন হইবে না, কিন্তু টেট্রাপ্লয়েড অবস্থায় দুইটি A জীনোমের ক্রোমোজোম পরস্পর জোড় বাঁধিয়া

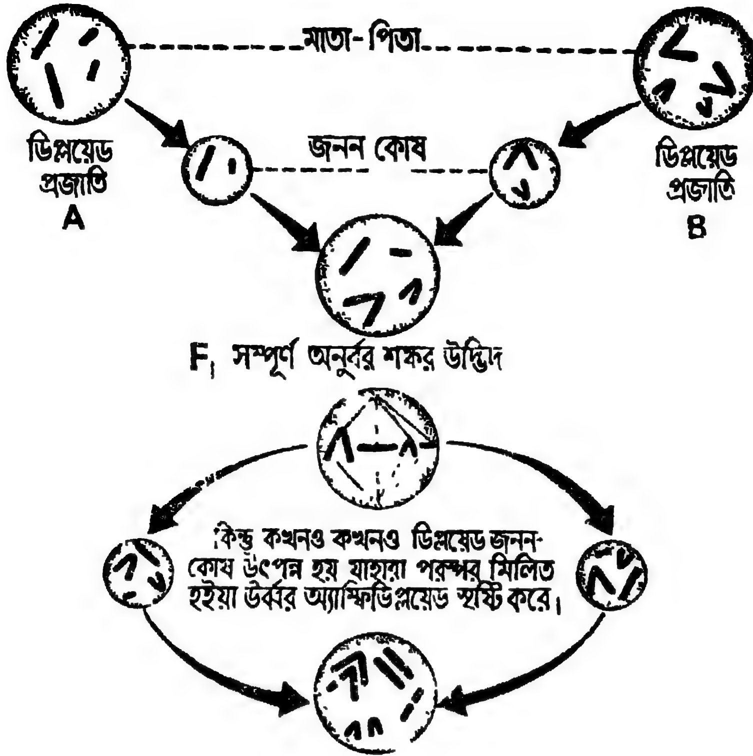
বাইভ্যালেণ্ট গঠন করিবে; এবং দুইটি B জীনোমের ক্রোমোজোম পরস্পর জোড় বাঁধিয়া বাইভ্যালেণ্ট গঠন করিবে। সুতরাং টেট্রাপ্লয়েড অবস্থায় 16টি বাইভ্যালেণ্ট গঠিত হইবে। এইরূপ একটি টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদের সহিত যদি অন্য একটি প্রজাতির সংকর জনন অনুষ্ঠিত হয়, যাহার জীনোম, ধরা যাক, "CC", তাহা হইলে যে উদ্ভিদের সৃষ্টি হইবে তাহার জীনোম-সূত্র (genomic formula) হইবে ABC। উৎপন্ন উদ্ভিদটি ট্রিপ্লয়েড কিন্তু সম্পূর্ণ অনুর্বর (sterile)। উর্বরতা প্রাপ্ত হইতে হইলে ইহাকেও পূর্বের ন্যায় ক্রোমোজোম দ্বিগুণিকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে যাইতে হইবে। এক্ষেত্রে উহা একটি হেক্সাপ্লয়েড ($6n = 48$) উদ্ভিদ হইবে যাহার জীনোম AABBCC।

উপরিউক্ত উদ্ভিদ দুইটি, টেট্রাপ্লয়েড এবং হেক্সাপ্লয়েড, উভয়ই স্বাভাবিক ডিপ্লয়েডের ন্যায় আচরণ করিবে এবং উহারা তাহাদের ডিপ্লয়েড পিতা-মাতা উদ্ভিদ হইতে বৈশিষ্ট্যগত দিক হইতে পৃথক হইয়া নূতন প্রজাতিরূপে চিহ্নিত হইবে। Winge-এর এই তত্ত্ব নানাভাবে প্রমাণিত হইয়াছে এবং বর্তমানে দেখা গিয়াছে যে এই পদ্ধতিতে প্রকৃতিগতভাবে নূতন নূতন প্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে।

উৎপত্তি, জীনোমের সংখ্যা ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া অ্যালোপ্লয়েডীকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। যথা, (ক) প্রকৃত অর্থাৎ জীনোমিক অ্যালোপলিপ্লয়েডী অথবা অ্যাম্ফিডিপ্লয়েডী (True or genomic allopolyploidy or Amphidiploidy); (খ) অটো-অ্যালোটেট্রাপ্লয়েডী (Auto-allotetraploidy) এবং (গ) সেগমেণ্টাল অ্যালোপলিপ্লয়েডী (Segmental allopolyploidy)।

(ক) প্রকৃত অর্থাৎ জীনোমিক অ্যালোপলিপ্লয়েডী অথবা অ্যাম্ফিডিপ্লয়েডী (True or genomic allopolyploidy or Amphidiploidy) এই প্রকার অ্যালোপলিপ্লয়েডী দুইটি বা তাহার অধিক সম্পর্কহীন প্রজাতির মধ্যে সংকর জনন পদ্ধতির দ্বারা উৎপন্ন হয়। প্রজাতিগুলির ক্রোমোজোমের মধ্যে এত পার্থক্য থাকে যে উহাদের মধ্যে কোনরূপ জোড় বাঁধার সম্ভাবনা থাকে না। সেই কারণে এইরূপ উদ্ভিদ খুবই অনুর্বর। বীজ উৎপন্ন না হইলে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবার সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং উহাদের উর্বরতা পুনরুজ্জীবিত করিতে বা সার্থক বীজ উৎপন্ন করিতে ক্রোমোজোমের দ্বিগুণকরণের দ্বারা টেট্রাপ্লয়েড অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। পলিপ্লয়েড অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এই উদ্ভিদ সাধারণ ডিপ্লয়েডের ন্যায় আচরণ করে। সাধারণ ডিপ্লয়েড হইতে তখন ইহাদের পার্থক্য করা বা পৃথক করা খুবই কষ্টকর। **সুতরাং অ্যাম্ফিডিপ্লয়েড বলিতে আমরা সেই সকল উদ্ভিদ বুঝি যাহারা যদিও অ্যালো-টেট্রাপ্লয়েড অথবা অ্যালোহেক্সাপ্লয়েড কিন্তু তাহাদের আচরণ একটি ডিপ্লয়েড উদ্ভিদের ন্যায়** (৬১নং চিত্র)। প্রকৃতিতে এইরূপ উদ্ভিদের উদাহরণ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা সকলেই নূতন প্রজাতিরূপে চিহ্নিত হইয়া আছে। তবে সকল

ক্ষেত্রে উহাদের উৎপত্তি সঠিকরূপে জানা যায় না বলিয়া তাহাদের সাধারণ ডিপ্লয়েড বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

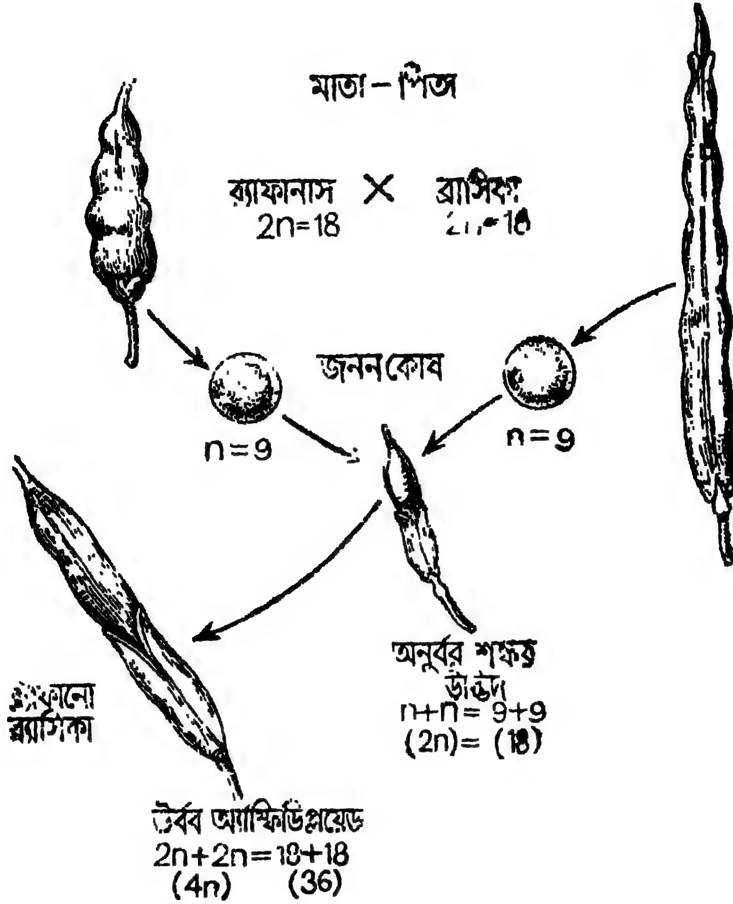


৬১নং চিত্র—অ্যাম্ফিডিপ্লয়েডী অনুষ্ঠিত হইবার আদর্শ ধারাবাহিক ক্রম

রাশিয়ান বিজ্ঞানী Karpechenko (কারপেচেন্‌কো) মূলা ও বাঁধাকপির মধ্যে শঙ্কর জনন ঘটাইয়া একটি অ্যাম্ফিডিপ্লয়েড উদ্ভিদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ দুইটি প্রজাতির মধ্যে জনন প্রক্রিয়ার ফলে যে উদ্ভিদ তিনি পাইলেন তাহা ডিপ্লয়েড হইলেও বীজ ধারণে অক্ষম ছিল। কিন্তু অবশেষে তিনি এমন একটি শঙ্কর উদ্ভিদ পাইলেন যাহা সম্পূর্ণ উর্বর অর্থাৎ বীজ দ্বারা বংশ বিস্তারে সক্ষম। কারপেচেন্‌কোর প্রজনন (breeding) পরীক্ষার ফল চিত্রের সাহায্যে দেখান হইল (৬২নং চিত্র)।

মূলা (*Raphanus sativus*) এবং বাঁধাকপি (*Brassica oleracea*) প্রজাতি দুইটি ব্র্যাসিকেসী (Brassicaceae) গোত্রভুক্ত উদ্ভিদ, প্রত্যেকটি ডিপ্লয়েড, এবং উহাদের ক্রোমোজোম সংখ্যা $2n=18$ কিন্তু উহাদের জীনোম পরস্পর হইতে ভিন্ন। মায়োসিসের সময় স্বাভাবিক 9টি বাইভ্যালেণ্ট গঠিত হয়। F_1 সংকর উদ্ভিদে ক্রোমোজোম সংখ্যা $2n=18$, এই আঠারটি ক্রোমোজোমের মধ্যে নয়টি র‍্যাফানাসের এবং বাকি নয়টি ব্র্যাসিকার। উহাদের পৃথক সত্তা সংকর উদ্ভিদের মধ্যে খুবই প্রকটরূপে প্রকাশিত হয় এবং মায়োসিসের সময় 18টি ক্রোমোজোম মনোভ্যালেণ্ট (monovalent) রূপে অবস্থান করে। ইহার ফলে স্বাভাবিক বা সম্পূর্ণ জনন কোষ উৎপন্ন হইতে

পারে না। কিন্তু এক সময় এই অনুর্বর সংকর উদ্ভিদে কয়েকটি বীজ তিনি পাইলেন। বীজগুলি হইতে যে বংশের সৃষ্টি হইল সেগুলি সকলেই উর্বর এবং তিনি দেখিলেন উহাদের ক্রোমোজোম সংখ্যার $2n = 18$-এর পরিবর্তে $4n = 36$ হইয়াছে এবং মায়োসিসের

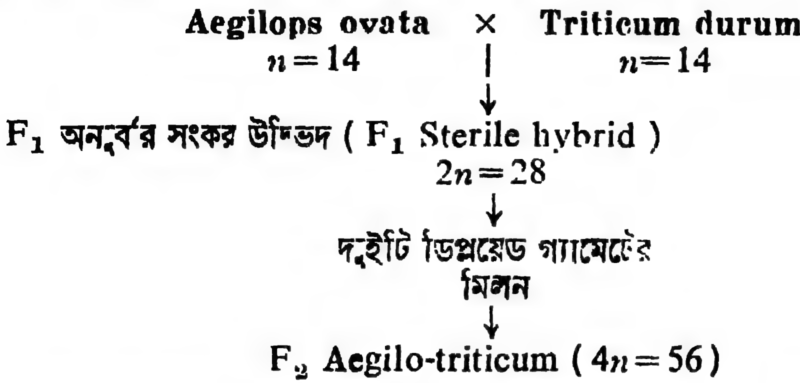


৬২নং চিত্র—র‍্যাফানোব্রাসিকার উৎপত্তি। চিত্রে বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা ও ফলের আকৃতি দেখান হইয়াছে।

সময় 18টি বাইভ্যালেণ্ট গঠিত হইতেছে। কারপেচেন্‌কো এই নবগঠিত উর্বর সংকর উদ্ভিদের নাম রাখিলেন *Rhaphanobrassica* (র‍্যাফানোব্রাসিকা)। ইহার 36টি ক্রোমোজোমের 18টি র‍্যাফানাসের এবং অবশিষ্ট 18টি ব্রাসিকার। সুতরাং এখানে সর্বমোট চারিটি জীনোম বর্তমান। যদি র‍্যাফানাসের জীনোম 'R' অক্ষর এবং ব্রাসিকার জীনোম 'B' অক্ষর দ্বারা সূচিত করা যায় তাহা হইলে *Rhaphanobrassica*-এর জীনোম হইবে 'RRBB'। দুইটি 'R' জীনোমভুক্ত 18টি ক্রোমোজোম পরস্পর জোড় বাঁধিয়া 9টি বাইভ্যালেণ্ট এবং দুইটি 'B' জীনোমভুক্ত 18টি ক্রোমোজোম পরস্পর জোড় বাঁধিয়া আরও 9টি বাইভ্যালেণ্ট, মোট 18টি বাইভ্যালেণ্ট গঠিত হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে F_2 উদ্ভিদ একটু বেশী স্বাস্থ্যবান, এখানে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহা পিতামাতা উদ্ভিদ অপেক্ষা বেশী দীর্ঘ। Katayama এবং Kihara 1921 খ্রীষ্টাব্দে এজিলপ্‌স্‌ ও ট্রিটিকাম-এর দুইটি প্রজাতির মধ্যে সংকর

জনন অনুষ্ঠিত করিয়া এইরূপ একটি অ্যাম্ফিডিপ্লয়েড উৎপন্ন করিয়াছিলেন (এজিলো-ট্রিটিকাম)। উভয় ক্ষেত্রেই দুইটি ডিপ্লয়েড জনন কোষের (গ্যামেট) মিলনের ফলে উর্বর, অ্যাম্ফিডিপ্লয়েড উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছিল।



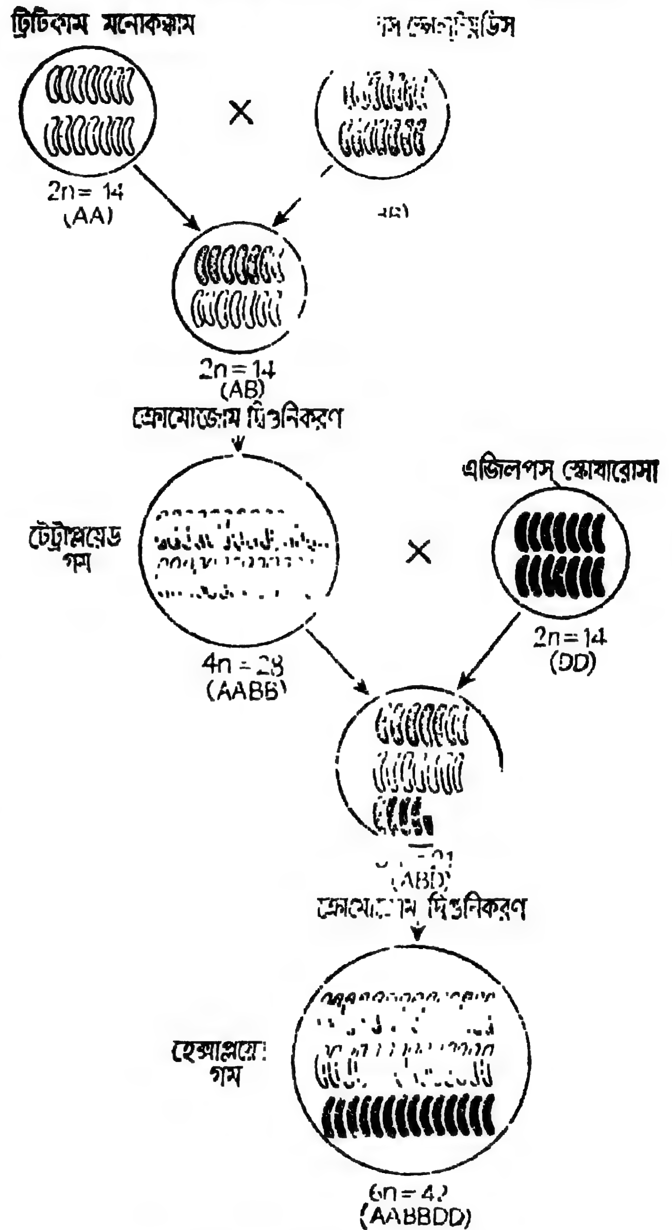
র‍্যাফানোব্রাসিকা এবং এজিলোট্রিটিকাম কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতিতে এইরূপ অ্যাম্ফিডিপ্লয়েড উদ্ভিদের প্রচুর উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপায়ে বিপরীত জনন কার্য সম্পন্ন হইয়া নূতন নূতন অ্যাম্ফি-ডিপ্লয়েড প্রজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমানে ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে উপরিউক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে বহু পলিপ্লয়েড প্রজাতির উৎপত্তি হইয়া (speciation) অভিব্যক্তি (evolution) সম্ভব হইয়াছে।

সাধারণ গমের (*Triticum aestivum*) উদাহরণ ধরা যাক। উহা একটি হেক্সাপ্লয়েড উদ্ভিদ। এখানে তিনটি জীনোম রহিয়াছে। ইহার জীনোম সূত্র AABBDD। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে D জীনোমটি, টিট্রিকামের নিকট সম্পর্কযুক্ত গণ এজিলপ্‌স্ স্কোয়ারোসা (*Aegilops squarosa*) হইতে আসিয়াছে। গম উৎপাদনকারী প্রজাতির উৎপত্তি দুই স্তরে হইয়াছে। প্রথম স্তরে একটি টেট্রাপ্লয়েড AABB প্রজাতি যাহা 'আইনকর্ণ'-দলভুক্ত প্রজাতি *T. monococcum* ও *A. speltoides*-এর মধ্যে সংকর জনন প্রক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় স্তরে 'ইমার'-দলভুক্ত একটি প্রজাতির সহিত (*T. dicoccoides*) *Aegilops squarosa*-এর সংকর জনন হইয়া ট্রিটিকাম এস্টিভাম সাবস্পিসিস্ স্পেল্টা (*T. eastivum sub. sp. spelta*) উৎপন্ন হইয়াছে (৬৩নং চিত্র)। সাব-স্পিসিস্ স্পেল্টার সহিত ট্রি. এস্টিভ্যাম সাব-স্পিসিস ভুলগেয়ারের প্রচুর মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

একই গণের দুইটি প্রজাতির মধ্যে সংকর জনন হইয়া অ্যাম্ফিডিপ্লয়েড প্রজাতির সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে *Primula kewensis, Galeopsis tetrahit, Nicotiana diglutta* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

P. floribunda ($n = 9$) ও *P. verticillata* ($n = 9$) হইতে *P. kewensis* ($4n = 36$); *N. glutinosa* ($n = 12$) ও *N. tabacum* ($n = 24$) হইতে *N. digulata* ($4n = 72$); এবং *G. pubescens*) ($n = 8$) ও *G. speciosa* ($n = 8$) হইতে *G. tetrahit* ($4n = 32$) প্রভৃতি উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়াছে।

Muntzing (1930, 1932) *G, pubescens* ও *G. speciosa* প্রজাতি দুইটির মধ্যে বিপরীত পরাগযোগ সংঘটিত করিয়া একটি সংকর উদ্ভিদ (F_1) সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর ঐ F_1 উদ্ভিদ-গুলি হইতে স্বপরাগযোগের সাহায্যে F_2 জেনারেশান (generation) সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাইয়া পরিশেষে তিনি একটি টেট্রাপ্লয়েড গ্যালিওপ্সিস প্রজাতি পাইলেন যাহার ক্রোমোজোম সংখ্যা ছিল $4n=32$। এই উদ্ভিদটি সম্পূর্ণ উর্বর ও ডিপ্লয়েডের ন্যায় বাইভ্যালেণ্ট গঠন করে। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে তাঁহার সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদটি প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত *G. tetrahit*-এর অনুরূপ, এবং কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক প্রজাতি দুইটির মধ্যে স্বাভাবিক জনন, অনুষ্ঠিত হইতে পারে। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে এই দুইটি প্রজাতির কোনটারই সহিত *G. pubescens* অথবা *G. speciosa*-এর সংকর জনন সংঘটিত হইতে পারে না।



৬৩নং চিত্র—হেক্সাপ্লয়েড গমের উৎপত্তি

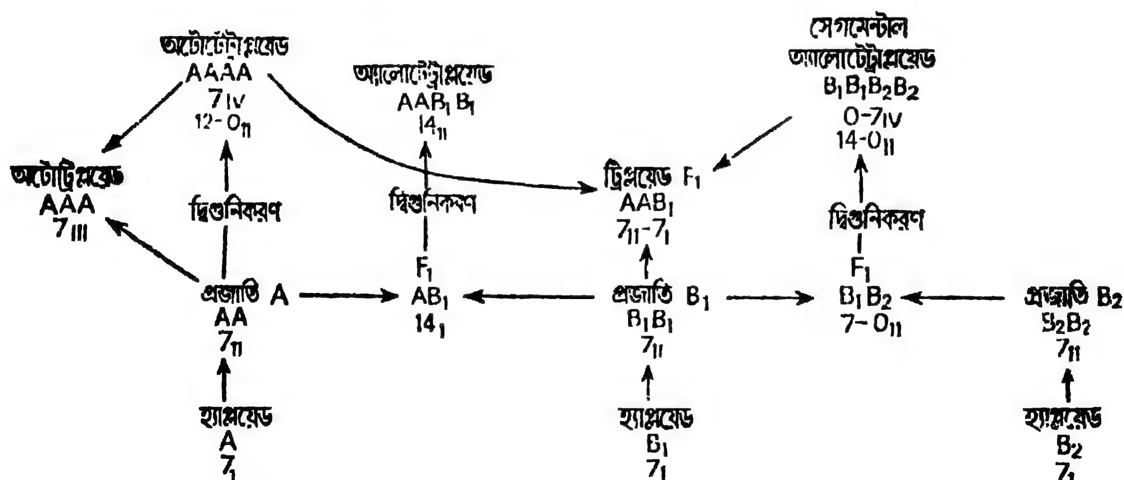
এই সকল প্রমাণাদি হইতে ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংকর জনন অনুষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ অ্যালোপলিপ্লয়েডীর মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন জীনোমের সংমিশ্রণের দ্বারা নূতন নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হইয়াছে বা হইতেছে।

(খ) অটো-অ্যালো টেট্রাপ্লয়েডী (Auto-allopolyploidy)—ইহা কেবলমাত্র হেক্সাপ্লয়েড বা তাহার অধিক মাত্রায় অবস্থিত থাকে। ইহাদের জীনোমসূত্র AAAABB অথবা AAAABBBB ইত্যাদি হইয়া থাকে। সুতরাং অটো-অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড বলিতে

সেই সকল অ্যালোপ্লয়েড উদ্ভিদকে বোঝায় যেখানে যে-কোন একটি জীনোমের পরপর চারিবার পুনরাবৃত্তি হয়। *Helianthus tuberosus, Solanum nigrum, Nicotiana tabecum* এবং *Chrysanthemum* ও *Fragaria*-এর কয়েকটি প্রজাতি এই প্রকার অ্যালোপলিপ্লয়েডীর উদাহরণ।

(গ) **সেগমেন্টাল অ্যালোপলিপ্লয়েডী** (Segmental allopolyploidy) – সেগমেন্টাল অ্যালোপলিপ্লয়েড উদ্ভিদে সাধারণত দুই জোড়া জীনোম অবস্থিত থাকে। অন্যান্য অ্যালোপলিপ্লয়েডীর ন্যায় এই জীনোম দুইটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির নয়। ইহাদের মধ্যে কিছু মিল থাকিয়া যায়। ফলে দুইটি জীনোমের অন্তর্ভুক্ত ক্রোমোজোমের মধ্যে সাইন্যাপসিস (জোড় বাঁধা) সংঘটিত হইতে দেখা যায়। এইরূপ অবস্থাকে অটোপলিপ্লয়েড ও অ্যালোপলিপ্লয়েডের মাঝামাঝি অবস্থা বলা যাইতে পারে। অটো-পলিপ্লয়েডীর ক্ষেত্রে জীনোমগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ মিল থাকে। যেমন, (AAAA) কিন্তু অ্যালোপলিপ্লয়েডীর ক্ষেত্রে জীনোমগুলি ভিন্ন প্রকৃতির। যেমন, (AABB) এবং সেগমেন্টাল অ্যালোপ্লয়েডীর ক্ষেত্রে জীনোম হইলে $B_1B_1B_2B_2$ অথবা $A_1A_1A_2A_2$। সুতরাং অটোপলিপ্লয়েড ও অ্যালোপলিপ্লয়েডীকে দুইটি চরম অবস্থার নিদর্শন বলা যাইতে পারে, যেখানে জীনোমগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ মিল ও সম্পূর্ণ অমিল দেখা যায় এবং সেগমেন্টাল অ্যালোপলিপ্লয়েডীকে এই দুই চরম অবস্থার মধ্যবর্তী দশা বলা যায়, যেখানে জীনোমগুলির মধ্যে কিছু পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। সাধারণ আলু *Solanum tuberosum* (সোলানাম টিউবারোসাম) এইপ্রকার উদ্ভিদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অটোটেট্রাপ্লয়েড, অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড ও সেগমেন্টাল অ্যালোটেট্রাপ্লয়েডের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিম্নে চিত্রের সাহায্যে বোঝান হয়।



৬৪নং চিত্র—৭টি ক্রোমোজোমযুক্ত কাল্পনিক হাপ্লয়েড প্রজাতি হইতে উৎপন্ন অটোপলিপ্লয়েড, অ্যালো-পলিপ্লয়েডী ও সেগমেন্টাল অ্যালোপলিপ্লয়েডীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখান হইয়াছে। প্রতিটি নমুনা প্রজাতির নীচে ইউনিভ্যালেন্ট (i), বাইভ্যালেন্ট (ii), ট্রাইভ্যালেন্ট (iii) এবং টেট্রাভ্যালেন্ট (iv) ক্রোমোজোম সংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে B_1 এবং B_2 জীনোমভুক্ত ক্রোমোজোম পরস্পর A জীনোমভুক্ত ক্রোমোজোম হইতে অধিক সম্পর্কযুক্ত বলিয়া ধরা হইয়াছে। [অটোটেট্রাপ্লয়েড প্রজাতির ক্রোমোজোম 12 স্থলে 14 পড়িতে হইবে]

অটোপলিপ্লয়েড ও অ্যালোপলিপ্লয়েড উদ্ভিদ চিনিবার উপায়—অটোপলিপ্লয়েডী ও অ্যালোপলিপ্লয়েডী—এই দুইটি ঘটনা সম্পূর্ণ আলাদা নয়। অটোপলিপ্লয়েডের মধ্যে একটি জীনোমের তিনবার বা তাহার অধিক পুনরাবৃত্তি হয়।

অ্যালোপলিপ্লয়েড বিশেষত হেক্সাপ্লয়েড বা তাহার অধিক মাত্রার পলিপ্লয়েডের মধ্যে যে-কোন একটি জীনোম তিনবার বা তাহার অধিক সংখ্যায় উপস্থিত থাকে। সুতরাং এই দুই পলিপ্লয়েড ধরনের মধ্যে পার্থক্য করা খুবই কষ্টকর। অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড বা অ্যাম্ফিডিপ্লয়েড উদ্ভিদ যেখানে সাধারণ ডিপ্লয়েডের ন্যায় কেবল বাইভ্যালেন্ট গঠিত হয় তাহাকেও চিহ্নিত করা আরও কঠিন।

পলিপ্লয়েড ধরন জানিবার জন্য প্রধানত ক্রোমোজোমের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করা হয়। মাল্টিভ্যালেন্ট গঠিত হইলে স্বাভাবিকভাবে তাহাকে অটোপ্লয়েড বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু সকল সময় তাহা সঠিক নাও হইতে পারে। কারণ, কখনও কখনও অ্যালোহেক্সাপ্লয়েড ও অ্যালোঅক্টাপ্লয়েড উদ্ভিদে মাল্টিভ্যালেন্ট গঠিত হইতে পারে। এই সম্পর্কে স্টেবিন্সের মতবাদ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, 'অটোপলিপ্লয়েড এমনই একটি পলিপ্লয়েড যাহার অনুরূপ ডিপ্লয়েড একটি উর্বর উদ্ভিদ, কিন্তু অ্যালোপলিপ্লয়েড এমনই একটি পলিপ্লয়েড যেখানে একটি প্রায় অনুর্বর সংকর উদ্ভিদের দ্বিগুণ জীনোম অবস্থিত থাকে"।

অ্যালোপলিপ্লয়েড উদ্ভিদে মায়োসিস বিভাজনে ক্রোমোজোমের আচরণ—স্বাভাবিক বাইভ্যালেন্ট গঠন ছাড়া ইউনিভ্যালেন্ট ও মাল্টিভ্যালেন্ট গঠন দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে **অ্যালোসিণ্ডেসিস** (Allosyndesis) এবং **অটোসিণ্ডেসিস** (Autosyndesis) দেখিতে পাওয়া যায়। অ্যালোসিণ্ডেসিস, যখন দুইটি ভিন্ন জীনোমের ক্রোমোজোম পরস্পর জোড় বাঁধে ; এবং অটোসিণ্ডেসিস, যখন একটি জীনোম ভুক্ত দুইটি ক্রোমোজোম পরস্পর জোড় বাঁধে। এইরূপ জোড় বাঁধা প্রধানত সেগমেন্টাল অ্যালোপলিপ্লয়েডীর ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহা ছাড়া আরও একপ্রকার ক্রোমোজোম মিলন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে গোণ মিলন বা সেকেণ্ডারী অ্যাসোসিয়েশান (Secondary association) বলে। এই ধরনের মিলন বাইভ্যালেন্ট ক্রোমোজোমের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বহু পুরাতন সম্পর্কযুক্ত কতকগুলি বাইভ্যালেন্ট ক্রোমোজোম পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া একটি দল গঠন করে। এইরূপ দলবদ্ধ মিলনকে গোণ মিলন বলে। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে গোণ মিলনে আবদ্ধ বাইভ্যালেন্টগুলির মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সূত্রের যোগ স্থাপিত হয়। গোণ মিলন অ্যালোপলিপ্লয়েড চিহ্নিতকরণের একটি নির্ভুল নিদর্শন।

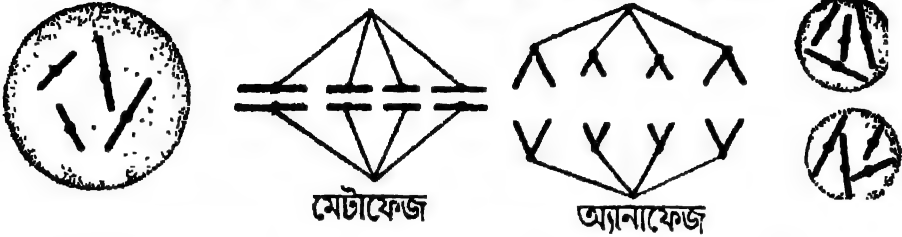
কৃত্রিম উপায়ে পলিপ্লয়েডীর উৎপাদন (Artificial induction of polyploidy)—কৃত্রিমভাবে পলিপ্লয়েডী সংঘটিত করিতে যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে তাহাদের মূল উদ্দেশ্য প্রধানত একটাই—তাহা হইলে স্বাভাবিক

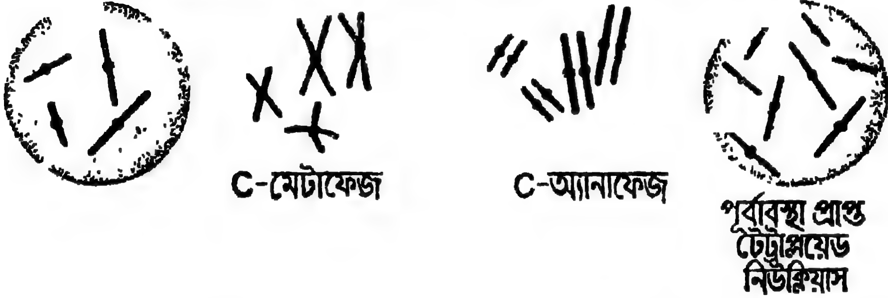
কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাহার ফলে ক্রোমাটিডের বা ক্রোমোজোমের দুই মেরু প্রান্তে চলন বাধা পায়। ক্রোমোজোমগুলি বা ক্রোমাটিডগুলি দুই মেরুতে না গিয়া একটি কোষের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় এবং তাহার ফলে ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণিত হইয়া যায়। অধিক বা অল্প মাত্রায় তাপ প্রয়োগ এবং নারকোটিক গুণ সম্পন্ন বস্তু (আচ্ছন্নতা বা অসাড়তা উদ্রেকের ঔষধ) সমূহ মাইটোসিস বা মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় প্রয়োগ করিয়া ক্রোমোজোম দ্বিগুণিত করা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া অন্যভাবেও ক্রোমোজোম দ্বিগুণিত হইয়া টেট্রাপ্লয়েডের সূচনা হইতে পারে, যেমন. টম্যাটো গাছে অগ্রমুকুল কাটিয়া দিলে অনেক সময় কাটা অংশের পার্শ্বদেশ হইতে যে শাখা বাহির হয় তাহা ডিপ্লয়েডের পরিবর্তে টেট্রাপ্লয়েড হইয়া থাকে। ভুট্টার কাক্ষিক মুকুলে তাপ প্রয়োগ করিয়া বা ড্রাসোফিলায় ঠাণ্ডা প্রয়োগ করিয়া একই ফল পাওয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বস্তু যেমন, ক্লোরালহাইড্রেট (Chloralhydrate), অ্যাসিন্যাপ্‌থেন্ (acenaphthene), সালফানিলঅ্যামাইড্ (sulfanilamide) ইথাইল-মারকারি-ক্লোরাইড (ethyl-mercury-chloride), হেক্সাক্লোরোসাইক্লোহেক্সেন (hexachlorocyclohexane), এবং কলচিসিন্ (colchicine) ইত্যাদি সাহায্যে পলিপ্লয়েডী সংঘটিত করা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে **কলচিসিন** (colchicin) খুবই ফলপ্রসূ। ইহা একটি অ্যাল্‌কালয়েড, কলচিকাম অটামনেল (Colchicum autumnale) নামক উদ্ভিদের গুঁড়ি কন্দ (corm) হইতে পাওয়া যায়। কলচিসিন অ্যালকালয়েডটি জলে দ্রবীভূত হয় এবং ইহা উদ্ভিদের উপর সাধারণত যে মিশ্রণে ব্যবহৃত করা হইয়া থাকে, তাহা কোন প্রকার বিষক্রিয়া করে না। ব্লেকস্‌লী এবং আরও কয়েকজন আমেরিকান বিজ্ঞানী ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলচিসিনের ক্রোমোজোম দ্বিগুণিত করার ক্ষমতা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অসংখ্য পরীক্ষাগারে বহু উদ্ভিদের উপর কলচিসিন প্রয়োগ করিয়া টেট্রাপ্লয়েডী সংঘটিত করা হইয়াছে।

উদ্ভিদকোষে কলচিসিনের প্রভাবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়াছে। প্রথমত যতক্ষণ ইহা প্রয়োগ করা হয়, ততক্ষণ ইহার প্রভাব বর্তমান থাকে, কিন্তু যখনই উহাকে অপসারিত করা হয় তখন তাহার প্রভাবও চলিয়া যায়। অর্থাৎ ইহার প্রভাব সাময়িক। সাময়িকভাবে ইহা মাকুতন্তু (স্পিণ্ডল তন্তু) গঠনে বাধা দেয় ফলে, স্বাভাবিক মাইটোসিসের ঈষৎ পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তিত মাইটোসিসকে "কলচিসিন্ মাইটোসিস" বা সংক্ষেপে "সি-মাইটোসিস (C-mitosis) বলে। মাকুতন্তু গঠিত না হওয়ায় লম্বভাবে বিভক্ত ক্রোমোজোমগুলি সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত থাকে। সি-মাইটোসিসের এই দশাকে সি-মেটাফেজ (C-metaphase) বলা হয়। সি-অ্যানাফেজ দশায় ভগিনী ক্রোমাটিডদ্বয় (sister chromatids) পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাশাপাশি অবস্থান করে এবং টেলোফেজ দশায় একটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণিত করে।

পলিপ্লয়েড কোষ ($2n \rightarrow 4n$) পরবর্তী বিভাজন চক্রে স্বাভাবিক মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া পলিপ্লয়েড কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। পুষ্প মুকুল, অগ্রমুকুল, কাক্ষিকমুকুল ইত্যাদি স্থানে কলচিসিন প্রয়োগ করিয়া টেট্রাপ্লয়েড শাখা বা পুষ্পশাখা ইত্যাদি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। টেট্রাপ্লয়েড পুষ্প হইতে ডিপ্লয়েড





৬৫নং চিত্র—স্বাভাবিক মাইটোসিসের সহিত কলচিসিন আবিষ্ট মাইটোসিসের তুলনা।

জনন কোষ উৎপন্ন হয় এবং পরিশেষে টেট্রাপ্লয়েড বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কলচিসিন প্রয়োগ করিয়া যে পলিপ্লয়েডী সংঘটিত করা হয় তাহাকে **কলচিপ্লয়েডী** (colchiploidy) বলে।

মায়োসিস প্রক্রিয়ার সময় কলচিসিন প্রয়োগ করিয়া প্রথম অ্যানাফেজ বা দ্বিতীয় অ্যানাফেজ দশায় মাকুতন্তু গঠনে বাধা সৃষ্টি করিয়া ডিপ্লয়েড জনন কোষ উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। মায়োসিসের প্রথম বিভাজনে ক্রোমোজোম পৃথকীকরণে বাধা সৃষ্টির ফলে $2n$ সংখ্যক ক্রোমোজোম একটি নিউক্লিয়াস ভুক্ত হইয়া প্রথমে একটি রেস্টিটিউশান নিউক্লিয়াস (restitution nucleus) গঠিত হয় এবং পরবর্তী ইকোয়েশনাল বিভাজনে চারিটি হ্যাপ্লয়েড কোষের পরিবর্তে দুইটি ডিপ্লয়েড কোষের সৃষ্টি হয়। মায়োসিসের দ্বিতীয় বিভাজনের সময় মাকুতন্তু গঠিত না হইলেও পূর্বের ন্যায় ডিপ্লয়েড জননকোষ উৎপন্ন হইতে পারে।

পলিপ্লয়েডী ও অভিব্যক্তি (Polyploidy and Evolution)

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে উদ্ভিদ রাজ্যের মোট উদ্ভিদের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী উদ্ভিদ পলিপ্লয়েড। এই পরিসংখ্যান হইতে ইহা ধারণা করা ভুল হইবে না যে নূতন

প্রজাতি সৃষ্টিতে বা অভিব্যক্তিতে পলিপ্লয়েডীর একটি বিরাট অবদান রহিয়াছে। ল্যামার্ক, ডারউইন, দ্যি-ভ্রিস প্রভৃতি প্রকৃতিবিদগণের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে মতবাদ সমূহ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে অভিব্যক্তির এমন বহুদিক রহিয়াছে যাহা অত্যন্ত ধীর গতিতে প্রবাহিত হইয়া বিভিন্ন জীবের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিতেছে এবং সেই সকল পার্থক্য সমূহ ধীরে ধীরে একত্রিত হইয়া নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু অভিব্যক্তির এই সময়-হরণকারী উপায় ছাড়া অন্তত একটি উপায় আমরা দেখিতে পাই যাহার দ্বারা বেশ দ্রুত গতিতে বা হঠাৎ আবির্ভাবের মত নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হয়—সেই উপায় হইল পলিপ্লয়েডী।

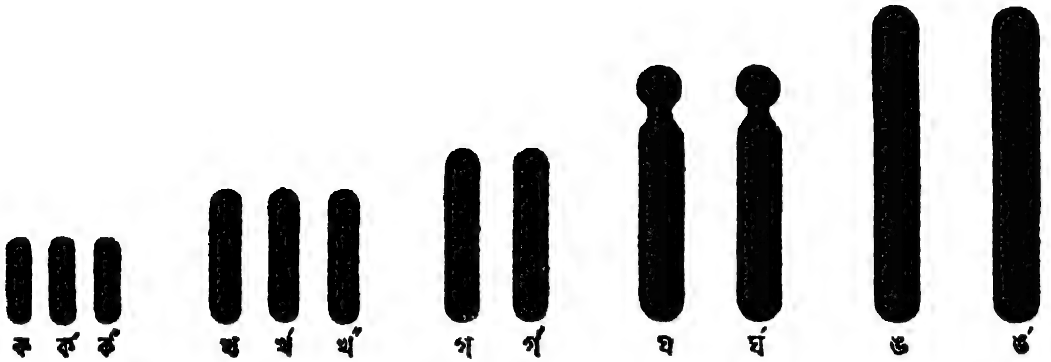
আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে কিরূপে অ্যালোপলিপ্লয়েডীর সাহায্যে (বিশেষত অ্যাম্‌ফিডিপ্লয়েডী) নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু অটোপলিপ্লয়েডীর বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সেখানে একই জিনোম বার বার যোগ হওয়ার জন্য নূতন কোন বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ সম্ভব হইতেছে না। সেখানে যাহা হইতেছে তাহা হইল একই ক্রোমোজোম তিন কিম্বা তাহার অধিকবার থাকার জন্য স্বাভাবিক কাজকর্মের পরিবর্তন এবং একই বৈশিষ্ট্যের অতিরিক্ত বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু অ্যালোপলিপ্লয়েডীর ফলে বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একটি উদ্ভিদের মধ্যে মিশ্রিত হইয়া নূতন ও উন্নত ধরনের প্রজাতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। তবে এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে অ্যালো-পলিপ্লয়েডী কোন নূতন বৈশিষ্ট্যের বা চরিত্রের সৃষ্টি করিতেছে না; পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের মাধ্যমে যে সকল নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য আবির্ভূত হয় তাহাদেরই নূতন সংমিশ্রণ সৃষ্টি করে মাত্র।

পলিপ্লয়েডী যে সকল সময় নূতন প্রজাতি সৃষ্টিতে বা অভিব্যক্তিতে সাহায্য করিতেছে তাহা নয়। ইহার কিছু বিপরীত কার্যও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করিয়া অটো-পলিপ্লয়েডী, যেখানে যদিও নূতন বা পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায় কিন্তু সাধারণ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে ইহা অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত ভাবে কার্য করিতেছে। অভিব্যক্তিতে পলিপ্লয়েডীর যে সকল অবদান দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল।

পলিপ্লয়েডী এবং নূতন প্রজাতির আবির্ভাব—অ্যালোপলিপ্লয়েডীর দ্বারা কিভাবে নূতন প্রজাতির উৎপত্তি হইতে পারে তাহার কিছু আলোচনা আমরা অ্যাম্‌ফিডিপ্লয়েডী আলোচনা করিবার সময় করিয়াছি। এক্ষণে আরও কয়েকটি উদাহরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। স্পার্টিনা টাউনসেনডি (*Spartina townsendi*) এক প্রকার ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। 1870 খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে প্রথম নজরে পড়ে। তাহার পর 1907 সালের মধ্যে এই উদ্ভিদ বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে স্পার্টিনার এই প্রজাতিটি একটি অ্যাম্‌ফিডিপ্লয়েড সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত (spontaneously) ভাবে একটি ইউরোপীয় প্রজাতি স্পার্টিনা স্ট্রিক্টা (*S. stricta*) ও আর একটি আমেরিকান প্রজাতি স্পার্টিনা অলটার্নিফ্লোরা (*S. alterniflora* ইহা

আমেরিকায় উৎপত্তি হইলেও সম্ভবত জাহাজে চালান হইয়া ইউরোপে পৌঁছায়) —এই দুই-এর মধ্যে সংকর জনন (hybridization) ও ক্রোমোজোম দ্বিগুণিত হইয়া উৎপত্তি হইয়াছিল। স্পার্টনা টাউনসেনডি ($n=63$) এর মধ্যে স্ট্রিক্‌টা ($n=28$) ও অলটার্নিফ্লোরা ($n=35$) দুইটি প্রজাতির মিশ্রিত বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ধান, অরাইজা স্যাটিভা (*Oryza sativa*) ক্রোমোজোম সংখ্যা $2n=24$। ইহা একটি সেকেন্ডারি অ্যালোপলিপ্লয়েড, বেসিক ক্রোমোজোম সংখ্যা $x=5$। চিত্রে অরিজা স্যাটিভার হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম গোষ্ঠী দেখান হইল। ক, খ', গ', ঘ' এবং ঙ'

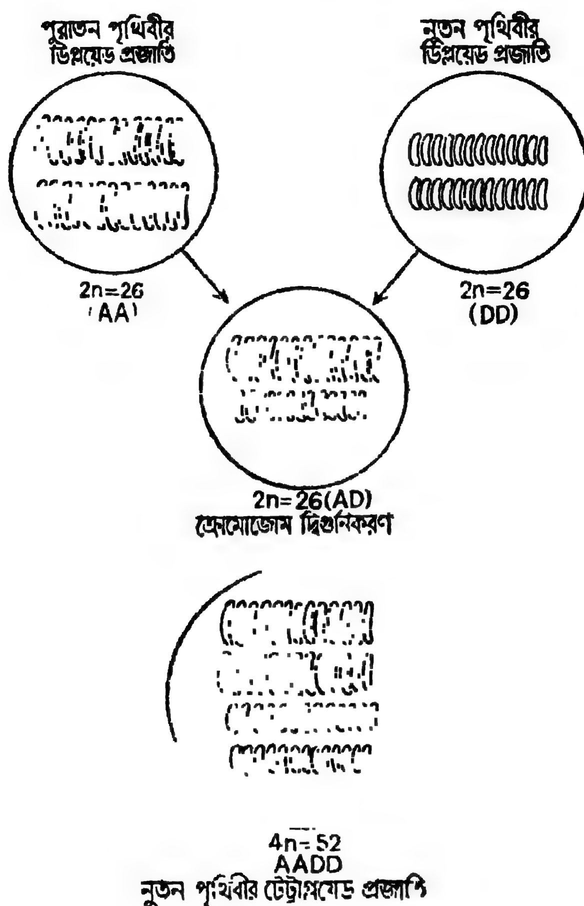


৬৬নং চিত্র—অরাইজা স্যাটিভার হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম দলের একটি নকশা চিত্র। ক, খ, গ, ঘ ও ঙ চিহ্নিত ক্রোমোজোমগুলি একটি প্রজাতি হইতে আসিয়াছে এবং ক', খ', গ', ঘ' ও ঙ' ক্রোমোজোমগুলি দ্বিতীয় প্রজাতি হইতে আসিয়াছে। অস্বাভাবিক মায়োসিসের ফলে দ্বিত্বকরণ হইয়া ক" ও খ" ক্রোমোজোমদ্বয় সৃষ্টি হইয়াছে।

ক্রোমোজোমগুলি একটি প্রজাতি হইতে ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ ক্রোমোজোমগুলি আর একটি প্রজাতি হইতে আসিয়াছে। ক" ও খ" ক্রোমোজোমদ্বয় মায়োসিস বিভাজনের সময় সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত কোন উপায়ে দ্বিগুণিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার পর সমগ্র বারটি ক্রোমোজোমের গোষ্ঠীটি দ্বিগুণিত হইয়া ($2n=24$) ধানের এই চাষযোগ্য প্রজাতিটির উৎপত্তি হইয়াছে। সংকর জনন, অ্যানুপ্লয়েডী ও ইউপ্লয়েডী পর পর সংঘটিত হইয়া ধানের প্রজাতিটির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সেকেন্ডারী অ্যালোপলিপ্লয়েড বলা হয়।

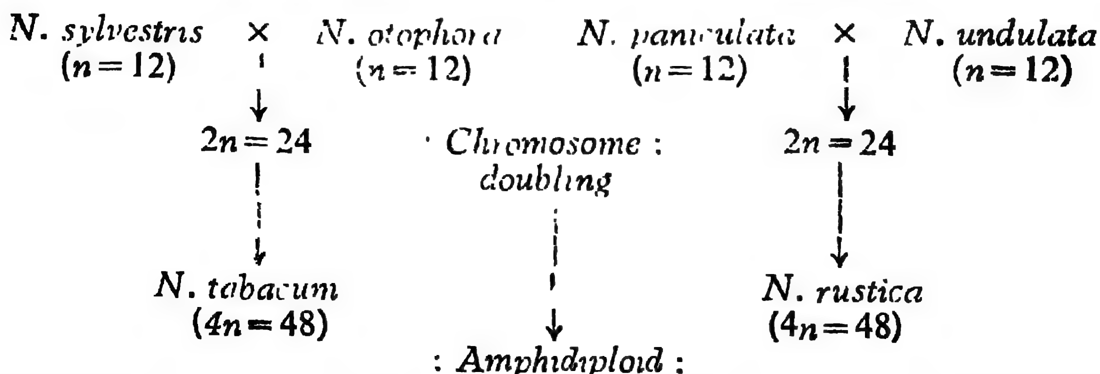
তুলা গাছের গণ গসিপিয়াম (*Gossypium*); সর্বমোট 23টি প্রজাতি এই গণের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে পাঁচটি প্রজাতি তুলার জন্য চাষ করা হয়। এইগুলি *G herbaceum* ($2n=26$), *G. arboreum* ($2n=26$), *G. hirsutum* ($2n=52$), *G barbadense* ($2n=52$) এবং *G. tomentosum* ($2n=52$) 52টি ক্রোমোজোমের চাষযোগ্য প্রজাতিগুলি ডিপ্লয়েড প্রজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের উৎপত্তি ৬৭নং চিত্রের সাহায্যে বোঝান হইল।

তামাক উদ্ভিদের গণ নিকোটিয়ানা (*Nicotiana*)। 65টি বিভিন্ন প্রজাতির এই গণটির মধ্যে চাষযোগ্য দুইটি প্রজাতি নিকোটিয়ানা ট্যাবেকাম (*Nicotiana taba-*



৭নং চিত্র—টেট্রাপ্লয়েড তামাক উদ্ভিদ। টেট্রাপ্লয়েড তামাক উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহা মনে করা হইতেছে যে এশিয়া মহাদেশের একটি চাষযোগ্য ডিপ্লয়েড প্রজাতির সহিত আমেরিকা মহাদেশের একটি বন্য (স্বাভাবিক) প্রজাতির মধ্যে সংকর জনন ও পরবর্তী স্তরে ক্রোমোজোম দ্বিগুণিকরণ হইয়াছে। উৎপন্ন অ্যাম্ফিডিপ্লয়েড উদ্ভিদ আমেরিকার অন্যান্য টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদের ন্যায় উর্বর।

cum এবং নিকোটিয়ানা রাসটিকা (*N. rustica*) অ্যাম্ফিডিপ্লয়েড রূপে অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে সংকর জনন হইয়া (*Interspecific cross*) উৎপন্ন হইয়াছে।



পলিপ্লয়েডী অভিব্যক্তির একটি সংরক্ষণশীল মাধ্যম—অভিব্যক্তিতে পলিপ্লয়েডী কিছুটা রক্ষণশীলতার ভূমিকা গ্রহণ করে। অ্যালোপলিপ্লয়েডী বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের নূতন সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নূতন প্রজাতির সৃষ্টি করে, কিন্তু অটোপলিপ্লয়েডী যেখানে একটি ক্রোমোজোম একাধিক বার থাকে সেখানে কোন নূতন বৈশিষ্ট্য, যাহা পরিব্যক্তির (mutation) ফলে সৃষ্ট হয়, একবার প্রবেশ করিলে তাহার বহিঃপ্রকাশ সহজে হইতে পারে না।

আমরা জানি যে পরিব্যক্তির ফলে যে সকল নূতন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় তাহার অধিকাংশই প্রচ্ছন্নগুণ সম্পন্ন (recessive) ও ক্ষতিকারক (lethal)। উপকারী পরিব্যক্তির শতকরা হার অতি সামান্য। উভয় প্রকার পরিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ হইতে তাহাদের হোমোজাইগাস অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে। একটি টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদে যেখানে প্রতিটি ক্রোমোজোম চারিবার করিয়া থাকে যেখানে একটি প্রচ্ছন্নগুণ সম্পন্ন চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ হইতে হইলে চারিটি ক্রোমোজোমেই ঐ প্রচ্ছন্নগুণের সমাবেশ হইতে হইবে। ধরা যাক, একটি টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদে জীন 'A' (প্রবলগুণ সম্পন্ন) হোমোজাইগাস অবস্থায় আছে। এখন, একটি জিনে পরিব্যক্তির ফলে তা a'-এ পরিণত হইল। সুতরাং এই স্থলে জিনোটাইপ হইবে AAAa'। এই পরিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ হইতে হইলে তাহাকে হোমোজাইগাস a'a'a'a' অবস্থায় আসিতে হইবে; যাহা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এই দিক হইতে ডিপ্লয়েড অপেক্ষাকৃত নমনীয় কারণ এখানে অতি সহজেই একটি প্রচ্ছন্নগুণ হোমোজাইগাস অবস্থায় আসিতে পারে।

পলিপ্লয়েড ও অযৌন জনন—উদ্ভিদ জগতে পলিপ্লয়েডী ও অযৌন জনন এই দুই এর মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পলিপ্লয়েডী আসিলে উদ্ভিদের উর্বরতা কমিয়া যায়, তখন অযৌন পদ্ধতির মাধ্যমে বংশ বিস্তার করিতে সচেষ্ট হয়। সুতরাং ইহা মনে হইতে পারে যে, যে সকল উদ্ভিদের অযৌন জননের উপায় আছে সেই স্থলেই পলিপ্লয়েডী সহজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

কিন্তু অযৌন জনন কার্যে (যৌন জননের) বিভিন্ন গুণের মিশ্রণ সম্ভব হয় না। সুতরাং যৌন জননে যে চারিত্রিক বৈচিত্র্যের সুযোগ থাকে পলিপ্লয়েডী আসার ফলে তাহার সম্ভাবনা চলিয়া যায়। ইহাকে পলিপ্লয়েডীর একটি ত্রুটি বলা যাইতে পারে।

পলিপ্লয়েডী ও ভৌগোলিক বিস্তার—ডিপ্লয়েড অপেক্ষা পলিপ্লয়েডের প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানাইয়া লওয়ার ক্ষমতা অনেক বেশী। এই কারণেই সম্ভবত ডিপ্লয়েড অপেক্ষা পলিপ্লয়েড উদ্ভিদের ভৌগোলিক বিস্তার অনেক বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

অটোপলিপ্লয়েডী নূতন কোন প্রজাতি সৃষ্টি করে না কিন্তু নূতন কোন স্থানে সহজে এবং বেশ দ্রুত গতিতে নূতন উপনিবেশ গাড়িয়া তুলিতে পারে। অ্যালোপ্লয়েডীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন জীনোমের সংমিশ্রণ হয় বলিয়া বিভিন্ন পরিবেশকে সহ্য করিবার ক্ষমতাও অনেক বেশী থাকে। এই দুই ক্ষমতা—পরিবেশ মানিয়ে লওয়া ও নূতন উপনিবেশ গড়া, পলিপ্লয়েডের ভৌগোলিক সীমারেখা বিস্তারে সাহায্য করিয়াছে।

প্রশ্নমালা

১। মাইটোকনড্রিয়া কি? ইহার গঠন এবং কার্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। মাইটোকনড্রিয়াকে কোষের "শক্তির উৎস" (Power house) বলা হয় কেন? (ক: বি: 1977)

৩। ক্লোরোপ্লাস্ট কি? উহার গঠন এবং কার্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। একটি নিউক্লিয়াসের বর্ণনা দাও। মূলের ভাজক কলায় যখন একটি নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় তখন তাহার মধ্যে যে যে পরিবর্তন দেখা যায় তাহা উল্লেখ কর। (ক: বি: 1969)

৫। মায়োসিস কোষ বিভাজনের বিভিন্ন অবস্থা চিত্রের সাহায্যে অঙ্কন করিয়া দেখাও এবং এই প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি উল্লেখ কর। (ক: বি: 1968, 1976)

৬। গ্যামেট গঠনের প্রাক্কালে কিরূপে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হ্রাস পায় তাহা বর্ণনা কর। মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজনের সহিত এই প্রক্রিয়ার পার্থক্য নিরূপণ কর? (ক: বি: 1970)

৭। মায়োসিস প্রক্রিয়ার যে যে পরিবর্তন ঘটে তাহা চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর। মায়োসিস এবং মাইটোসিসের মূলগত প্রভেদ কি? (ক: বি: 1972)

৮। চিত্র সহকারে মায়োসিস পদ্ধতি বর্ণনা কর। যৌন জননক্ষম উদ্ভিদের পক্ষে মায়োসিস কি অপরিহার্য? ক্রসিং ওভারের তাৎপর্য কি? (ক: বি: 1974)

৯। মায়োসিসের প্রথম বিভাজনের প্রফেজ দশা বর্ণনা কর। যে সকল উদ্ভিদের যৌন জনন হয় তাহাদের জীবনে মায়োসিসের স্বার্থকতা কি? উদ্ভিদের জগতের প্রধান শ্রেণীগুলিতে কোথায় মায়োসিস হয়? (ক: বি: 1979)

১০। ক্রোমোজোমের অঙ্গসংস্থান (morphylogy) বর্ণনা কর। ক্রোমোজোমের প্রধান প্রধান উপাদানগুলি উল্লেখ কর। (ক: বি: 1967)

১১। পলিপ্লয়েডী কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার অ্যালোপলিপ্লয়েডী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। শস্যের উন্নতি বিধানে অ্যালোপলিপ্লয়েডীর অবদান কি? (ক: বি: 1975)

১২। একজন উদ্যানপালক তোমায় একটি টেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদ প্রকার তৈরী করিতে বলিলেন। তুমি কি ভাবে তাহা সম্পাদন করিবে? (ক: বি: 1967)

১৩। পলিপ্লয়েডী এবং পরিব্যক্তি কাহাকে বলে? পলিপ্লয়েডী এবং পরিব্যক্তি প্রয়োগের দ্বারা উদ্ভিদের উন্নতির কিছু উদাহরণ দাও। (ক: বি: 1971)

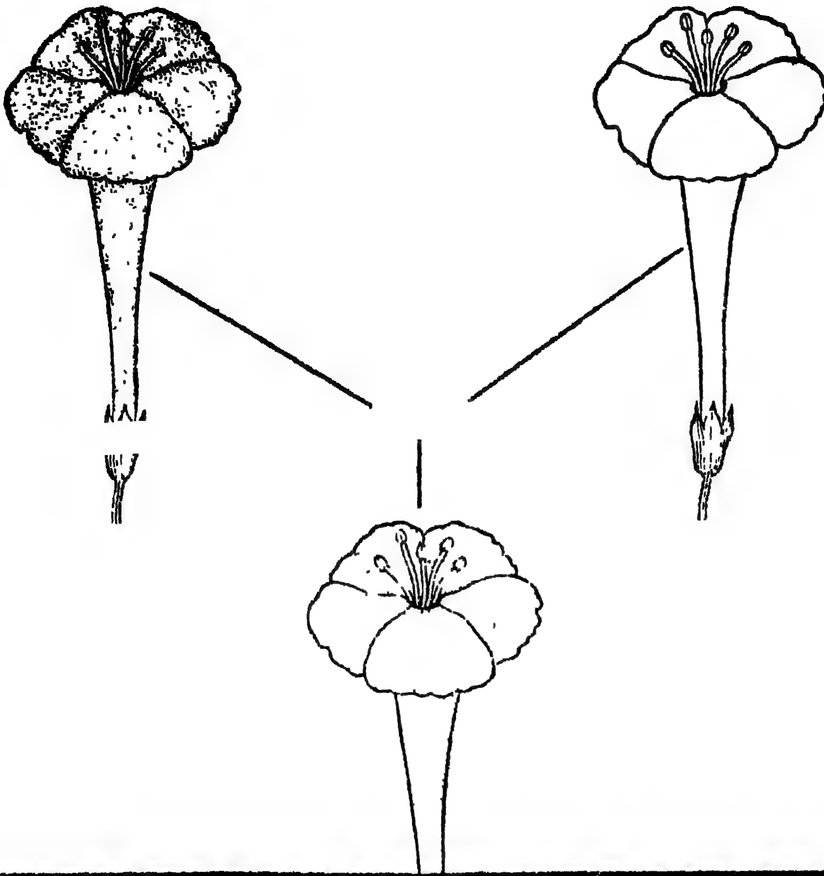
১৪। পরিব্যক্তি কাহাকে বলে? ইহার উৎপত্তি কি ভাবে হয়? Inheritance-এ ইহার গুরুত্ব বুঝাইয়া বল। (ক: বি: 1973, 1976)

১৫। পার্থক্য বুঝাও :— (ক: বি: 1976, 1980, 1977)

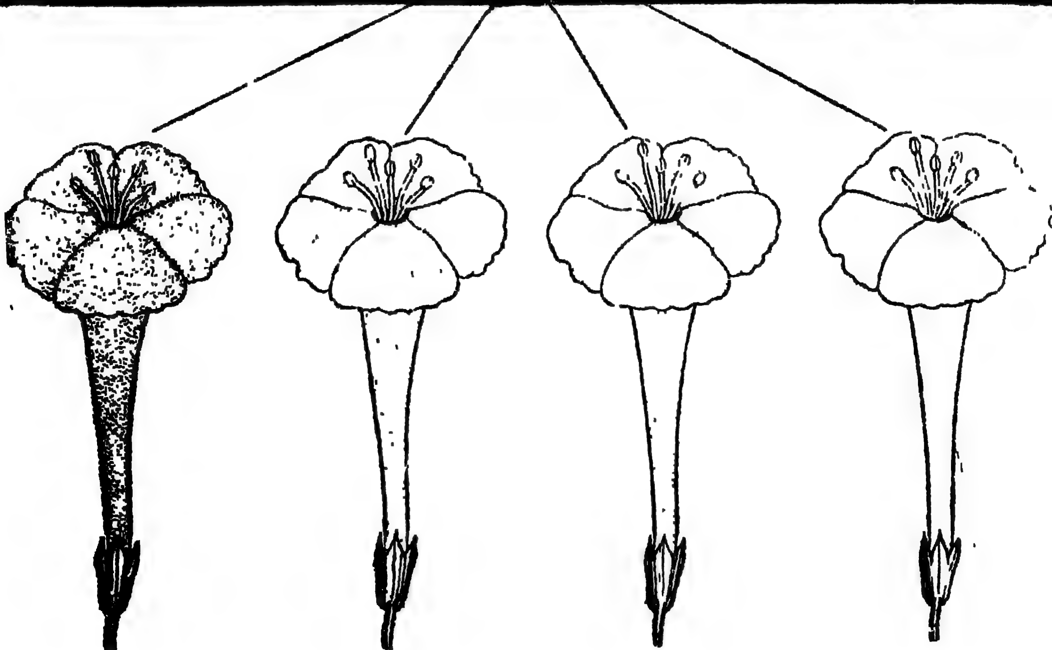
(ক) অটোটেট্রাপ্লয়েড ও অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড; (খ) ক্রোমোজোম ও ক্রোমাটিড; (গ) ক্রোমোনেমা ও ক্রোমাটিড; (ঘ) জাইগোটিন ও প্যাকিটিন; (ঙ) ডি এন এ ও আর এন এ; (চ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (গৌণ) কনস্ট্রিকসন; (ছ) অ্যানিউপ্লয়েডী ও অ্যাম্ফিডিপ্লয়েডী; (জ) টেলোমিয়ার ও সেণ্ট্রোমিয়ার; (ঝ) প্যাকিটিন ও ডিপ্লোটিন; (ঞ) এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও ক্রোমাটিন রেটিকুলাম।

১৬। টীকা লিখ :— (ক: বি: 1966, 69, 71, 72 ইত্যাদি)

(ক) মাইটোকনড্রিয়া; (খ) ক্লোরোপ্লাস্ট; (গ) ডি এন এ; (ঘ) যৌন ক্রোমোজোম; (ঙ) অ্যালোপলিপ্লয়েডী; (চ) আর এন এ; (ছ) ক্যারিওটাইপ; (ঝ) এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম।



সুপ্রজনন বিদ্যা



১ মেণ্ডেলের তত্ত্ব
(Mendelism)

মাতা-পিতার গুণাবলী তাহাদের সন্তান-সন্ততিতে বর্তায়, এই তথ্য আজ আর আমাদের নিকটে অবিদিত নহে। একই মাতা-পিতার সন্তান সাধারণত একই গুণাবলীর অধিকারী হয়, অর্থাৎ মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ সন্তানের মধ্যে প্রবাহিত হয় বলিয়া তাহারা সকলেই একই প্রকার দেখিতে বা গুণযুক্ত হয়। যেমন, গরু হইতে একটি গরুর জন্ম হয়, অথবা কুকুরের ছানা কুকুর-ই হয়; সেইরূপ মানুষের সন্তান মানুষরূপেই জন্মায়। এই যে পদ্ধতি, যাহার জন্য সন্তান-সন্ততি তাহাদের মাতা-পিতার মত দেখিতে হয় এবং তাহাদের গুণাবলীসমূহ প্রাপ্ত হয় তাহাকে **বংশগতি** (Heredity) বলে।

বংশগতির নিয়মের ফলেই প্রতিটি জীব তাহার নিজের মত জীবের সৃষ্টি করে এবং বংশ পরম্পরায় প্রজাতির বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখে। জীবের বংশগত গুণাবলী জনন-কোষে অবস্থান করে এবং ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনের ফলে যে জাইগোট (zygote) তথা নূতন জীবের সৃষ্টি হয় তাহার মধ্যে বংশগত গুণাবলী প্রকাশ পায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বংশজাত জীব কখনই হুবহু মাতাপিতার ন্যায় দেখিতে হয় না। কিছু কিছু পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল পরিবর্তনকে **প্রকারণ** (Variation) বলা হয়। সুতরাং প্রকারণ হইল এমনই একটি উপায় বা প্রবণতা যাহার দ্বারা একই গণভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতি অথবা একই প্রজাতিভুক্ত বিভিন্ন উদ্ভিদ পরস্পর হইতে বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ে পৃথক হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দুইটি একই প্রজাতিভুক্ত উদ্ভিদ, বিভিন্ন পরিবেশের (Environment) মধ্যে জন্মাইলে অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবে তাহাদের কিছু কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন বা অসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে একই বংশজাত জীবের যে পরিবর্তন হয় তাহাকে **পরিবেশীয় প্রকারণ** (Environmental variation) বলা হয়।

অন্যদিকে আবার, ক্রোমোজোম, জীন প্রভৃতি, অর্থাৎ বংশগত চরিত্র বহনকারী বস্তু এবং "চারিত্রিক একক" প্রভৃতির মধ্যে কোন পরিবর্তনের ফলে জীবের যে পরিবর্তন হয়, তাহাকে **বংশগত প্রকারণ** (Hereditary variation) অথবা **জেনোটীপিক প্রকারণ** (Genotypic variation) বলে।

নূতন প্রজাতি সৃষ্টি এবং জৈব অভিব্যক্তিতে (Speciation and Organic evolution) বংশগতি ও প্রকারণের বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। জীববিদ্যার যে অংশ পাঠ করিলে বংশগতি ও প্রকারণ এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাকে **সুপ্রজনন বিদ্যা বা জেনেটিক্স** (Genetics) বলা হয়। জেনেটিক্স শব্দটির মূল উৎস গ্রীক ভাষার "জেন" শব্দ হইতে। গ্রীক ভাষায় 'জেন' কথাটির অর্থ হইল "পরিণত হওয়া 'বা' জন্ম হইয়া বড় হওয়া" (To become or to grow into)। 1906 খ্রীষ্টাব্দে বেটুসন (Bateson) নামক জীববিজ্ঞানী বংশগত পরিবর্তন এবং প্রকারণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন এবং এই দুইটি বিজ্ঞানকে একত্রে জেনেটিক্স নামে অভিহিত করেন।

ইহার বহু পূর্বে অবশ্য 1760 খ্রীষ্টাব্দে কোলরয়টার (Kolreuter) নামক বিজ্ঞানী তামাক গাছের একটি প্রজাতির সংকরণ-প্রক্রিয়া (Hybridization) পর্যবেক্ষণ করিয়া মন্তব্য করেন যে, পরাগই জীব উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে এবং পরাগ ও ডিম্বকের মাধ্যমেই পিতামাতার গুণাবলী সন্তান-সন্ততির মধ্যে পরিবাহিত হয়।



৬৮নং চিত্র—উইলিয়াম বেট্‌সন

1865 খ্রীষ্টাব্দে গ্রেগর যোহান মেণ্ডেল (Gregor Johan Mendel) সর্বপ্রথম মটরগাছের উপর বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া বংশগতি সম্বন্ধে কয়েকটি সুস্পষ্ট ধারণা ও নীতি নির্ধারণ করেন। সুপ্রজনন বিদ্যায় তাঁহার অবদানের জন্য যথার্থই তাঁহাকে "আধুনিক সুপ্রজনন বিদ্যার" জনকরূপে অভিহিত করা হয় (Father of modern genetics)। তাঁহার পূর্বে অবশ্যই কিছু বিজ্ঞানী মেণ্ডেলের ন্যায় সংকর জনন পরীক্ষা করিয়া একই প্রকার ফল লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই প্রাপ্ত ফল হইতে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

গ্রেগর যোহান মেণ্ডেল (Gregor Johan Mendel)

22শে জুলাই 1822 খ্রীষ্টাব্দে সিলেসিয়ার (Silesia) অন্তর্গত হেনজেনডর্ফ (Heinzendorf) গ্রামে এক সাধারণ চাষীর পরিবারে মেণ্ডেল জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষা তিনি বাড়ীতেই পাইয়াছিলেন। তাহার পর স্কুলে ভর্তি হন। সেই সময় তাঁহার মেধা দর্শন করিয়া তাঁহাকে বাড়ী হইতে 13 মাইল দূরে লিপিঙ্কে (Liepink) অপেক্ষাকৃত ভালো স্কুলে পাঠান হয়। সেখানেও তিনি সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষা সম্পন্ন করেন। 1834 খ্রীষ্টাব্দে তিনি ট্রোপো (Troppau) উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। 1840 খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্নাতক হন। এই সময় তাঁহাকে খুবই কষ্টের মধ্যে পড়িতে হয়। অবশেষে তাঁহার এক ভগিনীর আর্থিক সাহায্যে এবং গৃহশিক্ষকতা করিয়া যে অর্থ উপার্জন করিতেন তাহার সাহায্যে তিনি অলমিট্‌জ্ ফিলজফিক্যাল ইনস্টিটিউটে (Olmitz Philosophical Institute)



৬৯নং চিত্র—গ্রেগর যোহান মেণ্ডেল

দুই বৎসরের শিক্ষাক্রম সম্পন্ন করেন। 1843 খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মোরাভিয়ার (Moravia) ব্রুণ (Brunn) অঞ্চলে অগস্টিনিয়ার ধর্মীয় মঠে (Augustinian monastery) যোগদান করেন। এই সময় তাঁহার প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ প্রকাশ পায়, এবং 1846 খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রুনের ফিলজফিক্যাল অ্যাকাডেমিতে কৃষি সংক্রান্ত ও দ্রাক্ষালতার চাষ সম্বন্ধে পড়াশুনা করেন। ইহার পর 1848 খ্রীষ্টাব্দে মেণ্ডেল ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে পড়াশুনাও সম্পন্ন করেন।

1851 হইতে 1853 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভিয়েনার (Vienna) ইউনিভার্সিটিতে প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, জীবাশ্ম, ভৌত বিজ্ঞান ও গণিত (Zoology; systematic Botany, Palaeontology, Physics and Mathematics) শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। 1854 খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রুণের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভৌত বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। এইখানে তিনি সুদীর্ঘ 14 বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। 1868 খ্রীষ্টাব্দে তিনি মঠাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

1856 খ্রীষ্টাব্দ হইতে শিক্ষকতা ও অন্যান্য কাজের অবসরে মঠের বাগানে মেণ্ডেল বিভিন্ন ফলের গাছ, ফুলগাছ ও অন্যান্য সব্জি গাছ, বিশেষত মটরশুঁটি গাছ লইয়া প্রজন (breeding) পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং কয়েকটি মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি 1865 খ্রীষ্টাব্দের 8ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার গবেষণা লব্ধ তথ্যসমূহ ব্রুণের ন্যাচারাল হিষ্ট্রি সোসাইটির (Brunn Natural History Society) সভাবৃন্দের সম্মুখে পাঠ করেন। পরের বৎসরে (1866 খ্রীঃ) তাহা ঐ সংসদের কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে অধুনা বিখ্যাত ও সমাদৃত এই মূল্যবান তথ্য সম্বলিত গবেষণা বিষয়টি তখন কাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। মেণ্ডেলের আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ তাঁহার মৃত্যুর (1884 খ্রীঃ 4ঠা জানুয়ারী) অনেক পরে, 1900 খ্রীষ্টাব্দে (অর্থাৎ প্রায় 16 বৎসর পরে) তিনজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হিউগো দি ভ্রীস (Hugo de Vries), করেন্স (Correns) এবং ফন শেরমার্ক (Von Tschermark) কর্তৃক পুনরাবিষ্কৃত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উপরিউক্ত তিন বিজ্ঞানী প্রত্যেকেই এককভাবে বিভিন্ন দেশে (দি ভ্রিস, হল্যাণ্ডে; করেন্স জার্মানীতে এবং শেরমার্ক অষ্ট্রিয়াতে) বিভিন্ন উদ্ভিদের উপর (ইনোথেরা, জিনিয়া, ভুট্টা, মটরশুঁটি ও অন্যান্য ফুলের গাছ) শংকর জনন পরীক্ষাকার্য চালাইয়া মেণ্ডেলের ন্যায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের গবেষণা বিষয়ের উপর পুরাতন নথীপত্র দেখিতে দেখিতে মেণ্ডেলের কাজের সন্ধান পান। এইভাবে মেণ্ডেলের তথ্য আবিষ্কৃত হয়। নব আবিষ্কৃত মেণ্ডেলের কার্যসমূহ পুনরায় 1901 খ্রীঃ ফ্লোরা নামক বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (Flora, 89, 364, 1901)

মেণ্ডেলের কার্য (Mendel's Work)

1856 খ্রীষ্টাব্দে মটর গাছ (*Pisum sativum*) লইয়া তাঁহার সুবিখ্যাত গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষা আরম্ভের প্রথম দুই বৎসর তিনি শুধু মটর গাছের

বিভিন্ন তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত প্রকার নির্বাচনে মনোনিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রকার নির্বাচনে সতর্কতার কারণ হইল নির্বাচিত উদ্ভিদগুলির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া ; অর্থাৎ উহাদের বৈশিষ্ট্যগুলি অপত্য বংশেও ঠিক একই থাকে কিনা তাহা জানিয়া লওয়া। এইজন্য তিনি প্রকারগুলি নির্বাচনের আগে বারংবার স্বপরাগ যোগের সাহায্যে পরপর অপত্য বংশের সৃষ্টি করিয়া বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ লক্ষ্য করেন। সবশেষে, প্রকারগুলির বিশুদ্ধতার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া সর্বমোট সাতটি তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মটরশুঁটি গাছ নির্বাচিত করেন।

মেণ্ডেলের পূর্বে বহু বিজ্ঞানী 'সংকর-প্রক্রিয়া' পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহ প্রাপ্ত ফল হইতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহারা একসঙ্গে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য লইয়া পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের নির্বাচিত প্রজাতি-প্রকার (variety)-গুলি হয়তো সকল ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ছিল না। এমনকি বংশগত চরিত্রের (Hereditary character) মিশ্রণ সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণাও সঠিক ছিল না।

মেণ্ডেল তাঁহার পূর্বেকার বিজ্ঞানীদের সকল দোষ ত্রুটি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত সাবধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রথমত তাঁহার মটরশুঁটি গাছকে সংকর-প্রক্রিয়া পরীক্ষার মূল গাছ হিসাবে নির্বাচনে যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। মেণ্ডেলের পরীক্ষায় মটর গাছ মনোনয়ন করার প্রধান কারণগুলি হইল, যে,

(ক) ইহার ফুলগুলি নিয়মিতরূপে স্ব-পরাগী।

(খ) উদ্ভিদগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়।

(গ) সংকর উদ্ভিদগুলি নিয়মিত বংশবৃদ্ধি করিতে সক্ষম।

(ঘ) ফুলগুলি আকারে বড় হওয়ায় সহজেই বিপরীত পরাগযোগ সংঘটিত করিয়া সংকর-প্রক্রিয়া সংঘটিত করিতে পারা যায়।

(ঙ) ইহার জীবনচক্র খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়, ফলে একটি ঋতুতে একাধিক অপত্য বংশ পাওয়া যায়।

(চ) গাছটিকে সহজেই, জমিতে অথবা টবে পালন করা যায়।

সংকর-প্রক্রিয়া পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত মটর গাছের সাতটি তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যগুলি হইল—

(ক) কাণ্ডের দৈর্ঘ্য — দীর্ঘকার এবং খর্বাকার।

(খ) বীজের গঠন — গোলাকার অথবা মসৃণগাত্র এবং কুঞ্চিতগাত্র।

(গ) বীজপত্রের রঙ — পীত বর্ণ এবং সবুজ বর্ণ।

(ঘ) পরিপক্ক ফলের গড়ন — মসৃণ এবং বীজের মাঝে মাঝে খাজ কাটা।

(ঙ) ফুলের অবস্থান — কাক্ষিক এবং শীর্ষাগ্র।

(চ) অপরিপক্ক ফলের রঙ — পীতবর্ণ এবং হালকা অথবা গাঢ় সবুজ।

(ছ) বীজত্বকের বর্ণ — পিঙ্গল এবং সাদা।

তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রকারগুলির নির্বাচনের পর মেণ্ডেল প্রায় ছয় বৎসর

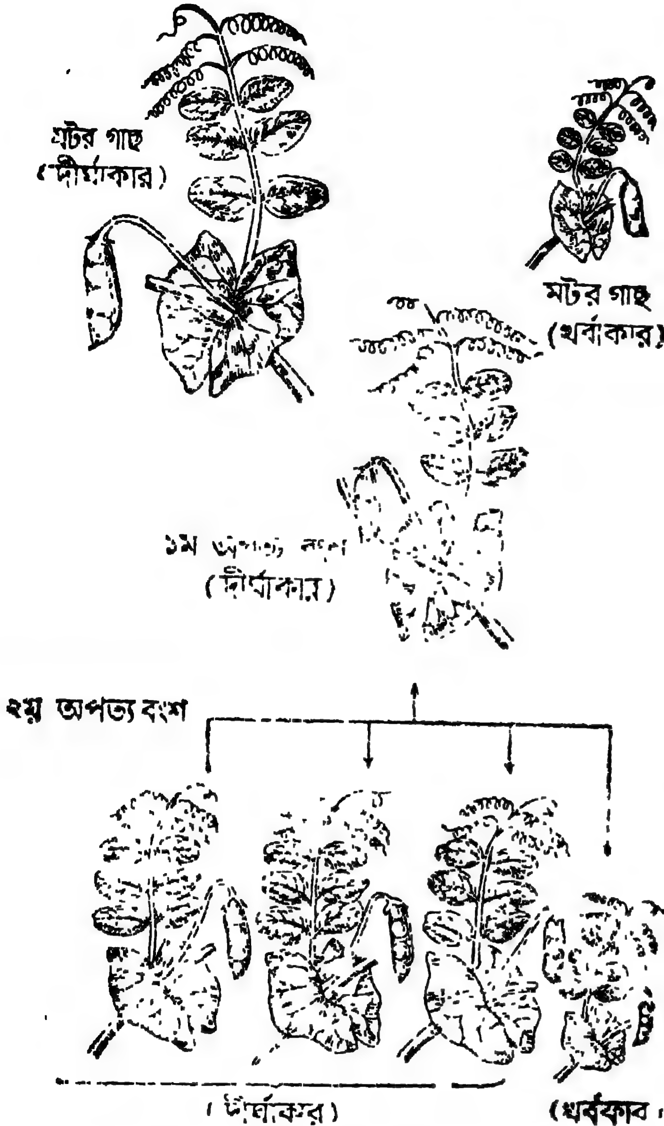
ধরিয়া সংকর প্রক্রিয়া চালান। পরীক্ষা লব্ধ ফলগুলি অত্যন্ত নিপুণতার সহিত যথাযথরূপে নথিভুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এই ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের একটি বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে, যাহা ছাড়া কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে না। সাতটি তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য জোড়া লইয়া প্রথমে তিনি একক সংকর জনন পরীক্ষা এবং পরে দ্বি-সংকর জনন পরীক্ষা করেন। প্রতি ক্ষেত্রেই সংকর উদ্ভিদগুলিকে তাহাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একত্রিত করিয়া নথিভুক্ত করেন এবং তাহাদের প্রত্যেকটির, স্বপরাগ যোগের সাহায্যে, অপত্য বংশগুলির মধ্যে বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ লক্ষ্য করেন।

মেণ্ডেলের সাতটি তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যের একক সংকর জনন পরীক্ষার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল :—

চরিত্র	তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সংকর জনন পরীক্ষা	প্রবল চরিত্র	প্রচ্ছন্ন চরিত্র	অনুপাত
কাণ্ডের দৈর্ঘ্য	দীর্ঘকার × খর্বাকার	দীর্ঘাকার 787	খর্বাকার 277	2·84 : 1 বা 3 : 1
বীজের গঠন	গোলাকার × কুঞ্চিত গাত্র	গোলাকার 5474	কুঞ্চিত গাত্র 1850	2·96 : 1 বা 3 : 1
বীজপত্রের বর্ণ	পীত বর্ণ × সবুজ বর্ণ	পীত বর্ণ 6022	সবুজ বর্ণ 2001	3·01 : 1 বা 3 : 1
পরিপক্ক ফলের গড়ন	মসৃণ × দুইটি বীজের মাঝে খাঁজকাটা	মসৃণ 882	খাঁজকাটা 299	2·95 : 1 বা 3 : 1
ফুলের অবস্থান	কাক্ষিক × শীর্ষাগ্র	কাক্ষিক 651	শীর্ষাগ্র 207	3·14 : 1 বা 3 : 1
অপরিপক্ক ফলের বর্ণ	সবুজ × পীত বর্ণ	সবুজ বর্ণ 428	পীত বর্ণ 152	2·82 : 1 বা 3 : 1
বীজত্বকের বর্ণ	পিঙ্গল বর্ণ × সাদা	পিঙ্গল 705	সাদা 224	3·15 : 1 বা 3 : 1

মেণ্ডেলের উপরিউক্ত পরীক্ষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত ও বিখ্যাত পরীক্ষাটি পরপৃষ্ঠায় বিশদরূপে বর্ণনা করা হইল।

একক চরিত্র জনন বা একক সংকর জনন পরীক্ষা (Monohybrid Cross)—ইহাই মেণ্ডেলের প্রথম পরীক্ষা। এই স্থলে কাণ্ডের দৈর্ঘ্য হইল মূল চরিত্র। ইহার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য হইল, দীর্ঘ কাণ্ড ও খর্বাকার কাণ্ড দুইটি বিশুদ্ধ উদ্ভিদ—একটি দীর্ঘকার কাণ্ড বিশিষ্ট অপরটি খর্বাকার কাণ্ড বিশিষ্ট। একটি চরিত্রের এইরূপ তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যের একটিকে অপরটির **অ্যালিল** বা **অ্যালিলোমর্ক** (Allele or Allelomorph) বলা হয়। এইরূপ তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে পরাগ মিলনের ফলে যে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় তাহাকে **হাইব্রিড** বা **সংকর উদ্ভিদ** (Hybrid) বলে।



৭০নং চিত্র—মেণ্ডেলের একক সংকর জনন পরীক্ষা

মেণ্ডেল সংকর-প্রক্রিয়া সংঘটিত করিবার সময় প্রথমে, দীর্ঘ কাণ্ড (প্রায় ৬ ফুট) যুক্ত মটর গাছকে স্ত্রী উদ্ভিদ হিসাবে লইয়া তাহার ফুল হইতে প্রস্ফুটিত হইবার পূর্বেই অপরিণত পুং দণ্ডগুলিকে কাটিয়া ফেলিলেন এবং তাহার পর ঐ ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর ঈপ্সিত ফুলের, (খর্বকাণ্ড যুক্ত উদ্ভিদের ফুল, যাহাকে পুং উদ্ভিদ হিসাবে লইয়াছিলেন) পরাগরেণু লাগাইয়া দিলেন। এইবার স্ত্রী ফুলটিকে ঢাকিয়া রাখিলেন। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য হইল যাহাতে কোন বাহিরের পরাগ আসিয়া গর্ভমুণ্ডের উপর পতিত হইতে না পারে।

কৃত্রিম উপায়ে পরাগ মিলন ঘটাইয়া তিনি যে বীজের সৃষ্টি করিলেন তাহা হইতে যে সকল মটর-গাছ হইল তাহারা সকলেই দীর্ঘ কাণ্ড যুক্ত মাতৃ উদ্ভিদের ন্যায়। বিপরীত-ভাবেও এই পরীক্ষা (খর্বাকার উদ্ভিদকে স্ত্রী এবং দীর্ঘকার উদ্ভিদকে পুং) করিয়া তিনি একই ফল লাভ করিলেন অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই সংকর উদ্ভিদ দীর্ঘকাণ্ড যুক্ত

হইল। তিনি সংকর উদ্ভিদগুলিকে F_1 অপত্য বংশ (প্রথম অপত্য বংশ) বলিয়া চিহ্নিত করিলেন।

প্রথম অপত্য বংশের সংকর উদ্ভিদগুলি হইতে স্বপরাগ যোগে উৎপন্ন বীজ সমূহ হইতে যে সকল উদ্ভিদ জন্মায় (1064টি) তাহাদের মধ্যে শতকরা 75 ভাগ (787টি) দীর্ঘাকার চরিত্র এবং শতকরা 25 ভাগ (277টি) খর্বাকার চরিত্র বিশিষ্ট হয়। ইহাদের অনুপাত 2·84 : 1 অথবা 3 : 1, (যদিও পরীক্ষার ফল যথাযথ 3 : 1 অনুপাতে আসে নাই, কিন্তু এই তফাৎকে পরীক্ষার ত্রুটি বা অন্য কোন আভ্যন্তরীণ কারণের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়)।

দ্বিতীয় অপত্য বংশের (F_2 অপত্য বংশ) উদ্ভিদগুলির মধ্যে স্বপরাগযোগ করিলে দেখা যায় যে, ঐ 25 ভাগ খর্বকার উদ্ভিদ হইতে পরবর্তী তৃতীয় অপত্য বংশে (F_3 অপত্য বংশ) সর্বদাই খর্বাকার উদ্ভিদ উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং ইহারা সকলেই বিশুদ্ধ খর্বাকার। দ্বিতীয় অপত্য বংশের অবশিষ্ট 75 ভাগ উদ্ভিদগুলি দীর্ঘাকার দেখা যাইলেও উহারা সকলে বিশুদ্ধ দীর্ঘাকার নহে। এই উদ্ভিদগুলির মধ্যে স্বপরাগযোগ ঘটাইলে দেখা যাইবে যে, পরবর্তী অপত্য বংশে উহাদের মধ্যে শতকরা 25 ভাগ উদ্ভিদ হইতে সর্বদাই বিশুদ্ধ দীর্ঘাকার উদ্ভিদ এবং অবশিষ্ট শতকরা 50 ভাগ উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন উদ্ভিদগুলির হার দীর্ঘতা ও খর্বতা অনুযায়ী পুনরায় 75 ও 25 এইরূপ অনুপাত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রতি অপত্য বংশে উৎপন্ন 50 ভাগ উদ্ভিদ হইল সর্বদাই সংকর।

মেণ্ডেল লক্ষ্য করিলেন সংকর উদ্ভিদগুলির (F_1 অপত্য বংশ) প্রতিটি দীর্ঘাকার চরিত্রের হইলেও উহাদের মধ্যে খর্বাকার চরিত্রটি বিরাজ করে। উহার বাহ্যিক প্রকাশ হয় না। দুইটি বিপরীত ধর্মীগুণের মধ্যে যে গুণটি আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম, (এই ক্ষেত্রে দীর্ঘাকার চরিত্র) তাহাকে তিনি **প্রবল গুণ** (Dominant character) এবং যে গুণটি আত্মপ্রকাশ করিতে অক্ষম (এই ক্ষেত্রে খর্বাকার চরিত্র) তাহাকে **প্রচ্ছন্ন গুণ** (Recessive character) নামে অভিহিত করেন।

তিনি ইহাও লক্ষ্য করেন যে, প্রচ্ছন্ন গুণটি সংকর উদ্ভিদে প্রকাশিত হইলেও উহার বিনাশ হয় না। পরবর্তী অপত্য বংশে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পৃথক হইয়া যায় (3 প্রবলগুণ : 1 প্রচ্ছন্নগুণ)।

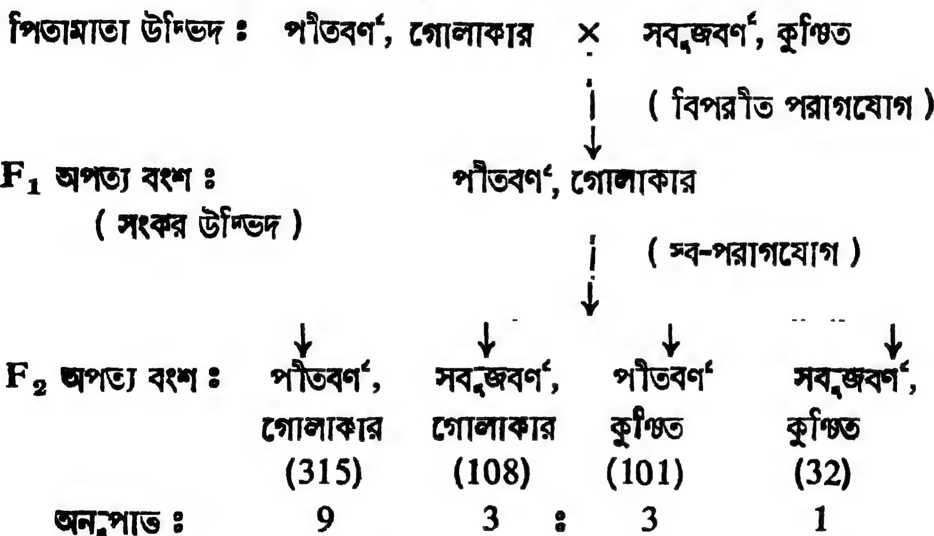
দ্বি-সংকর জনন পরীক্ষা (Dihybrid Cross)—মেণ্ডেল শুধুমাত্র একক সংকর জনন পরীক্ষা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি দুই বা তিনটি তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য যুক্ত উদ্ভিদ লইয়া দ্বি-সংকর ও ত্রি-সংকর জনন পরীক্ষাও করিয়াছিলেন। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাহাদের পৃথকীকরণ পদ্ধতি কিরূপ হয় তাহা দেখিবার উদ্দেশ্য লইয়া মেণ্ডেল এইরূপ জনন পরীক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

একটি দ্বি-সংকর জনন পরীক্ষায় তিনি, পীতবর্ণের বীজপত্র ও গোলাকার বীজ যুক্ত বিশুদ্ধ মটর উদ্ভিদের সহিত আর একটি সবুজ বর্ণের বীজপত্র ও কুঞ্চিত বীজ যুক্ত

বিশুদ্ধ মটর উদ্ভিদে যৌন সংযোগ সম্পন্ন করেন। প্রথম অপত্য বংশে (F_1 অপত্য বংশ) সংকর উদ্ভিদগুলি পীতবর্ণের বীজপত্র ও গোলাকার বীজ যুক্ত হয়। একক সংকর জনন পরীক্ষায় এই দুইটি বৈশিষ্ট্য, পীতবর্ণ বীজপত্র ও গোলাকার বীজ, প্রবল গুণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। সুতরাং দ্বি-সংকর জনন পরীক্ষায়ও এই দুইটি বৈশিষ্ট্য প্রবল গুণ রূপে বহিঃপ্রকাশ করিল।

সংকর উদ্ভিদগুলি হইতে স্বপরাগযোগে যে বীজ উৎপন্ন হইল তাহা পরীক্ষা করিয়া তিনি চারি প্রকার বৈশিষ্ট্য সমন্বয় দেখিতে পাইলেন। সর্বমোট 556টি দ্বিতীয় অপত্য বংশের বীজের মধ্যে 315টি পীতবর্ণ ও গোলাকার, 108টি সবুজ ও গোলাকার; 101টি পীতবর্ণ ও কুঞ্চিত এবং 32টি সবুজ ও কুঞ্চিত বীজ পাইয়াছিলেন।

দ্বি-সংকর জনন পরীক্ষাটি নিম্নলিখিত রূপে দেখান যাইতে পারে।



প্রাপ্ত ফল বিশ্লেষণ করিয়া মেণ্ডেল দেখিলেন যে ইহা পূর্বেকার একক জনন পরীক্ষার সহিত খুব সুন্দর সমতা রক্ষা করিতেছে। দুইজোড়া তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন সংমিশ্রণে 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাতে দ্বিতীয় অপত্য বংশে সঞ্চারিত হইয়াছে। এই অনুপাতের সহিত একক জনন পরীক্ষার অনুপাতের যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। প্রথম ক্ষেত্রে, একটি চরিত্রের তুলনামূলক দুইটি বৈশিষ্ট্য পরস্পর 3 : 1 অনুপাতে পৃথক হইয়াছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও দুইটি চরিত্রের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যগুলি স্বাধীনভাবে 3 : 1 অনুপাতে পৃথক হইয়া, মিলিতভাবে 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাত সৃষ্টি করিয়াছে, অর্থাৎ $(3+1)^2 = 9 : 3 : 3 : 1$।

দ্বি-সংকর জনন পরীক্ষা হইতে মেণ্ডেল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, প্রতিটি চরিত্রের জন্য যে দুইটি করিয়া বৈশিষ্ট্য থাকে (অ্যালিলস) তাহারা সংকর উদ্ভিদে একত্রিত হইলেও দ্বিতীয় অপত্য বংশে পৃথক হইয়া যায়; এবং সংকর উদ্ভিদে সকল সময় প্রবল গুণ যুক্ত বৈশিষ্ট্যের বাহ্যিক প্রকাশ হয়। শুধু তাহাই নহে, একাধিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিও সংকর উদ্ভিদে মিলিত হইলেও তাহাদের মধ্যে কোনরূপ সংমিশ্রণ হয়

না, তাহারা নিজেদের সতন্ত্র বজায় রাখে। পরবর্তী বংশে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া সঞ্চারিত হয়।

ত্রি-সংকর জনন পরীক্ষা (Tri-Hybrid Experiment)—তিনটি তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য যুক্ত দুইটি বিশুদ্ধ মটরশুটি গাছের মধ্যে যৌন সংযোগ সম্পন্ন করিয়া মেণ্ডেল ত্রি-সংকর জনন পরীক্ষাকার্য করিয়াছিলেন। পরীক্ষাটি নিম্নে দেখান হইল—

পিতামাতা উদ্ভিদ : দীর্ঘকাণ্ড, গোলাকার এবং পীতবর্ণের বীজপত্র × খর্বকাণ্ড, কুঞ্চিত এবং সবুজবর্ণের বীজপত্র

(বিপরীত পরাগযোগ)

F_1 অপত্য বংশ : দীর্ঘকাণ্ড, গোলাকার এবং পীতবর্ণ বীজপত্র

(স্ব-পরাগযোগ)

F_2 অপত্য বংশ :

	দীর্ঘকাণ্ড গোলাকার পীতবর্ণ	দীর্ঘকাণ্ড গোলাকার সবুজবর্ণ	দীর্ঘকাণ্ড কুঞ্চিত পীতবর্ণ	দীর্ঘকাণ্ড কুঞ্চিত সবুজবর্ণ	খর্বকাণ্ড গোলাকার পীতবর্ণ	খর্বকাণ্ড গোলাকার সবুজবর্ণ	খর্বকাণ্ড কুঞ্চিত পীতবর্ণ	খর্বকাণ্ড কুঞ্চিত সবুজবর্ণ
অনুপাত :	27 :	9 :	9 :	3 :	9 :	3 :	3 :	1

ত্রি-সংকর জনন পরীক্ষার F_2 অপত্য বংশের অনুপাত

27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1

উপরিউক্ত পরীক্ষার তিন জোড়া তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্বের ন্যায় স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হইয়া 27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1 এই অনুপাত সৃষ্টি করিয়াছে।

মেণ্ডেলের বংশগতির নিয়ম (Mendel's laws of Heredity)

প্রকৃতপক্ষে মেণ্ডেল নিজে তাঁহার গবেষণা লব্ধ তথ্য সমূহ হইতে কোন প্রকার নিয়ম (Laws) প্রকাশ করেন নাই। তিনি তাঁহার গবেষণার বিষয় বস্তু ও তথ্যাদি গাণিতিক পরিসংখ্যানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ঐ সকল সূত্র হইতে তিনি কিছু সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। মেণ্ডেল মনে করিতেন যে, প্রতিটি চরিত্রের জন্য একজোড়া বৈশিষ্ট্য (Factors) রহিয়াছে। এই একজোড়া বৈশিষ্ট্য প্রতি পিতৃ ও মাতৃ উদ্ভিদ বহন করে। বংশ বিস্তার করিবার সময় ঐ জোড়া বৈশিষ্ট্যের একটি করিয়া এক একটি জনন কোষে স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হয়, এবং নিষেক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বীজের বা অপত্য উদ্ভিদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলি আবার জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হয়। উহাদের মধ্যে যেগুলি প্রবলগুণ সম্পন্ন তাহাদের বাহ্যিক প্রকাশ হয় এবং যেগুলি প্রচ্ছন্নগুণ সম্পন্ন তাহাদের বাহ্যিক প্রকাশ হয় না।

করেন্স (জার্মান বিজ্ঞানী) মেন্ডেলের গবেষণার তথ্যাদি আবিষ্কার করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করিবার পর দেখিলেন যে তাঁহার গবেষণার মূল বিষয়টি দুইটি বংশগতির নিয়মরূপে প্রকাশ করা যায়। এই নিয়ম দুইটি হইল, **পৃথকীকরণ সূত্র** (*Law of Segregation*) এবং **স্বাধীন** বা **মুক্ত সঞ্চারণ সূত্র** (*Law of Independent assortment*)।

পৃথকীকরণ সূত্র (Law of Segregation)—মেন্ডেলের প্রথম সূত্রটি এইরূপ—**একজোড়া তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনকারী দুইটি বিশুদ্ধ উদ্ভিদের মধ্যে যখন ইতর পরাগযোগের সাহায্যে যৌন সংযোগ স্থাপন করা হয় তখন নির্দিষ্ট ধরনগুলি (বৈশিষ্ট্যগুলি) দ্বিতীয় অপত্য বংশে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পৃথক হইয়া যায় (3 : 1)। ইহাকেই পৃথকীকরণ সূত্র বলা হয়।**

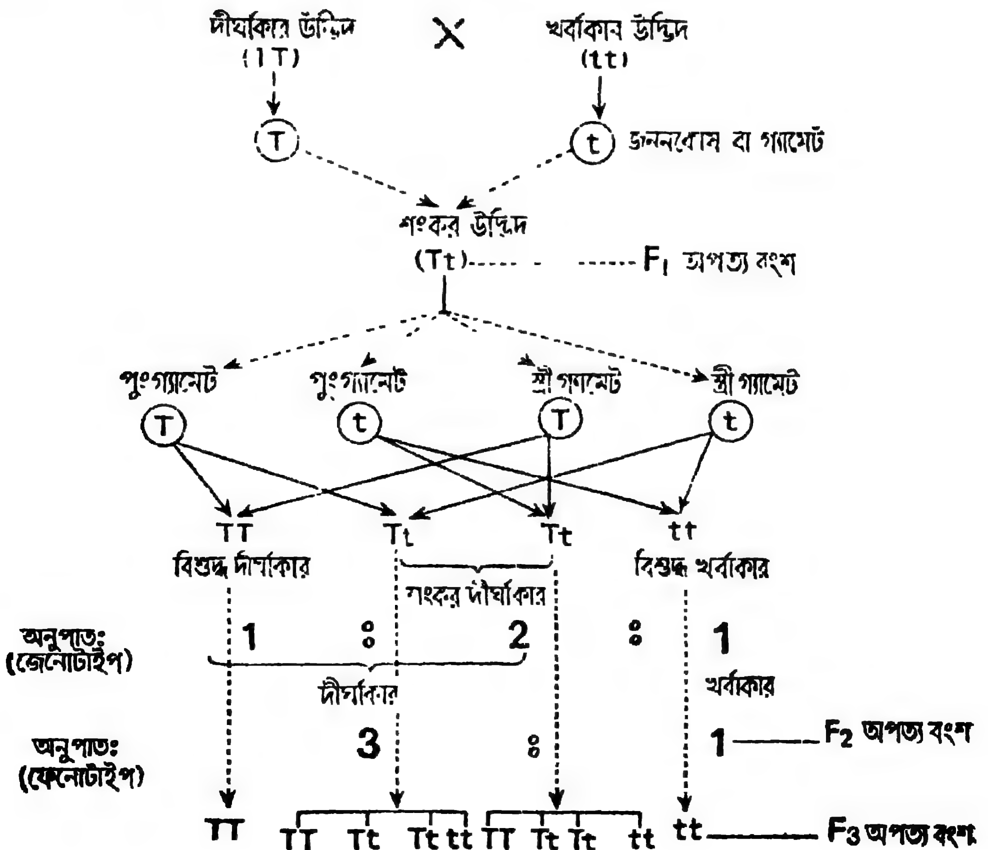
মেন্ডেলের সময় পৃথকীকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট ধারণা ছিল না। কি ভাবে বিভিন্ন চারিত্রিক ধরনগুলি সংকর উদ্ভিদ হইতে অপত্য বংশের বা সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তাহারও কোন সঠিক ব্যাখ্যা ছিল না। মেন্ডেল তাঁহার অসাধারণ চিন্তাশক্তি ও মেধার বলে যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও আবিষ্কার দ্বারা সমর্থিত হইয়াছিল।

প্রতিটি চরিত্রের জন্য দুইটি করিয়া বৈশিষ্ট্য (Factors) এবং তাহাদের একটির জননকোষে সঞ্চারণ হইতে মায়োসিস প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বর্তমানে মায়োসিস প্রক্রিয়া এবং ক্রোমোজোম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেক পরিষ্কার। আমরা ইহাও জানি যে বংশগতির বস্তু সমূহ নিউক্লিয়াসের মাধ্যমে সন্তানের দেহে আসে। কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমের ব্যবহার ও চলনের সহিত আমরা মেন্ডেলের বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণের মিল দেখিতে পাই। বংশগতির বস্তুটিকে (hereditary material) বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হইতে হইলে তাহাকে কোন কিছুর মাধ্যমের সাহায্যে যাইতে হইবে। এবং যেহেতু প্রতিটি বৈশিষ্ট্য দুইটি করিয়া থাকে সুতরাং ইহাদের বাহককেও জোড়ায় অবস্থিত থাকিতে হইবে। এইদিক হইতে আমরা দেখিতে পাই যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটি স্থায়ী বস্তু, ক্রোমোজোম অবস্থিত। ইহারা জোড়ায় জোড়ায় থাকে এবং মায়োসিস বিভাজনে ইহাদের একটি করিয়া জনন কোষের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মেন্ডেলের ফ্যাকটর বা বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ ও মায়োসিসের সময় ক্রোমোজোমের আচরণের যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় তাহা 1902 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী সাটন্ (Sutton) সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন। পরবর্তীকালে, মরগ্যান ও তাঁহার সঙ্গী বিজ্ঞানীগণের গবেষণায় (Morgan and his co-workers) ক্রোমোজোমই যে বংশগতির ধারক ও বাহক এই তত্ত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

উপরিউক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া মেন্ডেলের একক জনন পরীক্ষা বিশ্লেষণ করিলে বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ পদ্ধতি অনেকটা পরিষ্কার হইবে।

'T' অক্ষরকে কাণ্ডের দীর্ঘতা (প্রবলগুণ) এবং 't' অক্ষরকে কাণ্ডের খর্বতা (প্রচ্ছন্নগুণ) প্রকাশের জন্য বৈশিষ্ট্যের সূচক চিহ্ন ধরা হয় তাহা হইলে মেণ্ডেলের মত অনুসারে, বিশুদ্ধ দীর্ঘাকার উদ্ভিদটি 'TT' এবং বিশুদ্ধ খর্বাকার উদ্ভিদটি 'tt' বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইবে। জনন কোষে দুইটি বৈশিষ্ট্যের একটি সঞ্চারিত হয়, সুতরাং ঐ দুইটি উদ্ভিদের জনন কোষে বা গ্যামেটের মধ্যে যথাক্রমে T এবং t বৈশিষ্ট্য থাকিবে। এখন, যৌন মিলনের ফলে F_1 অপত্য বংশে যে সংকর উদ্ভিদ উৎপন্ন হইবে তাহার মধ্যে দুইটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ T এবং t মিশ্রিত হইবে। T-বৈশিষ্ট্য প্রবল বলিয়া ইহাই প্রকাশ লাভ করিবে। Tt সংকর উদ্ভিদটি T এবং t বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুই প্রকার গ্যামেট উৎপাদন করিবে এবং এই দুই প্রকার গ্যামেট, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় প্রকার জনন মাতৃকোষ হইতে উৎপন্ন হইবে (সঞ্চারণ সূত্র অনুযায়ী)। F_1 অপত্য বংশের উদ্ভিদের মধ্যে স্বপরাগযোগের ফলে পুং ও স্ত্রী গ্যামেটগুলি পরস্পর যথেচ্ছভাবে মিলিত হয়। ইহার ফলে তিন প্রকার উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়, যাহার মধ্যে একটি TT বিশুদ্ধ দীর্ঘাকার উদ্ভিদ, একটি tt বিশুদ্ধ খর্বাকার উদ্ভিদ এবং দুইটি Tt সংকর দীর্ঘাকার উদ্ভিদ। বিশুদ্ধ চরিত্রের উদ্ভিদগুলি পরবর্তী অপত্য বংশে সর্বদাই বিশুদ্ধ চরিত্রের উদ্ভিদ উৎপাদন করিবে কিন্তু সংকর উদ্ভিদগুলি পরবর্তী অপত্য বংশে পুনরায় 1 : 2 : 1 এই অনুপাতে বিশুদ্ধ, সংকর ও বিশুদ্ধ উদ্ভিদ উৎপাদন করিবে। ইহা নিম্নে অঙ্কিত চিত্রে বুঝান হইল ; যথা—



F_1 সংকর উদ্ভিদের উৎপন্ন গ্যামেটের মিলনের ফলে F_2 অপত্য বংশে যে বিভিন্ন চরিত্রের উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় তাহা চেকার বোর্ড (Checker Board) নামক ছকে দেখান যায়। ইহা নিম্নে দেখান হইল ;

♂→ পুং গ্যামেট

♀↓ স্ত্রী-গ্যামেট

	T	t
T	TT দীর্ঘাকার	Tt দীর্ঘাকার
t	Tt দীর্ঘাকার	tt খর্বাকার

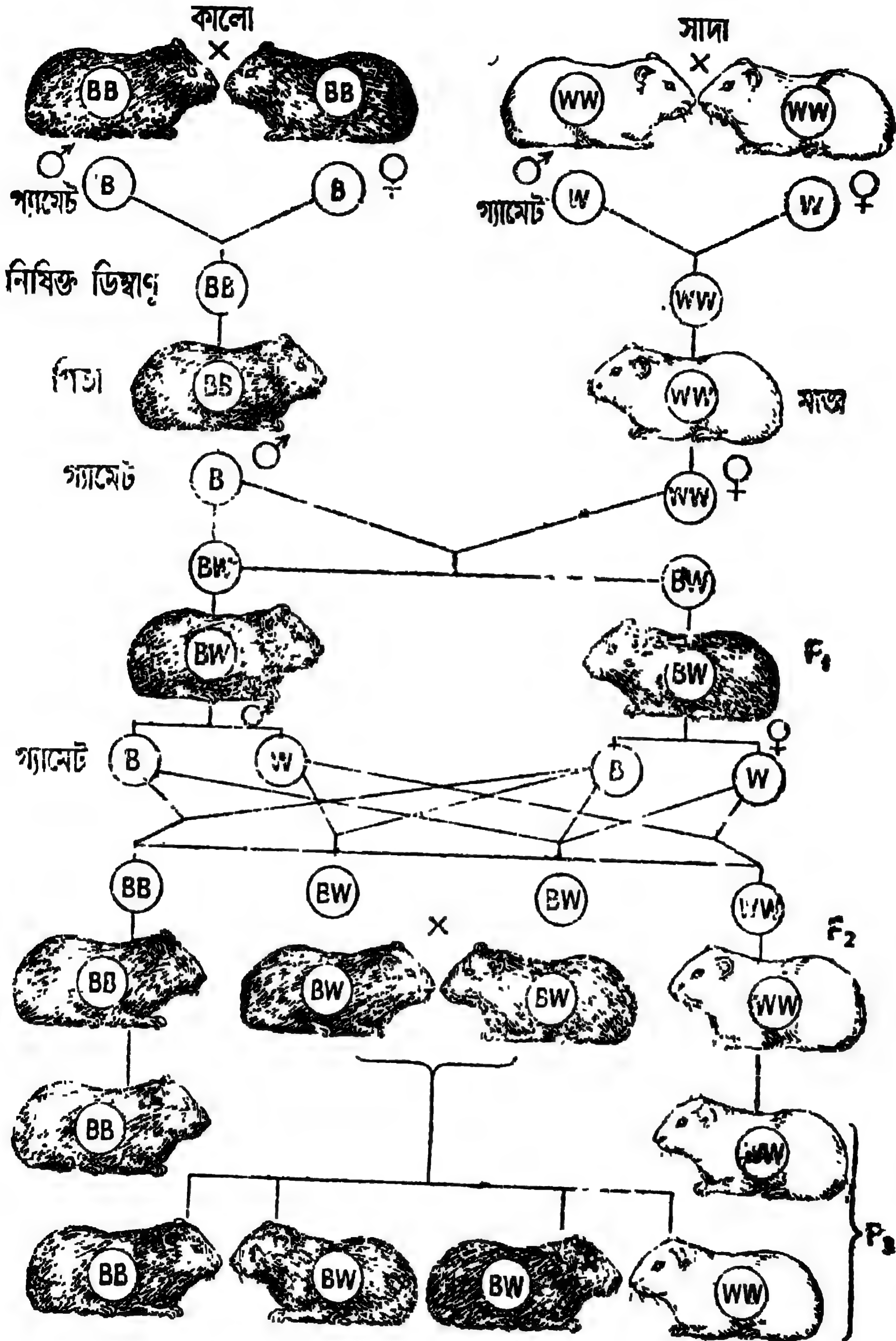
TT : Tt : tt
1 : 2 : 1 জেনোটাইপ
3 : 1 ফেনোটাইপ

চেকার বোর্ড হইতে ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, দুইটি অসমগুণযুক্ত অর্থাৎ একটি প্রবল ও আর একটি প্রচ্ছন্নগুণ, (হেটারোজাইগাস মিলন) সংকর উদ্ভিদ, দুই প্রকার গ্যামেট উৎপন্ন করে। পুং ও স্ত্রী উভয়দিকেই এইরূপ হয় বলিয়া ইহাদের "যেমন খুসী বা যথেচ্ছ (Random) মিলনে ফলে মোট চারিটির মধ্যে তিন প্রকার অপত্য বংশধর উৎপন্ন হয়, যথা, একটি হোমোজাইগাস প্রবলগুণ ও একটি হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্নগুণ (পূর্বেকার পিতামাতার ন্যায়) এবং দুইটি হেটারোজাইগাস প্রবলগুণ। সুতরাং একক জননপরীক্ষার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, পরীক্ষার প্রারম্ভে পিতা-মাতার যেরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা সংকর উদ্ভিদে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল (প্রবলগুণের উপস্থিতিতে প্রচ্ছন্নগুণ) তাহা দ্বিতীয় অপত্য বংশে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে (3 : 1) বাহির হইয়া আসিল।

বিভিন্ন প্রাণীর উপরও বংশগতির পরীক্ষা দেখান যাইতে পারে (৭১নং চিত্র) ঃ

এই পরীক্ষার জন্য বিশুদ্ধগুণ সম্পন্ন সাদা ও কালো রঙের গিনিপিগ লওয়া যাইতে পারে। একটি সাদা ও একটি কালো রঙের গিনিপিগের সমস্ত সন্ততি প্রথম অপত্য বংশে কালো রঙের হয়, কারণ ইহা প্রবলগুণ সম্পন্ন চরিত্র। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সাদা রঙ প্রচ্ছন্নভাবে থাকায় ঐগুলি অ-বিশুদ্ধ কালো বলিয়া বিবেচিত হইবে। দ্বিতীয় অপত্য বংশে গিনিপিগের যে সন্তান জন্মাইবে সেগুলির মধ্যে শতকরা 75 ভাগের কালো এবং 25 ভাগের রঙ সাদা হয়। সাদা গিনিপিগগুলি বিশুদ্ধ সাদা এবং তাহাদের সমস্ত সন্ততির রঙও সাদা, 75 ভাগ কালো রঙের মধ্যে 25 ভাগ বিশুদ্ধ কালো এবং তাহারা কেবলমাত্র কালো গিনিপিগের জন্ম দেয়। বাকী 50 ভাগ কালো গিনিপিগ

অ-বিশুদ্ধ, সুতরাং তাহাদের সন্ততিগুলি পুনরায় 3 : 1 অনুপাতে কালো ও সাদা রঙের হয়।



৭১নং চিত্র—গিনিপিগের উপর একক সংকর জনন পরীক্ষা

স্বাধীন বা মুক্ত সঞ্চারণ সূত্র (Law of independent Assortment)

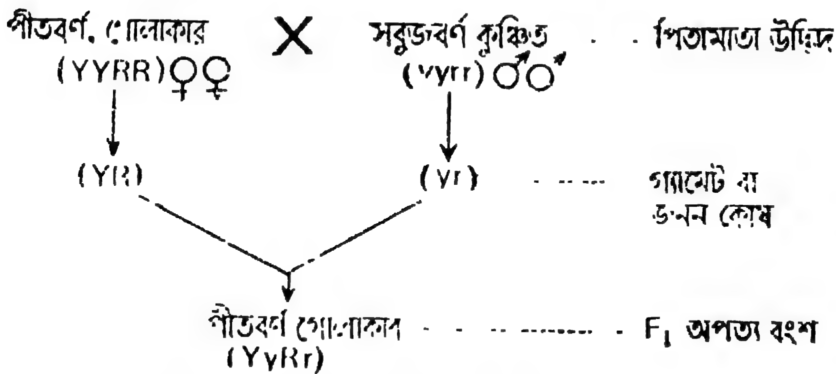
মেণ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রটি এইরূপ—দুই জোড়া তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনকারী দুইটি বিশুদ্ধ উদ্ভিদের মধ্যে যখন ইতর পরাগযোগের সাহায্যে যৌন

সংযোগ স্থাপন করা হয় তখন ঐ সকল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হয়।

এই সূত্রের মাধ্যমে ইহাই বোঝান হইতেছে যে, দুইটি তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য যখন একত্রে বংশানুসরণ করে (Inherited together) তখন তাহারা সঞ্চারণের ক্ষেত্রে পরস্পর স্বাধীন বা মুক্ত থাকে; অর্থাৎ একটি চরিত্রের বংশানুসরণের সময় অন্য চরিত্রটি কোনরূপ বাধা বা প্রভাব বিস্তার করে না। শুধু তাহাই নহে, চরিত্র দুইটি সংকর উদ্ভিদের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থান করিলেও তাহাদের মধ্যে কোনরূপ "চারিত্রিক-মিশ্রণ" (Blending of characters) অথবা, একটি চরিত্রের বহিঃপ্রকাশে অন্য চরিত্রটি কোনরূপ বাধা আরোপ করে না।

প্রত্যেকটি চরিত্র স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হয় বলিয়া দ্বি-সংকর জনন প্রক্রিয়ায় দুইটি তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সর্বমোট চারিপ্রকার চারিত্রিক যোগ (Character combination) সৃষ্টি হয় এবং তাহারা 9 : 3 : 3 : 1 এই অনুপাতে প্রকাশিত হয়।

মুক্ত সঞ্চারণ নীতি সহজে বুঝিতে হইলে মেণ্ডেলের দ্বি-সংকর জনন পরীক্ষাটি চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখিতে হইবে। এই স্থলে পীতবর্ণ বীজপত্র ও গোলাকার বীজ চরিত্রগুলি যথাক্রমে, সবুজ বীজপত্র ও কুঞ্চিত বীজ চরিত্র হইতে প্রবল। পীতবর্ণ



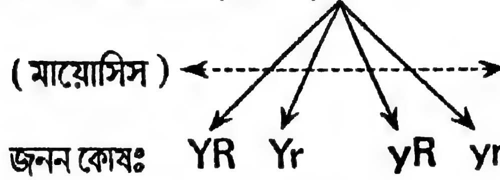
চরিত্রকে 'Y'-চিহ্ন এবং গোলাকার চরিত্রকে 'R'-চিহ্ন দ্বারা সূচিত করিলে বিশুদ্ধ পীতবর্ণ ও গোলাকার মটর গাছের জেনোটাইপ হইবে YYRR এবং যেহেতু সবুজ ও কুঞ্চিত চরিত্রদ্বয় প্রচ্ছন্নগুণ সম্পন্ন সুতরাং বিশুদ্ধ সবুজ বীজপত্র ও কুঞ্চিত বীজযুক্ত মটর গাছের জেনোটাইপ হইবে yyrr। গ্যামেটে বা জননকোষে প্রতিটি চরিত্রের একটি করিয়া অ্যালিল আসে, সুতরাং পরীক্ষায় মাতা-পিতা উদ্ভিদের গ্যামেট যথাক্রমে YR ও yr বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইবে। এখন, YR ও yr বৈশিষ্ট্যযুক্ত গ্যামেটদ্বয়ের মিলনে যে পীতবর্ণ বীজপত্র ও গোলাকার বীজযুক্ত সংকর উদ্ভিদ (F_1 অপত্য বংশ) উৎপন্ন হয়, তাহার জেনোটাইপ হইল YyRr (হেটারোজাইগাস অবস্থান)।

দ্বি-সংকর জনন পরীক্ষায় মেণ্ডেলের সফলতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল যে, তিনি যে সকল চরিত্র নির্বাচিত করিয়াছিলেন তাহাদের তুলনামূলক যুগ্মবৈশিষ্ট্যগুলি এক একটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়ের উপর অবস্থিত ছিল। সুতরাং মায়োসিস্ প্রক্রিয়ায়

গ্যামেট উৎপন্নের সময় সমসংস্থ ক্রোমোজোমদ্বয় যখন দুই মেরুপ্রান্তে গমন করিয়া অপত্য নিউক্লিয়াস গঠন করে, তখন ঐ ক্রোমোজোমদ্বয়ের উপর অবস্থিত তুলনামূলক যুগ্ম বৈশিষ্ট্যগুলিও পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াসের অন্তর্ভুক্ত হয়। একটি তুলনামূলক যুগ্ম বৈশিষ্ট্য যখন পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া দুই মেরুতে গমন করে তখন আর একটি সমসংস্থ ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত আরও একটি যুগ্ম বৈশিষ্ট্য পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দুইটি মেরুতে গমন করে।

ধরা যাক, Yy এই বৈশিষ্ট্য জুটি একটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম জুটির উপর এবং Rr বৈশিষ্ট্য জুটি অন্য একটি সমসংস্থ জুটির উপর অবস্থিত আছে। প্রথম অ্যানাফেজ

F_1 অপত্য বংশের জেনোটাইপঃ Yy Rr



দশায়, ক্রোমোজোম পৃথকীকরণের সময় Y বৈশিষ্ট্য যে মেরুতে গমন করিবে y বৈশিষ্ট্যটি তাহার বিপরীত মেরুতে যাইবে। এইভাবে R ও r জুটিও পৃথক হইবে।

♂ → পুং গ্যামেট

♀ ↓ স্ত্রী গ্যামেট

	YR	Yr	yR	yr
YR	YYRR পীতবর্ণ গোলাকার	YYRr পীতবর্ণ গোলাকার	YyRR পীতবর্ণ গোলাকার	YyRr পীতবর্ণ গোলাকার
Yr	YYRr পীতবর্ণ গোলাকার	YYrr পীতবর্ণ কুঞ্চিত	YyRr পীতবর্ণ গোলাকার	Yyrr পীতবর্ণ কুঞ্চিত
yR	YyRR পীতবর্ণ গোলাকার	YyRr পীতবর্ণ গোলাকার	yyRR সবুজবর্ণ গোলাকার	yyRr সবুজবর্ণ গোলাকার
yr	YyRr পীতবর্ণ গোলাকার	Yyrr পীতবর্ণ কুঞ্চিত	yyRr সবুজবর্ণ গোলাকার	yyrr সবুজবর্ণ কুঞ্চিত

9 পীতবর্ণ গোলাকার : 3 পীতবর্ণ, কুঞ্চিত : 3 সবুজবর্ণ, গোলাকার : 1 সবুজবর্ণ কুঞ্চিত

এখন, যে মেরুতে Y গিয়াছে সেই মেরুতে R ও r-এর মধ্যে যে-কোন একটি যাইবে ৮

সুতরাং, দুই জোড়া তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য থাকিলে চারি প্রকার বৈশিষ্ট্য সমন্বয় (Factor combination), যেমন, RY, Ry, rY, এবং ry হইবে। এইরূপে স্বাধীন সঞ্চারণ হইলে দুইজোড়া তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যের হেটারোজাইগাস অবস্থান হইতে (F_1 অপত্য উদ্ভিদ) চারি প্রকার জননকোষ উৎপন্ন হয়।

উপরিউক্ত চারি প্রকার জননকোষ মাতা-পিতা উভয় দিকেই সমসংখ্যায় উৎপন্ন হয়। তাহাদের প্রত্যেকেরই অন্য চারি প্রকার বিপরীত লিঙ্গের জননকোষের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ সমান থাকে। ফলে সর্বমোট 16 প্রকার জাইগোট উৎপন্ন হয়। এই ষোলটির মধ্যে 9টিতে দুইটি চরিত্রের কমপক্ষে একটি করিয়া প্রবলগুণ থাকে। তিনটিতে একটি চরিত্রের এবং আরও তিনটিতে অন্য চরিত্রের প্রবলগুণ অন্তত একটি থাকে। অবশিষ্ট জাইগোটে একটিও প্রবলগুণ থাকে না। ইহা পূর্ব পৃষ্ঠার চেকার বোর্ডে (Checker Board) দেখান হয়েছে।

মেণ্ডেলের সফলতার কারণ :

সুপ্রজনন পরীক্ষায় মেণ্ডেল যে সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহার মূল কারণগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল।

১। মটর গাছকে পরীক্ষার উদ্ভিদ হিসাবে নির্বাচন।

২। তিনি গাছের বিশুদ্ধতা নিরূপণে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এইজন্যই পরীক্ষার গাছগুলি নির্বাচিত চরিত্রে বিশুদ্ধ ছিল।

৩। প্রথমে একক সংকর জনন পরীক্ষার দ্বারা শুরু করিয়া ক্রমে দ্বি-সংকর এবং ত্রি-সংকর জনন পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ প্রথমে অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল হইতে শুরু করিয়া ক্রমে জটিলতর সমস্যা সমাধানের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

৪। প্রতি জনন পরীক্ষার ফল অন্ততপক্ষে তৃতীয় অপত্য বংশ পর্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

৫। সকল ক্ষেত্রেই পরীক্ষার ফলাফল অত্যান্ত সতর্কতার সহিত গণিতিক পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

৬। প্রত্যেকটি বংশধরকে তাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথক করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করেন এবং তাহাদের পূর্বেকার বংশের সহিত গণিতিক পদ্ধতি অনুসারে তুলনা করিয়া তবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৭। তবে একদিক হইতে মেণ্ডেল অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ছিলেন যে, যে সকল চরিত্রগুলি পরীক্ষার জন্য নির্বচন করিয়াছিলেন, সেগুলি সকলেই ভিন্ন ভিন্ন সমসংস্থ ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত ছিল। সুতরাং দ্বি-সংকর অথবা ত্রি-সংকর জনন পরীক্ষার ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের মুক্ত সঞ্চারণের সহিত বৈশিষ্ট্যগুলিরও মুক্ত সঞ্চারণ হইয়াছিল।

৮। মায়োসিস সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকা সত্ত্বেও চরিত্রগুলির বংশানুসরণ পদ্ধতি এবং প্রতিটি চরিত্রের জন্য দুইটি করিয়া তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যের কল্পনা—এ সকলই তাঁহার নিজস্ব অসাধারণ চিন্তা শক্তি ও বিজ্ঞানী মনের পরিচয় যাহার জন্যই পরীক্ষালব্ধ ফল হইতে সুন্দর এবং যথার্থ ব্যাখ্যা সম্ভব হইয়াছিল।

মেণ্ডেলের বৈশিষ্ট্য তত্ত্বের (Factors) সহিত মায়োসিস কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোমের আচরণের সাদৃশ্য

(ক) মেণ্ডেল বৈশিষ্ট্যগুলির অবস্থান নিউক্লিয়াসের মধ্যেই চিন্তা করিয়াছিলেন।	(ক) নিউক্লিয়াসের মধ্যেই ক্রোমোজোম অবস্থান করে।
(খ) প্রতিটি চরিত্রের জন্য দুইটি করিয়া তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য থাকে। উহাদের মধ্যে একটি প্রবল ও অন্যটি প্রচ্ছন্নগুণ হইতে পারে অথবা দুইটি-ই একই প্রকৃতির 'হোমোজাইগাস' হইতে পারে।	(খ) ডিপ্লয়েড কোষে প্রতিটি ক্রোমোজোম দুইটি করিয়া থাকে। ইহাদের সমসংস্থ ক্রোমোজোম বলা হয়।
(গ) জননকোষ গঠনের সময় প্রতিটি চরিত্রের দুইটি তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যের একটি করিয়া জননকোষে আসে।	(গ) মায়োসিস কোষবিভাজনের সময় প্রথম মেটাফেজ দশায় সমসংস্থ ক্রোমজোমগুলি জোড়বদ্ধ হয়, এবং প্রথম অ্যানাফেজ দশায় তাহারা পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াসের অন্তর্ভুক্ত হয়।
(ঘ) মেণ্ডেল কল্পিত বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই সঞ্চারিত হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হয়।	(ঘ) স্পিণ্ডল তন্তুর উপর যে-কোন একটি জোড়বদ্ধ ক্রোমোজোমের অবস্থান (স্থান সংক্রান্ত) অন্যান্য ক্রোমোজোম জোড়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। অর্থাৎ তাহা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়।
(ঙ) প্রতিটি জননকোষে প্রত্যেকটি চরিত্রের একটি করিয়া বৈশিষ্ট্য থাকে।	(ঙ) উৎপন্ন জননকোষের প্রত্যেকটিতে প্রতিটি ক্রোমোজোম কেবলমাত্র একটি করিয়া থাকে।
(চ) ডিপ্লয়েড জাইগোটের মধ্যে প্রতিটি চরিত্রের জন্য দুইটি করিয়া বৈশিষ্ট্য পুনরায় একত্রিত হয়।	(চ) ডিপ্লয়েড জাইগোটের মধ্যে পুনরায় প্রতিটি ক্রোমোজোম দুইটি করিয়া উপস্থিত হয়।

২

লিঙ্কেজ এবং ক্রসিং-ওভার
(Linkage and Crossing Over)

ক্রোমোজোমকে যদি জীনের বাহকরূপে গণ্য করা হয় এবং একটি জীব যদি কোন অ্যালেলিক জোড়ে, যেমন, Aa হেটারোজাইগাস হয়, তাহা হইলে ঐ আলেলিক জোড় দুইটি, একটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়ের উপর অবস্থিত থাকিবে (একটি ক্রোমোজোমে ‘A’ এবং অপর ক্রোমোজোম ‘a’)। মায়োসিসের ফলে উৎপন্ন জননকোষের অর্ধেকের মধ্যে ‘A’ এবং অবশিষ্ট অর্ধেকের মধ্যে ‘a’ বহনকারী ক্রোমোজোম থাকিবে। এক্ষণে যদি ঐ জীবটি দুইটি চরিত্রে হেটারোজাইগাস হয়, (অর্থাৎ, AaBb) এবং A-a ও B-b জোড় দুইটি পৃথক সমসংস্থ ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত থাকে তাহা হইলে জননকোষ উৎপন্ন হইবার কালে মেন্ডেলের স্বাধীন সঞ্চরণ সূত্র অনুসারে, পরস্পর স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হইয়া চারি প্রকার জনন কোষ, $2^2=4$, গঠন করিবে। এইরূপে, তিন জোড়া হেটারোজাইগাস অ্যালিল থাকিলে, যেমন, Aa Bb Cc, এবং উহারা যদি তিন জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে, উপরিউক্ত নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ $2^3=8$ প্রকার জনন কোষ উৎপন্ন হইবে।

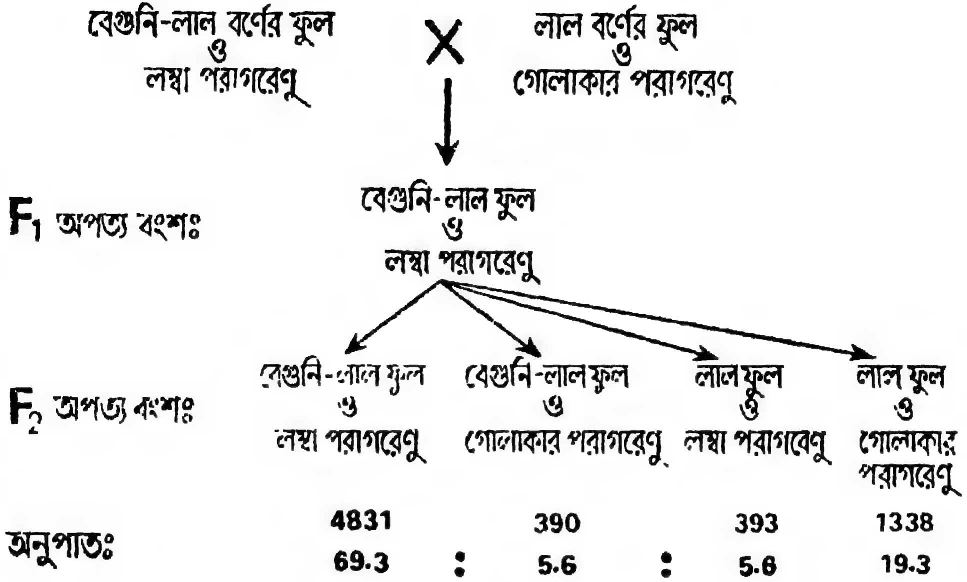
মায়োসিস প্রক্রিয়ার সময় মাকুতন্তুর উপর উপরিউক্ত Aa Bb Cc অ্যালিলগুলি সহ তিনজোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোমের চারি প্রকার অবস্থান সম্ভব হয়। এবং ঐরূপ অবস্থান হইতে 8 প্রকার জননকোষ উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই একই নিয়মে, চারি জোড়া তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য থাকিলে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় $2^4=16$ প্রকার জননকোষ উৎপন্ন হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ক্রোমোজোমের স্বাধীন সঞ্চরণের সহিত বৈশিষ্ট্য বা জীনের স্বাধীন সঞ্চারণ সম্ভব হয়। মেন্ডেল কল্পিত বৈশিষ্ট্য সঞ্চরণ পদ্ধতি ও মায়োসিস কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোমের আচরণ পদ্ধতির এই প্রকার সাদৃশ্য, সাটন বোভারি ও দ্যি ফ্রীস্ (Sutton, Boveri and De Vries) প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ লক্ষ্য করেন। এই সাদৃশ্য জীনের (বংশগতির একক) ক্রোমোজোমের উপর অবস্থান মতবাদকে অনেকখানি জোরালো করিয়াছে।

লিঙ্কেজ

জীন যে ক্রোমোজোমের উপর অবস্থান করে তাহার আরও নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল যখন বেটসন ও পুনেট (W. Bateson and R. C. Punett) কড়াইশুঁটি (Sweet pea) গাছের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে লিঙ্কেজ ঘটনাটি লক্ষ্য করেন। 1906 খ্রীষ্টাব্দে তাহারা একটি দ্বি-সংকর জনন পরীক্ষা বিশ্লেষণ করিবার সময় দেখিলেন যে প্রাপ্ত ফল মেন্ডেলের দ্বি-সংকর অনুপাতের সহিত মিলিতেছে না। সেখানে স্বাভাবিকের তুলনায়

মাতা-পিতার ধরন অধিক সংখ্যায় আসিতেছে। অপরদিকে, বিভিন্ন চরিত্রের পুনর্বণ্টিকরণ বা পুনর্মিশ্রণ (Recombination of Characters) স্বাভাবিক হইতে অনেক কম ছিল। বেটসন ও পুনেট কৃত দ্বি-সংকর জনন পরীক্ষাটি নিম্নে দেওয়া হইল।



উপরে লিখিত পরীক্ষায় যদি 'R' অক্ষরকে বেগুনী-লাল বর্ণের প্রতীক এবং 'r' অক্ষরটি ইহার প্রচ্ছন্নগুণ অর্থাৎ লাল, এবং 'P' ও 'P'-কে যথাক্রমে লম্বা ও গোলাকার পরাগরেণুর প্রতীক ধরা হয়, তাহা হইলে মূল জনন পরীক্ষাটি RRPP × rrpp এইরূপ ছিল। সুতরাং F_1 অপত্য বংশে সংকর উদ্ভিদের জেনোটাইপ ও ফেনোটাইপ যথাক্রমে, RrPp এবং বেগুনী-লাল বর্ণের ফুল ও লম্বা পরাগরেণু ছিল; দ্বিতীয় অপত্য বংশে চারি প্রকার চারিত্রিক মিশ্রণ 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাতে না আসার প্রকৃত কারণ F_1 সংকর উদ্ভিদে PR ও pr জীন যুক্ত জননকোষ অধিক সংখ্যায় প্রস্তুত হওয়া। মেণ্ডেলের রীতি অনুসারে PR, Pr, pR ও pr জননকোষ সমহারে প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই।

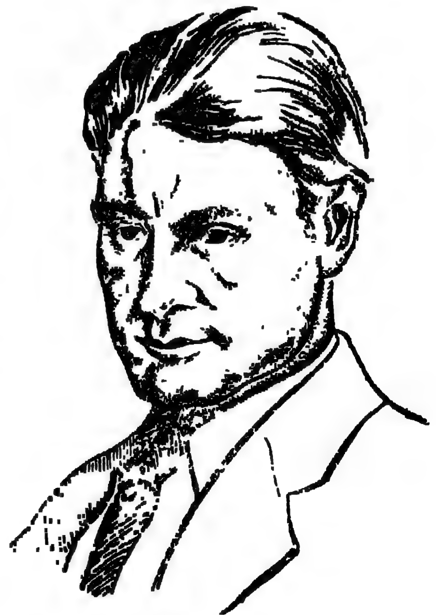
বেটসন ও পুনেট যদিও লিংকেজ ঘটনাটি প্রথম লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই ঘটনাটি "কাপলিং এবং রিপালশন" বা "দুই বস্তুর সংযোজন এবং দুই বস্তুর বিকর্ষণ" (Coupling and Repulsion) এই তত্ত্ব দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন। দুইটি প্রবলগুণ (RP) একত্রে অধিক সংখ্যায় গ্যামেটের মধ্যে প্রবেশ করার ঘটনাকে তাঁহারা দুইটি বস্তুর সংযোজন বলিয়া বর্ণনা করেন। একটি প্রবলগুণ ও আর একটি প্রচ্ছন্নগুণের, যেমন, Rp ও rp, একত্রে কোষের মধ্যে প্রবেশ করাকে তাঁহারা দুইটি বস্তুর বিকর্ষণ অর্থাৎ, রিপালশান বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন।

1910 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী মরগ্যান ও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী (T. H. Morgan, C. B, Bridges and A. H. Sturtevant) ড্রসোফিলা (Drosophila melanogaster) নামক এক প্রকার মক্ষিকা লইয়া পরীক্ষা করিয়া আলোচ্য সমস্যার সমাধান করেন। তাঁহারা বেটসন ও পুনেটের "কাপলিং এবং রিপালশান" তত্ত্বকে "লিংকেজ ও ক্রসিং-ওভার" তত্ত্বের দ্বারা অপসারিত করিলেন।



৭২নং চিত্র—থমাস হাণ্ট মরগ্যান

মরগ্যান ও তাঁহার সঙ্গী বিজ্ঞানীগণ ড্রসোফিলার ক্রোমোজোমে এইরূপ অনেকগুলি জীন আবিষ্কার করিলেন যাহারা মেণ্ডেলের সূত্র অনুসারে বংশানুগমন করে না, এই চরিত্রগুলি হইল, চোখের বর্ণ, চোখের গঠন, দেহের বর্ণ, ডানার উৎপত্তি ইত্যাদি। এইরূপ অনেকগুলি জীন আবিষ্কৃত হইবার পর তাঁহারা দেখিলেন যে এই জীনগুলিকে পরিষ্কার চারিটি দলে ভাগ করা যায়। শুধু তাহাই নয়, তাঁহারা ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে, বিভিন্ন দলভুক্ত জীন-গুলির মধ্যে স্বাধীন সঞ্চারণ ও পৃথকীকরণ মেণ্ডেলের সূত্র অনুযায়ী হইতেছে। অপরদিকে, একই দলভুক্ত জীনের মধ্যে অত্যন্ত বেশী মাত্রায় লিংকেজ দেখিতে পাইলেন। ড্রসোফিলার দেহকোষে 8টি ক্রোমোজোম ($n=4$) থাকে। সুতরাং জননকোষে শুধুমাত্র 4টি ক্রোমোজোম আসে। সেইজন্য মরগ্যান ও তাঁহার সঙ্গী বিজ্ঞানীগণ সমস্ত ঘটনাটির নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁহাদের মতে, একটি, ক্রোমোজোমের উপর একাধিক জীন থাকিতে পারে এবং ঐ সকল জীন বাহক ক্রোমোজোমের সহিত একই সঙ্গে বংশানুগমন করে। একটি ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত এইরূপ জীনগুলিকে তাঁহারা লিংকড্ জীন বলিয়া অভিহিত করিলেন। ড্রসোফিলার মধ্যে চারিটি লিংকেজ দল (Linkage group) আছে ; ইহারা যেন চারিটি ক্রোমোজোমের (হ্যাপ্লয়েড) প্রতিভূ।



৭৩নং চিত্র—কেলভিন বি ব্রিজেস

জীনের অবস্থান—মরগ্যানের এই আবিষ্কার শীঘ্রই অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের উদাহরণ হইতে সমর্থিত হইল। লিংকেজ দল ও ক্রোমোজোম সংখ্যার মধ্যে যে সাদৃশ্য

দেখা যায় তাহাতে জীনের ক্রোমোজোমের উপর অবস্থান দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়। 1916 খ্রীষ্টাব্দে ব্রিজস্ (Bridges, 1916) সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট প্রমাণ পাইলেন যে জীন ক্রোমোজোমের উপরই অবস্থিত। তিনি যখন ড্রসোফিলার যৌন-লিংকেজ ঘটিত বংশগতি পরীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় সেখানে মায়োসিস বিভাজনে **নন্‌ডিসজাংশান*** লক্ষ্য করেন এবং তাহার দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেন যে জীন ক্রোমোজোমের উপর অবস্থান করে। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার নন্‌ডিসজাংশান পরীক্ষা হইতে ইহাও প্রমাণ করেন যে কতকগুলি জীন একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের উপর অবস্থান করে এবং জীনের বংশানুগমন মায়োসিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

লিংকেজের অর্থ—লিংকেজ বলিতে একটি ক্রোমোজোমের উপর অনেকগুলি জীনের একত্রে অবস্থান ও একত্রে বংশানুগমনকে বোঝায়। জীন ক্রোমোজোমের উপর অবস্থান করে এবং সেই কারণে তাহাদের মধ্যে লিংকেজ দেখিতে পাওয়া যায়। লিংকড্ জীনগুলির একত্রে অবস্থান ও বংশানুগমন বংশধরের মধ্যে মাতা-পিতার চারিত্রিক ধরন (Parental type) অধিক হারে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন দলভুক্ত লিংকড্ জীনের মধ্যে পুনর্যুক্তিকরণ বা পুনর্মিশ্রণ (Recombination among the linked genes) যে পদ্ধতির দ্বারা সাধিত হয় তাহাকে **ক্রসিং-ওভার** বলা হয়। জীনের লিংকেজ ক্ষমতা (Strength of linkage) তাহাদের পারস্পরিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে। তাহারা যত পরস্পরের নিকটবর্তী থাকে তাহাদের মধ্যে লিংকেজ ক্ষমতাও তত বেশী হয়। অপরদিকে পরস্পর হইতে দূরবর্তী জীনের মধ্যে লিংকেজ ক্ষমতা কম থাকে। কারণ, সেই ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্থান থাকার জন্য ক্রসিং-ওভার অনুষ্ঠিত হইয়া জীনের পুনর্মিশ্রণ সম্ভব হয়। সুতরাং তাহাদের মধ্যে লিংকেজের হার আনুপাতিকভাবে কম থাকে।

লিংকড্ জীন চিহ্নিতকরণের উপায়—এফ. বি হার্ট ও তাঁহার সঙ্গী ডব্লু. এফ. ল্যামোরেক্স (F B. Hutt and W. F. Lamoreux, 1940) 1940 খ্রীষ্টাব্দে একটি দ্বি-সংকর জনন পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই পরীক্ষায় রঙীন ও কুঞ্চিত বা কোঁকড়ান ঝুঁটি বিশিষ্ট একটি মুরগীর সহিত সাদা ও স্বাভাবিক ঝুঁটি যুক্ত মোরগের যৌন জনন সম্পন্ন করেন। মোরগটির মধ্যে হোমোজাইগাস অবস্থায় ইনহিবিটরি (Inhibitory gene) জীন "II" (যাহা ঝুঁটির রঙের বহিঃপ্রকাশে বাধা দেয়) ও

নন্‌ডিসজাংশান—কোষ বিভাজনে অ্যানাফেজ দশায় ক্রোমোজোম বা ক্রোমাটিড্‌দ্বয় পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া দুই বিপরীত মেরুতে গমন করে। ইহাকে ডিস্‌জাংশান (Disjunction) বলে। যদি কোন কারণে ক্রোমোজোম বা ক্রোমাটিড্‌দ্বয় দুইটি বিপরীত মেরুর পরিবর্তে একই মেরুর দিকে গমন করে (অর্থাৎ পৃথকীকরণ না হয়), তাহা হইলে সেই পদ্ধতিকে নন্‌ডিসজাংশান (Nondisjunction) বলা হয়। নন্‌ডিসজাংশানের ফলে উৎপন্ন অপত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যার তারতম্য ঘটে।

স্বাভাবিক ঝুঁটির জন্য প্রচ্ছন্নগুণের জীন 'ff' অবস্থিত ছিল। তাঁহাদের ঐ পরীক্ষাটির নিম্নে দেখান হইল ঃ—

মাতা-পিতাঃ $\frac{iF}{iF}$* (রঙীন ও কুঞ্চিত) ♀♀ × $\frac{If}{If}$ (সাদা ও স্বাভাবিক) ♂♂

ডিম্বাণুঃ $\frac{iF}{}$ শুক্রাণুঃ $\frac{If}{}$

F_1 অপত্য বংশঃ $\frac{iF}{If}$ (সাদা ও কুঞ্চিত) ♀♀ ও ♂♂

টেস্‌ট ক্রসঃ $\frac{iF}{If}$ ♀♀ × $\frac{if}{if}$ ♂♂

	শুক্রাণু if
ডিম্বাণুঃ IF	সাদা, কুঞ্চিত (18)
iF	রঙীন, কুঞ্চিত (63)
If	সাদা, স্বাভাবিক (63)
if	রঙীন, স্বাভাবিক (13)

প্রাপ্ত ফল হইতে দেখা যাইতেছে যে iF এবং If গ্যামেট বা জনন কোষ অধিক মাত্রায় উৎপন্ন হওয়ায় টেস্‌ট ক্রসের আশানুরূপ অনুপাত, 1 ঃ 1 ঃ 1 ঃ 1 হয় নাই। মাতা ও পিতার ক্রোমোজোমে জীনের যেরূপ অবস্থান ছিল, অর্থাৎ iF ও If, তাহা অধিক পরিমাণে (63) আসিয়াছে। শতকরা হার হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে মাতা-পিতা ধরন শতকরা 80·3% এবং পুনর্মিশ্রণের ক্ষেত্রে শতকরা 19·7% হইয়াছে, যাহা 50-50% হওয়া উচিত ছিল। অধিক মাত্রায় মাতা-পিতা ধরনের আবির্ভাব লিঙ্কেজের ইঙ্গিত বহন করে। লিঙ্কেজের ক্ষমতা (অর্থাৎ জীনগুলি যত নিকটবর্তী থাকিবে) যত বেশী হইবে মাতা-পিতা ধরনও তত বেশী হইবে। সুতরাং পুনর্যুক্তির (Recombination) হার হ্রাস পাইবে।

দুইটি চরিত্রে হেটারোজাইগাস অবস্থা হইলে লিঙ্কড্ জীনদ্বয়ের অবস্থান অনুসারে বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যখন দুইটি প্রবলগুণ একটি ক্রোমোজোমে এবং দুইটি প্রচ্ছন্নগুণ উহার সমসংস্থ ক্রোমোজোমের উপর থাকে, যেমন, $\frac{A\ B}{a\ b}$ তাহাকে "কাপলিং" (Coupling) এবং যখন সমসংস্থ ক্রোমোজোমদ্বয়ের প্রত্যেকটিতে একটি প্রবলগুণ ও আর একটি প্রচ্ছন্নগুণ অবস্থিত থাকে, যেমন, $\frac{A\ b}{a\ B}$ তাহাকে "রিপালশান"

* জনন পরীক্ষায় লীঙ্কড্ জীনের অবস্থান $\frac{i\ F}{i\ F}$ অথবা $\frac{i\ F}{i\ F}$ ভাবে দেখান হয়। ইহা সমসংস্থ ক্রোমোজোমের উপর, জীনের অবস্থান বুঝায়।

(Repulsion) বলা হয়। এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে লিংকড্ জীনের পুনর্মিশ্রণের প্রবণতা তাহাদের প্রকৃতিগত অবস্থানের (কাপলিং অথবা রিপালশান) উপর নির্ভর করে না। উভয় ক্ষেত্রেই উহা একই থাকে।

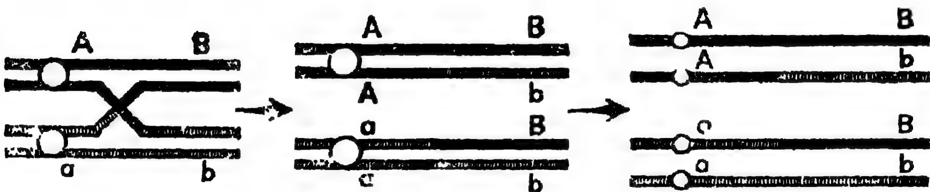
লিঙ্কেজ, F_2 অনুপাত এবং ক্রোমোজোম ম্যাপিং
(Linkage, F_2 ratios and Chromosome maping)

জীনের মধ্যে লিংকেজ থাকিলে মেণ্ডেলের দ্বি-সংকর অনুপাত (Dihybrid ratio), 9 : 3 : 3 1, পরিবর্তন হইয়া যাইবে। শুধু তাহাই নহে, টেস্ট ক্রস অনুপাতও, 1 : 1 : 1 : 1, পরিবর্তন হইবে। এই সকল ক্ষেত্রে মাতা-পিতা ধরন অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হইবে, এবং পুনর্যুক্তির মাত্রা হ্রাস পাইবে। লিংকেজের ক্ষমতা যত বেশী হইবে, অর্থাৎ জীনদ্বয় যত নিকটবর্তী থাকিবে, ক্রসিংওভারের (জীনের পুনর্যুক্তি) মাত্রাও সেই পরিমাণে কম আসিবে।

ক্রসিংওভারের শতকরা হিসাব অনুসারে ক্রোমোজোম ম্যাপিং অর্থাৎ ক্রোমোজোমের উপর জীনের যথার্থ অবস্থান নিরূপণ করা হইয়া থাকে! এখানে ক্রসিংওভারের শতকরা হিসাবকে দুইটি জীনের মধ্যে পার্থক্যের একক ধরা হয়, অর্থাৎ যখন দুইটি জীনের মধ্যে 4% ক্রসিংওভার দেখা যায় তখন বুঝিতে হইবে যে ঐ জীন দুইটি পরস্পর হইতে 4 একক (4 units) দূরত্বে বা ব্যবধানে রহিয়াছে।

ক্রসিংওভার (Crossing over)

মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় সমসংস্থ ক্রোমোজোমদ্বয়ের মুখোমুখী অবস্থিত দুইটি ক্রোমাটিডের পরস্পর অংশ বিনিময় করাকে ক্রসিংওভার বলে (৭৪নং চিত্র)।

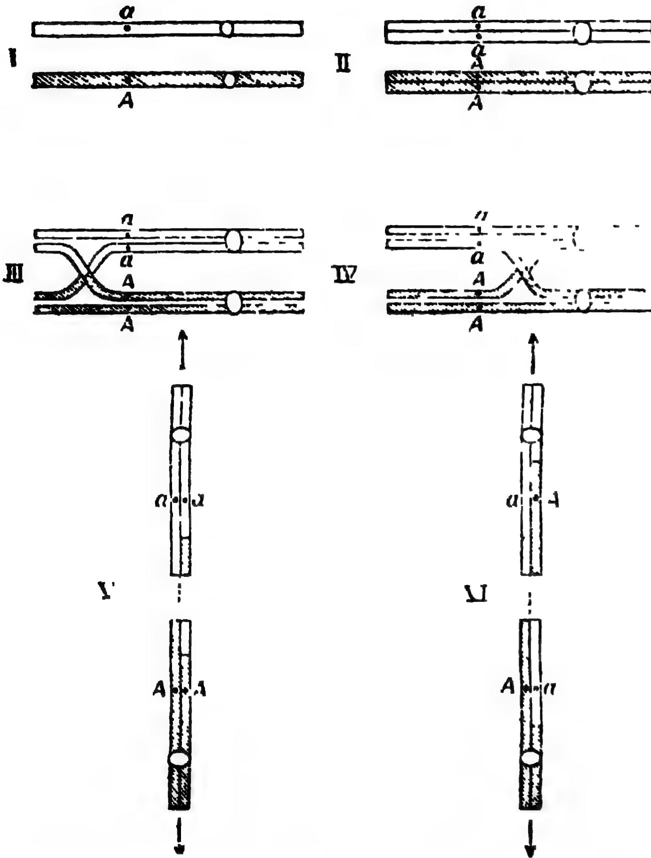


৭৪নং চিত্র—দুইটি সমসংস্থ ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিডের মধ্যে পরস্পর অংশ বিনিময় করাকে ক্রসিংওভার বলা হয়। ক্রসিংওভারের ফলে কায়াজমা গঠিত হয়।

ক্রোমাটিডের অংশ বিনিময়ের সহিত জীন দলের বিনিময় হইয়া থাকে। এইরূপে নূতন জীনের সমাবেশ দ্বারা নূতন ক্রোমোজোম গঠিত হয়। ক্রসিংওভার ক্রোমোজোমের যে-কোন স্থানেই সংঘটিত হইতে পারে, তবে একটি ক্রোমোজোমের উপর কতকগুলি ক্রসিং-ওভার ঘটিতে পারে, তাহা উহার দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। অপেক্ষাকৃত বড় ক্রোমোজোমে দুই অথবা তিনটি পর্যন্ত ক্রসিংওভার হইতে দেখা যায়।

একটি হেটারোজাইগাস অ্যালেলিক জোড়ের, যেমন, Aa, বংশানুগমন মায়োসিসের সময় ক্রোমোজোম পৃথকীকরণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে

যে মায়োসিসের ঠিক কোন সময়ে এই অ্যালেলিক জোড় A-a পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইয়া জননকোষের অন্তর্ভুক্ত হইবে ? বর্তমানে ক্রসিংওভার সম্বন্ধীয় জ্ঞান হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে অ্যালেলিক জোড়দ্বয় পরস্পর হইতে মায়োসিসের প্রথম অ্যানাফেজ অথবা দ্বিতীয় অ্যানাফেজ দশায় বিযুক্ত হইতে পারে। ইহা ৭৫নং চিত্রের সাহায্যে বোঝান হইল। অ্যালেলিক জোড় মায়োসিসের প্রথম অ্যানাফেজ দশায় পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইবে যদি জীন ও সেণ্ট্রোমিয়ারের মধ্যবর্তী কোন স্থানে ক্রসিংওভার অনুষ্ঠিত না হয়। কিন্তু যদি জীন ও সেণ্ট্রোমিয়ারের মধ্যবর্তী কোন স্থানে ক্রসিংওভার অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে A-a অ্যালেলিক জোড়দ্বয় দ্বিতীয় অ্যানাফেজ দশায় পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইবে।



৭৫নং চিত্র—অ্যালেলিক জোড় 'A-a'-এর পৃথকীকরণ পদ্ধতি। I, একটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম যাহাতে একটি হেটারোজাইগাস অ্যালেলিক জোড় A-a রহিয়াছে। II, ক্রোমোজোমদ্বয়ের লম্বচ্ছেদের ফলে চারিটি ক্রোমাটিড গঠিত হইয়াছে। III, অ্যালিল ও সেণ্ট্রোমিয়ারের বাহিরে কায়াজমা গঠন। IV, অ্যালিল ও সেণ্ট্রোমিয়ারের মধ্যবর্তী কোন স্থানে কায়াজমা গঠন। V, প্রথম অ্যানাফেজ দশায় অ্যালেলিক জোড় A-a পরস্পর হইতে পৃথক হইতেছে। VI, কায়াজমা অ্যালিল ও সেণ্ট্রোমিয়ারের মধ্যবর্তী কোন স্থানে গঠিত হইলে অ্যালেলিক জোড় A-a প্রথম অ্যানাফেজ দশায় পরস্পর হইতে পৃথক হইতে পারে না।

চার ক্রোমাটিড অবস্থায় ক্রসিংওভার সংঘটিত হয় (Crossing over takes place at 4-strand stage)

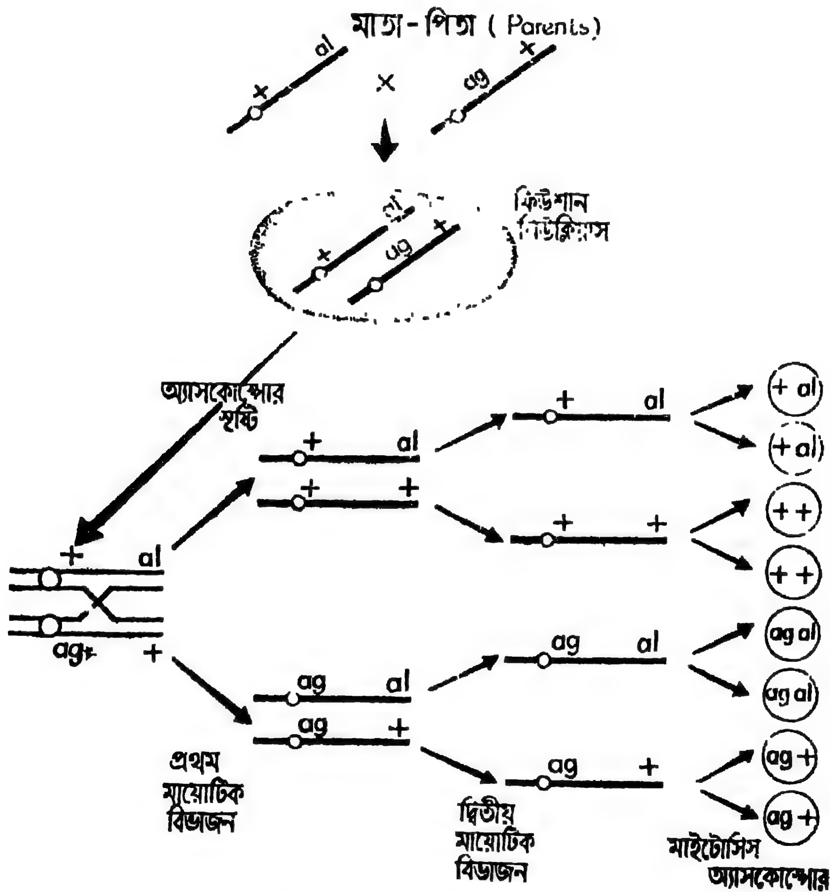
ক্রসিংওভার যে চার ক্রোমাটিড বা সূত্র অবস্থায় সংঘটিত হয়, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

নিউরোস্পোরা একটি মোল্ড ছত্রাক যাহা সাধারণ রুটির উপর জন্মাইয়া থাকে। ইহা হ্যাপ্লয়েড। ইহার ক্রোমোজোম সংখ্যা $n=1$। ইহা অ্যাসকোমাইসেটিস্ গোষ্ঠীভুক্ত। এই ছত্রাক যৌন জননকালে দুই প্রকার স্ট্রেন (Strain) যথাক্রমে + ও − অনুসূত্র পরস্পর মিলিত হইয়া ফিউশান নিউক্লিয়াস গঠন করে। জাইগোট উৎপন্ন হইবার পর মায়োসিস, সংঘটিত হয় এবং পরিশেষে অ্যাসকাস ও অ্যাসকোস্পোর বা

কনিডিয়া গঠিত হয়। নিউরোস্পোরার ক্রোমোজোম সংখ্যা একটি বলিয়া এখানে নানাবিধ সংপ্রজনন পরীক্ষা সহজেই করিতে পারা যায়।

ক্রসিংওভার দ্বি-সূত্র অথবা চারি সূত্র অবস্থায় সংঘটিত হয়, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে যে একজোড়া লিংকড্ জীনের বংশানুগমনের সময় কেবলমাত্র পুনর্যুক্তি ধরন অথবা দুই প্রকার, যথা, মাতাপিতা ও পুনর্যুক্তি ধরন প্রকাশিত হয় কিনা ? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা নিউরোস্পোরার অ্যালবিনো (Albino) ও আর্জিনিন উৎপাদন ক্ষমতা রহিত দুই স্ট্রেনের মধ্যে সংকর জনন পরীক্ষাটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারি।

নিউরোস্পোরার অ্যালবিনো (al) স্ট্রেনটি সাদা বর্ণের কনিডিয়া প্রস্তুত করে কিন্তু উহা স্বাভাবিকভাবে অ্যামিনো-অ্যাসিড আর্জিনিন উৎপন্ন করিতে পারে। দ্বিতীয়



৭৬নং চিত্র—দুইটি লিঙ্কড্ জীনের মধ্যে ক্রসিংওভার অনুষ্ঠিত হইবার পর নিউরোস্পোরার অ্যাসকাসের মধ্যে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরনের অ্যাসকোস্পোর।

স্ট্রেনটি কমলা বর্ণের কনিডিয়া উৎপন্ন করেন। কিন্তু উহা অ্যামিনো-অ্যাসিড আর্জিনিন উৎপন্ন করিতে পারে না (ag)। al ও ag জীনদ্বয় স্বাভাবিক জীনের (+) পরিব্যক্তির ফলে সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং উহারা প্রচ্ছন্নগুণ সম্পন্ন। উহাদের প্রবলগুণগুলি '+' চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করা হইল। ইহা জানা আছে যে এই জীনগুলি পরস্পর লিংকড্

এবং জীন 'ag' সেণ্ট্রোমিয়ারের নিকটে অবস্থিত। সুতরাং মাতা-পিতা স্ট্রেনের ক্রোমোজোমের উপর জীনের অবস্থান হইল যথাক্রমে, —o+ al— এবং —oag +— ।

ক্রোমোজোমের রেখাচিত্রের উপর ছোট বৃত্তকে সেণ্ট্রোমিয়ার বলিয়া বুঝিতে হইবে। আলোচ্য স্ট্রেন দুইটির জনন পরীক্ষা নিম্নে দেওয়া হইল :—

নিষেক ক্রিয়ার পর উৎপন্ন পুনর্যুক্ত স্ট্রেনে (Recombination type) যথাক্রমে, —o+ +— এবং —oag al— ক্রোমোজোম থাকে। জনন কার্যের পর উৎপন্ন কনিডিয়া হইতে পুনর্যুক্ত ধরন স্ট্রেন পাওয়া যায়। উৎপন্ন আটটি কনিডিয়ার মধ্যে চারিটি সাদা ও চারিটি কমলা বর্ণের। চারিটি সাদা কনিডিয়ার মধ্যে দুইটি পূর্বের মাতা-পিতা ধরনের এবং দুইটি পুনর্যুক্তি ধরনের অর্থাৎ, দুইটি পরিব্যক্তিশীল জীনের একত্র সমাবেশ এবং চারিটি কমলা বর্ণের কনিডিয়ার মধ্যে দুইটি মাতা-পিতার ন্যায় এবং দুইটি পুনর্যুক্তি অর্থাৎ, দুইটি স্বাভাবিক জীনের একত্র সমাবেশ ধরনের জীন বিন্যাস পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বংশধরদের মধ্যে শতকরা 50 ভাগ মাতা-পিতা ধরনের এবং শতকরা 50 ভাগ পুনর্যুক্তি ধরনের হইয়াছে। ক্রসিংওভার যদি চারিটি সূত্র অবস্থায় সংঘটিত না হইত তাহা হইলে এইরূপ হইত না।

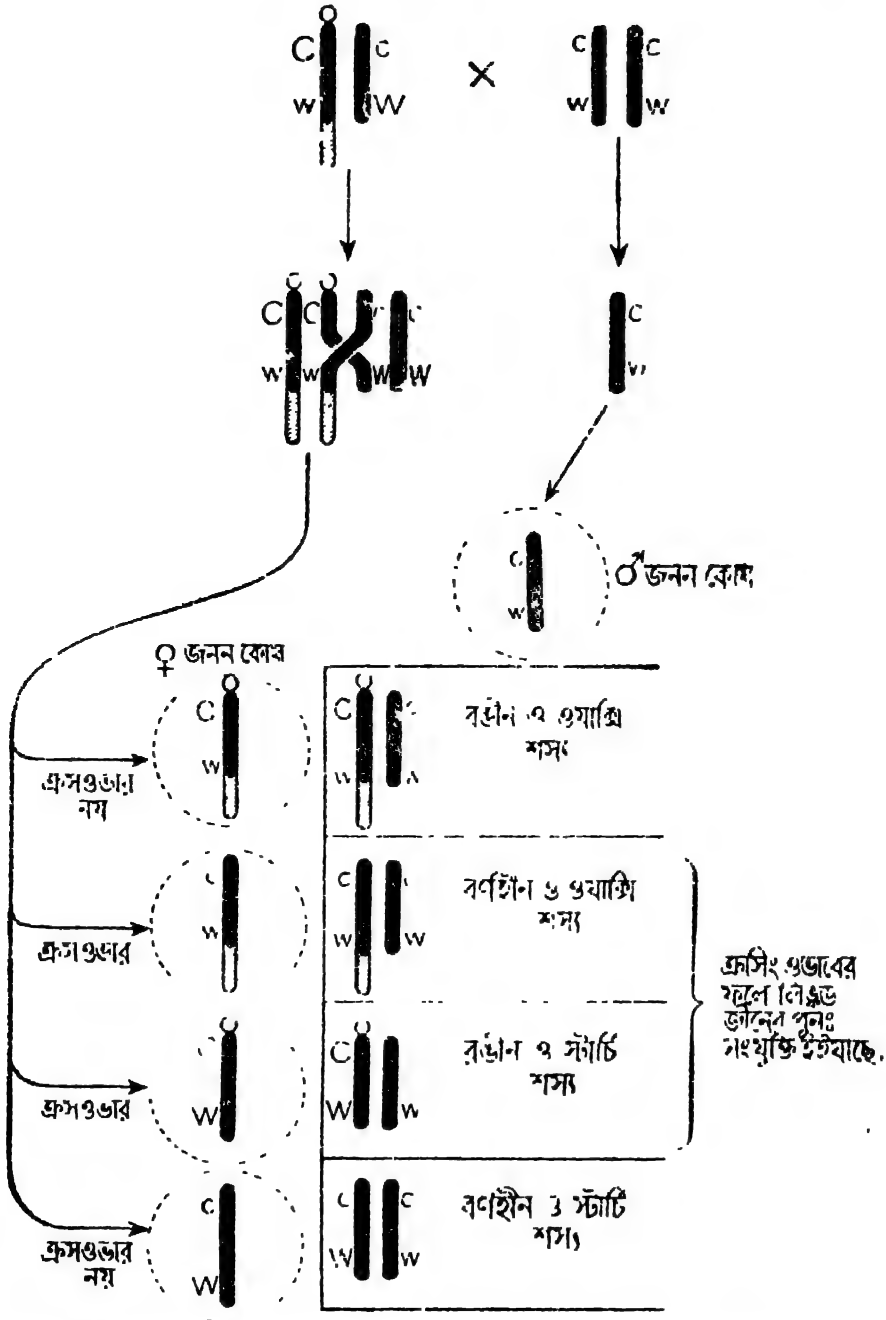
দ্বি-সূত্র অবস্থায় ক্রসিংওভার সম্পন্ন হইলে শুধুমাত্র পুনর্যুক্তি ধরনের স্ট্রেন গঠিত হইত। মাতা-পিতার ধরন বংশধরের মধ্যে দেখা যাইত না।

লিঙ্কড্ জীনের পুনর্মিশ্রণ ক্রসিংওভারের ফলেই সম্পন্ন হয় (Recombination of characters is associated with cytological exchange of chromosome parts)

যদিও লিংকেজ ও ক্রসিংওভার তত্ত্ব বহুদিন পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু ক্রসিংওভারের ফলেই যে বিভিন্ন জীনের অর্থাৎ চরিত্রের পুনঃসংযুক্তি হয় তাহার সরাসরি কোন প্রমাণ বিজ্ঞানীদের কাছে ছিল না। উহার প্রধান কারণ হইল যে সমসংস্থ ক্রোমোজোমের দুই প্রান্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে একই রকম দেখিতে লাগে বলিয়া তাহাদের একটিকে অন্যটি হইতে তফাৎ করা যায় না। এই অসমাপ্ত কার্যটিও পরিশেষে সম্পন্ন হয় কতিপয় বিজ্ঞানীর অসামান্য কর্ম সাধনায়। বিজ্ঞানী স্টার্ন (C. Stern), ড্রসোফিলার উপর এবং ক্রেগটন ও ম্যাক্লিংটক (H. B. Creighton and B. Mc. Clintock, 1931) ভুট্টার উপর গবেষণা করিয়া প্রায় একই সময় প্রমাণ করিলেন যে ক্রসিংওভারের ফলেই জীনের পুনর্মিশ্রণ হইয়া থাকে।

ভুট্টাগাছের উপর ক্রেগটন ও ম্যাকলিংটকের পরীক্ষা—ভুট্টা গাছের উপর X-ray পরীক্ষা চালাইয়া তাঁহারা এমন একটি প্রকার পাইলেন যেখানে ৮নং দলের একটি ক্রোমোজোমের একটি অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং ঐ ভগ্ন অংশটি ৯নং সমসংস্থ দলের একটি ক্রোমোজোমের এক প্রান্তে জুড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা আরও লক্ষ্য করিলেন যে ঐ ৯নং ক্রোমোজোমটির যে প্রান্তে ট্রান্সলোকেশান হইয়াছে তাহার অন্য প্রান্তে একটি

হেটারোক্রোমাটিনের বৃন্ত রহিয়াছে (Heterochromatic knob)। সুতরাং তাঁহারা এমন একটি প্রজাতি পাইলেন যাহার কোষের বার জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে একটি



৭৭নং চিত্র—ক্রেগটন ও ম্যাকলিংটকের জীনের পুনর্মিশ্রণ পরীক্ষা। তিনি এমন একটি ভুট্টার প্রকার পাইয়াছিলেন যাহার একটি সমসংস্থ ক্রোমোজোমের দুই প্রান্ত সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব হইয়াছিল। চিহ্নিত ক্রোমোজোমের উপর জীনের অবস্থান নির্দিষ্ট হইবার পর ক্রসিংওভারের ফলেই যে জীনের পুনর্মিশ্রণ সম্ভব হয় তাহা প্রমাণিত হয়।

সমসংস্থ দলের দুইটি ক্রোমোজোমকেই চিহ্নিত করা যায় (একটি স্বাভাবিক, অন্যটি আকারে বড় এবং বড়টির একপ্রান্তে একটি হেটারোক্রোমাটিনের বৃন্ত আছে।

স্বাভাবিক ক্রোমোজোমটির উপর বর্ণহীন (অ্যালিউরোন দানা) সস্য (c) ও স্টার্চ সস্য (W) জীনদ্বয় রহিয়াছে এবং বড় ক্রোমোজোমটির উপর রঙীন শস্য (C) ও ওয়াক্সি সস্যের (w) জীন রহিয়াছে। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে স্টার্চ সস্য ও রঙীন সস্য চরিত্র দুইটি প্রবলগুণ এবং ওয়াক্সি সস্য ও বর্ণহীন সস্য চরিত্র দুইটি প্রচ্ছন্নগুণ।

এইরূপ একটি প্রকার লইয়া বিজ্ঞানীদ্বয় টেস্ট-ক্রস সম্পন্ন করেন। তাঁহাদের টেস্ট-ক্রসের ফলাফল ৭৭নং চিত্রে দেখান হইল।

প্রাপ্ত বংশধরদের চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দুইটি মাতা-পিতা ধরনের মধ্যে মাতা-পিতার ক্রোমোজোম রহিয়াছে। কিন্তু দুইটি পুনঃযুক্ত ধরনের মধ্যে ক্রোমোজোমের আকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। রঙিন ও স্টার্চ সস্য বিশিষ্ট উদ্ভিদটির মধ্যে ছোট ক্রোমোজোমের একপ্রান্তে হেটারোক্রোমাটিন বৃত্ত রহিয়াছে, অপরদিকে বর্ণহীন ও ওয়াক্সি সস্য বিশিষ্ট উদ্ভিদটির মধ্যে বড় ক্রোমোজোমে হেটারোক্রোমাটিন বৃত্ত লক্ষিত হইল না। অর্থাৎ চরিত্রের পুনঃসংযুক্তির সহিত ক্রোমোজোমেরও পুনঃসংযুক্তি হইয়াছে। হেটারোক্রোমাটিন বৃত্তটি বড় ক্রোমোজোম হইতে ছোট ক্রোমজোমের উপর স্থানান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং ক্রেগটন ও ম্যাকলিংটকের এই পরীক্ষা হইতে ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল যে লিংকড্ চরিত্রের পুনর্মিশ্রণ ক্রসিংওভারের ফলেই ঘটিয়া থাকে।

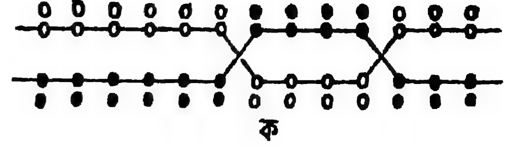
কায়াজমা তত্ত্ব
(Chiasma theory or the theory of chiasma formation)

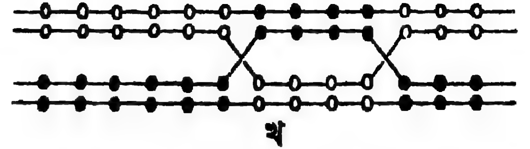
মায়োসিসের একটি বিশেষ দশায় (প্রধানত প্যাকিটিন) যখন সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি প্রত্যেকে লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হইয়া নিবিড়ভাবে জোড়বদ্ধ হয় তখন ভিতরের ক্রোমাটিড্দ্বয়ের (পরস্পর সংলগ্ন) কোন কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু তাহা পরক্ষণেই বিপরীতভাবে, অর্থাৎ ক্রসের আকারে একটি অন্যটির সহিত জুড়িয়া যায়। এই ঘটনাটিকে ক্রসিং-ওভার বলা হয়। সুতরাং ক্রোমাটিডের যে স্থানে ক্রসিংওভার অনুষ্ঠিত হয় সেই স্থানে 'X' চিহ্নের ন্যায় আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় (৭৪নং চিত্র)। এই চিহ্নকে কায়াজমা চিহ্ন বলা হয়। ক্রসিংওভার সম্পন্ন হইলে কায়াজমা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণে কায়াজমাকে ক্রসিংওভারের "দৃশ্যমান চিহ্ন" (Chiasma is the visible sign of crossing over) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

যদিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণ কায়াজমা সৃষ্টির নানা ব্যাখ্যা দিয়াছেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নাই, যাহা সুপ্রজনন বিদ্যার সকল সমস্যার সঠিক সমাধান করিতে পারে। নিম্নে কতকগুলি ব্যাখ্যা দেওয়া হইল যেগুলি বিভিন্ন সময়ে বহু সমর্থন পাইয়াছিল।

1. **দ্বৈত করণ তত্ত্ব** (Duplication theory)—বেলিং (I. Belling, 1927, 1933)-এর মতে দুইটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম প্রথমে একটির উপর আর একটি আড়া-

আড়ি ভাবে 'X' চিহ্নের ন্যায় স্থাপিত হয় (৭৮ ক-নং চিত্র)। ইহার পর ক্রোমোজোমের প্রতিলিপি গঠিত হইতে থাকে। প্রতিলিপি গঠনকালে, প্রথমে ক্রোমোমিয়ারগুলি দ্বিগুণিত হয় এবং পরের অংশে ক্রোমোমিয়ারগুলি পাশাপাশি জুড়িয়া যায়। এইরূপে তাঁহার মতে ক্রোমোজোমের দ্বৈতকরণের সময় ক্রসিং-ওভার সংঘটিত হয় (৭৮ খ-নং চিত্র)। সুতরাং বেলিং-এর মতে দুইটি ধাপে ক্রসিংওভার সম্পন্ন হয়। যথা, (ক) নূতন ক্রোমোমিয়ার গঠন এবং (খ) ক্রোমোমিয়ারগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন। এই যোগসূত্র স্থাপনকালে পাশাপাশি অবস্থিত ক্রোমোমিয়ারগুলি পরস্পর যুক্ত হয়, ফলে নবগঠিত ক্রোমোজোমে নূতন ক্রোমোমিয়ার সংযোজিত হয়।





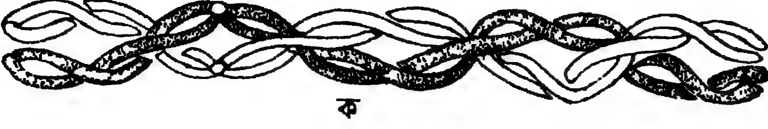
৭৮নং চিত্র—বেলিং-এর দ্বৈতকরণ তত্ত্ব অনুসারে কায়াজমা গঠনের নক্শা চিত্র

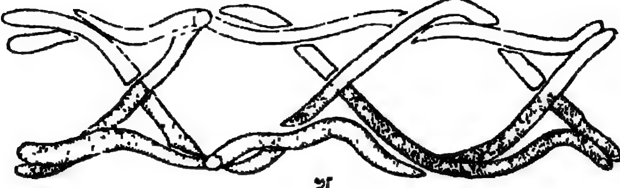
2 **প্রাচীন তত্ত্ব** (Classical theory)—স্যাক্স (Karl Sax, 1932) এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা। তাঁহার মতে কায়াজমা ক্রসিংওভারে দৃশ্যমান চিহ্ন নহে। ইহা কেবলমাত্র ক্রোমাটিডের পরস্পর আড়াআড়িভাবে অবস্থান সূচিত করে। এইরূপ অবস্থান কালে, আড়াআড়ি সংযোগস্থলে ক্রোমাটিডদ্বয় ভাঙ্গিয়া যায় এবং পরস্পর বিপরীতভাবে জুড়িয়া গিয়া ক্রসিংওভার সংঘটিত হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে ক্রসিং-ওভার অনুষ্ঠিত হইলে কায়াজমা বিলুপ্ত হয় (৭৯ গ-নং চিত্র)।

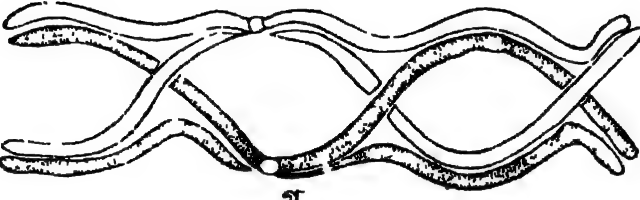
3. **টরশান তত্ত্ব** (Torsion theory)—ডার্লিংটন ১৯:৭ খ্রীষ্টাব্দে (C. D Darlington, 1937) কায়াজমা সৃষ্টির এই ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সমসংস্থ ক্রোমোজোমদ্বয় পরস্পর জোড়বন্ধ হইবার সময় যখন বিভিন্নভাবে পাক খাইতে থাকে সেই সময় কোন কোন স্থানে অতিরিক্ত চাপ বা টানের সৃষ্টি হয় এবং ফলে, ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই বিপরীতভাবে জুড়িয়া গিয়া (ক্রসিংওভার) কায়াজমা গঠন করে (৭৯ ক ও খ-নং চিত্র)।

4. **ভগ্ন হওয়া এবং ভগ্নাংশের আদানপ্রদান তত্ত্ব** (Break and Exchange theory)—সাম্প্রতিককালে ক্রসিংওভারের এই তত্ত্বটি যথেষ্ট সমর্থন লাভ করিয়াছে। এই তত্ত্ব অনুসারে ক্রসিংওভারের সময় অভগিনী ক্রোমাটিডের কোন কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহার পর উহাদের মধ্যে ভগ্ন অংশের বিপরীত বিনিময় হয়। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে স্টার্ন ও হোটা (Stern and Hotta, 1969) প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে ক্রসিং-ওভার দুই প্রকার এন্‌জাইম দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। এন্‌জাইম এন্ডোনিউক্লিয়েস (Endonuclease) ক্রোমাটিড্ ভাঙ্গিতে সাহায্য করে এবং এন্‌জাইম লাইগেস্ (Ligase) অভগিনী ক্রোমাটিডদ্বয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। তাঁহারা আরও দেখান

যে, ক্রসিংওভার সংঘটিত হইবার সময় সামান্য পরিমাণ ডি এন এ (DNA) উৎপন্ন হয়, যাহা ভগ্ন ক্রোমাটিডকে জুড়িবার জন্যে প্রয়োজন হয়।







৭৯নং চিত্র—কায়াজমা গঠনের কয়েকটি চিত্র : (ক) কায়াজমা গঠনের পূর্বে সমসংস্থ ক্রোমোজোমের পারস্পরিক জোড়বদ্ধ অবস্থান ; (খ) ক্রোমাটিড ভগ্ন হওয়া ও বিপরীতভাবে জুড়িয়া কায়াজমা গঠন ; (গ) কার্ল স্টার্ন প্রভাবিত কায়াজমা গঠনের চিত্র।

স্টার্নের মতে ক্রসিং-ওভার হইল ক্রোমাটিন পদার্থের আদান-প্রদান। মিশেলসন এবং উইগল্ (M. Meselson and Weigle,) ভাইরাস ক্রোমোজোমে আইসোটোপের সাহায্যে ডি এন এ চিহ্নিতকরণের দ্বারা (Isotopic labelling of DNA) দেখাইয়াছেন যে ক্রসিংওভারের সময় প্রকৃত পক্ষে দুইটি অর্ভাগিনী ডি এন এ অণুর মধ্যে যুগপৎ ভগ্ন ও ভগ্নাংশের বিনিময় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তবে সকল সময় ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ক্রসিংওভার কোন আকস্মিক অনুষ্ঠিত, অবাস্তব এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে ; ইহা একটি স্বাভাবিক সুপরিচালিত ও পূর্বনির্দিষ্ট ঘটনা, যাহার ফলে বিভিন্ন লিংকড্ জীনের মধ্যে পুনর্মিশ্রণ সম্ভব হয়।



বংশগতির ভৌত মূলসূত্র

(Physical Basis of Heredity)

মায়োসিসের সময় ক্রোমোজোমগুলির আচরণ প্রকৃতিগত ভৌত মূলসূত্রের কারণ; ইহারাই বংশগত চরিত্র গঠন নিয়ন্ত্রণ করে। ইহাকে বর্তমানে বংশগতির ক্রোমো-জোম-তত্ত্ব (Chrosome theory of inheritance) বলে। অধিকন্তু বহিঃ-নিউক্লিয় বংশগতি (Extra nuclear inheritance) নামক আরও একটি মতবাদ আছে এবং এই দুইটি তত্ত্বকেই একত্রে **বংশগতির ভৌত মূলসূত্র** (Physical Basis of Hercdity) বলা হয়।

ইহা বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুর আলোচনা করা প্রয়োজন। যথা—

জীন বা ডিটারমাইনার (Genes or Determiners)—জীন একটি বাস্তব পদার্থের একক যাহা জীবের কোন বিশেষ চরিত্র গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করে। জীনগুলি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বিশেষ এবং এইগুলি ক্রোমোজোমের গাত্রে রেখাকারে সজ্জিত থাকে। ইহারাই বংশগতির চূড়ান্ত এককরূপে প্রতিপন্ন হয়। একটি ক্রোমোজোমের উপর এইরূপ শত শত জীন থাকিতে পারে। ক্রোমোজোমে অবস্থিত জীনের সহিত পদার্থের আণবিক উপাদানের তুলনা করা যাইতে পারে। পরীক্ষালব্ধ ফলের দ্বারা যেরূপ পদার্থের অণুর অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়, সেইরূপ প্রজনন প্রণালীতে (Hybridization) ক্রোমো-জোমে জীনের অবস্থান বুঝিতে পারা যায়। ক্রোমোজোমের বিভাজনের সাথে ইহাতে অবস্থিত জীনগুলির বিভাজন হইয়া থাকে, এবং ক্রোমোজোম পৃথকীকরণের সময় জীনেরও পৃথকীকরণ হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, জীনগুলির পাশাপাশি অবস্থানের জন্য তাহাদের মধ্যে একটি রাসায়নিক সমতা (Chemical balance) বজায় থাকে। কিন্তু কোন কারণবশত জীনের অবস্থানের পরিবর্তন হইলে সেই সমতা বিপর্যস্ত হয়, ফলে চরিত্রের বাহ্যিক প্রকাশ ব্যাহত হয় অথবা রূপান্তরিত হয়। ইহাকেই **জীনের অবস্থান জনিত ফল** (Position effect of gene) বলা হয়।

সোমাটিক বা দেহকোষের ক্রোমোজোম (Chromosomes in somatic cells)—সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহকোষের নিউক্লিয়াসে যুগ্ম ক্রোমোজোমগুলি দুইটি গোষ্ঠীতে (set) বিরাজ করে। ইহারা যথাক্রমে মাতৃ ও পিতৃ যৌনকোষ হইতে আগত। সেইজন্য ইহাদের স্ত্রী-পুং ক্রোমোজোম গোষ্ঠী বলিয়াও গণ্য করা হয়। স্ত্রী ও পুং ক্রোমোজোম গোষ্ঠীতে অবস্থিত জীনগুলির অবস্থান ও বিন্যাস অনুরূপ হইয়া থাকে। অতএব সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রতিদেহকোষের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোমগুলি সমসংস্থরূপে (Homologous) অবস্থান করে। অর্থাৎ প্রতিটি ক্রোমোজোম দুইবার করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, প্রতিটি জীনও দুইটি করিয়া থাকে। উহাদের একটি স্ত্রী ও অন্যটি পুং যৌন কোষ হইতে আসে। দুইটি গোষ্ঠীতে বিরাজমান ক্রোমোজোম সমষ্টিকে **ডিপ্লয়েড** (Diploid) সংখ্যা বা $2n$ সংখ্যা বলা হয়। মাইটোসিস কোষ বিভাজনে

প্রতিটি ক্রোমোজোমের লম্বচ্ছেদ হয় এবং ঐ সঙ্গে প্রতিটি জীনেরও বিভাজন হয় এবং অ্যানাফেজ দশায় ক্রোমাটিডগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুইটি বিপরীত মেরুতে গমন করে ও অপত্য নিউক্লিয়াস ও পরিশেষে অপত্য কোষ গঠন করে। সুতরাং মাইটোসিস বিভাজন শেষে প্রতি কোষেই $2n$ সংখ্যক ক্রোমোজোম অবস্থিত থাকে।

যৌন কোষের ক্রোমোজোম (Chromosomes is germ cells)—কতকগুলি ডিপ্লয়েড্ কোষের মায়োসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজনের ফলে গ্যামেট বা যৌন কোষ উৎপন্ন হয়। মায়োসিস প্রক্রিয়া দুইটি ক্রম-বিভাজনের সমষ্টি। প্রথম প্রকার বিভাজনের সময় সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। ইহার ফলে দুইটি নবগঠিত অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেকে পরিণত হয়। ইহাকে হ্যাপ্লয়েড (Haploid) বা n-সংখ্যক ক্রোমোজোম সংখ্যা বলে। পরবর্তী বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর অনুদৈর্ঘ্যে দুইটি খণ্ডে বিভক্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, একটি ডিপ্লয়েড মাতৃকোষ হইতে চারিটি হ্যাপ্লয়েড যৌন কোষ বা গ্যামেট উৎপন্ন হয় এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই n-সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। নিষেকের সময় হ্যাপ্লয়েড মাতৃ-পিতৃ ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সম্পন্ন জাইগোট গঠন করে, যাহা হইতে নূতন উদ্ভিদ জন্মলাভ করে।

মায়োসিস ও জীন পৃথকীকরণ (Meiosis and the segregation of genes)—মায়োসিস কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোম বা ক্রোমাটিড পৃথকীকরণের সহিত উহার উপর অবস্থিত জীনেরও পৃথকীকরণ হয়। একটি হিটারোজাইগাস অ্যালেলিক জোড় যেমন, Aa, সমসংস্থ ক্রোমোজোমের উপর থাকিলে উহারা মায়োসিস বিভাজনে ক্রোমোজোম পৃথকীকরণের সাথে পরস্পর হইতে পৃথক হয়। তবে ইহাদের পৃথকীকরণ মায়োসিসের কোন্ দশায় সম্পন্ন হইবে তাহা ক্রসিংওভার অনুষ্ঠিত হইবার উপর নির্ভর করে। যদি ক্রসিং ওভার, সেণ্ট্রোমিয়ার ও জীনের মাঝামাঝি কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে, জীন Aa পরস্পর হইতে দ্বিতীয় অ্যানাফেজ দশায় ছাড়াছাড়ি হইবে। কিন্তু যদি ক্রসিংওভার সেণ্ট্রোমিয়ার ও জীনের পর ক্রোমোজোমের অবশিষ্ট কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে জীন A ও a পরস্পর হইতে প্রথম অ্যানাফেজ দশায় ছাড়াছাড়ি হইবে (৭৫ নং চিত্র)।

লিংকড্ জীনের পুনর্মিশ্রণ বা পুনঃযুক্তকরণ (Recombination of Linked genes)—জীন ক্রোমোজোমের উপর অবস্থান করে বলিয়া উহাদের মধ্যে লিংকেজ দেখিতে পাওয়া যায়। লিংকড্ জীন হইলে তাহাদের মধ্যে মেণ্ডেল আবিষ্কৃত স্বাধীন সঞ্চরণ রীতি দেখা যাইবে না। ক্রসিংওভারের ফলেই বিভিন্ন লিংকড্ জীনের মধ্যে পুনর্মিশ্রণ সংঘটিত হয়।

৪

বংশগতির রাসায়নিক মুলতত্ত্ব
(Chemical Basis of Heredity)

পূর্ব পরিচ্ছেদসমূহে আমরা জীনের ক্রোমোজোমের উপর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। ঐ আলোচনা হইতে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে জীন ক্রোমোজোমের উপর পাশাপাশি রেখাকারে অবস্থান করে। ক্রোমোজোমের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহা প্রধানত নিউক্লিও প্রোটিন বস্তু দ্বারা গঠিত। নিউক্লিও প্রোটিনের দুইটি উপাদান, যথা, প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড (প্রধানত ডি এন এ)। এই দুইটি উপাদানের মধ্যে নিশ্চয় যে-কোন একটি বংশগতির মূল বস্তু বা উপাদান (genetic matcrial) হিসাবে কার্য করিতেছে। বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে নিউক্লিক অ্যাসিডই বংশগতির মূল রাসায়নিক বস্তু। নিউক্লিক অ্যাসিড যে বংশগতির মূল বস্তু তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। যথা—

(১) কোষস্থিত যে সকল বস্তুর বংশগতিতে কিছু ভূমিকা আছে তাহাদের মধ্যেই নিউক্লিক অ্যাসিড বর্তমান থাকে, যেমন, নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত ক্রোমোজোম ; সাইটোপ্লাজমের অন্যান্য দানাদার বস্তু, যথা, ক্লোরোপ্লাস্ট, মাইটোকনড্রিয়া, রাইবোজোম ইত্যাদি এবং ভাইরাসের নিউক্লিয়য়েড।

(২) নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রজাতিগত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে বিভিন্ন প্রজাতি হইতে প্রাপ্ত নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠন বিন্যাস ভিন্নপ্রকার।

(৩) স্থায়িত্ব, বংশগতির মূল বস্তুর (genetic material) একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাধারণ ধরনের রাসায়নিক রূপান্তরে অর্থাৎ, কোন বিপাকীয় রূপান্তরে নিউক্লিক অ্যাসিডের কোন পরিবর্তন হয় না। ইহা কোষের অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা অনেক বেশী সুস্থিত বা স্থায়ী বস্তু (stable)।

(৪) ইহা দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু যেমন *5-ব্রোমোইউরাসিল, (5-bromouracil) বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত গ্যাস (mustard gas), রঞ্জন রশ্মি (X-ray), অ্যালট্রাভায়লেট রশ্মি (ultraviolet ray) ইত্যাদি নিউক্লিক অ্যাসিডের উপর কার্য করিয়া তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে বাহ্যিক চরিত্রের (Phenotypic character) পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) Mazia, Mirsky ইত্যাদি বিজ্ঞানীগণ দেখাইয়াছেন যে একটি প্রজাতির প্রতিটি দেহকোষে ডি এন এ-র পরিমাণ সকল সময় অপরিবর্তনীয় থাকে। বংশগতির মূল বস্তু হিসাবে এই প্রকাশ বৈশিষ্ট্য মূল্যবান।

---

* যে সকল পদার্থ পরিব্যক্তি (mutation) ঘটায় তাহাদের মিউটাজেন বলা হয়।

5-ব্রোমোইউরাসিল এমনি একটি রাসায়নিক পদার্থ যাহা প্রধানত ডি এন এ-র উপর কার্য করিয়া পরিব্যক্তি ঘটাইতে পারে।

(৬) ডি এন এ যে বংশগতির মূল রাসায়নিক বস্তু তাহার সরাসরি এবং সম্ভবতঃ সার্থক প্রমাণ আমরা ব্যাকটেরিয়ার রূপান্তর (Bacterial transformation) পরীক্ষার মাধ্যমে পাইয়াছি। ব্যাকটেরিয়া নিউমোকক্কাসের (Pneumococcus) কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে এই ধরনের চরিত্র রূপান্তরের (transfer of genetic character) ঘটনা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। নিউমোকক্কাসের (*Diplococcus pneumoniae*) দুইটি প্রকার (strains), SIII এবং RII; প্রথমটির ক্যাপসিউল আছে দ্বিতীয়টির ক্যাপসিউল নাই। ক্যাপসিউল যুক্ত নিউমোকক্কাসের প্রকার হইতে বিশুদ্ধ ডি এন এ সংগ্রহ করিয়া তাহা ক্যাপসিউলহীন RII প্রকারের সহিত মিশ্রিত করিলে দেখা যায় যে ক্যাপসিউলহীন নিউমোকক্কাসগুলি ক্রমে ক্যাপসিউল যুক্ত প্রকারে পরিবর্তিত হইতেছে। RII প্রকারের এই চারিত্রিক রূপান্তর শুধুমাত্র SIII প্রকারের ডি এন এ দ্বারা সম্ভব হইল।

(৭) এসকারেসিয়া কোলাই (*Escherichia coli*) ব্যাকটেরিয়ার উপর T_2 ব্যাকটেরিওফাজের (T_2-bacteriophage) সংক্রমণ হইতে ডি এন এ যে বংশগতির মূল বস্তু তাহার আরও একটি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

T_2-ফাজের দেহের গঠনে দেখা যায় (৩নং চিত্র) যে উহার দুইটি অংশ—একটি লেজ আর একটি মস্তক। সমগ্র দেহটি প্রোটিন দ্বারা গঠিত। মস্তকের মধ্যে শুধু ডি এন এ অবস্থিত। T_2-ফাজ যখন একটি ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে তখন সে নিজেকে, ব্যাকটেরিয়ার দেহে লেজ অংশ দ্বারা যুক্ত করে। সংযুক্ত অংশে একটি ছিদ্র হয় এবং তখন ঐ ছিদ্র পথে শুধু মাত্র ফাজ-ডি এন এ ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রবেশ করে। এই সংক্রমণের ফলে পরিশেষে, ব্যাকটেরিয়ার কোষের মধ্যে অসংখ্য ফাজ-দেহ গঠিত হয় এবং ব্যাকটেরিয়ার মৃত্যু হয়। শুধু একটি ফাজ ডি এন এ হইতে অসংখ্য ফাজ-দেহ গঠিত হওয়ার ঘটনা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, ডি এন এ শুধুমাত্র বংশগতির মূল উপাদান নহে, প্রোটিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ উৎপাদনকারী এক অনন্য পদার্থ।

(৮) ডি এন এ-র ন্যায় আর এন এ-ও বংশগতির মূল রাসায়নিক বস্তু হিসাবে কার্য করিয়া থাকে। তামাক পাতার মোজেক ভাইরাসে (TMV) ডি এন এ-এর পরিবর্তে আর এন এ থাকে। বিজ্ঞানী H. Fraenkel-Conrat (1957) এই ভাইরাস লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে এখানে আর এন এ অংশেরই একমাত্র নূতন সংক্রমণের ক্ষমতা আছে, শুধু তাহাই নহে, ঐ আর এন এ হইতে পুনরায় নূতন সম্পূর্ণ ভাইরাস দেহ গঠিত হইতে পারে। এই পরীক্ষায় প্রথমে তিনি ভাইরাসের দেহের দুইটি অংশকে যথাক্রমে আর এন এ (শতকরা 6 ভাগ) ও প্রোটিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলিকে (protein subunits) পৃথক করিলেন। অতঃপর এই দুইটি বস্তু লইয়া পৃথকভাবে নূতন তামাক গাছের পাতায় সিঞ্চন করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন প্রোটিন অংশের কোন সংক্রমণ ক্ষমতা নাই। কিন্তু আর এন এ সহজেই রোগ সৃষ্টি করিতেছে। নূতন রোগাক্রান্ত পাতা হইতে সম্পূর্ণ ভাইরাস দেহ পাওয়া গেল। সুতরাং, বিশেষ

করিয়া টোব্যাকো মোজেক ভাইরাসের ক্ষেত্রে বংশগতিতে আর এন এ-র ভূমিকা প্রমাণিত হইল।

পরবর্তীকালে TMV ছাড়া আরও অনেক ভাইরাস আবিষ্কৃত হইল যাহাদের মধ্যে ডি এন এ-এর পরিবর্তে আর এন এ আছে। সুতরাং ডি এন এ-র ন্যায় আর এন এ-কেও বংশগতির মূল রাসায়নিক বস্তু হিসাবে গণ্য করা যায়। তবে ডি এন এ যেমন, সকল ক্ষেত্রেই এইরূপ কার্য করিতেছে ; আর এন এ শুধুমাত্র কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রেই (যেখানে ডি এন এ অনুপস্থিত) এই কার্য করিয়া থাকে। সুতরাং আর এন এ-এর দুইটি প্রধান ভূমিকা দেখিতে পাওয়া যায়—একটি বংশগতির বস্তু হিসাবে (genetical function) অন্যটি অ-বংশগতি হিসাবে (Non genetic) অর্থাৎ অন্যান্য জৈবনিক কার্য, যেমন, প্রোটিন সংশ্লেষ ইত্যাদি।

ডি এন এ-র বৈশিষ্ট্য (*Characteristics of DNA*)—ডি এন এ-র দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, যথা, (ক) অটোক্যাটালিসিস (Autocatalytic function) এবং (খ) হেটারোক্যাটালিসিস (Heterocatalytic function)।

(ক) **অটোক্যাটালিসিস** (*Autocatalysis*)-- ডি এন এ যখন নিজেই নিজের প্রতিলিপি গঠন কার্য পরিচালনা করে, তখন তাহার সেই কার্যকে আটোক্যাটালিসিস বলা হয়।

হেটারোক্যাটালিসিস (*Heterocatalysis*)—নিজের প্রতিলিপি গঠন ছাড়া ডি এন এ যখন অন্যান্য মুখ্য রাসায়নিক বস্তু, যেমন, বিভিন্ন ধরনের আর এন এ এবং প্রোটিন ইত্যাদি, উৎপাদন পরিচালনা করে, তখন তাহার সেই কার্যকে হেটারোক্যাটালিসিস বলা হয়।

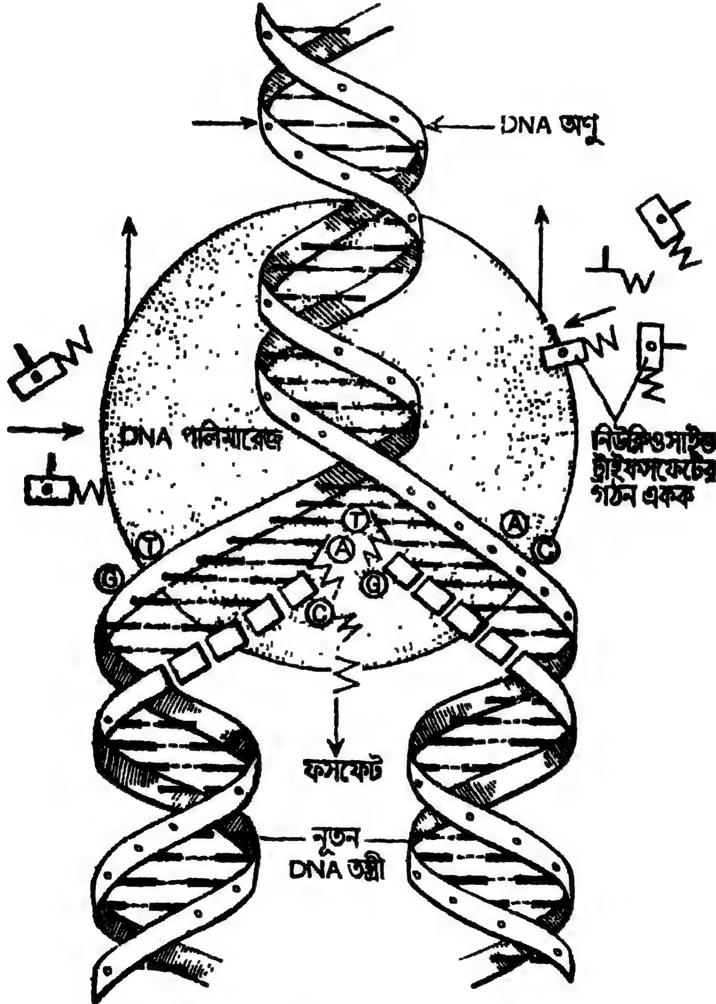
ডি এন এ প্রধানত তিন প্রকার আর এন এ গঠন করে, যেমন, এম আর এন এ (mRNA), টি আর এন এ (tRNA) এবং আর আর এন এ (rRNA)। এই তিন প্রকার আর এন এ, ডি এন এ হইতে উৎপন্ন হইয়া সাইটোপ্লাজমে চলিয়া আসে এবং সেখানে প্রোটিন ও এনজাইম উৎপন্ন করে। মেসেঞ্জার অর্থাৎ বার্তাবাহক আর এন এ-র মধ্যে কি ধরনের প্রোটিন উৎপন্ন হইবে তাহার নির্দেশ থাকে। সুতরাং প্রোটিন বা এনজাইম উৎপাদনে প্রত্যক্ষ না হইলেও পরোক্ষভাবে ডি এন এ যুক্ত থাকে।

ডি এন এ-র প্রতিলিপি গঠন (Replication of DNA)

ডি এন এ অণুর প্রতিলিপি কিরূপে গঠিত হয় সেই বিষয়ে তিনটি সম্ভাব্য মতবাদ প্রচলিত আছে। সেইগুলি যথাক্রমে ; (ক) অর্ধরক্ষণশীল মতবাদ (Semiconservative idea) (খ) রক্ষণশীল মতবাদ (Conservative idea), এবং (গ) বিকিরণকর মতবাদ (Dispersive idea)।

অর্ধরক্ষণশীল ডি এন এ প্রতিলিপি গঠন (*Semiconservative DNA replication*)- ওয়াটশন ও ক্রীক (Watson and Crick) ডি এন এ অণুর গঠন

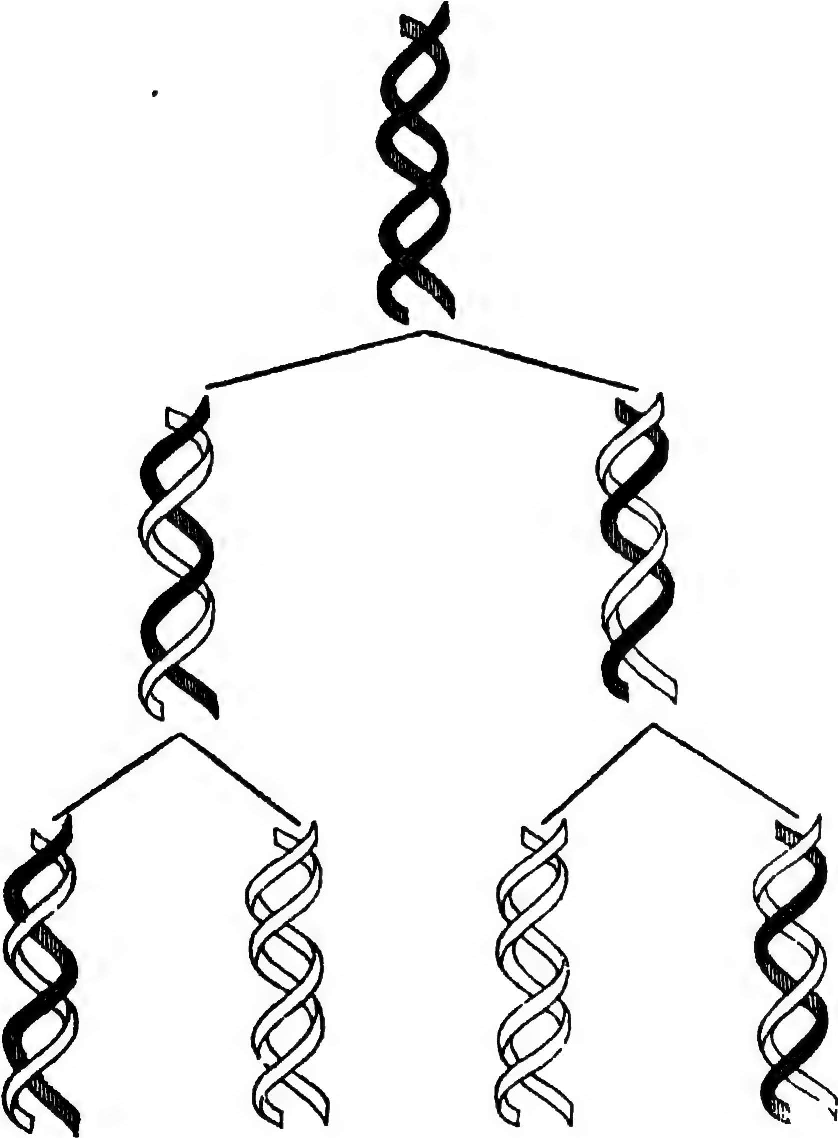
পদ্ধতি আলোচনা করার সময় ইহার প্রতিলিপি গঠনের যে চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রতিলিপি গঠন কালে প্রথমে ডি এন এ অণুর দুইটি শৃংখল মধ্যস্থিত হাইড্রোজেন বন্ড ক্রমান্বয়ে ভাঙ্গিয়া যায়, ফলে সূত্র দুইটি ক্রমশ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। প্রতিটি শৃংখল তখন তাহাদের উপর আর একটি নূতন শৃংখল গঠন করিতে থাকে। এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে যে, ডি এন এ অণুর এক প্রান্ত হইতে প্রতিলিপি গঠনের সূচনা হইয়া তাহা ক্রমান্বয়ে শৃংখল বরাবর অগ্রসর হইয়া অন্য প্রান্তে সম্পূর্ণ হয়। ডি এন এ অণুর দুইটি শৃংখলের পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং তাহাদের উপর সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আরও দুইটি নূতন শৃংখলের গঠন কার্য প্রায় একই সঙ্গে চলিতে থাকে। একটি ডি এন এ অণুর প্রতিলিপি গঠন কার্য নিম্নে ৮০নং চিত্রের সাহায্যে দেখান হইল।



৮০ নং চিত্র—অর্ধরক্ষণশীল ডি এন এ প্রতিলিপি গঠন

J. Cairns (1960) রেডিও অ্যাকটিভ থাইমিডিনের সাহায্যেই কোলাই. (*E. Coli*) ব্যাকটেরিয়ার ডি এন এ প্রতিলিপি গঠনের পদ্ধতি লক্ষ্য করেন। তাঁহার এই অটো-রেডিওগ্রাফিক পরীক্ষা উপরে উল্লিখিত ওয়াটশন-ক্রিক পরিকল্পিত ডি এন এ অণুর

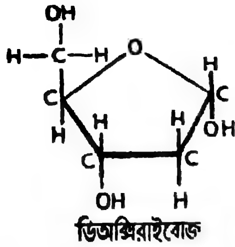
প্রতিলিপি গঠন পদ্ধতিকে জোরাল সমর্থন করে। Cairns-এর পূর্বে 1958 খ্রীষ্টাব্দে Meselson এবং Stahl ভারী নাইট্রোজেনের (N^{15}) সাহায্যে ডি এন এ-র প্রতিলিপি গঠন পদ্ধতি পরীক্ষা করেন এবং উপরে উল্লিখিত মতবাদকে সমর্থন করেন। তাঁহারাই এই পদ্ধতিকে অর্ধরক্ষণশীল (semiconservative) বলিয়া বর্ণনা করেন। কারণ, এই পদ্ধতির ফলে উৎপন্ন দুইটি ডি এন এ অণুর প্রত্যেকটিতে একটি পুরাতন এবং নূতন শৃঙ্খল থাকে (৮১নং চিত্র)।



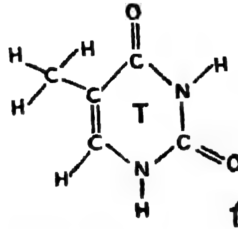
৮১নং চিত্র—প্রস্তাবিত ডি এন এ অণুর প্রতিলিপি গঠনের নক্শা চিত্র

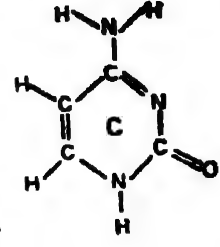
এনজাইম ডি এন এ পলিমারেজ III (DNA polymerase III) প্রতিলিপি গঠনের সময় ক্যাটালিস্টের কার্য করে। ডি এন এ অণুর একপ্রান্ত হইতে প্রথমে পলি-নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল দুইটি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। ফলে উভয় শৃঙ্খলের

বেসগুলি (Bases) মুক্ত হয়। এই সময় পরিবেশীয় মাধ্যমে যদি চারি প্রকার নিউক্লিওটাইড উপস্থিত থাকে তাহা হইলে আপাত মুক্ত শৃংখল দুইটির উপর অবস্থিত বেসগুলির সহিত বিপরীত বেস যুক্ত নিউক্লিওটাইডগুলি যুক্ত হইয়া পুরাতন শৃংখলের



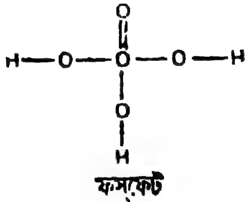
ডিঅক্সিরাইবোজ



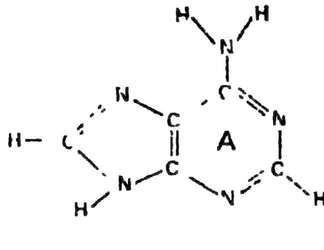


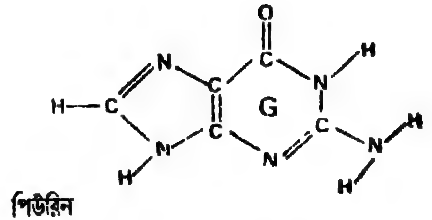
পিরিমিডিন

উপর একটি নূতন এবং বিপরীত শৃংখল গঠিত হইয়া দুইটি অপত্য ডি এন এ অণু গঠিত হইবে। পুরাতন ডি এন এ অণুর প্রতিটি শৃংখল তাহার উপর একটি নূতন শৃংখলের গঠন নিয়ন্ত্রণ করে। পুরাতন শৃংখলের যেস্থলে অ্যাডেনিন বেস থাকে সেই



ফসফেট



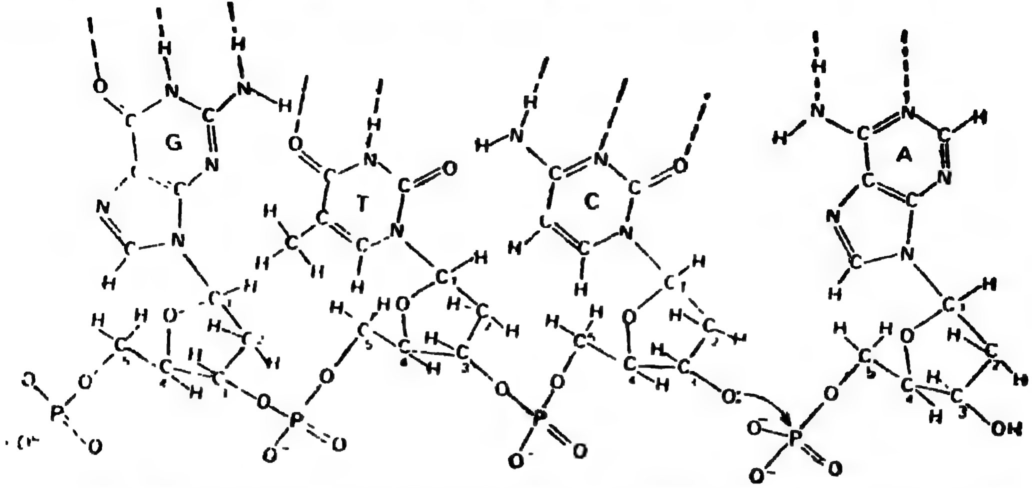


পিউরিন

স্থলে একটি থাইমিন বেস এবং যেস্থলে গুয়ানিন বেস থাকে সেই স্থলে একটি সাইটোসিন বেস যুক্ত নিউক্লিওটাইড আসিয়া যুক্ত হয় (A – T ; G – C)। সুতরাং একটি শৃংখলের বেস-ক্রম (base arrangement) জানা থাকিলে বিপরীত শৃংখলের বেস-ক্রম কি হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রতিলিপি গঠনকালে পুরাতন শৃংখলকে যদি নেগেটিভ (negative) বলা যায় তাহা হইলে, নূতন শৃংখলটিকে উহার একটি পজিটিভ (positive) অনুলিপি বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে প্রতিটি নূতন ডি এন এ অণুর মধ্যে একটি পুরাতন শৃংখল ও আর একটি নূতন শৃংখল থাকে। প্রথম বিভাজনে যে শৃংখলটি +ve রূপে চিহ্নিত হয় পরবর্তী বিভাজনে সেটি –ve রূপে কার্য করে। সুতরাং প্রতি ক্ষেত্রেই একটি নূতন ও একটি পুরাতন শৃংখল লইয়া একটি সম্পূর্ণ ডি এন এ অণু গঠিত হয় বলিয়া এইরূপ প্রতিলিপি গঠন পদ্ধতিকে অর্ধরক্ষণশীল (semiconservative) প্রতিলিপি গঠন বলা হইয়াছে।

নূতন শৃংখল গঠনকালে প্রথমে নিউক্লিওটাইডগুলি ATP হইতে এনার্জি গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত সক্রিয় হইয়া ওঠে এবং নিউক্লিওটাইড 5-ট্রাইফসফেট (5-triphosphate) গঠিত হয়। তাহার পর সক্রিয় নিউক্লিওটাইডগুলি পুরাতন শৃংখলের উপযুক্ত স্থানে, (অর্থাৎ যেস্থলে অ্যাডেনিন আছে সেস্থলে থাইমিন এবং যেস্থলে সাইটোসিন আছে

সেইস্থলে গুয়ানিন) হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা (কোভ্যালেন্ট বন্ড) যুক্ত হয় এবং নিজেরা পরস্পর এসটারিফিকেশান বিক্রিয়ার দ্বারা সংযুক্ত হইয়া একটি নূতন শৃংখলের



৮২নং চিত্র—ডি এন এ অণুর একদিকের শৃঙ্খল গঠন। এসটারিফিকেশান বিক্রিয়ার দ্বারা একটি শৃঙ্খলের দুইটি নিউক্লিওটাইডের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

সৃষ্টি করে (৮২নং চিত্র)। সমগ্র বিক্রিয়াটি ডি এন এ পলিমারেজ III (DNA polymerase III) এনজাইম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

রক্ষণশীল ডি এন এ প্রতিলিপি গঠন (Conservative DNA replication)—রক্ষণশীল ডি এন এ প্রতিলিপি গঠনের ক্ষেত্রে ইহা ধারণা করা হইয়াছে যে দুইটি অপত্য ডি এন এ অণু গঠিত হইবার পর উহাদের মোট চারিটি শৃংখল খুলিয়া যায় এবং পুনরায় দুইটি পুরাতন ও দুইটি নূতন শৃংখল একত্রে মিলিত হইয়া দুইটি অপত্য অণু গঠন করে। সুতরাং এই পদ্ধতির ফলে যে দুইটি অপত্য ডি এন এ অণু উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে একটি পুরাতন অণু (আগেকার অবস্থা) এবং অন্যটি সম্পূর্ণ নূতন (যাহার দুইটি শৃংখলই নূতন) অণু। রক্ষণশীল গঠন পদ্ধতি ওয়াটশন-ক্রিক চিহ্নিত ডি এন এ অণুর স্বয়ং সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কোন বিরোধিতা করে নাই। পরন্তু ইহার দ্বারা কতকগুলি সুপ্রজনন সংক্রান্ত বিষয়ের সমাধানের প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল। যাহাই হউক, বর্তমানে এই পদ্ধতির সমর্থনে কোন সার্থক প্রমাণ আমাদের সম্মুখে নাই।

বিকিরণকর ডি এন এ প্রতিলিপি গঠন (Dispersive DNA replication)—বিকিরণকর পদ্ধতির মতে প্রতিলিপি গঠনের সময় প্রথমে, ডি এন এ অণুর দুইটি শৃংখল ছোট ছোট অংশে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহার পর ছোট ছোট অংশগুলি নূতন নিউক্লিওটাইডের সহিত জোড়া লাগিয়া দুইটি ডি এন এ অণু গঠন করে।

৫ বংশগতি-সম্বন্ধীয় কয়েকটি তথ্য
(A Few Facts of Heredity)

উদ্যানপালক এবং পুষ্পোৎপাদকগণ কৃত্রিম প্রণালীতে সংকর উদ্ভিদ উৎপাদনকালে কখনও কখনও কয়েকটি আশ্চর্যজনক ঘটনার সম্মুখীন হন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মেণ্ডেলের বংশগতি সূত্রের বিরূপ সমালোচনা করে। এইরূপ কয়েকটি ঘটনা নিম্নে আলোচিত হইল ; যথা—

অসম্পূর্ণ প্রাবল্য (Incomplete dominance) (৮৩নং চিত্র)

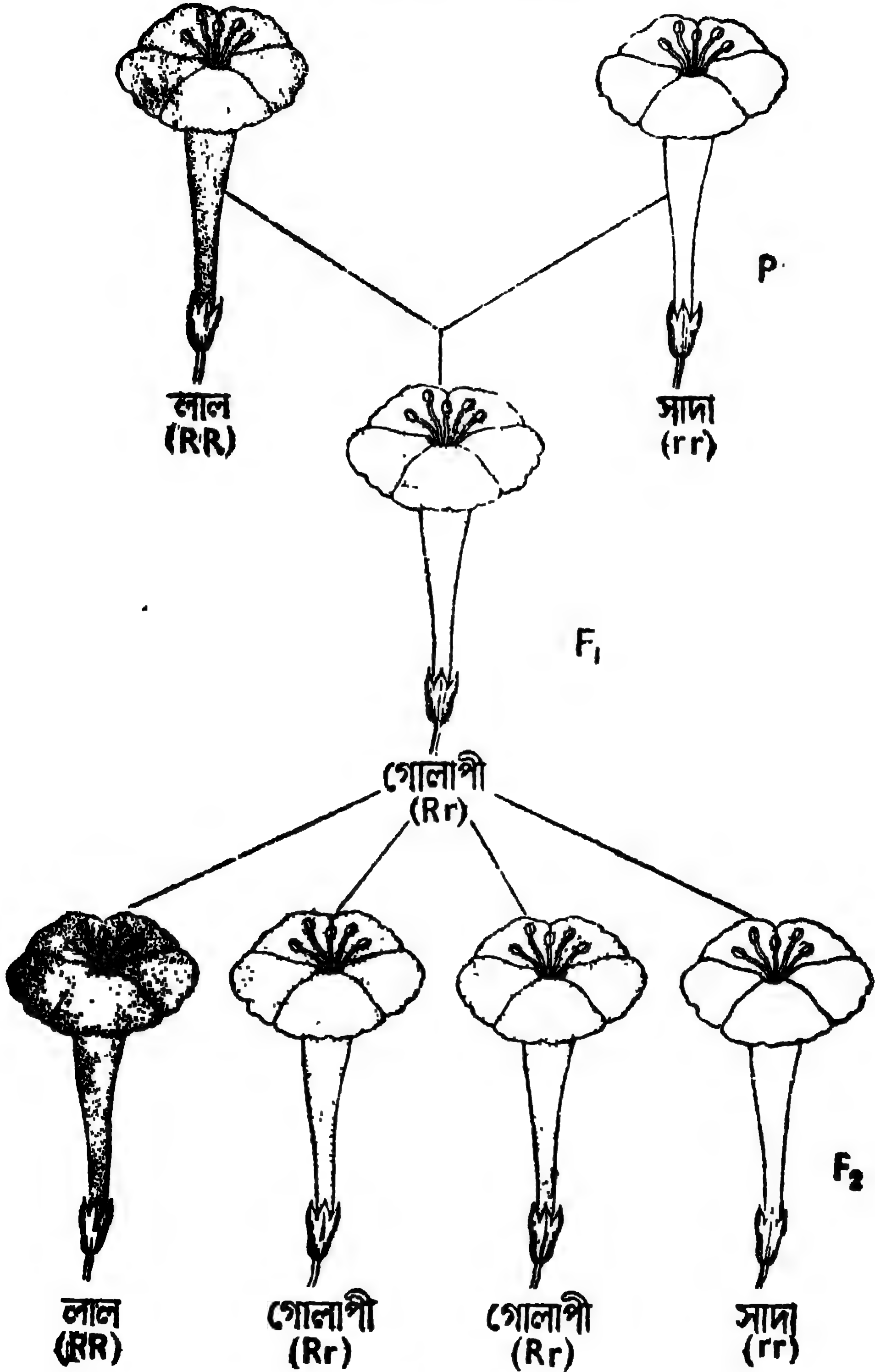
মেণ্ডেলের প্রাবল্যজনিত সূত্র সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে দেখা যায় না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, প্রকৃত বংশবৃদ্ধি করিতে সক্ষম এইরূপ লোহিতবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট (RR) Mirabilis jalapa বা কৃষ্ণকলি উদ্ভিদের সহিত এইরূপ শ্বেতবর্ণ পুষ্প-বিশিষ্ট (rr) উদ্ভিদের প্রজননের দ্বারা F_1 অপত্যবংশে গোলাপী পুষ্পবিশিষ্ট (Rr) সংকর উদ্ভিদ জন্মাইতে দেখা যায়। ইহার কারণস্বরূপ বলা যায় যে, এই ক্ষেত্রে একটির প্রবল চরিত্র (RR) অপরটির প্রচ্ছন্ন চরিত্র (rr)-কে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিতে পারে না এবং সেই কারণে কোনো উদ্ভিদকেই প্রকৃত প্রবল চরিত্রসম্পন্ন বলিয়া গণ্য করা যায় না। কাজেই উভয় চরিত্রই অবশেষে মধ্যবর্তী গোলাপি বর্ণরূপে প্রকাশ পায়। এই অবস্থাকে **অসম্পূর্ণ প্রাবল্য** (incomplete dominance) বলিয়া গণ্য করা হয়।

একই প্রজাতির বিভিন্ন varieties বা প্রকারের মধ্যে অথবা নিকট সম্বন্ধীয় প্রজাতির মধ্যে প্রজনন সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমগাছের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে প্রজনন সম্ভব হইতে পারে কিন্তু আম ও কাঁঠাল যাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বর্গের অন্তর্গত তাহাদের মধ্যে প্রজনন কখনই সংঘটিত হইতে পারে না।

হাইব্রিড ভিগর বা হেটারোসিস (Hybrid Vigour or Heterosis)

ক্রমাগত স্বনিষেকের ফলে "শুদ্ধ পন্থার উদ্ভিদের" (Pure line plant) সৃষ্টি হয়। শুদ্ধপন্থা ভুক্ত উদ্ভিদ অধিকাংশ চরিত্রে হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকে। ক্রমাগত স্বনিষেক উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। ভুট্টা এবং রাই এই উভয় উদ্ভিদে ইতর পরাগযোগে নিষেক সম্পন্ন হয়। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত পরাগযোগের দ্বারা ইহাদের স্বনিষেক সম্ভব। এই দুই উদ্ভিদের ক্ষেত্রে স্বনিষেকের ফলে উৎপন্ন বংশধারার মধ্যে চারিত্রিক অবনতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ক্রমাগত স্বনিষেকের ফলে এইরূপ চারিত্রিক অবনতি অন্যান্য উদ্ভিদ এমনকি প্রাণীর মধ্যেও যথেষ্ট দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বনিষেক বংশধারাভুক্ত উদ্ভিদকে সম্পূর্ণ মরিয়া যাইতেও দেখা যায়। তবে, মৃত্যু না হইলেও ক্রমাগত স্বনিষেকের ফলে বংশধরের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের হানি বা জীবনী

শক্তির হ্রাস হইতে দেখা যায়। এইরূপ ঘটনাকে "স্বনিষেক অধঃপতন" বা ইনব্রিডিং ডিজেনারেশান (inbreeding degeneration) বলা হয়।



৮৩নং চিত্র—কৃষ্ণকলি ফুলের অসম্পূর্ণ প্রাবল্য

ক্রমাগত স্বনিষেকের ফলে শুদ্ধ পন্থার কোন উদ্ভিদ ধারার (বা বংশের) মধ্যে যখন

চারিত্রিক অবনতি লক্ষিত হয় তখন যদি সেই উদ্ভিদকে লইয়া অন্য একটি বংশধারাভুক্ত শুদ্ধধারা উদ্ভিদের সহিত সংকর জনন অনুষ্ঠিত করা হয়, তাহা হইলে যে সংকর উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে পূর্বাপেক্ষা অধিক বর্ধিত তেজ ও উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। এইরূপ বর্ধিত তেজ বা গুণাবলীর বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাকে হাইব্রিড ভিগর (Hybrid Vigour) বলা হয়।

একজন আমেরিকান সুপ্রজননবিদ C. H. Shull 1914 খ্রীষ্টাব্দে ভুট্টাগাছে হাইব্রিড ভিগর লক্ষ্য করেন। তিনি সংকর প্রক্রিয়ার ফলে তেজ বা জীবনীশক্তির এই বৃদ্ধিকে হেটারোসিস (heterosis) বলিয়া উল্লেখ করেন। হেটারোসিসের সুপ্রজননগত যতগুলি ব্যাখ্যা এ পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে সেগুলিকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

(ক) বিভিন্ন ধরনের অ্যালিলের পারস্পরিক ক্রিয়া (মিথস্ক্রিয়া) ভিত্তিক বিশ্লেষণ (Explanation based on Interaction of Alleles)—কোন কোন সুপ্রজননবিদ এইরূপ মত পোষণ করেন যে ক্রোমোজোমের উপর কোন নির্দিষ্ট স্থানের (locus) জন্য উপস্থিত অ্যালিলের হোমোজাইগাস মিশ্রণ হইতে হেটারোজাইগাস মিশ্রণ অধিক ফলপ্রসূ। ধরা যাক, এইরূপ একটি স্থানের জন্য দুইটি শুদ্ধ উদ্ভিদে দুই প্রকার অ্যালিল যথাক্রমে a_1 ও a_2 রহিয়াছে। অ্যালিলের মিথস্ক্রিয়া ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে অ্যালিলের সম্ভাব্য উপস্থিতির যেমন, a_1a_1 ও a_2a_2 (হোমোজাইগাস) স্থলে যদি a_1a_2 (হেটারোজাইগাস) উপস্থিত হয় তাহা হইলে দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির অ্যালিলের মিথস্ক্রিয়ার ফলে অধিক চারিত্রিক উন্নতি সংঘটিত হয়। এই বিষয়টি বোঝাইতে অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রাবল্য বা ওভার ডমিন্যান্স (over-dominance) সংজ্ঞা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। দুইটি সম-প্রকৃতির অ্যালিল ($a\ a_1$ অথবা a_2a_2) অপেক্ষা দুইটি অসম-প্রকৃতির অ্যালিলের (a_1a_2) যুক্ত প্রচেষ্টা অধিক কার্যকরী হয়।

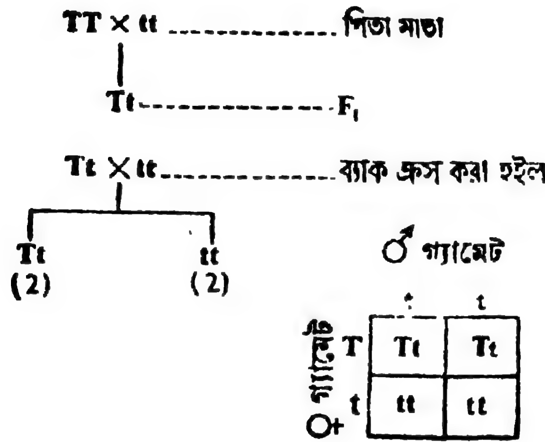
(খ) বিভিন্ন প্রবলগুণসম্পন্ন অ্যালিলের মিথস্ক্রিয়া ভিত্তিক ব্যাখ্যা (Explanation based on Interaction of different Dominant genes)—ক্রমাগত স্বনিষেকের ফলে চারিত্রিক অবনতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়া থাকে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিব্যক্তির ফলে প্রায় সকল সময় ক্ষতিকারক জীনের উৎপত্তি হয়। এই ক্ষতিকারক জীন স্বনিষেকের ফলে হোমোজাইগাস অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ফলে, প্রজাতির মধ্যে চারিত্রিক অবনতি লক্ষিত হয়। কিন্তু যখন সংকর জনন অনুষ্ঠিত করা হয় তখন ঐ পরিব্যক্তিশীল জীন (mutant gene) হেটারোজাইগাস অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বর্ধিত তেজ সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে প্রবলগুণের উপস্থিতিতে প্রচ্ছন্নগুণ চাপা পড়িয়া যায়, তাহার বাহ্যিক প্রকাশ হইতে পারে না। অর্থাৎ Aa মিশ্রণের ফল AA মিশ্রণের ন্যায় প্রকাশিত হয়।

শুদ্ধ পন্থার উদ্ভিদ অধিকাংশ চরিত্রে হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকে। এই হোমোজাইগাস অবস্থা দুইটি প্রচ্ছন্ন চরিত্র অথবা দুইটি প্রবল চরিত্র সমন্বয়ে হইতে পারে। ধরা যাক, একটি শুদ্ধ পন্থার উদ্ভিদে কয়েকটি জীনের সমাবেশ এইরূপ যথা,

aaBBCCdd এবং EE এবং আর একটি শুদ্ধ পন্থার উদ্ভিদে AAbbccDD এবং ee। এক্ষণে এই দুইটি স্বনিষেক ধারাভুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে সংকর জনন অনুষ্ঠিত করিলে অভিষ্ট সংকর উদ্ভিদে জীনের সমাবেশ AaBbCcDd এবং Ee হইবে। অর্থাৎ প্রায় সকল জীনেই হেটারোজাইগাস অবস্থা আসিবে এবং প্রবলগুণের প্রভাবে সংকর উদ্ভিদ অধিক তেজ বা জীবনীশক্তির পরিচয় দিবে। উপরন্তু যে সকল জীনের সমবেত ফল বা কিউমুলেটিভ প্রভাব আছে তাহা প্রবলগুণের মাত্রা বৃদ্ধির প্রভাবে উন্নত চারিত্রিক মান প্রকাশ করিবে।

ব্যাক ক্রস এবং টেস্ট ক্রস (Back Cross and Test Cross)

সাধারণ ক্ষেত্রে F_1 অপত্যবংশের সংকর উদ্ভিদগুলির মধ্যে স্বনিষেকের ফলে যে বীজ উৎপন্ন হয় তাহা অঙ্কুরিত হইলে F_2 অপত্যবংশের উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। কিন্তু



৮৪নং চিত্র—প্রথম অপত্য বংশের একটি সংকর উদ্ভিদের সহিত একটি শুদ্ধ প্রচ্ছন্ন চরিত্রের উদ্ভিদের ব্যাক ক্রসিং বা টেস্ট ক্রসিং-এর ফলে উদ্ভূত উদ্ভিদগুলি 1 : 1 অনুপাতে আসিয়াছে।

প্রাণীর ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে একই F_1 বংশজাত দুইটি প্রাণীর সাহচর্য প্রয়োজন হয়। এখন এই F_1 সংকর উদ্ভিদটি যদি পূর্বতন বংশের যে-কোনো একটির সহিত নিষিক্ত হয় তখন এই ঘটনাকে ব্যাক ক্রসিং (back crossing) বলে। যদি F_1 অপত্যবংশের সংকর উদ্ভিদগুলি বিগত বংশের প্রবল চরিত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদের সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে F_2 অপত্যবংশের প্রতিটি উদ্ভিদই প্রবল চরিত্রবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। পরন্তু ইহাদের পূর্ব বংশের প্রচ্ছন্ন চরিত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদের সহিত মিলনের ফলে F_2 অপত্যবংশে প্রবল ও প্রচ্ছন্ন চরিত্রসম্পন্ন উদ্ভিদগুলি 1 : 1 এই অনুপাতে অবস্থান করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মেন্ডেলের দীর্ঘ এবং খর্বাকার মটর গাছের পরীক্ষায় F_1 অপত্য বংশ উৎপন্ন দীর্ঘ সংকর উদ্ভিদের সহিত পূর্ব বংশের বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন চরিত্রবিশিষ্ট মটর গাছের জননে উৎপন্ন দীর্ঘ এবং খর্বাকার চরিত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদগুলি

1 : 1 এই অনুপাতে দেখা যাইবে। অধিকন্তু ইহাও দেখা যাইবে যে দীর্ঘ চরিত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদগুলির মধ্যে কোনটিই বিশুদ্ধ দীর্ঘ চরিত্রের নহে। ইহা ৮৪নং চিত্রে বুঝান হইয়াছে।

F_1 সংকর উদ্ভিদকে যখন পূর্ব বংশের প্রচ্ছন্ন চরিত্র বিশিষ্ট উদ্ভিদের সহিত মিলিত করা হয় (সংকর জনন) মনোহাইব্রিড (একক সংকর জনন) অথবা ডাইহাইব্রিড (দ্বি-সংকর জনন) ইত্যাদি, তখন সেইরূপ জনন পরীক্ষাকে টেস্ট ক্রস (test cross) বলা হয়। টেস্ট ক্রসও এক ধরনের ব্যাক ক্রস। অর্থাৎ সকল টেস্ট ক্রসকে ব্যাক ক্রস বলা যাইতে পারে কিন্তু সকল ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস নয়। দ্বি-সংকর টেস্ট ক্রসের অনুপাত হইবে 1 : 1 : 1 : 1। একটি অজানা চরিত্রের জেনোটাইপ জানিবার জন্য টেস্ট ক্রস করা হইয়া থাকে কারণ টেস্ট ক্রসের সময় প্রচ্ছন্নগুণ যুক্ত পুং উদ্ভিদ অপত্য বংশের চারিত্রিক প্রকাশের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না।

———

৬ পরিব্যক্তি

(Mutation)

জীন পুনর্মিশ্রণ দ্বারা হয় নাই অথচ অকস্মাৎ আবির্ভূত এইরূপ বংশানুসরণকারী কোন চারিত্রিক পরিবর্তনকে **মিউটেশান** অর্থাৎ **পরিব্যক্তি** (Mutation) বলা হয়। এই পরিবর্তন ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত এবং গুণগত দিক হইতে আসিতে পারে অথবা একটি জীনের রাসায়নিক পরিবর্তনের দ্বারাও হইতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে, নিউক্লিয়াসের বাহিরে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থিত কোন বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলেও সংঘটিত হইতে পারে।

উৎপত্তির ধরন অনুসারে পরিব্যক্তিকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা, **স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যক্তি** (Spontaneous mutation) এবং **কৃত্রিম পরিব্যক্তি** (Artificial mutation) ঃ প্রথমক্ষেত্রে চরিত্রের পরিবর্তন প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া সম্পন্ন হয়; দ্বিতীয়ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন মনুষ্য দ্বারা সংঘটিত হয়।

পরিব্যক্তির প্রকৃতি অনুসারে ইহাকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়, যথা ঃ

(ক) **প্লাজমা সংক্রান্ত পরিব্যক্তি** (Plasmatic mutation) সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থিত স্বানির্ভরশীল ও নিজ অস্তিত্ব রক্ষাকারী বস্তু (প্লাসটিড, মাইটোকনড্রিয়া ইত্যাদি) সমূহের পরিব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(খ) **নিউক্লিয়াস সংক্রান্ত পরিব্যক্তি** (Nuclear mutations)—ইহার তিনটি বিভাগ, যথা,

(1) **জীনোমীয় পরিব্যক্তি** (Genome mutations)—পলিপ্লয়েডী—অটোকিম্বা অ্যালোপালিপ্লয়েডী ($2n \rightarrow 3n \rightarrow 4n \rightarrow$ইত্যাদি) ইহার অন্তর্গত।

(2) **ক্রোমোজোমীয় পরিব্যক্তি** (Chromosome mutation or Structural mutation)—অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে লক্ষ্য করা যায়। ইহা নিম্নলিখিত ধরনের হইতে পারে, যথা,

(i) অ্যানুপ্লয়েডী—অসম্পূর্ণ জীনোম হ্রাস-বৃদ্ধি, $2n \rightarrow 2n-1, 2n+1, \cdots$ইত্যাদি।

(ii) ডেফিসিয়েন্সি অথবা ডিলিশান (deficiency or deletion)—ক্রোমোজোমের অংশ বিশেষ ভগ্ন হইয়া বাদ চলিয়া যাওয়া।

(iii) ডুপ্লিকেশান (duplication)—ক্রোমোজোমের অংশ বিশেষ দ্বিগুণিত হওয়া।

(iv) ইনভারশান (inversion)—ক্রোমোজোমের অংশ বিশেষ ভাঙ্গিয়া গিয়া পুনরায় বিপরীতভাবে জুড়িয়া যাওয়া।

(v) ট্রান্সলোকেশান (translocation)—একটি ক্রোমোজোমের কোন অংশ ভাঙিয়া অন্য ক্রোমোজোমে গিয়া জুড়িয়া যাওয়া।

(vi) রেসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশান (reciprocal translocation)—দুইটি অ-সমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে অংশ বিনিময় করা।

(3) জীন অথবা বৈশিষ্ট্য অথবা বিন্দু পরিব্যক্তি (gene or factor or point mutation)—অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহাকে লক্ষ্য করা যায় না। এইরূপ পরিব্যক্তি মেণ্ডেলের সূত্র অনুসারে বংশানুগমন করিয়া থাকে।

ঊনবিংশতি শতাব্দীর পূর্বে পরিব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণা খুবই অস্পষ্ট ছিল। চার্লস ডারউইন সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক পরিবেশে হঠাৎ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। তিনি ঐসকল পরিবর্তনকে "স্পোর্টস" ('Sports') বলিয়া অভিহিত করেন। ডারউইন-এর বেশ কিছু বৎসর পরে বেটসন (Bateson) লক্ষ্য করিলেন যে জীব জগতে বিভিন্ন চরিত্রে মধ্যে মধ্যে এমন সব পরিবর্তন আসে যেগুলিকে 'অবিরাম' (continuous) বলা চলে না। তিনি সেই সকল পরিবর্তনকে "বিরাম যুক্ত পরিবর্তনশীলতা" (discontinuous variations) বলিয়া উল্লেখ করিলেন। হুগো দিত্র ফ্রীস (Hugo de Vries) 1901 খ্রীষ্টাব্দে ইনোথেরা ল্যামার্কিয়ানা (Oenothera lamarkiana) নামক একটি উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে অকস্মাৎ কিছু চরিত্রের পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। তিনি সেই সময় ঐসকল পরিবর্তনগুলিকে যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যেকের একটি করিয়া নামকরণ করেন। দিত্র ফ্রীস কর্তৃক চিহ্নিত ইনোথেরা ল্যামার্কিয়ানার বিভিন্ন প্রকারগুলি যথাক্রমে, (i) জাইগাস (gigas), অর্থাৎ দীর্ঘাকার, (ii) ন্যানেলা (Nanella) অর্থাৎ খর্বাকার, (ii) লাটা (Lata) অর্থাৎ চওড়া পাতা এবং পিউটেটিভ (Putative). ইহা গাওডেন্স (gaudens) ও ভিলান্স (velans) গোষ্ঠীভুক্ত দুইটি ক্রোমোজোমের মধ্যে ক্রসিংওভার অনুষ্ঠিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। এইগুলি ছাড়া আরও অনেক অস্বাভাবিক পরিবর্তন, যেমন, ফুলের গঠন, বর্ণ ইত্যাদি লক্ষ্য করিলেন। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে ইনোথেরার এই প্রজাতিটি খুবই অল্প মাত্রায় অথচ অবিরতভাবে নূতন "পরিব্যক্তিশীল প্রজাতি" ('mutants') সৃষ্টি করিতেছে। শুধু তাহাই নহে এই প্রকারগুলির মধ্যে কতকগুলি আবার স্বাভাবিক প্রজাতি হইতে এতদূর সরিয়া আসে যে দিত্র ফ্রীস তাহাদের উপক্রান্ত (incipient) প্রজাতি বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ইনোথেরা ল্যামার্কিয়ানা, সেই সময় এমন একটি "পরিব্যক্তিশীল অবস্থার" (mutant period) মধ্য দিয়া চলিতেছিল যে ঐ প্রজাতিটি প্রচুর পরিমাণে নূতন ধরনের প্রজাতির সৃষ্টি করিতেছিল। অপরদিকে আবার ইনোথেরার অন্যান্য প্রজাতিগুলি সেই সময় "বিশ্রাম অবস্থার" ("resting period") মধ্য দিয়া চলিতেছিল এবং যে কোন সময় পুনরায় ল্যামার্কিয়ানার ন্যায় নূতন পরিব্যক্তিশীল প্রজাতি সৃষ্টি শুরু করিবে। ইনোথেরা প্রজাতির এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া দিত্র ফ্রীস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে অকস্মাৎ অথচ ধারাবাহিক নহে এইরূপ পরিবর্তনের ফলেই নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হইতেছে। এইরূপ ঘটনাকেই তিনি মিউটেশান অর্থাৎ পরিব্যক্তি নামে অভিহিত করিলেন।

যদিও ফ্রীসের পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বসমূহের উপর আধুনিক পরিব্যক্তি

সম্বন্ধীয় গবেষণার মূলভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ইনোথেরার মধ্যে যে পরিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়াছিলেন সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীনের পুনর্মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত হইয়াছিল। ইনোথেরা ল্যামার্কিয়ানা হইতেছে "সমতাপূর্ণ হেটারোজাইগাস" (balanced heterozygus) অবস্থানের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহার ক্রোমোজোম সংখ্যা $2n = 14$, এই 14টি ক্রোমোজোম দুইটি গোষ্ঠীতে (complex) বিভক্ত, যথা, গাউডেন্স (gaudens) এবং ভিলান্স (velans)। প্রতি কমপ্লেক্সে 7টি করিয়া ক্রোমোজোম আছে। বিজ্ঞানী O. Renner সর্বপ্রথম এই দুইটি কমপ্লেক্স লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাদের "রেনার কমপ্লেক্স" (Renner Complex) বলা হয়। গাউডেন্স + গাউডেন্স অথবা ভিলান্স + ভিলান্স মিলন (হোমোজাইগাস অবস্থা) হইলে জাইগোট গঠিত হয় না। হেটারোজাইগাস অবস্থা, অর্থাৎ, গাউডেন্স + ভিলান্স মিলন হইলে বীজ উৎপন্ন হয়। এই প্রকার সুষম অথবা সমতাপূর্ণ হেটারোজাইগাস অবস্থার উদাহরণ প্রকৃতিতে খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিব্যক্তির প্রকৃত উদাহরণ বহু বৎসর পূর্বেই লক্ষ্য করা গিয়াছিল। 1590 খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর হেডেলবার্গ শহরে একটি বাগানে **চেলিডোনিয়াম মেজাস** (*Chelidonium majus*) উদ্ভিদে "কাটা পত্র" (cut leaf) পরিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যাণ্ডে অ্যানকন জাতীয় (Ancon race) ভেড়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় ভেড়ার পা অত্যন্ত খাটো হয়। ইহা ছাড়া আরও বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যক্তির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of spontaneous mutations)

স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্ট অধিকাংশ পরিব্যক্তি প্রচ্ছন্ন চরিত্রের হইয়া থাকে। ইহা বলাই বাহুল্য যে প্রচ্ছন্ন চরিত্র হোমোজাইগাস অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তবেই প্রকাশিত হয়। হ্যাপ্লয়েড জীবের মধ্যে, যেখানে প্রতিটি জীন একটি করিয়া থাকে, সেখানে প্রচ্ছন্ন জীনের উপর প্রবল জীনের প্রভাবের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। সুতরাং সেইস্থলে প্রচ্ছন্ন পরিব্যক্তি সহজেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু ডিপ্লয়েড জীবের ক্ষেত্রে তাহা নহে। কারণ সেখানে প্রতিটি চরিত্রের জন্য দুইটি করিয়া জীন থাকে। দুইটি জীনের মধ্যে একটি প্রবল ও অন্যটি প্রচ্ছন্নগুণ সম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং ডিপ্লয়েড জীবের ক্ষেত্রে পরিব্যক্তির বাহ্যিক প্রকাশে "প্রবল-প্রচ্ছন্ন" জীন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

প্রবল প্রকৃতির পরিব্যক্তি (dominant mutation) অথবা মাঝামাঝি ফলদায়ক কোন পরিব্যক্তি (intermediate effect) হেটারোজাইগাস জীবের মধ্যে সহজেই প্রকাশিত হয়, যেমন aa-এর স্থলে Aa। এখানে A জীনটি পরিব্যক্তিশীল জীন। সুতরাং হেটারোজাইগাস অবস্থায় তাহার ব্যাহ্যিক প্রকাশ হইবে। প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির পরিব্যক্তি (recessive mutation) প্রবল প্রকৃতির পরিব্যক্তি অপেক্ষা অধিক মাত্রায়

সৃষ্টি হয়। প্রবল গুণের হোমোজাইগাস অবস্থা প্রাপ্ত কোন জীবের একটি জীনে পরিব্যক্তি হইলে, অর্থাৎ AA→Aa তখনই সেই পরিব্যক্তিশীল চরিত্রের বাহ্যিক প্রকাশ হইবে না; কিন্তু কোন হেটারোজাইগাস উদ্ভিদ প্রবল জীনটির পরিব্যক্তি হইলে, অর্থাৎ Aa→aa, উদ্ভিদটির সেই অঙ্গে উহার প্রকাশ হইবে। অঙ্গজ জননকারী উদ্ভিদ-সমূহ, যেমন, আলু, বিভিন্ন ধরনের ফল ও ফুলের গাছ ইত্যাদি, বিভিন্ন চরিত্রে প্রধানত হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকে। এই সকল উদ্ভিদের কোন অংশে যদি কোন পরিব্যক্তি হয় এবং ঐ অংশটি যদি অঙ্গজ জননে অংশ গ্রহণ করে, অর্থাৎ ঐ অংশ হইতে যদি মুকুল ইত্যাদি বাহির হয়, তাহা হইলে অপত্য উদ্ভিদে সেই পরিব্যক্তি ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হইবে।

যৌন জননকারী উদ্ভিদের দেহকোষে পরিব্যক্তি হইলে তাহা অপত্য বংশে প্রবাহিত হইবে না। কিন্তু ঐ পরিব্যক্তি যদি রেণু মাতৃকোষে (প্রাণীর ক্ষেত্রে যৌন মাতৃকোষে) অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে পরবর্তী বংশে হোমোজাইগাস অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে।

স্ব-পরাগী উদ্ভিদে স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যক্তি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ হইবার কারণ হইল, স্ব-পরাগী উদ্ভিদ অধিকাংশ চরিত্রে হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকে। স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যক্তির ফলে সেই সকল চরিত্রে তাহারা হেটারোজাইগাস অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জননকোষ গঠিত হইবার সময় প্রবল প্রচ্ছন্ন জীনদ্বয় 1 : 1 অনুপাতে পরস্পর হইতে পৃথক হয়। ফলে, মেণ্ডেলের সূত্র অনুসারে 3 : 1 অনুপাতে অপত্য বংশধরদের মধ্যে পরিব্যক্তির প্রকাশ হয়। ইতর-পরাগী উদ্ভিদ অধিকাংশ চরিত্রে হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকে, কারণ নিষেককালে অন্য উদ্ভিদ হইতে পরাগরেণু আসে বলিয়া অধিকাংশ সময় হেটারোজাইগাস মিশ্রণের সম্ভাবনা বেশী থাকে। এক্ষণে ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে স্ব-পরাগী উদ্ভিদের ন্যায় ইতর-পরাগী উদ্ভিদেও স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যক্তি সংঘটিত হয়। কিন্তু সেই পরিব্যক্তির বাহ্যিক প্রকাশ সহজে হইতে পারে না কারণ, অধিকাংশ সময় প্রবল জীনের প্রভাবে বা অবস্থানের জন্য প্রচ্ছন্ন পরিব্যক্তিটি দৃষ্টির আড়ালে থাকিয়া যায়।

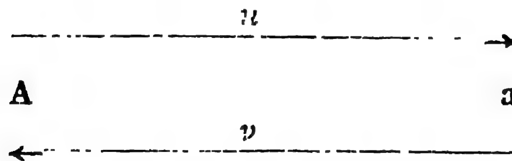
আমরা এ পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন পরিব্যক্তি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করিলাম। অর্থাৎ জীন 'A' পরিব্যক্তির ফলে ধীরে ধীরে 'a'-তে রূপান্তরিত হয়। কোন সন্দেহ নাই যে এই প্রকার পরিব্যক্তি খুবই বেশী মাত্রায় অনুষ্ঠিত হয়। তবে বিপরীত পরিব্যক্তিও, অর্থাৎ a→A, অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। বিপরীত পরিব্যক্তি (reversible mutation) প্রধানত পরিব্যক্তিশীল জীনেই (mutant gene), অনুষ্ঠিত হয়। নিউরোস্পোরা ও অন্যান্য মাইক্রোঅরগানিজমে এই প্রকার পরিব্যক্তির উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা গিয়াছে যে, এক সময় নিউরোস্পোরায় যে স্ট্রেন অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপাদন করিতে পারিত না, সেই স্ট্রেন পুনরায় সেই ক্ষমতা ফিরিয়া পাইয়াছে। এইরূপ বিপরীত পরিব্যক্তি কদাচিৎ ঘটিতে দেখা যায়। যখন এই প্রকার পরিব্যক্তি সংঘটিত হয়, তখন ঐ পরিব্যক্তিশীল জীনটি কিন্তু পুনরায় পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসে না।

সামান্য পরিবর্তিত অবস্থায় চলিয়া আসে, অর্থাৎ, পুনরায় A জীনে রূপান্তরিত না হইয়া A^1 জীনে পরিণত হয় ($a \rightarrow A^1$)।

কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যস্থানে (loci) পরিব্যাপ্তি হইয়া এমন একটি জীনের সৃষ্টি হয় যাহা কোন হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন পরিব্যাপ্তিকে কার্য করিতে বাধা সৃষ্টি করে। এইরূপ বাধাদানকারী জীনকে সাপ্রেসর পরিব্যাপ্তিশীল জীন (supressor mutant) বলে। বেসিডিওমাইসেটী গোষ্ঠীভুক্ত একটি ছত্রাক কোপ্রাইনাস ল্যাগোপাস (*Coprinus lagopus*)-এ মধ্যে এমন 7টি জীনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহারা প্রত্যেকেই অ্যামিনো অ্যাসিড মেথিওনিন (methionine) উৎপাদন করে। প্রথমে এইরূপ ধারণা করা হইয়াছিল যে, উহাদের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন জীন (recessive allele), me—1, বিপরীত পরিব্যাপ্তির ফলে পুনরায় পূর্বের প্রবলগুণ সম্পন্ন জীনে পরিণত হইয়াছে, এবং সেই কারণে ঐ স্ট্রেনটি আর মেথিওনিন উৎপাদন করিতে পারিতেছে না। কিন্তু পরবর্তীকালে জানিতে পারা গেল যে প্রকৃতপক্ষে, অন্য একটি স্থানে সাপ্রেসর পরিব্যাপ্তির ফলে এইরূপ হইয়াছে। পরিব্যাপ্তিশীল সাপ্রেসর জীনটি me—1 জীনের কার্যে বাধা সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া ইহা পূর্বের প্রারম্ভিক প্রবলগুণ সম্পন্ন জীনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছে বা ফল প্রদান করিতেছে। সর্বমোট 64টি পরিব্যাপ্তিশীল প্রকারের (mutant strains) মধ্যে 5টি বিভিন্ন স্থান বা অঞ্চলের (loci) সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যেগুলি me—1 জীনের কার্যে বাধাদান করে।

মানুষের ক্ষেত্রে ব্র্যাকিড্যাকটাইলি* (*brachydactyly*) একটি প্রবলগুণ সম্পন্ন পরিব্যাপ্তির (dominant mutation) উদাহরণ। ইহা প্রায় সকল সময় 1 : 1 অনুপাতে বংশানুগমন করে।

স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যাপ্তি সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা কিছু আলোচনা করা হইল তাহার সংক্ষিপ্তসার একটি সামান্য চিত্রের সাহায্যে বোঝান যাইতে পারে :—



৮৫নং চিত্র—স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যাপ্তির রেখাচিত্র

যেখানে A এবং a দুইটি অ্যালিল এবং *u* এবং *v* যথাক্রমে দুইদিকের পরিব্যাপ্তির হার। উপরের চিত্র হইতে ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে,

(ক) জীন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিব্যাপ্তির ফলে পরিবর্তিত হইয়া উহার প্রচ্ছন্নগুণের অ্যালিলে পরিণত হইতে থাকে। এই পরিবর্তনের হার যে কোন একটি

* ব্র্যাকিড্যাকটাইলি এই পরিব্যাপ্তির ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় ফ্যালাঙ্গস (Phalanx) জোড়া লাগিয়া হাতের আঙুলগুলি ক্ষুদ্রাকার হইয়া যায়।

জীনের পক্ষে নির্দিষ্ট (constant) থাকে ; তবে অন্য জীনের ক্ষেত্রে এই হার ভিন্ন হয়।

(খ) পরিব্যাপ্তি অনেক সময় বিপরীতমুখী হইয়া থাকে, একটি পরিব্যাপ্তিশীল জীন পুনরায় পরিব্যাপ্তির ফলে তাহার পূর্বতন অবস্থা ফিরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু বিপরীত দিকের হার সাধারণত ভিন্ন হয়।

পরিব্যাপ্তি এবং জীবনচক্র (Mutation and the life-cycle)

পরিব্যাপ্তি জীবনচক্রের যে কোন অবস্থায় আসিতে পারে। পরিণত অবস্থায় দেহকোষে পরিব্যাপ্তি হইলে সেই উদ্ভিদেই তাহা উৎপত্তি স্থলে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু দেহকোষের সেইস্থান হইতে পুষ্প অথবা রেণুস্থলী উৎপন্ন হইলে, নূতন পরিব্যাপ্তিশীল চরিত্রটি পরবর্তী বংশে সঞ্চারিত হইতে পারে। মুকুলের মধ্যে পরিব্যাপ্তি সংঘটিত হইলে তাহা পত্র, কাণ্ড অথবা অন্যান্য অংশে প্রকাশিত হইবে। জননকোষ প্রস্তুত হইবার সময় মাতৃকোষে অথবা মাতৃকোষ উৎপন্ন হইবার পূর্বে পরিব্যাপ্তি আসিলে তাহা জননকোষে সঞ্চারিত হইয়া বহু পরিব্যাপ্তিশীল অপত্য উদ্ভিদ সৃষ্টি করিবে। আবার, জাইগোট উৎপন্ন হইবার পর উহার বৃদ্ধির সূচনায় যদি পরিব্যাপ্তি সংঘটিত হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ উদ্ভিদের মধ্যেই সেই পরিব্যাপ্তি বিস্তারিত হইবে, এবং উহা বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হইয়া নূতন পরিব্যাপ্তিশীল বংশের সৃষ্টি করিবে।

কৃষি সংক্রান্ত এবং উদ্যান পালনের দিক হইতে মুকুল পরিব্যাপ্তির (Bud mutation) যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। এই পরিব্যাপ্তি মুকুলের ভাজক কলায় অনুষ্ঠিত হয়। যদি মুকুল সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় পরিব্যাপ্তি সংঘটিত হয় তাহা হইলে মুকুলের প্রায় সকল কোষেই এই পরিব্যাপ্তি থাকিবে ; এবং যে বীটপ ঐ পরিব্যাপ্তি সম্পন্ন মুকুল হইতে উৎপন্ন হইবে তাহার সকল কোষই পরিব্যাপ্তিশীল হইবে। কিন্তু যদি মুকুল সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায় পরিব্যাপ্তি আসে তাহা হইলে মুকুলের অর্ধেক স্বাভাবিক এবং অর্ধেক পরিব্যাপ্তিশীল হইবে। সুতরাং উৎপন্ন বীটপেরও অর্ধেক অংশ স্বাভাবিক এবং অর্ধেক অংশ পরিব্যাপ্তিশীল হইবে। যে বীটপ এই দুইপ্রকার বা ততোধিক বিভিন্ন জিনোটাইপ সম্পন্ন কোষ দ্বারা গঠিত হয় তাহাকে কাইমেরা (Chimera) বলা হয়।

স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যাপ্তি সংঘটিত হইবার উপায় (Process of induction of spontaneous mutations)—1927 খ্রীষ্টাব্দে Muller এবং Stadlar কর্তৃক রঞ্জন রশ্মির (x-ray) পরিব্যাপ্তি আবিষ্ট করিবার ক্ষমতা আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ধারণা বলবত হয় যে মহাজাগতিক রশ্মিবিচ্ছুরণের ফলেই স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যাপ্তি সংঘটিত হইতেছে। Timofeff-Ressovesky একটি তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিলেন যে বজ্রবিদ্যুৎ স্বতঃস্ফূর্ত জীন পরিব্যাপ্তির একটি মুখ্য কারণ। Nawaschin (1938) এবং আরও অনেকে একটি ভিন্ন মত প্রকাশ করিলেন ; তাঁহাদের মতে বাহ্যিক কারণে নহে, আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াই স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোমোজোম

ভাঙ্গার মুখ্য কারণ। তাঁহার দেখাইলেন যে, আভ্যন্তরীণ বিপাকীয় বিন্যাসের কোন পরিবর্তন স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যক্তির মূল কারণ। বীজকে বহুদিন সঞ্চয় বা গুদামজাত করিয়া রাখিয়া দিলে তাহাতে পরিব্যক্তির হার বৃদ্ধি হয়। ইহা ধারনা করা হইয়াছে যে বহুদিন গুদামজাত থাকিবার ফলে বীজের অভ্যন্তরে মজুত খাদ্য বস্তু আভ্যন্তরীণ শ্বাস কার্যে ভাঙ্গিয়া নানা ধরনের রাসায়নিক, ক্ষতিকারক বস্তু উৎপন্ন হয়। সেই সকল পদার্থ বীজের মধ্যে জমা হইতে থাকে এবং পরিশেষে ক্রোমোজোমের উপর ক্রিয়া করিয়া তাহাকে ভাঙ্গিতে সাহায্য করে। বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে Ca^{++} এবং Mg^{++} ধাতুর অভাবেও ক্রোমোজোম ভাঙ্গিয়া যায়।

আবিষ্ট পরিব্যক্তি (Induced mutations)

কৃত্রিম উপায়ে, সাধারণত যে সকল বস্তু বা শক্তির (Agent) দ্বারা পরিব্যক্তি সংঘটিত করা হইয়া থাকে তাহাদের পরিব্যক্তি সংঘটক বা পরিব্যক্তি সংঘটককারী বস্তু (mutagens of mutagenic agents) বলা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন পরিব্যক্তি সংঘটক এবং কৃত্রিম উপায়ে পরিব্যক্তি ঘটাইবার ব্যবস্থাদি আমাদের জানা আছে যেগুলি বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বহুদিনের অনলস সাধনার ফলশ্রুতি। বিভিন্ন ধরণের পরিব্যক্তি সংঘটক বস্তু যাহাদের কৃত্রিম উপায়ে পরিব্যক্তি ঘটাইবার কার্যে ব্যবহৃত করা হয় তাহাদের প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন,

(ক) **ভৌতশক্তি** (Physical agents)—

(১) স্থূলানু রশ্মি বিচ্ছুরণ (ionizing radiation)—রঞ্জন রশ্মি (x-ray), α, β এবং γ-রশ্মি ; রেডিও-অ্যাকটিভ বস্তুসমূহের রশ্মি বিচ্ছুরণ, প্রোটন এবং ইলেকট্রণ।

(২) অ-স্থূলানু রশ্মি বিচ্ছুরণ (nonionizing radiation)।

(খ) **রাসায়নিক বস্তু** (Chemical agents)--বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু যেমন, বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত বাষ্প (mustard gases), যথা, নাইট্রোজেন মাসটার্ড, সালফার মাসটার্ড ; ইথিলিন অক্সাইড (Ethylene oxide) ; ডাই-ইথাইল সালফেট (diethyl sulphate) ; নাইট্রোসোগুয়ানিডিন (Nitrosoguanidine) ; নাইট্রোসো মিথাইল ইউরিয়া (Nitroso methyl urea) ইত্যাদি।

বিভিন্ন বস্তুদের মধ্যে প্রধানত রঞ্জন রশ্মি কৃত্রিম উপায়ে পরিব্যক্তি সংঘটিত করিবার জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। H. G. Muller, 1927 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ড্রসোফিলার উপর পরীক্ষা করিয়া রঞ্জন রশ্মির পরিব্যক্তি সংঘটিত করিবার ক্ষমতা আবিষ্কার করেন। তিনি দেখিলেন যে কৃত্রিম উপায়ে সংঘটিত পরিব্যক্তির সহিত স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যক্তির কোন বাহ্যিক পার্থক্য নাই। 1928 খ্রীষ্টাব্দে আরও একজন বিজ্ঞানী, L. G. Stadler, বার্লি এবং ভুট্টা গাছের উপর রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন যে উহা এই দুইটি প্রজাতির মধ্যে অধিক মাত্রায় পরিব্যক্তি সংঘটিত করিতেছে।

একটি পরমাণুর গঠন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার অভ্যন্তরে প্রোটন

(Possitively charged) এবং প্রোটনকে ঘিরিয়া বিভিন্ন কক্ষে ইলেকট্রণ (negetively charged) রহিয়াছে। এইভাবে অবস্থান করায় পরমাণুগুলি বিদ্যুতে অক্রিয় অবস্থায় থাকে। রঞ্জন রশ্মি কণিকা কোন বস্তুর মধ্য দিয়া চলিয়া যাইবার সময় একটি ইলেকট্রণকে ধাক্কা দিয়া তাহাকে কক্ষ হইতে বাহির করিয়া দেয়, ফলে সেই পরমাণুটি আর অক্রিয় থাকে না তাহা পজিটিভ (+ve) প্রবাহযুক্ত হইয়া যায়। এইরূপ প্রবাহযুক্ত পরমাণুকে স্থুলানু বা আয়ন (ion) বলে। যখন একটি অণুর মধ্যে অবস্থিত একটি পরমাণু স্থুলানুতে পরিণত হয় তখন তাহার ধর্ম আমূল পরিবর্তন হয়। ফলে অণুটিরও ধর্মের পরিবর্তন হয়। এইরূপ পরিবর্তিত অণুটি যদি একটি জীন অথবা একটি জীনের অংশ বিশেষ হয়, এবং তখন যদি সেই পরিবর্তিত জীনটি তাহার অনুলিপি গঠন করে তাহা হইলে অপত্য জীনটি পূর্ব জীন হইতে ভিন্ন প্রকার অর্থাৎ পরিব্যাক্তিশীল জীন হইবে।

রঞ্জন রশ্মির প্রয়োগে যে সকল পরিব্যাক্তি সংঘটিত হইয়া থাকে তাহারা অধিকাংশই প্রচ্ছন্নগুণের এবং প্রাণ নাশক অথবা ক্ষতিকারক (lethal) হয়। আমরা জানি যে হোমোজাইগাস অবস্থানেই লেথাল জীনের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে। রশ্মি বিচ্ছুরণে প্রাণ-নাশক পরিব্যাক্তির আবির্ভাবের হার রশ্মি প্রায়াগের পরিমাণের সহিত সমানুপাতিক। রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগের মাত্রা যে এককের দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহাকে রণ্টজেন একক বা সাধারণভাবে r-একক (Rontgen unit or r-unit) বলা হয় (ইংরাজী r-অক্ষর দ্বারা সূচিত করা হয়।) Wedding, 1939 খ্রীষ্টাব্দে রঞ্জন রশ্মি সংক্রান্ত পরিব্যাক্তি সম্বন্ধে তিনটি সর্ত দিয়াছিলেন ; যথা,

(ক) পরিব্যাক্তি প্রকাশের হার কোষের মধ্যে স্থুলানুকরণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ স্থুলানুকরণের মাত্রা যত অধিক হইবে পরিব্যাক্তির হারও ততই বৃদ্ধি পাইবে। স্থুলানুকরণের মাত্রা r-একক দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

(খ) নির্দিষ্ট মাত্রায় স্থুলানুকরণে যে পরিব্যাক্তির হার দেখা যায় তাহা রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল নহে। অর্থাৎ β-রশ্মি γ-রশ্মি এবং রঞ্জন রশ্মির প্রভৃতি ক্ষেত্রে একই ফল পাওয়া যায়।

(গ) নির্দিষ্ট পরিমাণ রশ্মি প্রয়োগে যে পরিব্যাক্তির হার দেখা যায় তাহা রশ্মি প্রয়োগের সময়ের উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ রশ্মি কত সময় ধরিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার উপর পরিব্যাক্তির হার নির্ভর করে না। অল্প সময়ের জন্য জোরাল রশ্মি, অধিক সময় ধরিয়া হাল্কা মাত্রার রশ্মি প্রয়োগ অপেক্ষা বেশী ফল পাওয়া যায়।

উপরের উল্লিখিত রশ্মি বিচ্ছুরণের যে ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হইল তাহা প্রধানত ক্রোমোজোম বা জীনকে সরাসরি আঘাত করিয়া পরিব্যাক্তি সংঘটিত করা সম্পর্কেই মত ব্যক্ত করা হইয়াছে। সরাসরি আঘাতের এই মতবাদকে টারগেট তত্ত্ব (Target theory) বলা হয়। এই তত্ত্বের স্বপক্ষে প্রধান প্রমাণ হইল রশ্মির মাত্রার

(radiation dose) সহিত পরিব্যক্তির হারের সরাসরি সম্পর্ক ; অর্থাৎ, রশ্মি প্রয়োগের মাত্রা যত বাড়ান হয় পরিব্যক্তির হারও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত এইরূপ অনুপাত দেখা যায়, তাহার পর আর এই অনুপাত ঠিক থাকে না।

রঞ্জন রশ্মি ছাড়া অন্যান্য রশ্মি, যেমন, α, β, γ-রশ্মি পরিব্যক্তি ঘটাইতে পারে। ইহাতে রঞ্জন রশ্মির ন্যায় প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কসমিক রশ্মি, যাহা বহির্জগৎ হইতে অবিরত আমাদের এই গ্রহকে আঘাত করিতেছে তাহাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবাক্তি সংঘটিত করিয়া থাকে।

আলট্রাভায়লেট বা অতিবেগুনী রশ্মি স্থুলানুবিচ্ছুরণকারী রশ্মি নহে। ইহা স্থুলানুবিচ্ছুরণকারী অন্যান্য শক্তিশালী রশ্মির ন্যায় দেহের অভ্যন্তরে বেশী দূর প্রবেশ করিতে পারে না। সেই কারণে এই রশ্মি প্রধানত এককোষী অথবা এক কোষ-স্তর বিশিষ্ট উদ্ভিদ, যেমন, নানাধরনের ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, পরাগরেণু ইত্যাদি কোষে প্রয়োগ করিয়া পরিব্যক্তির নানান পরীক্ষা চালান হয়।

পরিব্যক্তি সংঘটনের পরোক্ষ তত্ত্ব (Indirect theory of mutation)—কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে রশ্মি বিচ্ছুরনের প্রভাব প্রত্যক্ষ নহে ; পরন্তু উহা পরোক্ষভাবে পরিব্যক্তি সংঘটিত করে। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগ করিয়া তাহার ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐ রাসায়নিক বস্তুগুলি প্রত্যক্ষভাবে ক্রোমোজোমের উপর ক্রিয়া করে না। উহারা সাইটোপ্লাজমের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায় এবং তাহার ফলে কতকগুলি ক্ষতিকারক বস্তুর সৃষ্টি হয়। এই ক্ষতিকারক বস্তুগুলি, যেমন, H_2O_2, নাইট্রোজেন ঘটিত বস্তু ইত্যাদি ক্রোমোজোম ভাঙ্গিয়া দেয়। এখন, যেহেতু রশ্মি ও রাসায়নিক বস্তু সমূহ ভিন্নধর্মী হইলেও তাহাদের সর্বশেষ ফলাফল একই ধরনের অর্থাৎ, একই প্রকারের পরিব্যক্তি আনয়ন করে, সুতরাং কোন কোন বিজ্ঞানী এইরূপ ধারণা পোষন করেন যে উহাদের কার্যক্রম বা কার্যপদ্ধতি একই প্রকারের ; অর্থাৎ পরোক্ষ। ট্র্যাডেসক্যানসিয়া (*Tradescantia* sp) উদ্ভিদে রশ্মি প্রয়োগের মাত্রার সহিত ক্রোমোজোম ভাঙ্গার সরাসরি কোন অনুপাত লক্ষিত হয় নাই। বিজ্ঞানী Duryee পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে যদি একটি নিউক্লিয়াসকে রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করিয়া স্বাভাবিক সাইটোপ্লাজমের মধ্যে রাখা যায় তাহা হইলে সেখানে কোনরকম পরিব্যক্তি দেখা যায় না। কিন্তু বিপরীতভাবে, অর্থাৎ শুধুমাত্র সাইটোপ্লাজমে রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করিয়া তাহার মধ্যে স্বাভাবিক ও সুস্থ নিউক্লিয়াসটিকে পুনঃস্থাপন করিলে ক্রোমোজোম পরিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা প্রমাণিত হয় যে রঞ্জন রশ্মি সরাসরি ক্রোমোজোমকে আঘাত করিয়া ভাঙ্গে না বা তাহার কোন আণবিক পরিবর্তন করে না ; ইহা সাইটোপ্লাজমের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইয়া ক্রোমোজোম পরিব্যক্তি অথবা জীন পরিব্যক্তি সংঘটিত করে।

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বস্তু বা পদার্থ আমাদের জানা আছে যাহা পরিব্যক্তি সংঘটিত করে। ইহাদের মধ্যে মাসটার্ড গ্যাস, নাইট্রোজেন ও সালফার ঘটিত

রাসায়নিক বস্তুসমূহ, β-প্রোপিওল্যাকটোন, ডায়াজোমিথেন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ফরমালডিহাইড, যাহা সাধারণত মৃত জীবদেহ সংরক্ষিত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়, তাহারও কিছু পরিব্যক্তি আনয়ন করার ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। রাসায়নিক বস্তুগুলি প্রধানতঃ জলে দ্রবণীয় অবস্থায় জীন এবং ক্রোমোজোম পরিব্যক্তি সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে জীবদেহে প্রযোগ করা হইয়া থাকে। রাসায়নিক পদার্থসমূহ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অক্সিজেনে (O_2) এবং তাপ (temperature) পরিব্যক্তি ঘটিতে সাহায্য করে।

পরিব্যক্তির সন্ধান (Detection of mutation)

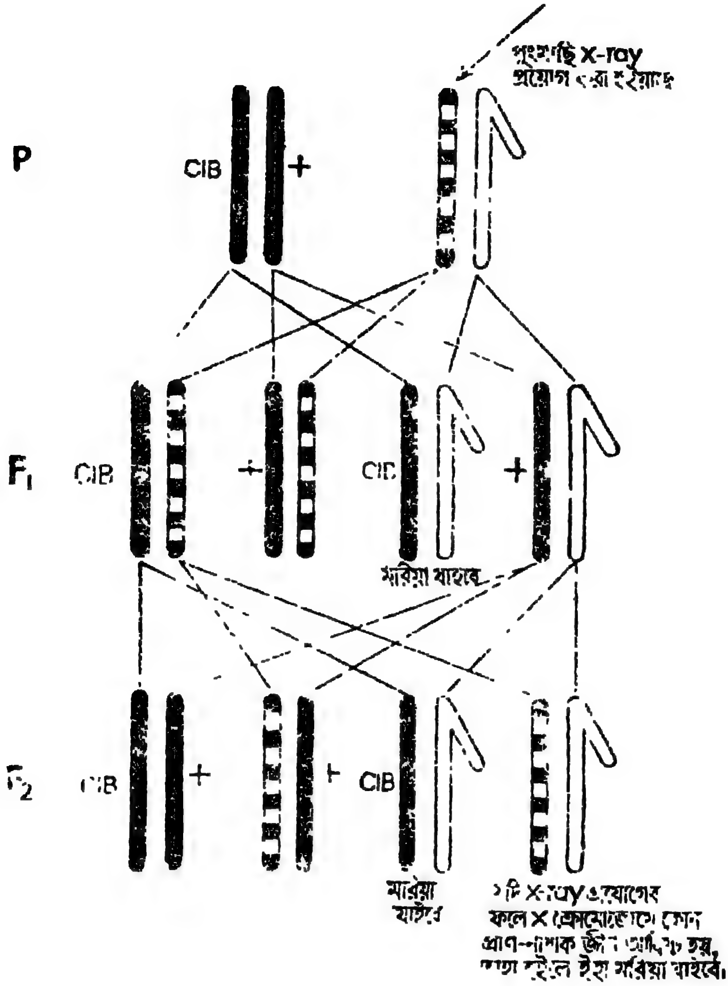
রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করিয়া যে সকল পরিব্যক্তি সংঘটিত করা হয় তাহার অধিকাংশই প্রচ্ছন্নগুণের এবং প্রাণনাশক (recessive and lethals)। আমারা জানি যে প্রচ্ছন্নগুণ সকল সময় হোমোজাইগাস অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তবেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রাণনাশক জীনের ক্ষেত্রে হোমোজাইগাস অবস্থায় জীবের মৃত্যু হয়। সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগের দ্বারা কোন পরিব্যক্তি আসিয়াছে কিনা তাহা জানিবার কোন উপায় থাকে না। তাহা সত্ত্বেও বর্তমানে প্রাণনাশক পরিব্যক্তির সন্ধান পাওয়ার কয়েকটি উপায় জানা গিয়াছে। নিম্নে উহার আলোচনা করা হইল।

যৌনতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত প্রাণনাশক জীন পরিব্যক্তির সন্ধান (Detection of sex-linked lethal gene mutation)

(ক) ClB উপায় (ClB method)—বিজ্ঞানী মুলার 1927 খ্রীষ্টাব্দে একটি উপায় বাহির করেন যাহার দ্বারা প্রাণনাশক পরিব্যক্তি সনাক্ত করা সম্ভব হয়। ইহাকে ClB উপায় বলা হয় (৮৬নং চিত্র)। মুলারের নিকট ড্রসোফিলার বিভিন্ন প্রকারের যে সঞ্চয় ছিল তাহার একটি হইল ClB। ClB-মাছির x-ক্রোমোজোম একটি লিথাল জীন (l) এবং একটি প্রবলগুণের বার চক্ষু (Bar eye) জীন (B) বহন করে। এই দুইটি জীন ছাড়া এখানে একটি ইনভারশান হইয়াছে (C) যাহার জন্য এই ক্রোমোজোমটির সহিত স্বাভাবিক x-ক্রোমোজোমের ক্রসিংওভার অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ClB-স্ত্রী-মাছির দুইটি x-ক্রোমোজোমের একটি ClB-x অন্যটি স্বাভাবিক x। এখানে লিথাল বা প্রাণনাশক জীনটি হেটারোজাগাস অবস্থায় আছে সুতরাং তাহার বহিঃপ্রকাশ হয় না। ClB-স্ত্রী মাছিকে বার চক্ষু চিহ্ন দ্বারা সনাক্ত করা যায়। ClB-পুরুষ মাছি জন্মাইতে পারে না কারণ, সেখানে একটি x-ক্রোমোজোম থাকে বলিয়া প্রাণনাশক জীনের (l) প্রভাবে উহারা মরিয়া যায়।

মুলার তাঁহার পরীক্ষায় স্বাভাবিক পুরুষ মাছিদের (বার চক্ষু নহে) উপর রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করিয়া ClB-স্ত্রী মাছিদের সহিত যৌন সংযোগ করাইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগের ফলে পুরুষ মাছিদের x-ক্রোমোজোমে কোন প্রাণ-

নাশক (lethal) জীন আবিষ্ট হইয়াছে কিনা তাহা লক্ষ্য করা। প্রথম অপত্য বংশে যে সকল বংশধর পাইলেন তাহার মধ্য হইতে ClB-স্ত্রী এবং স্বাভাবিক পুরুষ মাছিদের বাছিয়া লইলেন এবং ইহাদের মধ্যে পুনরায় যৌন সংযোগ ঘটাইয়া দ্বিতীয় অপত্য বংশে স্ত্রী ও পুরুষ মাছিদের অনুপাত নির্ণয় করিলেন। প্রথম অপত্য বংশে

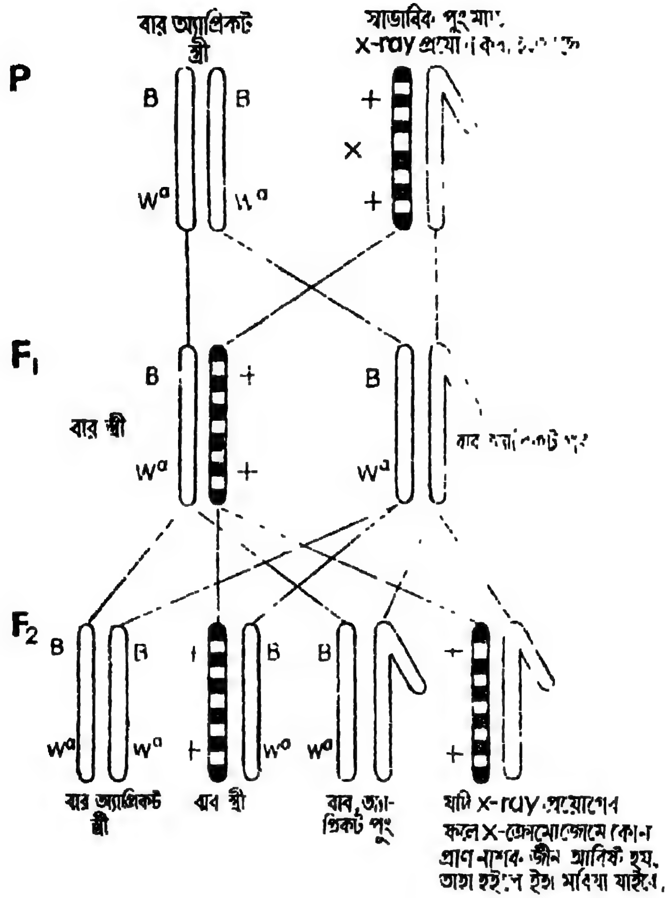


৮৩নং চিত্র—ClB উপায় : রঞ্জন রশ্মি আবিষ্ট X-ক্রোমোজোমকে কালো-সাদা বর্ণ দ্বারা চিত্রিত করা হইয়াছে।

স্ত্রী ও পুরুষ মাছির অনুপাত ছিল 2 : 1, কারণ, ClB-পুরুষ জন্মাইবে না। এই বংশে স্ত্রী মাছিদের মধ্যে আবার শতকরা 50 ভাগ ClB এবং বাকি 50 ভাগ স্বাভাবিক। ClB-স্ত্রী মাছিদের দুইটি ক্রোমোজোমের মধ্যে একটি ClB-x এবং অপরটি রঞ্জন রশ্মি দ্বারা উদ্দীপ্ত (irradiated)। রঞ্জন রশ্মি দ্বারা উদ্দীপ্ত x-ক্রোমোজোমে কোন প্রাণনাশক জীনের আবির্ভাব হইলেও তাহা ClB মাছির মধ্যে প্রকাশ পাইবে না, কারণ, ঐ জীনটি যেস্থলে আবির্ভূত হইয়াছে তাহার অ্যালিল জীন তখন প্রবল জীনের ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

দ্বিতীয় অপত্য বংশে মুলার কোন পুরুষ মাছি পাইলেন না, অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের

অনুপাত দাঁড়াইল 2 : 0। ইহা জানা আছে যে, ClB-পুরুষ মাছি উৎপন্ন হইবে না। কিন্তু যেহেতু স্বাভাবিক পুরুষ মাছিও উৎপন্ন হইল না তখন ইহা নির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হইল যে রঞ্জন রশ্মি দ্বারা উদ্দীপ্ত x-ক্রোমোজোমে একটি প্রাণনাশক জীন (lethal gene) আবিষ্ট হইয়াছে। স্ত্রী মাছির ক্ষেত্রে উহা হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকে, কিন্তু পুরুষ মাছির (xy) ক্ষেত্রে তাহা প্রকাশিত হইল।



৮৭নং চিত্র—মুলার-5 উপায় : রঞ্জন রশ্মি আবিষ্ট X-ক্রোমোজোম এবং তাহার বংশধর ক্রোমোজোমগুলি কালো-সাদা বর্ণ দ্বারা চিত্রিত করা হইয়াছে।

(খ) মুলার-5 উপায় (Muller-5 method)—পরিব্যক্তি চিহ্নিত করিবার আরও একটি সহজতর উপায় মুলার বাহির করিয়াছেন। তাহা মুলার-5 উপায় বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে (৮৭নং চিত্র)। তাঁহার 5নং সঞ্চয়ের যে ড্রসোফিলা, তাহার একটি x-ক্রোমোজোমের দুইবার ইনভারশনের ফলে উহা সম্পূর্ণরূপে ক্রসিংওভার প্রতিরোধী হইয়াছে। উপরন্তু ঐ ক্রোমোজোমে দুইটি চিহ্নিতকারী (marker gene) জীন, যথাক্রমে প্রবল গুণের বার চক্ষু (B) এবং প্রচ্ছন্ন গুণের অ্যাপ্রিকট্ বর্ণ (w^a) অবস্থিত। এইরূপ চরিত্রের হোমোজাইগাস স্ত্রী ড্রসোফিলা আর একটি পুরুষ ড্রসোফিলার মত অবিকল একই রকম দেখিতে হয়। ইহাদের মুলার-5 ড্রসোফিলা বলা হয়।

মুলার-5 স্ত্রী মাছির সহিত একটি স্বাভাবিক বর্ণের (wild type) রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগে উদ্দীপ্ত পুরুষ ড্রসোফিলার যৌন জনন সম্পন্ন করা হয়। F_1 অপত্য বংশে প্রাপ্ত সকল পুরুষ মাছি মুলার-5 মাছির ন্যায় হইল। F_2 অপত্য বংশে পুরুষ মাছিদের মধ্যে শতকরা 50 ভাগ মুলার-5 ধরনের এবং অবশিষ্ট 50 ভাগ স্বাভাবিক ধরনের হওয়া উচিত। কিন্তু যদি রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগের ফলে কোন যৌন ঘটিত (Sex linked) প্রাণনাশক জীন পরিব্যক্তি আবিষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় অপত্য বংশে কোন স্বাভাবিক ধরনের পুরুষ ড্রসোফিলার উৎপত্তি হইবে না। মুলার তাঁহার এই পরীক্ষায় দ্বিতীয় অপত্য বংশে স্ত্রী ও পুরুষ মাছির অনুপাত পাইলেন, 2 : 1। প্রাপ্ত পুরুষ মাছিগুলি ছিল মুলার-5 ধরনের। সুতরাং স্বাভাবিক পুরুষ মাছির অনুপস্থিতি প্রমাণ করিল যে রঞ্জন রশ্মির প্রয়োগের ফলে একটি প্রাণনাশক পরিব্যক্তির উৎপত্তি হইয়াছে।

———

৭ যৌন ক্রোমোজোম ও যৌন নির্ধারণ
(Sex chromosomes and Sex determination)

পূর্বে বলা হইয়াছে যে; কোন জীবের প্রতিটি জীব কোষে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম আছে। যে সকল ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম দ্বারা যৌন নির্ধারণ হয় তাহাদের মধ্যে সাধারণত একজোড়া বিশেষ ধরনের ক্রোমোজোম দেখা যায়, উহাদের যৌন ক্রোমোজোম বলা হয়। এই দুইটি যৌন ক্রোমোজোমের একটিকে X ও অন্যটিকে Y বর্ণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। ইহাদের অ্যালোজোম নামেও অভিহিত করা হয়। একজোড়া অ্যালোজোম ছাড়া অবশিষ্ট ক্রোমোজোমগুলিকে অটোজোম বলা হয়। অটোজোমকে ইংরাজী A বর্ণের দ্বারা সূচিত করা হয়।

ড্রসোফিলা মেলানোগ্যাসটার মক্ষিকার ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা $2n = ৪$। এই চার জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে তিন জোড়া অটোজোম এবং এক জোড়া অ্যালোজোম বা যৌন ক্রোমোজোম। ড্রসোফিলা মক্ষিকার ক্রোমোজোম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে পুরুষের ক্ষেত্রে তিন জোড়া অটোজোম এবং দুইটি অ্যালোজোম, যথাক্রমে X ও Y আছে। এই চারজোড়া ক্রোমোজোমকে সূচক বর্ণের দ্বারা নিম্নলিখিতরূপে দেখান হয়; যেমন, $2A+XY$; এক্ষেত্রে $A=3$। স্ত্রী-মক্ষিকায় Y ক্রোমোজোমের পরিবর্তে আর একটি X ক্রোমোজোম থাকে। সুতরাং স্ত্রী-মক্ষিকার ক্রোমোজোম সূত্র হইল, $2A+XX$। এইরূপে মানুষের ক্ষেত্রেও স্ত্রী ও পুরুষের ক্রোমোজোম সূত্র এইভাবে লেখা যায়, যেমন, স্ত্রী—$2A+XX$ এবং পুরুষ $2A+XY$ (এখানে $A=22$)।

X ও Y ক্রোমোজোম ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের ক্রোমোজোম দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের Z এবং W বর্ণ দ্বারা সূচিত করা হয়। অ্যালোজোমের সংখ্যা সাধারণত দুইটি হইলেও এইরূপ কতকগুলি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়—যাহাদের মধ্যে দুই এর অধিক অ্যালোজোম থাকে এবং ক্রোমোজোম সংখ্যার বিচারে পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য থাকে।

উদ্ভিদ একলিঙ্গ বা উভয় লিঙ্গ হয় বলিয়া উহাদের যৌন নির্ধারণ প্রক্রিয়া কিছু জটিল। অধিকন্তু কোন কোন উদ্ভিদের যৌন-নির্ধারণ পরিবেশ কর্তৃক প্রভাবিত হয়। অ্যারিসিমা জ্যাপোনিকা (*Arisaema japonica*) ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে কন্দের আকৃতি ও ওজনের উপর যৌন নির্ধারণ হয়। যে সকল উদ্ভিদ বৃহৎ কন্দ হইতে উৎপন্ন হয় তাহারা স্ত্রী-পুষ্প উৎপন্ন করে; অপরদিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার কন্দ হইতে উৎপন্ন উদ্ভিদ পুং-পুষ্প উৎপন্ন করে। অধিকাংশ ভিন্নবাসী (dioecious) উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া প্রাণীর ন্যায় যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

নিম্নে কয়েকটি উদ্ভিদের যৌন প্রকৃতির বিবরণ দেওয়া হইল ; যথা—

XX ও XY প্রকৃতি বিশিষ্ট :

সাইলিন ডায়োইকা (*Silen dioica*) নামক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যথারীতি স্ত্রী উদ্ভিদ ও পুরুষ উদ্ভিদের মধ্যে ক্রোমোজোম সংখ্যার কোন প্রভেদ নাই ; কিন্তু স্ত্রী উদ্ভিদ (2A+XY) হোমোগ্যামেটিক, অর্থাৎ সর্বদা একপ্রকার গ্যামেট (A+X) উৎপন্ন করে এবং পুরুষ উদ্ভিদ (2A+XY) হেটারোগ্যামেটিক, অর্থাৎ দুই প্রকার গ্যামেট উৎপন্ন করে (A+X) এবং (A+Y)। দুইটি বিপরীত (A+X) ক্রোমোজোম সহ গ্যামেটের মিলনের ফলে স্ত্রী উদ্ভিদ এবং (A+X) ও (A+Y) ক্রোমোজোম সহ দুইটি গ্যামেটের মিলনের ফলে একটি পুরুষ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

2. **XX ও XO প্রকৃতি বিশিষ্ট :**

এইরূপ প্রকৃতি ডায়োসকোরিয়া (*Dioscoria* sp.) প্রজাতির মধ্যে দেখা যায়। ইহাদের স্ত্রী উদ্ভিদে দুইটি X যৌন ক্রোমোজোম আছে কিন্তু পুং উদ্ভিদে একটি মাত্র X যৌন ক্রোমোজোম আছে। Y ক্রোমোজোম অনুপস্থিত। Y-এর অনুপস্থিতি 'O' বর্ণ দ্বারা সূচিত করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে স্ত্রী ও পুং উদ্ভিদের মধ্যে ক্রোমোজোম সংখ্যার প্রভেদ আছে। স্ত্রী উদ্ভিদে একটি ক্রোমোজোম বেশী। যথারীতি স্ত্রী উদ্ভিদ হোমোগ্যামেটিক এবং পুং উদ্ভিদ হেটারোগ্যামেটিক। পুং উদ্ভিদে দুই রকম গ্যামেট উৎপন্ন হয়, যথা (A+X) এবং (A+O) ; অর্থাৎ শতকরা 50 ভাগ গ্যামেটে একটি X ক্রোমোজোম থাকে এবং অবশিষ্ট 50 ভাগ গ্যামেটে কোন যৌন ক্রোমোজোম থাকে না। (A+X) এবং (A+O) গ্যামেটদ্বয়ের মিলনের ফলে (2A+XO) ধরনের পুরুষ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

3. **ZW ও ZZ প্রকৃতি বিশিষ্ট :**

ফ্রাগেরিয়া ইলেটর (*Fragaria elatior*) উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই ধরনের যৌন প্রকৃতি দেখা যায়। এই স্থলে পুং উদ্ভিদ হোমোগ্যামেটিক (2A+ZZ) এবং স্ত্রী উদ্ভিদ হেটারোগ্যামেটিক (2A+ZW)। এখানে দুই প্রকার গ্যামেট উৎপন্ন হয়, যথা, (A+Z) এবং (A+W)। ইহা সাইলিন ডায়োকা-র ঠিক বিপরীত।

4. **XX ও XY_1Y_2 প্রকৃতি বিশিষ্ট :**

হিউমিউলাস জ্যাপোনিকাস এবং রুমেক্স-এর কয়েকটি প্রজাতির (*Humulus japonicus* and some sps of *Rumex*) মধ্যে এইরূপ উদাহরণ দেখা যায়। স্ত্রী উদ্ভিদ—2A+XX এবং পুং উদ্ভিদ—$2A+XY_1Y_2$। সুতরাং পুং উদ্ভিদে স্ত্রী অপেক্ষা একটি যৌন ক্রোমোজোম বেশী আছে। পুং উদ্ভিদের তিনটি যৌন ক্রোমোজোম মায়োসিস বিভাজনের সময় পরস্পর জোড় বাঁধিয়া একটি ট্রাইভ্যালেন্ট গঠন করে। X-ক্রোমোজোম ইংরাজী অক্ষর "U"-এর ন্যায় আকৃতি গঠন করে দুইটি ক্রোমোজোম উহার দুই পার্শ্বে যুক্ত হয়। অ্যানাফেজে ক্রোমোজোম পৃথকীকরণের সময় X ক্রোমোজোম যে মেরুতে গমন করে Y_1 ও Y_2 একত্রে তাহার বিপরীত মেরুতে গমন করে ; সুতরাং

পুং উদ্ভিদ দুই প্রকার গ্যামেট গঠন করে, যথা ($A+X$) এবং ($A+Y_1Y_2$)। স্ত্রী উদ্ভিদ হোমোগ্যামেটিক, অর্থাৎ এক প্রকার গ্যামেট উৎপন্ন করে ($A+X$)। ($A+X$) এবং ($A+Y_1Y_2$) ক্রোমোজোম বিশিষ্ট দুইটি বিপরীত গ্যামেটের মিলনে $2A+XY_1Y_2$ পুং উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

5. $2X_1$ $2X_2$ ও $X_1X_2Y_1Y_2$ **প্রকৃতি বিশিষ্ট :**

হিউমিউলাস লুপুলাস (*Humulus lupulus*) উদ্ভিদের মধ্যে এই উদাহরণ পাওয়া যায়। এখানে স্ত্রী উদ্ভিদ, $2A+2X_1+2X_2$; এবং পুং উদ্ভিদ, $2A+X_1X_2Y_1Y_2$। স্ত্রী এবং পুং উদ্ভিদের মধ্যে ক্রোমোজোম সংখ্যার কোন প্রভেদ নাই। স্ত্রী উদ্ভিদ হোমোগ্যামেটিক, সকল সময় একই ধরনের গ্যামেট ($A+X_1X_2$) উৎপন্ন করে এবং পুং উদ্ভিদ হেটারোগ্যামেটিক। পুং উদ্ভিদের চারিটি যৌন ক্রোমোজোম মায়োসিস কোষ বিভাজনে কোন বাইভ্যালেন্ট গঠন করে না। উহারা প্রত্যেকেই ইউনি-ভ্যালেন্ট হিসাবে অবস্থান করে। অ্যানাফেজ পৃথকীকরণের সময় X_1 ও X_2 একত্রে একটি মেরুতে গমন করে এবং Y_1 ও Y_2 একত্রে উহার বিপরীত মেরুতে গমন করে। সুতরাং পুং উদ্ভিদে দুই প্রকার গ্যামেট উৎপন্ন হয়, যথা, ($A+X_1X_2$) ও ($A+Y_1Y_2$)। যৌন ক্রোমোজোমের অন্য প্রকার মিশ্রণ কখনও-ই দেখা যায় না।

6. $2X_1$ $2X_2$ ও X_1X_2Y **প্রকৃতি বিশিষ্ট :**

আর্টিপ্লেক্স হাইমেনিলিট্রা (*Artiplex hymenelytra*) উদ্ভিদের যৌন নির্ধারণ পদ্ধতি **হিউমিউলাস জ্যাপোনিকাসের** ঠিক বিপরীত। এখানে স্ত্রী উদ্ভিদ অপেক্ষা পুং উদ্ভিদে একটি ক্রোমোজোম কম। স্ত্রী উদ্ভিদ, $2A+2X_1$ $2X_2$; এবং পুং উদ্ভিদ, $2A+X_1X_2Y$। স্ত্রী উদ্ভিদ যথারীতি হোমোগ্যামেটিক, অর্থাৎ একই প্রকার গ্যামেট ($A+X_1X_2$) উৎপন্ন করে কিন্তু পুং উদ্ভিদ হেটারোগ্যামেটিক, সকল সময় দুই প্রকার গ্যামেট, যথা, ($A+X_1X_2$) এবং ($A+Y$) উৎপন্ন করে। পুরুষের ক্ষেত্রে Y ক্রোমোজোম একটি 'লুপ' গঠন করে এবং তাহার দুই প্রান্তে দুইটি X ক্রোমোজোম যুক্ত হয়। অ্যানাফেজে দুইটি X ক্রোমোজোম একটি মেরুতে গমন করে এবং Y ক্রোমোজোম তাহার বিপরীত মেরুতে গমন করে।

7. O ও Y **প্রকৃতি বিশিষ্ট :**

ফোরাডেনড্রন ফ্ল্যাভেসেন্স (*Phoradendron flavescens*)—উদ্ভিদে এইরূপ অস্বাভাবিক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে স্ত্রী উদ্ভিদ অপেক্ষা পুং উদ্ভিদে একটি ক্রোমোজোম বেশী। শুধু তাহাই নয়, X ক্রোমোজোম সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। স্ত্রী উদ্ভিদে কোন যৌন ক্রোমোজোম নাই ($2A+O$) এবং পুং উদ্ভিদে শুধুমাত্র একটি Y-ক্রোমোজোম বর্তমান, ($2A+Y$)। যথারীতি স্ত্রী উদ্ভিদ হোমোগ্যামেটিক, কেবলমাত্র (A) ক্রোমোজোম বিশিষ্ট গ্যামেট উৎপন্ন করে ; এবং পুং উদ্ভিদ হেটারো-গ্যামেটিক, দুই প্রকার গ্যামেট (A) ও ($A+Y$) উৎপন্ন করে। (A) ও ($A+Y$)-এর মিলনে পুং এবং (A) ও (A) গ্যামেটের মিলনে স্ত্রী উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

যৌন ক্রোমোজোমের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of sex Chromosomes) — X ও Y যৌন ক্রোমোজোমদ্বয়কে মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় জোড় বাঁধিতে দেখা যায়। তবে ইহারা পরস্পর সম্পূর্ণ সমসংস্থ নয়। উহাদের মধ্যে যেমন আকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায় (X ক্রোমোজোম অপেক্ষা Y ক্রোমোজোম আকারে কিছুটা বড় হয়), সেইরূপ প্রকৃতির দিক হইতেও উহারা পরস্পর হইতে ভিন্ন। X ও Y ক্রোমোজোমের সামান্য অংশ পরস্পর সমসংস্থ কিন্তু অবশিষ্ট অংশে উহারা সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় অনুরূপ অংশই জোড়বদ্ধ হয়।

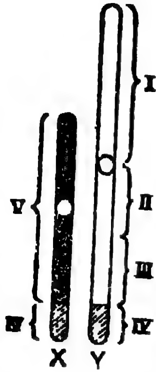
সাধারণভাবে যৌন ক্রোমোজোমের মধ্যে অ্যালোসাইক্লিক প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। কক্সিনিয়া (*Coccenia* sp.) উদ্ভিদে X-ক্রোমোজোমে গৌণ সংকোচ দেখা যায়। কোষ বিভাজনের সময় ইহারা স্বাভাবিক আচরণ করিয়া থাকে।

যৌন লিংকজ (Sex-linkage)—যৌন ক্রোমোজোম অন্যান্য ক্রোমোজোমের ন্যায় জীন দ্বারা সজ্জিত থাকে। অটোজোমের উপর অবস্থিত জীনের বংশগতি সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে যৌন ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত জীনের বংশগতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইল।

যৌন ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত জীনের বংশগতি প্রধানত তিন ভাগে আলোচনা করা যাইতে পারে, যথা, (১) X-ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত জীন যাহা Y-ক্রোমোজোমে নাই ; (২) Y-ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত জীন যাহা X-ক্রোমোজোমে নাই এবং (৩) X ও Y-এর সাধারণ (সমসংস্থ) অংশের উপর অবস্থিত জীন। প্রথম দলভুক্ত জীন, অর্থাৎ যাহারা শুধুমাত্র X-এর উপর আছে, Y-এ নাই, তাহাদের **যৌন লিংকেজ ঘটিত জীন** (sex-linked gene) বলা হয়। যৌন লিংকেজ ঘটিত জীনের-বংশগতিকে **যৌন লিংকেজ ঘটিত বংশগতি** (sex-linked inheritance) বলে। Y-ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত জীনকে Y-লিংকড্ জীন (Y-linked gene) বা শুধুমাত্র Y-লিংকেজ বলা হয়। X এবং Y-এর সাধারণ অংশের উপর অবস্থিত জীনকে অসম্পূর্ণ যৌন লিংকেজ (incomplete sex linkage) বলা হয়।

উদ্ভিদের মধ্যে যৌন লিংকেজের উদাহরণ—M Westergaard (1958) একটি সপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদ **মেলানড্রিয়াম অ্যালবাম** (*Melandrium album*)-এর উপর যৌন ঘটিত লিংকেজ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালান। এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে সেখানে ড্রসোফিলার ন্যায় X ও Y ক্রোমোজোম দ্বারা যৌন নির্ধারণ হয়। তিনি আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সরু পাতার (narrow leaves) জন্য এবং পাতার হরিদ্রাভ সবুজ (yellow green) বর্ণের জন্য দায়ী জীনসমূহ শুধুমাত্র X-ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত রহিয়াছে ; এবং পত্রের কর্বরিত (variegation) চরিত্রের একটি ইনহিবিটার জীন শুধুমাত্র Y-ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও একটি জীন লক্ষ্য করিলেন যাহা অস্বাভাবিক ফুলের সৃষ্টি করে, তাহা X ও Y-এর সাধারণ অংশের উপর অবস্থিত। তিনি ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে X ও Y ক্রোমোজোমের সাধারণ অংশের মধ্যে কায়াজমা গঠিত হয়।

সুতরাং ইহা প্রমাণিত হয় যে এই দুই যৌন ক্রোমোজোম মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় জোড়বন্ধ হইয়া বাইভ্যালেণ্ট গঠন করে। চিত্রে মেল্যানড্রিয়ামে যৌন ক্রোমোজোমদ্বয়ের বিভিন্ন অংশ এবং ঐ সকল অংশের উপর অবস্থিত বিভিন্ন জীনের কার্য উল্লেখ করা হইল (৮৮নং চিত্র)।



৮৮নং চিত্র—মেলানড্রিয়ামের যৌন ক্রোমোজোমের চিত্র : সমসংস্থ অংশটি কোণাকুণি রেখা টানিয়া দেখান হইয়াছে। কালো অংশটি শুধুমাত্র X-ক্রোমোজোমে রহিয়াছে। অপরদিকে সাদা অংশ কেবলমাত্র Y-ক্রোমোজোমে রহিয়াছে। I অংশে স্ত্রী-অঙ্গের চরিত্র নিয়ন্ত্রণকারী জীন অবস্থান করে; II ও III অংশে পরাগধানী সৃষ্টিকারী জীন অবস্থিত। Y-ক্রোমোজোমের I, II ও III অংশের উপর অবস্থিত জীনসমূহ Y-লিঙ্কড্ বংশগতি প্রদর্শন করে। X-ক্রোমোজোমের V অংশের উপর অবস্থিত জীন X-লিঙ্কড্ বংশগতি প্রদর্শন করে। X ও Y-ক্রোমোজোমের IV অংশে অবস্থিত জীন অসম্পূর্ণ যৌন লিঙ্কেজ ঘটিত বংশগতি প্রদর্শন করে।

যৌন লিংকেজ ঘটিত চরিত্রের বংশগতি (Inheritance of sex-linked characters)—যৌন লিংকেজ ঘটিত চরিত্রের বংশগতি সাধারণ জীনের, যাহা অটোজোমের উপর অবস্থিত, বংশগতির ধারা হইতে ভিন্ন। আমরা জানি পুরুষের মধ্যে X ও Y ক্রোমোজোম এবং স্ত্রীর মধ্যে দুইটি X-ক্রোমোজোম থাকে। সুতরাং কোন প্রচ্ছন্নগুণের যৌন লিংকেজ ঘটিত জীন (recessive sex-linked genes) পুরুষের মধ্যে সহজেই প্রকাশিত হয়, কারণ, সেখানে প্রবলগুণের জীনের অবস্থানের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রে যৌন লিংকেজ ঘটিত প্রচ্ছন্ন জীন পুরুষের ন্যায় সহজে প্রকাশিত হয় না। কারণ সেখানে প্রচ্ছন্ন জীনের প্রকাশ প্রবল গুণের অবস্থানের উপর নির্ভর করে! দুইটি X-ক্রোমোজোম থাকিলে জীনের হেটারোজাইগাস অবস্থান হওয়ার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। এই কারণে মানুষের হিমোফিলিয়া রোগ, যাহা একটি প্রচ্ছন্ন যৌন লিংকেজ ঘটিত জীন, পুরুষের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। হোমোজাইগাস হিমোফিলিয়া প্রাণনাশের কারণ হয় বলিয়া স্ত্রীলোকের মধ্যে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও বা দেখা যায় তাহার সংখ্যা অতি নগণ্য।

জীব জগতে X-লিংকড্ চরিত্রের তুলনায় Y-লিংকড্ চরিত্র খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ড্রসোফিলার মধ্যে পুং উর্বরতা নির্দেশ করে এইরূপ দুইটি জীন Y-ক্রোমোজোমের সহিত যুক্ত বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। মানুষের ক্ষেত্রে, লিপ্তপদাঙ্গুলি (webbed toes) এবং "কানের ধারে চুল" (hairy earrims ; hypertrichosis pinnae auris) চরিত্রের জীন Y-ক্রোমোজোমের উপর অবস্থিত। Y-লিংকড্ ঘটিত চরিত্র হইলে উহা কেবল পুরুষের মধ্যেই প্রকাশিত হয়, কারণ আমাদের জানা আছে যে Y-ক্রোমোজোম স্ত্রীর মধ্যে থাকে না।

৮ প্রকারণ
(Variation)

জীবের প্রকৃত গঠন দুইটি কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ; যথা, heredity বা বংশগতি এবং environment বা পরিবেশ। ল্যামার্ক (Lamark) নামক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করিতেন যে, পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে জীবের গঠনেরও পরিবর্তন হয়, কিন্তু ওয়াইম্যান (Weismann) নামক বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার মতে জীবদেহের গঠন কখনই পরিবেশীয় পরিবর্তনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে বংশগতি অপরিবর্তনীয় হইলে নূতন প্রজাতির উদ্ভব হইত না অর্থাৎ কোনরূপ evolution বা অভিব্যক্তির প্রকাশ পাইত না। অতএব অভিব্যক্তি বলিতে variation বা প্রকারণ বুঝায়। জীবের যে সকল বংশগত প্রকারণ পরিবেশের উপযুক্ততা প্রমাণ করে, প্রকৃতি তাহাদেরই নির্বাচন করে। এই সকল উপযুক্ত জীব পরিবেশের সহিত সুষ্ঠুভাবে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলে এবং এইরূপে ক্রম নির্বাচনের দ্বারা নূতন প্রজাতি জন্মলাভ করে। অতএব অভিব্যক্তিতে প্রকারণ, নির্বাচন এবং সামঞ্জস্য বজায় থাকা বিশেষ প্রয়োজন। জীবের কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া চলাকে adaptation বা অভিযোজন বলে।

একই বংশগত জীবের নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রকারণ ঘটিয়া থাকে ; যথা—

1. **নিরন্তর অথবা অস্থির প্রকারণ** (The continuous or fluctuating variation)—এইপ্রকার প্রকারণ সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায়। একই উদ্ভিদের দুইটি একই আকৃতির পাতা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। এইরূপ প্রকারণের জন্য পরিবেশই দায়ী। অন্তঃস্থ অথবা বহিঃস্থ পরিবেশের পরিবর্তনের ফলেই এইরূপ প্রকারণ সম্ভবপর, কিন্তু ইহা বংশগতিতে অংশগ্রহণ করে না।

2. **বিচ্ছিন্ন প্রকারণ বা পরিব্যক্তি** (Discontinuous variation or Mutation)—ইহারা দৈবাৎ অথবা পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে সংঘটিত হয়। বংশগত গঠনপ্রণালীর দৈবাৎ পরিবর্তনকে mutation বা পরিব্যক্তি বলে। পরিব্যক্ত উদ্ভিদ বংশগতিতে অংশ গ্রহণ করে।

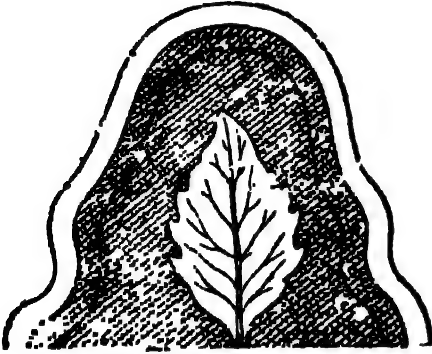
3. **সংকরণের দ্বারা প্রকারণ** (Variation due to hybridization)—সংকরণ প্রণালী দ্বারা যে জীবের বংশগতি নির্ণয় সম্ভবপর তাহা গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (Gregor Johan Mendel) নামক বিজ্ঞানী প্রথমে নিরূপণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি Genetics বা সুপ্রজননবিদ্যায় অমূল্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন।

4. **কাইমেরা** (Chimeras)—দুইটি বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে grafting বা জোড় কলম বাঁধিলে সংযোগ স্থলের ক্যালাস (callus) কলা হইতে কতকগুলি অঙ্গজ মুকুল গঠিত হইতে দেখা যায়। এই মুকুলগুলি হইতে যে শাখা উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে অঙ্গজ বিস্তার করিলে যেসকল নূতন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় তাহাদের পূর্বতন উদ্ভিদগুলির মিশ্র চরিত্র ধারণ করিতে দেখা যায় এবং ইহাদের প্রকৃত hybrid বা সংকর উদ্ভিদ বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা জন্মে। এইপ্রকারে উৎপন্ন মিশ্র চরিত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদকে কাইমেরা (chimera).

বলে। কলম না বাঁধিলেও সাধারণ উদ্ভিদের দেহকোষের (mutation) বা পরিব্যক্তি ঘটিলে সীমেরা হইতে দেখা যায়। কখনও কখনও উদ্ভিদের দেহকোষে chromosomal mutation বা ক্রোমোজোমীয় পরিব্যক্তি ঘটে এবং এইরূপ দুইটি বিভিন্ন উদ্ভিদের

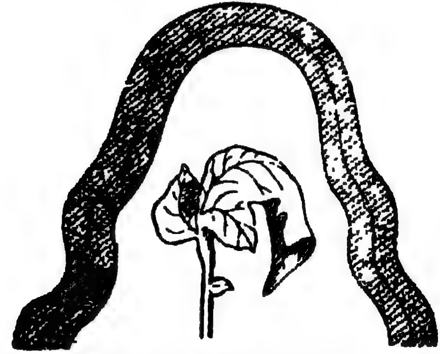

Solanum nigrum


Solanum lycopersicum


Solanum tubingense


Solanum koelreuterianum


Solanum proteus

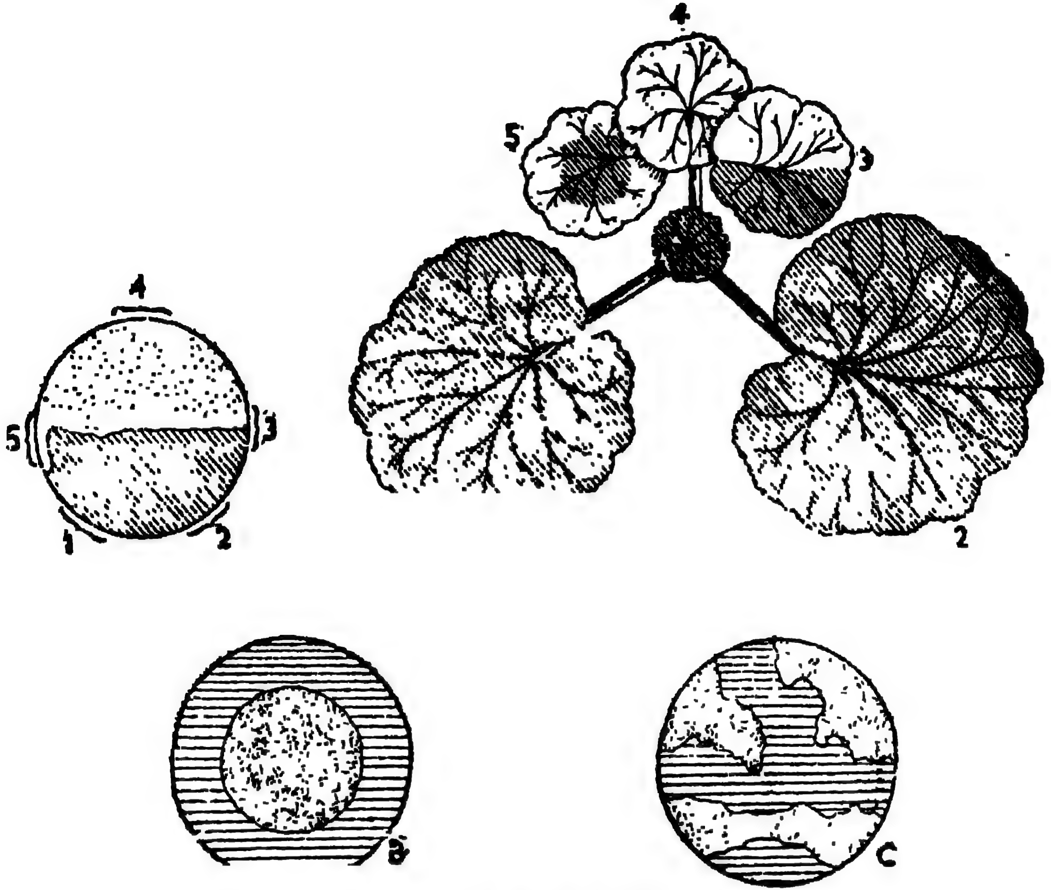

Solaaum gaertnerianum

৮৯নং চিত্র—বিভিন্ন প্রকারের সীমেরা

কোষগুলির ক্রোমোজোমের পার্থক্য থাকিলে তাহা হইতে যে সীমেরা উৎপন্ন হয় তাহাকে chromosomal chimera বা ক্রোমোজোমীয় সীমেরা বলে। এইরূপ কলা হইতে যে মুকুল গঠিত হয় তাহাকে chimeral bud mutation বা সীমেরা ঘটিত মুকুল পরিব্যক্তি বলে।

দুই-এর অধিক প্রজননসংক্রান্ত বিভিন্ন কলা হইতে যে সীমেরা গঠিত হয় তাহাকে পলিক্লিনাল সীমেরা (polyclinal chimera) বলে। দুইটি উদ্ভিদের কলাগুলি

যদি সীমেরার পৃথক এবং নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে তখন ইহাকে সেক্টোরিয়াল সীমেরা (sectorial chimera) বলে। পরন্তু যখন সীমেরার মধ্যাঞ্চলে একটি



১০ নং চিত্র—সীমেরার প্রকারণ

উদ্ভিদের কলা এবং বহির্ভাগের ত্বক অঞ্চলে অপর উদ্ভিদের কলা থাকে তখন ইহাকে পেরীক্লিনাল সীমেরা (periclinal chimera) বলে। যখন উভয় উদ্ভিদের কলা সীমেরাতে মিশ্রিত অবস্থায় অবস্থান করে তখন ইহাকে হাইপার সীমেরা (hyper-chimera) বলে।

যেহেতু কৃত্রিম প্রণালীতে উৎপন্ন সীমেরাতে পূর্বতন উদ্ভিদগুলির কলা বিদ্যমান থাকে যাহার ফলে উভয়েরই চরিত্র প্রস্ফুটিত হয় সেইজন্য ইহাকে graft hydrid বা জোড় কলমের সংকর উদ্ভিদ নামেও অভিহিত করা হয়। 1921 খ্রীষ্টাব্দে উইনক্লার (Winkler) নামক বিজ্ঞানী সোলেনাম নাইগ্রাম (*Solanum nigrum*) এবং সোলেনাম লাইকোপারসিকাম (*Solanum lycopersicum*) নামক প্রজাতিগুলির মধ্যে পরীক্ষা করিয়া এই প্রকার উদ্ভিদ উৎপাদন করেন। উইনক্লার (Winkler), জরজেনসেন (Jorgenessen) প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ এইপ্রকার সংকর উদ্ভিদের বিশদভাবে পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ইহা পূর্বতন উদ্ভিদগুলির কলার স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে এবং কোন ক্ষেত্রেই ইহাদের কোষের বা নিউক্লিয়াসের মিলন হয় না।

৯ উদ্ভিদের উন্নতিকল্পে সুপ্রজননবিদ্যার প্রয়োগ
(Application of Genetics in Plant Improvement)

সুপ্রজননবিদ্যা কেবলমাত্র তাহার প্রয়োগের দ্বারাই বিচার করা সমীচীন নহে, কারণ ইহাতে মানুষের জ্ঞাতব্য বহু তথ্যই বিদ্যমান থাকে। পরন্তু ইহার সমস্যাগুলি বহু প্রকার জৈবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত। ব্যবহারিক প্রজননবিদ্যা যদিও স্বল্পকাল হইল প্রচলিত হইয়াছে, তথাপি ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত। অধিকন্তু ইহা দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং মানুষের প্রভূত উন্নতি সাধন করে বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা অতিশয় সচেতন। আজ যাহা উৎপাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাল তাহা কৃষিবিদগণের অতি মূল্যবান তথ্যের অনুসন্ধান হিসাবে পরিগণিত হয়। সুপ্রজননবিদ্যা বিশারদ, সমাজবিজ্ঞানী, লোকহিতৈষী ব্যক্তি, জীববিদ্যার ছাত্র এবং চিকিৎসকগণের নিকট ইহা অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হয়। অতএব সুপ্রজননবিদ্যায় বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তাহার ফলিত প্রয়োগের অনুসন্ধান পাওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ—এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বংশগতি এবং অভিব্যক্তিবাদের সম্পর্কের কথাই মনে পড়ে। অভিব্যক্তিবাদ প্রধানত বংশগতির উপর নির্ভরশীল এবং বংশগতি বলিতে বংশগতির ধারা, প্রকারণ, এবং অংশত নূতন জীবের আবির্ভাব বুঝায়। Physiology বা শারীরবৃত্ত, taxonomy বা উদ্ভিদ শ্রেণীবন্ধ বিদ্যা, cytology বা কোষবিদ্যা এবং embryology বা ভ্রূণবিদ্যা প্রভৃতি জীববিদ্যার বিভিন্ন শাখায় প্রজননবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ অধিকতর স্বীকৃতি লাভ করিতেছে।

ফলিত প্রয়োগ—কৃষিকার্যে এবং মানুষের উন্নতিকল্পে প্রজননবিদ্যা বহুমুখী প্রয়োগ দেখা যায়। মানুষের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যে মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে ইহা ব্যবহৃত হয় তাহাই নহে পরন্তু ইহা মানুষের বিভিন্ন প্রকার রোগ, criminology বা অপরাধ বিজ্ঞান, sociology বা সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাস প্রভৃতির বিষয় জ্ঞানলাভ করা যায়।

প্রজননবিদ্যা ও কৃষিকার্য—মেণ্ডেলের তত্ত্ব, লিংকেজ, ক্রসিং-ওভার, পরিব্যক্তি এবং পলিপ্লয়েডী সংক্রান্ত প্রজননবিদ্যায় বিশদ জ্ঞানলাভের দ্বারা উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজনন, নির্বাচন তথা উন্নত প্রকৃতির জীবের উৎপাদন সম্ভবপর হইয়াছে। ইহার প্রয়োগে ভুট্টা, ইক্ষু, ধান পাট, টোমাটো, গম প্রভৃতি ফসলী উদ্ভিদের নূতন varieties বা প্রকার উৎপাদিত হয় যাহা ছত্রাকজনিত রাস্ট, প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ করিতে অপেক্ষাকৃত সক্ষম। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন কৃষিগবেষণাগারে ফসলী উদ্ভিদের উন্নতিকল্পে প্রজনন-সংক্রান্ত পরীক্ষাকার্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

প্রাচীনকালে মানুষ খাদ্য, পরিধান এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা মিটাইবার জন্য কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করিত। যে সকল উদ্ভিদ তাহার প্রয়োজন মিটাইত শুধু সেইগুলিই সে নির্বাচন করিত। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা,

বন্যজন্তুর আক্রমণ প্রভৃতি হইতে উহাদের রক্ষা করা তখন দুরূহ ব্যাপার ছিল। কাজেই উহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মানুষকে সদা সতর্ক থাকিতে হইত। অধিকন্তু, ফসলের গুণ, উৎপন্নের পরিমাণ প্রভৃতি প্রাথমিক জ্ঞান না থাকায় ঐসকল ফসলী উদ্ভিদ চাষ করিতে প্রভূত সময় ও শক্তি বৃথা ব্যয় করিতে হইত। এমনকি কয়েক দশক বৎসর পূর্বেও চাষের জন্য প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু বর্তমানে প্রজননবিদ্যায় জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিতে এবং অধিক পরিমাণে ফসল ফলাইতে সক্ষম হইয়াছে। অত্যল্প শ্রম এবং ব্যয়ের দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ফসল পাইতেছে এবং ইহার জন্য নানাভাবে গবেষণাকার্যও বর্তমানে চলিতেছে। এই বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ জীবের বংশবৃদ্ধি, গঠন এবং বৃদ্ধিসম্পর্কীয় প্রাকৃতিক গূঢ় তথ্য জানিতে পারিয়াছে। সে এখন বিভিন্ন জীবের জীনগুলি নিপুণভাবে যুক্ত করিতে সক্ষম এবং সহজেই পরিব্যাপ্তি প্রবৃত্ত করিতে, পলিপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন করিতে ও নূতন ধরনের উন্নত প্রকৃতির উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করিতে পারে।

সুপ্রজননবিদ্যার প্রয়োগে গবেষণালব্ধ যে-সকল উন্নত প্রকৃতির উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভবপর হইয়াছে তাহাদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ; যথা —

নূতন উদ্ভিদ উৎপাদনে পরিব্যাপ্তি বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে সম্ভবত প্রাকৃতিক পরিব্যাপ্তির ফলে মাদ্রাজের G E B-24 নামক একপ্রকার উন্নত জাতের ধান উৎপাদিত হইয়াছে। রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে প্রবৃত্ত পরিব্যাপ্তির দ্বারা উন্নত প্রকৃতির পাট উৎপাদনের জন্য গবেষণা-কায চলিতেছে।

ধান, গম, তুলা, ইক্ষু, ছোলা, আপেল, টোমাটো প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় ফসলী উদ্ভিদ প্রকৃতিগত উন্নততর পলিপ্লয়েড রূপে দেখা যায়। প্রজনবিদ্যা-বিশারদগণ কৃত্রিম সংশ্লেষ প্রণালীতে র‍্যাফানো-ব্রাসিকা, (*Raphano-brassica*) ব্রাসিকা জুনসিয়া (*Brassica juncea*) প্রভৃতি উন্নত প্রকৃতির উদ্ভিদ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বর্তমানে রঞ্জনরশ্মি, কলচিসীন প্রভৃতির প্রয়োগে বিভিন্ন উদ্ভিদের পরিবৃত্তি প্রবৃত্ত করিতে প্রচেষ্টা চলিতেছে। ক্রোমোজোম আধিক্য হইলে কখনও কখনও উদ্ভিদকে বিশাল আকৃতি-বিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। হ্যাগারআপ (Hagerup), ফ্লভিক (Flovik) প্রভৃতি বিজ্ঞানিগণের মতে, এইরূপ ক্রোমোজোমের আধিক্যের ফলে কোনো কোনো উদ্ভিদ চরম আবহাওযাপূর্ণ স্থানে জন্মাইবার ক্ষমতা লাভ করে। পলিপ্লয়েডী এবং প্রজননের মিলিত ক্রিয়ার দ্বারা আলু, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি রোগ-প্রতিরোধক প্রজাতি উৎপাদন করা সম্ভবপর হইয়াছে। আলু, ইক্ষু এবং কোনো কোনো মনোরম ফুলের গাছ যাহাদের কাণ্ড, পাতা, মূল প্রভৃতি অঙ্গজ অংশগুলি কেবল মানুষের প্রয়োজনীয়তায় ব্যবহৃত হয় তাহাদের পলিপ্লয়েডী প্রবৃত্ত করিয়া বৃহৎ আকারের করা যায় এবং উহাদের বহু প্রকারণও পাওয়া যায়। এইরূপে ইক্ষু, জোয়ার প্রভৃতি উন্নত প্রকৃতির পলিপ্লয়েড পাওয়া গিয়াছে। ফসলী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে Pure line selection বা শুদ্ধ পন্থায় নির্বাচন দ্বারাও সুফল পাওয়া গিয়াছে। বহু প্রকার উন্নত জাতের ধান, তুলা প্রভৃতি এই প্রক্রিয়ার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। ভ্যাভিলভ (Vavilov) নামক

একজন রুশদেশীয় বিজ্ঞানী তাঁহার সমকর্মীগণের সাথে এই বিষয়ে প্রচুর অনুসন্ধানকার্য চালাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পেরুদেশীয় এক প্রকার আলুর প্রজাতি ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করিতে সক্ষম ; আবার মেক্সিকোদেশীয় আলুর অপর একটি প্রজাতি ছত্রাক-জনিত ধ্বসা রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জন করে। সম্প্রতি ইক্ষু ও জোয়ার, এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক গণের মধ্যে প্রজনন প্রক্রিয়ায় উন্নত প্রকৃতির উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। এইরূপে বিভিন্ন ধানের প্রজাতির মধ্যে প্রজনন প্রক্রিয়ার দ্বারা উন্নত প্রকৃতির ধান কৃতকার্যের সহিত উৎপাদিত হইয়াছে।

প্রতি বৎসর বিভিন্ন রোগের আক্রমণে বহু প্রয়োজনীয় উদ্ভিদই বিনষ্ট হয়। রোগ-প্রতিরোধক ঔষধ বা তৎসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি বহুক্ষেত্রেই দরিদ্র কৃষকগণ কর্তৃক সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক প্রজনন প্রক্রিয়ায় রোগ-প্রতিরোধক উদ্ভিদ উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলিতেছে এবং বহুক্ষেত্রে তাঁহারা কৃতকার্য হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ধান, গম, জোয়ার, বার্লি, তিসি, চীনাবাদাম, নারিকেল, পাট, তুলা, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি বহু রোগ-প্রতিরোধক উদ্ভিদ এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রজননবিদ্যা ও মানুষ—কখনও কখনও মানুষের বহুপ্রকার বংশগত ত্রুটি দেখা যায়। প্রজননবিদ্যার সাহায্যে ঐসকল ত্রুটির প্রতিকার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইয়াছে। রক্তকণিকায় বিভিন্ন জীনগোষ্ঠীর প্রকৃতি আবিষ্কৃত হওয়ায় মানুষের পক্ষে রক্তদান করার সুবিধা হইয়াছে। ইহাও আজ অবিদিত নহে যে যৌন লিঙ্গজঘটিত চরিত্র মানুষের বহুপ্রকার বংশগত ত্রুটির কারণ। এইরূপে সুপ্রজননবিদ্যায় জ্ঞানলাভ করিলে কেবলমাত্র যে মানুষের বহুপ্রকার বংশগত ত্রুটিগুলিই নির্ণয় করা যায় তাহাই নহে পরন্তু বিবাহের মাধ্যমে উহাদের বিস্তার প্রতিরোধ করিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ-সাধন করা যায়।


উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যা

১ উদ্ভিদ প্রজননের লক্ষ্য

(Aims of Plant Breeding)

বর্তমানে আমাদের এই বিশ্বে, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সকল দেশের কাছেই খাদ্য উৎপাদন একটি বিশেষ এবং প্রধান সমস্যা। অত্যন্ত দ্রুত হারে বর্ধিত জনসংখ্যার সহিত সমতা রাখিয়া খাদ্য উৎপাদনের হারও সমাংক বৃদ্ধি করা আগামী বৎসরসমূহের একটি অত্যাবশ্যক কর্ম। তবে, শুধুমাত্র খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিলেই চলিবে না তাহার সহিত উৎপন্ন খাদ্য শস্যের পুষ্টিগত উন্নতি বিধানের দিকেও যথেষ্ট মনোনিবেশ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সেই সকল উদ্ভিদ প্রকারণ সংগ্রহ করিতে বা চাষ করিতে হইবে যাহাদের মধ্যে প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বেশী এবং সেই সঙ্গে গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদনও বৃদ্ধি করিতে হইবে। কারণ, ঐ সকল প্রাণী মানুষের খাদ্যের একটি বড় অংশ অধিকার করিয়া আছে। খাদ্য বস্তু ছাড়া অন্যান্য বস্তুসমূহ যাহা আমাদের স্বাভাবিক জীবন-যাপনের জন্য অপরিহার্য, যেমন, আঁশ বা তন্তু (তুলা, পাট ইত্যাদি), কাঠ ও অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি আজিকের এই পৃথিবীতে অত্যাবশ্যকীয় কার্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি শুধুমাত্র চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না ; এই বৃদ্ধি আরও যে কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলি হইল যথাক্রমে, জল, সার, কীট-পতঙ্গ, জীবাণু বা ছত্রাকের আক্রমণ রোধ এবং উন্নত মানের শস্য-প্রকার (crop variety)। প্রথম তিনটির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ বা উন্নত পরিবেশীয় ব্যবস্থা, কিন্তু চতুর্থ বিষয় অর্থাৎ উন্নত মানের শস্য-প্রকারের জন্য প্রয়োজন উন্নত মানের বংশগত চরিত্র-যুক্ত উদ্ভিদ প্রকারের। উন্নত মানের বংশগত চরিত্রযুক্ত প্রকার সংগ্রহ করা বা সৃষ্টি করাই উদ্ভিদ প্রজননবিদগণের প্রধান কার্য।

সার্থক উদ্ভিদ প্রজননবিদ হইতে হইলে নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকিতে হইবে—

(ক) তাঁহাকে একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী হইতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহাকে উদ্ভিদের শ্রেণী বিন্যাস, অঙ্গসংস্থান, জনন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সার্থকরূপে জানিতে হইবে।

(খ) কোষ তত্ত্ব ও সুপ্রজনন তত্ত্ব সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা রাখিতে হইবে।

(গ) উদ্ভিদের শরীর-বৃত্তীয় জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে।

(ঘ) কীট-পতঙ্গের বিষয়েও তাঁহাকে একজন বিশেষজ্ঞ হইতে হইবে।

(ঙ) জীব সম্পর্কিত রসায়ন বিদ্যা (প্রাণ রসায়ন) সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে।

(চ) পরিসংখ্যান বিষয়ে সুপণ্ডিত হইতে হইবে।

(ছ) চাষ-বাস সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষজ্ঞ হইতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, চাষীদের চাহিদা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত থাকিতে হইবে।।

উপরিউক্ত বিজ্ঞান বিষয়গুলি উদ্ভিদ প্রজননবিদদের কার্য করিবার যন্ত্র স্বরূপ এবং

"প্রাণরস" (germ plasm) তাহাদের "কাঁচামাল"। প্রজননবিদ তাঁহার বিজ্ঞান বিষয়ক লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা ঐ কাঁচামাল হইতে নূতন এবং উন্নত মানের উদ্ভিদ প্রকার সৃষ্টি করেন।

উদ্ভিদ প্রজননের লক্ষ্য (Aim of Plant Breeding)—উদ্ভিদ প্রজনন বলিতে প্রধানত অর্থনৈতিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের বংশপরম্পরাক্রমে প্রবাহিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদির উন্নতিসাধন করা এবং বিদ্যমান উদ্ভিদগুলি হইতে সামগ্রিকভাবে উন্নত ধরনের উদ্ভিদ প্রকার সৃষ্টি করাকে বুঝায়। উদ্ভিদ প্রজননের প্রাথমিক লক্ষ্যগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

(ক) বিভিন্ন উদ্ভিদজাত দ্রব্যের যেমন, শস্যদানা, তৈলবীজ, তন্তু, গবাদি পশুর খাদ্য-বস্তু ইত্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

(খ) শাক-সবজী, ফুল, ফল ও বীজের আকৃতি, গঠন, বর্ণ, স্বাদ, পুষ্টি, সঞ্চয় করা, উর্বরতা ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতিসাধন করা। ইহা ছাড়া কোন কোন বিষয়ে যেমন, আখ গাছের শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করা, তুলোর আঁশ সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ করা, কলাই বা ডালের মধ্যে প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ইত্যাদি প্রজননবিদগণের বিশেষ লক্ষ্য থাকে।

(গ) উদ্ভিদের এইরূপ প্রকার সৃষ্টি করা যাহারা নানা প্রকার রোগের আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে ; অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ্য প্রকার সৃষ্টি করা। শুধু তাহাই নহে, পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গের আক্রমণ হইতেও আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা, খরা অথবা অতি বৃষ্টি সহ্য করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন নূতন প্রকার সৃষ্টি করা ইত্যাদি উদ্ভিদ প্রজননবিদগণের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য থাকে।

(ঘ) মৃত্তিকার বিভিন্ন অবস্থা, যেমন, ক্ষারীয়, অম্ল, বা লবণাক্ত, সহ্য করার ক্ষমতা অথবা মানিয়া নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করা বা বৃদ্ধি করা।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশকে সহজেই মানাইয়া লইতে পারে এইরূপ উদ্ভিদ প্রকার সৃষ্টি করা।

(ঙ) প্রয়োজন অনুসারে উদ্ভিদের পরিণত অবস্থা প্রাপ্তির সময়, অর্থাৎ ফুল ও ফল ধারণের সময় বাড়াইয়া তোলা অথবা কমাইয়া আনা।

(চ) উদ্ভিদের বৃদ্ধির ধরনের পরিবর্তন করা, অর্থাৎ খর্বতা অথবা দীর্ঘতা। প্রয়োজন অনুসারে উদ্ভিদের বৃদ্ধি রোধ করা যাহাতে ঝোড়ো বাতাসে অথবা মঞ্জরী বা শীষের ভারে কাণ্ড নুইয়া পড়ে, শস্যহানি হইতে না পারে ; উদ্ভিদের শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি করা বা কামান ; বহু শীর্ষ সমেত কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা যাহাতে গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য খড় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

(ছ) ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে এইরূপ 'প্রকার' সৃষ্টি করা।

(জ) যান্ত্রিক উপায়ে চাষ করিবার এবং ফসল কাটায় উপযোগী উদ্ভিদ প্রকার সৃষ্টি করা।

উদ্ভিদ প্রজনন কেন্দ্র এবং শস্যসমূহের গুণগত মানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির কয়েকটি নিদর্শন :

উদ্ভিদ প্রজননের দ্বারা তাহার সামগ্রিক মানের উন্নতিসাধন করা হইয়াছে এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

1912 খ্রীষ্টাব্দে কোয়েম্বাটোরে (Coimbatore) আখ প্রজন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ কেন্দ্রে Dr. C. A. Barber এবং তাঁহার পরবর্তী বিজ্ঞানী Dr. T. S. Venkatraman এবং অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ আখের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংকর জনন সম্পন্ন করিয়া এমন একটি প্রকার সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে শর্করার পরিমাণ অন্যান্য প্রকারের তুলনায় অধিক এবং উহা উত্তর ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ সহজেই মানাইয়া লইতে পারিয়াছে। কোয়েম্বাটোরের আখ প্রজন কেন্দ্রে উৎপন্ন আখের ঐ নূতন প্রকারটি বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে চাষ করা হইতেছে। স্যাকারাম বারবেরিস (*Saccharum barberis*) যাহা উত্তর ভারতের স্থানীয় একটি প্রজাতি, সেখানকার পরিবেশে ভালভাবেই জন্মাইতে পারে। কিন্তু তাহার শর্করার পরিমাণ খুবই অল্প। আর একটি প্রজাতি স্যাকারাম অফিসিনেরাম (*Saccharum officinarum*) যদিও ইহার শর্করার পরিমাণ অন্য প্রজাতি হইতে অধিক কিন্তু উত্তর ভারতের মৃত্তিকায় ও আবহাওয়ায় তাহার বৃদ্ধি ভাল হয় না। এই দুইটি প্রজাতি ও আরও একটি স্বাভাবিক প্রজাতির (wild species) মধ্যে সংকরণ প্রক্রিয়া সংঘটিত করিয়া বর্তমান উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির সৃষ্টি করা হইয়াছে।

রাস্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসহ উচ্চ ফলনশীল গম গাছের প্রকার তৈরী করিবার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা আজ ভারতের বিভিন্ন গম প্রজন প্রতিষ্ঠানে চলিয়াছে। ইহার ফলে বহু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসহ উচ্চ ফলনশীল গমের প্রকার সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ প্রচেষ্টার (রাস্ট রোগ প্রতিরোধকারী প্রকার সৃষ্টি) প্রথম সূচনা হয় 1943 সনে সিমলায়। বিহারের পুসা (pusa), দিল্লীর নিকট নব পুসা (New pusa) যাহার বর্তমান নাম ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র (Indian Agricultural Research Institute) পাঞ্জাব ইত্যাদি স্থানে গম প্রজন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে গম প্রজননের প্রধান লক্ষ্যগুলি হইল, (১) উৎপাদন বৃদ্ধি, (২) পরিপক্কতার সময় হ্রাস, (৩) কাণ্ডের দৃঢ়তা, (৪) খরা সহ্য করিবার ক্ষমতা, (৫) রোগ প্রতিরোধ, (৬) কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধ এবং (৭) সাধারণ মানের উন্নয়ন। উন্নত কয়েকটি গমের প্রকার হইল, N. P. 165, N. P. 771, C 591, N. P. 770 ইত্যাদি।

সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (Central Rice Research Institute) কটকে অবস্থিত। ইহা ভারত সরকার কর্তৃক 1946 সনে স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হইল ভারতে সকল প্রকার ধানের ফলন বৃদ্ধি এবং এই উদ্দেশ্যে সুপ্রজনন, রোগ প্রতিকার, কীট-পতঙ্গের আক্রমণ ইত্যাদি সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়। এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চাষযোগ্য ও স্বাভাবিক

(wild type) ধানের নমুনা রক্ষিত আছে। সারা ভারত সংযুক্ত ধানের উন্নতি প্রকল্প (All India Coordinated Rice Improvement Project) 1965 সনে কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপন করিয়াছেন। উহার উদ্দেশ্য হইল ভারতের বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক যে সকল গবেষণাকেন্দ্র আছে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপন করা, বিভিন্ন তথ্যাদি এবং প্রজনের প্রয়োজনে নমুনা প্রকার আদান-প্রদানের দ্বারা কার্যের দ্রুতগতি আনয়ন করা। পশ্চিমবঙ্গের চুঁচুড়ায় একটি ধান গবেষণা কেন্দ্র আছে (Rice Research Institute)। সেখানে বহু উচ্চ ফলনশীল ধরনের প্রকার, সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে।

তন্তু হিসাবে পাট, তুলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পাটের আঁশ বা তন্তুর উন্নতির প্রচেষ্টা 1904 খ্রীষ্টাব্দ হইতে শুরু হইয়াছে। তদানীন্তন বাংলার কৃষি বিভাগ Mr. R S Finlow নামক একজন তন্তুবিদকে এই কার্যের জন্য নিয়োগ করিয়াছিল। Chinsurah green (*C. olitorius*) এবং D15 (*C. capsularis*) তাঁহারই উৎপাদিত দুইটি উচ্চ ফলন যুক্ত প্রকার। ইহার পর 1935 সনে ভারত সরকার কেন্দ্রীয় জুট কমিটি এবং ঢাকায় Jute Agricultural Research Laboratory গঠন করেন। ভারত বিভাগের পর নূতনভাবে Jute Agricultural Research Institute 1948 সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। 1955 সনে উহা পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে (নীলগঞ্জ) স্থানান্তরিত হয়। সম্প্রতিকালে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বিভিন্ন পাট উৎপাদনকারী দেশে, আসাম, বিহার, ওড়িশা এবং উত্তর প্রদেশ, পাটের উন্নতি বিধানের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। Jute Agricultural Institute কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নতমানের পাটের নাম JRC অক্ষর এবং তাহার পার্শ্বে কয়েকটি সংখ্যা যেমন, JRC 206 দ্বারা সূচিত করা হয় (Jute Research Capsularis) এবং olitorius প্রজাতির ক্ষেত্রে JRO এবং কয়েকটি সংখ্যা যেমন, JRO, 632, JRO 7835 দ্বারা সূচিত করা হয়।

প্রকারণ—উদ্ভিদ প্রজনের ভিত্তিস্বরূপ (Variation—The basis of Plant Breeding)

একই প্রজাতির দুইটি উদ্ভিদ কখনও এক প্রকার দেখিতে হয় না। প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চারিত্রিক মিল, যেমন, পাতার আকৃতি বা গঠন, পত্রবিন্যাস, মঞ্জরী, ফুলের আকৃতি, গঠন ইত্যাদি অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিলে উহাদের মধ্যে বহু তফাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে। গাছের উচ্চতা, পরিণতি প্রাপ্তির সময়, বীজত্বকের বর্ণ, আকৃতি, শাঁসের মধ্যে শর্করার পরিমাণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, পাপড়ির বর্ণ, এবং আরও অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উহারা পরস্পর হইতে তফাৎ হইবে। এইরূপ চারিত্রিক ভিন্নরূপ হওয়াকেই পরিবর্তনশীলতা বা প্রকারণ (variation) বলা হয়। উদ্ভিদের মধ্যে দুই প্রকার প্রকারণ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, (ক) পরিবেশীয় প্রকারণ বা পরিবেশের প্রভাবজনিত পরিবর্তনশীলতা

(variations due to environment) এবং (খ) বংশগত প্রকারণ বা বংশগতিজনিত পরিবর্তনশীলতা (variations due to heredity)।

পরিবেশীয় প্রকারণ (Environmental variation)—পরিবেশের প্রভাবে চারিত্রিক পরিবর্তন বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয় না। সুতরাং তাহাদের প্রজনন প্রক্রিয়ায় কোন গুরুত্ব থাকে না। উপযুক্ত সার ও অন্যান্য উপাদান পাইয়া কোন মৃত্তিকায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও তেজ বর্ধিত হইতে পারে, অপরদিকে একই উদ্ভিদ কোন কিছু উপাদানের অভাবে চারিত্রিক দুর্বলতা প্রদর্শন করিতে পারে। সুতরাং শুধুমাত্র চারিত্রিক পরিবর্তন দেখিয়া ইহা বলা যাইবে না উহা উন্নতমানের অথবা নিম্নমানের জিনোটাইপের জন্য ঘটিয়াছে।

বংশগত প্রকারণ (Hereditary variation)—বংশগত প্রকারণের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ পরস্পর হইতে জীনসম্বন্ধীয় বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন থাকে। একই পরিবেশে এবং অবস্থার মধ্যে জন্মাইয়া কোন কোন প্রজাতি বা প্রকারের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বংশগত প্রকারণ সেই উদ্ভিদটির সকল বংশধরের মধ্যেই প্রকাশিত হইতে পারে। বীজের গঠন, বীজত্বকের বর্ণ ফুলের বর্ণ শস্যশূলের (awn) উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত এবং শস্যের ধান ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশগত প্রকারণের ফলে আবির্ভূত হইতে পারে। বংশগত প্রকারণ প্রধানত পরিব্যক্তি, সংকরণ প্রক্রিয়া, জীনের পুনর্মিশ্রণ, পলিপ্লয়েডী অথবা জীনের অবস্থান জনিত কারণে সৃষ্টি হইতে পারে।

২

উদ্ভিদ প্রজনের উপায়সমূহ

(Methods of Plant Breeding)

দলগত বা সমষ্টিগতভাবে (quantitative) গুণাবলীর বংশগতির প্রতি উদ্ভিদ ও প্রাণী-প্রজনবিদগণের আকর্ষণ মেণ্ডেলের বহুপূর্ব হইতেই ছিল, আজ হইতে শত শত বৎসর পূর্বে এমনকি হাজার বৎসর পূর্বেও এই সমষ্টিগত চারিত্রিক গুণাবলী সম্বন্ধে মানুষের অনুসন্ধিৎসা প্রবল ছিল। এই অনুসন্ধিৎসা এবং অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান পরবর্তীকালে সুপ্রজনবিদ্যায় অন্তঃপ্রজন (interbreeding) এবং নির্বাচনের (selection) মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সংকর জনন রীতি অনুসারে সমগ্র প্রজন ব্যবস্থাকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়, যেমন অন্তঃপ্রজন (interbreeding) এবং বহিঃপ্রজন (out breeding)। মনুষ্য সমাজে ভাই-বোন বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলে অন্তঃপ্রজন সম্ভব হইত। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে এবং উদ্ভিদের মধ্যে এইরূপ সম্ভব হয়। স্বপরাগী উদ্ভিদ (self reproducing plants) অন্তঃপ্রজনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক যতদূর হইবে তাহা ততই বহিঃপ্রজনের দিকে অগ্রসর হইবে। অর্থাৎ বহিঃপ্রজনের ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কোন নিকট সম্পর্ক থাকে না। ক্রমাগত অন্তপ্রজনের ফলে (উদ্ভিদের ক্ষেত্রে স্বপরাগযোগে যে প্রজন ক্রিয়া) যে বংশধারা সৃষ্টি হয় তাহাকে "সহজাত বংশধারা" (inbreed line) বলে। ক্রমাগত অন্তঃপ্রজনের ফলে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গুণগত উৎকর্ষতা হ্রাস পায় (interbreeding or inbreeding degeneration)।

জননের বৈশিষ্ট্য অনুসারে উদ্ভিদকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা, (ক) স্বপরাগী উদ্ভিদ, (খ) ইতরপরাগী উদ্ভিদ এবং (গ) অঙ্গজ জননকারী উদ্ভিদ। স্বপরাগী উদ্ভিদ ক্রমাগত সহজাত প্রজনের ফলে অধিকাংশ চরিত্রে হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকে। স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যক্তির ফলে কোন অনাকাঙ্খিত চরিত্র আবির্ভূত হইলে তাহা পরবর্তী বংশে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ফলে চারিত্রিক অবনতি পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং স্বপরাগী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নির্বাচন (selcetion) এবং সংকরণ এই দুই প্রক্রিয়ার মুখ্য ভূমিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইতরপরাগী উদ্ভিদে যেহেতু বাহির হইতে পরাগরেণু আসিয়া বীজ উৎপন্ন হয় সুতরাং ঐ ক্ষেত্রে বিভিন্ন জীনোমের সংমিশ্রণ সম্ভব হয় এবং তাহার ফলে চারিত্রিক গুণাবলীর যথেষ্ট পরিবর্তনশীলতা লক্ষিত হয়। সুতরাং স্বপরাগী উদ্ভিদের ন্যায় এখানেও নির্বাচন একটি উপায় এবং স্বতস্ফূর্তভাবে ছাড়া কৃত্রিম উপায়ে আরও পরিবর্তনশীলতা অথবা অন্যান্য গুণাবলী যুক্ত করিবার জন্য সংকরণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়।

যে সকল উদ্ভিদ অঙ্গজ জননের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে অথবা যাহাদের একমাত্র অঙ্গজ জননের সাহায্যেই পালন করা হয় তাহাদের উন্নতির জন্য যে-সকল অঙ্গ জনন কার্যে অংশ গ্রহণ করে, যেমন ঊর্ধ্বধাবক, স্ফীতকন্দ, শাখা ইত্যাদি তাহাদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত এবং উৎসাহব্যঞ্জক পরিবর্তনশীলতা লক্ষিত হইলে সেই সকল অঙ্গগুলিকে পরবর্তী বংশধারার জন্য নির্বাচন করা হয়। ইহাই এই প্রকার উদ্ভিদের ক্ষেত্রে একমাত্র সফল পদ্ধতি। কোন কোন ক্ষেত্রে সংকরণ পদ্ধতিও অবলম্বন করা হয়।

উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলি ছাড়া সাম্প্রতিককালে উদ্ভিদ প্রজনবিদগণ আরও দুইটি পদ্ধতি প্রয়োগ করেন তাহা হইল পলিপ্লয়েডী প্রজন এবং পরিব্যক্তি প্রজন। উদ্ভিদের সামগ্রিক উন্নতি সাধনের জন্য উদ্ভিদ প্রজনবিদগণ যে-সকল উপায় অবলম্বন করেন তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল ঃ

(ক) নূতন প্রজাতি আনয়ন এবং নূতন জলবায়ু সহ্য করিতে অভ্যস্ত করান (Introduction and Acclimatization)।

(খ) নির্বাচন (Selection)।

(গ) সংকরণ প্রক্রিয়া (Hybridization)।

(ঘ) পলিপ্লয়েডী প্রজন (Polyploidy breeding)।

(ঙ) পরিব্যক্তি প্রজন (Mutation breeding)।

(ক) নূতন প্রজাতি আনয়ন এবং নূতন জলবায়ু সহ্য করিতে অভ্যস্ত করান (Introduction and Acclimatization)—বর্তমানে যে সকল শস্যাদি আমাদের দেশে চাষ করা হয় তাহাদের অনেকেই আমাদের দেশীয় উদ্ভিদ নয়। উহাদের অনেকের উৎপত্তি বিদেশে। আবার, এরূপ অনেক শস্য আছে যাহাদের পূর্ব ইতিহাস অর্থাৎ তাহাদের উৎপত্তিস্থল প্রকৃত পক্ষে কোথায় ছিল তাহার সঠিক বৃত্তান্ত কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে। এইরূপ শস্যগুলি হইল, ধান, গম, বার্লি, পাট, কলাই, আখ, এবং জোয়ার (sorgum) ইত্যাদি। কয়েক প্রকার শস্য, যেমন, ভুট্টা, তামাক, আলু এবং তুলার কয়েকটি প্রজাতি যাহাদের বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়, তাহাদের উৎপত্তিস্থল আমেরিকা। সাম্প্রতিকালের চাষের জন্য উহাদের ঐসব অঞ্চলে আনা হইয়াছে। স্থানীয় কোন প্রজাতির সামগ্রিক উন্নতি সাধনের জন্য অন্য কোন দেশ হইতে নূতন প্রজাতি অথবা প্রকার আনয়ন (introduction) করা হইয়া থাকে। সাধারণত উন্নতমানের জার্মপ্লাজম (germplasm) সংগ্রহ করাই এইরূপ "আনয়নের" মুখ্য উদ্দেশ্য।

যখন কোন নূতন প্রজাতি অথবা প্রকার প্রজননের উদ্দেশ্যে কোন স্থানে লইয়া যাওয়া হয় বা নিয়ে আসা হয়, তাহা সেই স্থানের জলবায়ুর উপযোগী নাও হইতে পারে। স্থানীয় উদ্ভিদ বলিতে সেই সকল উদ্ভিদকে বোঝায় যাহারা সেই অঞ্চলের জলবায়ু বা পরিবেশে স্বাভাবিকরূপে জন্মাইতে পারে। সুতরাং নূতন আমদানী করা উদ্ভিজ্জ প্রকারটিকে প্রথমে সেই অঞ্চলের পরিবেশের সহিত মানাইয়া লইতে বা পরিবেশ সহ্য করিতে অভ্যস্ত করাইতে হইবে এবং তাহার ফলেই প্রজন ইত্যাদি পরীক্ষা সম্পন্ন

করিতে পারা যাইবে। সাধারণভাবে দেখা গিয়াছে, যে কোন নূতন আমদানী করা প্রকার বা প্রজাতি প্রথম প্রথম স্থানীয় আবহাওয়ার সহিত মানাইতে না পারিলেও ধীরে ধীরে কয়েকটি বংশের পর মানাইয়া লয়। স্বপরাগী উদ্ভিদের তুলনায় ইতর-পরাগী উদ্ভিদ নূতন কোন অঞ্চলের আবহাওয়ার সহিত সহজেই নিজেকে মানাইয়া লয়। কারণ, ইতর-পরাগযোগ নূতন জীনের মিশ্রণ সম্ভব করে। সুতরাং আবহাওয়ার উপযোগী জীন মিশ্রিত হইয়া শীঘ্রই স্থানীয় জলবায়ু সহ্য হইয়া যায়। বিভিন্ন জীনের মিশ্রণে যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহাতে নূতন আবহাওয়া মানাইয়া লওয়া সহজতর হয়।

(খ) নির্বাচন (Selection)—প্রাথমিকভাবে উদ্ভিদ প্রজনন বা উদ্ভিদের উন্নতিসাধন নির্বাচনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। প্রত্যেকটি উদ্ভিদকে প্রাকৃতির নির্বাচনের সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু শস্যাদি উদ্ভিদসমূহ প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়াও আরও একটি নির্বাচনের সম্মুখীন হয়, তাহা মানুষের দ্বারা কৃত কৃত্রিম নির্বাচন। বহু বৎসর ধরিয়া মানুষ তাহাদের প্রয়োজনীয় উদ্ভিদের মধ্যে যখনই কোন আকাঙ্ক্ষিত বংশগত প্রকারণ দেখিতে পাইয়াছে তাহাদের নির্বাচিত করিয়া পালন করিয়া আসিতেছে। সুতরাং কৃষিকার্যে ব্যবহৃত উদ্ভিদসমূহ দুইপ্রকার পরিবেশের মধ্যে থাকে; প্রথম প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং দ্বিতীয় কৃত্রিম পরিবেশ, যাহা মানুষ নিজ প্রয়োজনে সৃষ্টি করে। এইরূপে দুইপ্রকার নির্বাচনের মাধ্যমে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত উদ্ভিদসমূহের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে।

আধুনিক প্রজনন প্রণালীতে উদ্ভিদের প্রকার নির্বাচন অত্যন্ত জটিল পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। নিম্নে তিনপ্রকার নির্বাচন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল:

(ক) দলবদ্ধভাবে নির্বাচন (Mass selection)—দলবদ্ধভাবে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহা হইল সরাসরি বহুবীজের মধ্য হইতে যেগুলি আপাত দৃষ্টিতে খারাপ বা রোগগ্রস্ত বলিয়া বোধ হয় তাহাদের বাতিল করিয়া অবশিষ্ট বীজগুলি সংগ্রহ করা; অথবা ক্ষেতের মধ্যে বহু উদ্ভিদের মধ্য হইতে যাহাদের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অথবা হীনতর বলিয়া বোধ হয় তাহাদের সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া অবশিষ্ট উদ্ভিদগুলিকে রক্ষা করা বা তাহাদের মধ্য হইতে বীজ সংগ্রহ করা।

কোন কোন ক্ষেত্রে দলবদ্ধভাবে নির্বাচন যথেষ্ট দ্রুততার সহিত মোটামুটি ভাল ফল পাওয়া যায়, কিন্তু এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হইল যে, স্বতস্ফূর্তভাবে এবং ধীর গতিতে যে চারিত্রিক পরিবর্তন আসে তাহা কোন ক্রমেই বুঝিতে পারা যায় না। শুধু তাহাই নহে, দলবদ্ধভাবে নির্বাচন পদ্ধতির কোন পরীক্ষামূলক নিয়ন্ত্রণ না থাকায় চরিত্রের গুণগত মানের অবনতির মূল কারণ জানিতে পারা যায় না। অর্থাৎ সেই অবনতি কিসের জন্য হইয়াছে - পরিবেশীয় কোন কারণে অথবা বংশগত জীন পরিব্যক্তির জন্য অথবা অন্য কোন কারণে তাহা বুঝিবার কোন উপায় থাকে না। অন্যদিকে আবার, স্বাভাবিক পরাগ সংযোগের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় অনাকাঙ্ক্ষিত পরাগরেণু আসিয়া নির্বাচিত উদ্ভিদসমূহের চারিত্রিক অবনতি ঘটায়।

(২) বংশ পরিচয়গত নির্বাচন (Pedigree selection)—দলবদ্ধভাবে নির্বাচনের অসুবিধাগুলি বহুলাংশে বংশ পরিচয়গত নির্বাচনের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব হয়। এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিবেশীয় প্রকারণের সহিত বংশগত প্রকারণের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। বংশ পরিচয়গত নির্বাচনের সময় প্রতিটি উদ্ভিদ ও তাহাদের বংশধরদের বিশেষরূপে পরীক্ষা ও প্রজননের উদ্দেশ্যে পৃথক করিয়া রাখা হয়। প্রতিটি উদ্ভিদের যে বংশধারা সৃষ্টি হয় তাহাকে "বংশ পরিচয় সম্পন্ন ধারা" (pedigreed line) বলে। এইরূপ বিভিন্ন "বংশ পরিচয় সম্পন্ন ধারা"-গুলি হইতে তুলনামূলকভাবে উন্নত মানের প্রকার নির্বাচন করাকেই বংশ পরিচয়গত নির্বাচন (pedigree selection) বলা হয়।

বংশ পরিচয়গত নির্বাচন প্রধানত স্বপরাগী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বহুল পরিমাণে কৃতকার্য হওয়া গিয়াছে। এইপ্রকার নির্বাচনের শুরুতে প্রথমে কোন একটি বিশেষ প্রজাতির বিভিন্ন শুদ্ধ বংশধারাকে নির্বাচন করিয়া পৃথকভাবে রক্ষণা-বেক্ষণ করা হয় (isolation)। ইহার পর প্রজননবিদগণ ঐ সকল বিভিন্ন শুদ্ধ ধারার উদ্ভিদগুলি লইয়া নানাভাবে পরীক্ষা করেন। প্রচলিত উদ্ভিদ প্রকার হইতে এই সকল শুদ্ধ ধারার মধ্যে কোন একটি উন্নত ধরনের কিনা তাহা জানিবার জন্যই এই সকল পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। আপাতই যত সহজ বিবরাটি বর্ণনা করা হইল প্রকৃতপক্ষে তাহা অত সহজ নয়, কারণ উন্নত মান নির্বাচনের জন্য যে সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা হয় তাহার পার্থক্য এতই সামান্য থাকে যে তাহার উৎকর্ষতা প্রমাণ করা খুবই দুরূহ কার্য। শুধু তাহাই নহে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তাহা কিরূপ কার্যকরী হইবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া তবেই প্রজননবিদকে মতামত প্রকাশ করিতে হয়।

উদাহরণস্বরূপ জই (Oat) প্রজননের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে নূতন বংশধারা শুরু হয় একটি মঞ্জরী হইতে প্রাপ্ত বীজ হইতে। প্রাথমিক নির্বাচনের পর 2 হইতে 3 অথবা আরও বেশী বছর ধরিয়া উৎপাদনের হার, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, কাণ্ডের দৃঢ়তা এবং অন্যান্য চারিত্রগুলি নিরিক্ষণ করা হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই পূর্বেকার বংশ এবং বিভিন্ন শুদ্ধ বংশধারার সহিত পারস্পারিক তুলনা করা হয়। উল্লেখযোগ্য ধারাগুলিকে লইয়া আরও ব্যাপকভাবে পরীক্ষার জন্য বৃহত্তর পরীক্ষাভূমিতে (larger experimental plot) লওয়া হয় এবং আরও কয়েক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা চালান হয়। অবশেষে সকল রকমের পারস্পরিক তুলনামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল বংশধারাভুক্ত উদ্ভিদের অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হয় এবং কিছুকাল বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। পর্যবেক্ষণ শেষে নির্বাচিত উদ্ভিদগুলিকে প্রজননবিদগণ নূতন উন্নত প্রকার রূপে চিহ্নিত করিয়া কৃষকদের নিকট তুলিয়া দেন।

ইতর-পরাগী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক নির্বাচনের পর প্রতিটি উদ্ভিদকে স্ব-পরাগযোগের সাহায্যে প্রতিপালন করা হয়। ক্রমাগত অন্তঃপ্রজননের ফলে হোমোজাইগাস অবস্থার ফলে শুদ্ধ বংশধারার মধ্যে একটি চারিত্রিক সমতা দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) **শুদ্ধ পন্থার নির্বাচন** (Pure line selection)—1903 খ্রীষ্টাব্দে W. Johannsen শুদ্ধ পন্থা তত্ত্বের প্রস্তাবনা করেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে একটি প্রজাতি বা প্রকার হইতে যে বংশ সৃষ্টি হয় তাহা হইতে অনেকগুলি শুদ্ধ বংশধারা (Pure line) পৃথক করিয়া লওয়া যায়। শুদ্ধ বংশধারা বলিতে এইরূপে উদ্ভিদ বুঝাইতেছেন যাহা একটি হোমোজাইগাস স্বপরাগী উদ্ভিদ হইতে আসিয়াছে। শুদ্ধ বংশগত উদ্ভিদ অন্তঃপ্রজননের দ্বারাই বংশ বিস্তার করে। একটি দলবদ্ধভাবে নির্বাচিত উদ্ভিদ হইতে একটি শুদ্ধ পন্থায় নির্বাচিত উদ্ভিদের মধ্যে অনেক বেশী চারিত্রিক শুদ্ধতা বা সঙ্গাত দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য একটি শুদ্ধ বংশের অন্তর্গত উদ্ভিদসমূহ একই প্রকার দেখিতে হয়।

শুদ্ধ পন্থায় নির্বাচন মোটামুটি সরল উপায়ে সম্পন্ন হয়। এই স্থলে, প্রাথমিকভাবে একসঙ্গে অনেকগুলি উদ্ভিদ নির্বাচিত করিয়া তাহাদের পৃথকভাবে এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত উপায় স্বপরাগ মিলনের সাহায্যে বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়। শুদ্ধ পন্থায় নির্বাচনের জন্য যে-সকল উপায় অবলম্বন করা হয় তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

(১) প্রথমে একটি প্রজাতির অসংখ্য উদ্ভিদের মধ্য হইতে 200 হইতে 1000টি প্রকার বাছিয়া লওয়া হয়।

(২) প্রত্যেকটি উদ্ভিদের বংশধরদের এক একটি সারিতে চাষ করা হয়। শ্রেষ্ঠ সারি নির্বাচিত করিয়া তাহার প্রতিটি উদ্ভিদ হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া একত্র করা হয়। সুতরাং নির্বাচিত সারির প্রতিটি উদ্ভিদ এক একটি পরীক্ষামূলক প্রকারে পরিণত হয়।

(৩) তৃতীয় বৎসরে প্রতিটি প্রকারকে একাধিক পর্যবেক্ষণ ভূমিতে চাষ করা হয়। শ্রেষ্ঠ প্রকারগুলি নির্বাচিত করিয়া তাহাদের বীজ সংগ্রহ করা হয়।

(৪) চতুর্থ বৎসর হইতে সপ্তম বৎসর পর্যন্ত নির্বাচিত প্রকারগুলির প্রাথমিক উৎপাদন পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। ঐসময় প্রকারগুলির উৎপাদন হার প্রচলিত প্রকারের উৎপাদন হারের সহিত তুলনা করিয়া শ্রেষ্ঠ প্রকার সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(৫) অষ্টম বৎসরে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ প্রকারটির বীজ সংগ্রহের উদ্দেশ্য অধিক সংখ্যায় চাষ করা হয়।

শুদ্ধ পন্থার নিবাচনে কোন নূতন জীনোটাইপ সৃষ্টি হয় না। এই পন্থার দ্বারা কেবলমাত্র সেই সকল উন্নত জীনোটাইপ নির্বাচিত হয় যাহা স্বাভাবিকভাবে উদ্ভিদের মধ্যেই অবস্থান করে। যখন নির্বাচিত প্রকারটি সকল রকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় তখন তাহার নামকরণ করা হয় এবং নূতন চাষযোগ্য প্রকার হিসাবে চাষীদের নিকট পাঠান হয়।

(গ) **সংকরণ প্রক্রিয়া** (Hybridization)—সংকরণ প্রক্রিয়ায় দুইটি প্রকারের মধ্য জননক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। ইহার ফলে উৎপন্ন অপত্য বংশধরদের মধ্যে মাতৃ

ও পিতার গুণাবলী সঞ্চারিত হয়। সুতরাং এই পদ্ধতি অবলম্বন করিবার সময় এইরূপ দুইটি প্রকার নির্বাচিত করা হয় যাহাদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত গুণাবলী বর্তমান থাকে।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, Pusa 4 এবং Australian Federation নামক দুইটি গমের প্রকারের মধ্যে সংকর জনন সংঘটিত করিবার পর যে প্রশাখাটি (NP 165) নির্বাচন করা হয় তাহার মধ্যে যুগপৎ Pusa 4 প্রকারের উন্নতমান ও উচ্চ ফলন এবং Federation প্রকারের আলগা স্মাট রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা মিলিত হইয়াছে। পরবর্তী পর্যায়ে, এই NP 165 প্রকারের সহিত Kenya E 220 প্রকারের সংকর জনন করা হয়। প্রাপ্ত বংশধরদের মধ্য হইতে কিছু 'প্রকার' নির্বাচন করা হয় যাহাদের মধ্যে NP 165-এর সকল গুণাবলী অর্থাৎ উচ্চ ফলন, উন্নতমান ও আলগা স্মাট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জীনসমূহ এবং Kenya E 220 প্রকারের কৃষ্ণবর্ণ ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধকারী জীন একত্রিত হইয়াছে!

একক জীন ঘটিত বাহ্যিক চরিত্রসমূহ ছাড়া সংকরণ পদ্ধতি ও তাহার পরবর্তী স্তরে অপত্য বংশধরদের মধ্য হইতে নির্বাচনের মাধ্যমে সমষ্টিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহে (features of quantitative nature) পিতা-মাতা হইতে উন্নত ধরনের উদ্ভিদ প্রকার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। উদ্ভিদের মধ্যে এইরূপ অনেক বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন, উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া, কাণ্ডের দৃঢ়তা এবং শস্যের গুণগত মান, ইত্যাদি, যাহা অনেকগুলি একই প্রকৃতির জীনের একত্র সমাবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় (cumulative effect of genes)। ঐ জীনগুলি বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রকারের মধ্য হইতে সংকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে একটি প্রকারের মধ্যে আসিয়া একত্রিত হইয়া পূর্ণ প্রকাশিত হয়। এই প্রকার উচ্চতর সংযুক্তি যাহা উদ্ভিদের মধ্যে দেখা যায় তাহাদের ট্রান্সগ্রেসিভ সেগ্রিগেট্স্ (transgressive segregates) বলে!

ইতরপরাগী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রধানত দুই প্রকার সংকরণ কার্য প্রণালী অনুসরণ করা হয়। (১) দুইটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রজনন (inter specific crossing) এবং (৩) হাইব্রিড ভিগর (Hybrid Vigour) পদ্ধতির সদ্ব্যবহার করা।

সংকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিদের সামগ্রিক উন্নয়ন করা হইলেও এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও একটি সীমা আছে। বহু ক্ষেত্রেই দুইটি প্রজাতির মধ্যে প্রজনন সম্ভবপর হয় না, তবে ভ্রূণ কালচার (embryo culture) গর্ভদণ্ডের জোড় কলম (style) grafting) ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অনেক ক্ষেত্রে নিষেক সফল করা হইলেও যে স্থলে জাইগোট উৎপন্ন হয় না' সেই স্থলে সংকরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

(ঘ) **পলিপ্লয়েডী প্রজনন** (Polyploidy breeding)—পলিপ্লয়েডী সংঘটিত হইলে স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভিদের সহ্য ক্ষমতা, তেজ এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। শুধু তাহাই নয়, সাধারণ ডিপ্লয়েড অপেক্ষা পলিপ্লয়েড উদ্ভিদের দেহের আকৃতিও বড় হয়। আমাদের খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদসমূহের অধিকাংশই

উচ্চ পলিপ্লয়েড, যেমন. ধান গম, জই, তুলা, তামাক ইত্যাদি। এই সকল তথ্যাদি উদ্ভিদ প্রজনবিদগণকে কৃত্রিম উপায়ে পলিপ্লয়েডী সংঘটিত করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে বা উদ্ভিদের সামগ্রিক উন্নতি সাধন করিতে উৎসাহ দিয়াছে।

সকল ক্ষেত্রেই যে পলিপ্লয়েডী সংঘটিত হইলে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাহা নয়; কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন সয়াবীন, লিনসিড এবং ভুট্টা গাছে পলিপ্লয়েডী সংঘটিত করিয়া ভালো ফল পাওয়া যায় নাই। তবে সাধারণভাবে স্বপরাগী উদ্ভিদ অপেক্ষা ইতরপরাগী উদ্ভিদে এই প্রকার প্রজন পদ্ধতিতে অধিক সুফল পাওয়া গিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে পলিপ্লয়েডী সংঘটন অর্থনৈতিক দিক হইতে খুব একটা লাভবান হওয়া যায় না। সেই কারণে প্রজনবিদগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাহা হইল প্রথমে কৃত্রিম উপায়ে পলিপ্লয়েড সংঘটিত করা এবং সেই পলিপ্লয়েড উদ্ভিদটিকে লইয়া পরবর্তী পর্যায়ে স্বাভাবিক ডিপ্লয়েড উদ্ভিদের সহিত সংকর জনন সম্পন্ন করা। সুতরাং পলিপ্লয়েড প্রজন প্রধানত তিন পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যথা, (ক) কৃত্রিম পলিপ্লয়েডী সংঘটন, (খ) সংকরণ প্রক্রিয়া, এবং (গ) নির্বাচন।

জাপানে বীট গাছে পলিপ্লয়েডী প্রজনের দ্বারা ট্রিপ্লয়েডী সংঘটিত করিয়া তাহার শর্করার পরিমাণ 10% হইতে 12% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে। Muntzing (1951) সুইডেনে শীত সহ্য করিতে সক্ষম টেট্রাপ্লয়েড রাইশস্যের একটি প্রকার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ঐ নূতন প্রকারটি উৎপাদন ক্ষমতা ডিপ্লয়েড প্রকারের ন্যায় কিন্তু তাহার বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা, উৎপাদন ও রুটির মান ডিপ্লয়েড অপেক্ষা অনেক উন্নত। ফলের গাছের মধ্যে টেট্রাপ্লয়েড ক্রেনবেরী (cranberries) এবং আঙুর, উচ্চ ফলনশীল ট্রিপ্লয়েড তরমুজ খুবই উল্লেখযোগ্য। "ক্লাবরুট" রোগের প্রতিরোধ ক্ষমত সহ বৃহৎ আকারের টেট্রাপ্লয়েড মূলা জাপানের কিহারা ইনস্টিটিউটে (Kihara Institute of Japan) সৃষ্টি করা হইয়াছে।

(ঙ) **পরিব্যক্তি প্রজনন** (Mutation breeding)—1928 খ্রীষ্টাব্দে Stadler বার্লি গাছের উপর রঞ্জন রশ্মি (X-ray) প্রয়োগ করিয়া দেখাইলেন যে রশ্মি বিকিরণ পরিব্যক্তি ঘটাইতে সক্ষম হয়। এই আবিষ্কারের পর হইতে রঞ্জন রশ্মির দ্বারা পরিব্যক্তি সংঘটিত করিয়া তাহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য বিজ্ঞানীমহলে সাড়া পড়িয়া যায়। উপরন্তু, সুইডেনে বার্লিগাছের উপর রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগের ফলে কাণ্ডের দৃঢ়তা বৃদ্ধি, শীঘ্র মঞ্জরীর আবির্ভাব, বার্লির গুণগত মান, এবং অন্যান্য চাষ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যের উন্নতির সংবাদে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীমহল উৎসাহবোধ করিলেন এবং পরিব্যক্তির তত্ত্বীয় দিক ছাড়াও ব্যবহারিক সম্ভাবনার দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

পরিব্যক্তি প্রজনের ক্ষেত্রে প্রথমে কৃত্রিম উপায়ে পরিব্যক্তি সংঘটিত করা হয় এবং পরবর্তী কয়েকটি বংশ ধরিয়া তাহার প্রকৃতি লক্ষ্য করা হয়। যদি কোন উপকারী বা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলে প্রজনের মাধ্যমে সেই পরিবর্তনটি একটি নির্দিষ্ট উদ্ভিদ প্রকারের মধ্যে আনা হয়।

ধান গাছের উপর রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করিয়া পরিব্যাপ্তি সংঘটনের ঘটনাটি সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয় জাপানে 1934 খ্রীষ্টাব্দে। ভারতে রামিয় এবং পার্থসারথি (Ramiah and Parthasarathy) 1936 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ধানের উপর রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করিয়া পরিব্যাপ্তি সংঘটিত করেন। তাহার পর হইতে ভারতের নানা স্থানে এই বিষয়টি লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিয়াছে। যদিও অধিকাংশ পরিব্যাপ্তি যেমন, ক্লোরোফিলের অভাব ইত্যাদি অর্থকরী দিক হইতে মোটেও অভিপ্রেত নয়, তথাপি সত্ত্বেও নানা ধরনের উপকারী পরিব্যাপ্তি যেমন উদ্ভিদের উচ্চতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদি লক্ষ্য করা গিয়াছে। উড়িষ্যার এগ্রিকালচার এবং টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ে T 141 নামক ধানের একটি প্রকারের উপর রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ করিয়া এরূপ একটি পরিব্যাপ্তিশীল প্রকার গঠন করা হইয়াছে যাহার কাণ্ড কিছুটা খর্ব, যথেষ্ট দৃঢ়, কিন্তু অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে উহা মাতা-পিতা উদ্ভিদের সমতুল্য।



উদ্ভিদ প্রজনে অনুসৃত রীতি বা প্রণালীসমূহ
(Techniques in Breeding Crop Plants)

স্বপরাগী উদ্ভিদের প্রজনন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। এই স্থলে স্বাভাবিক পরাগ-সংযোগ ঘটিয়ে বীজ সংগ্রহ করা যায়। তবে প্রজননবিদকে স্বাভাবিক ইতর পরাগ যোগের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সজাগ থাকিতে হইবে। যদি স্বাভাবিক ইতর পরাগ যোগের সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে তখন তাহাকে ফুলগুলি মোড়ক দ্বারা (bag) আবৃত করিয়া বাহিরের পরাগ রেণু হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

ইতর-পরাগী উদ্ভিদের প্রজননের জন্য অতি অবশ্যই পুষ্পকে মোড়ক দ্বারা আবৃত রাখিতে হইবে। যে সকল ইতর-পরাগী উদ্ভিদে বাতাসের দ্বারা পরাগ-সংযোগ হইয়া থাকে তাহাদের ক্ষেত্রে সমগ্র পুষ্প মঞ্জরীকে পার্চমেণ্ট কাগজে তৈরী মোড়কের মধ্যে অথবা স্বচ্ছ কোন বস্তু দ্বারা তৈরী মোড়কের মধ্যে রাখা হয় এবং প্রতিদিন ঢাকা দেওয়া মঞ্জরী ভালো করিয়া ঝাঁকিয়া দেওয়া হয়। এই কার্য ফুল ফোটা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত করিয়া যাইতে হয়। যে সকল পুষ্পের আকার অপেক্ষাকৃত বড়, যেমন, তুলা, তাহাদের পাপড়িগুলিকে মুড়িয়া যৌনাঙ্গগুলি ঢাকিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। ইহাতে রেণু এবং তাহার বাহক পতঙ্গকে দূরে রাখা সম্ভব হয়। কতকগুলি সিম্ব জাতীয় উদ্ভিদ, যাহাদের শুধুমাত্র পতঙ্গ দ্বারা পরাগ-সংযোগ হয় সেই সকল উদ্ভিদ মিহি জালের তৈরী খাঁচার মধ্যে রাখিয়া ইতর পরাগযোগের সম্ভাবনা রোধ করা যায়। ভুট্টার ক্ষেত্রে ট্যাসেলের (tassel) উপর রেণু সংগ্রহ করিবার জন্য একপ্রকার বিশেষ ধরনের মোড়ক রাখা হয় এবং সমগ্র উদ্ভিদটিকে একটি বড় মোড়কের মধ্যে রাখা হয় যাহাতে বাহির হইতে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত রেণু আসিতে না পারে।

সংকরণ প্রক্রিয়া কার্যকরী করিতে হইলে সর্বপ্রথম যাহা করা প্রয়োজন তাহা হইল পরাগমিলন নিয়ন্ত্রণ করা। পরাগমিলন নিয়ন্ত্রণ করিতে যে সকল পন্থা অবলম্বন করা হয় সেগুলি হইল, (১) ইমাসকিউলেশান (Emasculation); (২) ব্যাগিং (Bagging); এবং (৩) পরাগসংযোগ (Pollination)।

ইমাসকিউলেশান (Emasculation)—স্ত্রী পুষ্প বা বীজ পুষ্প বলিয়া চিহ্নিত পুষ্প হইতে পরাগধানীগুলির অপসারণ করাকে ইমাসকিউলেশান বলা হয়। একলিঙ্গ পুষ্পে ইমাসকিউলেশান পদ্ধতি কার্যকর করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। যাহা প্রয়োজন তাহা হইল স্ত্রীপুষ্পের গর্ভমুণ্ডকে অবাঞ্ছিত পরাগমিলন হইতে রক্ষা করা এবং উপযুক্ত সময়ে নির্দিষ্ট পুষ্প হইতে পরাগরেণু সংগ্রহ করিয়া পরাগমিলন সংঘটিত করা। উভয়লিঙ্গ পুষ্পের পরাগধানী পরিণত হইবার পূর্বেই ইমাসকিউলেশান সম্পূর্ণ করিত

হয়। ইমাসকিউলেশান এবং পরাগমিলন সংঘটিত করিতে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়। উহাদের নিম্নে আলোচনা করা হইল।

(ক) **পরাগধানীর অপসারণ ও হস্তদ্বারা পরাগ-সংযোগ** (Removal of Anthers and Hand pollination)—ফরসেপ অথবা অন্যান্য ব্যবস্থার সাহায্যে পরাগধানী পরিণত (mature) হইবার পূর্বেই তাহাদের ফুল হইতে অপসারণ করা হয়। ইমাসকিউলেশনে ইহাই সাধারণ অনুসৃত নীতি। ধান, গম, বার্লি তুলো, তামাক ইত্যাদি উদ্ভিদে এই নীতি প্রয়োগ করা হয়। ছোট এবং সরু মুখ যুক্ত কাঁচি এবং ছোট সুচালো ও মাথার দিক বাঁকান ফরসেপ এই কার্যে খুবই উপযোগী। ইহাদের সাহায্যে পরাগধানী অপসারণ করিবার পর ফুলগুলি ছোট ছোট পার্চমেণ্ট কাগজের ব্যাগের সাহায্যে ঢাকিয়া রাখা হয়। তাহার পর উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ যখন গর্ভমুণ্ড পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন নির্দিষ্ট পুং-পুষ্প হইতে পরাগরেণু সংগ্রহ করিয়া গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত করা হয় বা ছিটাইয়া দেওয়া হয়।

(খ) **উত্তাপ, শীতলতা অথবা অ্যালকোহল প্রয়োগ করিয়া পরাগরেণু বিনষ্ট করা এবং কৃত্রিম পরাগমিলন ঘটান** (Killing the pollen grains by heat, cold or alcohol and hand pollination)—যেখানে হস্তের সাহায্যে ইমাসকিউলেশান সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে সাধারণত এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। জোয়ার, ধান এবং ঘাস জাতীয় অন্যান্য শস্যের ক্ষেত্রে গরম জল প্রয়োগ করিয়া পরাগরেণু বিনষ্ট করা যাইতে পারে। সুতরাং পরাগধানীগুলি অপসারণ করিবার আর প্রয়োজন থাকে না। এই প্রক্রিয়ায় ফুলগুলি সরাসরি 45°C হইতে 48°C উত্তপ্ত জলে 1 হইতে 10 মিনিট পর্যন্ত চুবাইয়া রাখিতে হয়। সময়ের এই তারতম্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। অনেক সময় হিমাঙ্কের কাছাকাছি তাপমাত্রা প্রয়োগ করিয়া ধান এবং গম গাছের পরগরেণুর কার্য কারীতা বিনষ্ট করা যায়। এই উদ্দেশ্যে থার্মফ্লাস্কে করিয়া উপযুক্ত তাপমাত্রায় গরম অথবা ঠাণ্ডা জল লইয়া ক্ষেতে যাওয়া হয় এবং ফুলগুলি উহাতে চুবাইয়া ইমসকিউলেশান কার্য করা হয়। তাপের মাত্রা এরূপভাবে নির্দিষ্ট করা হয় যাহাতে শুধুমাত্র পুং অংশটি বিনষ্ট হয় অথচ ফুলের অন্য কোন অংশের কোন ক্ষতি না হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন, লবঙ্গাকার বৃক্ষ (lucerne), সাধারণত 57% ইথাইল অ্যালকোহল প্রায় 10 মিনিট যাবত প্রয়োগ করিলে পরাগরেণু বিনষ্ট হয়।

(গ) **ইমাসকিউলেশান ছাড়াই বাঞ্ছিত পরাগমিলন** (Polination without emasculation)—তামাক, আলু ইত্যাদি কয়েক প্রকার উদ্ভিদের মধ্যে অনেক সময় এইরূপ প্রকার পাওয়া যায় যাহাদের স্বপরাগযোগ হইলে নিষেক সম্পন্ন হয় না (self incompatible)। এইরূপ ক্ষেত্রে ইমাসকিউলেশানের কোন প্রয়োজন হয় না। সুতরাং সহজেই বাঞ্ছিত প্রজন কার্য সম্পন্ন করা যায়।

(ঘ) **পুং-বন্ধ্যাকরণ** (Male sterility)—পুং-বন্ধ্যাকরণের সাহায্যে বার্লি, জোয়ার ইত্যাদি উদ্ভিদে ইমাসকিউলেশনের ক্লান্তিকর একঘেয়েমি কাটাইয়া ওঠা যায়।

পুং-বন্ধ্যা হ জাতি একটি প্রচ্ছন্নগুণের জিনের জন্য হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করিয়াও বন্ধ্যাত্ব সংঘটিত করা যায়। এইরূপ পদার্থগুলি হইল, (1) 2-4-D (2-4-dichlorophenoxy acetic acid), (2) NAA (Napthelin acetic acid), (3) ম্যালিকহাইড্রাজাইড, (4) 4-ট্রাইআয়োডো বেনজইক অ্যাসিড, ইত্যাদি।

পরাগমিলনের জন্য হস্তের সাহায্যে রেণু ছড়ান যায় অথবা বিদ্যুৎ চালিত পলি-নেটরের সাহায্যেও পরাগরেণু ছিটাইয়া পরাগমিলন সম্ভব করা যায়।

ইমাসকিউলেশান সম্পন্ন করিবার পর ফুলগুলিকে পার্চমেন্ট কাগজের তৈরী ছোট ছোট ব্যাগ দিয়া মুড়িয়া রাখা হয় এবং মোড়কগুলি যথাযথ চিহ্নিত করিয়া রাখা হয়। এইরূপ পদ্ধতিকে ব্যাগিং এবং লেবেলিং (Bagging and labelling) বলা হয়।

---

১ অভিব্যক্তিবাদ
(Evolution)

Evolution বা অভিব্যক্তি বলিতে মন্থর গতিতে অবিরাম পরিবর্তন বুঝায় যাহার ফলে নূতন কিছুর আবির্ভাব ঘটে। এইরূপে পৃথিবীতে নূতন নূতন জীবের আবির্ভাবের রহস্যকে organic evolution বা জৈব অভিব্যক্তি অথবা Theory of Evolution বা অভিব্যক্তিবাদ বলে।

পৃথিবীর সর্বত্রই লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কখন্ এবং কিরূপ অবস্থায় ঐসকল জীব পৃথিবীতে প্রথম আসিল এবং বসবাস করিতে লাগিল। প্রাচীনকালের ভারতীয় এবং গ্রীসদেশীয় দার্শনিকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত পণ্ডিতগণ বিভিন্ন প্রকার জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতবাদ পোষণ করেন। ঐসকল মতবাদের মধ্যে জৈব অভিব্যক্তির মতবাদ সর্বজনস্বীকৃত; অবশ্য ইহার বিপক্ষেও কয়েকজন জীববিজ্ঞানী মত পোষণ করেন।

জীবনের অভিব্যক্তি এবং উদ্ভিদের অভিব্যক্তি (Evolution of life and evolution of plants ;—ভূতাত্ত্বিক এবং জ্যোতির্বিদগণ মনে করেন যে পৃথিবী সৃষ্টি হইবার পর ইহা ছিল একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের গোলক যাহা অন্যান্য গ্রহের ন্যায় সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তন করিত। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই অগ্নিপিণ্ড ক্রমে শীতল হইতে লাগিল এবং একটি কঠিন অন্তস্তল গঠন করিলে। পৃথিবীর উপরিভাগে আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল এবং উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প বৃষ্টির আকারে পৃথিবীর উপরিভাগে পতিত হইল। এইরূপে প্রথম অগভীর সমুদ্র, হ্রদ, উপহ্রদ প্রভৃতি জলাশয়ের উৎপত্তি হইল। এই উত্তপ্ত জলাশয়েই আকস্মিক প্রাণের প্রথম স্পন্দন দেখা দিল। ইহা একটি অত্যাশ্চর্য সজীব প্রোটোপ্লাজম। কিরূপে ইহার আবির্ভাব হইল তাহা এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। ভবিষ্যতে কোনোদিন হয়ত এই রহস্যের সমাধান হইবে। সম্ভবত তৎকালীন পরিবেশ এই সজীব প্রোটোপ্লাজমের উৎপাদনের সহায়ক ছিল।

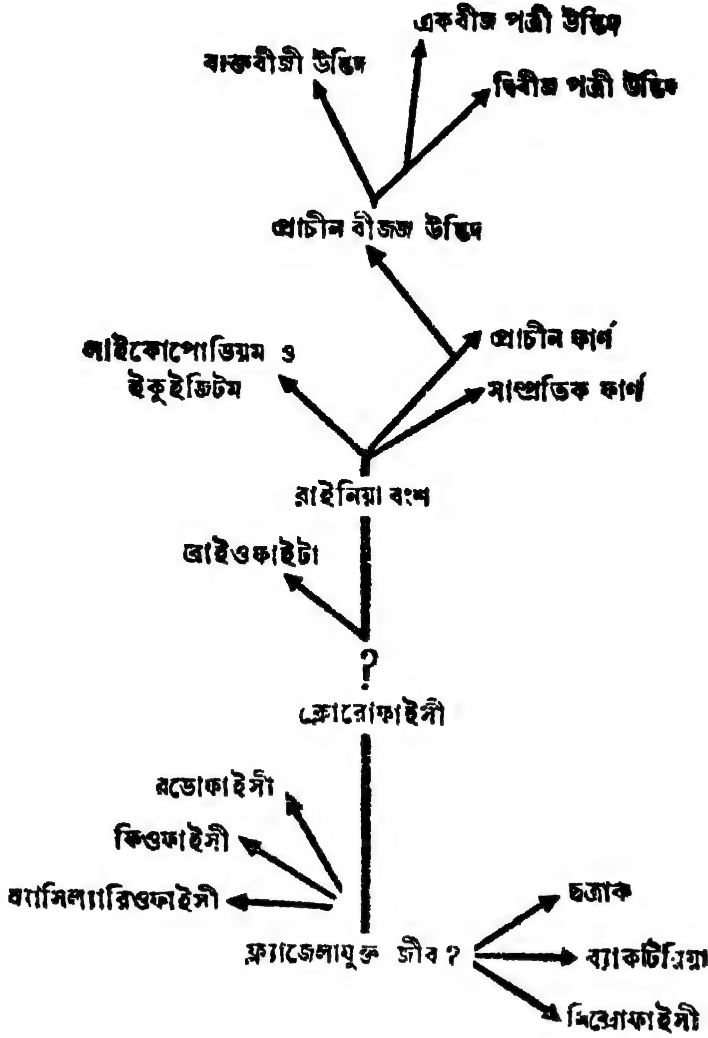
ইহা অবিদিত নহে যে সজীব প্রাণীর মৌলিক গঠনই হইল প্রোটিন। প্রাণীর আবির্ভাবের পূর্বে বহুকাল ধরিয়া সম্ভবত প্রাকৃতিক সংশ্লেষ প্রণালীতে প্রোটিন উৎপন্ন হইত। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রায় একশত কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে সজীব প্রোটোপ্লাজমের প্রথম আবির্ভাব হয়। এই সময়ে আবহাওয়া অত্যধিক তপ্ত ছিল এবং বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেনের অভাব ছিল। পরন্তু বায়ুমণ্ডল বলিতে

মুক্ত হাইড্রোজেন, মিথেন ও জলীয় বাষ্প বুঝাইত। Electric discharge বা বিদ্যুৎক্ষরণ অথবা natural radiation বা প্রাকৃতিক তাপ বিকিরণ-এর প্রভাবে সম্ভবত ঐসকল গ্যাস কৃত্রিম প্রণালীতে সংশ্লিষ্ট হইয়া বিভিন্ন প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড (amino acids) উৎপাদন করিত। তৎকালে এইপ্রকার সংশ্লেষ সম্ভবপর ছিল বলিয়া এইরূপ ধারণা করা যাইতে পারে যে প্রাণের প্রথম স্পন্দনও ঐ সময়েই জাগিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে **ভাইরাস** (Virus) নামক একপ্রকার অতি ক্ষুদ্রাকার পদার্থগোষ্ঠীর উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহা জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী অবস্থা বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাদের সাধারণ অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় না এবং ইহারা জীবের বহু প্রকার রোগের সৃষ্টি করে। গবেষণার দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনজনিত নিউক্লিওপ্রোটিন নামক একটি যৌগিক পদার্থ বিশেষ। ভাইরাস পদার্থগুলি প্রোটোপ্লাজমের আবির্ভাবের পরেও সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ ধারণা করা যাইতে পারে যে কয়েকটি অজৈব পদার্থ হইতে প্রোটোপ্লাজমের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহাই হউক, তৎকালীন প্রোটোপ্লাজম সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভবপর হইয়াছে এবং জানা গিয়াছে যে ইহার বিপাক প্রণালী অতি জটিল।

সজীব প্রোটোপ্লাজমের যখন প্রথম অভ্যুদয় হয় তখন তাহাদের বৃদ্ধি ছিল এবং জনন ছিল। একটি সজীব প্রোটোপ্লাজম অনুরূপ বহুসংখ্যক সজীব প্রোটোপ্লাজম উৎপাদন করিতে পারিত। ইহাদের আকৃতি একই প্রকার এবং তৎকালে জৈব জগতের সবেমাত্র জন্ম হইয়াছে বলিয়া ইহারা অজৈব পদার্থের দ্বারা পুষ্টিসাধন করিত। উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোনোরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত না, কিন্তু কয়েক সহস্র বৎসর ধরিয়া এই সজীব প্রোটোপ্লাজম যখন লক্ষ লক্ষ বংশানুক্রম অনুসরণ করিতে লাগিল ঐ সময়ে উহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ variations বা প্রকারণ দেখা গেল। এই প্রকারণগুলি ক্রমে একত্রিতভাবে উহাদের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করিল, যাহার ফলে উহাদের আকৃতির কিছু তারতম্য পরিলক্ষিত হইল। ইতিমধ্যে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটিতে এবং কয়েকটি নূতন প্রকারণ এই নূতন পরিবেশে সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইল। এই দুই প্রকার প্রকারণের প্রভাবে ক্রমে নূতন নূতন সজীব পদার্থের অভিব্যক্তি হইতে লাগিল। ক্রমেই ইহা উপলব্ধি হইল যে এই অভিব্যক্তির ফলে প্রথমে প্রাণিজগতের সৃষ্টি হইল এবং পরে উহাদের মধ্যে কেহ কেহ chlorophyll বা সবুজ বর্ণ ধারণ করিলে উদ্ভিদ জগতের আবির্ভাব ঘটিল। এই সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী হইতেই বিভিন্ন সজীব পদার্থের উৎপত্তি হইতে লাগিল কিন্তু উহাদের মধ্যে যাহারা নূতন পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অক্ষম তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। যাহারা জীবিত রহিল তাহারা পুনরায় অভিব্যক্তির বশবর্তী হইয়া নূতন নূতন সজীব পদার্থ গঠন করিল। এইরূপ অভিব্যক্তির ফলে প্রাচীনকালের সজীব পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া কিরূপে বর্তমানকালের উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদগোষ্ঠী বিন্যাসিত হইয়াছে

তাহা নিম্নের evolutionary tree বা অভিব্যক্তি বৃক্ষ নামক চিত্রের দ্বারা বুঝান হইয়াছে। যথা,—



৯১ নং চিত্র—অভিব্যক্তি বৃক্ষ

২

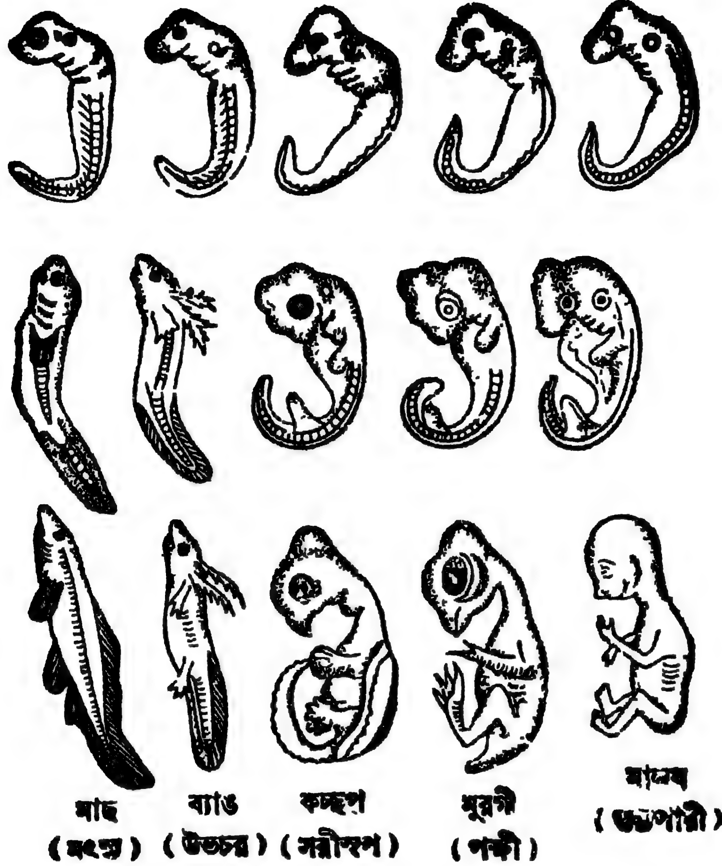
জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণ
(Evidences of Organic Evolution)

অধিকাংশ জীববিদ্যাবিদগণই জৈব অভিব্যক্তির স্বপক্ষে মত পোষণ করেন ; অবশ্য বর্তমানেও উহাতে বহু বিতর্কমূলক তথ্য নিহিত আছে। জৈব অভিব্যক্তির স্বপক্ষে অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য—

1. **তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান** (Comparative morphology or anatomy) —বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদে সম-আকৃতিবিশিষ্ট অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। একই গোত্রের সমগ্র উদ্ভিদে অথবা অধিকাংশ উদ্ভিদের মধ্যে এইপ্রকার সমাঙ্গ দেখা যাইতে পারে। সকল **শিম্বিগোত্রীয় পুষ্প** (papilionaceous flowers) একই রূপ দেখিতে হয় ; লাইকোপোডিয়াম (Lycopodium) এবং ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের (strobili) **রেণুপত্র-মঞ্জরীগুল** একই আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে ; অনুরূপে ব্রাওফাইটা (Bryophyta) এবং টেরিডোফাইটা (Pteridophyta) শ্রেণীর উদ্ভিদের **স্ত্রীধানীগুলি** (archegonia) এবং পাইনজাতীয় উদ্ভিদের **রঞ্জন নালী** (resin canals) একই প্রকারের। **নিষ্ক্রিয় অঙ্গের** (Vestigeal organs) ক্ষেত্রে, বর্তমানে উহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া বন্ধ থাকিলেও অতীতে ইহারা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী ছিল এইরূপ ধারণা করা যাইতে পারে : কিন্তু অভিব্যক্তির পরিবর্তনের সাথে উহাদের প্রয়োজন না থাকিলেও ঐ ক্রিয়াবিহীন অঙ্গটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। অধিকন্তু **সমসংস্থ** (homologues) ও **সমবৃত্তি** (analogous) অঙ্গগুলিও জৈব অভিব্যক্তির যথোপযুক্ত যুক্তি প্রদর্শন করে।

2. **তুলনামূলক ভ্রূণবিদ্যা** (Comparative Embryology)—বিভিন্ন উদ্ভিদের ভ্রূণ লক্ষ্য করিলে জৈব অভিব্যক্তি যথোপযুক্ত যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ লাইকোপড্ (Lycopod) পাইন এবং **গুপ্তবীজী উদ্ভিদ** (angiosperms) এর বা নূতন **রেণুধর উদ্ভিদগুলি** (sporphytes) একই রূপে গঠিত হয় ; ফার্নের **তাম্বুলাকার** (cordate) সবুজবর্ণের প্রোথ্যালাস এবং লিভারওয়ার্ট (Liverwort) গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদের **লিঙ্গধর** (gametophyte) থ্যালস একই আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে ; সাইকাস (Cycas) এবং টেরিডোফাইটা শ্রেণী উদ্ভিদের বহু ফ্ল্যাজেলাযুক্ত শুক্রাণুগুলির আকৃতি একই রূপ দেখিতে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ হইতে সম্ভবত উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ পৃথিবীতে আসিয়াছে, কারণ উভয় শ্রেণী উদ্ভিদেরই কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

বয়স্ক অবস্থায় কতকগুলি প্রাণী ও উদ্ভিদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য দেখা যাইলেও অনেক সময় পরিস্ফুরণকালে তাহাদের দৈহিক গঠনের কোনো পার্থক্য থাকে না। যেমন, ভ্রূণ অবস্থায় মাছ ও উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ীর গঠন প্রায় এক

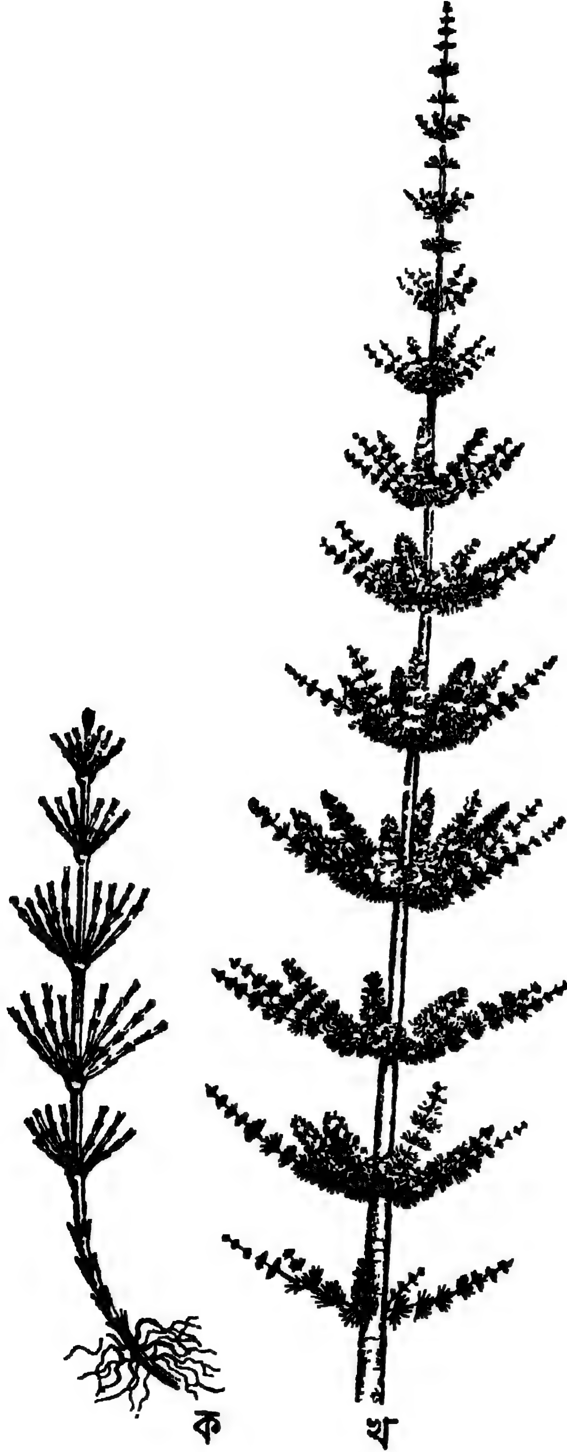


৯২নং চিত্র—কয়েকটি প্রাণীর ভ্রূণ অবস্থা।

(৯২নং চিত্র)। অনেক ক্ষেত্রে আবার উচ্চস্তরের প্রাণীর ভ্রূণ নিম্নস্তরের বয়স্ক প্রাণীর অনুরূপ হয়, যেমন ব্যাঙাচি ও মাছ। ইহা হইতে প্রমাণ করা যায় যে মাছের মত পূর্বপুরুষ হইতে ব্যাঙের উদ্ভব হইয়াছে।

ইহার উপর ভিত্তি করিয়া হ্যাকেল (Hackel) নামক জীববিজ্ঞানী জীবযোনীসূত্র (Biogenic law)-এর অথবা পুনরাবৃত্তি সূত্র (Theory of Recapitulation)-এর দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে ব্যক্তিযোনির (ontogeny) পুনরাবৃত্তি (recapitulation) ঘটে অর্থাৎ উদ্ভিদ বিশেষের গঠন ঐ জাতীয় সমগ্র উদ্ভিদের গঠনকে সংক্ষিপ্তভাবে পুনরাবৃত্তি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, Acacia (বাবলাজাতীয়) উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতির (species) চারাগুলিতে আদর্শ সবুজবর্ণের পত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐগুলি ঝরিয়া যায় এবং পত্রবৃন্তগুলি (petioles), পর্ণবৃন্তে

(phyllode)-এ রূপান্তরিত হইয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহাদের পূর্ব-পুরুষদিগের ন্যায় প্রকৃত পত্র ধারণ করিবার ক্ষমতা চারাগুলির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।



১৩নং চিত্র—(ক) ইকুইজিটম ও (খ) ক্যালামাইটস-এর আপেক্ষিক আবৃত্তি

3. ভূবিদ্যালিপি (Geological records)—অতীত যুগের অধুনালুপ্ত উদ্ভিদের প্রকৃতি কিরূপ ছিল তাহা fossils বা জীবাশ্মের সংগ্রহ হইতে জানিতে পারা

যায়। Palaeobotanists বা প্রত্নোদ্ভিদবিদ্যা বিশারদগণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের শিলাখণ্ড হইতে সংগৃহীত জীবাশ্ম পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া ঐসকল উদ্ভিদের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হইতে থাকে যাহার ফলে নূতন নূতন প্রজাতি সৃষ্টি হয়। এইজন্য অধুনা যেসকল উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের সহিত প্রাচীনকালীন কিন্তু অধুনালুপ্ত কোনো কোনো উদ্ভিদ বা তাহার অংশের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, Carboniferous age বা কার্বনিফেরস যুগের বিশাল ক্যালামাইটিস (Calamites) নামক বৃক্ষের আকৃতি ও বর্তমানকালীন ক্ষুদ্রাকার ইকুইজিটম (Equisetum) নামক উদ্ভিদের আকৃতি প্রায় একই প্রকার (৯৩নং চিত্র); দীর্ঘাকার কর্ডেইটিস (Cordaites) এবং বর্তমানকালের ইউক্কা (Yucca)-র মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়; জুরাসিক (Jurassic) যুগে প্রাপ্ত গিংকগো (Ginkgo) নামক উদ্ভিদের একটি প্রজাতির পাতাগুলির সহিত বর্তমানকালীন গিংকগো বাইলোবা (*Ginkgo biloba*) নামক উদ্ভিদের পাতার যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। অধুনাপ্রাপ্ত আরকিওপটেরিক্স (Archeopterix) নামক প্রাণীর জীবাশ্ম পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহার সরীসৃপ ন্যায় দন্তবিশিষ্ট দুইটি চোয়াল ছিল এবং পক্ষীর ন্যায় পালকবিশিষ্ট দুইটি পক্ষ ও নখরযুক্ত দুইটি অঙ্গুলি ছিল। ইহা হইতে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে সরীসৃপজাতীয় প্রাণী হইতে পক্ষীজাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছে।

4. **ভৌগোলিক বিস্তার** (Geographical distribution)—সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্ভিদগুলির বিস্তারও জৈব অভিব্যক্তির স্বপক্ষে স্বীকৃতি প্রদান করে। দেখা গিয়াছে যে, নিকটবর্তী অঞ্চলের উদ্ভিদগুলি প্রায় অনুরূপ কিন্তু ইহাদের সহিত দূরবর্তী অঞ্চলের উদ্ভিদগুলির কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, বিহার এবং ওড়িশায় প্রায় একই প্রকার উদ্ভিদের বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহারা পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চল অথবা রাজপুতানার মরুভূমি অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অধিকন্তু ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ প্রভৃতি স্থানের সমতলভূমি অঞ্চলে যে-সকল উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে সুদূর ইওরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের সমতলভূমিতে দেখা যায় না। জলবায়ু এবং মৃত্তিকার পরিবর্তনের ফলেই এইপ্রকার উদ্ভিদ বিস্তারের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। একটি genus বা গণের কয়েকটি প্রজাতি যদি কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে জন্মায় তাহা হইলে স্বভাবতই অনুমান করা যায় যে ঐসকল প্রজাতি ইহার কোনো পূর্বপুরুষের বংশজাত যাহা ঐ অঞ্চলে অথবা উহার সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। ইহার কারণস্বরূপ বলা যায় যে, আঞ্চলিক কারণের প্রভাবে আদি প্রজাতিটির variations বা প্রকারণ বিভিন্ন গতিপথে বিস্তারলাভ করে যাহার ফলে নিকট সম্বন্ধীয় নূতন নূতন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

5. **তুলনামূলক শারীরবৃত্ত** (Comparative Physiology)—দেখা গিয়াছে যে, কতকগুলি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে শারীরবৃত্ত প্রণালীগুলি একই প্রকারে সংঘটিত হয় এবং

বিপাকের সময় যে-সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহারাও প্রায় একই প্রকৃতির হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সকল সবুজবর্ণের উদ্ভিদই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় transpiration বা প্রস্বেদনক্রিয়া সম্পাদন করে এবং খাদ্য প্রস্তুত করে ; সকল fungi বা ছত্রাকই গ্লাইকোজেন নামক শর্করাজাতীয় খাদ্য সঞ্চয় করে ; সকল Labiatae গোত্রীয় উদ্ভিদেই aromatic oils বা একপ্রকার সুগন্ধ তৈল থাকে ; পাইনজাতীয় সকল উদ্ভিদেই resins বা রজন দেখিতে পাওয়া যায়।

6. উদ্ভিদ-শ্রেণীবন্ধ বিদ্যা সংক্রান্ত (Taxonomic evidence)—উদ্ভিদগুলি যথেচ্ছাকৃত চরিত্রবিশিষ্ট হয় না। পরন্তু ইহারা একই সাদৃশ্যযুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এইরূপে species বা প্রজাতি genera বা গণ, family বা গোত্র প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে এবং এই সকল উদ্ভিদগোষ্ঠী একই বংশ পর্যায়ের বন্ধনে আবদ্ধ। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে বর্তমানকালে যে-সকল উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা প্রাক্তন উদ্ভিদের ক্রম পরিবর্তনের ফলেই আবির্ভূত হইয়াছে। এইরূপে, নাইগ্রাম (*nigrum*) টিউবারোসাম (*tuberosum*), মেলনজিনা (*melongena*) প্রভৃতি প্রজাতিগুলি একই গণ সোলানাম (*solanum*)-এর অন্তর্গত ; আবার সোলানাম (*Solanum*), নিকোটিয়ানা (*Nicotiana*), ডাটুরা (*Datura*), প্রভৃতি বিভিন্ন গণ একই গোত্র সোলানাসি (*Solanaceae*)-র অন্তর্গত। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ঐসকল প্রজাতি এবং গণ পরস্পর সাধারণ পূর্বতন উদ্ভিদের বংশজাত।

7. সুপ্রজনন ও নির্বাচিত প্রজনন (Genetics and Selective breeding)· ইহা অবিদিত নহে যে cutting বা শাখাকলম, layering বা দাবা কলম, grafting বা জোড় কলম, selective breeding বা নির্বাচন প্রণালীতে প্রজন প্রভৃতির দ্বারা নূতন প্রকৃতির উদ্ভিদ উৎপন্ন করা সম্ভব। এইরূপে ব্রাসিকা ওলারেসীয়া (*Brassica oleracea*) নামক উদ্ভিদ হইতে, ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উদ্ভিদের varieties বা প্রকার কৃত্রিম প্রণালীতে উৎপাদন করা সম্ভবপর হইয়াছে।

8. কৃত্রিম প্রণালীতে আবিষ্ট পরিবর্তন (Artificially induced changes) —রঞ্জন রশ্মি, ভারনালিজেশন (vernalization), ফোটোপিরিয়ডিজম্ (photoperiodism), হরমোন (hormones) প্রভৃতির প্রয়োগে কখনও কখনও উদ্ভিদের নূতন চরিত্রধারণ করিতে দেখা যায় এবং যদি ইহা স্থিতিলাভ করে তখন নূতন উদ্ভিদের প্রকার অথবা নূতন প্রজাতিও জন্মলাভ করিতে পারে। উপরিলিখিত তত্ত্ব হইতে ইহাই অনুধাবন করা যায় যে, জীবিত উদ্ভিদ কখনও কখনও অভিব্যক্তিশীল পরিবর্তনের বশবর্তী।



জৈব অভিব্যক্তি সম্বন্ধে মতবাদ : প্রজাতির অভ্যুদয়

(Theories explaining Organic Evolution : Origin of Species)

পূর্বে পণ্ডিতগণের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে কোন অতি প্রাকৃত শক্তিই বিভিন্ন প্রকার জীবের আবির্ভাবের কারণ। কিন্তু জীববিদ্যার উন্নতির সাথে এইরূপ ধারণা ক্রমে লোপ পাইতেছে। বর্তমান যুগের বাফোঁ (Buffon) নামক একজন ফ্রান্সদেশীয় বিশেষজ্ঞ ইহার সর্বপ্রথম বিরোধিতা করেন। তিনি এই বিষয়ে যে-সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করেন তাহা পরবর্তীকালে ডক্‌ট্রিন অফ ডিসেণ্ট (Doctrine of descent) নামক মতবাদ প্রণয়নের সহায়ক ছিল। বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী জৈব অভিব্যক্তি সম্বন্ধে যে-সকল মতবাদ পোষণ করেন তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল—

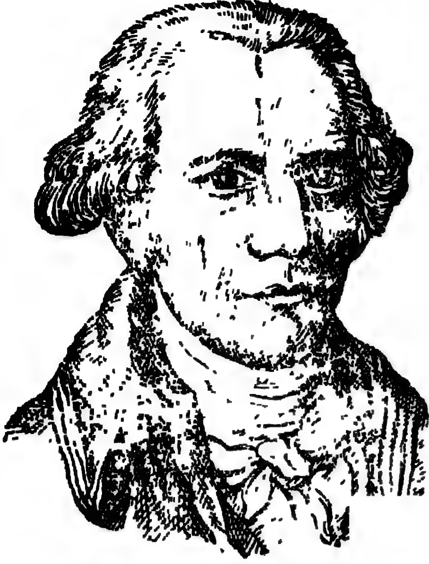
I. সেণ্টহিলেয়ারের মতবাদ (St. Hilaire's theory)

ফ্রান্সদেশীয় প্রকৃতিবিজ্ঞানী জিওফ্রয় সেণ্ট হিলেয়ার (Geoffroy St. Hilaire) বিশ্বাস করিতেন যে পরিবেশের পরিবর্তনই একমাত্র নূতন প্রজাতি গঠনের প্রধান কারণ। তাঁহার মতে যুগ যুগ ধরিয়া আবহাওয়া, মৃত্তিকার গঠন এবং অন্যান্য পরিবেশীয় অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে যাহার ফলে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর আকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। এইরূপ পরিবর্তন যদি বংশানুক্রমে চলিতে থাকে, তাহা হইলে নূতন প্রজাতি জন্মলাভ করা অসম্ভব নহে। দৈবাৎ পরিবর্তনের ফলেই একটি প্রজাতি অপর একটি প্রজাতিতে পরিণত হয়। তাঁহার মতে এইসকল পরিবর্তন ভ্রূণের মধ্যেই সাধিত হয়; পরিণত উদ্ভিদে হয় না। এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে কতকগুলি জীবের পক্ষে অনুকূল হয় কিন্তু কতকগুলি আবার ক্ষতিকর।

II. ল্যামার্কের মতবাদ (Lamarck's theory)

জিয়েন ব্যাপটিস্ট-দ্য ল্যামার্ক (Jean Baptist de Lamarck) একজন ফরাসীদেশীয় দার্শনিক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী ছিলেন (1744—1829)। তিনি জৈব অভিব্যক্তির সম্বন্ধে অতি প্রাচীন সরল এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার মতবাদকে ব্যবহার ও অব্যবহার মতবাদ বা গুণাবলী অর্জন ও অর্জিত গুণাবলী সন্তানসন্ততিতে হস্তান্তরিতকরণ বলা হয়। নিম্নলিখিত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ল্যামার্কবাদ প্রতিষ্ঠিত, যথা—(1) পরিবেশের প্রভাবে variations বা প্রকারণ দেখা দেয় এবং এইরূপ প্রকারণ ও প্রকৃতির মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান; (2) বিভিন্ন অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার করিলে জীবের চরিত্রের বহুল পরিবর্তন সাধিত হয়; (3) ইহার দ্বারা জীবের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রচেষ্টার দ্বারা নূতন চরিত্র গঠিত হইতে পারে এবং সর্বশেষ ও অতি মূল্যবান তথ্য হইল যে (4) এইরূপে Inheritance of acquired characters অথবা অর্জিত গুণাবলী সন্তান-সন্ততিতে হস্তান্তরিত হয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে পরিবেশের সহিত জীবদেহের গঠনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উর্বর জমিতে

উদ্ভিদের প্রাচুর্যপূর্ণ বৃদ্ধি হয় কিন্তু অনুর্বর জমিতে বৃদ্ধি রহিত হইয়া থাকে ল্যাম্যাকের মতে কোনো বিশেষ অঙ্গ অবিরাম ব্যবহার করিলে ইহা আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কিন্তু অব্যবহারের ফলে উহার বৃদ্ধি রহিত হইয়া ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ অর্জিত গুণাবলী সন্তানসন্ততির মধ্যে হস্তান্তরিত হয় এবং অবশেষে নূতন প্রজাতি জন্মলাভ করিতে পারে। ল্যামার্ক দুইটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাঁহার এই মতবাদ প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, পুরাকালের জিরাফের গ্রীবা ও সম্মুখের পদ দীর্ঘ ছিল না। উহা উচ্চ ডাল হইতে পাতা সংগ্রহ করিবার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে আধুনিক জিরাফের গ্রীবা এবং সম্মুখের পদ এত দীর্ঘ হইয়াছে। ল্যামার্ক বলেন, পুরাকালের উটপাখী উড়িতে পারিত। উহাদের পূর্বপুরুষেরা ক্রমাগত তাহাদের পক্ষ অব্যবহারের ফলে উহা একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হইয়াছে।



৯৪ নং চিত্র—জিয়েন ব্যাপটিস্ট-দ ল্যামার্ক

ল্যামার্কের মতবাদের সমালোচনা (Criticism of Lamarckism)—ল্যামার্কের এইরূপ সরল মতবাদকে বিজ্ঞানীগণ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতবাদ প্রকাশিত হইবার পর হইতে বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পরীক্ষা ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে ইহার বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে এই মতবাদ পরিত্যাজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

(ক) **নিরীক্ষণের তথ্যসমূহ** (Facts of observation) :

(১) কর্মী পিপীলিকা, মৌমাছি ও উইপোকা ইত্যাদি সকলেই বন্ধ্যা হয়। তাহারা কোন বংশ সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের মধ্যে পরিবেশীয় কোন পরিবর্তন অথবা অর্জিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বংশধরের মধ্যে সঞ্চারিত বা হস্তান্তরিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তথাপি নূতন বংশের কর্মী বা শ্রমিক পতঙ্গগুলির মধ্যে পরিবেশের মানানসই পরিবর্তন (তাহাদের জীবনের বা কর্মের অনুসৃত পদ্ধতির সহিত সমতাপূর্ণ) লক্ষিত হয়।

(২) আর একটি উদাহরণ আমাদের নিজেদের অর্থাৎ মেরুদণ্ডী প্রাণী হইতে দেওয়া যাইতে পারে। সর্বক্ষণ ব্যবহার করিতে করিতে আমাদের দাঁতের শেষ পরিণতি যাহা হওয়া সম্ভব তাহা হইল ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া ও অবশেষে বিলুপ্ত হওয়া। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে এবং আহার বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া দাঁতের বিভিন্ন পরিবর্তন হইয়াছে। সুতরাং

ঐ সকল পরিবর্তন ল্যামার্কের সূত্র অনুসারে হইয়াছে বলিয়া কখনও মানিয়া লওয়া যায় না।

উপরের উল্লিখিত তথ্যাদি হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে ল্যামার্কের তত্ত্ব সকল সময় কার্যকরী হয় না, শুধু তাহাই নয়, জীবজগতে প্রতিযোজনের (adaptation) ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে অর্জিত গুণাবলীর বংশানুগমনের কোন সুযোগ থাকে না অথবা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাহার বংশানুগমন লক্ষিত হয় না।

(খ) বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ তথ্যের দৃষ্টান্ত (Facts of experiment) ঃ

(১) ড্রসোফিলা মক্ষিকাদের সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে রাখিয়া পরপর 60-টি বংশধর পর্যন্ত সৃষ্টি করা হয়। এইভাবে বংশ সৃষ্টি করিয়া দেখা যাইল যে উহাদের চোখের দৃষ্টির কোন সামান্যতম তারতম্য হয় না।

পাহাড়ের গুহার অন্ধকারে বসবাসকারী প্রাণীদের দৃষ্টির অবনতির কারণস্বরূপ ল্যামার্কের সমর্থকগণ এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে কয়েক পুরুষ (generation) ধরিয়া অন্ধকার গুহায় বসবাস করিতে করিতে তাহাদের চোখের দৃষ্টির অবনতি হইয়াছে।

(২) ভাইজম্যান (Weismann) দুইটি ইঁদুর লইয়া (একটি পুং ও অপরটি স্ত্রী) তাহাদের লেজ কাটিয়া দিলেন এবং তাহাদের মধ্যে যৌন জনন সম্পন্ন করেন। এইরূপে 12টি জনু পর্যন্ত পরীক্ষা করিয়া কোন ক্ষেত্রেই "কর্তিত লেজ" চরিত্রটির বংশানুগমন দেখিতে পাইলেন না।

(৩) ল্যামার্কের বিভিন্ন সমর্থকগণ যদিও নানা পরীক্ষার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন যেগুলি ঐ তত্ত্বকে সমর্থন করে; যেমন, ক্যামিরার (Kammerer) পরীক্ষা স্যালামান্ডার প্রাণীর হলুদবর্ণ ধারণ; ম্যাকডুগালের (McDougall) ইঁদুরের শিক্ষা সংক্রান্ত পরীক্ষা এবং গুয়ার স্মিথের (Guyer Smith) ইঁদুরের মধ্যে ত্রুটিযুক্ত অক্ষির আবির্ভাব ইত্যাদি। কিন্তু উপরিউক্ত পরীক্ষাগুলি যখন জীববিদ্যাবিদগণ পুনরায় অনুষ্ঠিত করেন তখন কেহই পূর্বের ফল পাইলেন না।

(গ) বংশগতির তথ্যসমূহের দৃষ্টান্ত (Facts from mechanism of heredity) ঃ

ল্যামার্ক ও ডারউইনের সময় যৌন জননের প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা ছিল না। পরবর্তীকালে ইহা জানিতে পারা যায় যে, জননকালে একটি পিতৃ ও একটি মাতৃ জননকোষ মিলিত হইয়া একটি ডিপ্লয়েড জাইগোট গঠন করে। জাইগোট ক্রমান্বয়ে বিভাজিত হইয়া দেহ বা সোমা গঠন করে। অবশেষে ক্রোমোজোম এবং উহার উপর অবস্থিত জীনের কথাও জানিতে পারা যায়।

ভাইজম্যান (1890) উপরিউক্ত তথ্যাদি হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন যে সাধারণ দেহের অংশে কোন পরিবর্তন আসিলে তাহা জননকোষের কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না অর্থাৎ ল্যামার্কের মতবাদ অনুসারে বংশগতি কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

সম্প্রতি রুশদেশীয় জীববিজ্ঞানী লাইসেনকো (Lysenko) ল্যামার্কবাদের নূতন রূপ দিয়াছেন এবং ইহা লাইসেনকোবাদ নামে পরিচিত ; কিন্তু ইহাও বিশেষ সমর্থন লাভ করে নাই। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে অর্জিত গুণাবলীর সন্তানসন্ততিতে হস্তান্তরকরণ সম্বন্ধে পরীক্ষালব্ধ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পরিশেষে, ব্যবহার ও অব্যবহারের ফলে যে নূতন চরিত্র গঠিত হয় তাহাও বংশানুক্রমে অংশ গ্রহণ করে না।

III. ডারউইনের মতবাদ (Darwin's theory)

1859 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী (Charles Darwin : 1809—1882), ৯৫নং চিত্র, প্রজাতির উৎপত্তি বা Origin of species নামক তাঁহার সুপরিচিত গ্রন্থে প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ (*Theory of Natural Selection*) লিপিবদ্ধ করিয়া যুগান্তর আনয়ন করেন। তাঁহার এই মতবাদ অভিব্যক্তি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য প্রদান করেন এবং ইহা বিপুল সমর্থন ও সমাদর লাভ করে। ডারউইনের মতবাদের বিশেষত্বগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল ; যথা—

1. **অত্যধিক বংশ বৃদ্ধির হার** (Prodigality of Production)—জীবগণ অধিক সংখ্যায় বংশবৃদ্ধি করে কিন্তু ইহার মধ্যে অল্প কয়েকটি জীবিত থাকে। ডারউইনের বহু পূর্বে অবশ্য লিনিয়াস (Linnaeus) নামক বিজ্ঞানী এই তথ্য নির্ণয় করেন। তাঁহার মতে যদি একটি বর্ষজীবী উদ্ভিদ বৎসরে দুইটি করিয়া বীজ উৎপন্ন করে এবং বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়া উৎপন্ন চারাগুলির সকলেই যদি জীবিত থাকে ও প্রত্যেক চারাগাছ যদি অনুরূপে দুইটি করিয়া বীজ সৃষ্টি করিতে থাকে তাহা হইলে দেখা যাইবে যে কুড়ি বৎসরে দশ লক্ষেরও অধিক উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দেখা গিয়াছে, তামাক গাছ প্রতি বৎসর উদ্ভিদ প্রতি অনধিক 360,000 সংখ্যক বীজ উৎপাদন করিতে পারে এবং একপ্রকার ফার্ন বৎসরে 2000 কোটি রেণু উৎপাদন করিতে সক্ষম।



৯৫ নং চিত্র—চার্লস ডারউইন

2. **জীবন-সংগ্রাম** (Struggle for existence)—অত্যধিক বংশবৃদ্ধির ফলে খাদ্য, পানীয়, আলোক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব ঘটে এবং ফলে তাহাদের মধ্যে জীবনধারণ করিবার জন্য সর্বদাই সংগ্রাম দেখা দেয়। এই সংগ্রাম একই প্রজাতিগুলির মধ্যে অথবা একপ্রকার প্রজাতির সহিত অন্য প্রকার প্রজাতির, অথবা

উদ্ভিদের প্রজাতির সহিত প্রাণীর প্রজাতির, অথবা জীব ও পরিবেশের মধ্যে সংঘটিত হইতে পারে।

3. **বিশ্বব্যাপী পরিবৃত্তি ঘটনা** (Universal occurrence of variation)—জীবগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারণ দেখা যায় বলিয়া উহারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া চলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে পদ্মফুল জল ভিন্ন কখনও স্থলে জন্মায় না ; ফণিমনসা যে স্থানের মৃত্তিকায় জলের প্রাচুর্য কম, সেই স্থানেই জন্মায়। অধিকন্তু একই পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভিদ জন্মাইলে তাহাদের মধ্যে সকল উদ্ভিদই উহাতে সমভাবে সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া চলিতে পারে।

4. **যোগ্যতমের প্রাধান্য** (Survival of the fittest)—জীবনসংগ্রামের জন্য জীবগুলির মধ্যে নানারূপ প্রকারণ প্রকাশ পায়, যাহার ফলে প্রকৃতি তাহার নির্বাচনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে অর্থাৎ যাহারা প্রকৃতির প্রতিবন্ধকগুলিকে উপেক্ষা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম তাহারাই শুধু জয়ী হয় এবং অবশিষ্ট অনুপযুক্ত জীবগুলি লয়প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য ডারউইন তাঁহার মতবাদের নাম দিয়াছেন Natural Selection বা প্রাকৃতিক নির্বাচন।

5. **উপযুক্ত প্রকারণের বংশগতি এবং নূতন প্রজাতির উৎপত্তি** (Inheritance of advantageous variations and origin of species)—ডারউইন মনে করেন যে এইরূপে বংশপরম্পরায় ক্রমে উন্নততর প্রকারণ লক্ষিত হইবে এবং জীবগুলিকে পারিপার্শ্বিকের সহিত অধিকতর উপযুক্ত করিয়া তুলিবে। এইরূপে অবশেষে নূতন প্রজাতি জন্মলাভ করিতে পারে।

যদিও ডারউইনের এই মতবাদ জৈব অভিব্যক্তির উৎকৃষ্টে সাক্ষ্য প্রদান করে, তথাপি ইহা সর্বজনস্বীকৃত নহে। ভিন্ন মতবাদগুলি এইরূপ ; যথা—(1) তিনি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত জীবই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবে বলিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই ; (2) জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত এবং অনুপযুক্তের প্রভেদ এবং অনুপযুক্তের লয়ের কারণ সম্বন্ধে তিনি কিছুই নির্দেশ দেন নাই ; (3) পরিবেশের সহিত অতিমাত্রায় উপযুক্ত করিয়া তুলিতে কোনো কোনো জীব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ ইহাদের পক্ষে ক্ষতিকর ; (4) শত সহস্র উদ্ভিদ জীবনধারণে সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তখন সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান জীবকে বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়, (5) কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রকারণের নির্দিষ্ট সীমা আছে ; (6) উদ্ভিদ ও প্রাণীর বহুপ্রকার প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য আছে যাহার সহিত তাহাদের জীবনসংগ্রামের উপযুক্ততার কোনো সম্পর্ক নাই ; (7) প্রকারণগুলি বিভিন্ন হইলেও উন্নত ধরনের জটিল জীবের আবির্ভাব ইহার দ্বারা প্রমাণ করা যায় না।

এই সকল মতবিরোধ সত্ত্বেও ডারউইনের মতবাদ সুপ্রজননবিদ্যায় (Genetics) নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছে।

IV. ভাইজম্যানের মতবাদ (Weismann's theory)

ডারউইনের মৃত্যুর পর August Weismann (আগস্ট ভাইজম্যান 1834—1914) তাঁহার এই মতবাদ প্রকাশ করেন। তিনি ল্যামার্কবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ডারউইনের মতবাদকেও তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে অর্জিত গুণাবলী কখন সন্তান-সন্ততিতে বর্তায় না। তাঁহার মতবাদের নাম Germplasm theory বা জার্মপ্লাজম মতবাদ। প্রকারণ বিশ্লেষণ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষার পর তিনি এই মতবাদ প্রকাশ করেন। তাহার মতবাদ হইল, প্রতি জীবিত প্রাণীর দুই প্রকার পদার্থ আছে ; একটি হইল জার্মপ্লাজম (germplasm) এবং অপরটি হইল সোমাটোপ্লাজম (somatoplasm)। জার্মপ্লাজম হইতে জনন কোষ এবং নূতন জীবদেহ গঠিত হয় এবং ইহা অবিরাম গতিতে বংশানুক্রম বজায় রাখে কিন্তু সোমাটোপ্লাজম সর্বদাই প্রতি বংশে নূতন রূপে উদ্ভূত হয় এবং জার্মপ্লাজম হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থান করে। সোমাটোপ্লাজমের এইরূপ ধারাবাহিকতার অভাব ঘটে বলিয়া নূতন প্রকারণ দেখা দিলে ইহা সন্তান-সন্ততিতে প্রকাশিত হয় না। অধিকন্তু সোমাটোপ্লাজম জার্মপ্লাজমে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

V. দ্য ভ্রীসের পরিব্যক্তিবাদ (De Vries Mutation Theory)

ওলন্দাজ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী Hugo de Vries (হুগো দ্য ফ্রীস 1848—1935 ; ৯৬নং চিত্র), এই মতবাদ প্রচলন করেন। তাঁহার মতে একপ্রকার সূক্ষ্ম এবং অস্থির প্রকারণ আছে যাহারা ডারউইনের মতে বংশগতিশীল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। তিনি বলেন, কতকগুলি জীবে এইপ্রকার প্রকারণ আকস্মিকভাবে বংশগতির স্থায়ী পরিবর্তন ঘটায় যাহার ফলে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়। তাঁহার মতে এইপ্রকার প্রকারণই প্রকৃত প্রকারণ এবং এই ঘটনাকে **পরিব্যক্তি** (Mutation) বলে। পরিব্যক্তি অতিমাত্রায় সংঘটিত হইতে পারে। দ্য ফ্রীসের এই মতবাদের নাম **পরিব্যক্তিবাদ** (Mutation theory) এবং যে জীবে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে mutant বা **পরিব্যক্তিশীল জীব** বলে।



৯৬নং চিত্র—হুগো দ্য ফ্রীস

ইহা অতিমাত্রায় সংঘটিত হইলে তখন ইহাকে **অঙ্গবিকৃতি** (monostrocities) বলা হয়। পরিব্যক্তির বিশেষত্বগুলি নিম্নরূপ ; যথা—(1) মধ্যে মধ্যে একই প্রজাতির

মধ্যে পরিব্যক্তিশীল জীবের সৃষ্টি হয়; (2) বহুক্ষেত্রেই পরিব্যক্তিশীল জীবের বৈশিষ্ট্যগুলি সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়; (3) অস্থির প্রকারণের সহিত পরিব্যক্তির কোনো সম্পর্ক নাই; (4) পরিব্যক্তি ভিন্নমুখী হইতে পারে; (5) পরিব্যক্তিশীল জীব সাধারণত প্রাকৃতিক নির্বাচনপথ অনুসরণ করে; (6) অনুপযোগী পরিব্যক্তিশীল জীব প্রাকৃতিক নির্বাচনে লুপ্ত হয়।

প্রকারণ কোনো নিয়মের বশবর্তী নয়। ইহা জীবনচক্রের যে-কোনো স্থানে, gamets বা গ্যামেটে অথবা zygote বা জাইগোটে অথবা somatic cells বা দেহকোষেও সংঘটিত হইতে পারে।

বিভিন্ন প্রকার পরিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—জীন পরিব্যক্তি (gene mutations), ক্রোমোজোমীয় পরিব্যক্তি (chromosomal mutations) এবং জীনোমীয় পরিব্যক্তি (genomatic mutations)। কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে পরিব্যক্তি পাঁচ প্রকারের; যথা—জীনপরিব্যক্তি (gene mutations), আকৃতিগত পরিব্যক্তি (structural mutations), সংখ্যাগত পরিব্যক্তি (numerical mutations), প্লাস্টিড পরিব্যক্তি (plastid mutations), এবং সাইটোপ্লাজমীয় পরিব্যক্তি (cytoplasmic mutations)।

জীন পরিব্যক্তি (*Genc mutation*)—ইহার সম্বন্ধে Genetics বা সুপ্রজননবিদ্যা বিভাগে আলোচনা করা হইয়াছে।

ক্রোমোজোমীয় পরিব্যক্তি (*Chromosomal mutation*)—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জীনগুলি নির্দিষ্ট অনুক্রমে ক্রোমোজোম গাত্রে রেখাকারে সজ্জিত থাকে এবং প্রতি ক্রোমোজোমে নির্দিষ্ট সংখ্যক জীন থাকে। এখন এইরূপ হইতে পারে যে ক্রোমোজোম সংখ্যার কোনরূপ পরিবর্তন না হইয়া কোনো নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমে জীনের সংখ্যা অথবা ইহাদের অনুক্রমের পরিবর্তন হইতে পারে। ক্রোমোজোমের এইরূপ পরিবর্তনকে chromosomal mutations বা ক্রোমোজোমীয় পরিবর্তন বলে। ক্রোমোজোম প্রস্থে খণ্ডিত হইয়া একটি ক্রোমোজোমের খণ্ড অপর ক্রোমোজোমের খণ্ডের সহিত যুক্ত হইয়া অথবা অনুরূপ প্রক্রিয়ায় এইরূপ পরিব্যক্তি সাধিত হয়।

জীনোমীয় পরিব্যক্তি (*Genomatic mutations*)—এইরূপ পরিব্যক্তি ক্রোমোজোম গোষ্ঠীর সংখ্যার পরিবর্তন দ্বারা সংঘটিত হয়। Cytology বা কোষবিদ্যা বিভাগে পলিপ্লয়েডী (Polyploidy) অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

দেহকোষ পরিব্যক্তি (*Somatic mutations*)—কখনও কখনও যৌনকোষ ব্যতীত বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে অবস্থিত দেহকোষেও পরিব্যক্তি দেখা যায়। এইরূপ পরিব্যক্তিকে দেহকোষ পরিব্যক্তি বলে। অঙ্গজ জননের দ্বারা কোনো কোনো অঞ্চলে পরিব্যক্তি অংশ গঠিত হইতে পারে এবং ইহা হইতে নূতন উদ্ভিদ জন্মলাভ করে।

উপরিলিখিত পরিব্যক্তিগুলি জীবদেহের কোনো বিশিষ্ট বিপাকীয় অথবা জৈবনিক ক্রিয়ার দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত সংঘটিত হয় এবং এইজন্য ইহাদের স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যক্তি (spontaneous mutations) বলে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বহিস্থ অথবা

অন্তঃস্থ কারণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পরিব্যাপ্তি সংঘটিত হইতে পারে। এইরূপ পরিব্যাপ্তিকে **আবিষ্ট পরিব্যাপ্তি** (induced mutation) বলে।

আবিষ্ট পরিব্যাপ্তি (Induced Mutation)—X-ray বা রঞ্জন রশ্মি, অথবা বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ নির্দিষ্ট মাত্রায় সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করিলে পরিব্যাপ্তি আবিষ্ট করা যাইতে পারে। আবেশ সৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থগুলির মধ্যে কলচিসিন (colchicine) সালফানিলামাইড (sulphanilamide), ফিনাইল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (phenylacetic acid) বেনজিন (benzene), ডি ডি টি (DDT) প্রভৃতি প্রধান। কখনও কখন সাধারণ অপেক্ষা অধিক তাপমাত্রা প্রয়োগেও পরিব্যাপ্তি আবিষ্ট হইতে পারে। এই প্রকার আবিষ্ট উদ্ভিদ হইতে নূতন উদ্ভিদের variety বা প্রকার এবং ক্রমে species বা নূতন প্রজাতি জন্মলাভ করিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে আবেশ সৃষ্টিকারী পদার্থগুলির প্রয়োগের মাত্রাধিক্য ঘটিলে বিভিন্ন প্রকার কঠিন রোগ এবং এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।


কলাস্থান

১ উদ্ভিদ কোষস্থ আরগাস্টিক পদার্থ
(Ergastic Substances in Plant Cells)

উদ্ভিদ কোষের গঠন সম্বন্ধে কোষবিদ্যা (cytology) অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। উদ্ভিদ কোষের প্রোটোপ্লাজমে জীবিত অংশগুলি ব্যতীত নানাবিধ নির্জীব পদার্থ (nonliving substances) থাকে যাহাদিগকে আরগাস্টিক পদার্থ (ergastic substances) বলে। ইহাদের অধিকাংশই সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত থাকিতে পারে। এই সকল নির্জীব পদার্থগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে : (i) **সঞ্চিত পদার্থ** (reserve materials), (ii) **অন্তঃক্ষরিত পদার্থ** (secretary products) ও (iii) **বর্জ্য পদার্থ** (waste products)।

1. সঞ্চিত পদার্থ (**Reserve materials**)

এই সকল পদার্থ প্রোটোপ্লাজম কর্তৃক উৎপন্ন হয় এবং এক প্রকার বিশেষ প্রকৃতির কোষে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত থাকে। সেই কারণে ইহাদের উদ্ভিদের খাদ্যরূপে গণ্য করা হয়। ইহারা কঠিন অথবা তরল অবস্থায় থাকিতে পারে। ইহারা নাইট্রোজেন ঘটিত অথবা অ-নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ হইতে পারে।

A. অ-নাইট্রোজেন ঘটিত সঞ্চিত পদার্থ (**Non-nitrogenous reserve materials**)

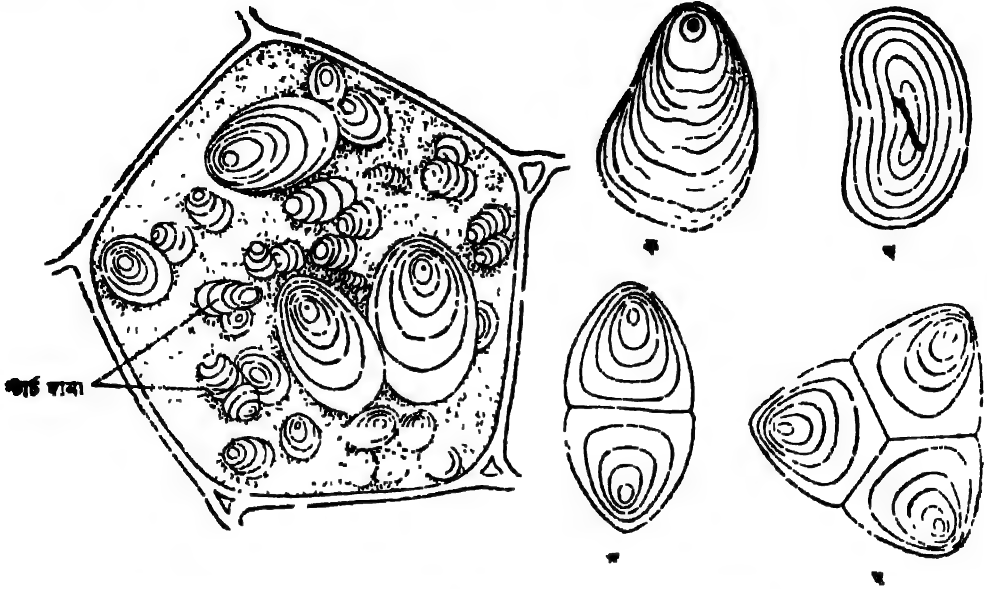
1. **কার্বহাইড্রেট** (Carbohydrates)—কার্বন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে গঠিত জৈব যৌগকে কার্বহাইড্রেট বলে। ইহাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত হইল যথাক্রমে জলের অনুরূপ অর্থাৎ 2 : 1। উত্তাপ প্রয়োগে ইহা হইতে জল অপসারিত হয় এবং কৃষ্ণ বর্ণের দগ্ধ কার্বনের অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে। কার্বহাইড্রেট জলে দ্রবণীয় অথবা অদ্রবণীয় হইতে পারে। **স্টার্চদানা** (starch grains) **সঞ্চিত সেলুলোজ** (reserve cellulose) ও **গ্লাইকোজেন** (glycogen) হইল অদ্রবণীয় কার্বহাইড্রেট এবং শর্করা (sugar) ও ইনুলিন (Inulin) হইল দ্রবণীয় কার্বহাইড্রেট।

অদ্রবণীয় কার্বহাইড্রেট (Insoluble carbohydrates) :—

(a) স্টার্চদানা (starch grains)—ইহা অদ্রবণীয় কার্বহাইড্রেট। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খাদ্য হিসাবে ইহাকে গণ্য করা হয়। ইহার রাসায়নিক সংকেত হইল $(C_6H_{10}O_5)_n$। উদ্ভিদের অধিকাংশ অংশে স্টার্চ দানারূপে সঞ্চিত থাকে বলিয়া ইহাদের স্টার্চদানা (starch grains) বলে। স্ফীত মূল ও ভূনিম্নস্থ কাণ্ডে ইহাদিগকে প্রধানত দেখিতে পাওয়া যায়। শীতল জল, কোহল ও ইথারে ইহা অদ্রবণীয়।

স্টার্চ দানা দুই প্রকারের হইয়া থাকে। **আত্তীকরণ স্টার্চ** (assimilation starch) ও **সঞ্চিত স্টার্চ** (reserve starch) সালোক সংশ্লেষের সময় উদ্ভিদ দেহের ক্লোরোপ্লাস্টের সাহায্যে আত্তীকরণ স্টার্চ গঠিত হয় এবং অস্থায়ীরূপে কোষ

মধ্যে সঞ্চিত থাকে। পরন্তু শর্করা দ্রবণ হইতে লিউকোপ্লাস্টের সাহায্যে সঞ্চিত স্টার্চ উৎপন্ন হয় এবং ইহার গঠনে আলোকের প্রয়োজন হয় না। সঞ্চিত স্টার্চ আত্তীকরণ



১৭নং চিত্র—স্টার্চ দানা : (ক) অযুক্ত (উৎকেন্দ্রীয়) : (খ) অযুক্ত (এককেন্দ্রীয়) (গ) অর্ধযুক্ত ; (ঘ) যুক্ত।

স্টার্চ অপেক্ষা আকারে বড় দেখিতে হয় ও ইহাদের নির্দিষ্ট আকৃতি আছে। ইহারা প্রধানত উদ্ভিদের সঞ্চয় অঙ্গে সঞ্চিত থাকে। জলে অদ্রবণীয় হইলেও উদ্ভিদের পুষ্টি-সাধনের সময় স্টার্চদানা ডায়াস্টেজ (diastase) অথবা অ্যামাইলেজ (amylase) নামক এনজাইমের সাহায্যে দ্রবণীয় শর্করাতে পরিণত হয়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে স্টার্চদানা পরীক্ষা করিলে ইহাকে স্তরীভূত (stratified) দেখায়। ইহার কারণস্বরূপ বলা হয় যে স্টার্চ দানা ও জল ইহাতে পর্যায়ক্রমে সঞ্চিত থাকে। স্তরগুলি একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে স্থাপিত হয়। এই বিন্দুটিকে হাইলাম (hilum) বলে। হাইলাম হইল উজ্জ্বল, ইহা গোলাকার তারকাকার, কোন বিশিষ্ট বা খণ্ডিত হইতে পারে। হাইলাম দানার এক পার্শ্বে থাকিলে ইহাকে উৎকেন্দ্রীয় বা অপকেন্দ্রীয় (eccentric) বলে কিন্তু ইহা দানার কেন্দ্রে অবস্থিত হইলে এককেন্দ্রীয় বা সমকেন্দ্রীয় (concentric) বলে। আলুতে উৎকেন্দ্রীয় দানা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু মটর বীজে এককেন্দ্রীয় দানা দেখা যায়। স্টার্চ দানাগুলি পৃথক থাকিলে উহাদিগকে সরল বা অযুক্ত দানা (simple grains) বলে। কখন কখন দুই বা ততোধিক দানা একত্রে পুঞ্জীভূত থাকিলে উহাকে যৌগিক বা যুক্তদানা (compound grains) বলে। দুই বা ততোধিক যুক্তদানা কতকগুলি স্তর দ্বারা বেষ্টিত হইলে উহাদিগকে অর্ধযৌগিক বা অর্ধযুক্ত দানা (semi-compound grains) বলে। বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে স্টার্চদানার আকৃতিও বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে। আলুর ক্ষেত্রে ইহা ডিম্বাকার ও উৎকেন্দ্রীয় ; মটরের ক্ষেত্রে ইহা

গোলাকার ও এককেন্দ্রীয়; চাউল, ভুট্টা প্রভৃতির ক্ষেত্রে ইহা বহুক্ষেত্র বিশিষ্ট এবং ফণিমনসার ক্ষেত্রে ইহা ডম্বেলের ন্যায় দেখিতে হয়।

স্টার্চদানার পরীক্ষা (Testes for starch grains) :—

(1) ইহা শীতল জলে, কোহলে বা ঈথারে অদ্রবণীয় (2) লঘু আয়োডিনের দ্রবণ প্রয়োগ করিলে ইহা নীল হইতে পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে।

(b) সঞ্চিত সেলুলোজ (Reserve cellulose)—সঞ্চিত সেলুলোজ একপ্রকার অদ্রবণীয় কার্বহাইড্রেট। ইহার রাসায়নিক সংকেত হইল $(C_6H_{10}O_5)_n$। স্টার্চ-দানা অপেক্ষা ইহাকে স্বল্প পরিমানে উদ্ভিদে দেখিতে পাওয়া যায়। সেলুলোজ দ্বারা গঠিত কোষ প্রাচীরে সঞ্চিত খাদ্য থাকে না। খেজুর, নারিকেল প্রভৃতির সস্যে (endosperm) যে অতিরিক্ত সেলুলোজ নির্মিত প্রাচীর থাকে তাহাই সঞ্চিত সেলুলোজ। পোষণের জন্য আবশ্যক হইলে ইহা **সেলুলেজ** (cellulase) নামক এনজাইম ক্রিয়ার দ্বারা শর্করায় পরিণত হয়।

সেলুলোজের পরীক্ষা (Tests for cellulose)—(1) ইহা কোহল, ক্ষার বা লঘু অ্যাসিডে অদ্রবণীয়। (2) আয়োডিনের দ্রবণ ও সালফিউরিক অ্যাসিড (sulphuric acid) প্রয়োগ করিলে ইহা নীল বা পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে। (3) ক্লোর-জিঙ্ক-আয়োডিন (chlor zinc iodine) প্রয়োগ করিলেও ইহা নীল পিঙ্গল বর্ণের হয়।

(c) গ্লাইকোজেন (Glycogen)—গ্লাইকোজেন স্টার্চের ন্যায় এক প্রকার কার্বহাইড্রেট পদার্থ। ইহাকে **প্রাণীজ স্টার্চ** (animal starch) নামেও অভিহিত করা হয়। উদ্ভিদের মধ্যে ইহা প্রধানত ছত্রাকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে প্রধানত অনিয়তাকার পদার্থরূপে ছত্রাকের অনুসূত্রে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকিতে দেখা যায়। ইহার কার্য ও শর্করার ন্যায়। আবশ্যক হইলে গ্লাইকোজেনেজ (glycoganase) নামক এনজাইমের ক্রিয়ার দ্বারা শর্করায় পরিণত হয়।

গ্লাইকোজেনের পরীক্ষা (Test for glycogen)—আয়োডিনের দ্রবণ প্রয়োগ করিলে ইহা লোহিত-বাদামী (reddish brown) বর্ণ ধারণ করে।

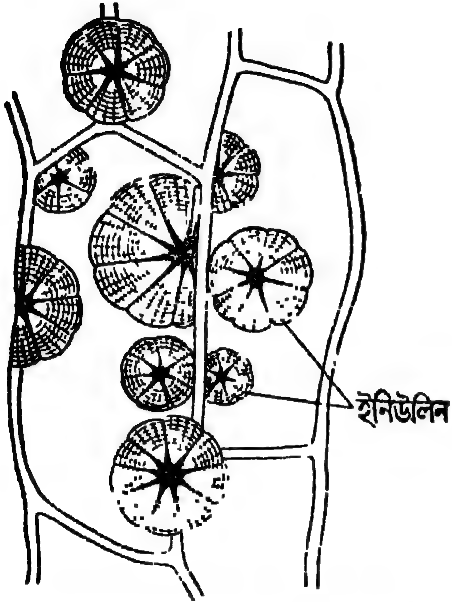
দ্রবণীয় কার্বহাইড্রেট (Soluble Carbohydrate)

(a) **শর্করা** (Sugars)—শর্করা হইল দ্রবণীয় কার্বহাইড্রেট। শকরা বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। দ্রাক্ষা শর্করা (glucose or cane sugar) হইল সর্বাপেক্ষা সরল প্রকৃতির শর্করা এবং ইহা পাকা ফলেও পিঁয়াজের রসাল শল্কপত্রে থাকে। ইহার রাসায়নিক সংকেত হইল $C_6H_{12}O_6$। ইক্ষু শর্করা (Sucrose or grape sugar) হইল অপর একপ্রকার শর্করা যাহা ইক্ষুর কাণ্ডে ও বীটের মূলে থাকে। ইহার রাসায়নিক সংকেত হইল $C_{12}H_{22}O_{11}$। আবশ্যক হইলে ইক্ষু শর্করা এনজাইম ক্রিয়ার দ্বারা দ্রাক্ষা শর্করায় পরিণত হয়।

শর্করার পরীক্ষা (Tests for sugars)—উদ্ভিদের যে অংশে দ্রাক্ষা শর্করা আছে তাহার ক্ষুদ্র অংশ লইয়া কিছু পরিমাণ কপার সালফেট বা তুঁতে (Copper sulphate)

ও কষ্টিক পটাশের (caustic potash) দ্রবণ প্রয়োগ করিয়া উত্তপ্ত করিলে যখন উহা ফুটিতে থাকিবে তখন রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা ইণ্টকের ন্যায় লোহিত বর্ণের (brick red) অধঃক্ষেপ দেখা যাইবে। ইক্ষু শর্করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত পরীক্ষায় দ্রবণটি নীল বর্ণ (blue colour) ধারণ করিবে।

(b) ইনুলিন (Inulin)—ইনুলিন হইল একপ্রকার দ্রবণীয় কার্বহাইড্রেট। ইহাকে ডালিয়া, হাতীচোখ প্রভৃতির কন্দাল মূলের (tuberous root) কোষে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রাসায়নিক সংকেত হইল $(C_6H_{10}O_5)_n$।



৯৮নং চিত্র—ডালিয়ার কন্দাল মূল হইতে ইনুলিন দেখান হইয়াছে

ইনুলিনের পরীক্ষা (Tests for inulin) - ডালিয়া বা হাতীচোখের কন্দাল মূলকে কিছুদিন যাবৎ 95% কোহল প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে কোষ প্রাচীরের গাত্রে বা কোণে পাখার ন্যায় দেখিতে কেলাস সঞ্চিত হইয়াছে।

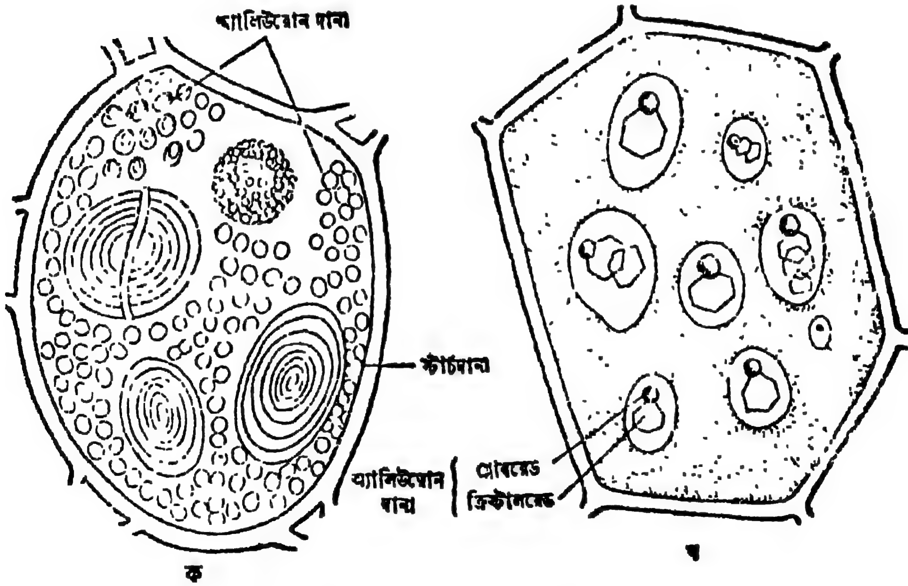
2. স্নেহ ও তৈল পদার্থ (Fats and oils) -স্নেহ ও তৈল পদার্থ হইল বিভিন্ন প্রকারের স্নেহজাত অ্যাসিড (fatty acids) ও গ্লিসারলের (glyceryol) যৌগিক পদার্থ। সাধারণ তাপে স্নেহ পদার্থ কঠিন অবস্থায় থাকে কিন্তু তৈল হইল তরল পদার্থ। কার্বহাইড্রেটের ন্যায় ইহারা কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত তবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন জলের অনুপাতে থাকে না। ইহারা উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খাদ্য হিসাবে পরিগণিত। যে সকল বীজে কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ স্বল্প থাকে ঐ সকল বীজে স্নেহ ও তৈল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং সাইটোপ্লাজমে বিন্দুর আকারে অবস্থান করে। অর্কিড ও লিলি গোত্রীয় উদ্ভিদের (অর্কিডেসী ও লিলিয়েসী) ত্বকের কোষে ইটিওপ্লাস্ট (etioplasts) নামক বিশেষ অংশের সাইটোপ্লাজমে তৈল বিন্দু দেখা যায়। সম্ভবত ইহারা কার্বহাইড্রেট হইতে উৎপন্ন হয় এবং শ্বাসকার্যের সময় ব্যয়িত হয় ও শক্তি সংগ্রহ করে।

স্নেহ ও তৈল পদার্থের পরীক্ষা (Tests for fats and oils)—(1) ইহারা (রেড়ীর তৈল ব্যতীত) জলে ও কোহলে অদ্রবণীয় কিন্তু পেট্রোলিয়াম (petroleum) ক্লোরোফর্ম (chloroform) ও ঈথারে (ether) দ্রবণীয়। (2) 1% অসমিক অ্যাসিডের (Osmic acid) জলীয় দ্রবণ প্রয়োগ করিলে ইহারা কৃষ্ণবর্ণ বা বাদামী বর্ণে পরিণত হয়। (3) সুডান III (Sudan III) প্রয়োগ করিলে ইহারা লোহিত বর্ণ ধারণ করে।

B. নাইট্রোজেন ঘটিত সঞ্চিত পদার্থ (Nitrogenous reserve materials)

নাইট্রোজেন ঘটিত সঞ্চিত খাদ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ব্যতীত সর্বদাই নাইট্রোজেন থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সালফার ও ফসফরাস দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি জীবিত কোষে ইহা কঠিন অথবা তরল অবস্থায় থাকে। কেবলমাত্র তরল অবস্থায় ইহা কোষ হইতে কোষান্তরে পরিবাহিত হয়।

প্রোটিন (Proteins)—ইহারা উদ্ভিদের অতীব জটিল অদ্রবণীয় নাইট্রোজেন ঘটিত সঞ্চিত পদার্থ। ইহারা উদ্ভিদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং প্রোটোপ্লাজমের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রতি জীবিত কোষে ইহাদের দেখা যায়। নিউক্লিয়াসে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে বলিয়া এইরূপ প্রোটিনকে নিউক্লিও প্রোটিন (nucleo proteins) বলে। প্রোটিন প্রধানত ভ্যাকুওলের (Vacuoles) মধ্যে থাকে এবং ইহারা ক্রমশ কঠিন হইয়া কেলাসে পরিণত হয়। যে সকল বীজে তৈলের পরিমাণ অধিক অথবা কার্বহাইড্রেট স্বল্প থাকে সেই সকল



৯৯নং চিত্র—অ্যালিউরোন দানা : (ক) মটর বীজের অ্যালিউরোন দানা; (খ) রেড়ি বীজের অ্যালিউরোন দানা

বীজই প্রোটিন উৎপন্ন হয়। প্রোটিন অনিয়তাকার (amorphous) অথবা কেলাসাকার (crystalline) দেখিতে হয়। অনিয়তাকার প্রোটিন আকারবিহীন অথবা গোলাকার হইয়া থাকে এবং কেলাসাকার প্রোটিনকে ক্রিস্টালয়েড (crystalloids) বলে। কেলাসাকার প্রোটিন অনিয়তাকার প্রোটিনের সহিত যুক্ত হইলে ইহাদের অ্যালিউরোন দানা (aleurone grains) বলে। বহু প্রকার বীজের ভ্রূণে (embryo), সস্যে (endosperm) ও পেরিস্পার্মে (perisperm) অ্যালিউরোন দানা দেখিতে পাওয়া যায়। মটর বীজের বীজপত্রের কোষে ইহারা প্রচুর পরিমাণে থাকে। ভুট্টা, গম

প্রভৃতির ক্ষেত্রে দানা ত্বকের পরবর্তী কোষস্তরে ইহাদের দেখা যায়। রেড়ীর সঙ্গে ক্রিস্টালয়েডের সহিত একপ্রকার গোলাকার খনিজ পদার্থ সংযুক্ত থাকিতে দেখা যায় যাহাকে গ্লোবয়েড (globoid) বলে। গ্লোবয়েড হইল ক্যালসিয়াম ফসফেট (calcium phosphate) ও ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট (magnesium phosphate) দ্বারা গঠিত।

তরল প্রোটিনকে অ্যামাইড (amide) বলে। আবশ্যক হইলে অ্যালিউরোন দানা এনজাইম ক্রিয়ার দ্বারা অ্যামাইডে পরিণত হয়। ইহাকে সাধারণত শাখা-প্রশাখার অগ্রভাগের কোষে দেখিতে পাওয়া যায়।

অ্যালিউরোন দানার পরীক্ষা (Tests for aleurone grains)—(1) আয়োডিনের দ্রবণ প্রয়োগ করিলে ইহারা হরিদ্রাভ বা বাদামী বর্ণ ধারণ করে। (2) লঘু কষ্টিক পটাশের দ্রবণে প্রথমে ক্রিস্টালয়েড স্ফীত হয় ও অবশেষে ইহা দ্রবীভূত হয় কিন্তু গ্লোবয়েডের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। (3) নাইট্রিক অ্যাসিড (nitric acid) প্রয়োগ করিলে গ্লোবয়েড দ্রবীভূত হয় কিন্তু ক্রিস্টালয়েড অপরিবর্তিত থাকে।

II. অন্তঃক্ষরিত পদার্থ (Secretory Products)

অন্তঃক্ষরিত পদার্থগুলি প্রোটোপ্লাজমের বিপাকের ফলে গঠিত হয়। ইহাদের সহিত উদ্ভিদের পোষণের কোন সম্পর্ক নাই ; কিন্তু ইহারা উদ্ভিদের কোন না কোন উপকার সাধন করে। বিভিন্ন প্রকার অন্তঃক্ষরিত পদার্থ নিম্নে বর্ণিত হইল :

1. **রঞ্জক পদার্থ** (colouring matters)—উদ্ভিদে বিভিন্ন প্রকার রঞ্জক পদার্থ দেখা যায়। রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতিতেই ফুল, ফল প্রভৃতি নানাবর্ণ ধারণ করে। ক্লোরোফিল (clorophyll) নামক সবুজ বর্ণের রঞ্জন পদার্থ ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে থাকে। সবুজ বর্ণ উদ্ভিদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় কারণ ইহা ব্যতীত সালোক-সংশ্লেষ (photosynthesis) সম্পন্ন হয় না। অ্যান্থোসায়ানিন (anthocyanin) হইল অপর এক প্রকার প্রয়োজনীয় রঞ্জক পদার্থ। ইহা কোষরসে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা কেলাসাকারেও থাকিতে পারে। ইহাকে জল, কোহল ও ঈথার প্রয়োগে পৃথক করা যায়। কোষরসের প্রকৃতির উপর অ্যান্থোসায়ানিনের বিক্রিয়া দ্বারা ইহার বর্ণ নিরূপিত হয়। বিক্রিয়া শেষে কোষরস অ্যাসিড হইলে ইহা লোহিত বর্ণ ধারণ করে কিন্তু ক্ষার হইতে ইহা নীল বর্ণের হয়। পুষ্প, নবগঠিত বিভিন্ন বর্ণের কাণ্ড, বীটপাছের মূল, নবগঠিত লোহিত আমপাতা প্রভৃতিতে অ্যান্থোসায়ানিন উৎপন্ন হয়। ইহা সবুজ বর্ণের ক্লোরোফিলকে আবৃত করিয়া রাখে।

ক্লোরোফিল ও অ্যান্থোসায়ানিন ব্যতীত ক্যারটিনয়েড (Carotinoids) নামক অপর এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ আছে। ইহারা ক্যারোটিন (carotene) ও জ্যান্থফিল (xanthophyll) নামক রঞ্জক পদার্থের সমষ্টি। ইহারা ক্লোরোফিল অথবা ক্রোমোপ্লাস্টের সহিত পৃথকভাবে থাকিতে পারে কিন্তু কোষরসের সহিত কখনও দ্রবীভূত থাকে না। ইহার কার্য হইল, ফুল ও ফলে নানা ধরনের বর্ণের সৃষ্টি করা। ফুলের

বর্ণ কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করিয়া পরাগযোগ সাধন করে এবং ফলের বর্ণ পশুপক্ষীকে আকৃষ্ট করিয়া বীজের বিস্তার সাধন করে।

2. এনজাইম (Enzymes)—ইহা একপ্রকার অত্যাশ্চর্য নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ। ইহারা প্রোটোপ্লাজম কর্তৃক নিঃসৃত হয় এবং জৈব অনুঘটকরূপে (catalysts) ক্রিয়া করে।

এনজাইম সর্বদাই জীবিত কোষের মধ্যে থাকে এবং শ্বাসকার্য, আত্তীকরণ, পরিপাক প্রভৃতি জৈবনিক কার্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ইহারা অদ্রবনীয় খাদ্যকে দ্রবীভূত করে এবং এই প্রক্রিয়া সময় স্বয়ং অক্ষুণ্ণ থাকিয়া রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করে।

3. মিষ্টরস বা মধু (Nectar)—ইহা মিষ্ট স্বাদযুক্ত ও মধুগ্রন্থি হইতে নির্গত হয়। ইহার প্রধান কার্য হইল যে ইহা কীট-পতঙ্গকে আকৃষ্ট করিয়া পরাগযোগ সাধন করে।

III. বর্জ্য পদার্থ (Excretory or waste products)

বর্জ্য পদার্থগুলি বিপাকের সময় উপজাতরূপে গঠিত হয়। ইহারা পোষণে কোনরূপ সহায়তা করে না। প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদের কোন বিশেষ রেচন-ইন্দ্রিয় নাই ইহাদের কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য পদার্থগুলি বর্ণিত হইল :

1. উপক্ষার (Alkaloid)—ইহা নাইট্রোজেন ঘটিত জটিল পদার্থ এবং কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত। উদ্ভিদের মূল, বীজ, পাতা, বল্কল প্রভৃতি অংশে জৈব অ্যাসিডের সমন্বয়ে ইহা উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিষাক্ত, তিক্ত স্বাদযুক্ত। ইহারা কেলাস ও তরল, উভয় আকৃতি বিশিষ্ট হইতে পারে এবং কোহলে দ্রুত দ্রবণীয়। উপক্ষারের কতকগুলি বিশিষ্ট উদাহরণ হইল সিঙ্কোনা গাছের (cinchona) বল্কলে গঠিত, কুইনাইন (quinine), তামাক গাছের পাতায় উৎপন্ন, নিকোটিন (nicotine), আফিম গাছের মরফিন (morphine) নাক্সভমিকা গাছের বীজের স্ট্রিকনিন (strychnine), কোকো গাছের পাতার কোকেন (cocaine), চা গাছের পাতার থিয়েন (thein), কফি গাছের বীজের ক্যাফিন (caffein) প্রভৃতি।

2 জৈব অ্যাসিড (Organic acids)—বিভিন্ন প্রকার জৈব অ্যাসিড উদ্ভিদ-কোষে প্রস্তুত হয় এবং ইহারা কোষরসে মিশ্রিত থাকে। ইহাদের মধ্যে লেবুতে উৎপন্ন সাইট্রিক অ্যাসিড, (citric acid) তেঁতুলে উৎপন্ন টারটারিক অ্যাসিড (tartaric acid), আপেলে উৎপন্ন ম্যালিক অ্যাসিড (malic acid) প্রভৃতি প্রধান। ইহারা বিভিন্ন জৈবনিক ক্রিয়া, বিশেষত শ্বাসকার্যে অংশ গ্রহণ করে।

3. রজন (Resins)—রজন হইল কঠিন ভঙ্গুর, অনুদ্বায়ী জটিল পদার্থ এবং উদ্বায়ী তৈল জারিত হইয়া গঠিত হয়। ইহা ক্ষার ও কোহলে দ্রবণীয় কিন্তু জলে অদ্রবণীয়। জলে মিশাইলে ইহা অবদ্রব (emulsion) গঠন করে। উদ্বায়ী তেলে দ্রবণীয় রজনকে অলীয় রজন (oleo-resins) বলে ; যথা তার্পিন (terpentine)

এবং উদ্বায়ী তৈলের সহিত ইহা মিশ্রিত থাকিলে ইহাকে গঁদ রজন (gum resins) বলে ; যথা হিং (asafoetida)।

4. **গঁদ** (Gums)—সেলুলোজ দ্বারা গঠিত কোষপ্রাচীর বিশ্লিষ্ট হইয়া গঁদ উৎপন্ন হয়। বাবলা গাছের আঠা, কর্পূর প্রভৃতি হইল ইহার উদাহরণ।

5. **ট্যানিন** (Tannins)—ট্যানিন হইল নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ এবং অধিকাংশ উদ্ভিদের কর্টেক্স ও ফ্লোয়েমের সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র দানারূপে পৃথক বা একত্রিত থাকিতে দেখা যায়। প্রধানত প্যারেনকাইমা অথবা কর্কের কোষে ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন প্রোটোপ্লাজমে দ্রবীভূত হইয়া ইহাদিগকে গঁদ বা মিউসিলেজের ন্যায় দেখিতে হয়। ওক গাছের (Quercus sp) ফ্লোয়েমে এবং তেঁতুল গাছের ফলে ট্যানিন থাকে। খয়ের গাছ (*Acacia catechu*) হইতে যে খয়ের উৎপন্ন হয় তাহাও একপ্রকার ট্যানিন। যে সকল কাষ্ঠে ট্যানিন থাকে তাহারা সহজেই বিনষ্ট হয় না। সেইজন্য এই প্রকার কাষ্ঠ অতিশয় মূল্যবান বলিয়া গণ্য করা হয়। ট্যানিনের কার্য : (a) ইহা কোষকে শুষ্কতা, বিনাশ ও আঘাত হইতে রক্ষা করে ; (b) স্টার্চের বিপাক ও শর্করার পরিবহণে ইহা সহায়তা করে ; (c) সাইটোপ্লাজমের কোলয়ডীয় প্রকৃতি রক্ষা করে।

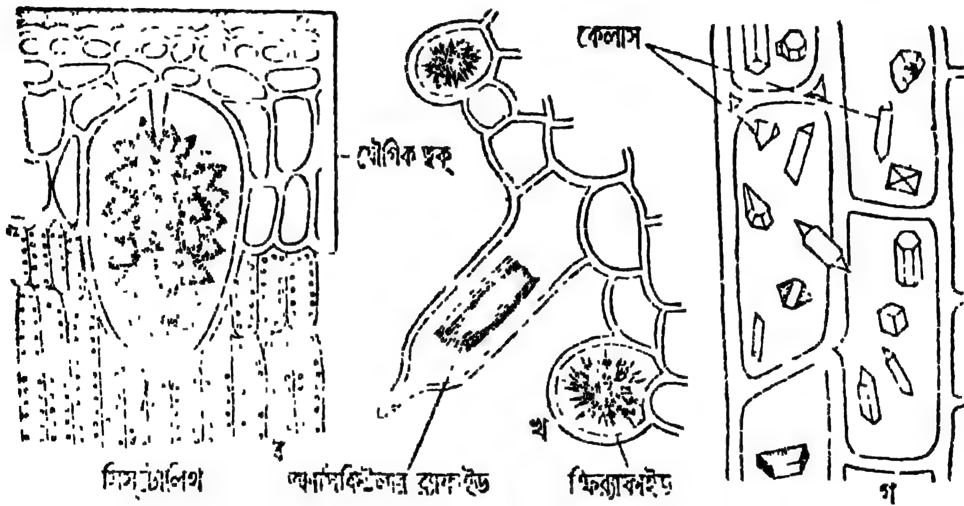
ট্যানিনের পরীক্ষা (Tests for tannins)—(a) ফেরিক ক্লোরাইড বা ফেরাস সালফেট দ্রবণে নীল বা সবুজ বর্ণ ধারণ করে। (b) পটাসিয়াম ডাইক্রোমেটের জলীয় দ্রবণে ইহা পিঙ্গল বর্ণের অধঃক্ষেপের সৃষ্টি করে।

6. **তরুক্ষীর** (Latex)—জল মিশ্রিত স্টার্চদানা, শর্করা, প্রোটিন, এনজাইম উপক্ষার (alkaloids) প্রভৃতির অবদ্রবকে (emulsion) তরুক্ষীর বলে। উপরোক্ত উপাদানগুলির মধ্যে কেহ কেহ জলে দ্রবীভূত হয়, আবার কেহ কেহ অদ্রবণীয় থাকিয়া যায়। ইহা কোষ অথবা নালীকার মধ্যে ক্ষরিত হয় এবং ইহাদের মধ্য দিয়া উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়। সাধারণত ইহা দুগ্ধের ন্যায় সাদা দেখিতে হয়। দুগ্ধবতের কারণ হইলে যে ইহাতে কাউচু (coutchouc) ও গাটাপার্চারের (gutta-parcha) সূক্ষ্ম দানা থাকে। কখন কখন তরুক্ষীর বিষাক্ত হয়। এই কারণে প্রাণীগণ কর্তৃক ইহারা পরিত্যক্ত হয়। হিভিয়া (Hevea), ফাইকাস (Ficus) প্রভৃতি উদ্ভিদের তরুক্ষীর হইতে রবার (rubber) উৎপন্ন হয়। পেঁপে গাছের তরুক্ষীর হইতে পেপেন (papain) নামক একপ্রকার পদার্থ পাওয়া যায় যাহা পরিপাক ক্রিয়ার সহায়ক। উদ্ভিদের ক্ষত পূরণেও (healing of wounds) তরুক্ষীর কিছু প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে।

7. **বান তৈল** (Etherial oils)—ইহারা উদ্বায়ী তৈল এবং প্রধানত ফল ও ফুলে উৎপন্ন হয়। বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই ইহারা তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায় ও বিশেষ প্রকার গন্ধ বিতরণ করে। লেবুর তৈল, পিপারমেন্টের তৈল প্রভৃতি হইল বান তৈলের উদাহরণ। ইহারা প্রধানত লেবু গাছের পাতা লেবুর খোসা ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা প্রভৃতির তৈল গ্রন্থিতে (oil glands) উৎপন্ন হয়। সাধারণ তৈল হইতে ইহাদের

প্রভেদ হইল যে সাদা কাগজে ঘষিলে উহাতে কোনরূপ দাগ পড়ে না। ফুলের গন্ধ পরাগযোগের উদ্দেশ্যে পতঙ্গদিগকে আকৃষ্ট করে। বিকর্ষী গন্ধ সাধারণত উদ্ভিদকে পশুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে।

৪. **খনিজ কেলাস** (Mineral crystals)—উদ্ভিদের প্রায় সকল অংশেই বিশেষত জলজ উদ্ভিদ ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ইহাদের দেখা যায়। ইহারা মজ্জা, কর্টেক্স ও ফ্লোয়েমে সাধারণত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কেলাসগুলি প্রোটোপ্লাস্টে অথবা ভস্মের ন্যায় মৃত কোষের অভ্যন্তরে নিহিত থাকে। প্রতি কোষে সাধারণত একই প্রকার কেলাস দেখা যায় কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক প্রকারের কেলাসকে একসাথে দেখিতে পাওয়া যায়। পাম ও অর্কিড গাছের কেলাসগুলি সিলিকাযুক্ত এবং



১০০নং চিত্র—উদ্ভিদের খনিজ কেলাস: ক. সিস্টোলিথ; খ. র‍্যাফাইড; গ. ক্যালসিয়াম অক্জালেট

কোষের সাইটোপ্লাজম ইহাদিগের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিণত থাকে; কিন্তু কখন কখন উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশ ক্যালসিয়াম অক্সালেটের (calcium oxalate) কেলাসরূপে কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। ক্যালসিয়াম অক্সালেটের কেলাসগুলি বিভিন্ন আকৃতির হইয়া থাকে; (1) পিঁয়াজের খোলায় ইহারা দণ্ড, প্রিজম অথবা বিভিন্ন আকৃতির হয়; (2) কচুগাছের ও কচুরিপানার পত্রবৃন্তে, টোপাপানায় (Pistia) পত্রমূলে এবং ভূনিম্নস্থ কাণ্ডে ইহাদের সূচের গুচ্ছের ন্যায় (needle shaped) দেখায়।

এই প্রকার কেলাসকে র‍্যাফাইড (raphides) বলে। কচুরিপানার পত্রবৃন্তে ও টোপাপানার পত্রমূলে একপ্রকার বিশেষ প্রকৃতির মিউসিলেজযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষে তারকাকার (star shaped) কেলাস দেখা যায় যাহাদিগকে কংগ্লোমেরেট (conglomerates) বা স্ফিয়্যারাফাইড (Sphaeraphides) বলে।

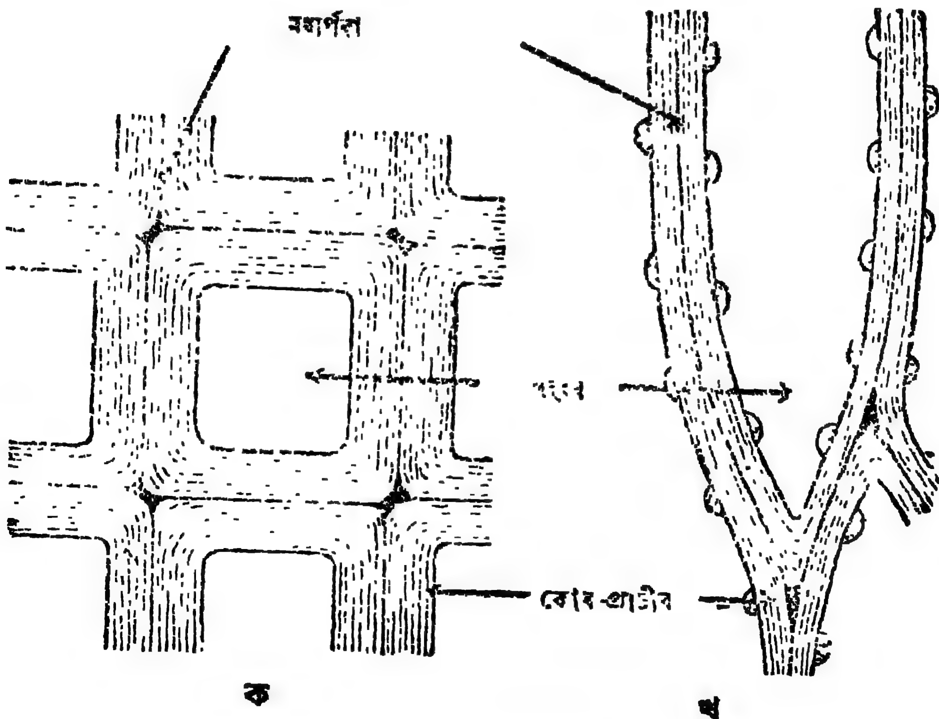
র‍্যাফাইডের পরীক্ষা (Test for raphides)—(a) খনিজ অ্যাসিডে র‍্যাফাইড দ্রবণীয় কিন্তু ইহাতে কোনরূপ গ্যাস নির্গত হয় না। (b) জলমিশ্রিত অ্যাসিটিক অ্যাসিডে ইহা অদ্রবণীয়।

২

কোষপ্রাচীর
(The Cell Wall)

(উদ্ভিদকোষের চারিদিকে যে আবরণ থাকে তাহাকে কোষপ্রাচীর (cell wall) বলে। নূতন কোষের কোষপ্রাচীর পাতলা, স্থিতিস্থাপক, স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। ইহা প্রোটোপ্লাজম দ্বারা নিঃসৃত হয়। জননকোষের কোন প্রাচীর থাকে না। প্রোটোপ্লাস্ট উৎপন্ন হইবামাত্র ইহার চারিদিকে কোষপ্রাচীর নিঃসৃত হয়। কোষপ্রাচীর জল ও গ্যাসীয় দ্রব্যের দ্বারা ভেদ্য এবং ইহার দেহের মধ্যে জল থাকে। ইহা প্রোটোপ্লাজমকে বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা করে, কোষের বিভিন্ন আকৃতি বজায় রাখে এবং উহাকে দৃঢ়তা প্রদান করে।)

(কোষপ্রাচীর সেলুলোজ (cellulose) নামক কার্বোহাইড্রেট পদার্থের দ্বারা গঠিত এবং ইহার রাসায়নিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। কোষপ্রাচীর যখন প্রথম গঠিত হয়, তখন ইহাতে পেকটোজ (pectose) নামক একপ্রকার কার্বোহাইড্রেট থাকে; পরে ইহার উপর অদ্রাব্য পদার্থ, যথা, ক্যালসিয়াম পেকটেট (calcium pectate) জমা হইয়া ইহা ক্রমে কঠিন হয়। এই প্রথম স্তরের উপর পেকটোস (pectose) ও সেলুলোজ (cellulose) দ্বারা গঠিত দ্বিতীয় প্রাচীর জমা হয়। কিন্তু তৃতীয় কোষপ্রাচীর সম্পূর্ণভাবে সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর ... এই তিনস্তরের স্তরগুলি মিউসিলেজে (mucilage) পরিবর্তিত হয়।)



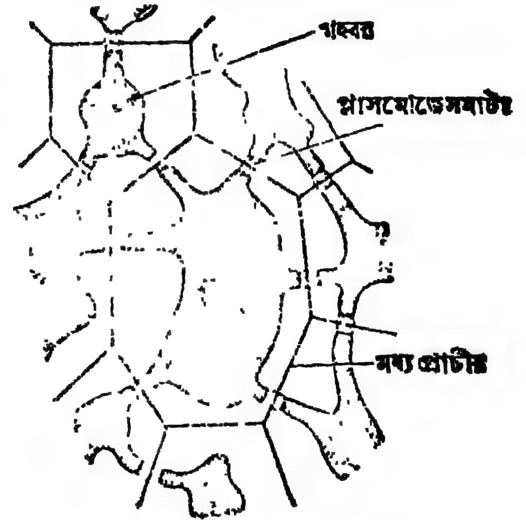
১০১নং চিত্র—(ক) ট্র্যাকীডের প্রস্থচ্ছেদ; (খ) ঐ দৈর্ঘ্যচ্ছেদ

ছত্রাক ব্যতীত সকল উদ্ভিদের কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ থাকে। জল ও গ্যাসীয় দ্রবণ ইহার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে পারে।)

পরীক্ষা : (1) ইহা ক্লোর-জিংক-আইওডিন দ্রবে (chlor-zinc-iodine solution) নীল বা বেগুনী বর্ণের হয়। (2) ইহা কুপ্রামোনিয়ায় (কিউপ্রিক অক্সাইডের ঘন অ্যামোনিয়ার দ্রবণ) দ্রবণীয়।

মধ্যপর্দা (The middle lamella)—যখন দ্বিতীয় কোষপ্রাচীর সুস্পষ্ট হয় তখন পার্শ্ববর্তী কোষগুলির প্রথম কোষপ্রাচীরগুলি সংযুক্ত হইয়া মধ্যপর্দা গঠন করে (১০১নং চিত্র)। পূর্বে ইহাকে দুই প্রাচীরের মধ্যবর্তী সংযোগসাধক পদার্থ বলিয়া মনে করা হইত। কোষপ্রাচীরের প্রকৃতি, বিশেষ রং ও উপযুক্ত আলোকপাত দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। সংযুক্ত কোষস্থিত কোণের মধ্যপর্দা প্রায়ই স্থূল হয়।

প্লাসমোডেসমাটা (Plasmodesmata) (১০২নং চিত্র) —সাইটোপ্লাজমীয় সূত্রগুলি কোষপ্রাচীরস্থিত সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া যাইয়া পার্শ্ববর্তী কোষগুলির প্রোটোপ্লাজমের সহিত সংযোগ স্থাপন করে। এই সূত্রগুলিকে প্লাসমোডেসমাটা (plasmodesmata) বলে। ইহারা সজীব কোষের বৈশিষ্ট্য। সূত্রগুলি এত সূক্ষ্ম যে বিশেষ রঙে রঞ্জিত না করিলে দেখা যায় না। ইহারা বিশেষত খেজুর ও অন্যান্য গাছের শস্যের পুরাতন কোষে থাকে। প্লাসমোডেসমাটা (Plasmodesmata) সম্ভবত খাদ্য সংবহনে সাহায্য করে। ইহাকে উত্তেজনা পরিবাহকরূপেও গণ্য করা হয়।



১০২ নং চিত্র—প্লাসমোডেসমাটা

কোষপ্রাচীরের উদ্ভব (Origin of the cell wall) -পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোষপ্রাচীর নিঃস্রাবরূপে প্রোটোপ্লাজম দ্বারা নির্গত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, প্রোটোপ্লাজমের বাহিরের অংশ কোষপ্রাচীরে পরিণত হয়। অধুনা প্রথমোক্ত মতই সমীচীন বলিয়া জানা গিয়াছে।

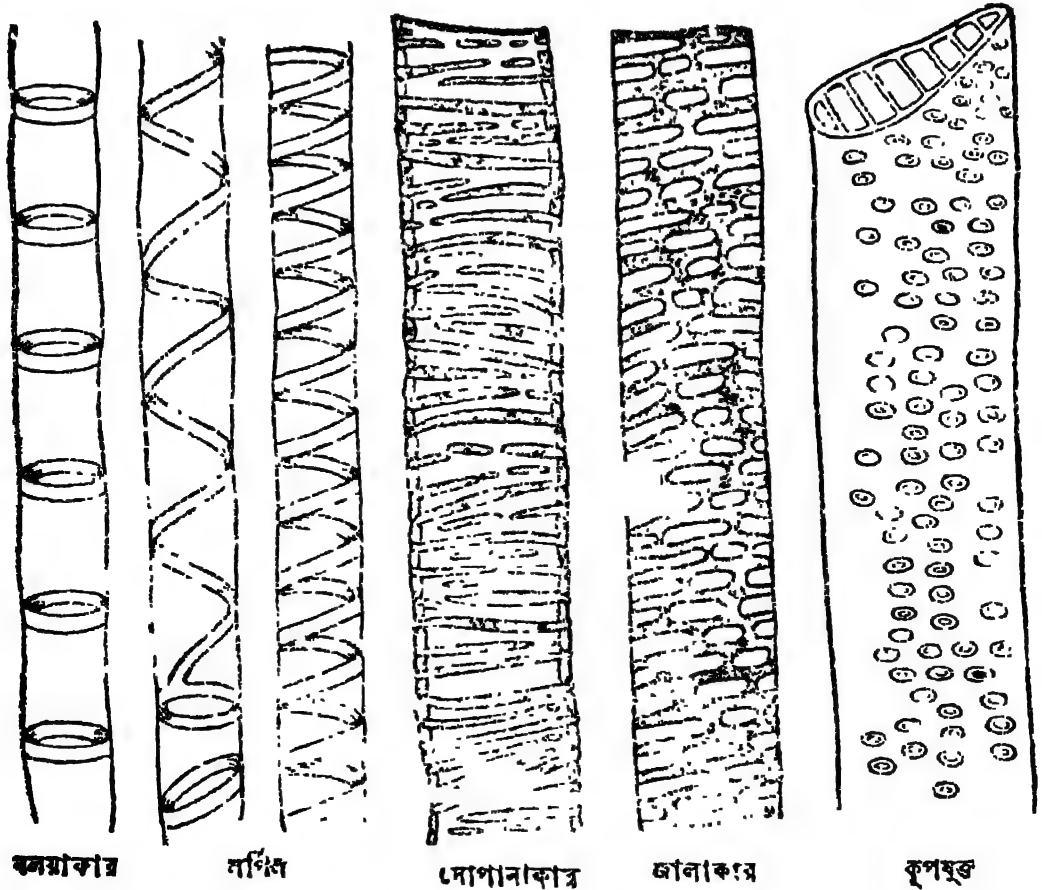
কোষপ্রাচীরের বিকাশ (Development of the cell wall)—নবগঠিত কোষের আয়তন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবার সময় কোষপ্রাচীর এবং উপরিতলও বৃদ্ধি পায় আর উহা পাতলাও থাকে। কিন্তু উপযুক্ত আয়তন বৃদ্ধির পরে ইহার প্রাচীর স্থূল হয়। এইরূপে কোষপ্রাচীর উপরিতলও স্থূল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

উপরিতলে বৃদ্ধি (Growth in surface area) -কোষের বৃদ্ধির সময় কোষপ্রাচীর বিস্তৃত হয় এবং এইরূপে কোষটি বড় হয়। যাহাতে কোষপ্রাচীর ক্রমশ বিস্তৃত হয়, সেজন্য নূতন সেলুলোজের কণিকা পুরাতন কোষপ্রাচীরের উপর অথবা উহার মধ্যে জমা হয়। ফলে কোষপ্রাচীরটি পুনরায় বিস্তৃত হইতে পারে। কোষপ্রাচীরের এইপ্রকার বৃদ্ধিকে **অন্তর্বেশ** (intussusception) বলে।

স্থূল বৃদ্ধি (Groth in thickness)—কোষপ্রাচীরের দুই প্রকারের স্থূল বৃদ্ধি হইতে পারে—(১) **অ্যাপোজিশন** (apposition) অর্থাৎ নূতন সেলুলোজ কণিকা ক্রমশ পুরাতন কোষপ্রাচীরের ভিতরের তলের উপর জমা হইয়া অবশেষে একটি স্তর গঠন করে; (2) **সুপারপজিশন** (superposition) অর্থাৎ যখন কোষপ্রাচীরের ভিতরের তলের উপর সেলুলোজ স্তরে স্তরে জমা হয়।

কোষপ্রাচীরের স্থূলীকরণ (Thickening of the Cell Wall)

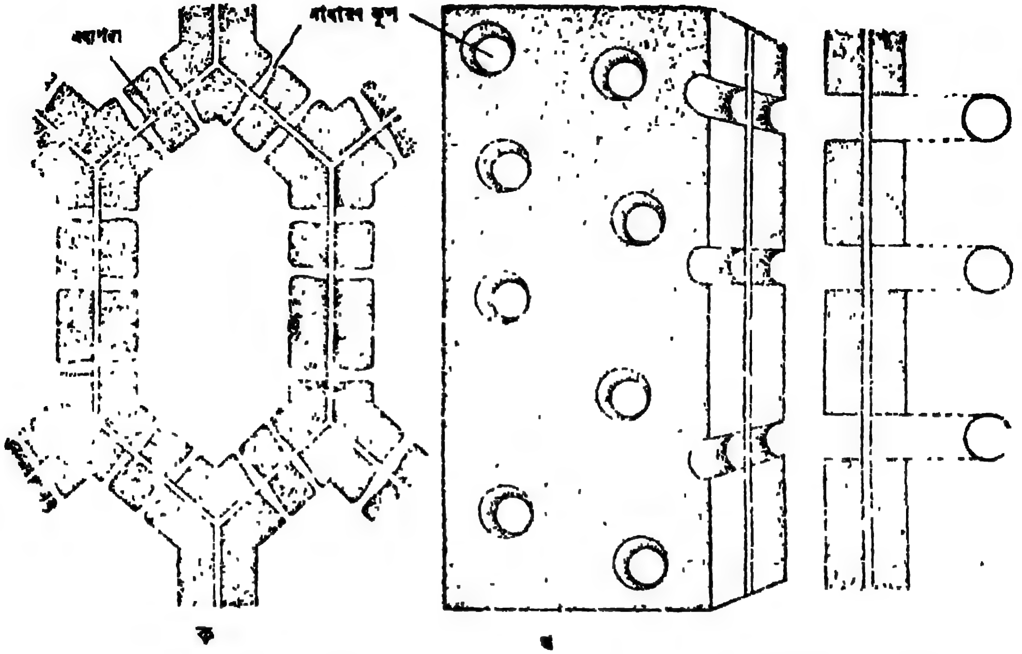
কোষ পূর্ণ আয়তনে পরিণত হইবার পূর্বে কোষপ্রাচীর সাধারণত স্থূল হয় না। সেলুলোজ বা লিগনিন জমা হইবার পর কোষপ্রাচীর স্থূল হয়। সাধারণত ইহারা প্রাচীরের গায়ে সমভাবে জমা হয় না, কতক অংশ স্থূল হয় এবং বাকী অংশ আগেকার মত পাতলাই থাকে। এই পাতলা স্থানগুলির ভিতর দিয়া খনিজ লবণের দ্রবণের আদান-প্রদান হয়। প্রাচীর স্থূল হইবার সময় কোষের ভিতরকার প্রোটোপ্লাজমের অংশগুলির অভাব ঘটে এবং ইহার ফলে মরিয়া যায়। কোষপ্রাচীরকে সুদৃঢ় করাই হইতেছে এই স্থূলীকরণের প্রধান উদ্দেশ্য।



১০৩নং চিত্র—কোষপ্রাচীরের বিভিন্ন প্রকার স্থূলীকরণ

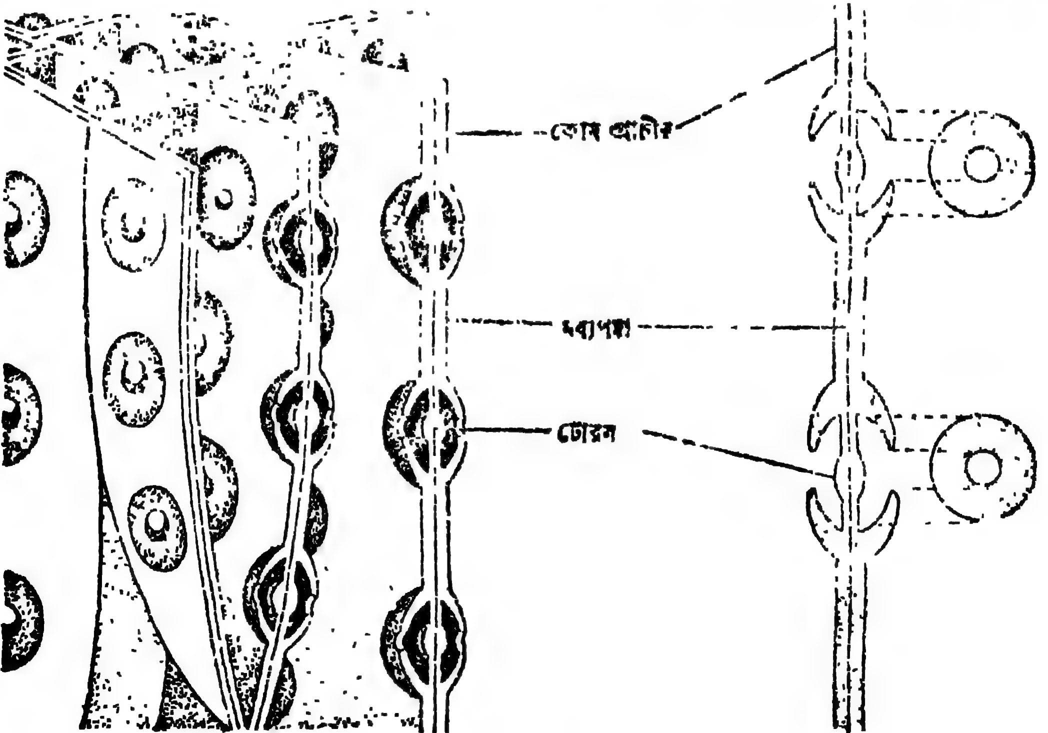
কোষপ্রাচীরের স্থূলীকরণ নানা প্রকারের হইয়া থাকে (১০৩নং চিত্র)। (a) **বলয়াকার** (annular) যখন স্থূলীকরণ আংটির মত হয়; (b) **সর্পিল** (spiral), যখন

পাকানো ফিতার মত হয় ; (c) সোপানাকার (scalariform) যখন সিঁড়ির ধাপের



১০৪নং চিত্র—(ক) মধ্যপর্দা ও সাধারণ কূপযুক্ত কোষপ্রাচীর ; (খ) সাধারণ কূপের আকৃতি

মত হয় ; (d) জালিকাকার (reticulate) যখন স্থূলীকরণ অসমানভাবে হইয়া জালের

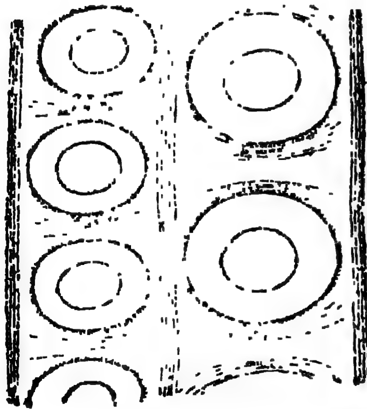


১০৫নং চিত্র—সপাড় কূপ

মত হয় ; (e) কূপযুক্ত (pitted), যখন স্থূলীকরণ প্রায় সমভাবে হয়, কিন্তু কতক-

গুলি গোলাকার অংশ পূর্বের মত পাতলা থাকে ; এই পাতলা অংশগুলিকেই কূপ বা গর্ত বলিয়া মনে হয়। কূপের আয়তন, আকৃতি ও প্রাচুর্য বিভিন্ন প্রকারের হয়। সকল স্থলে কোষপ্রাচীরে ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। কূপের মধ্য দিয়া কোষরসের আদান-প্রদান হয়। কূপ দুই প্রকার—(1) **সাধারণ কূপ** (simple pits), ইহারা সাধারণত গোলাকার বা উপবৃত্তাকার হয় (১০৪নং চিত্র), (2) **সপাড় কূপ** (bordered pit) ইহারাও দেখিতে গর্তের মত, তবে ইহাদের ঝুলানো কাণা থাকে (১০৫নং চিত্র)। সপাড় কূপ সাধারণ কূপ হইতেই উৎপন্ন হয়। সাধারণ কূপের চারিদিকে স্থূলীকরণের বস্তুগুলি জমা হইয়া গম্বুজের মত হয়, কিন্তু ইহার উপরে একটি ছোট গহ্বর থাকে। কোষপ্রাচীরের বিপরীত পার্শ্বেও এইপ্রকার আর একটি সপাড় কূপ উৎপন্ন হয়। বাহির হইতে দেখিলে ইহার দুইটি বলয় আছে বলিয়া মনে হয়। গম্বুজের উপরিস্থ ছোট গহ্বরটিকে একটি ছোট আলোকিত অংশরূপে দেখায় এবং গম্বুজের যে-ঝিল্লীটি গর্তকে ঢাকিয়া রাখে, তাহাকে একটি বড় অস্বচ্ছ গোলাকার অংশরূপে দেখায়। একটি পরিণত সপাড় কূপের সাধারণ কোষপ্রাচীরের কেন্দ্রস্থল সামান্য স্থূল হইয়া থাকে। ইহাকে **টোরস** (torus) বলে। সময় সময় টোরস গর্তের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। সপাড় কূপযুক্ত কোষপ্রাচীর ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের কাষ্ঠের বৈশিষ্ট্য, তবে গুপ্তবীজী উদ্ভিদেও থাকে। ইহারা সাধারণত জলসংবহন-কলাতে (water-conducting tissue) থাকে।

ক্রাসুলী (Crassulae) (১০৬নং চিত্র)—কখনো কখনো আদি কোষপ্রাচীর গাত্রে রেখাকার অথবা গোলাকার স্থূলীকরণ হইয়া থাকে, যাহা সপাড় কূপগুলিকে আংশিক বেষ্টন করে। এই প্রকার স্থূলীকরণকে ক্রাসুলী (crassulae) বলে। ইহারা গৌণ প্রাচীরস্তর দ্বারা আবৃত আদি গহ্বরের প্রান্তবিশেষ। সুনির্দিষ্ট রঞ্জক দ্বারা প্রস্তুতীকরণের পরে কেবলমাত্র পৃষ্ঠতল (surface view) হইতে দেখিলেই ইহাদের বুঝা যায়। পূর্বে রঞ্জিত সপাড় কূপের পৃষ্ঠগুলি দেখিলে ইহাদের বারস্ অফ স্যানিও (bars of sanio) এবং রিমস্ অফ স্যানিও (rims of sanio) নামে অভিহিত করা হইত, কিন্তু এখন এইরূপ নামের প্রচলন নাই।



১০৬নং চিত্র—ক্রাসুলী

কোষপ্রাচীরের প্রকৃতির পরিবর্তন (Modifications in the nature of the Cell Wall)

কোষপ্রাচীর সর্বদাই সেলুলোজ দ্বারা গঠিত হইতে পারে অথবা বিবিধ কার্যের জন্য নানা প্রকারে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এই পরিবর্তন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে ঘটিয়া

থাকে, অথবা বিভিন্ন বস্তু কোষপ্রাচীরে জমা হইয়া বা প্রবেশ করিয়া এই পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে। পরিবর্তনের সময় কোষপ্রাচীরের এক বা একাধিক স্তর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। নিম্নলিখিত উপায়ে কোষপ্রাচীরের পরিবর্তন হয়ঃ

1. **লিগ্নীভবন** (Lignification)—এই প্রক্রিয়াতে সেলুলোজ প্রাচীর লিগনিনে (lignin) পরিবর্তিত হয় অথবা পুরাতন সেলুলোজ প্রাচীরের উপর নূতন লিগনিনের স্তর জমা হয়। লিগ্নীভবনের পর কোষপ্রাচীরকে লিগনিনযুক্ত (lignified) বলে। লিগনিন জটিল পদার্থ; ইহা কঠিন ও স্থিতিস্থাপক। যদিও ইহা জলের দ্বারা ভেদ্য তথাপি ইহা বেশী জল ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। লিগনিনযুক্ত কোষ প্রায়ই মৃত হয়। এইপ্রকার কোষ ধারকতন্তু (supporting fibre) ও সংবহন-কলাতে থাকে (conducting tissue)। লিগ্নীভবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সঠিক জানিতে পারা যায় না। তবে খুব সম্ভবত ইহা কোষপ্রাচীরের দৃঢ়তা, শক্তি, স্থায়িত্ব ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে।

পরীক্ষা— (1) ইহা ক্লোর-জিঙ্ক-আইওডিন দ্রবে (chlor-zinc iodine solution) বাদামী-হরিৎ বর্ণের হয়। (2) ইহা ফ্লোরোগ্লুসিন phloroglucin) ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণের হয়। (3) ইহা অ্যাসিড অ্যানিলিন সালফেটের সংস্পর্শে উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণের হয়। (4) ইহা সালফিউরিক অ্যাসিড ও আইওডিনের সংস্পর্শে গাঢ় পিঙ্গল বর্ণের হয়। (5) ইহা ইউ-ডি-জ্যাভেলে (Eau-de-javelle) দ্রবীভূত হয়।

2. **কিউটিনে পরিণতি** (Cutinization)—এই প্রক্রিয়াতে কিউটিন (cutin) পুরাতন সেলুলোজ-নির্মিত কোষপ্রাচীরে প্রবেশ করে এবং এইপ্রকার প্রাচীরকে কিউটিনযুক্ত (cutinized) বলে। কিউটিন মোমের ন্যায় পদার্থ; ইহা অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক ও প্রসারণশীল। কিউটিনযুক্ত কোষপ্রাচীর উদ্ভিদের বাহিরের অংশেই দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—ত্বক (Epidermis)। সময় সময় ত্বকের নিচের কোষও এইপ্রকার হয়। সাধারণত কোষের বাহিরের প্রাচীর এবং সময় সময় পার্শ্বদিকের প্রাচীর এবং কদাচিৎ ভিতরের প্রাচীর কিউটিনযুক্ত হইয়া থাকে। কিউটিনযুক্ত কোষপ্রাচীর কেবলমাত্র দৃঢ়ই হয় না, ইহাতে জল এবং গ্যাস সহজে প্রবেশ করিতে পারে না; সুতরাং ইহা বাষ্পমোচনে বাধা দেয়।

কোন কোন বায়ুর উদ্ভিদে ত্বকের বাহিরের দিকে কিউটিনের একটি পাতলা স্তর উৎপন্ন হয়। ইহাকে কিউটিকল (cuticle) এবং প্রক্রিয়াটিকে কিউটিকলে পরিণতি (cuticularization) বলে। কিউটিকল প্রায়ই স্থূল হয় ও কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাকে উন্মোচন করা হয়।

পরীক্ষা—(1) ইহা ক্লোর-জিঙ্ক-আইওডিন দ্রবে (chlor-zinc-iodine solution) হরিৎ বা বাদামী বর্ণের হয়। (2) ইহা সালফিউরিক অ্যাসিড ও আইওডিনের সংস্পর্শে হরিদ্রাভ-বাদামী হয়। (3) ইহা কস্টিক পটাশে হরিৎ বর্ণের হয়।

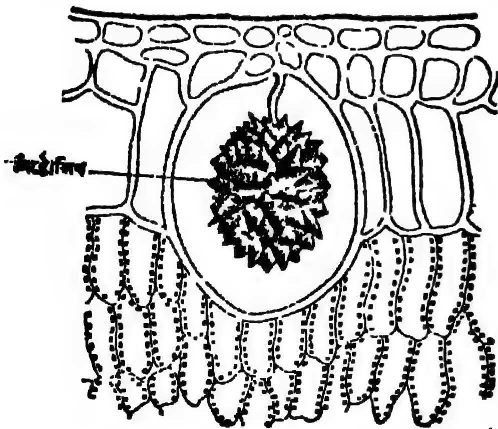
3. **সুবারীভবন** (Suberization)—এই প্রক্রিয়াতে সুবারিন (suberin) পুরাতন সেলুলোজ কোষপ্রাচীরে প্রবেশ করে এবং এইপ্রকার প্রাচীরকে সুবারিনযুক্ত (suberized) বলে। সুবারিন তৈলাক্ত পদার্থ। সাধারণত সুবারিনযুক্ত কোষপ্রাচীরকে উদ্ভিদের ভিতরের অংশে দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—কর্ক। সুবারিনযুক্ত কোষপ্রাচীর জল বা গ্যাসের দ্বারা দুর্ভেদ্য।

পরীক্ষা—(1) ইহা ক্লোর-জিঙ্ক-আয়োডিন দ্রবে (cholor-zinc-iodine solution) হরিদ্রাভ-বাদামী বর্ণের হয়। (2) ইহা কিউটিনের মত কস্টিক পটাশে হরিৎ বর্ণের হয়, তবে ইহার ক্রিয়াকে প্রতিরোধ করে।

4. **মিউসিলেজে পরিণত** (Mucilagenous change)—সময় সময় সেলুলোজযুক্ত কোষপ্রাচীর মিউসিলেজে পরিণত হয়। ইহা শুষ্ক অবস্থায় কঠিন, কিন্তু জলে ভিজিলে ফুলিয়া উঠিয়া আঠাল হয়। সুতরাং মিউসিলেজের জল ধারণ করিবার শক্তি খুব বেশী। ইহা অনেক বীজের ত্বকে থাকে; যথা—তোপমারী, ইসপগুল প্রভৃতি; সময় সময় ফুলে এবং ফলেও থাকে; যথা—জবা, ঢেঁড়স প্রভৃতি। মিউসিলেজ জল ধারণ করিয়া রাখিতে পারে বলিয়া ইহা মরুভূমির উদ্ভিদের পাতার কোষপ্রাচীরে থাকে। অধিকাংশ শৈবালের কোষপ্রাচীরের বাহিরে মিউসিলেজের একটি আবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

পরীক্ষা—(1) ইহা সালফিউরিক অ্যাসিড ও আইওডিনের সংস্পর্শে বেগুনী বর্ণের হয়। (2) ইহা মিথিলীন নীলের সংস্পর্শে গাঢ় নীল বর্ণের হয়।

5. **ধাতব পরিণতি** (Mineralization)—কোষপ্রাচীর গঠিত হইবার পরেই ধাতব পরিণতি আরম্ভ হয়। এই প্রক্রিয়াতে নানাবিধ অজৈব লবণ প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করে অথবা উহার উপরে জমা হয়। ইহাদের মধ্যে সিলিকা ও ক্যালসিয়ামঘটিত লবণ, বিশেষত ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ক্যালসিয়াম অক্জালেট প্রধান। ঘাস, বাঁশ, ইকুইজিটম প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ডের ত্বকে সিলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ধাতব পরিণতি কোষপ্রাচীরকে দৃঢ় করে বটে, কিন্তু ইহা ভঙ্গপ্রবণ হয়।



১০৭নং চিত্র—সিস্টোলিথ

কতকগুলি গাছের ত্বকের কোষের ভিতরে ক্যালসিয়াম কার্বনেট অদ্ভুত রকমে জমা হয়। ইহাকে **সিস্টোলিথ** (cystolith) বলে (১০৭নং চিত্র)। ইহা গঠিত হইবার সময় কোষপ্রাচীর হইতে কোষমধ্যে সেলুলোজের উদ্গমন হয় এবং পরে ইহার উপর ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ছোট ছোট দানা জমা হইয়া ঝুলায়মান আঙুরগুচ্ছের ন্যায় দেখিতে হয়। প্রধানত রবার, বট প্রভৃতি পাতার ত্বকের বড় বড় কোষের মধ্যে সিস্টোলিথ দেখিতে পাওয়া যায়।

পরীক্ষা—(1) ইহা অম্লের অ্যাসিডে দ্রবীভূত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্গত করে। (2) ইহা মৃদু অ্যাসেটিক অ্যাসিডেও দ্রবীভূত হয়।

কোষপ্রাকার (Cell Forms)

কোষপ্রাচীরের উপরিতলের বৃদ্ধির জন্য কোষ নানা আকারের হয়। কোষপ্রাচীরের বৃদ্ধি সমানভাবে সকল দিকে হইলে কোষ গোলাকার হয়। কিন্তু উহা পার্শ্ব অপেক্ষা দুই প্রান্তে বেশী হইলে কোষ ডিম্বাকার হয় এবং কেবলমাত্র একই দিকে খাড়া বা সমান্তরালভাবে হইলে ইহা লম্বা হয়। নিম্নের কোষের বিভিন্ন আকার বর্ণনা করা হইল :

(*a*) প্যারেনকাইমা (Parenchyma)—এইপ্রকার কোষ কোষপ্রাচীরের সকল দিকে সমভাবে বর্ধিত হইয়া উৎপন্ন হয়। প্যারেনকাইমা কোষ সাধারণত বহুভুজ-ক্ষেত্রবিশিষ্ট (polygonal) হয়। সময় সময় ইহারা গোলাকার (round) বা ডিম্বাকার (oval) হয়; যখন ইহারা সংযুক্ত হইয়া কলা (tissue) গঠন করে, তখন উহাদের কোষমধ্যবর্তী (intercellular) রন্ধ্র থাকে। ইহাদের ইটের ন্যায় (muriform) আকৃতিও হইতে পারে; যথা—ত্বক্‌কোষ (epidermal cells), কর্ককোষ (cork cells), ক্যাম্বিয়াম কোষ (cambium cells) ইত্যাদি। কোষ তারকাকারও (stellate) হয়; যথা—বট পাতার মধ্যশিরার কোষ।

কোলেনকাইমা (Collenchyma)—ইহাও একপ্রকার প্যারেনকাইমা কোষ। কোলেনকাইমা কোষ সামান্য একটু লম্বা হয়; কিন্তু ইহার অনুদৈর্ঘ্য প্রাচীর পাতলাই থাকে, কিন্তু কোণ স্থূল হয়।

(*b*) প্রোসেনকাইমা (Prosenchyma)—এইপ্রকার কোষ সাধারণত বেশ লম্বা হয়। প্রোসেনকাইমা তিন প্রকার :

1. তন্তু (Fibres)—যখন কোষগুলি সূক্ষ্ম ও সূচাল হয় এবং উহাদের প্রাচীর সমভাবে স্থূল হয় ও সাধারণতঃ সরল গর্তযুক্ত থাকে।

2. স্ক্লেরাটিক কোষ (Sclerotic cells)—ইহারা বিভিন্ন আকৃতির হয়; যথা, গোলাকার, বহুভুজ বিশিষ্ট প্রভৃতি। কোষগুলি মৃত এবং ইহাদের এইরূপ অধিক পরিমাণে স্থূলীকরণ হয় যে কোষ গহ্বরটি অতণয় ক্ষুদ্রাকার ধারণ করে। ইহাদের প্রাচীরের কূপগুলি (pits) ছোট, গোলাকার, বলয়াকার অথবা শাখান্বিত হয়।

3. ট্রাকীড (Tracheid)—ইহারা লম্বা মৃত কোষ এবং ইহাদের প্রান্তগুলি প্রশস্ত বড় গহ্বরযুক্ত হয়। গহ্বরগুলি সাধারণত শূন্য থাকে। প্রাচীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিগনিনযুক্ত হয় এবং ইহার গর্তগুলি সপাড় কূপযুক্ত (bordered pitted) থাকে।

---

৩ কলা
(The Tissue)

একই বা বিভিন্ন প্রকারের কোষগুলি সংযুক্ত হইয়া একই প্রকার কার্য করিলে এবং ইহাদের উৎপত্তিস্থানও এক হইলে ইহাদিগকে কলা tissue বলে। কলার কোষগুলি এরূপভাবে মিলিত হইতে পারে যাহাতে ইহাদের মধ্যে কোন ছিদ্র বা রন্ধ্র থাকে না অথবা ইহাদের মধ্যে কোন কোষমধ্যবর্তী স্থান (intercellular space) উৎপন্ন হইতে পারে। কোষমধ্যবর্তী স্থান দুই প্রকারের হয়—(1) সিজোজেনিক (schizogenic) ও (2) লাইসিজেনিক (lysigenic)। সিজোজেনিক কোষমধ্যবর্তী স্থান পার্শ্ববর্তী কোষগুলির প্রাচীর বিচ্ছিন্ন হইয়া উৎপন্ন হয় এবং লাইসিজেনিক কোষমধ্যবর্তী স্থান কতকগুলি কোষ বিনষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ কোষমধ্যবর্তী স্থান বায়ুতে পূর্ণ থাকে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাতে জল অথবা নানাবিধ বর্জ্য পদার্থ (যথা—গঁদ, রজন, বান তৈল, মিউসিলেজ প্রভৃতি) থাকে। সিজোজেনিক কোষমধ্যবর্তী স্থানে বায়ু থাকে বলিয়া উহা উদ্ভিদের বায়ু-চলাচল কলা (aerenchyma) গঠন করে, কিন্তু লাইসিজেনিক কোষমধ্যবর্তী স্থানে জল অথবা নানাবিধ বর্জ্য পদার্থ থাকে।

কলার প্রকার (Kinds of Tissue)

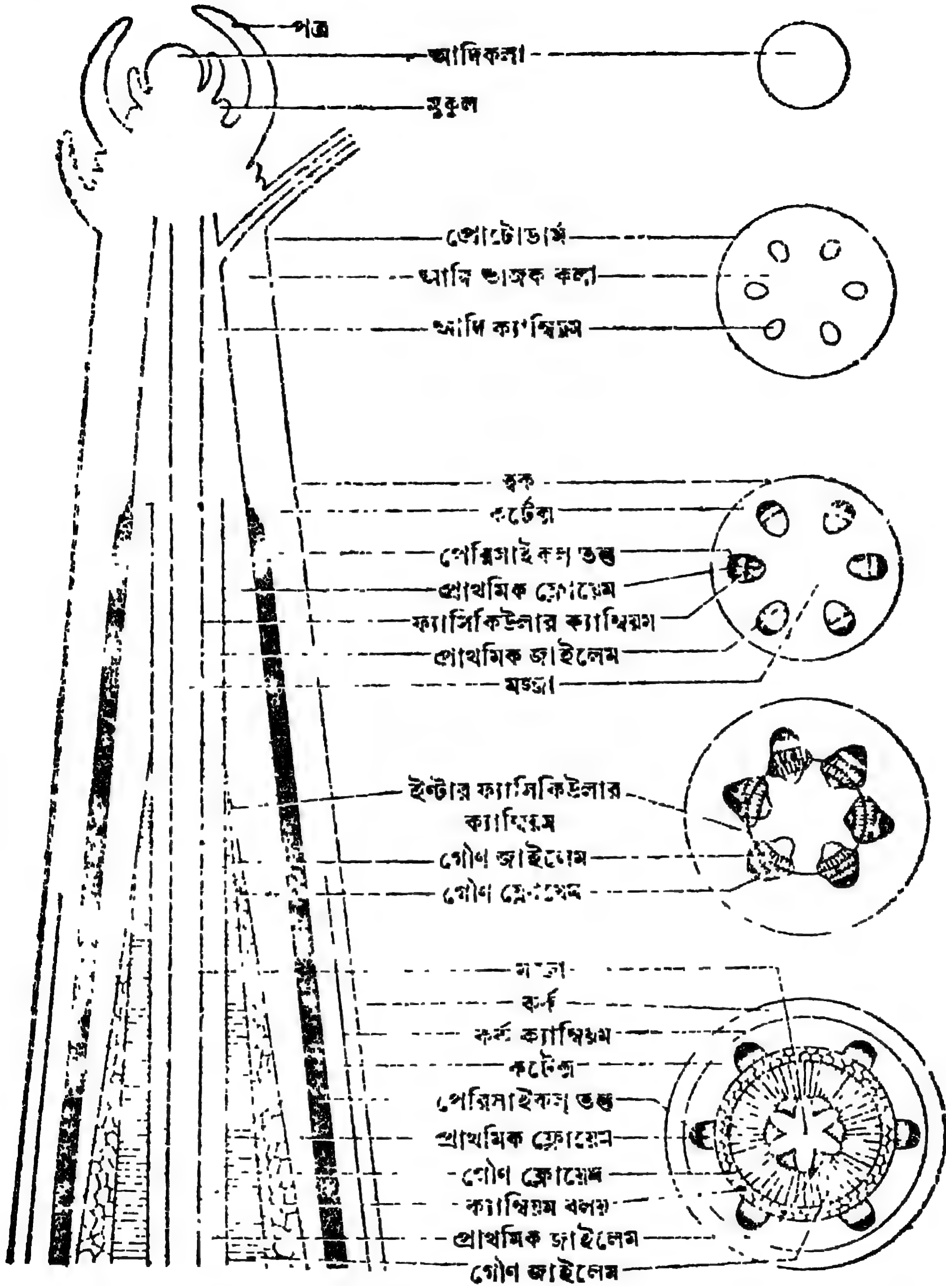
কলা দুই প্রকারের—(1) **ভাজক কলা** (meristematic tissue or meristem), অর্থাৎ যাহার কোষগুলি সাধারণত বিভক্ত হয় (II) **স্থায়ী কলা** (permanent tissue), অর্থাৎ যাহার কোষগুলি সাধারণত বিভক্ত হয় না। ভাজক কলার কোষস্থিত প্রোটোপ্লাজম দানাদার ও নিউক্লিয়াস বেশ বড় হয় এবং কোষগুলির কোন কোষমধ্যবর্তী স্থান থাকে না। কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগে কেবল এই প্রকার কলা থাকে; ইহার কোষগুলির একই প্রকার গঠন ও কার্য আছে। এই প্রকার কলাকে **প্রারম্ভিক ভাজক কলা** (premeristem or primordial meristem) বলে। ইহার বৃদ্ধি ও বিভেদের ফলে সকল প্রকার প্রাথমিক স্থায়ী কলা (primary germanent tissue) উৎপন্ন হয়।

প্রারম্ভিক কলা শীঘ্রই তিনটি অঞ্চলে বিভেদিত হয়; যথা (1) প্রোটোডার্ম (protoderm) (2) প্রোকেম্বিয়াম স্ট্র্যাণ্ড (procambium strands) এবং (3) আদি ভাজক কলা (fundamental or pround meristem)। এই তিনটি অঞ্চলকে সম্মিলিতভাবে প্রাথমিক অগ্রস্থ ভাজক কলা (primary apical meristem) বলে। ইহা ক্রমে ক্রমে বিভেদিত হইয়া প্রাথমিক স্থায়ী কলাতে পরিবর্তিত হয়।

I. ভাজক কলা (Meristem)

প্রারম্ভিক কলা (Primordial meristem or promeristem) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রারম্ভিক কলা উদ্ভিদের বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা

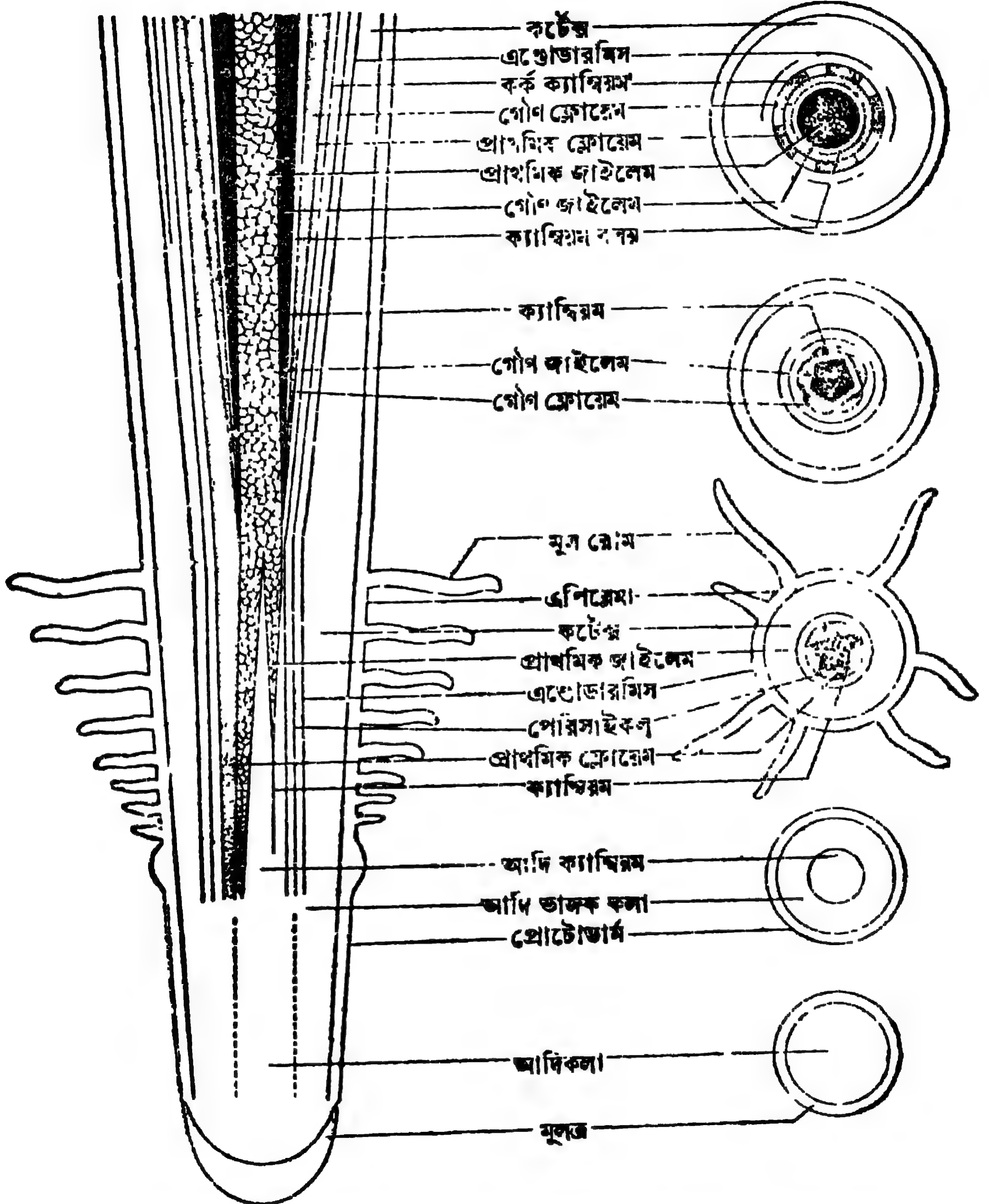
হইতেই ক্রমে উদ্ভিদের অন্যান্য অঙ্গগুলির উৎপত্তি হয়। ইহার কোষগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি, ঘন সাইটোপ্লাজম ও বৃহৎ নিউক্লিয়স সম্পন্ন, পাতলা কোষপ্রাচীর বিশিষ্ট, অদ্রবণীয় সঞ্চিত



১০৮নং চিত্র—কাণ্ডের অগ্রভাগের দীর্ঘচ্ছেদ করিয়া কলার ক্রমবিন্যাস দেখান হইয়াছে

খাদ্যবিহীন এবং কোষগুলি বিভক্ত হইতে সক্ষম। কোষগুলি বহুতলবিশিষ্ট এবং কোষমধ্যবর্তী স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না। বিভক্ত হইবার সময়, কতকগুলি বিভক্ত কোষ আকারে বড় হইয়া পুনরায় বিভক্ত হয় এবং বর্ধিষ্ণু অঞ্চলটি ক্রমে বর্ধিত হইতে থাকে। সম্পূর্ণ অগ্রভাগে অবস্থিত কোষগুলি ভাজক অবস্থায় থাকিয়া যায়। কিন্তু

পশ্চাতের কোষগুলি ক্রমশ তিনটি সুস্পষ্ট অঞ্চলে বিভেদিত হয়। ইহাদিগকে প্রোটোডার্ম (protoderm), প্রোক্যাম্বিয়াম স্ট্র্যান্ড (procambium strand) এবং আদি ভাজক কলা (fundamental or ground meristem) বলে। এই সকল



১০৭নং চিত্র—মূলের অগ্রভাগের দীর্ঘচ্ছেদ করিয়া বিভিন্ন কলার ক্রমবিন্যাস দেখান হইয়াছে

অঞ্চলে কোষবিভাজন-ক্ষমতা ক্রমশ কমিয়া যায় এবং অবশেষে বিভাজনক্ষমতা সম্পূর্ণে লোপ পাইয়া কোষগুলি স্থায়ী কলায় (permanent tissue) পরিণত হয়। প্রারম্ভিক কলার সকল বিভক্ত কোষগুলিই প্রাথমিক স্থায়ী কলায় পরিণত হয় না। ইহার কতকগুলি কলা বরাবরই ভাজক কলারূপে থাকিয়া যায়।

1. প্রোটোডার্ম (Protoderm)—ইহা সম্পূর্ণ বহিঃস্থ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায় এবং কোষগুলি অরীয়রূপে (radially) বিভক্ত হইয়া ক্রমে উদ্ভিদের ত্বকের সৃষ্টি করে। কোন কোন ক্ষেত্রে কোষগুলি স্পর্শকতলে (tangentially) বিভক্ত হইয়া বহুকোষী স্তরযুক্ত ত্বককে (multiple epidermis) সৃষ্টি করে ; যথা, বট, রবার প্রভৃতি। মূলের ত্বকের এপিব্লেমা বা রোমবহ (epiblema or piliferous layer) বলে।

2. প্রোক্যাম্বিয়াম (Procambium)—দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ইহা বলয় আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পরে কয়েকটি অংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং প্রতিটি অংশ বৃত্তাকারে অবস্থান করে। প্রত্যেক অংশ হইতে ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের উৎপত্তি হয় এবং প্রতিটি বাণ্ডল জাইলেম, ফ্লোয়েম এবং ক্যাম্বিয়ামের সমষ্টি। কিন্তু একবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রোক্যাম্বিয়াম স্তরগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকে এবং মূলের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি কেন্দ্রীয় প্রোক্যাম্বিয়াম স্তরের উৎপত্তি হয়। কয়েকটি কাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রোক্যাম্বিয়াম স্তরের ক্রমবৃদ্ধির সাথে একটি সম্পূর্ণ বেলনাকার বাণ্ডিলের উৎপত্তি হয় এবং ইহার বহিঃস্তরটি পেরিসাইকেল (pericycle) গঠন করে।

3. আদি ভাজক কলা (Ground meristem) ইহা ক্রমে কর্টেক্স (cortex) মজ্জাংশু (medullary rays) এবং মজ্জাতে (pith) বিভেদিত হয়। যে সকল কাণ্ডের ক্ষেত্রে ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে তথায় পেরিসাইকল (pericycle) আদি ভাজক কলা হইতে গঠিত হয়।

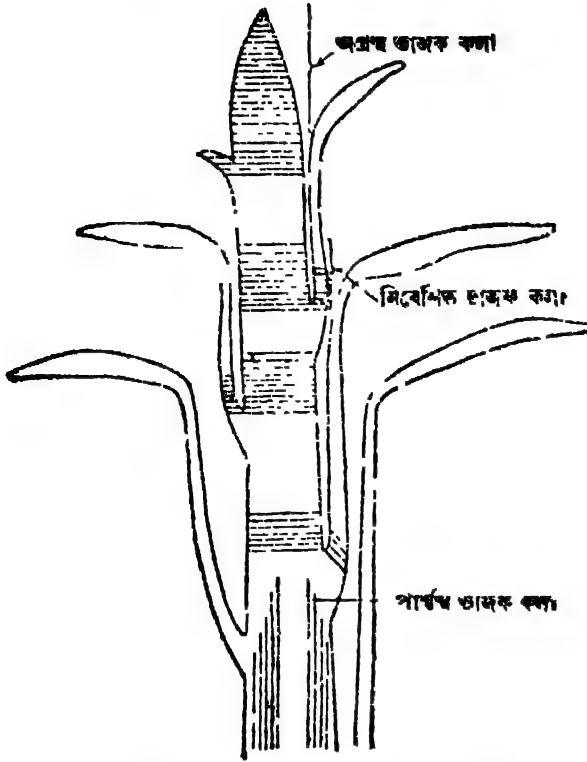
ক্যাম্বিয়াম (Cambium) ভিন্ন সকল ভাজক কলার কোষগুলির বিভাজন শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায় এবং প্রাথমিক স্থায়ী কলার সৃষ্টি হয়। যথা—ত্বক (epidermis), কর্টেক্স (cortex), পেরিসাইকল (pericycle), জাইলেম (xylem), ফ্লোয়েম (phloem), মজ্জাংশু (medullary rays) এবং মজ্জা (pith)। যদিও স্বল্প সময়ের জন্য স্থায়ী কলার সক্রিয় কোষবিভাজন-পদ্ধতি বন্ধ হয়, তথাপি অবস্থা বিশেষে ইহা পুনরায় কোষবিভাজনে সক্ষম হইয়া ভাজক কলায় পরিণত হয়। ইহাদের গৌণ ভাজক কলা (secondary meristematic tissue) বলে। অবশ্য সকল প্রাথমিক স্থায়ী কলাই প্রাথমিক ভাজক কলা হইতে উৎপন্ন হয়।

ভাজক কলার শ্রেণীবিভাগ (Classification of Meristematic Tissue—১১০নং চিত্র)

অবস্থান অনুসারে ভাজক কলা তিন প্রকার—অগ্রস্থ (apical), পার্শ্বস্থ (lateral) এবং নিবেশিত (intercalery)।

1. অগ্রস্থ ভাজক কলা (Apical meristem)—ইহা কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগে থাকে ; এই কলার কোষগুলি বিভিন্ন কার্যের জন্য বর্ধিত হয়। (টেরিডোফাইটাতে (pteridophyta) অগ্রস্থ ভাজক কলা একটিমাত্র কোষে গঠিত কিন্তু উচ্চশ্রেণী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অগ্রস্থ ভাজক কলা বহু কোষের সমষ্টি।)

2. **পার্শ্বস্থ ভাজক কলা** (Lateral meristem) ইহা কান্ড ও মূলের পার্শ্বদিকে থাকে। (ইহার কোষগুলি কেবলমাত্র একটি তলে বিভক্ত হয়; ইহার ফলে ইহারা স্থূল হয়। এইপ্রকার ভাজক কলা ব্যক্তবীজী (gymnosperms) ও গুপ্তবীজী (angiosperm) উদ্ভিদের বিশেষত্ব। ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম (Fascicular cambium) ও কর্ক ক্যাম্বিয়াম (cork cambium) বা ফেলোজেন (phellogen) ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।



১১০নং চিত্র— ভাজক কলার শ্রেণী বিভাগ

3. **নিবেশিত ভাজক** (Intercalary meristem) ইহা অগ্রস্থ ভাজক কলার অংশ। ইহা স্থায়ী কলা হইতে উৎপন্ন হইয়া পৃথক হয়। এইরূপে নিবেশিত ভাজক কলা স্থায়ী কলার মধ্যে থাকে। যথা—ইকুইজিটম ও কতকগুলি ঘাসের পর্বমধ্য এবং পাতার পত্রমূলে। যে-অঙ্গে ইহা থাকে তাহাকে দীর্ঘ হইতে সাহায্য করে।

উৎপত্তি অনুসারে ভাজক কলা দুই প্রকার—**প্রাথমিক** (primary) ও **গৌণ** (secondary)।

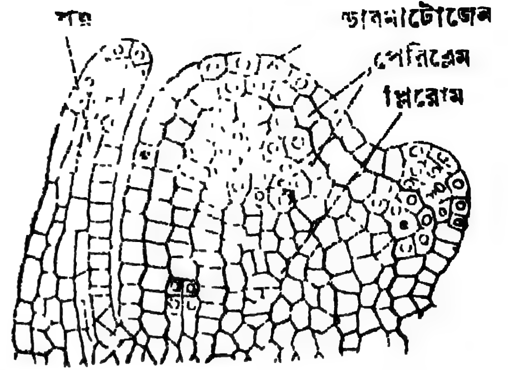
1. (**প্রাথমিক ভাজক কলা** (Primary meristem)— ইহা ভ্রূণ অবস্থা হইতে অবস্থান করে এবং উদ্ভিদ যতদিন জীবিত থাকে ততদিন পর্যন্ত ইহাকে দেখা যায়। মূল ও কান্ডের অগ্রস্থ ভাজক কলা (apical meristem), ব্যক্তবীজী (gymnosperm) ও গুপ্তবীজী (angiosperm) উদ্ভিদের ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম (fascicular cambium) এবং একবীজপত্রী উদ্ভিদের নিবেশিত ভাজক কলা প্রাথমিক ভাজক কলার উদাহরণ।

2. (**গৌণ ভাজক কলা** (Secondary meristem)— ইহা বিশেষ কারণে স্থায়ী কলা হইতে উৎপন্ন হয়। ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম (Interfascicular cambium) ও কর্ক ক্যাম্বিয়াম (cork cambium) গৌণ ভাজক কলার উদাহরণ।)

ভাজক কলার অঞ্চলীকরণ এবং বিন্যাস (Theories of Zonation and Differentiation)

ভাজক কলাগুলি বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন অঞ্চলে বিন্যাসিত হয়। এইরূপ অঞ্চলীকরণ ও বিন্যাস বিভিন্ন পদ্ধতিতে হইয়া থাকে।

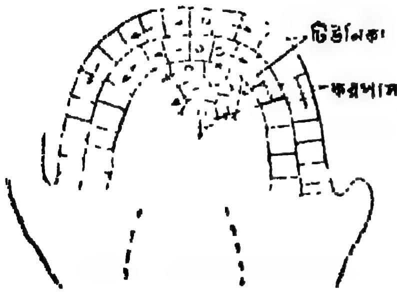
1. **অগ্রস্থ কোষপদ্ধতি** (Apical cell theory)—শৈবাল, **ব্রায়োফাইটা** (Bryophyta), ও টেরিডোফাইটার (Pteridopyta), ক্ষেত্রে একটিমাত্র অগ্রস্থ কোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা তিনটি প্রান্তে নিয়মিতভাবে বিভক্ত হইয়া বহু সংখ্যক কোষের সৃষ্টি করে। উচ্চশ্রেণী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অগ্রস্থ কোষ বহু সংখ্যক কোষের সমষ্টি বলিয়া এইরূপ প্রণালীকে বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।



১১১নং চিত্র—দীর্ঘচ্ছেদে হিস্টোজেন দেখান হইয়াছে

2. **হিস্টোজেন পদ্ধতি** (Histogen theory—১১১নং চিত্র)—এই প্রণালী অনুযায়ী মূল অথবা কাণ্ডের অগ্রভাগ অনেকগুলি কোষের সমষ্টি। ইহা ক্রমে ক্রমে তিনটি সুস্পষ্ট অঞ্চলে বিন্যাসিত হয়। সর্বাবহিঃস্থ অঞ্চলটিকে **ডারমাটোজেন** (dermatogen) বলে এবং ইহা হইতে ত্বকের (epidermis) উৎপত্তি হয়। দ্বিতীয় অঞ্চলটিকে **পেরিব্লেম** (periblem) বলে এবং ইহাই প্রধানত কর্টেক্স (cortex) গঠনে অংশ গ্রহণ করে। সর্বমধ্যস্থ অঞ্চলটিকে **প্লিরোম** (plerome) বলে ; ইহা হইতে ভ্যাস্কুলার ব্যাণ্ডল (vascular bundles) ও মজ্জা (pith) গঠিত হয়।

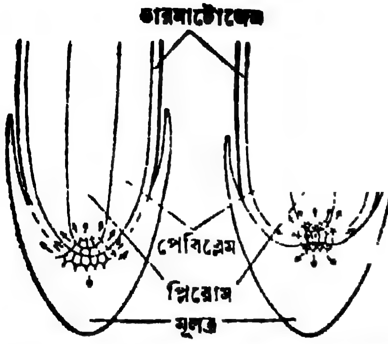
3. **টিউনিকা কর্পাস পদ্ধতি** (Tunica-corpus theory)—১১২নং চিত্র)—এই প্রণালী কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের কাণ্ডের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কাণ্ডের অগ্রভাগটি বিভিন্ন হারে বৃদ্ধির ফলে দুইটি অঞ্চলে বিভেদিত হয়। মধ্য অঞ্চলটিকে **কর্পাস** (corpus) বলে এবং ইহা **টিউনিকা** (tunica) নামক কোষস্তর দ্বারা আবৃত। কর্পাসের কোষগুলি টিউনিকা অপেক্ষা বৃহত্তর এবং ইহারা বহুতলে বিভক্ত হয় এবং ইহার ফলে কাণ্ডের অগ্রভাগটি আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু টিউনিকার কোষগুলি কেবলমাত্র একটি তলে বিভক্ত হয় এবং ইহার ফলে অগ্রতলটি বৃদ্ধি পায়। ইহাদের নিম্নস্থ কোষগুলি ক্রমে স্থায়ী কলায় পরিণত হয়। কর্পাস হইতে কেবলমাত্র মজ্জা (pith) অথবা স্টেল (stele) ও কর্টেক্সের কিছু অংশ এবং টিউনিকা হইতে বহিরাংশ বা ত্বকের epidermis সৃষ্টি হয়।



১১২নং চিত্র—কাণ্ডের অগ্রভাগের দীর্ঘচ্ছেদ

মূলের অগ্রভাগ (Root apex—১১৩নং চিত্র)—মূলের প্রাথমিক কলায় সাধারণত তিন প্রকার প্রারম্ভিক কোষ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, বহিঃস্থ কোষসমষ্টি হইতে মূলত্র (root cap) এবং ডারমাটোজেনের (dermato-

gen) উৎপত্তি হয় ; মধ্যের কোষসমষ্টি হইতে পেরিব্লেম (periblem) এবং সর্বমধ্যস্থ কোষসমষ্টি হইতে প্লিরোম (plerome) গঠিত হয়। কিন্তু একবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বহিঃস্থ কোষসমষ্টি হইতে মূলত্র উৎপন্ন হয় কিন্তু মধ্যস্থ অঞ্চল ডারমাটোজেন ও পেরিব্লেম গঠনে অংশ গ্রহণ করে এবং সর্বমধ্যস্থ কোষসমষ্টি হইতে প্লিরোম উৎপন্ন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মূলত্র ক্যালিপট্রোজেন (calyptrogen) নামক চতুর্থ প্রারম্ভিক কোষসমষ্টি হইতে স্বাধীনভাবে গঠিত হয়।



১১৩নং চিত্র—মূলের অগ্রভাগের দীর্ঘচ্ছেদ

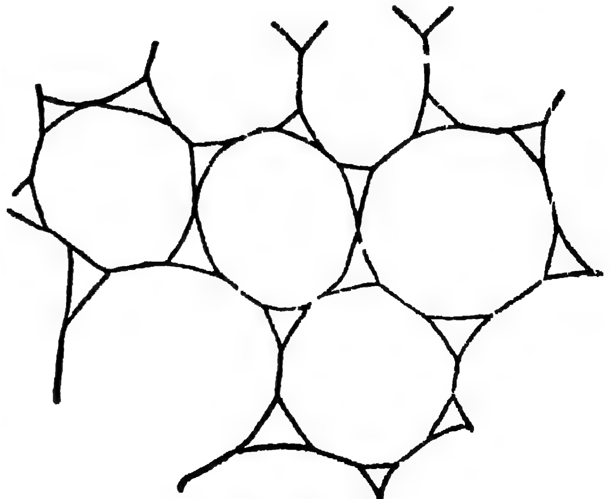
II. প্রাথমিক স্থায়ী কলা (Primary permanent tissue)

যে সকল প্রাথমিক স্থায়ী কলা অগ্রস্থ ভাজক কলা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদের কোষগুলির নির্দিষ্ট আকৃতি ও আয়তন আছে এবং সাধারণত কোষমধ্যবর্তী স্থান থাকে। প্রাথমিক স্থায়ী কলা তিন প্রকার—সরল (simple), (2) জটিল (complex) এবং (3) বিশেষ (special)।

A. সরল কলা (Simple tissue)

এই প্রকার কলাতে একই প্রকার কোষ থাকে এবং উহারা একই কার্য করে। ইহা তিন প্রকারের—প্যারেনকাইমা (parenchyma), কোলেনকাইমা (collenchyma) ও স্ক্লেরেনকাইমা (sclerenchyma)।

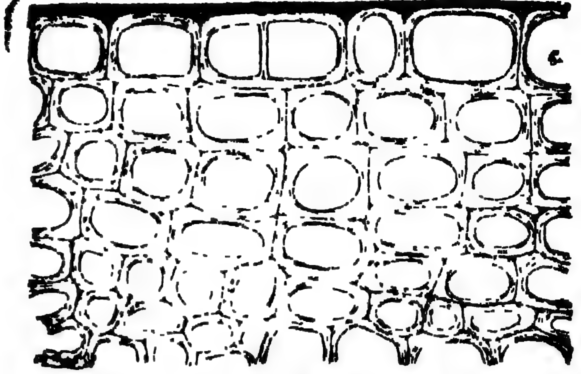
1. প্যারেনকাইমা (Parenchyma—১১৪নং চিত্র)—এইপ্রকার কলা প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত এবং উহাদের ব্যাস সমান। কোষগুলির আকৃতি গোলাকার, ডিম্বাকার বা বহুক্ষেত্র বিশিষ্ট।) (ইহাদের মধ্যে পর্যাপ্ত প্রোটোপ্লাজম থাকে।)(কোষমধ্যবর্তী স্থানও আছে।)(কোষপ্রাচীর পাতলা সেলুলোজ দ্বারা গঠিত।) উদ্ভিদের অধিকাংশ দেহ এই প্রকার কোষদ্বারা গঠিত।(খাদ্য-প্রস্তুত, খাদ্যসঞ্চয় ও কম মাত্রায় খাদ্যসংবহন ইহার প্রধান কার্য। এইজন্য ইহাকে পোষককলাও (nutritive tissue) বলা হয়।)

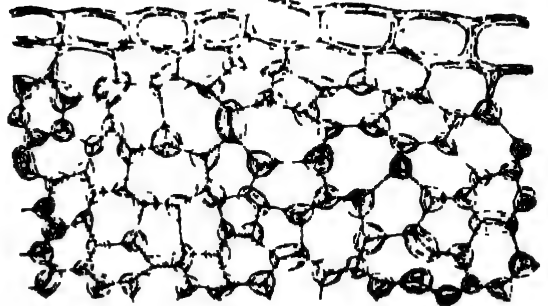

১১৪নং চিত্র—প্যারেনকাইমা

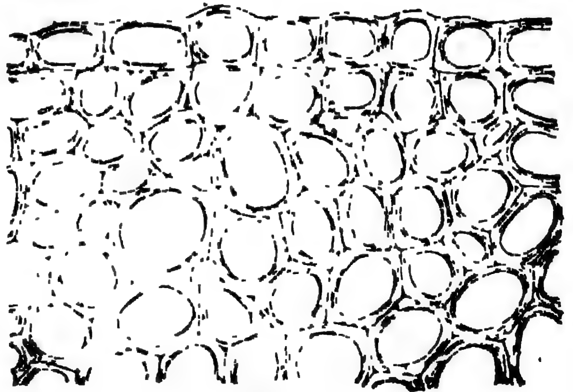
2. **কোলেনকাইমা** (Collenchyma—১১৫নং চিত্র)—(এইপ্রকার কলার কোষগুলি কিছু দীর্ঘ, স্থূলপ্রাচীরবিশিষ্ট, কিন্তু কখনই লিগনিনযুক্ত হয় না। কোষগুলির মধ্যে প্রোটোপ্লাজম থাকে বলিয়া ইহাদের প্যারেনকাইমা কলার সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে।) যে-সকল স্থানে প্যারেনকাইমা এবং কোলেনকাইমা পরস্পর পাশাপাশি অবস্থান করে সেইসকল স্থানে উভয়েরই মধ্যবর্তী অবস্থার কলাগুলি লক্ষ্য করা যায়।

(কোলেনকাইমা সাধারণত কাণ্ডে অথবা পাতার অধস্ত্বকে (hypodermis) দেখিতে পাওয়া যায়। কখনো কখনো ইহা মূলের উন্মুক্ত অংশেও থাকে। কয়েকটি উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা ও পুষ্পদণ্ডের ক্ষেত্রে কোলেনকাইমাই প্রথম স্তম্ভন কলা (mechanical tissue) রূপে পরিচিত, যদিও কতকগুলি বীরুতের ক্ষেত্রে ইহাকেই প্রধান স্তম্ভন কলারূপে গণ্য করা হয়। কোলেনকাইমা সাধারণত বলয় আকারে অথবা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়)

(কোলেনকাইমার কোষগুলি ক্ষুদ্র প্রিজমের ন্যায় অথবা দীর্ঘ তন্তুর (fibre) ন্যায় দেখিতে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ইহারা বহুভুজবিশিষ্ট। কোষপ্রাচীরের স্থূলীকরণ সমভাবে হয় না।)(স্থূলীকরণ অনুযায়ী তিন প্রকারের কোলেনকাইমা আছে। যথা, **কৌণিক** (angular)—যখন কোষের কোণাগুলিতে স্থূলীকরণ হইয়া থাকে; যথা কিউকারবিটেসী গোত্রীয় উদ্ভিদ (Fam.-Cucurbitaceae)—পানিমরিচ প্রভৃতি (2) **স্তরীভূত** (Lamellar)—যখন কোষপ্রাচীরের গাত্রে স্তরের ন্যায় স্থূলীকরণ হইয়া থাকে কিন্তু পার্শ্বপ্রাচীরের স্থূলীকরণ কোষের অবশিষ্ট অংশ অপেক্ষা কম; যথা, আয়াপান প্রভৃতি উদ্ভিদ। (3) **কুপাকৃতি** (Lacular)—এই সকল কোষের


ক

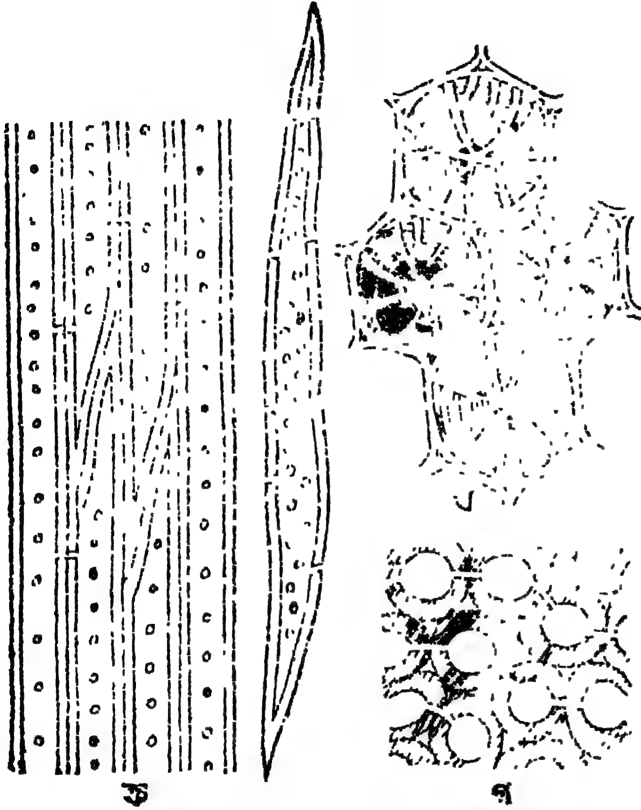

খ


গ

১১৫নং চিত্র—কোলেনকাইমা : (ক) স্তরীভূত ; (খ) কৌণিক ; (গ) কুপাকৃতি

স্পষ্ট কোষমধ্যবর্তী স্থান আছে এবং এইগুলির চতুর্দিকে স্থূলীকরণ হইয়া থাকে। যথা,—হাতিশুঁড় প্রভৃতি উদ্ভিদ।

3. স্ক্লেরেনকাইমা (Sclerenchyma—১১৬নং চিত্র)—এইপ্রকার কলার কোষগুলির প্রাচীর লিগ্নীভবন (lignification) হইয়া অত্যন্ত স্থূল ও কঠিন হয় এবং উহা সাধারণত সরল কূপযুক্ত। কোষপ্রাচীর প্রায় নিয়মিতভাবেই স্থূল হয়; সেইজন্য কোষগহবর অতিশয় ক্ষুদ্র হয়। কোষের মধ্যে সাধারণত প্রোটোপ্লাজম থাকে না। স্ক্লেরেনকাইমা দুই প্রকার—(ক) স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু (sclerenchyma fibre) ও (খ) স্ক্লেরটিক কোষ (sclerotic cell) বা স্ক্লেরাইড (scleride)।



১১৬নং চিত্র—স্ক্লেরেনকাইমা: (ক) স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু, (খ) স্ক্লেরটিক কোষ; (গ) স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুর প্রস্থচ্ছেদ

স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু (Sclerenchyma fibre): এইপ্রকার তন্তুর কোষগুলি খুব লম্বা, সূচাল ও একত্র গ্রথিত থাকে। কোষপ্রাচীরগুলি নিয়মিতভাবে স্থূল হয় এবং উহা সাধারণত সরল কূপযুক্ত। কূপগুলি ক্ষুদ্র, গোলাকার বা বিদারিত। কোষগুলি পরিণত হইলে মরিয়া যায় এবং সামান্য গহ্বরযুক্ত হয়, কারণ কোষপ্রাচীর অত্যন্ত স্থূল হয়। কোষপ্রাচীর সাধারণত কঠিন ও লিগনিনযুক্ত হয়, তবে সময় সময় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সেলুলোজযুক্ত অথবা মিউসিলেজযুক্ত হইতে পারে। স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু দুই প্রকারের: বাস্ট তন্তু (bast fibres) এবং কাষ্ঠিক তন্তু (wood fibres)। কর্টেক্স, পেরিসাইকল ও ফ্লোয়েমের তন্তু বাস্ট তন্তুর উদাহরণ; ইহারা সাধারণ কূপযুক্ত। কাষ্ঠ বা জাইলেম (xylem)-এর তন্তুকে কাষ্ঠিক তন্তু বলে; ইহারা হ্রাসপ্রাপ্ত সপাড় কূপযুক্ত। স্ক্লেরেনকাইমা উদ্ভিদকে বলশালী ও দৃঢ় করে; এইজন্য ইহাকে স্তম্ভন কলা (mechanical tissue) বলে। স্ক্লেরেনকাইমা কাণ্ডের যে কোন স্থানে উৎপন্ন হইতে পারে; যথা—(1) একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের মধ্যে ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের আচ্ছাদনরূপে, (2) সূর্যমুখী উদ্ভিদের কাণ্ডের মধ্যে কঠিন বাস্ট (hard bast) বা বাণ্ডিল টুপি (bundle cap) রূপে, (3) কুমড়া গাছের কাণ্ডের

সম্পূর্ণ পেরিসাইকলে, (4) পাইন পাতার অধস্তকরূপে (hypodermis) (5) জাইলেম (xylem) বা কাষ্ঠিক তন্তুরূপে (wood fibres) এবং (6) ফ্লোয়েমে বা বাস্ট তন্তুরূপে (bast fibres)।

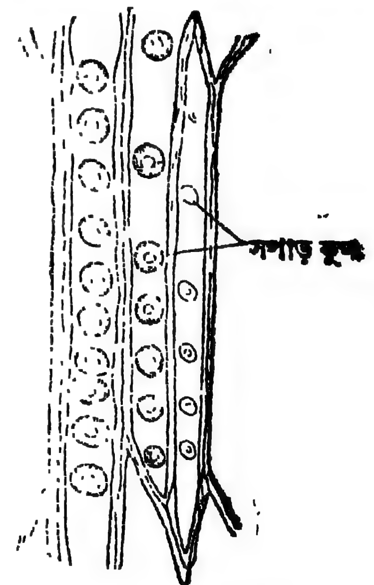
(b) স্ক্লেরোটিক কোষ (Sclerotic cell) বা স্ক্লেরাইড (Scleride)—ইহাদের কোষগুলি প্যারেনকাইমা কোষের ন্যায় ক্ষুদ্র সমব্যাসসম্পন্ন অথবা দীর্ঘ দণ্ডের ন্যায় অথবা স্তম্ভের ন্যায় অথবা শাখান্বিত এবং বিভিন্ন আকৃতির হইয়া থাকে। কোষগুলি মৃত, কিন্তু সময় সময় ইহাদের মধ্যে ট্যানিন ও মিউসিলেজ থাকে। প্রাচীরগুলি অত্যন্ত স্থূল ও লিগনিনযুক্ত হয়, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সুবারিনযুক্ত বা কিউটিনযুক্ত হইতে পারে। ইহাদের কোষগহ্বর ক্ষুদ্র, গোলাকার এবং প্রায়ই শাখান্বিত হয়। স্ক্লেরোটিক কোষগুলি পৃথকভাবে অথবা গুচ্ছাকারে উদ্ভিদের দেহের প্যারেনকাইমায়, বিশেষত কর্টেক্সে ও ফ্লোয়েমে থাকে। ইহারা সরল ফলে (যথা—নাসপাতি); বা বীজে (যথা—পেয়ারা) থাকিলে ইহাদিগকে গ্রিট কোষ (grit cell) বলে। ইহা উদ্ভিদকে দৃঢ়তা প্রদান করে; সুতরাং ইহাও একপ্রকার স্তম্ভন কলা (mechanical tissue)।

B. জটিল কলা (Complex tissue)

জটিল কলা একাধিক আকারের কোষ দ্বারা গঠিত, কিন্তু একই কার্য করে। জাইলেম (Xylem) ও ফ্লোয়েম (phloem) নামক দুইটি ভ্যাস্কুলার কলা (vascular tissue) জটিল কলার উদাহরণ। ইহারা অত্যন্ত আবশ্যকীয়। নিম্নে ইহাদের বিবরণ দেওয়া হইল :

(a) জাইলেম (Xylem) :

এইপ্রকার কলার কোষগুলি বৃদ্ধির সময় জটিলভাবে পরিবর্তিত হইয়া প্রাথমিক দশায় চারি প্রকার উপাদানে বিভাজিত হয়, যথা—ট্রাকীড (tracheid), ট্রাকীয়া (trachea) বা বাহিকা (vessel), জাইলেম প্যারেনকাইমা (xylem parenchyma) ও কাষ্ঠিক তন্তু (wood fibres)।

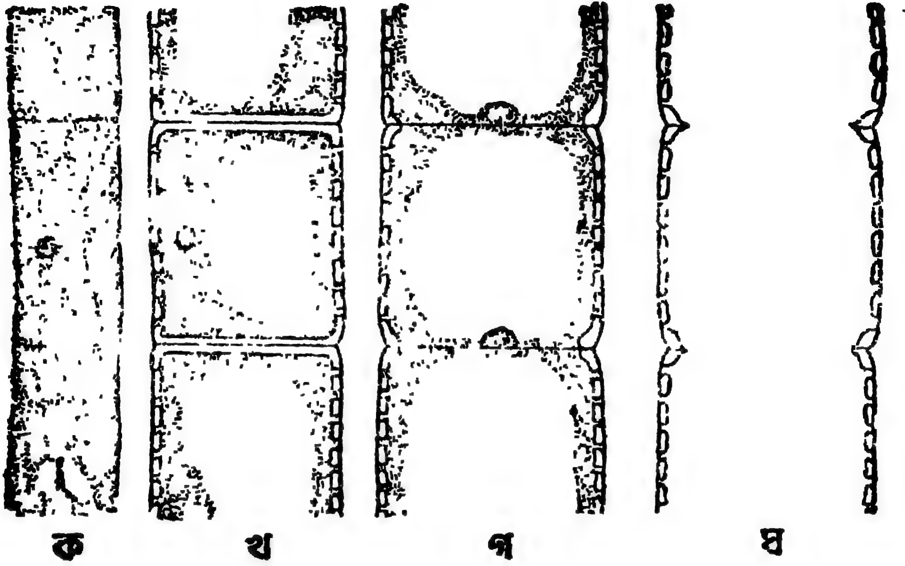


১১৭নং চিত্র—ট্রাকীড

1. ট্রাকীড (Tracheid—১১৭নং চিত্র)—ইহা দীর্ঘ মৃত কোষ কিন্তু অগ্রভাগ সূক্ষ্ম নহে। ইহার lumen বা গহ্বর বেশ বড় ও শূন্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোষপ্রাচীর লিগনিনযুক্ত ও সপাড় কূপযুক্ত। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে কূপগুলি বড়, কিন্তু গুপ্তবীজীতে ছোট। টেরিডোফাইটার ক্ষেত্রে কোষপ্রাচীর বলয়াঙ্কিত, সর্পিলাঙ্কিত, ও সোপানাঙ্কিত হয়। কোষগুলি একটির উপরে একটি করিয়া সাজান থাকে। ইহা ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের

জলসংবহন কলার সহিত অবস্থান করে। জলসঞ্চয়, জলসংবহন ও দৃঢ়তা প্রদান করা ইহার কার্য।)

2. ট্র্যাকীয়া (Trachea) বা বাহিকা (Vessel)—ইহা একপ্রকার লম্বা নল বিশেষ। এইপ্রকার নল একসারি লম্বা কোষের প্রস্থ প্রাচীরগুলি বিলুপ্ত হইয়া (১১৮নং চিত্র) অথবা কতকগুলি ট্র্যাকীড মিলিত হইয়া উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইবার সময় ইহা আয়তনে বড় হয় এবং পরে ইহার পার্শ্বের প্রাচীর-দুইটি লিগ্‌নিনযুক্ত এবং স্থানে স্থানে স্থূল হইয়া নানা আকারের হয়। স্থূলীকরণ বলয়াঙ্কিত, সর্পিলাঙ্কিত,



১১৮নং চিত্র—(ক—ঘ) বাহিকার ক্রমিক পরিণতি

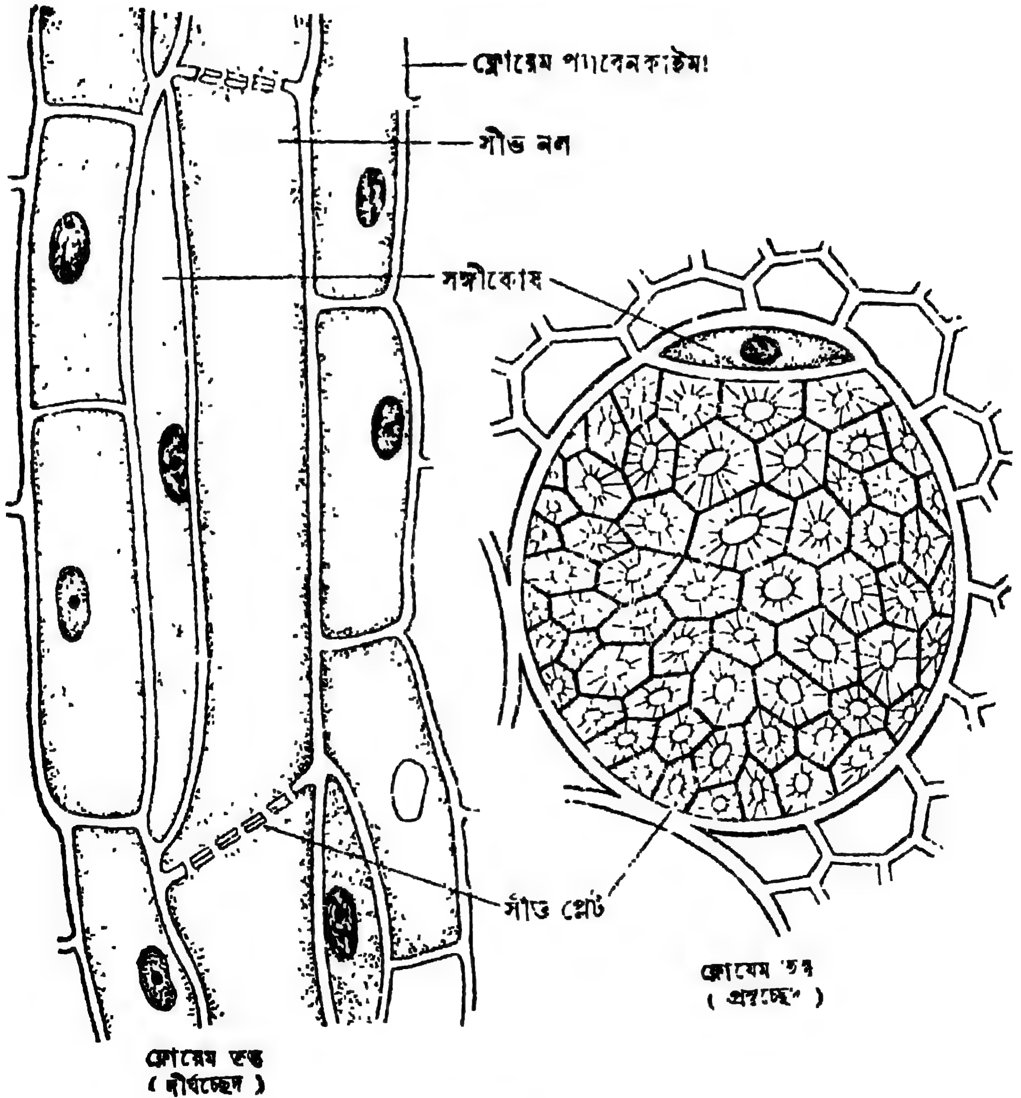
সোপানাঙ্কিত, জালাঙ্কিত ও কূপাঙ্কিত হয়। জলসংবহন করা ও দৃঢ়তা প্রদান করা বাহিকাগুলির প্রধান কার্য। প্রাচীরের পাতলা অংশ দিয়া জল এক বাহিকা হইতে অন্য বাহিকায় যায় এবং উহার স্থূল অংশ বাহিরের চাপ প্রতিরোধ করে। বাহিকা গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য, যদিও ইহা ম্যাগনোলিয়েসী গোত্রীয় (Fam. Magnoliaceae), ক্যাকটেসী গোত্রীয় (Fam. Cactaceae) এবং কতকগুলি জলজ ও পরজীবী উদ্ভিদে থাকে না। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের মধ্যে কেবলমাত্র নিটামে (Gnetum) বাহিকা আছে।

3. জাইলেম প্যারেনকাইমা (Xylem parenchyma)—ইহারা স্বল্পবিস্তর দীর্ঘ প্যারেনকাইমা কোষ এবং একটির পার্শ্বে একটি করিয়া সাজান থাকে। কোষ-প্রাচীর পাতলা বা স্থূল এবং বেশী পরিমাণে লিগ্‌নিনযুক্ত হয়। কূপ থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। ইহারা প্রাথমিক ও গৌণ কাষ্ঠে এবং দ্বিবীজপত্রী ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের গৌণ মজ্জাংশুতে (secondary medullary) থাকে। তবে পাইন (pine), অ্যারোকেরিয়া (Aurocaria) প্রভৃতি ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে ইহারা থাকে না, খাদ্যসঞ্চয়, জলসংবহন এবং উদ্ভিদকে সুদৃঢ় করা ইহাদের কার্য।

4. **কাণ্ঠিক তন্তু** (Wood fibres)—ইহাদের আকৃতি ও কার্যের বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে।

(B) ফ্লোয়েম (Phloem)

ইহার উপাদানগুলি বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন প্রকারের হয়। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ইহার চারিটি উপাদান থাকে ; যথা—সীভ নল (sieve tube), সঙ্গিকোষ (companion cell), ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা (phloem parenchyma) ও বাস্ট তন্তু (bast fibres)। সকল ক্ষেত্রে এই উপাদানগুলি একসঙ্গে থাকে না। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ ও টেরিডোফাইটার ফ্লোয়েমে কেবলমাত্র সীভ নল ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে এবং একবীজপত্রী উদ্ভিদের ফ্লোয়েমে সীভ নল ও সঙ্গিকোষ থাকে।



১১৯নং চিত্র—ফ্লোয়েম

1. **সীভ নল** (Sieve tube—১১৯নং চিত্র)—ইহারা একপ্রকার নল বিশেষ। এই নল একসারি লম্বা, পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট সজীব কোষের প্রস্থের প্রাচীর আংশিক

বিলুপ্ত হইয়া উৎপন্ন হয়। আংশিক বিলুপ্ত কোষপ্রাচীরটি চালুনির মত ছিদ্রিত হয় বলিয়া ইহাকে **সীভ প্লেট** (sieve plate) বলে। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে ও টেরিডোফাইটায় সীভ প্লেটগুলি পার্শ্বস্থ প্রাচীরেও দেখিতে পাওয়া যায় এবং কখনও কখনও বক্রভাবে থাকে। প্রত্যেক সীভ নলে একটি সুস্পষ্ট কেন্দ্রস্থিত ভ্যাকুওল থাকে এবং বাহিরের দিকের সাইটোপ্লাজমের স্তরের মধ্যে কতকগুলি অবর্ণ প্লাসটিড ও বিক্ষিপ্ত স্টার্চ দানা থাকে, কিন্তু কখনও নিউক্লিয়াস থাকে না। সীভপ্লেটের ছিদ্রের মধ্য দিয়া সীভ নলের সাইটোপ্লাজমের পারস্পরিক সংযোজন স্থাপিত হয়। কোষরসে প্রোটীন দ্রবীভূত থাকিয়া ইহাকে আঠাল করে। পাতা হইতে প্রস্তুত খাদ্য (যথা—কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটীন) কাণ্ডের ভিতর দিয়া মূলে ও অন্যান্য অংশে চালনা করাই সীভ নলের প্রধান কার্য।

সময় সময় **ক্যালাস** (callus) বা **ক্যালাস প্যাড** (callus pad) নামক একপ্রকার বর্ণহীন, কেলাসিত, উজ্জ্বল, কার্বোহাইড্রেট পদার্থ সীভ প্লেটের উপর জমা হইয়া সীভ নলের কার্য অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্যালাস স্থায়ীভাবে সীভ নলের কার্য বন্ধ করে, তবে অস্থায়ীভাবে হইলে ইহা দ্রবীভূত হয় ও সীভ নল পুনরায় কার্যকরী হয়।

2. **সঙ্গিকোষ** (Companion cell)—সীভ নলের সহিত দীর্ঘ সামঞ্জস্যহীন ও বিশিষ্ট প্রকারের প্যারেনকাইমা কোষকে সঙ্গিকোষ বলে। প্রত্যেক সঙ্গিকোষের মধ্যে দানাদার সাইটোপ্লাজম, ছোট ছোট ভেকুওল এবং একটি সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে, কিন্তু কখনো স্টার্চ দানা থাকে না। সকল গুপ্তবীজী উদ্ভিদের সঙ্গিকোষ আছে কিন্তু ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে ও টেরিডোফাইটায় নাই। সম্ভবত ইহারা সীভ নলকে খাদ্য-সংবহন করিতে সাহায্য করে।

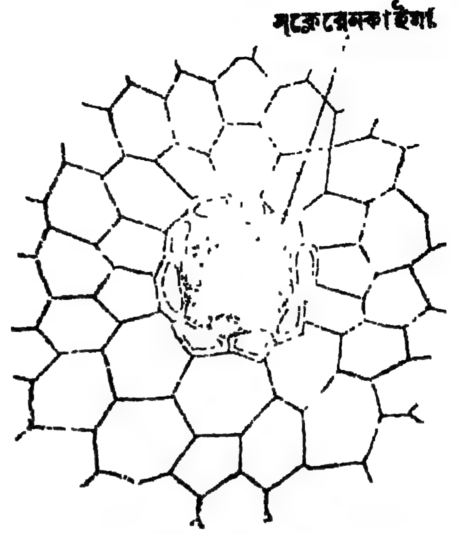
3. **ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা** (Phloem parenchyma)—ইহার কোষগুলি আদি ক্যাম্বিয়াম (procambium) হইতে গঠিত হইবার সময় খাড়াভাবে দীর্ঘ হয় এবং পরে ইহারা বিস্তারেও বর্ধিত হয়। শর্করা ও সহজে পরিব্যাপ্তশীল প্রোটীন সংবহন, প্রোটীন-সঞ্চয় এবং সীভ নল হইতে মজ্জাংশু ও জাইলেম প্যারেনকাইমাতে খাদ্য সংবহন করাই ইহার প্রধান কার্য।

4. **বাস্ট তন্তু** (Bast fibres)—ইহার আকৃতি ও কার্য সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। বাস্ট তন্তু সাধারণত গুপ্তবীজী উদ্ভিদের গৌণ ফ্লোয়েমে থাকে, কিন্তু টেরিডোফাইটায়, কতকগুলি ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে এবং কয়েকটি কোমল কাণ্ডের গুপ্তবীজী উদ্ভিদে থাকে না।

(C) বিশেষ কলা (Special tissue)

এইপ্রকার কলা বলিতে নানাবিধ বহিঃক্ষরিত কলা (secretory tissue)—যথা, বহিঃক্ষরিত কোষ (secretory cells), গ্রন্থি (glands) এবং ক্ষীরনালী (laticiferous ducts) বুঝায়। ইহাদের মধ্যে বিশিষ্ট পদার্থ থাকে বলিয়া ইহারা বিশেষ

কার্য সম্পাদন করে। এই সকল কলা গঁদ (gums), রজন (resins), বান তৈল (etherial oils), মধু (nectar) প্রভৃতি ক্ষরণ করে।



১২০নং চিত্র—বহিঃক্ষরিত কোষ

1. বহিঃক্ষরিত কোষ (Secretory cells—১২০নং চিত্র)—এইরূপ কোষগুলি দুই প্রকারের ; যথা—(a) বিছুটির দংশরোম (stinging hairs), মধুগ্রন্থি, রজন নালী, তৈল নালী প্রভৃতিতে ক্ষরিত পদার্থ অনিয়মিতরূপে বহিঃনিক্ষিপ্ত হয়। এইজন্য ইহাদের রেচনকোষ (secretory cells) নামেও অভিহিত করা হয়। ইহাদের ঘন দানাদার সাইটোপ্লাজম এবং সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস আছে।

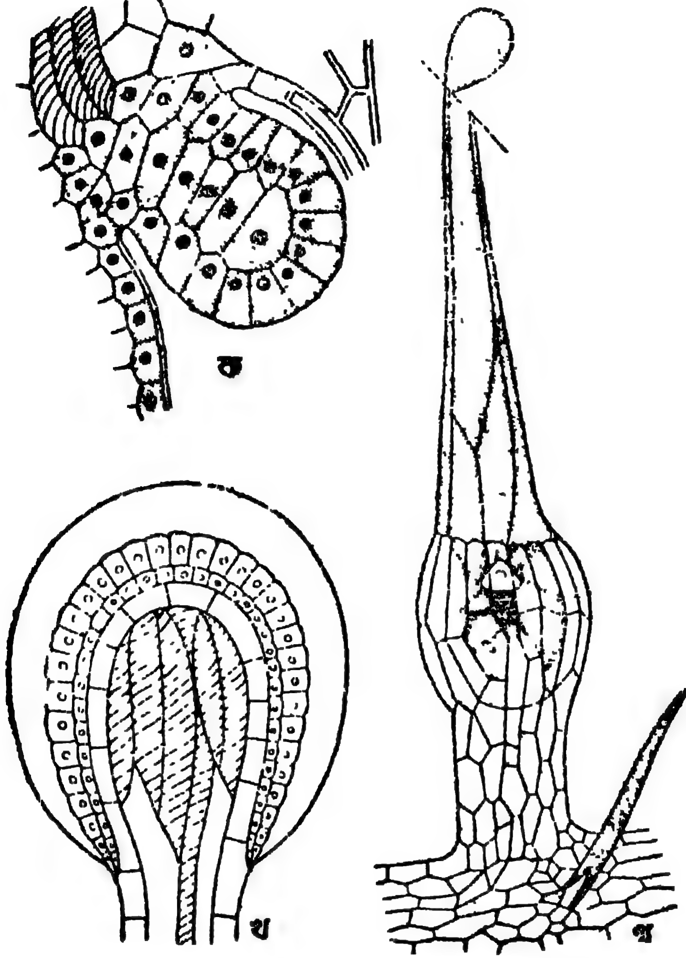
(b) অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষরিত পদার্থ কোষগুলির মধ্যে সঞ্চিত থাকে বলিয়া ইহারাই প্রকৃত বহিঃক্ষরিত কোষ (secretory cells)। ইহাদের কোষগহ্বরটি বৃহৎ এবং ক্ষরিত পদার্থ দ্বারা পূর্ণ ; যথা, হলুদ, বহুপ্রকার ফার্ন প্রভৃতি।

2. গ্রন্থি (Glands)—বহিঃক্ষরিত কোষগুলি কখনো কখনো একত্রিত হইয়া একটি বিশেষ আকৃতির গ্রন্থি (gland) গঠন করে। অবস্থান ও আকৃতি অনুযায়ী তিন প্রকারের গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা—(a) বহিঃগাত্রীয় গ্রন্থি (superficial glands)—ইহাদের উদ্ভিদগাত্রের বহির্ভাগে দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা—কদম, কুমকোলতা প্রভৃতি উদ্ভিদে। এই সকল উদ্গত গ্রন্থিগুলি রোম অথবা ট্রাইকোম (trichomes) এবং শল্ক (scales), পরিবর্তিত হইতে পারে ; যথা—ফলসা, তামাক, তুলা প্রভৃতি উদ্ভিদ।

(b) অন্তঃস্থ গোলাকার গ্রন্থি (Internal globular glands)—এই প্রকার গ্রন্থির কোষগুলি একত্রিত হইয়া গোলাকার দেখিতে হয় ; যথা—কদম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের উপপত্র প্রভৃতি।

(c) অন্তঃস্থ নলাকার গ্রন্থি (Internal tubular glands)—এইপ্রকার গ্রন্থির নালী সিজোজেনিকভাবে (schizogenously) উৎপত্তি হইতে পারে ; যথা—পাইন জাতীয় উদ্ভিদের রজন নালী, অথবা ইহার লাইসিজেনিকভাবে (lysigenously) উৎপত্তি হইতে পারে। যথা—লেবুর খোসার গ্রন্থি। সিজোজেনিকভাবে উৎপত্তির সময়, ক্ষারীয় কোষগুলি কোষমধ্যবর্তী duct বা নালীর চতুর্দিকে এপিথিলিয়াম (epithelium) নামক একটি আবরণ সৃষ্টি করে এবং ইহা ক্ষারীয় পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে।

বহু প্রকার গ্রন্থি পাচক এনজাইম (digestive enzymes) ক্ষরণ করে বলিয়া ইহারা পরিপাকে অংশ গ্রহণ করে। এইপ্রকার গ্রন্থিকে পাচকগ্রন্থি (digestive glands) বলে। পতঙ্গভুক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে একপ্রকার বিশেষ ধরনের গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায় যাহা একপ্রকার প্রোটীন পাচক এনজাইম ক্ষরণ করিয়া ধৃত পতঙ্গের দেহে ক্রিয়া করিয়া



১২১নং চিত্র—বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থি
(ক) ড্রসেরা ; (খ) কলস উদ্ভিদ ; (গ) বিচুটি

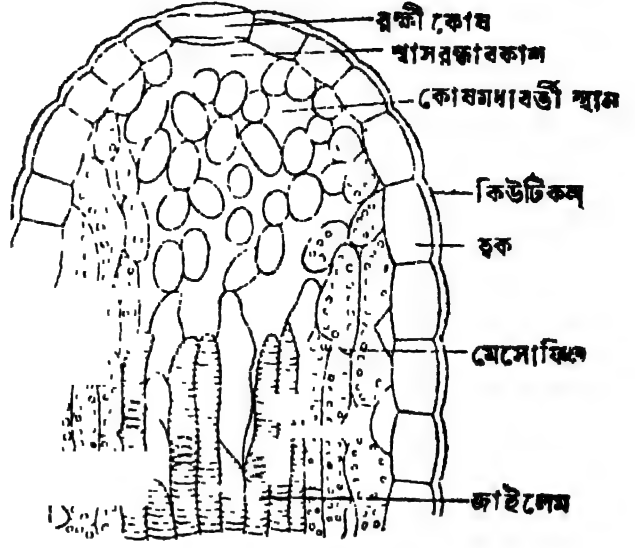
দ্রবীভূত পদার্থ শোষণ করে ; যথা—কলস উদ্ভিদ (pitcher plant) (১২১ খ-নং চিত্র) ড্রসেরা (১২১ ক-নং চিত্র) প্রভৃতি।

মধুক্ষরীয় গ্রন্থিগুলিকে মধুগ্রন্থি (nectaries) বলে। ইহাদের ফুলের বিভিন্ন অংশে, মঞ্জরীপত্র প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

3. হাইডাথোড (Hydathodes) (১২২নং চিত্র)—জল, লবণ দ্রবণ প্রভৃতি তরল দ্রব্য কোন কোন উদ্ভিদের একটি বিশেষ অঙ্গ দিয়া ক্ষরিত হয়। এইরূপ অঙ্গকে হাইডাথোড বলে। ইহাদের পাতার অগ্রভাগে বা কিনারায় দেখিতে পাওয়া যায়। এইপ্রকার উদ্ভিদের জন্য স্বল্প উষ্ণতা, আর্দ্র বায়ু এবং মৃত্তিকাতে প্রচুর জল থাকা

প্রয়োজন। প্রস্বেদন বিঘ্নিত হইলে, জলপরিবহণকারী কলার স্থিতশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তখন কোষমধ্যবর্তী স্থানগুলিকে প্রচুর পরিমাণে জল সঞ্চয়ের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য হাইডাথোডের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

আর্দ্র উষ্ণ রাত্রির পরদিন প্রত্যুষে কচুপাতা, বহু প্রকার ঘাস, ট্রোপিওলাম প্রভৃতির পাতার অগ্রভাগে বা কিনারায় শিশিরবিন্দুর ন্যায় জল বাহির হইতে প্রায়ই দেখা যায়। প্রতি জলবিন্দুই পাতায় হাইডাথোডের অবস্থান নির্দেশ করে।



১২২নং চিত্র—হাইডাথোড

হাইডাথোড এককোষী অথবা বহুকোষী উদ্গত ত্বক এবং জল পরিবহনকারী কলার অর্থাৎ জাইলেমের সহিত সরাসরি যুক্ত। সাধারণত ইহারা এপিথেম (epithem) নামক পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট, প্রচুর কোষ-মধ্যবর্তী স্থান সম্পন্ন মেসোফিল কোষের সমষ্টি এবং ইহারা ত্বক এবং বান্ডিল প্রান্তের মধ্যে অবস্থান করে। এপিথেম জলপূর্ণ হইলে, একটি বা একাধিক উপত্বকীয় প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়া এবং একটি বা একাধিক জলরন্ধ্র দিয়া জল নির্গত হয়। কোষগুলি ক্ষুদ্র এবং ক্লোরোপ্লাস্টবিহীন।

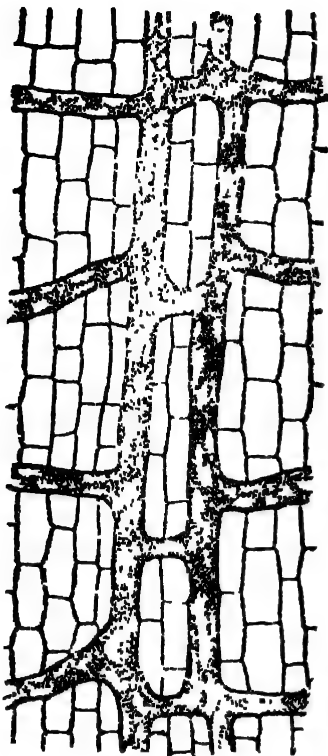
4. **রজন নালী** (Resin duct)—এইপ্রকার নালীতে রজন সঞ্চিত থাকে। এই নালী সিজোজেনিক পদ্ধতিতে গঠিত হয়। পাইন-জাতীয় উদ্ভিদে রজন নালী থাকে।

5. **ল্যাটিসিফেরাস নালী** (Laticiferous ducts—১২৩নং চিত্র)—ইহার মধ্যে তরুক্ষীর (latex) সঞ্চিত থাকে। ইহা দুই প্রকারের ; যথা—

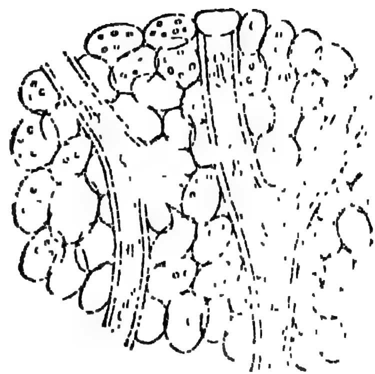
(*a*) **ক্ষীরনালী** (Latex vessels)—প্রাথমিক ভাজক অবস্থায় কতকগুলি দীর্ঘ ও সজীব কোষের প্রস্থ-কোষপ্রাচীর বিলুপ্ত হইয়া ক্ষীরনালী উৎপন্ন হয়। ইহা সজীব এবং পার্শ্বীয় শাখাবিশিষ্ট কিন্তু শাখাগুলি সন্নিকটে আসিলে সংযুক্ত হয়। প্যাপাভারেসী গোত্রীয় (Fam. Papaveraceae), মুজেসী উপগোত্রীয় (Sub-fam. Musaceae), এরেসী গোত্রীয় (Fam Araceae) প্রভৃতি উদ্ভিদের ক্ষীরনালী বৈশিষ্ট্য।

(*b*) **ক্ষীরকোষ** (Latex cell)—ইহা আকারে এককোষযুক্ত। নলাকার কোষটি একটিমাত্র ভাজককোষ হইতে উৎপন্ন হয় এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধির সময় ক্রমশ দীর্ঘ ও

শাখাবিশিষ্ট হয়। কতকগুলি ভ্রূণেও ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং পরে শাখাবিশিষ্ট হয়। কিন্তু শাখাগুলি সন্নিকটে আসিলে কখনো সংযুক্ত হয় না। মোরেসী গোত্রীয় (Fm. Moraceae), অ্যাসক্লিপিয়াডেসী গোত্রীয় (Fam. Asclepia-daceac) প্রভৃতি উদ্ভিদের ক্ষীর কোষ বৈশিষ্ট্য।



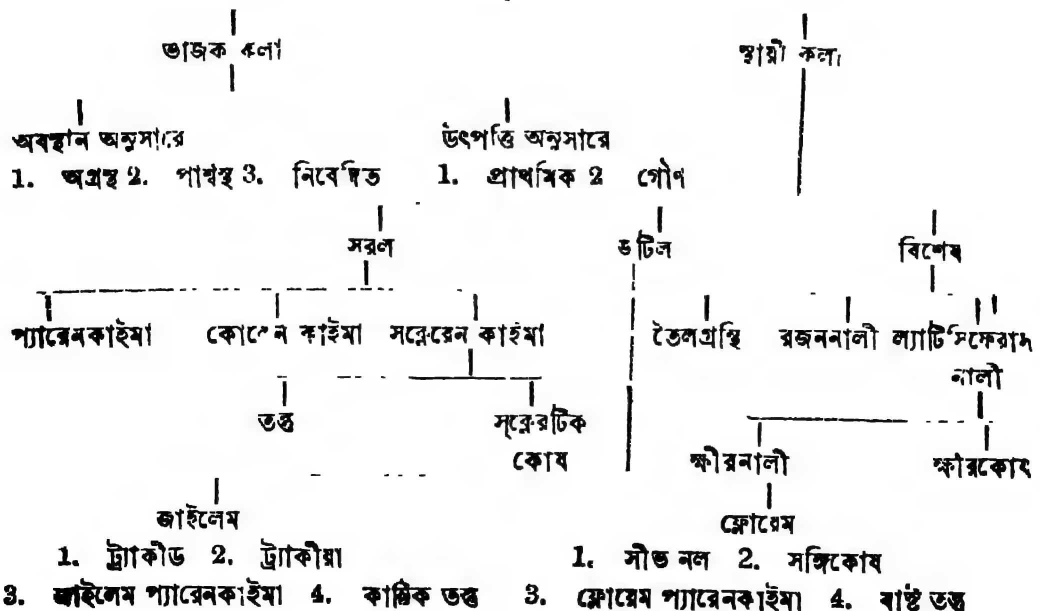
ক



খ

১২৩নং চিত্র—ল্যাটিসিফেরাস নালা : (ক) ক্ষীরনালী, (খ) ক্ষীরকোষ

কলার ছক এইরূপ ঃ



8 কলাতন্ত্র
(The Tissue System)

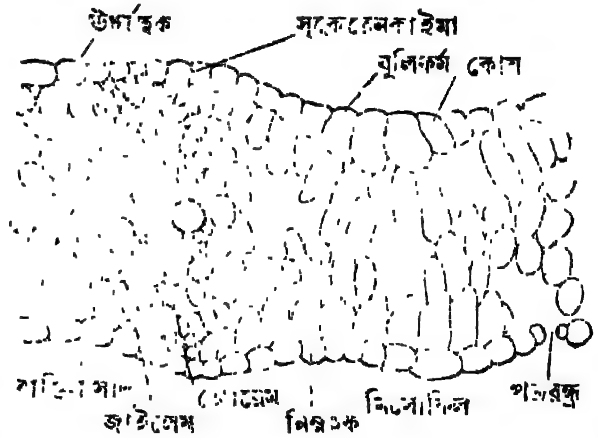
কলাগুলির (Tissue) আকৃতিগত সাদৃশ্য এবং অনুরূপ কার্যের উপর ভিত্তি করিয়া ইহাদিগকে বিভিন্ন কলাতন্ত্রে (tissue system) ভাগ করা হইয়াছে। কলাতন্ত্র তিন প্রকারের, যথা—(A) ত্বক কলাতন্ত্র (epidermal or tegumentary tissue system), (B) আদি কলাতন্ত্র (fundamental or ground tissue system)

A. ত্বক কলাতন্ত্র (Epidermal or tegumentary tissue system) :

এইপ্রকার কলাতন্ত্র ত্বক (epidermis) এবং ইহার নানাবিধ উপবৃদ্ধি (outgrowth) এবং রন্ধ্র লইয়া গঠিত। রন্ধ্র বিশেষত পাতায় ও নরম কাণ্ডে থাকে। এই কলাতন্ত্র প্রোটোডার্ম (protoderm) নামক মুখ্য অগ্রস্থ ভাজক কলা হইতে উৎপন্ন হয়।

B. আদি কলাতন্ত্র (Fundamental or ground tissue system) :

এইপ্রকার কলাতন্ত্র উদ্ভিদের দেহের প্রধান অংশ। ইহা ত্বকের নীচ হইতে কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা প্রধানত প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত এবং বিপাক, খাদ্যসঞ্চয় ও উদ্ভিদকে আংশিকভাবে দৃঢ় করা ইহার প্রধান কার্য। সময় সময় কোলেনকাইমা, স্ক্লেরেনকাইমা এবং অন্যান্য কলাও ইহাতে থাকিতে পারে। মূলে ও কাণ্ডেতে এই তন্ত্র কর্টেক্স (cortex) যাহা ভিতরদিক স্টার্চসীদ (starch sheath) বা এণ্ডোডার্মিস (endodermis) দ্বারা সীমাবদ্ধ—পেরিসাইকল (pericycle), প্রাথমিক মজ্জাংশু



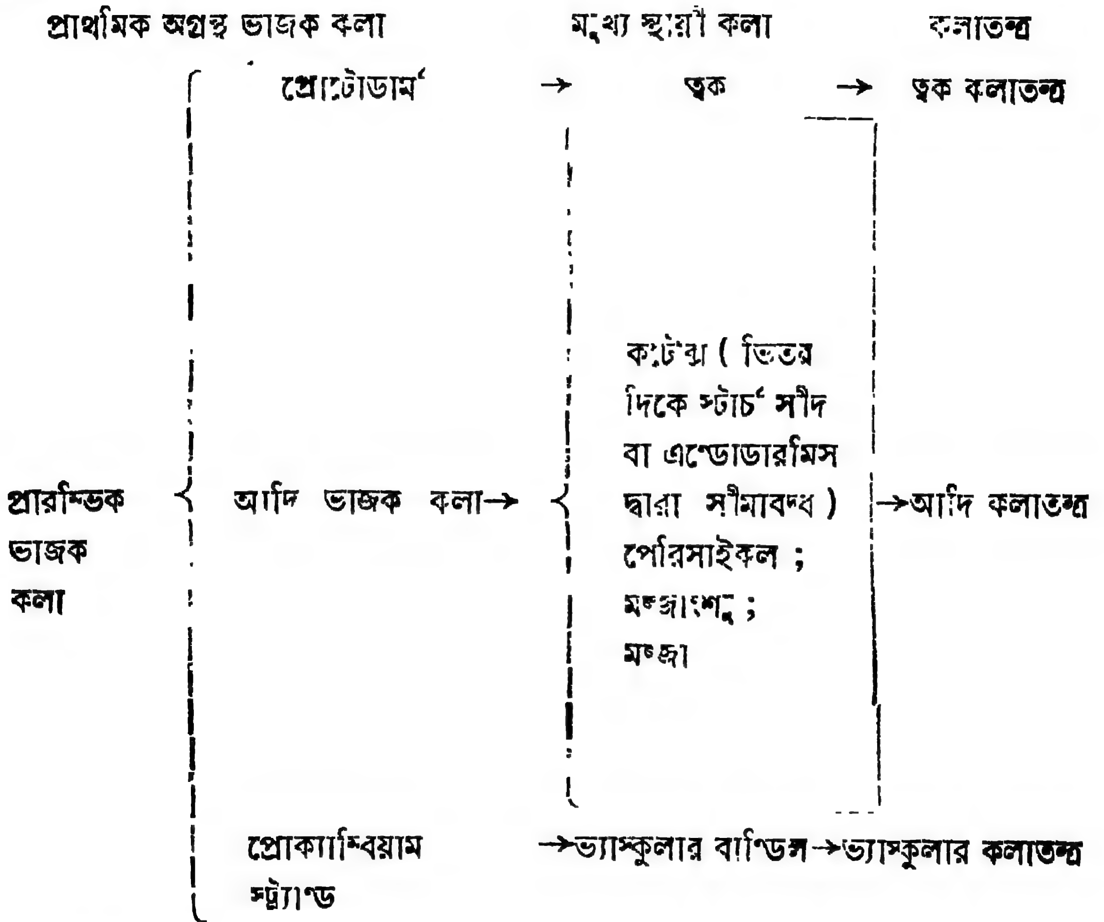
১২৪নং চিত্র—কলাতন্ত্র

এবং মজ্জা (medulla or pith) দিয়া গঠিত। পেরিসাইকল, প্রাথমিক মজ্জাংশু ও মজ্জা (stele) বা স্টেলের ভিতরে থাকে বলিয়া ইহাদিগকে অন্তঃস্টেলীয় (intrastelar) কলা বলে এবং বাকি কলা স্টেলের বাহিরে থাকে বলিয়া উহাদিগকে বহিঃস্টেলীয় (extrastelar) কলা বলে। পাতার আদি কলাকে মেসোফিল (mesophyll) বলে (১২৪নং চিত্র) এবং ইহা সাধারণত প্যালিসেড (palisade) ও স্পঞ্জী (spongy) প্যারেনকাইমায় বিভেদিত হয়। এই কলাতন্ত্র আদি ভাজক কলা (fundamental or ground meristem) হইতে উৎপন্ন হয়।

C. ভ্যাস্কুলার কলাতন্ত্র (Vascular tissue system) :

এই কলাতন্ত্র প্রধানত জাইলেম ও ফ্লোয়েম নামক দুইটি জটিল কলাদ্বারা গঠিত হয়। সংযুক্ত জাইলেম ও ফ্লোয়েমকে **নালিকা বাণ্ডিল** বা **ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল** (vascular bundle) বলে এবং ইহা প্রধানত জল ও খাদ্য সংবহন করে। এই তন্ত্র উদ্ভিদকে দৃঢ়ও করে। ইহা প্রোক্যাম্বিয়াম স্ট্র্যাণ্ড (procambium strand) হইতে উৎপন্ন হয়।

প্রাথমিক অগ্রস্থ ভাজক কলা, প্রাথমিক স্থায়ী কলা এবং কলাতন্ত্র-সম্বন্ধীয় ছকটি এইরূপ :



I. ত্বক কলাতন্ত্র (Epidermal tissue system)

ত্বক (Epidermis) :

উদ্ভিদদেহের সর্বাপেক্ষা বাহিরের স্তরকে ত্বক বলে। ইহা প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত। শৈশব অবস্থায় প্রত্যেক কোষের মধ্যে সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস থাকে। ত্বকের কোষের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না, তবে ফার্ন ও কতকগুলি জলজ উদ্ভিদের, বিশেষত একবীজপত্রী উদ্ভিদের ত্বকে, ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। সাধারণত কোষরসের কোন বর্ণ নাই, তবে কতকগুলি রসাল ফলে ইহা বর্ণযুক্ত হয়।

পত্ররন্ধ্র ও লেণ্টিসেলের অবস্থান ব্যতীত ত্বক অবিচ্ছিন্ন থাকে। ইহা প্রোটোডার্মের

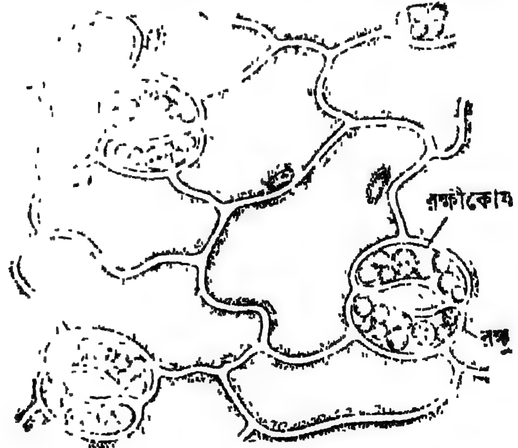
কোষ বিভেদিত হইয়া উৎপন্ন হয় এবং বিভেদের সময় বাহিরের কোষপ্রাচীরে কিউটিন নামক মোমের মত পদার্থ জমা হইয়া ইহাকে জল ও গ্যাস হইতে অভেদ্য করে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট কিউটিকলও থাকে। সাধারণত ইহা এক স্তরবিশিষ্ট কোষদ্বারা গঠিত, কিন্তু কোন কোন সময় ইহা বহুস্তরবিশিষ্টও হয়; যথা—রবার, বট প্রভৃতির পাতা। সময় সময় ত্বকের অংশ পত্ররন্ধ্র, বহিঃক্ষরিত কলা (যথা—মধুগ্রন্থি) মূলরোম প্রভৃতিতে পরিবর্তিত হইয়া বিশেষ কার্য করে। মূলের ত্বককে এপিব্লেমা (epiblema) বা রোমবহ (piliferous layer) বলে।

ত্বকের কার্য—(1) ত্বক বাহিরের আঘাত, অত্যধিক তাপ ও শৈত্য এবং পরজীবী ছত্রাক ও ব্যাক্টিরিয়া হইতে ভিতরকার কলাকে রক্ষা করে। (2) ইহার কিউটিনযুক্ত কোষপ্রাচীর বাষ্পমোচনের সময় অতিরিক্ত জলনির্গম প্রতিরোধ করে এবং মোমযুক্ত কোষপ্রাচীর বৃষ্টির জলকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। (3) ইহার বহুস্তরযুক্ত কোষপ্রাচীর জল সঞ্চয় করে। (4) ইহা সময় সময় সালোকসংশ্লেষ ও ক্ষরণ কার্যও করে।

A. ত্বকের রন্ধ্র (Epidermal openings)

রন্ধ্র দুই প্রকার—(1) পত্ররন্ধ্র (stomata) ও (2) জলরন্ধ্র (water stomata)।

1. **পত্ররন্ধ্র** (Stomata—১২৫নং চিত্র)—উদ্ভিদের বায়ব অংশগুলির ত্বক অবিচ্ছিন্ন নয়। ইহাতে বহু রন্ধ্র থাকে এবং প্রত্যেক রন্ধ্র দুইটি বিশিষ্ট অর্ধচন্দ্রাকৃতি ত্বককোষ দ্বারা বেষ্টিত থাকে। এই কোষ-দুইটিকে **রক্ষিকোষ** (guard cells) বলে। রক্ষিকোষ ও রন্ধ্র মিলিত হইয়া **পত্ররন্ধ্র** (stomata) গঠন করে; ইহার সাহায্যে বায়ু ও উদ্ভিদের ভিতরকার কলার গ্যাসীয় বস্তুর বিনিময় হয়। পত্ররন্ধ্রের নিচে একটি বড় বাতাবকাশ (air space) আছে; ইহাকে **শ্বাসরন্ধ্র** (respiratory cavity) বলে এবং ইহা কতকগুলি উপত্বকীয় (subepidermal) কোষের দ্বারা আবৃত থাকে (১২৬নং চিত্র)। শ্বাসরন্ধ্রের সহিত কোষমধ্যবর্তী স্থানের (intercellular spaces) যোগাযোগ আছে। রক্ষিকোষের মধ্যে সাইটোপ্লাজম, নিউক্লীয়াস ও ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদে রক্ষিকোষের আকৃতি বিভিন্ন এবং সেইহেতু পত্ররন্ধ্রের আকারের হ্রাসবৃদ্ধি হওয়ার



১২৫নং চিত্র—পত্ররন্ধ্র

প্রক্রিয়াও বিভিন্ন। প্রধানত রক্ষিকোষের প্রাচীরের যে অংশটি রন্ধ্রকে বেষ্টন করিয়া থাকে, উহা অপর অংশগুলি হইতে সাধারণত স্থূল হয়। যে অংশটি রন্ধ্র হইতে সর্বাপেক্ষা দূরে থাকে, তাহাই বেশী প্রসারণশীল। রক্ষিকোষ দুইটি রসস্ফীত (turgid) হইলে উহারা ফুলিয়া উঠে এবং রন্ধ্রের চতুর্দিকের প্রাচীরটিও বাঁকিয়া যায়। ইহার ফলে রন্ধ্রের মুখ খুলিয়া যায়। রক্ষিকোষ রন্ধ্রের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে। সুতরাং ইহা গ্যাসীয় বিনিময় নিয়ন্ত্রিত করে। রসস্ফীতি কমিয়া যাইলে কোষ-দুইটি শ্লথ (flaccid) হয় এবং কোষপ্রাচীর শিথিল হইয়া পরস্পরের উপরে পড়ে ; সুতরাং রন্ধ্রের পরিমাণ হ্রাস পায় অথবা উহা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

মূল ব্যতীত পত্ররন্ধ্র উদ্ভিদের সকল সবুজ অংশে, বিশেষত পাতায় উৎপন্ন হয়। ইহা বিষমপৃষ্ঠ (dorsiventral) পাতার নিচের তলে বহু সংখ্যায় থাকে : সমাঙ্কপৃষ্ঠ (isobilateral) পাতার উভয় তলেই সমান সংখ্যায় থাকে ; প্লবমান (floating) পাতায় কেবলমাত্র উপর তলে থাকে ; নিমজ্জিত পাতায় ও মূলে কোন পত্ররন্ধ্র উৎপন্ন হয় না।

পত্ররন্ধ্রের কার্য—বায়ু ও উদ্ভিদের মধ্যে অবস্থিত কলার গ্যাসীয় বিনিময় করা পত্ররন্ধ্রের প্রধান কার্য। গ্যাসীয় বিনিময় দুই প্রকার—1. সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis)—এই প্রক্রিয়ার সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পত্ররন্ধ্রের ভিতর দিয়া মেসোফিলের কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং অক্সিজেন পত্ররন্ধ্রের ভিতর দিয়া বাহির হয়।



১২৬নং চিত্র—পাতার দীর্ঘচ্ছেদ করিয়া পত্ররন্ধ্রের আভ্যন্তরিক গঠন দেখান হইয়াছে

2. **শ্বাসকার্য** (Respiration)—এই প্রক্রিয়ার সময় বায়ুস্থিত অক্সিজেন পত্ররন্ধ্রের ভিতর দিয়া প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হয়। উক্ত কার্য ব্যতীত, প্রস্বেদন (transpiraiion) পত্ররন্ধ্রের ভিতর দিয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার সময় দেহের অতিরিক্ত জল বাষ্পে পরিণত হইয়া নির্গত হয়।

অনেক সময় পত্ররন্ধ্র দিয়া অধিক পরিমাণে প্রস্বেদন হইয়া উদ্ভিদ মরিয়া যাইতে পারে। শুষ্ক বাতাস, অত্যধিক তাপ এবং কম শোষণ ইহার প্রধান কারণ। সাধারণত বেশী প্রস্বেদনের উপক্রম হইলে, রক্ষিকোষ-দুইটি শ্লথ হয় এবং রন্ধ্রটি আকারে ছোট বা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যে সকল উদ্ভিদ এরূপ স্থানে জন্মায় যেখানে সর্বদাই শুষ্ক বাতাস ও অত্যধিক তাপ থাকে, উহাদের পত্ররন্ধ্র নিম্নপ্রকারে রক্ষিত হয়—(1) পত্ররন্ধ্র ঘন রোমের দ্বারা আবৃত থাকে, (2) কোষপ্রাচীরে স্থূল কিউটিকল উৎপন্ন হয়, (3) পত্ররন্ধ্র গর্তের মধ্যে থাকে, (4) পাতার যে-তলে পত্ররন্ধ্রগুলি থাকে, তাহা ভিতরে গুটান থাকে।

2. জলরন্ধ্র (Water-stomata)—ইহা সাধারণত পত্ররন্ধ্র অপেক্ষা বড় এবং প্রধানত জলজ উদ্ভিদে থাকে। রক্ষিকোষের মধ্যে কোন প্রোটোপ্লাজম থাকে না; সুতরাং রন্ধ্রটির পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, উহা সর্বদাই খোলা থাকে। দেহের অতিরিক্ত জল জলরন্ধ্র দিয়া তরল অবস্থায় নির্গত হয়।

B. ত্বকপ্ররোহ (Epidermal outgrowths)

কাণ্ড ও পাতার ত্বক হইতে যেসকল উপাঙ্গ বাহির হয়, তাহাদিগকে রূহ (trichome) বা রোম (hair) বলে। এই সকল রোম এককোষী বা বহুকোষী এবং সরল বা শাখান্বিত হয়। মূলরোম সকল এককোষী উপাঙ্গ। বিছুটির দংশরোম (stinging hair) এবং অন্যান্য গ্রন্থিরোম (glandular hair) জটিল ও বহুকোষী হয়। রোমের কোষ সজীব বা মৃত হইতে পারে। কোষ প্রাচীর সাধারণত সেলুলোজ দ্বারা গঠিত ও পাতলা, কিন্তু সময় সময় লিগনিনযুক্ত বা কিউটিনযুক্ত ও স্থূল হয়।

রোমের কার্য—(1) মূলরোম মাটি হইতে খনিজ পদার্থের দ্রব শোষণ করে। (2) পাতার ও কাণ্ডের রোম প্রস্বেদন ও দীপনমাত্রা (intensity of illumination) হ্রাস করে। (3) গর্ভমুণ্ডের রোম পরাগরেণু সংগ্রহ করিয়া পরাগযোগ সাধন করে। (4) ফল ও বীজের রোম উহাদের বিস্তারের সাহায্য করে। (5) দংশরোম উদ্ভিদকে জীবজন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। (6) গ্রন্থিরোম বাহিঃক্ষরিত পদার্থ ক্ষরণ করিয়া জীবজন্তুর আক্রমণ হইতে উদ্ভিদকে রক্ষা করে এবং পতঙ্গভুক উদ্ভিদে এনজাইম নিঃসৃত করিয়া পতঙ্গদেহকে দ্রবীভূত করে। (7) সময় সময় রোম উদ্ভিদকে আরোহণে সাহায্য করে।

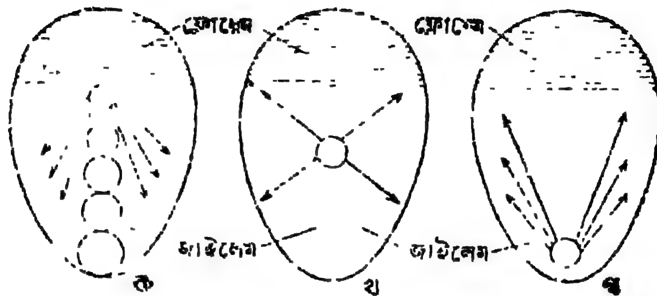
II. আদি কলাতন্ত্র (Fundamental or Ground Tissue System)

1. কর্টেক্স (Cortex)

এই কলার সমষ্টি বাহিরের দিকে ত্বকদ্বারা এবং ভিতরের দিকে স্টার্চ সীদ বা এণ্ডোডারমিস দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। ইহার স্থূলত্ব অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, এবং মূলে প্রায়ই বহুস্তর থাকে। সাধারণত ইহা প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত কিন্তু কোলেন-

ভাজক কলা নিঃশেষিত হইয়া যায়। ক্যাম্বিয়াম থাকিলে ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলকে মুক্ত বলে, কিন্তু না থাকিলে বদ্ধ (closed) বলে। মূলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম একত্রে থাকে না, উহারা পৃথক ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল গঠন করে।

জাইলেম অক্ষের কেন্দ্রের দিকে বা পরিধির দিকে অথবা উভয় দিকে গঠিত হইতে পারে (১২৮নং চিত্র)। কেন্দ্রের দিকে গঠিত হইলে এক্সআর্চ (exarch), যথা মূল;



১২৮নং চিত্র—জাইলেম ও ফ্লোয়েমের উৎপত্তি :
(ক) এক্সআর্চ; (খ) মেসার্চ; (গ) এণ্ডআর্চ

পরিধির দিকে গঠিত হইলে এণ্ডআর্চ (endarch), যথা, উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের কাণ্ড; এবং উভয় দিকে গঠিত হইলে উহাকে মেসার্চ (mesarch) বলে, যথা, ফার্ন ও সাইকাসের কাণ্ড ও পাতা।

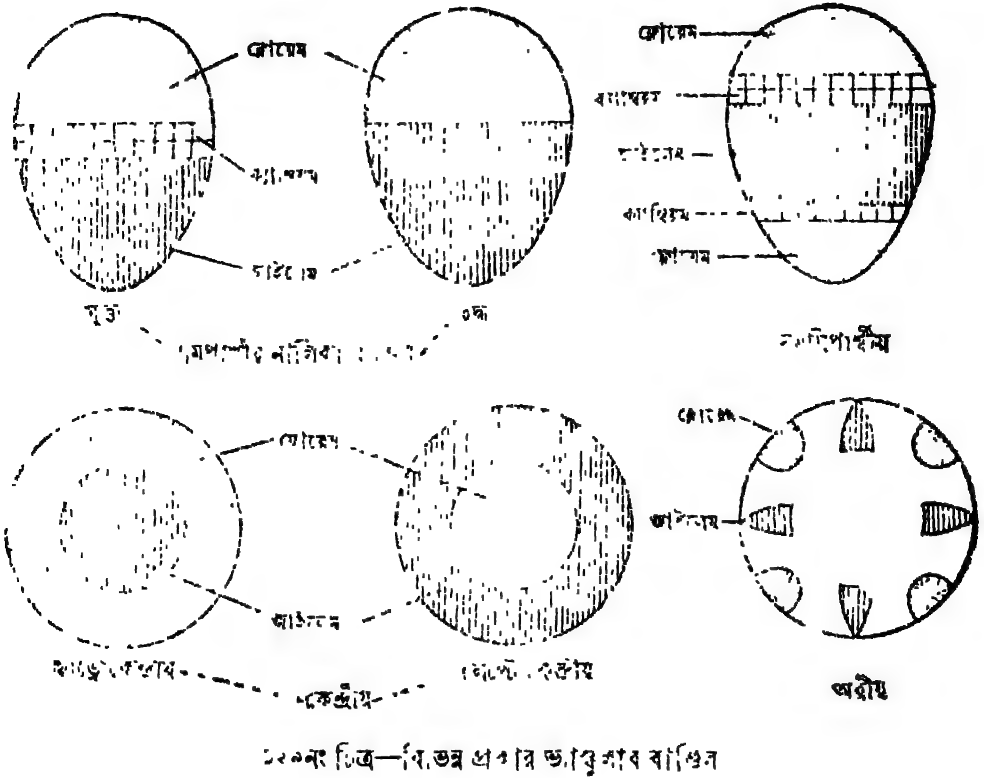
যেসকল কলা ও কোষ জাইলেম ও ফ্লোয়েম গঠন করে তাহাদের বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে। জাইলেম ও ফ্লোয়েমের যে-অংশ প্রথমে বিভেদিত হয়, তাহাকে যথাক্রমে প্রোটোজাইলেম (protoxylem) ও প্রোটোফ্লোয়েম (protophloem) বলে। প্রোটোজাইলেমের বাহিকাগুলি সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ এবং উহাদের প্রাচীর বলয়াঙ্কিত ও সর্পিলাঙ্কিত। জাইলেম ও ফ্লোয়েমের যে-অংশ পরে বিভেদিত হয়, তাহাকে যথাক্রমে মেটাজাইলেম (metaxylem) ও মেটাফ্লোয়েম (metaphloem) বলে মেটাজাইলেমের বাহিকাগুলির প্রাচীর জালাঙ্কিত ও কূপাঙ্কিত হয়। প্রাথমিক জাইলেম ও ফ্লোয়েমে প্রোটো ও মেটা-জাইলেম ও ফ্লোয়েম থাকে। প্রোটোফ্লোয়েমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে, কিন্তু মেটাফ্লোয়েমে সীভ নল, সঙ্গিকোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা এবং বাস্টতন্তু থাকে। একবীজপত্রী উদ্ভিদে প্রাথমিক ফ্লোয়েম চিরকাল বাঁচিয়া থাকে। প্রাথমিক জাইলেম ট্র্যাকীড, ট্র্যাকীয়া (প্রাচীর বলয়াঙ্কিত, সর্পিলাঙ্কিত, জালাঙ্কিত, এবং কূপাঙ্কিত) ও জাইলেম প্যারেনকাইমা থাকে। প্রাথমিক বাণ্ডিলে কোন কাষ্ঠিক তন্তু থাকে না।

জাইলেম ও ফ্লোয়েমের পারস্পরিক অবস্থান অনুযায়ী ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল প্রধানত দুই প্রকার—(a) সংযুক্ত (conjoint) ও (b) অরীয় (radial), (১২৯নং চিত্র)।

A. সংযুক্ত (Conjoint)

এই প্রকার ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল জাইলেম ও ফ্লোয়েম দ্বারা গঠিত হয় ; যথা—কাণ্ড ও পাতা। সংযুক্ত বাণ্ডিল তিন প্রকারের ঃ

7. সমপার্শ্বীয় (Collateral)—যখন জাইলেম ও ফ্লোয়েম পাশাপাশি একই রেখার উপর থাকে তখন তাহাকে সমপার্শ্বীয় বাণ্ডিল বলে। জাইলেম ভিতরের দিকে ও ফ্লোয়েম বাহিরের দিকে থাকে। সমপার্শ্বীয় বাণ্ডিল মুক্ত (open) অর্থাৎ ক্যাম্বিয়ামযুক্ত, যথা—অধিকাংশ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড, অথবা বন্ধ (closed), অর্থাৎ ক্যাম্বিয়ামহীন, যথা—অধিকাংশ একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে হইতে পারে।



২৬৯নং চিত্র—বিভিন্ন প্রকার ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল

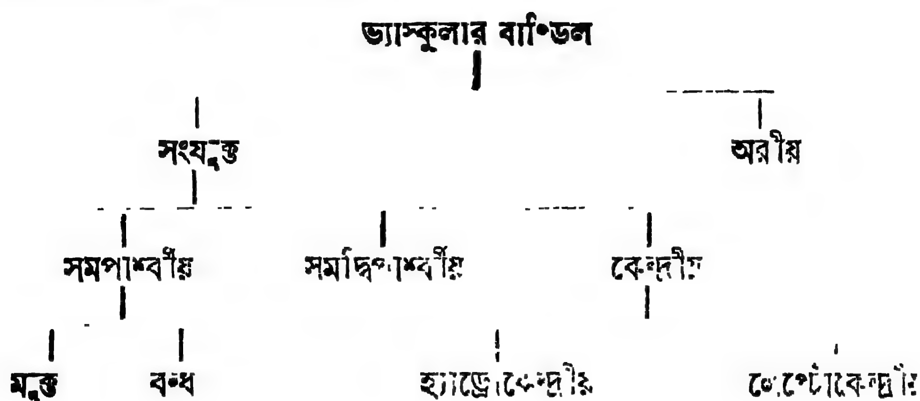
2 সমদ্বিপার্শ্বীয় (Bicollateral)—যখন জাইলেম বাণ্ডিল মাঝখানে থাকে ও উহাদের উভয় দিকে ফ্লোয়েম থাকে এবং ইহারা ক্যাম্বিয়াম দ্বারা পৃথক হয়, কিন্তু তিনটিই একই রেখার উপর থাকে ; যথা—কিউকারবিটেসী গোত্রীয় উদ্ভিদ (Fam. Cucurbitaceae)।

3. সমকেন্দ্রীয় (Concentric)—যখন জাইলেম ও ফ্লোয়েম এরূপভাবে অবস্থান করে যে, একটি অপরটিকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ইহা দুই প্রকার, যথা হ্যাড্রোকেন্দ্রীয় (hadrocentric) অর্থাৎ জাইলেম কেন্দ্রে (যথা—ফার্ন, সেলাজিনেলা প্রভৃতি) বা লেপ্টোকেন্দ্রীয় (leptocentric), অর্থাৎ ফ্লোয়েম কেন্দ্রে থাকে (যথা—ড্রাসিনা প্রভৃতি)।

B. অরীয় (Radial)

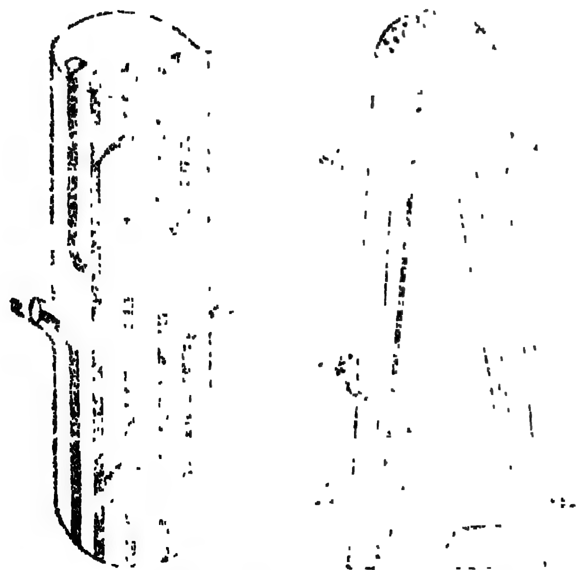
যখন জাইলেম ও ফ্লোয়েম পৃথক ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল গঠন করে এবং ইহারা বিভিন্ন ব্যাসার্ধে পর্যায়ক্রমিকভাবে থাকে। যথা, মূলে।

ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের ছকটি এইরূপ :



ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের অনুদৈর্ঘ্য প্রবাহপথ
(Longitudinal Course of Vascular Bundles)

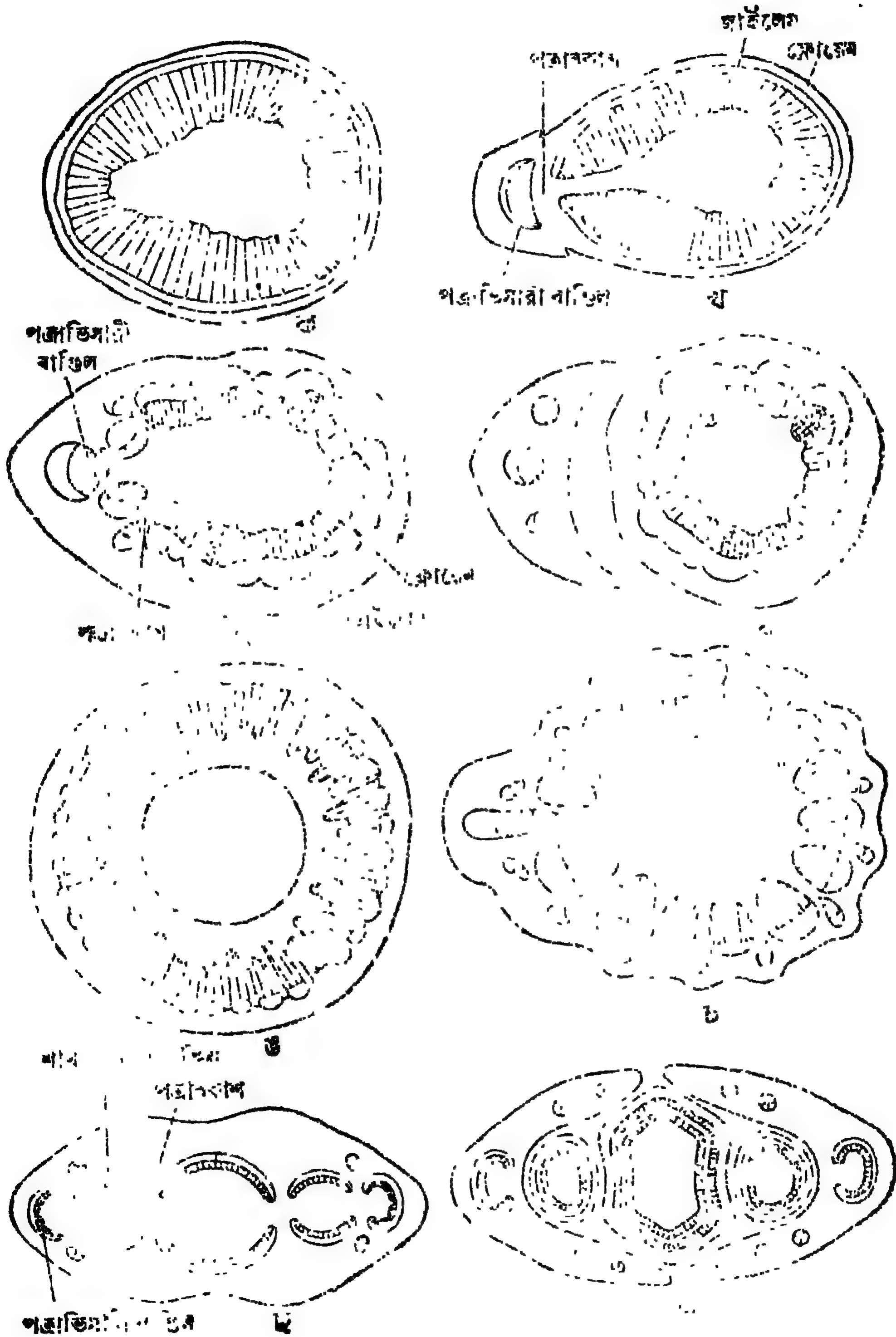
মূলে হইতে পাতার অগ্রভাগ পর্যন্ত ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া থাকে। অনুদৈর্ঘ্য ছেদের সাহায্যে দেখা যায়, ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের এইরূপ প্রবাহপথ, নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হইল।



১৩০নং চিত্র—ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের অনুদৈর্ঘ্য প্রবাহপথ : (ক) দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে ; (খ) একবীজপত্রী উদ্ভিদে

মূলের অরীয় ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি কাণ্ডের নিম্নাংশ পর্যন্ত অরীয় বাণ্ডিলরূপে অগ্রসর তথায় তাহারা যুক্ত হয় এবং 180° আবর্তিত হইয়া কাণ্ডের উপরিভাগে সমপার্শ্বীয় বাণ্ডিলরূপে প্রবাহিত হয়। কাণ্ডের এই বাণ্ডিলগুলিকে **কলাইন বাণ্ডিল** (cauline bundles) বলে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলই বক্রভাবে পাতার দিকে যায় এবং তখন ইহাদিগকে **সাধারণ বাণ্ডিল** (common bundles) বলে কারণ ইহারা পাতা এবং কাণ্ড উভয়েরই মধ্যে অবস্থান করে। কাণ্ডের বাণ্ডিল এবং পাতার বাণ্ডিলের মধ্যবর্তী ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের অংশ অর্থাৎ স্টেল এবং পত্রমূলের প্রবেশপথের ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের অংশকে **পত্রাভিসারী বাণ্ডিল** (leaf-trace bundle)

বলে। একটি পাতা হইতে একটি বা একাধিক পত্রাভিসারী বাণ্ডিল কাণ্ডে প্রবেশ করিতে পারে।



১৩১নং চিত্র—দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বিভিন্ন পর্বসন্ধির প্রস্থচ্ছেদ

সাধারণত নিম্নগামী একটি পত্রাভিসারী বাণ্ডিল আবর্তিত অথবা বিভক্ত হইয়া

ইহার নিম্নে অবস্থিত পাতার অনুরূপ বাণ্ডিলের সহিত মিলিত হয় এবং ইহার প্রবাহ বন্ধ হয়। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের পত্রাভিসারী বাণ্ডিলের প্রবাহপথ বিভিন্ন। ইহা বাণ্ডিলগুলির প্রবাহপথের দৈর্ঘ্যের উপর ও নিম্নে অবস্থিত বাণ্ডিলের সহিত মিলিত হইবার পূর্বে বিভক্ত হইবার উপর নির্ভর করে এবং পত্রবিন্যাসের উপর কাণ্ডের প্রবেশপথ নির্ভর করে।

ব্যক্তবীজী এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সকল পত্রাভিসারী বাণ্ডিলগুলিই সমদূরবর্তী অবস্থায় কাণ্ডে প্রবেশ করিয়া নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হয়। এইজন্য কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে ইহারা বলয় আকার ধারণ করে (১৩০ ক-নং চিত্র)।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন গভীরতায় পত্রাভিসারী বাণ্ডিলগুলি কাণ্ডে প্রবেশ করে এবং সেইজন্য প্রস্থচ্ছেদে ইহাদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয় (১৩০ খ-নং চিত্র)।

পত্রাবকাশ (Leaf gaps or lacunae—১৩১নং চিত্র)—পত্রাভিসারী বাণ্ডিলগুলি কাক্ষিক বাণ্ডিল হইতে নির্গত হইয়া পাতায় প্রবেশ করিলে পত্রাবকাশ গঠিত হয়। ইহারা কাক্ষিক বাণ্ডিল হইতে বিচ্ছিন্ন শূন্য স্থান নহে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই স্থানগুলি প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা পূর্ণ। পত্রাবকাশগুলির উপরিভাগের এবং নিম্নের ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলির সহিত পরস্পর পার্শ্বীয় সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পত্রাবকাশের সংখ্যা অনুযায়ী তিন প্রকারের পর্বসন্ধি (nodes) আছে। একটি অথবা তিনটি অথবা অধিক সংখ্যক পত্রাভিসারী বাণ্ডিল কাক্ষিক বাণ্ডিল হইতে নির্গত হইলে সমসংখ্যক পত্রাবকাশ গঠিত হয়। এইরূপ পত্রাবকাশকে যথাক্রমে **একপত্রাবকাশী** (unilacunar type) **ত্রিপত্রাবকাশী** (trilacunar type অথবা **বহুপত্রাবকাশী** (multilacunar type) বলে।

শাখাভিসারী বাণ্ডিল এবং শাখাবকাশ
(Branch Traces and Branch Gaps)

উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পাতার কক্ষ হইতে শাখা উৎপন্ন হয়। সুতরাং ইহার ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি অবশ্যই কাক্ষিক বাণ্ডিলের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত। দ্বিবীজপত্রী এবং ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, যেসকল বাণ্ডিলগুলি শাখায় প্রবেশ করে তাহাদিগকে **শাখাভিসারী বাণ্ডিল** (branch traces) বলে। শাখাভিসারী বাণ্ডিলগুলি শাখা হইতে নির্গত হইলে কাক্ষিক বা বাণ্ডিলে যে উন্মুক্ত অংশের সৃষ্টি হয় তাহাকে **শাখাবকাশ** (branch gap) বলে।

৫

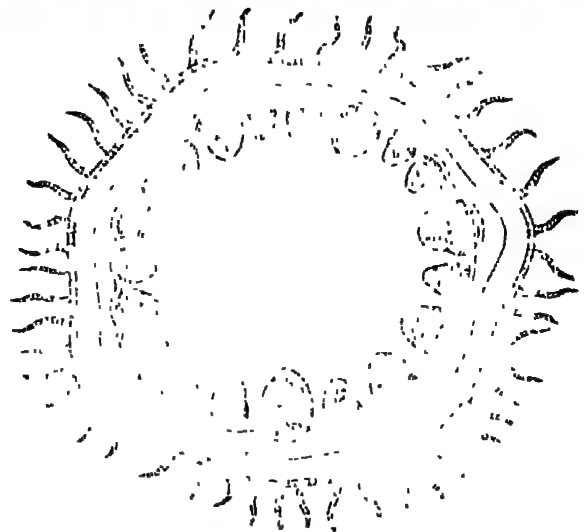
প্রাথমিক দেহ
(The Primary Body)

I. কাণ্ডের গঠন (Structure of stem)

1. দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড (Dicotyledonous stem)

A. সূর্যমুখীর কাণ্ড (Sunflower stem—১৩২ ও ১৩৩নং চিত্র) ঃ

সূর্যমুখীর নরম কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে বাহির হইতে ভিতর দিকে কলাগুলি নিম্নলিখিতভাবে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায় ঃ



১৩২নং চিত্র—সূর্যমুখীর কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের অবস্থান দেখান হইয়াছে।

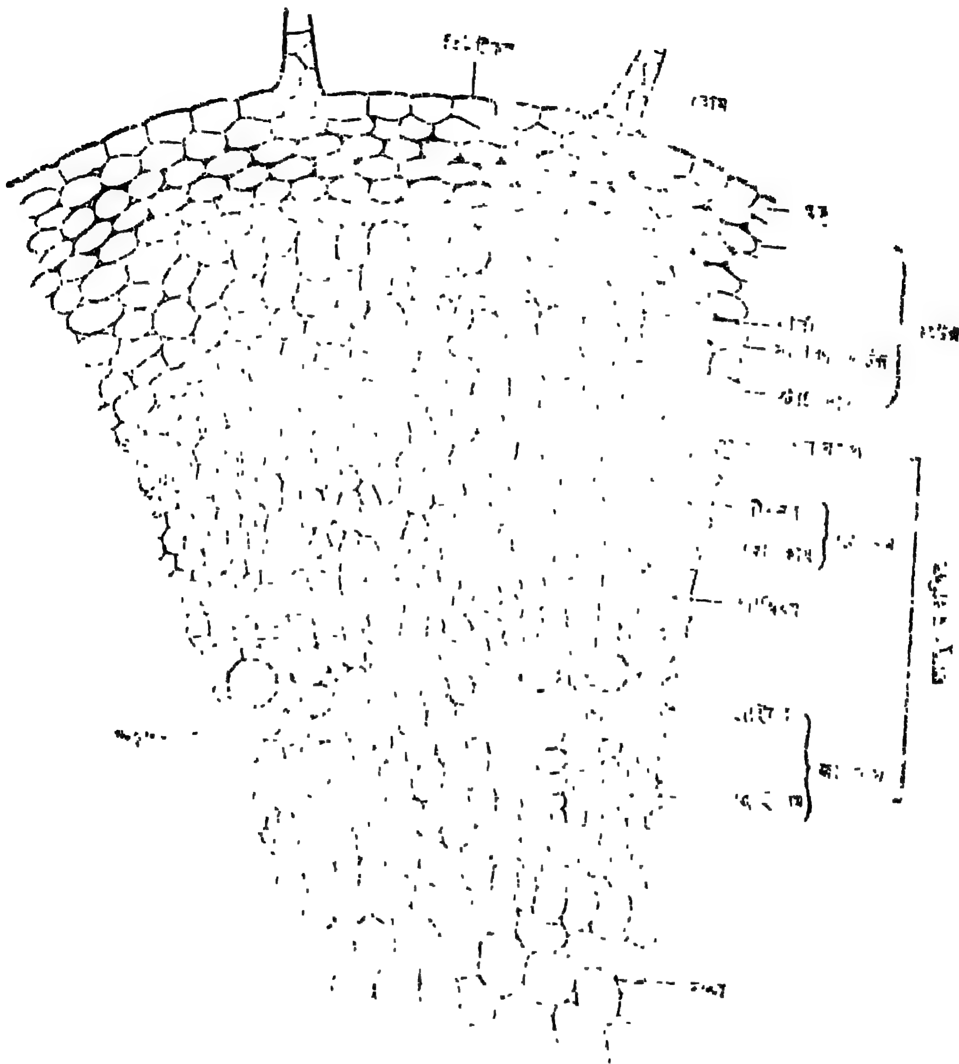
(i) ত্বক (Epidermis)—ইহা সর্বাপেক্ষা বাহিরের স্তর ও কতকগুলি চ্যাপ্টা কোষ দ্বারা গঠিত। কোষগুলির মধ্যে প্রায়ই ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে এবং পার্শ্ববর্তী প্রাচীরগুলি এরূপ নিষ্ঠাভাবে সংযুক্ত থাকে যে ইহাতে কোন কোষমধ্যবর্তী স্থান থাকে না। ইহার সুস্পষ্ট কিউটিকল আছে। এই স্তরে প্রায়ই পত্ররন্ধ্র দেখিতে পাওয়া যায়। ত্বককোষ হইতে বহুকোষী রোম উৎপন্ন হয়।

(ii) কর্টেক্স (Cortex)—এই কলা ত্বকের ঠিক নিম্নে থাকে এবং তিনটি অঞ্চলে বিভেদিত হয় ঃ

(a) অধস্ত্বক (Hypodermis)—ত্বকের দিকে কর্টেক্সের কয়েকটি স্তরের কোষ ক্রমশ ছোট হয়, পার্শ্ব দিক চ্যাপ্টা হইয়া সুস্পষ্ট কোষমধ্যবর্তী স্থান উৎপন্ন করে এবং উহাদের কোণগুলি স্থূল হয় (কোলেনকাইমা)। কোষগুলি সজীব এবং ইহাদের মধ্যে অসংখ্য ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

(b) সাধারণ কর্টেক্স (General cortex)—ইহা অনেকগুলি বড়, প্রায় গোলাকার, পাতলা প্রাচীরযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত। ইহাদের সুস্পষ্ট কোষমধ্যবর্তী স্থান থাকে। ইহারা ভিতরের দিকে ক্রমশ ছোট হয়, অবশেষে ঘনিষ্ঠভাবে সন্নিবেশিত হইয়া একটি স্তর গঠন করে এবং ইহার কোষের মধ্যে স্টার্চ দানা থাকে। এই স্তরকে **(c) স্টার্চ সীদ (Starch sheath)** বলে। সাধারণ কর্টেক্সের মধ্যে

অন্তঃক্ষারীয় নালী (ducts) এবং নালীর চারিদিকে প্রোটোপ্লাজমযুক্ত ছোট ছোট কোষ থাকে।



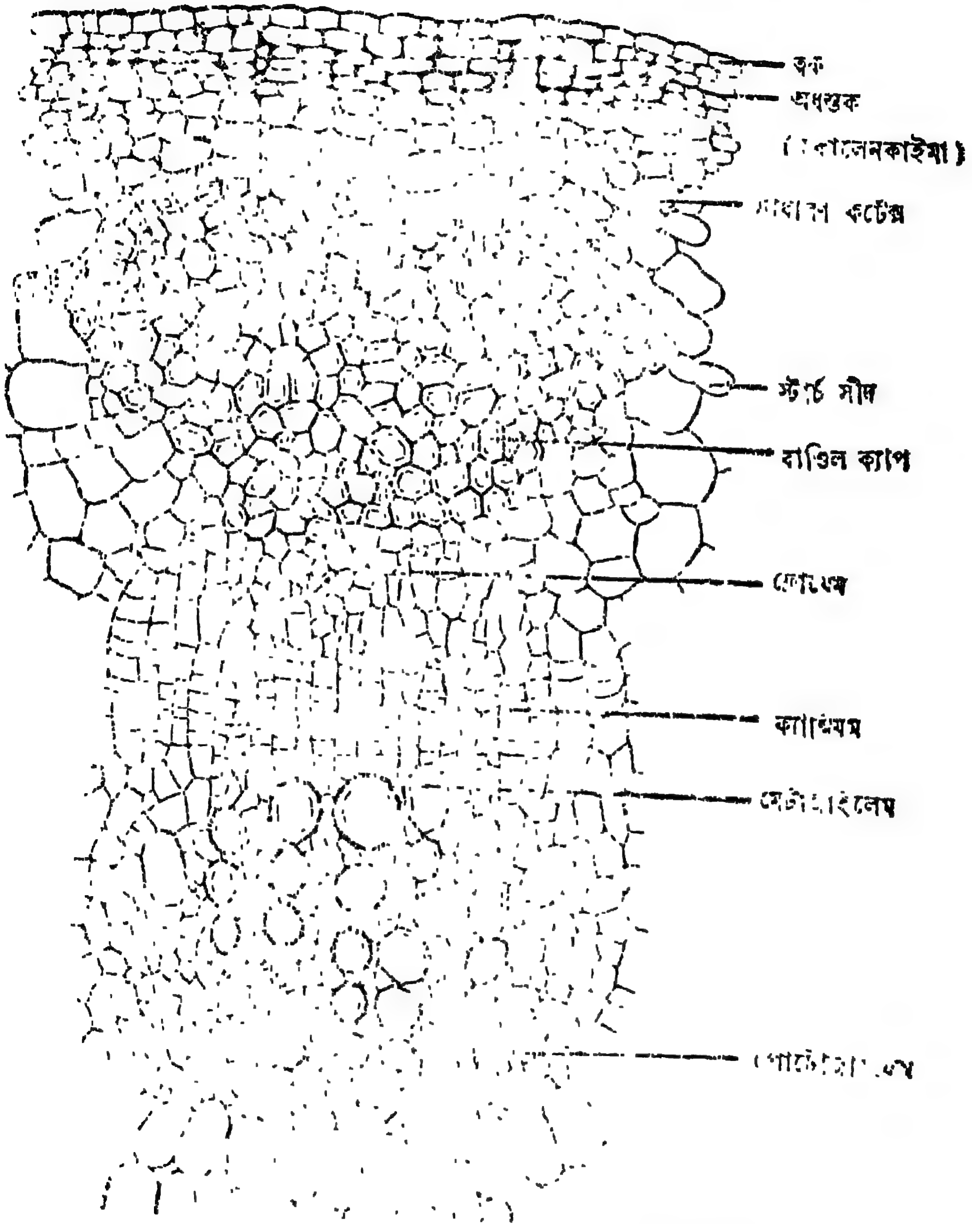
১৩৩নং চিত্র—সূর্যমুখীর কাণ্ডের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

(*iii*) **স্টেল** (Stell)—স্টার্চ সীথের ভিতরকার কলা স্টেল গঠন করে। ইহা নিম্নলিখিত অঞ্চলে বিভক্ত হয়ঃ

(*a*) **পেরিসাইকল** (Pericycle)—ইহা স্টেলের সর্বাপেক্ষা বাহিরের অংশ ইহাতে কয়েকটি স্তর থাকে। স্তরের যে কোষগুলি ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের উপর থাকে উহারা স্ক্লেরেনকাইমা দ্বারা গঠিত এবং বাণ্ডিল ক্যাপ বা টুপি (Bundle caps) বা কঠিন বাস্ট (Hard bast) গঠন করে। কিন্তু যে কোষগুলি দুইটি ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের মধ্যস্থলে থাকে তাহারা প্যারেনকাইমাযুক্ত।

(*b*) **ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল** (Vascular bundles)—পেরিসাইকলের নিম্নে ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলির বলয়-সমাবেশ থাকে। প্রত্যেক ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল সংযুক্ত,

সমপার্শ্বীয় ও মুক্ত (১৩৪নং চিত্র)। বাণ্ডিল টুপির নিচে ফ্লোয়েম (phloem) থাকে; ইহাতে সীভ নল সঙ্গীকোষ এবং ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা আছে। ফ্লোয়েমের নিম্নে একটি সংকীর্ণ অংশে পাতলা প্রাচীরযুক্ত ভাজক কলা থাকে এবং ইহার কোষগুলি বিভক্ত হইয়া



১৩৪নং চিত্র—সূর্যমুখীর কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া একটি ভ্যাস্কুলার বাণ্ডল বড় করিয়া দেখান হইয়াছে

জাইলেম ও ফ্লোয়েম উৎপন্ন করে। এই কলাকে ক্যাম্বিয়াম (cambium) বলে। ক্যাম্বিয়ামের ভিতরের দিকে জাইলেম (xylem) থাকে। ইহা প্রোটোজাইলেম ও মেটাজাইলেম বাহিকা, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও কাষ্ঠিক তন্তুদ্বারা গঠিত।

প্রোটোজাইলেম মজ্জার দিকে থাকে এবং ইহার প্রাচীর বলয়াঙ্কিত ও সর্পিলাঙ্কিত; মেটাজাইলেম ক্যাম্বিয়ামের দিকে থাকে এবং ইহার প্রাচীর জালাঙ্কিত ও কূপাঙ্কিত।

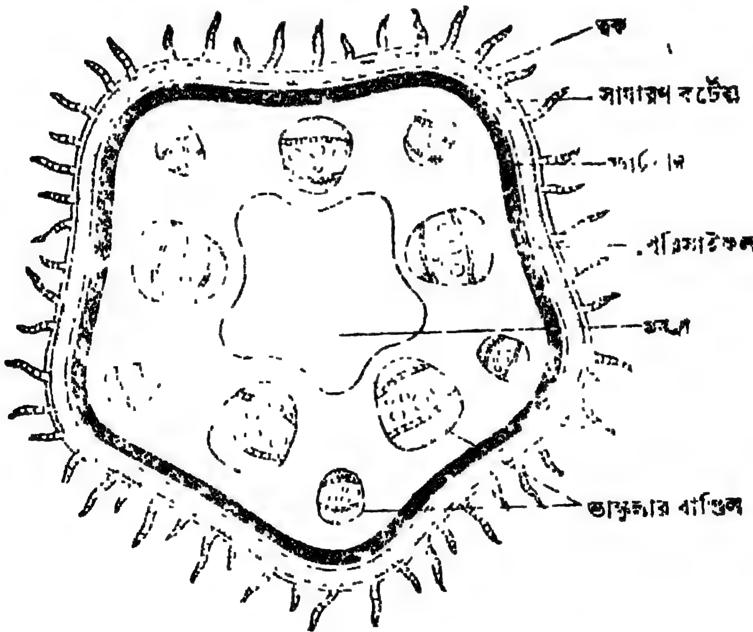
(c) মজ্জা (Pith)—ইহা কাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে থাকে ও ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি দ্বারা পরিবৃত। কোষগুলি পাতলা প্রাচীরযুক্ত ও বড় এবং ইহাদের কোষমধ্যবর্তী স্থান আছে।

(d) প্রাথমিক মজ্জাংশু (primary medullary rays)—ইহা দুইটি ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের মধ্যস্থলে থাকে। কোষগুলি কিছু দীর্ঘ।

B. কুমড়ার কাণ্ড (Cucurbita stem—১৩৫ ও ১৩৬নং চিত্র):

কুমড়ার কাণ্ড পঞ্চকোণবিশিষ্ট উচ্চ এবং নিম্ন অঞ্চল দ্বারা গঠিত। ইহার প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে বাহির হইতে ভিতর দিকে কলাগুলি নিম্নলিখিতভাবে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায়।

(i) ত্বক (Epidermis)—ইহা এক-স্তরযুক্ত কোষদ্বারা গঠিত কোষগুলির বাহিরের প্রাচীর কিউটিন ও কিউটিকলযুক্ত এবং বহুকোষী রোম আছে।



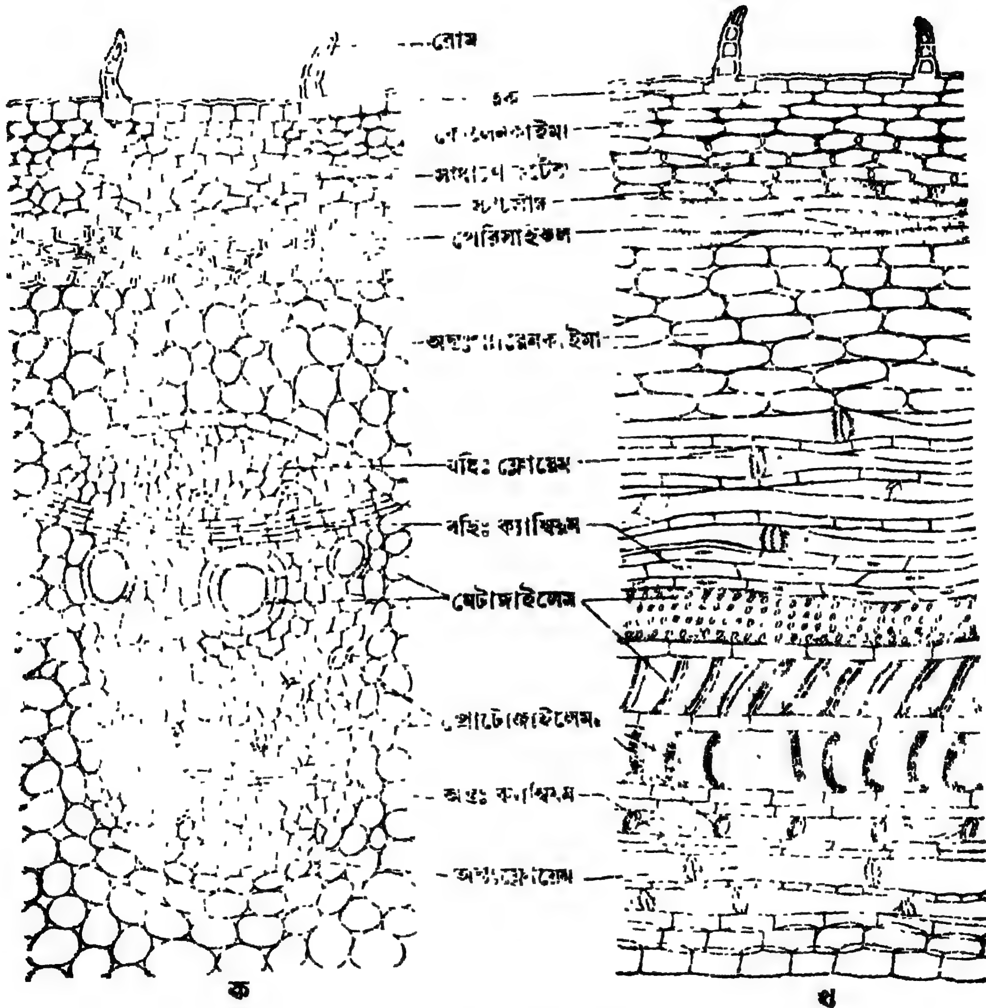
১৩৫নং চিত্র—কুমড়ার কাণ্ডের সম্পূর্ণ প্রস্থচ্ছেদের একটি রেখাচিত্রের মধ্যে ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলির অবস্থান দেখান হইয়াছে।

(ii) কর্টেক্স (Cortex)—ইহা ত্বকের নিম্নে থাকে এবং নিম্নলিখিত কলাদ্বারা গঠিত।

(a) অধস্ত্বক (Hypodermis)—ইহা কোলেনকাইমা কোষবিশিষ্ট কতকগুলি স্তরদ্বারা গঠিত। কোষগুলির কোণ স্থূল, কিন্তু লিগনিনযুক্ত নহে এবং কতকগুলির মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট আছে।

(*b*) সাধারণ কর্টেক্স (General cortex)—ইহা প্যারেনকাইমা কোষবিশিষ্ট দুইটি বা তিনটি স্তরদ্বারা গঠিত এবং অধস্ত্বকের নিম্নের দিকে থাকে।

(*c*) স্টার্চ সীদ (Starch sheath)—ইহা কর্টেক্সের সর্বাপেক্ষা ভিতরের অংশ। ইহা এক-স্তরবিশিষ্ট কোষ দ্বারা গঠিত। কোষগুলি ঘনসন্নিবেশিত ও পিপাকৃতি ; ইহাদের মধ্যে প্রচুর স্টার্চ দানা আছে, কিন্তু কোন কোষমধ্যবর্তী স্থান নাই।



১৩৬নং চিত্র—কুমড়ার কাণ্ড
(ক) আংশিক প্রস্থচ্ছেদ : (খ) আংশিক দীর্ঘচ্ছেদ

(*iii*) স্টেল (Stele)—ইহা কাণ্ডের মধ্যস্থলে থাকে এবং বাহিরের দিকে স্টার্চ দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইহা নিম্নলিখিত কলা দ্বারা গঠিত :

(*a*) পেরিসাইকল (pericycle)—ইহা তিনটি বা চারিটি স্তরবিশিষ্ট স্ক্লেরেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত এবং স্টার্চ সীদের ঠিক নিম্নেই থাকে।

(*b*) **অন্তঃ প্যারেনকাইমা** (Internal parenchyma)—ইহা পেরিসাইকলের নিম্নে থাকে এবং বহুস্তরবিশিষ্ট বৃহৎ আকৃতির প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত। ইহার মধ্যে ভ্যাস্কুলার ব্যাণ্ডিলগুলি নিহিত থাকে।

(*c*) **ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল** (Vascular bundles)—ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি সংযুক্ত, সমদ্বিপাশ্বীয় ও মুক্ত। ইহাদের সংখ্যা দশ কিন্তু পাঁচটি করিয়া দুইটি বলয়ে সাজান থাকে। প্রত্যেকটি বাহিরের ছোট বাণ্ডিল কাণ্ডের কোণের নিম্নে এবং ভিতরের বড় বাণ্ডিল দুইটি কোণের মধ্যভাগের নিম্ন অঞ্চলে থাকে। প্রত্যেক বাণ্ডিলকে পরীক্ষা করিলে নিম্নলিখিত কলা দেখা যায় :

(*i*) **বহিঃ ফ্লোয়েম** (Outer phloem)—ইহাতে সুস্পষ্ট সীভপ্লেটযুক্ত সীভ নল, সঙ্গিকোষ এবং ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে।

(*ii*) **বহিঃ ক্যাম্বিয়াম** (Outer cambium)—ইহা কতকগুলি স্তরবিশিষ্ট সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ কোষদ্বারা গঠিত। কোষগুলি নিয়মিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ।

(*iii*) **জাইলেম** (Xylem)—ইহা ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের কেন্দ্রস্থলে থাকে। ইহাতে দুইটি বা তিনটি বড় কূপাঙ্কিত বাহিকা (মেটাজাইলেম) এবং কতকগুলি ছোট বলয়াঙ্কিত ও সর্পিলাঙ্কিত বাহিকা (প্রোটোজাইলেম) আছে। জাইলেমের বাকি অংশ জাইলেম প্যারেনকাইমা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে।

(*iv*) **অন্তঃ ক্যাম্বিয়াম** (Inner cambium)—ইহা জাইলেমের নিম্নের দিকে থাকে এবং কয়েকটি ছোট ঘনসন্নিবিষ্ট কোষদ্বারা গঠিত।

(*v*) **অন্তঃ ফ্লোয়েম** (Inner phloem)—ইহা অনেকটা বহিঃ ফ্লোয়েমের মত, তবে কম-বেশী চাপা বা শৃঙ্খলাচ্যুত।

(*b*) **মজ্জা** (Pith)—ইহা প্রথম অবস্থায় বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং কাণ্ডটি ফাঁপা হয়।

C. **রক্তদ্রোণের কাণ্ড** (Stem of Leonurus —১৩৭নং চিত্র)।

রক্তদ্রোণের নরম কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে বাহির হইতে ভিতর দিকে কলাগুলি নিম্নলিখিতভাবে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায় :

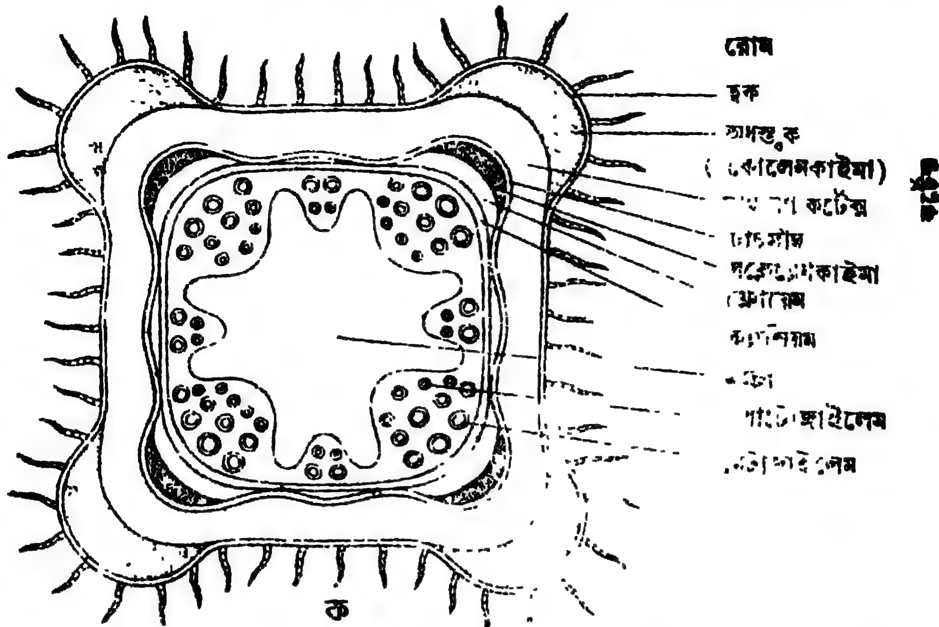
(*i*) **ত্বক** (Epidermis)—ইহা এক স্তরযুক্ত কোষদ্বারা গঠিত। ইহার বাহিরের প্রাচীর কিউটিকলযুক্ত এবং বহুকোষী রোম আছে।

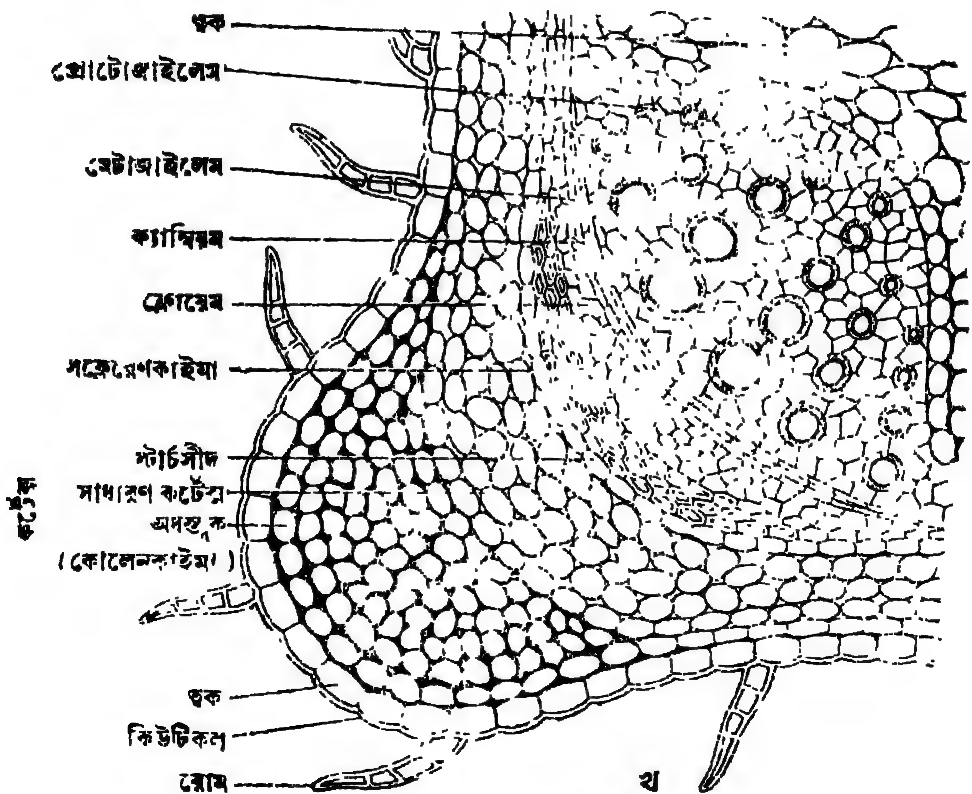
(*ii*) **কর্টেক্স** (Cortex)—ইহা ত্বকের নিম্নে অবস্থিত এবং নিম্নলিখিত কলা দ্বারা গঠিত :

(*a*) **অধস্ত্বক** (Hypodermis)—ইহা কয়েকটি স্তরযুক্ত কোলেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত। কাণ্ডের চারিটি কোণে এই প্রকার কলা প্রচুর পরিমাণে থাকে। কিন্তু ইহা একটি অবিচ্ছিন্ন স্তর গঠন করে না।

(*b*) **সাধারণ কর্টেক্স** (General cortex)—ইহা কয়েকটি স্তরযুক্ত প্যারেনকাইমা

কোষদ্বারা গঠিত এবং কোষমধ্যবর্তী স্থানগুলি সুস্পষ্ট। কোষগুলির মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট





১৩৭নং চিত্র—রক্তদ্রোণের কাণ্ড :
(ক) সম্পূর্ণ প্রস্থচ্ছেদ, (খ) একটি কোণ বর্ধিত করিয়া দেখান হইয়াছে

থাকে বলিয়া অংশটিকে একটি সবুজ বেষ্টনী বলিয়া মনে হয়। যে-স্থানে কোলেনকাইমা নাই সেই স্থানে সবুজ কোষগুলি উপর দিকে বিস্তৃত হইয়াছে।

(*c*) **স্টার্চ সীদ** (Starch sheath)—ইহা এক-স্তরবিশিষ্ট তরঙ্গায়িত পিপাকৃতি কোষদ্বারা গঠিত এবং কোষগুলির মধ্যে প্রচুর স্টার্চ দানা আছে।

(*iii*) **স্টেল** (Stele)—ইহা কাণ্ডের মধ্যস্থলে থাকে এবং বাহিরের দিকে স্টার্চ সীদ দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইহা নিম্নলিখিত কলাদ্বারা গঠিত ঃ

(*a*) **পেরিসাইকল** (Pericycle)—ইহা কয়েকটি স্তরবিশিষ্ট স্ক্লেরেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত।

(*b*) **ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল** (Vascular bundles)—ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় এবং মুক্ত। ইহারা আদিকলার বহির্ভাগে অবস্থিত। ফ্লোয়েমে সীভ নল, সঙ্গীকোষ এবং ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে। ফ্লোয়েমের নিম্নে ক্যাম্বিয়াম অবস্থিত। প্রথম অবস্থা হইতেই ক্যাম্বিয়াম বলয় গঠিত হইতে থাকে। ক্যাম্বিয়ামের নিম্নাংশে জাইলেম অবস্থিত। ইহা প্রোটোজাইলেম মেটাজাইলেম, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও কাষ্ঠিক তন্তুর সমষ্টি।

মজ্জা (Pith)--ইহা কাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে থাকে এবং বৃহৎ, ডিম্বাকার অথবা গোলাকার প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত। ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের সহিত সংযুক্ত কতকগুলি কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

D. **আকন্দের কাণ্ড** (Stem of Calotropis—১৩৮নং চিত্র) ঃ

আকন্দের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে বাহির হইতে ভিতর দিকে কলাগুলি নিম্নলিখিতভাবে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায় ঃ

ত্বক (Epidermis)—ইহা একটি স্তরযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। ত্বকের উপরিভাগে স্থূল কিউটিকল্ এবং মোমের ন্যায় আচ্ছাদন আছে। কাণ্ডের এই অংশে ইতস্তত পত্ররন্ধ্র দেখা যায়।

কর্টেক্স (Cortex)—ইহা কয়েকটি স্তরযুক্ত কোষের সমষ্টি এবং নিম্নলিখিত কলা দ্বারা গঠিত ঃ

(*a*) **অধস্ত্বক** (Hypodermis)—ইহা দুইটি অথবা তিনটি স্তরযুক্ত বৃহৎ আকারের প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত।

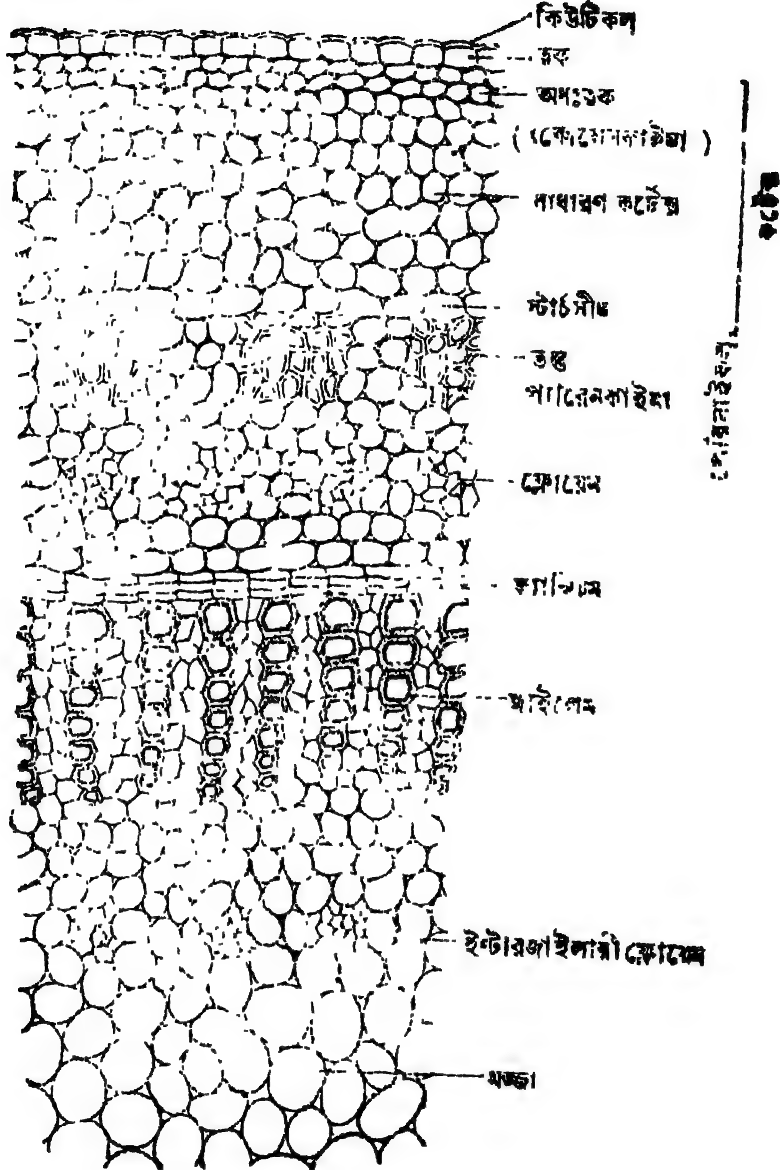
(*b*) **সাধারণ কর্টেক্স** (General cortex)—ইহা কয়েকটি স্তরযুক্ত বৃহৎ আকারের প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত।

(*c*) **স্টার্চ সীদ** (Starch sheath)—ইহা এক-স্তরবিশিষ্ট তরঙ্গায়িত পিপাকৃতি কোষ দ্বারা গঠিত এবং কোষগুলির মধ্যে প্রচুর স্টার্চ দানা থাকে।

স্টেল (Stele)—ইহা কাণ্ডের ভিতরের দিকে থাকে এবং বাহিরের দিকে স্টার্চ সীদ দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইহা নিম্নলিখিত কলাদ্বারা গঠিত ঃ

(*a*) **পেরিসাইকল** (Pericycle)—এই অংশটি কয়েকটি স্তরযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত এবং ইহাতে ইতস্ততঃ ফ্লোয়েম তন্তু দেখিতে পাওয়া যায়।

(*b*) **ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল** (Vascular bundles)—ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় ও মুক্ত। ফ্লোয়েম, সীভ নল, সঙ্গিকোষ ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত। ইহার নিম্নে পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট আয়তাকার ক্যাম্বিয়াম অবস্থিত। ক্যাম্বিয়ামের নিম্নাংশে স্থূল জাইলেম অবস্থিত এবং ইহা মেটাজাইলেম ও প্রোটো-



১৩৮নং চিত্র—আকন্দের কাণ্ডের আংশিকপ্রস্থচ্ছেদ

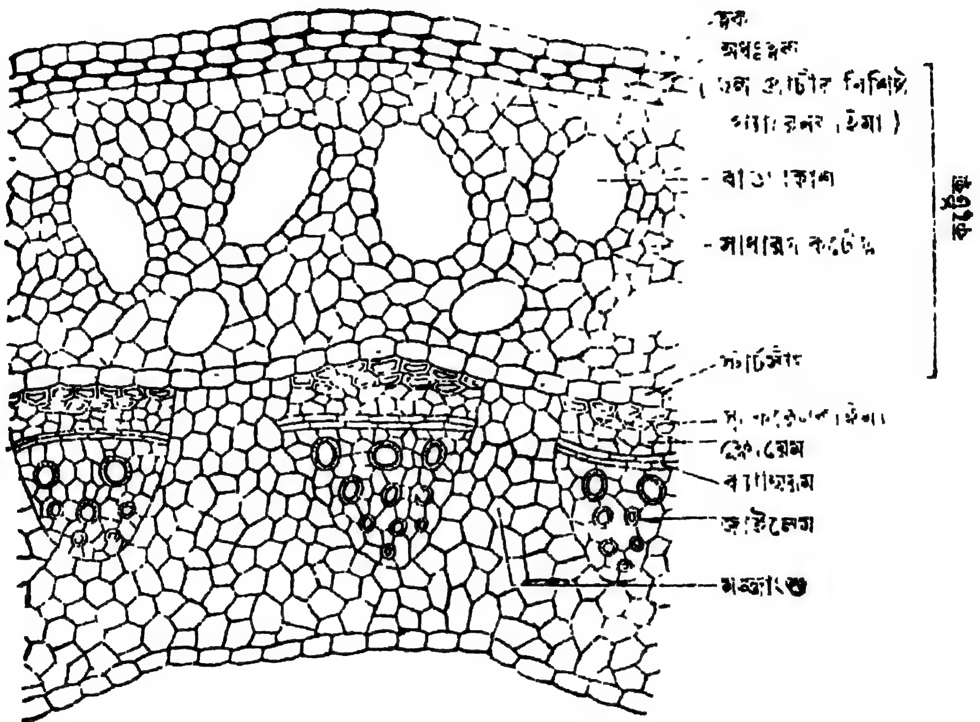
—।ইলেমের সমষ্টি। জাইলেমের নিম্নে অন্তঃজাইলেমীয় ফ্লোয়েম (intraxylary phloem) ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

মজ্জা (Pith)—ইহা কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত এবং প্যারেনকাইমা কোষ দ্বার গঠিত। ইহাতে সচরাচর নালী (ducts) দেখিতে পাওয়া যায়।

E. হিংচার কাণ্ড (Stem of Enhydra—১৩৯নং চিত্র) ঃ

হিংচা জলে নিমজ্জিত উদ্ভিদ। ইহার কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে কলাগুলি বাহির হইতে ভিতর দিকে নিম্নলিখিতভাবে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায় ঃ

ত্বক (Epidermis)—ইহা সর্বাপেক্ষা বহির্ভাগের এক-স্তরযুক্ত কোষ এবং পাতলা কিউটিকলের আবরণ আছে।



১৩৯নং চিত্র—হিংচার কাণ্ডের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

কর্টেক্স (Cortex)—ইহা ত্বকের নিম্নে অবস্থিত স্বল্পপরিসর স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহা নিম্নলিখিত কলার সমষ্টি ঃ

(*a*) **অধঃত্বক** (Hypodermis)—ইহা ত্বকের নিম্নে দুইটি অথবা তিনটি স্তর-যুক্ত স্থূল প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত।

(*b*) **সাধারণ কর্টেক্স** (General cortex)—ইহা বহুস্তরযুক্ত পাতলা প্রাচীর-বিশিষ্ট প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত এবং ইহাতে বহুসংখ্যক বাতাবকাশ (air-spaces (দেখিতে পাওয়া যায়। কোষগুলির মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট আছে।

(*c*) **স্টার্চ সীদ** (Starch sheath)—ইহা কর্টেক্সের সর্বনিম্ন একস্তরযুক্ত কোষ। কোষগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট এবং উহাদের মধ্যে বহু স্টার্চ দানা আছে। এই স্তরটি তরঙ্গায়িত বলিয়া মনে হয়।

স্টেল (Stele)—ইহা কাণ্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং স্টার্চ সীদের নিম্নে অবস্থিত। ইহা নিম্নলিখিত কলার সমষ্টি :

(*a*) **পেরিসাইকেল** (Pericycle)—ইহা সূর্যমুখীর কাণ্ডের ন্যায় প্যারেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা কোষস্তরের সমষ্টি এবং শেষোক্ত স্তরটি ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের উপর ক্ষুদ্র বাণ্ডিল টুপি (bundle cap) গঠন করে।

(*b*) **ভ্যাস্কুলার ব্যান্ডিল** (Vascular bundles)—ইহারা সুগঠিত এবং বলয় আকারে সজ্জিত। প্রতি ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় ও মুক্ত।

(*i*) **ফ্লোয়েম** (Phloem)—ইহা স্বল্প স্থান অধিকার করিয়া থাকে এবং ইহা সীভ নল ও সঙ্গিকোষের সমষ্টি।

(*ii*) **ক্যাম্বিয়াম** (Cambium)—ইহা জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের মধ্যস্থলে কয়েকটি পাতলা স্তর কিন্তু পুরাতন কাণ্ডে ইহাকে বলয় আকারে দেখিতে পাওয়া যায়।

(*iii*) **জাইলেম** (Xylem) - ইহাও স্বল্পস্থান অধিকার করিয়া থাকে এবং কতিপয় বাহিকা (vessels) ও জাইলেম প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত।

(*c*) **মজ্জা** (Pith)—ইহার কোষগুলি বিনষ্ট হইয়া কেন্দ্রে একটি বৃহৎ গহবর সৃষ্টি করে।

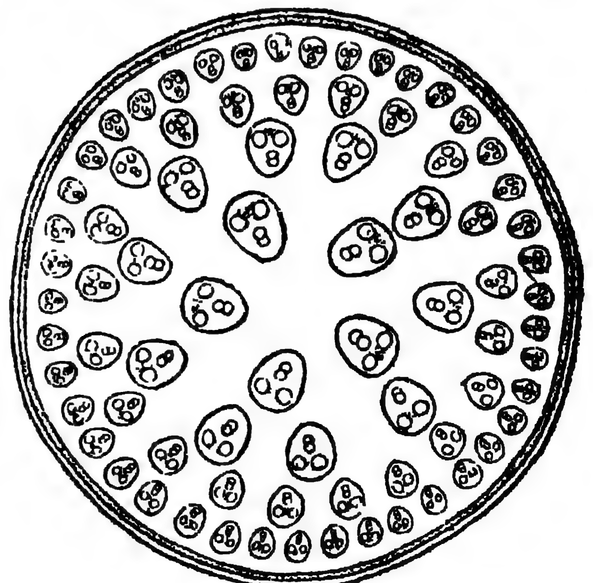
(*d*) **মজ্জাংশু** (Medullary rays)—ইহারা ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলির মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং প্যারেনকাইমা কোষের সমষ্টি।

2. **একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড** (Monocotyledonous stem)

A. ভুট্টার কাণ্ড (Stem of Maize—১৪০ ও ১৪১নং চিত্র) :

ভুট্টার কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে বাহির হইতে ভিতর দিকে কলাগুলি নিম্নলিখিতভাবে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায় :

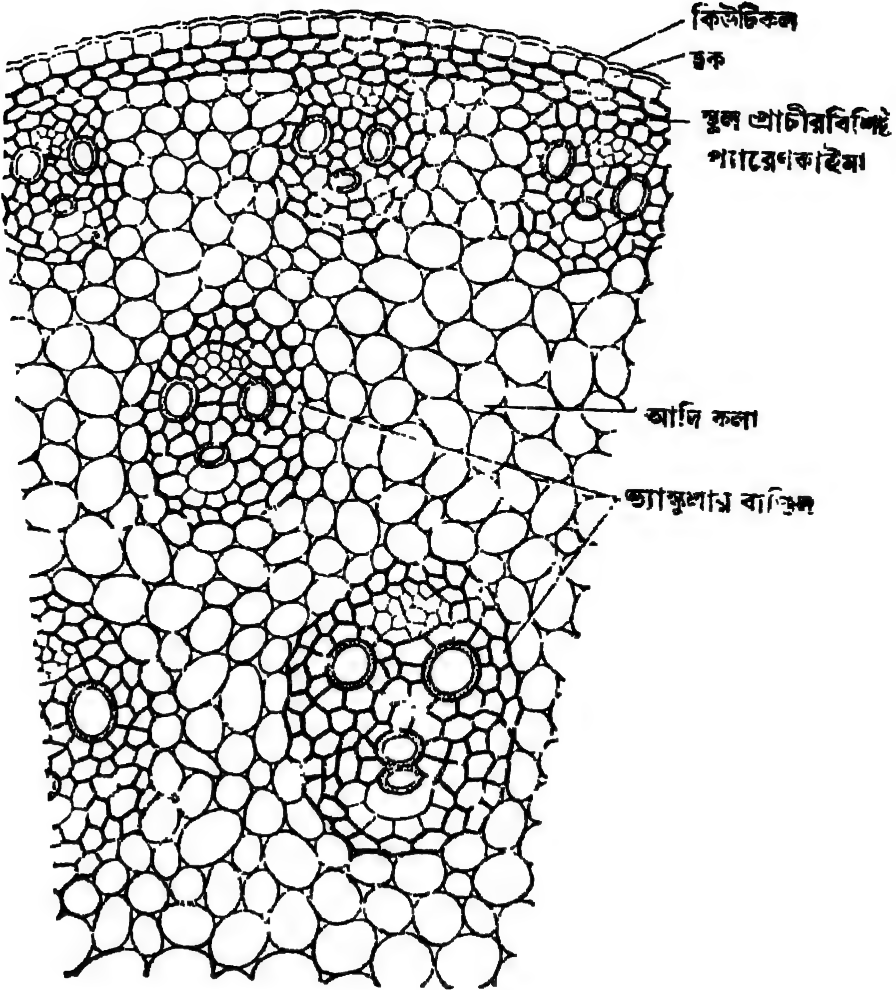
ত্বক (Epidermis) - ইহা সর্বাপেক্ষা বাহিরের স্তর ও বতকগুলি চ্যাপ্টা কোষ দ্বারা গঠিত। পার্শ্ববর্তী প্রাচীরগুলি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। কোষের বাহিরের প্রাচীর সামান্য বক্র, অত্যধিক কিউটিনযুক্ত এবং স্থূল কিউটিকলযুক্ত। ত্বকে কয়েকটি পত্ররন্ধ্র থাকে কিন্তু কোন রোম নাই।



১৪০নং চিত্র—ভুট্টার কাণ্ডের সম্পূর্ণ প্রস্থচ্ছেদ

অধস্ত্বক (Hypodermis)—ইহা ত্বকের নিম্নে অবস্থিত এবং কয়েকটি স্তরযুক্ত স্থূল প্রাচীরবিশিষ্ট প্যারেনকাইমা

কোষ দ্বারা গঠিত। কিন্তু পত্ররন্ধ্রের নিম্নের অধস্ত্বকে পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট প্যারেনকাইমা কোষ থাকে।



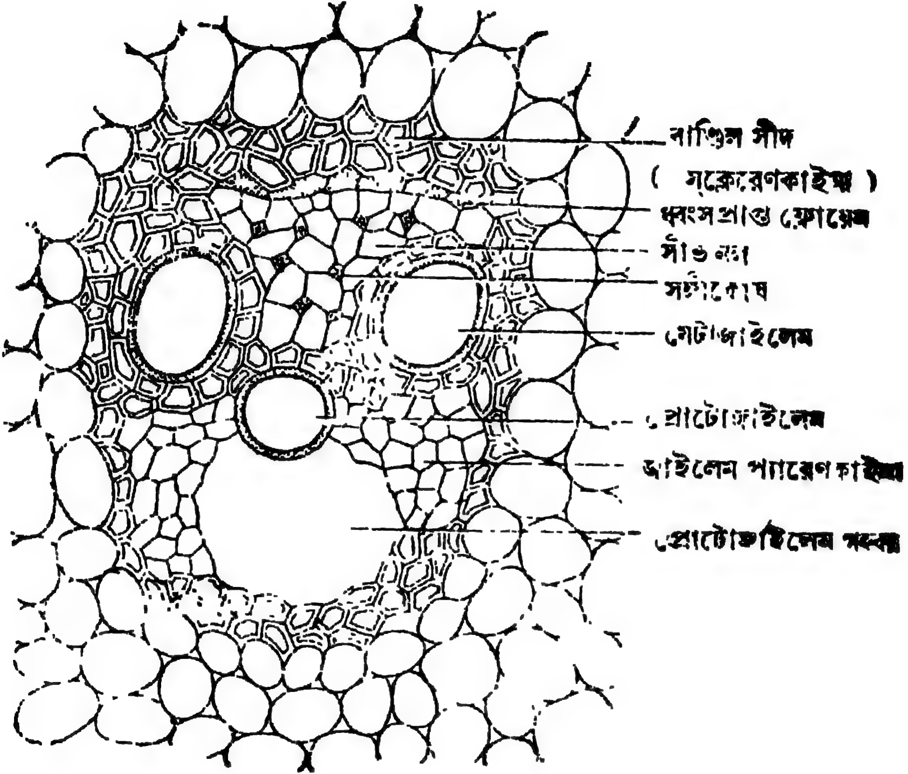
১৪১নং চিত্র—ভুট্টার কাণ্ডের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

আদিকলা (Ground tissue)—ইহা বহু অবিচ্ছিন্ন পাতলা প্রাচীরযুক্ত প্যারেন-কাইমা কোষদ্বারা গঠিত এবং কোষমধ্যবর্তী স্থান যুক্ত। ইহা অধস্ত্বকের নিম্ন হইতে কাণ্ডের কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল (Vascular bundles)—ইহারা সংযুক্ত সমপার্শ্বীয় ও বন্ধ (১৪২নং চিত্র)। বহুসংখ্যক ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল আদিকলার মধ্যে বিক্ষিপ্ত সমাবেশে থাকে, তবে ভিতর দিকে বাণ্ডিলের সংখ্যা কম, কিন্তু আকারে বেশ বড়। ত্বকের দিকে বাণ্ডিলের সংখ্যাই বেশী, ইহারা ছোট ও একত্রিত ; প্রত্যেকের চতুর্দিকে স্ক্লেরেনকাইমা আচ্ছাদন আছে এবং অনেক সময় ইহারা অধস্ত্বকের স্থূল প্যারেনকাইমার সহিত অবিচ্ছিন্ন থাকে।

(a) জাইলেম (Xylem)—ইহা ইংরাজী অক্ষর Y-এর মত সজ্জিত থাকে ; Y-এর

দুইটি বাহুতে দুইটি কুপাঙ্কিত বড় বাহিকা মেটাজাইলেম (metaxylem) থাকে এবং উহাদের অগ্রভাগে বলয়াঙ্কিত ও সর্পিলাঙ্কিত অনেকগুলি ছোট বাহিকা প্রোটোজাইলেম (protozylem) থাকে। প্রোটোজাইলেমের নিম্নে একটি সুস্পষ্ট প্রোটোজাইলেম গহবর (protoxylem cavity) দেখা যায়। কাণ্ডের বৃদ্ধির সময় কয়েকটি প্রোটোজাইলেমের বাহিকা বিনষ্ট হইয়া এই গহবর উৎপন্ন করে। প্রোটোজাইলেমের দুই পার্শ্বে লিগনিনযুক্ত ট্র্যাকীড বা ছোট জাইলেম বাহিকা থাকে।



১৪২নং চিত্র—একটি ভাস্কুলার বাণ্ডিল বর্ধিত করিয়া দেখান হইয়াছে

(b) ফ্লোয়েম (Phloem)—ইহা Y-এর দুইটি বাহুর মধ্যে থাকে। ইহাতে সীভ নল ও সঙ্গিকোষ থাকে কিন্তু ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা একেবারেই থাকে না। প্রাথমিক প্রোটোফ্লোয়েম প্রায়ই বিনষ্ট হয়।

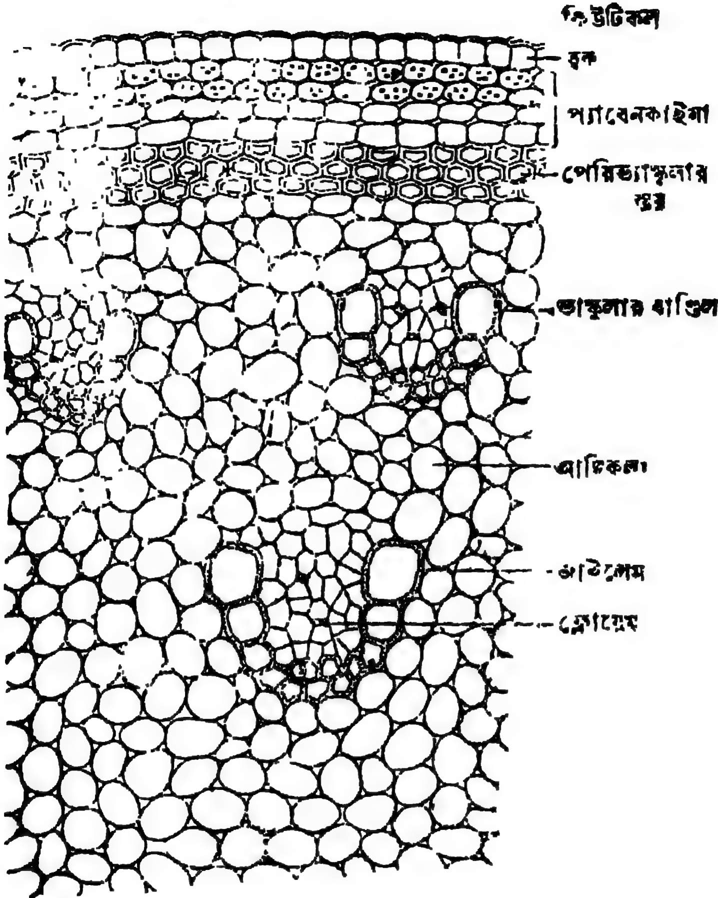
B. শতমূলীর কাণ্ড (Stem of Asparagus—১৪৩নং চিত্র) :

শতমূলীর কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে বাহির হইতে ভিতর দিকে কলাগুলি নিম্নলিখিতভাবে সজ্জিত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায় :

ত্বক (Epidermis) ইহা এক-স্তরযুক্ত গোলাকার কোষের সমষ্টি এবং বহির্ভাগে কিউটিকলযুক্ত।

আদিকলা (Ground tissue)—ত্বকের নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা কাণ্ডের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার বহির্ভাগের কোষস্তরগুলি প্যারেনকাইমা কোষের

সমষ্টি এবং ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোপ্লাস্ট আছে। ক্লোরোপ্লাস্টবিহীন স্তরের নিম্নে তিন-স্তরযুক্ত স্ক্লেরেনকাইমা কোষ বলয় আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে পেরিভ্যাস্কুলার স্তর (perivascular strand) বলে। কাণ্ডের কেন্দ্রস্থল সুস্পষ্ট কোষমধ্যবর্তী স্থানবিশিষ্ট বৃহৎ প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত।



১৪৩নং চিত্র—শঙ্খমূলীর কাণ্ডের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল (Vascular bundles)—ইহারা সংযুক্ত সমপার্শ্বীয় ও বদ্ধ এবং আদিকলায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। পেরিভ্যাস্কুলার স্তরের সন্নিকটের বাণ্ডিলগুলি অপেক্ষা কেন্দ্রে অবস্থিত বাণ্ডিলগুলি বৃহত্তর। জাইলেম ইংরাজী অক্ষর Y-এর ন্যায় দেখিতে এবং দুইটি বাহুতে মেটাজাইলেম এবং অগ্রভাগে প্রোটোজাইলেম অবস্থিত। ফ্লোয়েম সীভ নল ও সঙ্গিকোষের সমষ্টি এবং Y-এর দুই বাহুর মধ্যে থাকে।

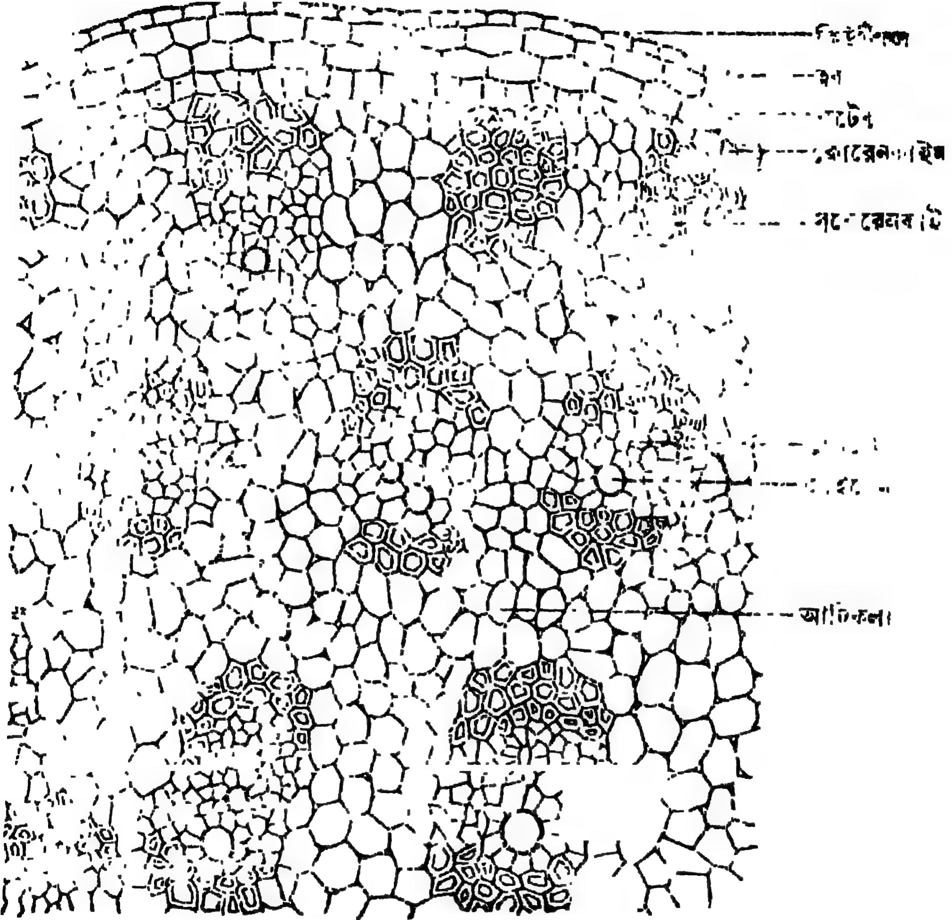
C. সর্বজায়ার ভৌম পুষ্পদণ্ড (Scape of Canna—১৪৪নং চিত্র) :

সর্বজায়ার ভৌম পুষ্পদণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে বাহির হইতে ভিতর দিকে কলাগুলি নিম্নলিখিতভাবে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায় :

ত্বক (Epidermis)—ইহা সর্বাপেক্ষা বাহিরের স্তর এবং প্রশস্ত তলবিশিষ্ট কোষ-দ্বারা গঠিত। কোষগুলির বাহিরের প্রাচীর কিউটিনযুক্ত।

আদিকলা (Ground tissue)—ইহা ত্বকের নিম্ন হইতে কাণ্ডের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বহু পাতলা প্রাচীরযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত। কোষমধ্যবর্তী স্থান আছে। ইহা নিম্নপ্রকার কলায় বিভেদিত হয়ঃ

(a) **কর্টেক্স** (Cortex)—ইহা ত্বকের নিম্নে থাকে এবং ইহাতে দুইটি স্তরযুক্ত, পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট, প্যারেনকাইমা কোষ থাকে।



১৪৪নং—সনজাযার ভৌম পর্ণদণ্ডের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

(b) **ক্লোরোফিলযুক্ত কলা** (Clorophyllous tissue)—ইহা কর্টেক্সের নিম্নে থাকে এবং এক স্তরবিশিষ্ট ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত কোষদ্বারা গঠিত।

(c) **স্ক্লেরেনকাইমা** (Sclerenchayma)—ইহা অবিচ্ছিন্নভাবে ক্লোরোফিলযুক্ত কলার নিম্নে থাকে।

ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল (Vascular bundles)—ইহারা আদি কলার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে থাকে এবং নানা আয়তনের হয়। প্রত্যেক ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল সংযুক্ত সমপার্শ্বীয় ও বন্ধ এবং ইহার জাইলেম ভিতরের দিকে ও ফ্লোয়েম বাহিরের দিকে থাকে। স্ক্লেরেনকাইমাযুক্ত বাণ্ডিল সীদ (bundle sheath) সাধারণত অবিচ্ছিন্ন থাকে না; ইহা দুই খণ্ডে থাকে, একটি অপরটির ভিতরের দিকে সূক্ষ্ম স্তর গঠন করে।

নীচে দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের তুলনা দেওয়া হইল ঃ

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড	একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড
1. আদি কলাকে বহিস্টেলীয় ও অন্তঃস্টেলীয় কলায় বিভেদ করা যাইতে পারে।	1. আদি কলাকে এইপ্রকারে বিভেদ করা যায় না।
2. ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের সংখ্যা কম ও ইহাদের বলয় সমাবেশ আছে।	2. ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল ডিম্বাকার সংযুক্ত, বিক্ষিপ্ত সমাবেশ আছে।
3. প্রত্যেক ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল কীলকাকার, সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয়, সমদ্বিপার্শ্বীয় ও মুক্ত। ইহার চারিদিকে স্ক্লেরেনকাইমাযুক্ত কোন আচ্ছাদন নাই।	3. প্রত্যেক ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল ডিম্বাকার সংযুক্ত সমপার্শ্বীয় কদাচিৎ কেন্দ্রীয় ও বদ্ধ। ইহার চারিদিকে স্ক্লেরেনকাইমাযুক্ত আচ্ছাদন আছে।
4. জাইলেম ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের নিম্নে থাকে। ইহাতে বলয়াঙ্কিত ও সর্পিলাঙ্কিত বাহিকা (প্রোটোজাইলেম), জালাঙ্কিত ও কূপাঙ্কিত বাহিকা (মেটাজাইলেম), জাইলেম প্যারেনকাইমা ও কাষ্ঠিক তন্তু আছে।	4. জাইলেম ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে। বাহিকাগুলি Y অক্ষরের মত সাজান থাকে। দুইটি বড় কূপাঙ্কিত বাহিকা (মেটাজাইলেম) উপরে থাকে ও কতকগুলি ক্ষুদ্র বলয়াঙ্কিত ও সর্পিলাঙ্কিত বাহিকা (প্রোটোজাইলেম) Y-এর অগ্রভাগে থাকে। সাধারণত প্রোটোজাইলেমের নিম্নে একটি বড় প্রোটোজাইলেম গহ্বর আছে।
5. ফ্লোয়েম ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের উপরের অংশে থাকে। ইহাতে সীভনল সঙ্গিকোষ ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা আছে।	5. ফ্লোয়েম Y-এর দুইটি বাহুর মধ্যস্থলে থাকে ; ইহাতে সীভ নল ও সঙ্গিকোষ আছে কিন্তু কোন ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা নাই।

II. মূলের গঠন (Structure of Roots)

1. দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল (Dicotyledonous root)

A. মটরের মূল (Root of pea—১৪৫নং চিত্র) ঃ

মটরের নরম মূলের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে বাহির হইতে ভিতরের দিকে কলাগুলি নিম্নলিখিতভাবে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায় ঃ

এপিব্লেমা (Epiblema) বা **রোমবহ** (Piliferous layer)—এই মূলের সর্বাপেক্ষা বাহিরের অংশ এবং এক-স্তরযুক্ত সজীব, পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট কোষদ্বারা গঠিত। ইহার কয়েকটি কোষ দীর্ঘ হইয়া মূলরোমে পরিণত হয়।

কর্টেক্স (Cortex)—এই কলা এপিব্লেমার ঠিক নিম্নে থাকে এবং দুইটি অঞ্চলে বিভেদিত হয় ঃ

(a) **সাধারণ কর্টেক্স** (General cortex)—ইহা বহুস্তরযুক্ত গোলাকার বা ডিম্বাকার কোষদ্বারা গঠিত। ইহাতে বহু কোষমধ্যবর্তী স্থান আছে।

(b) **এণ্ডোডারমিস** (Endodermis)—ইহা সাধারণ কর্টেক্সের সর্বাপেক্ষা নিম্নের অংশ। ইহা এক-স্তরযুক্ত, ঘনসন্নিবিষ্ট, বহুভুজাবিশিষ্ট কোষদ্বারা গঠিত

ইহাতে কোন স্টার্চ দানা ও কোষমধ্যবর্তী স্থান থাকে না। ইহাতে ক্যাসপেরিয়ন পটি আছে।

স্টেল (Stele)—ইহা এণ্ডোডারমিসের নিম্নে থাকে এবং ইহাতে তিনটি অঞ্চল আছে ঃ

(a) **পেরিসাইকল** (Pericycle)—ইহা স্টেলের সর্বাপেক্ষা বাহিরের অংশ এবং এক-স্তরযুক্ত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত।

১৪৫নং চিত্র—মটর মূলের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

(b) **ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল** (Vascular bundles)—ইহারা অরীয়। জাইলেম বাণ্ডিলের সংখ্যা ফ্লোয়েম বাণ্ডিলের সংখ্যার সমান এবং উহারা ব্যাসার্ধের উপর পর্যায়-ক্রমে সজ্জিত থাকে। জাইলেম অথবা ফ্লোয়েম বাণ্ডিলের সংখ্যা তিন। ফ্লোয়েমে সীভ নল, সঙ্গিকোষ ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা আছে। প্রত্যেক ফ্লোয়েম বাণ্ডিলের বহির্ভাগে স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুর গুচ্ছ আছে।

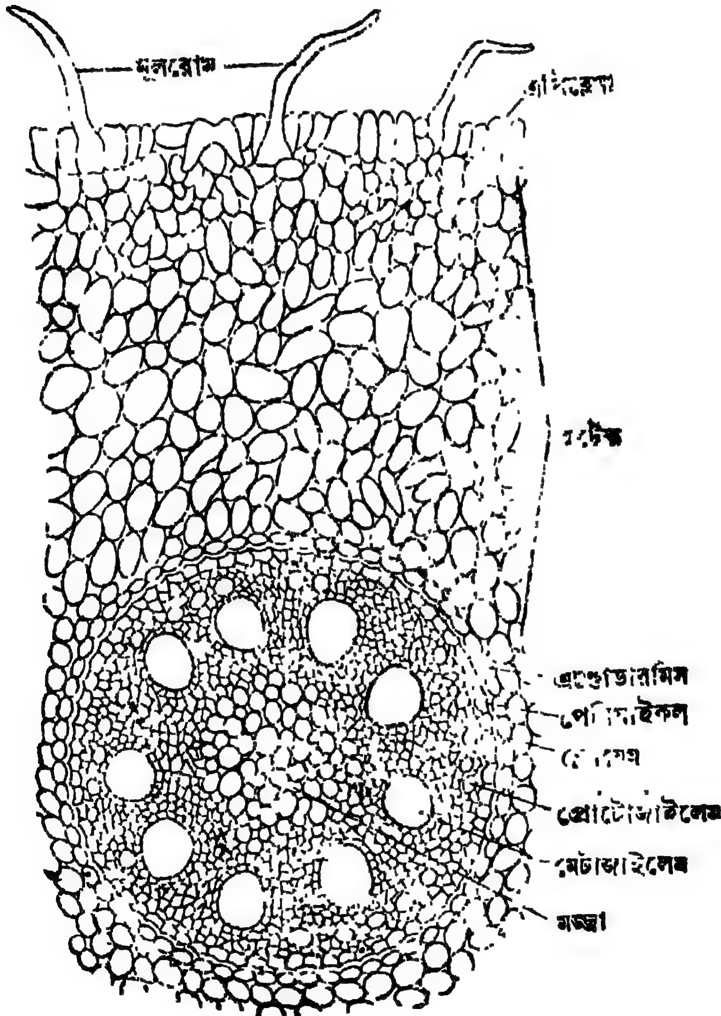
(c) মজ্জা (Pith)—ইহা অতিশয় ক্ষুদ্র এবং কেন্দ্রস্থলে থাকে। পরিণত মূলের ক্ষেত্রে মজ্জা দেখিতে পাওয়া যায় না।

2. **একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল (Monocotyledonous root)**

A. **ভুট্টার মূল (Root of Maize—১৪৬নং চিত্র) ঃ**

ভুট্টার মূলের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে বাহির হইতে ভিতর দিকে কলাগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায় ঃ

এপিব্লেমা (Epiblema) বা **রোমবহ** (Piliferous Layer)—ইহা সর্বাপেক্ষা বাহিরের অংশ এবং এক-স্তরযুক্ত সজীব প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত। ইহার কয়েকটি কোষ দীর্ঘ হইয়া মূলরোমে পরিণত হয়।



১৪৬নং চিত্র—ভুট্টার মূলের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

কর্টেক্স (Cortex)—ইহা এপিব্লেমার নিম্নে থাকে এবং দুইটি অঞ্চলে বিভেদিত হয় ঃ

(a) **সাধারণ কর্টেক্স** (General cortex)—ইহা বহুস্তরবিশিষ্ট বৃহৎ আকারের

গোলাকার প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত। ইহাতে অনেক কোষমধ্যবর্তী স্থান আছে। কোষের মধ্যে প্রায়ই অবর্ণ প্রাসটিড ও স্টার্চ দানা থাকে।

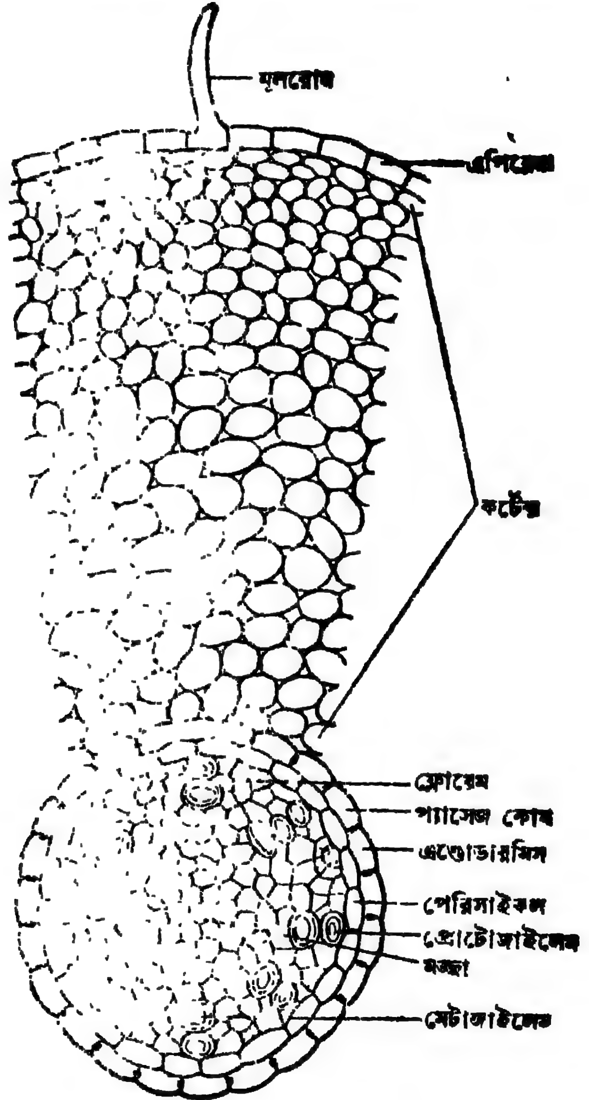
(b) **এণ্ডোডারমিস** (Endodermis)—ইহা কর্টেক্সের নিম্নে থাকে এবং এক-স্তরযুক্ত। প্রস্থচ্ছেদে ইহা চক্রাকার দেখায়। ইহার কোষগুলি দুই প্রকারের ঃ

(i) সাধারণ এণ্ডোডারমিস কোষ—ইহা এক-স্তরযুক্ত পিপা আকৃতির কোষ এবং কর্টেক্স এবং স্টেলের মধ্যে অবস্থিত। ইহাদের কোষ মধ্যবর্তী স্থান থাকে না। ইহাদের প্রস্থ প্রাচীরে ক্যাসপেরিয়ান পটি আছে এবং ভিতরের প্রাচীর স্থূল কিন্তু ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের প্রোটোজাইলেমের সম্মুখে অবস্থিত এণ্ডোডারমিসের কোষগুলি পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট। এইপ্রকার কোষকে (ii) প্যাসেজ কোষ (Passage cells) বলে।

স্টেল (Stele)—ইহা এণ্ডোডারমিসের নিম্নে থাকে এবং তিনটি অঞ্চলে বিভেদিত হয় ঃ

(*a*) **পেরিসাইকল** (Peri cycle)—ইহা স্টেলের সর্বাপেক্ষা বাহিরের অংশ এবং এক-স্তরবিশিষ্ট প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত।

(*b*) **ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল** (Vascullar budles)—ইহারা অরীয় অর্থাৎ জাইলেম ও ফ্লোয়েম বাণ্ডিলগুলি ব্যাসার্ধের উপর পর্যায়ক্রমে সজ্জিত থাকে। জাইলেম ও ফ্লোয়েম বাণ্ডিলের সংখ্যা পাঁচের অধিক (polyarch)। প্রোটোজাইলেম পেরিসাইকলের দিকে এবং মেটাজাইলেম কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত। ফ্লোয়েম বাণ্ডিলে সীভ নল ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা আছে।



১৪৭নং চিত্র—কচুর মূলের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

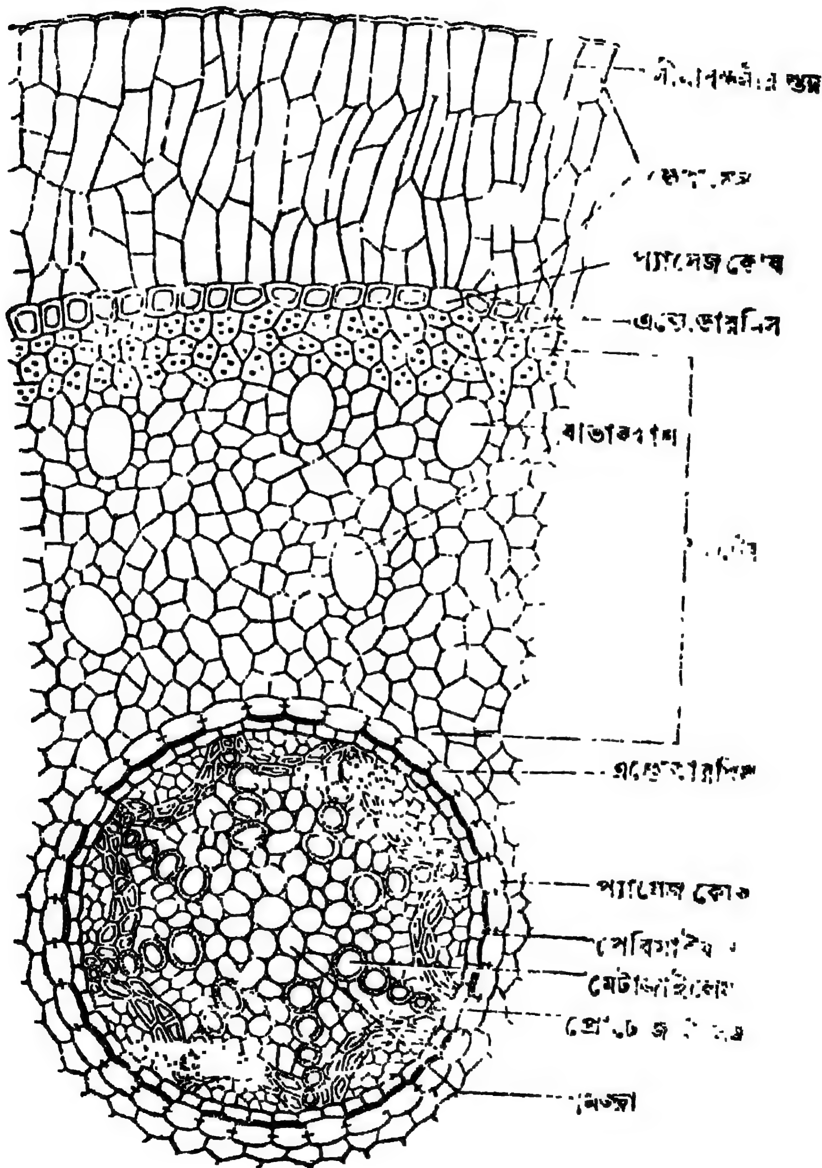
B, কচুর মূল (Root of Arum—১৪৭নং চিত্র) ঃ

ইহার গঠন অনেকটা ভুট্টার মূলের মত। সাধারণ কর্টেক্সে র‍্যাফাইড আছে।

C. ব্যাম্পার বায়বীয় মূল (Aerial root of Vanda—১৪৮নং চিত্র) :

ব্যাম্পা নামক অর্কিডের বায়বীয় মূলের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে বাহির হইতে ভিতর দিকে কলাগুলি নিম্নলিখিতভাবে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায় :

ভেলামেন (Velamen)—ইহা কয়েকটি স্তরযুক্ত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট দীর্ঘ কোষের সমষ্টি। সর্বাপেক্ষা বহিঃস্থ স্তরটিকে **সীমাবন্ধনীয় স্তর** (limiting layer বলে।



১৪৮নং চিত্র—ব্যাম্পার বায়বীয় মূলের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

এক্সোডারমিস (Exodermis)—ইহা স্থূল প্রাচীরবিশিষ্ট একটি-স্তরযুক্ত-কোষের দ্বারা গঠিত কিন্তু মধ্যে মধ্যে **প্যাসেজ কোষ** (passage cell) নামক পাতলা প্রাচীর

বিশিষ্ট কোষদ্বারা বিচ্ছিন্ন। প্যাসেজ কোষগুলি ভেলামেন দ্বারা শোষিত জল মূলের অভ্যন্তরস্থ কোষগুলিতে পরিবহণ করে।

কর্টেক্স (Cortex)—এই স্তরটি বৃহৎ এবং বহুসংখ্যক ডিম্বাকার অথবা গোলাকার সুস্পষ্ট কোষমধ্যবর্তী স্থানবিশিষ্ট প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। বহিঃস্থ কোষগুলিতে ক্লোরোপ্লাস্ট আছে।

এন্ডোডারমিস (Endodermis)—ইহা একটি স্তরযুক্ত। ইহাদের পার্শ্বের ও নিম্নের প্রাচীরগুলি সুবারিনযুক্ত এবং মধ্যে মধ্যে পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট প্যাসেজ কোষ (passage cell) থাকে। প্যাসেজ কোষগুলি প্রোটোজাইলেম বাহিকার বিপরীত দিকে অবস্থিত।

স্টেল (Stele)—ইহা এন্ডোডারমিসের নিম্নে থাকে এবং নিম্নলিখিত কলা দ্বারা গঠিত :

(*a*) পেরিসাইকেল (Pericycle)—ইহা একটি-স্তরযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষের সমষ্টি।

(*b*) ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল (Vascular bundles)—ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি অরীয় এবং বিভিন্ন ব্যাসার্ধে বহুসংখ্যক জাইলেম বাণ্ডিল ও ফ্লোয়েম বাণ্ডিল আছে।

(c) যোজক কলা (Conjunctive tissue)—এই কলার কোষগুলি স্ক্লেরেনকাইমাযুক্ত এবং ফ্লোয়েম বাণ্ডিলগুলিকে আংশিক আবৃত করে।

(*d*) মজ্জা (Pith)—ইহা কেন্দ্রে অবস্থিত এবং গোলাকার প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। ইহার মধ্যে নালী (ducts) প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

D. গরান গাছের শ্বাসমূল (Breathing root of Ceriops)—১৪৯নং চিত্র) :

গরান গাছের শ্বাসমূলের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে নিম্নলিখিত আভ্যন্তরিক গঠন দেখিতে পাওয়া যায় :

কর্ক (Cork)—ইহা বহির্ভাগে কয়েকটি স্তরযুক্ত সুবারিনবিশিষ্ট কোষের সমষ্টি এবং ইহাতে ইতস্তত লেন্টিসেল দেখিতে পাওয়া যায়।

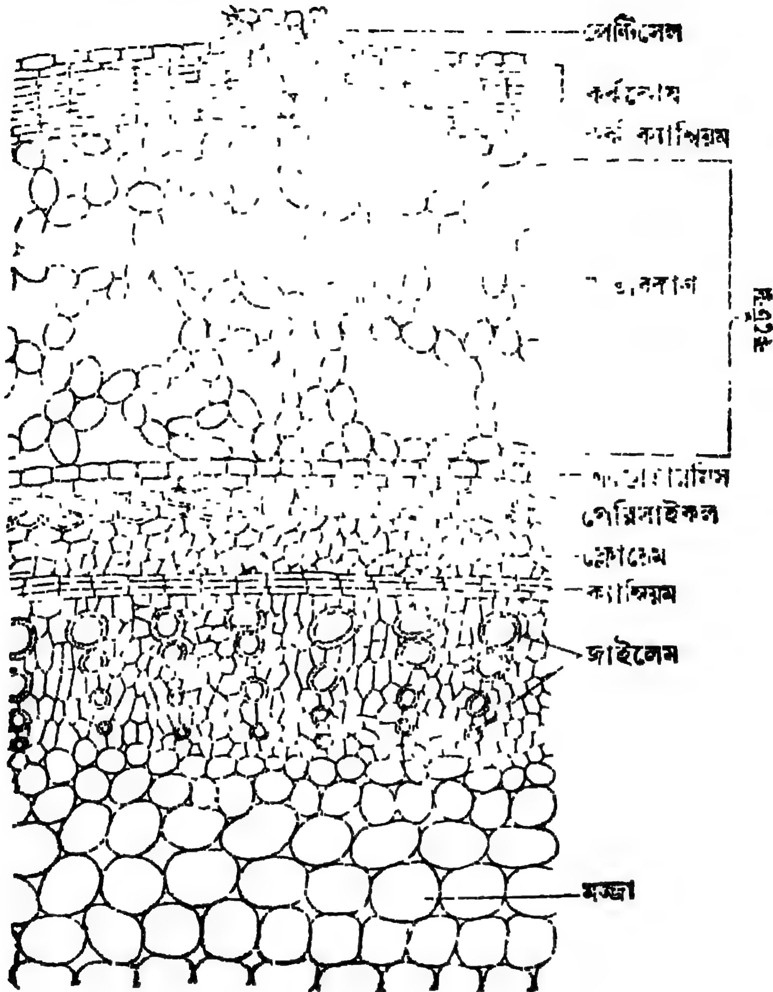
কর্টেক্স (Cortex)—ইহা বহুস্তরযুক্ত গোলাকার অথবা বহুভুজবিশিষ্ট প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত, ইহাতে বহুসংখ্যক সুস্পষ্ট বাতাবকাশ (air spaces) আছে।

এন্ডোডারমিস (Endodermis)—ইহা একটি-স্তরযুক্ত পিপাকৃতি কোষের সমষ্টি।

স্টেল (Stele)—ইহা এন্ডোডারমিসের নিম্নে থাকে এবং নিম্নলিখিত কলার দ্বারা গঠিত :

(*a*) পেরিসাইকেল (Pericycle)—ইহা কতিপয় স্তরযুক্ত এবং বহির্ভাগে প্যারেনকাইমা ও ভিতরের অংশে স্ক্লেরেনকাইমা কোষ থাকে।

(*b*) **ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল** (Vascular bundles)—দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ন্যায় ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি অবিচ্ছিন্ন বলয় গঠন করে এবং ইহারা সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় ও মুক্ত ; জাইলেমের প্রকৃতি এণ্ডআর্ক।



১৪৯নং চিত্র—গরান গাছের শ্বাসমূলের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

(*c*) **মজ্জা** (Pith) ইহা কেন্দ্রে অবস্থিত বিস্তৃত অঞ্চল এবং প্যারেনকাইমা কোষের সমষ্টি।

নিম্নে দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলের তুলনা দেওয়া হইল :

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল	**একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল**
1. এণ্ডোডারমিস একই প্রকার কোষ দ্বারা গঠিত। ক্যাসপেরিয়ান পটি থাকায় কোষের পার্শ্ববর্তী প্রাচীরের মধ্যাংশ স্থূল হয়	1. এণ্ডোডারমিস দুই প্রকার কোষ দ্বারা গঠিত—সাধারণ এণ্ডোডারমিস কোষ ও প্যাসেজ কোষ। এণ্ডোডারমিসের কোষগুলির পার্শ্ববর্তী প্রাচীরের মধ্যাংশে (ক্যাসপেরিয়ান পটির জন্য) এবং ভিতরের প্রাচীর C অক্ষরের মত স্থূল হয়। প্যাসেজ কোষগুলি পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট এবং প্রোটোজাইলেমের বিপরীতে থাকে।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল	একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল
2. ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল অরীয়। জাইলেম বা ফ্লোয়েম বাণ্ডিলের সংখ্যা সাধারণতঃ দুই হইতে পাঁচ হয়।	2. ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল অরীয়। জাইলেম অথবা ফ্লোয়েম বাণ্ডিলের সংখ্যা সাধারণতঃ পাঁচের বেশি হয়।
3. মজ্জা নাই অথবা খুব স্বল্প।	3. মজ্জা অধিক।
4. গৌণ বৃদ্ধির সময় ক্যাম্বিয়াম উৎপন্ন হইয়া ইহা স্থূল হয়।	4. ক্যাম্বিয়াম উৎপন্ন হয় না বলিয়া গৌণ বৃদ্ধি হয় না।

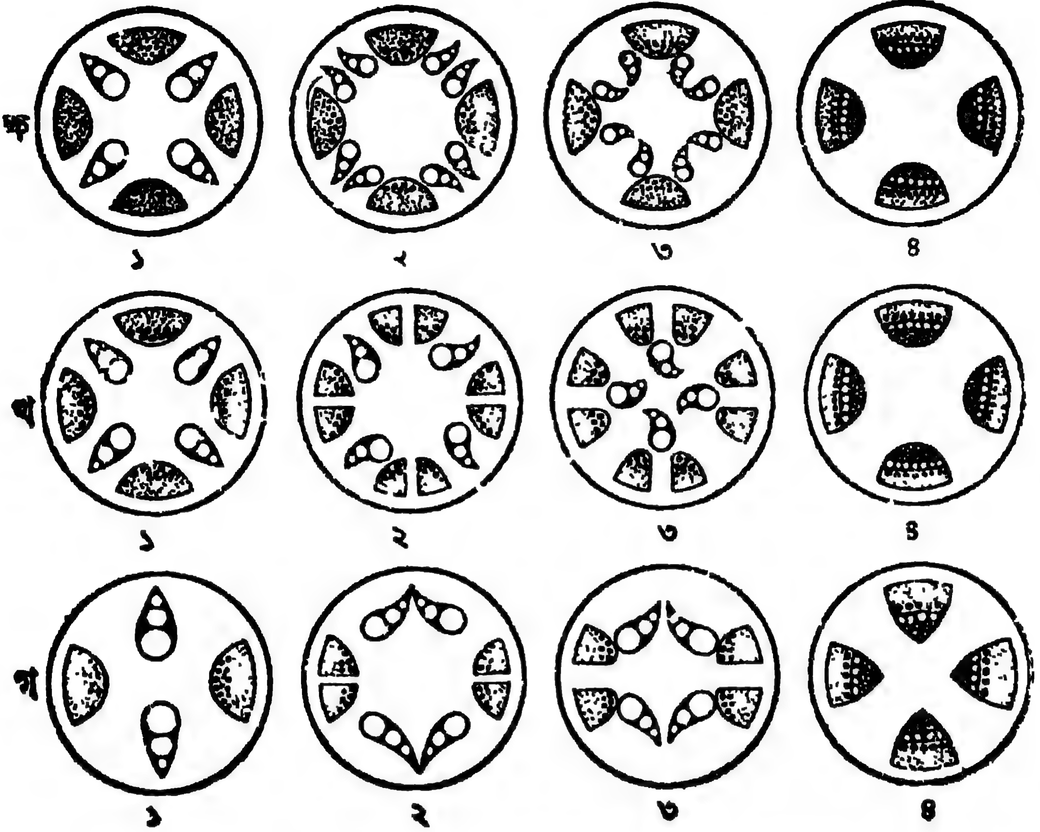
দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের ও মূলের তুলনা

কাণ্ড	মূল
1. ত্বক-কোষের বাহিরের প্রাচীর কিউটিন-যুক্ত। ত্বক হইতে বহুকোষী রোম উৎপন্ন হয়।	1. ত্বক-কোষের বাহিরের প্রাচীর পাতলাই থাকে। ত্বক হইতে এককোষী মূলরোম উৎপন্ন হয়।
2. অধস্ত্বকে কোলেনকাইমা থাকে।	2. অধস্ত্বক নাই।
3. কর্টেক্সের পরিমাণ কম। ইহা ভিতর দিকে স্টার্চ সীথ দ্বারা সীমাবদ্ধ। স্টার্চ সীথের কোষগুলির প্রাচীর পাতলা এবং উহাদের মধ্যে স্টার্চ দানা থাকে।	3. কর্টেক্সের পরিমাণ বেশী। ইহা ভিতর দিকে এণ্ডোডারমিস দ্বারা সীমাবদ্ধ। এণ্ডোডারমিসের কোষের পার্শ্ববর্তী প্রাচীরের মধ্যাস্থল স্থূল এবং উহাদের মধ্যে স্টার্চ দানা থাকে না।
4. বহুস্তরযুক্ত পেরিসাইকেল সাধারণতঃ স্ক্লেরেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। কখনও কখনও ইহা দুই প্রকার কোষের সমষ্টি। স্ক্লেরেনকাইমাযুক্ত কোষগুলির ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের উপরে থাকিয়া বাণ্ডিল টুপি বা হার্ড বাস্ট গঠন করে এবং প্যারেনকাইমা কোষগুলি দুইটি বাণ্ডিলের মধ্যস্থলে থাকে।	4. পেরিসাইকেল, এক-স্তরযুক্ত, প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত।
5. ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের সংখ্যা বহু এবং উহাদের বলয়-সমাবেশ আছে। প্রত্যেক বাণ্ডিল সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় ও মুক্ত।	5. ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের সংখ্যা সাধারণত দুই হইতে পাঁচ। বাণ্ডিলগুলি অরীয়।
6. প্রোটোজাইলেম কেন্দ্রের দিকে ও মেটাজাইলেম বাহিরের দিকে থাকে।	6. প্রোটোজাইলেম বাহিরের দিকে ও মেটাজাইলেম কেন্দ্রের দিকে থাকে।
7. ক্যাম্বিয়াম পূর্ব হইতেই থাকে, সুতরাং গৌণ বৃদ্ধি শীঘ্র হয়।	7. ক্যাম্বিয়াম প্রথমে থাকে না, পরে উৎপন্ন হয়, সুতরাং গৌণ বৃদ্ধি একটু বিলম্বে হয়।
8. মজ্জারশ্মি পূর্ব হইতেই থাকে।	8. মজ্জারশ্মি প্রথমে থাকে না, গৌণ বৃদ্ধির সময়ে উৎপন্ন হয়।
9. প্রথম অবস্থায় মজ্জা থাকে, কিন্তু গৌণ বৃদ্ধির সময় বিনষ্ট হয়।	9. মজ্জা থাকে না অথবা খুব অল্প থাকে।

মূল-কাণ্ডের অবস্থান্তর (Root-stem Transition—১৫০-২ চিত্র)

যদিও মূলে ও কাণ্ডের ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল অবিচ্ছিন্ন থাকে, তথাপি উহাদের গঠনের প্রভেদ আছে। একটি চারাগাছের ক্ষেত্রে মূলের অরীয় ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল কাণ্ডের সংযুক্ত ও সমপার্শ্বীয় বাণ্ডিলে পরিণত হয়। এই পরিণতি অক্ষের যে-অঞ্চলে সংঘটিত

হয়, তাহাকে **অবস্থান্তর অঞ্চল** (transition region) বলে। এই অবস্থান্তর ভ্রূণমূলের অগ্রভাগে, ঠিক বীজপত্রাবকাণ্ডের নিম্নে, বা ইহার কেন্দ্রে অথবা ইহার উপরে সংঘটিত হইতে পারে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তথ্য হইল যে, অবস্থান্তরের সময় মূলের



১৫০নং চিত্র—মূলের অরীয় বাণ্ডিলের কাণ্ডের সমপার্শ্বীয় বাণ্ডেলে পরিণতি :
(ক) কৃষ্ণকলি, (খ) খেজুর, (গ) কুমড়া

প্রত্যেকটি জাইলেমের স্তর উহার অক্ষের চারিদিকে লম্বালম্বিভাবে 180 আবর্তন করে। ইহা নানা প্রকারের হইতে পারে, তবে নিম্নে প্রধান তিন প্রকার অবস্থান্তরের বিষয় বর্ণনা করা হইল :

1. প্রত্যেক জাইলেম অংশ লম্বালম্বি বিভক্ত হয়। একটি খণ্ড ডান দিকে ও অপরটি বাম দিকে 180° আবর্তন করিয়া ফ্লোয়েমের নিম্নের অংশের সহিত সংযুক্ত হয়। এইপ্রকার অবস্থান্তরে মূলে যতগুলি ফ্লোয়েম স্তর থাকে কাণ্ডেও ততগুলি প্রাথমিক ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল দেখা যায় ; যথা—সন্ধ্যামণি বা কৃষ্ণকলি প্রভৃতি।

2. প্রত্যেক ফ্লোয়েম স্তর এবং প্রত্যেক জাইলেম স্তর লম্বালম্বি বিভক্ত হয়। প্রত্যেকের খণ্ড দুইটি পার্শ্বের দিকে আবর্তন করে এবং পূর্বেকার মত জাইলেম খণ্ডটি ফ্লোয়েম খণ্ডের নিম্নের অংশে সংযুক্ত হয়। এইজন্য মূলে যতগুলি ফ্লোয়েম অংশ থাকে, কাণ্ডে ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের সংখ্যা তাহার অপেক্ষা দ্বিগুণ হয় ; যথা— কুমড়া প্রভৃতি।

3. জাইলেম স্তর বিভক্ত হয় না এবং 180° আবর্তন করে। ইতিমধ্যে ফ্লোয়েম

স্তরগুলি বিভক্ত হয় এবং পার্শ্বদিকে আবর্তন করিয়া জাইলেম স্তরের উপরে সংযুক্ত হয়; যথা—খেজুর, জংলী মটর প্রভৃতি।

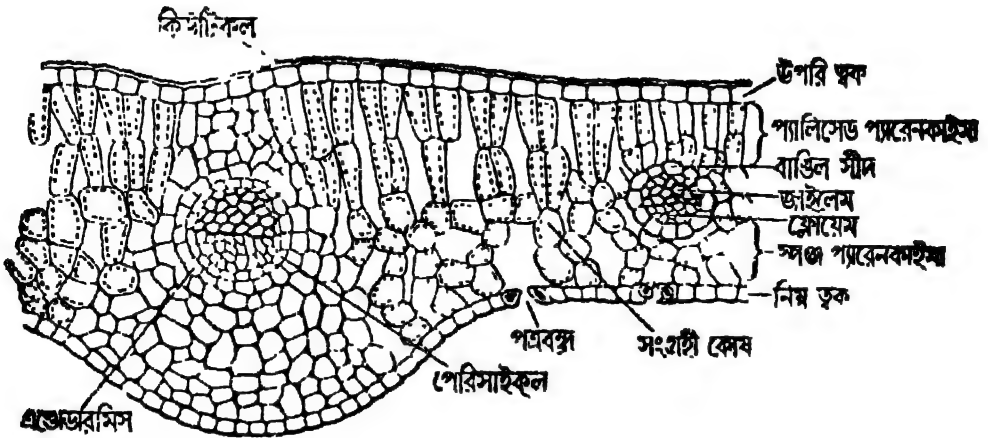
III. পাতার গঠন (Structure of Leaves)

1. দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতা (Dicotyledonous leaves)

A. আম পাতা (Leaf of Mango—১৫১নং চিত্র):

আমপাতার প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে, বাহির হইতে ভিতর দিকে কলাগুলি নিম্নলিখিতভাবে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায়:

ঊর্ধ্ব ত্বক (Upper epidermis)—ইহা এক স্তরযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত এবং বাহিরের প্রাচীরগুলি স্থূল, কিউটিনযুক্ত ও কিউটিকলযুক্ত হয়। সাধারণত ইহার ক্লোরোপ্লাস্ট ও পত্ররন্ধ্র থাকে না।



১৫১নং চিত্র—আমপাতার আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

মেসোফিল (Mesophyll)—ইহা প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত ও দুইটি অঞ্চলে বিভেদিত হয়:

(*a*) **প্যালিসেড প্যারেনকাইমা** (Palisade parenchyma)—ইহা দুইস্তরযুক্ত, ঘনসন্নিবিষ্ট, দীর্ঘাকৃতি কোষদ্বারা গঠিত। প্রত্যেক কোষের পার্শ্ব প্রাচীরের নিকট অসংখ্য ক্লোরোপ্লাস্ট শ্রেণীবদ্ধভাবে থাকে।

(*b*) **স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা** (Spongy parenchyama)—ইহা কতকগুলি ডিম্বাকার কোষদ্বারা গঠিত এবং কোষগুলি আলগাভাবে সজ্জিত থাকে। ইহাদের বহু কোষমধ্যবর্তী স্থান আছে। কোষের মধ্যে অল্পসংখ্যক ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। কয়েকটি স্পঞ্জী কোষ একটি বা একাধিক প্যালিসেড কোষের সহিত সংযুক্ত হইয়া সংগ্রহী কোষ (collecting cell) গঠন করে।

ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল (Vascular bundles)—বহু ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল স্পঞ্জী প্যারেনকাইমার মধ্যে দেখা যায়। প্রত্যেক বাণ্ডিলের চারিদিকে প্যারেনকাইমা কোষের একটি আচ্ছাদন থাকে; ইহাকে **বাণ্ডিল সীদ** (bundle sheath) বলে। ভ্যাস্কুলার

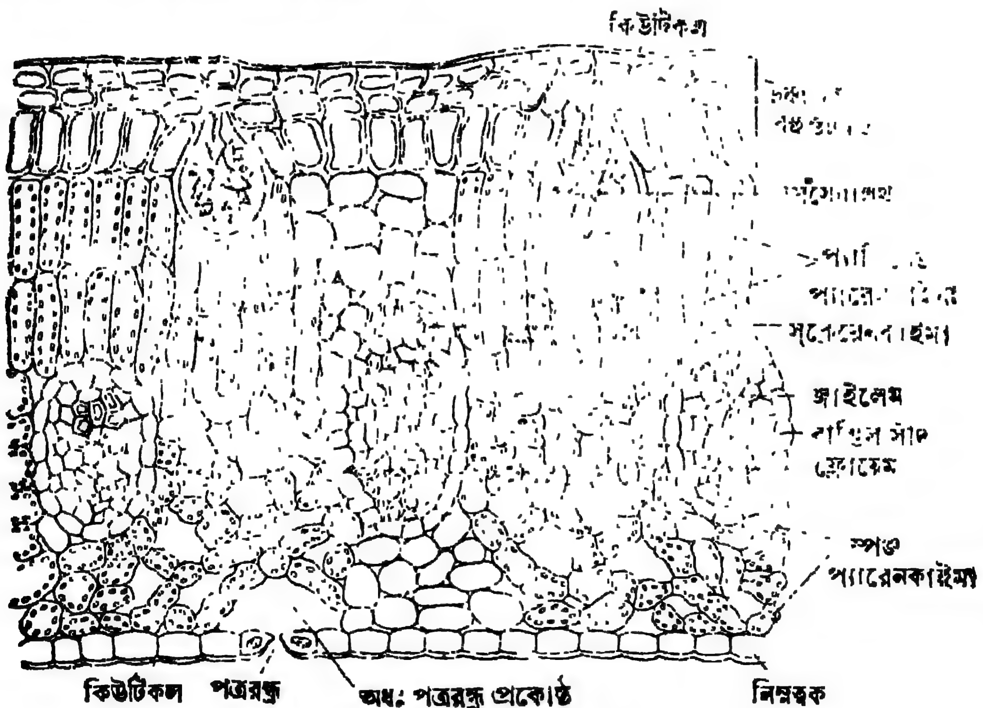
বান্ডিল সংযুক্ত, সমপাশ্বীয় ও বন্ধ। জাইলেম ঊর্ধ্ব ত্বকের দিকে এবং ফ্লোয়েম নিম্ন ত্বকের দিকে থাকে।

জাইলেম (Xylem)-এ বলয়াঙ্কিত ও সর্পিলাঙ্কিত বাহিকা, ট্রাকীড, জাইলেম প্যারেনকাইমা এবং কাষ্ঠিক তন্তু থাকে। **ফ্লোয়েম** (Phloem)-এ সরু সীভ নল সাঙ্গকোষ ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে।

নিম্ন ত্বক (Lower epidermis)—ইহা ঊর্ধ্ব ত্বকের মত এক-স্তরযুক্ত কোষদ্বারা গঠিত, কিন্তু ইহাতে অসংখ্য পত্ররন্ধ্র থাকে। প্রত্যেক পত্ররন্ধ্র ক্লোরোপ্লাস্ট ও স্টার্চ দানাযুক্ত রক্ষিকোষ দ্বারা বেষ্টিত এবং ইহার পশ্চাৎ দিকে শ্বাসগহ্বর (respiratory cavity) থাকে।

B. রবার পাতা (Leaf of Indian rubber—১৫২নং চিত্র) ঃ

রবার পাতার আভ্যন্তরিক গঠন আমপাতার ন্যায়, কিন্তু ইহার ঊর্ধ্বত্বক বহুস্তরযুক্ত ; ঊর্ধ্ব ত্বকের ভিতরে অবস্থিত কয়েকটি কোষের আকার বৃহৎ হইয়া থাকে। এই সকল বৃহদাকার কোষের মধ্যে **সিস্টোলিথ** (cystolith) থাকে।



১৫২নং চিত্র—রবার পাতার প্রস্থচ্ছেদ

C. করবীর পাতা (Leaf of Nerium—১৫৩নং চিত্র) ঃ

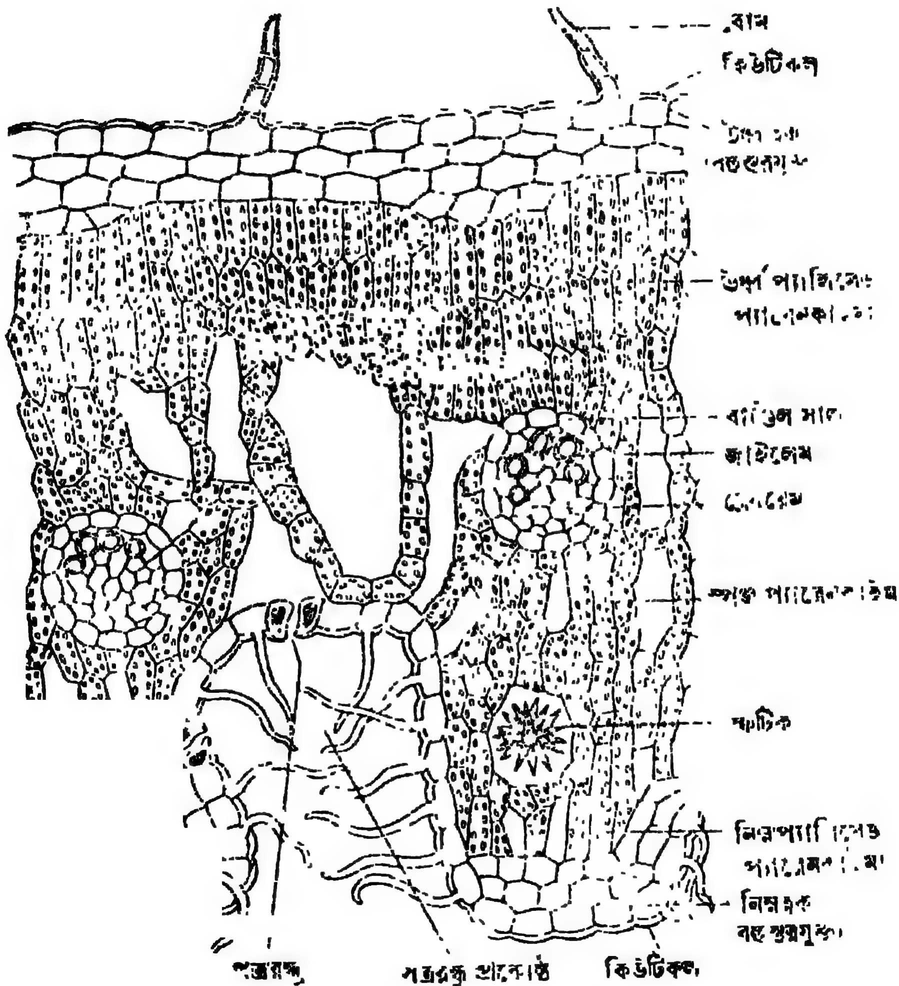
করবীর পাতার প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে নিম্নলিখিত আভ্যন্তরিক গঠন দেখিতে পাওয়া যায় ঃ

ঊর্ধ্বত্বক (Upper epidermis)—ইহা কয়েকটি স্তরযুক্ত ও কোষমধ্যবর্তী

স্থানবিহীন প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত এবং বহির্ভাগে স্থূল কিউটিকল থাকে। বহিঃস্তর হইতে অসংখ্য একসারি বহুকোষী রোম নির্গত হয়।

মেসোফিল (Mesophyll)—ইহা সুস্পষ্ট প্যালিসেড এবং স্পঞ্জী প্যারেনকাইমায় বিভেদিত। প্যালিসেড প্যারেনকাইমা ঊর্ধ্বত্বক এবং নিম্ন ত্বকের সংশ্লিষ্ট কিন্তু স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা উহাদের মধ্যে অবস্থিত।

(*a*) **ঊর্ধ্ব প্যালিসেড প্যারেনকাইমা** (Upper palisade parenchyma)—ইহা দুই বা ততোধিক স্তরযুক্ত ঘনসন্নিবিষ্ট দীর্ঘ প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত এবং কোষগুলির মধ্যে প্রচুর ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। কোষমধ্যবর্তী স্থান প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।



১৫৩নং চিত্র—করবী পাতার প্রস্থচ্ছেদ

(*b*) **স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা** (Spongy parenchyma)—ইহা কয়েকটি স্তরের সমব্যাসযুক্ত কোষদ্বারা গঠিত। কোষগুলি আলগাভাবে সজ্জিত এবং ইহার মধ্যে প্রচুর কোষমধ্যবর্তী স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি কোষের মধ্যে ক্যালসিয়াম অক্জ্যালেটের কেলাসগুচ্ছ (calcium oxalate crytals) দেখিতে পাওয়া যায়।

(c) **নিম্ন প্যালিসেড প্যারেনকাইমা (Lower palisade parenchyma)**—ইহা স্পঞ্জী প্যারেনকাইমার নিম্নে অবস্থিত এবং এক বা একাধিক স্তরযুক্ত প্যালিসেড কোষ দ্বারা গঠিত।

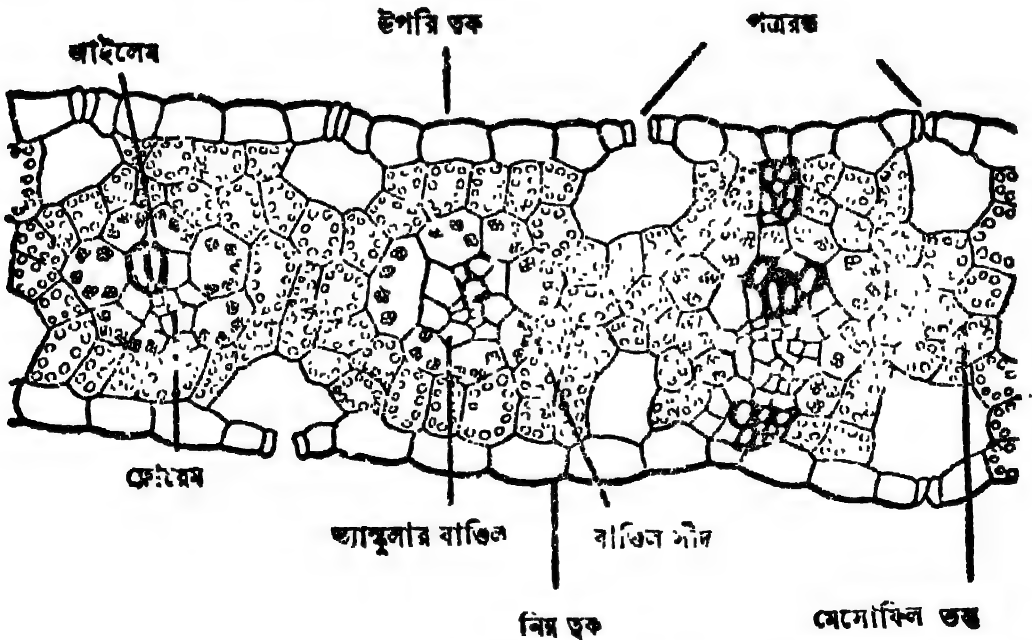
ভ্যাস্কুলার বান্ডিল (Vascular bundles)—ইহারা ঊর্ধ্ব প্যালিসেড প্যারেনকাইমা এবং স্পঞ্জী প্যারেনকাইমার মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং উপরিভাগে জাইলেম ও নিম্ন ভাগে ফ্লোয়েম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি বান্ডিলের চতুর্দিকে প্যারেনকাইমা কোষযুক্ত বান্ডিল সীদ (bundle sheath) থাকে।

নিম্ন ত্বক (Lower epidermis)—ঊর্ধ্ব ত্বকের ন্যায় ইহা কয়েকটি স্তরযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত কিন্তু কিউটিকল ঊর্ধ্ব ত্বক অপেক্ষা পাতলা। পত্ররন্ধ্রগুলি নিম্ন ত্বকদ্বারা গঠিত কক্ষের মধ্যে অবস্থিত (stomatal crypt) এবং নিম্ন ত্বক হইতে নির্গত অসংখ্য এককোষী রোম (trichomes) দ্বারা আবৃত থাকে।

2. **একবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতা (Monocotyledonous leaves)**

A. **ভুট্টার পাতা (Leaf of Maize—১৫৪নং চিত্র)**

ভুট্টার পাতার প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে, নিম্নলিখিত আভ্যন্তরিক গঠন দেখিতে পাওয়া যায়ঃ



১৫৪নং চিত্র—ভুট্টার পাতার প্রস্থচ্ছেদ

ত্বক (Epidermis)—পাতার প্রত্যেক তলের ত্বকে এক-স্তরযুক্ত ক্লোরোপ্লাস্টবিহীন কোষ এবং অসংখ্য পত্ররন্ধ্র আছে। উভয় তলের পত্ররন্ধ্রগুলি প্রায় সমান সংখ্যক।

মেসোফিল (Mesophyll)—ইহা দুইটি ত্বকের মধ্যে থাকে এবং পাতার অধিকাংশ

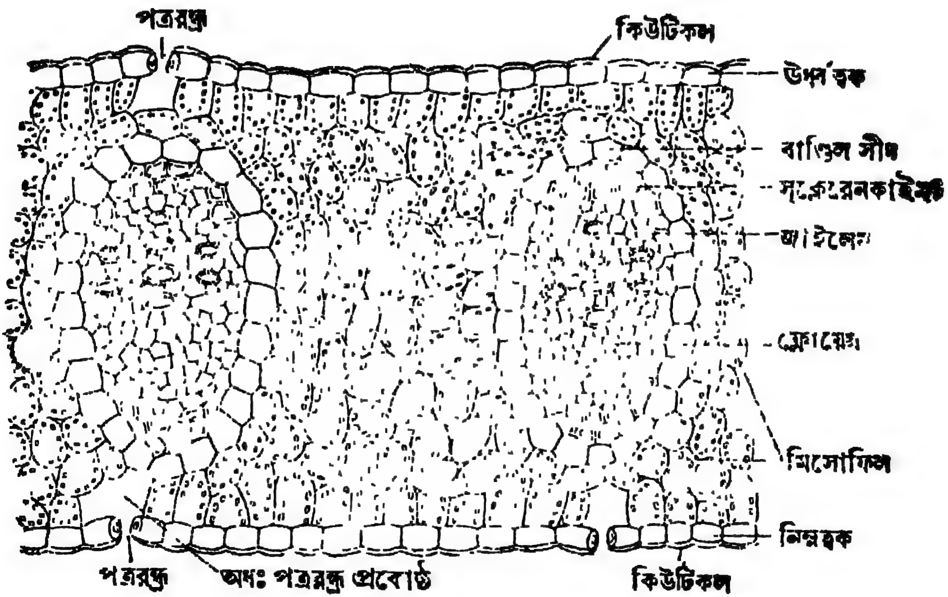
স্থান অধিকার করে। কোষগুলি অপেক্ষাকৃত ঘনসন্নিবিষ্ট এবং ইহাদের মধ্যে অসংখ্য ক্লোরোপ্লাস্ট এবং কম সংখ্যক কোষমধ্যবর্তী স্থান থাকে। কিন্তু মেসোফিল প্যালিসেড ও স্পঞ্জী প্যারেনকাইমায় বিভেদিত হয় না।

ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল (Vascular bundles)—ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় ও বদ্ধ। ইহারা দুই প্রকার : বড় ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি কাণ্ডের ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের ন্যায় কিন্তু ইহার বাণ্ডিল সীদের স্তম্ভনকলা-দুইটি বিচ্ছিন্ন স্থূল প্রাচীর বিশিষ্ট উপাদান গঠন করে ; ইহাদের মধ্যে একটি ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের উপরে এবং অপরটি উহার নিম্নে থাকে। ইহা ব্যতীত, বাণ্ডিলটি ক্লোরোফিলযুক্ত কোষদ্বারা বেষ্টিত। জাইলেম ঊর্ধ্ব ত্বকের দিকে ও ফ্লোয়েম নিম্ন ত্বকের দিকে থাকে। ছোট বাণ্ডিলগুলি বড় বাণ্ডিলের মত, কিন্তু উহাদের পার্শ্বীয় স্তম্ভনকলা নাই।

B. রজনীগন্ধার পাতা (Leaf of Tube rose—১৫৫নং চিত্র)

রজনীগন্ধার পাতার প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে নিম্নলিখিত আভ্যন্তরিক গঠন দেখিতে পাওয়া যায়।

ঊর্ধ্ব ত্বক (Upper epidermis —ইহা এক-স্তরযুক্ত আয়তাকার কোষের সমষ্টি এবং বহির্ভাগে স্থূল কিউটিকল আছে। এই স্তরে ইতস্তত পত্ররন্ধ্র দেখিতে পাওয়া যায়।



১৫৫নং চিত্র—রজনীগন্ধার পাতার প্রস্থচ্ছেদ

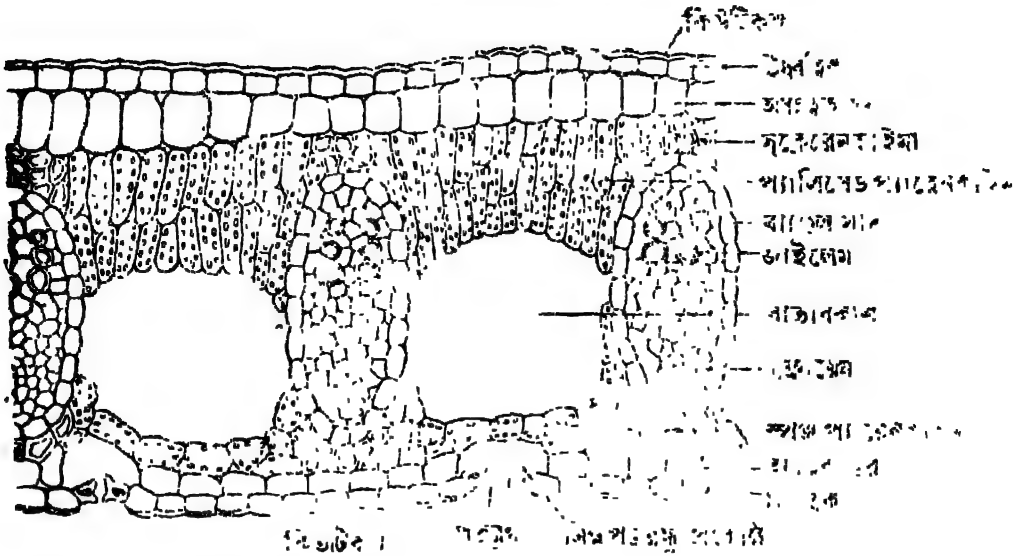
মেসোফিল (Mesophyll)—ইহা প্যালিসেড ও স্পঞ্জী প্যারেনকাইমায় বিভেদিত নয়। কোষগুলি সমব্যাসযুক্ত এবং ইহাতে অসংখ্য ক্লোরোপ্লাস্ট আছে। কোষমধ্যবর্তী স্থানও দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্ন ত্বক (Lower epidermis)—ইহা ঊর্ধ্বত্বকের ন্যায়।

C. কলাপাতা (Leaf of Banana—১৫৬নং চিত্র) ঃ

কলাপাতার প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে নিম্নলিখিত আভ্যন্তরিক গঠন দেখিতে পাওয়া যায় ঃ

ঊর্ধ্ব ত্বক (Upper epidermis)—ইহা একটি স্তরযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত এবং বহির্ভাগে কিউটিকল থাকে। পত্ররন্ধ্র থাকিতেও পারে।



১৫৬নং চিত্র—কলাপাতার প্রস্থচ্ছেদ

ঊর্ধ্ব অধঃত্বক স্তর (Upper Sub-epidermal layer)—ইহা ঊর্ধ্ব ত্বকের নিম্নে অবস্থিত এবং পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট কোষের সমষ্টি।

মেসোফিল (Mesophyll)—ইহা প্যালিসেড এবং স্পঞ্জী প্যারেনকাইমায় বিভেদিত।

(*a*) **প্যালিসেড প্যারেনকাইমা** (Palisade parenchyma)—ইহা দুইটি অথবা তিনটি স্তরযুক্ত ঘনসন্নিবিষ্ট দীর্ঘ কোষের সমষ্টি এবং কোষগুলির মধ্যে প্রচুর ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

(*b*) **স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা** (Spongy parenchyma)—ইহার কয়েকটি স্তরযুক্ত প্রায় সমব্যাসযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত এবং স্থানে স্থানে কোষগুলি নিয়মিত সমান্তরালভাবে সজ্জিত। ইহাতে বৃহৎ বাতাবকাশ (air chambers) দেখিতে পাওয়া যায়।

ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল (Vascular bundles)—ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি স্বল্প গঠিত হয়। ইহারা বদ্ধ এবং প্রতি বাণ্ডিলের উপরিভাগে এবং নিম্নাংশে স্ক্লেরেনকাইমা স্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

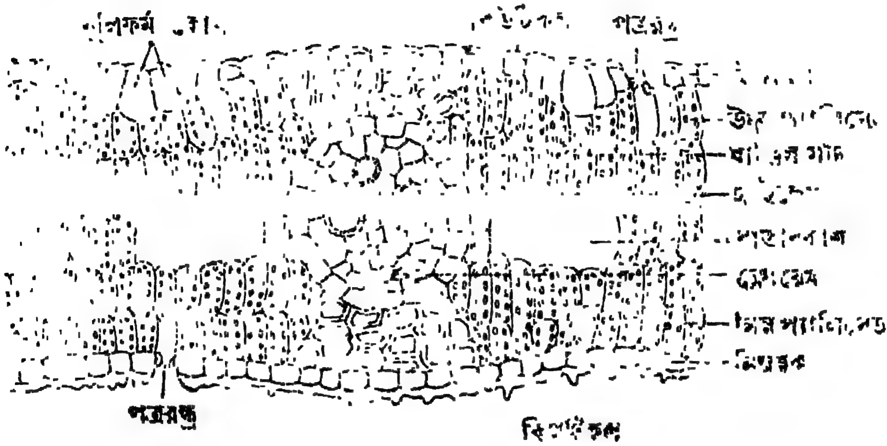
নিম্ন অধস্ত্বক স্তর (Lower Sub-epidermal layer)—ইহা মেসোফিলের নিম্নে অবস্থিত। ইহাতে পত্ররন্ধ্র প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্ন ত্বক (Lower epidermis)- ইহা একটি স্তরযুক্ত গোলাকার কোষদ্বারা গঠিত এবং বহির্ভাগে কিউটিকল থাকে। ইহাতে পত্ররন্ধ্র ইতস্তত থাকে।

D **বাঁশপাতা** (Leaf of Bamboo—১৫৭নং) ঃ

বাঁশপাতার প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে নিম্নলিখিত আভ্যন্তরিক গঠন দেখিতে পাওয়া যায়।

ঊর্ধ্ব ত্বক (Upper epidermis)—ইহা একটি-স্তরযুক্ত কোষের সমষ্টি এবং বহির্ভাগে কিউটিকল থাকে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি bulliform বা বৃহৎ আকৃতির কোষ থাকে।



১৫৭নং—চিত্র বাঁশপাতার প্রস্থচ্ছেদ

মেসোফিল (Mesophyll)—ইহা কেবলমাত্র প্যালিসেড প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত। কোষগুলি দীর্ঘ ঘনসন্নিবিষ্ট এবং ঊর্ধ্ব ও নিম্ন ত্বক হইতে লম্বভাবে নির্গত হইয়াছে। ঊর্ধ্ব ত্বকের সংশ্লিষ্ট কোষকে **ঊর্ধ্ব প্যালিসেড কোষ** (upper palisade cell) এবং নিম্ন ত্বকের সংশ্লিষ্ট কোষকে **নিম্ন প্যালিসেড কোষ** (lower palisade cells) বলে। উভয় প্যারেনকাইমার মধ্যে অনেকগুলি ডিম্বাকার বাতাবকাশ (air chambers) দেখিতে পাওয়া যায়।

ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল (Vascular bundles)-ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি নানা আকারের হইয়া থাকে এবং পাতার উপরি তল ও নিম্ন তলের সহিত স্ক্লেরেনকাইমা কোষদ্বারা যুক্ত। প্রতি বাণ্ডিল সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় এবং বদ্ধ। উপরি অংশে জাইলেম এবং নিম্নাংশে ফ্লোয়েম অবস্থিত।

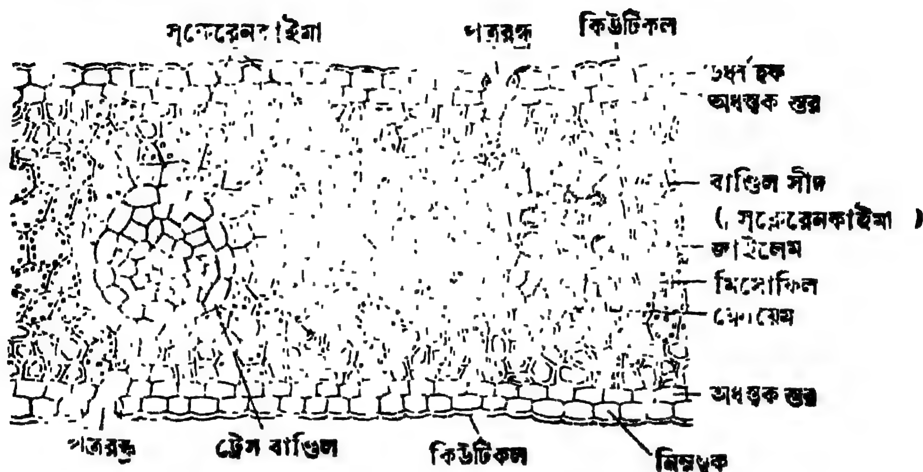
E. **খেজুর পাতা** (Leaf of Date palm—১৫৮নং চিত্র) ঃ

খেজুর পাতার প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে নিম্নলিখিত আভ্যন্তরিক গঠন দেখিতে পাওয়া যায় ঃ

ঊর্ধ্ব ত্বক (Upper epidermis)—এই স্তরটি বেলনাকার কোষদ্বারা গঠিত এবং বহির্ভাগে কিউটিকলের আবরণ আছে। মধ্যে মধ্যে পত্ররন্ধ্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ঊর্ধ্ব অধস্ত্বক স্তর (Upper Sub-epidermal layer)—ইহা একটি-স্তরযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত এবং কোষগুলির মধ্যে স্বল্প ক্লোরোপ্লাস্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

মেসোফিল (Mesophyll)—ইহা উভয় অধস্ত্বক স্তরের মধ্যে অবস্থিত এবং ইহাই পাতার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া থাকে। ইহা প্যালিসেড ও স্পঞ্জী প্যারেনকাইমায় বিভেদিত হয় না। ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন অধস্ত্বক স্তরের মধ্যে অনেকগুলি স্ক্লেরেনকাইমা কোষগুচ্ছ সমান্তরালভাবে থাকে।



১৫৮নং চিত্র—খেজুর পাতার প্রস্থচ্ছেদ

ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল (Vascular bundles)—ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি সমান্তরালভাবে সজ্জিত। প্রতি বাণ্ডিল সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় ও বদ্ধ এবং জাইলেম উপরি অংশে ও ফ্লোয়েম নিম্নাংশে অবস্থিত। দুই প্রকার বাণ্ডিল দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র। বৃহৎ বাণ্ডিলগুলি স্ক্লেরেনকাইমা কোষের আবরণী দ্বারা বেষ্টিত কিন্তু ক্ষুদ্র বাণ্ডিলগুলির চতুর্দিকে প্যারেনকাইমা কোষের আবরণী আছে। প্রতি বৃহৎ বাণ্ডিলের উপর অংশে এবং নিম্নাংশে স্ক্লেরেনকাইমা স্তর I-গার্ডারের ন্যায় কার্য করে।

নিম্ন অধস্ত্বক স্তর (Lower Sub-epidermal layer)—ইহা ঊর্ধ্ব অধস্ত্বকের ন্যায় দেখিতে।

নিম্ন ত্বক (Lower epidermis)—ইহার আকৃতি ঊর্ধ্ব ত্বকের ন্যায়।

IV. পত্রবৃন্তের গঠন (Structure of Petiole)

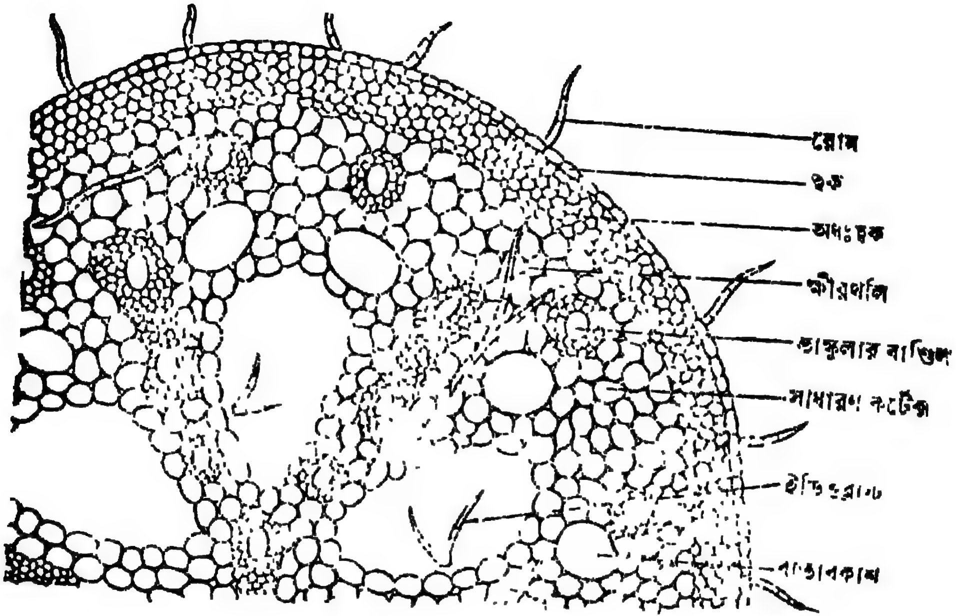
শালুকের পত্রবৃন্ত (Petiole of Nymphaea—১৫৯নং চিত্র) :

শালুকের পত্রবৃন্তের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে বাহির হইতে ভিতর দিকে কলাগুলি নিম্নলিখিতভাবে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায় :

ত্বক (Epidermis)—ইহা পাতলা কিউটিকলযুক্ত একসারী কোষের সমষ্টি এবং বহির্ভাগে বহুকোষী রোম আছে।

অধস্ত্বক (Hypodermis)—ইহা বহুস্তরযুক্ত ক্লোরোপ্লাস্টবিশিষ্ট কোলেনকাইমা কোষদ্বারা গঠিত।

আদি কলা (Ground tissue)—ইহা বহুসংখ্যক বাতাবকাশযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষের সমষ্টি এবং বাতাবকাশগুলির মধ্যে বিশিষ্ট আকৃতির তারকাকার রোম (stellate hairs) আছে। ঐ সকল কোষ ক্ষুদ্র অক্সালেট দানাসম্পন্ন শাখাযুক্ত স্ক্লেরেনকাইমা কোষের সমষ্টি। আদি কলার সর্বত্রই তরুক্ষীরস্থলী (latex sacs) দেখিতে পাওয়া যায়।



১২৯নং চিত্র—শালুকের পত্রবৃন্তের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল (Vascular bundles)—ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প এবং একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের ন্যায় আদিকলার মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। দুই প্রকার বাণ্ডিল দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—একক বাণ্ডিল এবং দুইটি সমষ্টিগত বাণ্ডিল। প্রাথমিক জাইলেমগুলি বিনষ্ট হইয়া বাতাবকাশ সৃষ্টি করে। প্রকৃত বাহিকা এবং ক্যাম্বিয়াম দেখিতে পাওয়া যায় না।

———

৬ গৌণ বৃদ্ধি
(Secondary Growth)

সকল উদ্ভিদে কোষ গঠিত হইবার পর ক্রমশ উহারা বড় হইয়া পূর্ণ আয়তনযুক্ত হয়, ফলে উহারা লম্বা এবং সামান্য স্থূলও হয়। ইহাকে **প্রাথমিক বৃদ্ধি** (primary growth) বলে। অধিকাংশ দ্বিবীজপত্রী, নগ্নবীজী এবং কয়েকটি একবীজপত্রী (যথা—ড্রাসিনা) উদ্ভিদে প্রাথমিক বৃদ্ধি হইবার পর গৌণ কলা (secondary tissue) গঠিত হইয়া উহাদের ব্যাস স্থূল হয়। এই সকল গৌণ কলা বহিঃস্টেলীয় (extrastelar) ও অন্তঃস্টেলীয় (intrastelar) অঞ্চলে বিভিন্ন ক্যাম্বিয়াম স্তরের তৎপরতার জন্য গঠিত হয় এবং উদ্ভিদের যে-সকল অঙ্গে উহারা থাকে সেই সকল অঙ্গ স্থূল হয়। বিভিন্ন ক্যাম্বিয়াম স্তরের কর্ম তৎপরতার জন্য নূতন গৌণ কলার গঠনকে **গৌণ বৃদ্ধি** (secondary growth) বলে। গৌণ কলা দুই প্রকার : (1) **গৌণ ভ্যাস্কুলার কলা** (secondary vascular tissue) ও (2) **পেরিডার্ম** (periderm)।

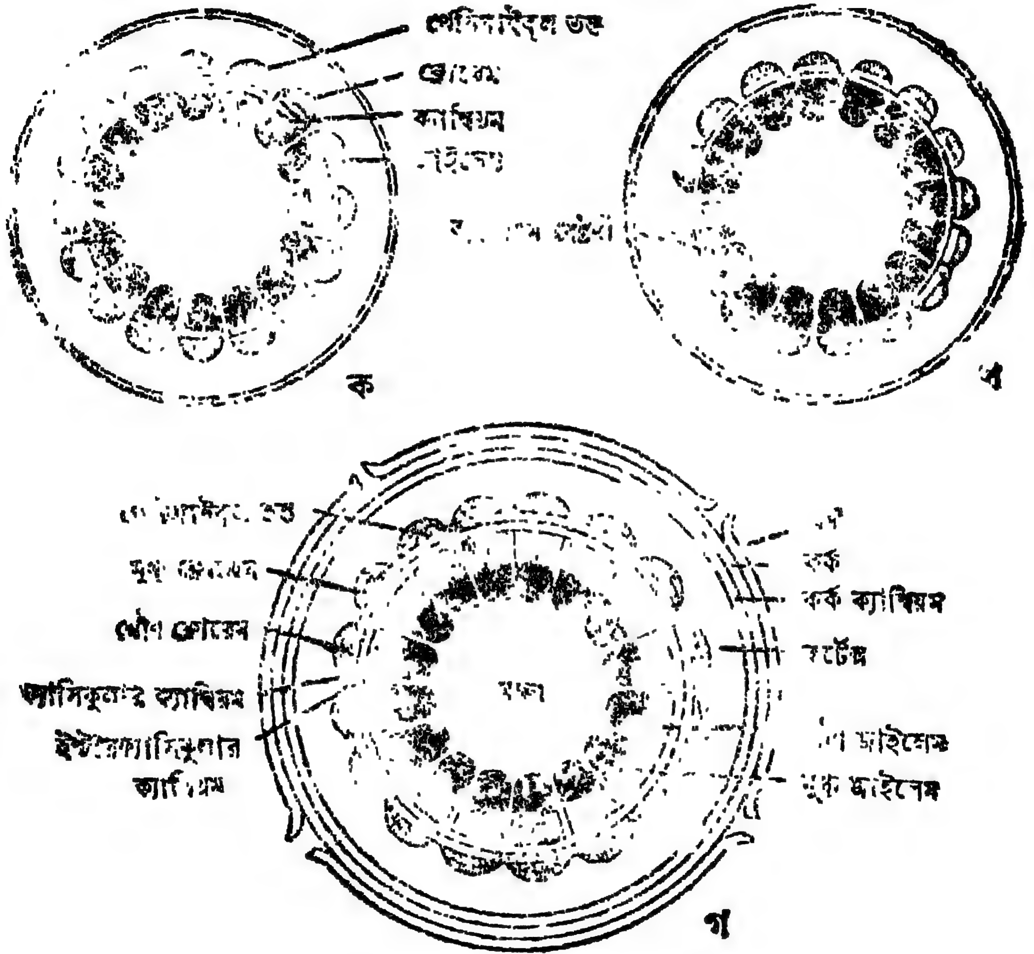
দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের গৌণবৃদ্ধি (Secondary Growth in Dicotyledonous Stem—১৬০নং চিত্র)

(a) **অন্তঃস্টেলীয় অঞ্চলে** (**In the intrastelar region**) :

1. **ক্যাম্বিয়াম বেষ্টনীর উৎপত্তি** (Formation of cambium ring)—গৌণ বৃদ্ধি আরম্ভ হইবার সময় প্রাথমিক মজ্জাংশুর কয়েকটি প্যারেনকাইমা কোষ, যাহারা বিভিন্ন ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম স্তরের মধ্যস্থলে থাকে তাহারা বিভক্ত হয় ও **ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম** (interfascicular cambium) নামক নূতন গৌণ ভাজক কলা বা secondary meristem-এর স্তর গঠন করে। ইন্টার-ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম স্তরগুলি প্রাথমিক ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম স্তরগুলির সহিত উভয় পার্শ্বে সংযুক্ত হয় এবং এইরূপে কেন্দ্রীয়স্তম্ভ (central cylinder)-এর মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ক্যাম্বিয়াম বেষ্টনীর (cambium ring) উৎপত্তি হয়।

2. **গৌণ জাইলেম ও গৌণ ফ্লোয়েমের উৎপত্তি** (Formation of secondary xylem and secondary phloem—১৬১নং চিত্র)—ক্যাম্বিয়াম বেষ্টনী ভিতর দিকে ও বাহিরের দিকে নূতন কোষ উৎপন্ন করে। প্রত্যেক ক্যাম্বিয়াম কোষ প্রস্থভাবে বিভক্ত হইয়া ভিতর দিকে ও বাহিরের দিকে মোট দুইটি কোষ বিভক্ত হয়। ইহাদের মধ্যে একটি ক্যাম্বিয়াম মাতৃ-কোষরূপে থাকে এবং অপরটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গৌণ জাইলেম বা ফ্লোয়েম অংশে বিভেদিত হয়। জাইলেমের বাহিরের দিকে নূতন জাইলেম অংশ গঠিত

হইয়া ইহা ক্রমশ আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নবগঠিত জাইলেম এবং ফ্লোয়েমকে গৌণ জাইলেম (secondary xylem) ও গৌণ ফ্লোয়েম (secondary phloem) বলে। যতদিন উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয়, ততদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ক্যাম্বিয়াম কোষ বিভক্ত হয়। জাইলেম অংশ ফ্লোয়েম অপেক্ষা বেশী পরিমাণে গঠিত হয়। গৌণ জাইলেমে কাষ্ঠবাহিকা, ট্রাকীড, কাষ্ঠিক তন্তু ও জাইলেম প্যারেনকাইমা থাকে। গৌণ ফ্লোয়েমে প্রধানত সীভ নল, সঙ্গীকোষ, বাস্ট তন্তু ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে। সময় সময় বহিঃক্ষরিত কোষ, ক্ষীরনালী বা রজন-নালী দেখিতে পাওয়া যায়।

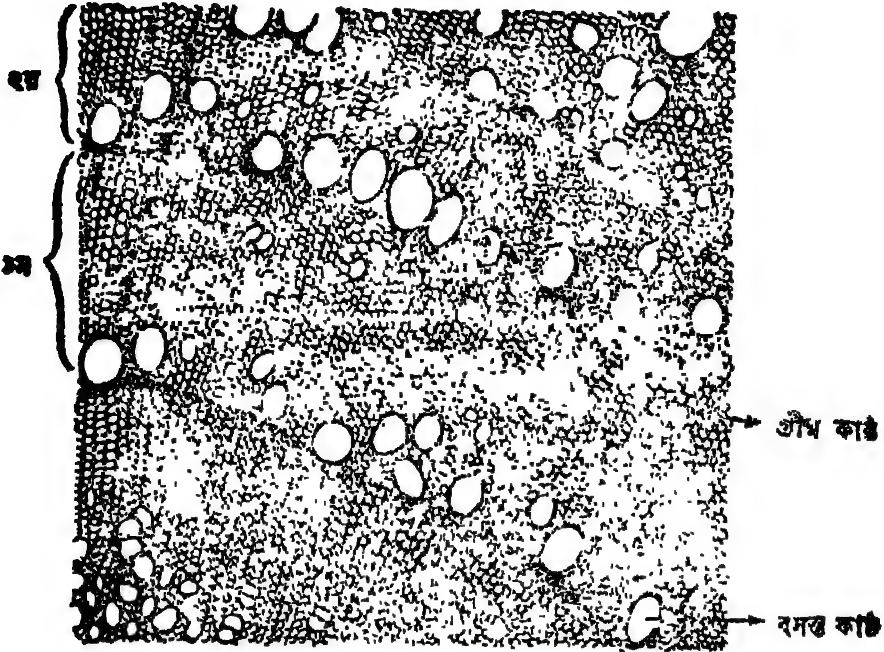


১৬০নং চিত্র—কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া গৌণ বৃদ্ধি দেখান হইয়াছে

3. **গৌণ মজ্জাংশুর উৎপত্তি** (Formation of secondary medullary rays—১৬৩নং চিত্র)—ইন্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম গৌণ জাইলেম ও ফ্লোয়েম গঠন করে বলিয়া মজ্জা হইতে কর্টেক্স পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাথমিক মজ্জাংশুকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কতকগুলি ক্যাম্বিয়াম কোষ গৌণ জাইলেম ও ফ্লোয়েম সমভাবে উৎপন্ন না করিয়া কতকগুলি প্যারেনকাইমা কোষ উৎপন্ন করে। ইহারাই গৌণ মজ্জাংশু (secondary medullary rays) গঠন করে। ইহাদের মধ্য দিয়া ফ্লোয়েমে ও অন্যান্য কলাতে জল সংবাহিত হয়।

4. নূতন ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের উৎপত্তি (Formation of vascular bundles)— ইণ্টারফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়ামের মত বিভক্ত হইয়া ভিতর দিকে নূতন জাইলেম ও বাহিরের দিকে নূতন ফ্লোয়েম উৎপন্ন করে। এইরূপে নূতন ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের উৎপত্তি হয়। নূতন ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলে প্রোটোজাইলেম ও গৌণ মজ্জাংশু থাকে না।

5. **বর্ষবলয়ের উৎপত্তি** (Formation of annual rings)—বসন্তকালে যখন মুকুল প্রস্ফুটিত হয়, কচি পাতা উৎপন্ন হয় এবং সালোকসংশ্লেষ প্রবলভাবে হয়, তখন



১৬১নং চিত্র—দ্বিবীজপত্রীর কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ করিয়া বর্ষবলয় দেখান হইয়াছে

মাটি হইতে প্রচুর রস সরবরাহ হয়। এইজন্য ক্যাম্বিয়াম এই সময় যে সবল বাহিক গঠন করে, তাহা বড় রন্ধ্রযুক্ত হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে, বিশেষত যখন বৃদ্ধি হইবার সময় প্রায় শেষ হয়, তখন ক্যাম্বিয়ামের কর্মতৎপরতা ক্রমশ কমিয়া যায়। এইজন্য এই সময় প্রচুর স্তম্ভনকলা, প্রধানত কাষ্ঠিক তন্তু, গঠিত হয়। পূর্বোক্ত প্রকার কাষ্ঠকে **বসন্তকাষ্ঠ** (spring wood) ও শেষোক্ত প্রকারকে গ্রীষ্মকাষ্ঠ (summer wood) বলে। ইহাদের কোষের আকৃতি গঠন ও ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শীতকালে ক্যাম্বিয়ামের কর্মতৎপরতা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। আবার বসন্তকাল আসিলে এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি হয়। এইজন্য পর্যায়ক্রমে বসন্তকাষ্ঠ প্রশস্ত বাহিকাযুক্ত এবং গ্রীষ্মকাষ্ঠ কাষ্ঠিক তন্তুযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বসন্তকাষ্ঠ ও গ্রীষ্মকাষ্ঠ উভয়ে মিলিয়া প্রতি বৎসর কাষ্ঠের বৃদ্ধি নির্ণয় করে। এইজন্য বৃক্ষের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ করিলে কতকগুলি বলয় দেখা যায়। এই বলয়গুলিকে **বর্ষবলয়** (annual rings) বলে।

(১৬২নং চিত্র)। বৎসরের পর বৎসর বর্ষবলয় গঠিত হয় এবং উহাদের সংখ্যা গণনা করিয়া বৃক্ষের বয়স নির্ণয় করা যায়। তবে সকল বৃক্ষের বর্ষবলয় থাকে না। যেস্থানে ঋতু পরিবর্তন সুস্পষ্ট নহে সেই স্থানের বৃক্ষের কোন বর্ষবলয় থাকে না। সাধারণত গৌণ ফ্লোয়েমের বসন্ত-ফ্লোয়েম ও গ্রীষ্ম-ফ্লোয়েমের কোন বিভিন্নতা নাই সুতরাং ইহা অবিচ্ছিন্ন ফিতার মত দেখায়।

বর্ষবলয়-গঠন সম্পর্কে দুইটি প্রবাদ (theory) আছে :

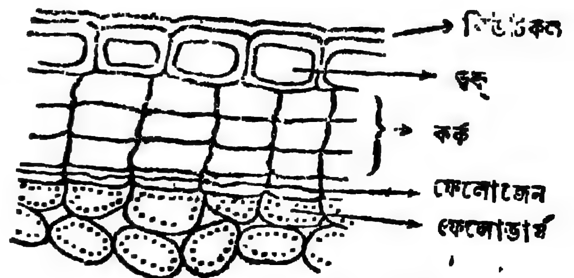
(*a*) **খাদ্যবাদ** (Food theory)—বসন্তকাষ্ঠের বাহিকাগুলি গ্রীষ্মকাষ্ঠের বাহিকাগুলি অপেক্ষা প্রশস্ত ; কারণ বসন্তকালে মাটির রসের পরিমাণ গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা বেশী এবং উহার উচ্চ চাপে নিয়ত সংবহনের জন্য প্রশস্ত বাহিকা আবশ্যক। বাহিকার প্রাচীর স্থিতিস্থাপক, কিন্তু উচ্চ চাপে স্থিতিস্থাপকতা বিনষ্ট হইয়া উহা প্রশস্ত হয়।

(*b*) **স্থানবাদ** (Space theory)—ক্রমাগত নূতন কাষ্ঠ গঠনের ফলে বৃক্ষের ভিতরকার স্থান ক্রমশ কমিয়া যায়. এজন্য যে-সকল বাহিকা পরবর্তীকালে উৎপন্ন হয়, তাহারা ক্রমশ সূক্ষ্ম হয় এবং যাহারা গ্রীষ্মকালে উৎপন্ন হয়, তাহারা সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম হয়। কিন্তু শীতের শেষে যখন কর্ক ও বল্কল ফাটিয়া যায় তখন বৃক্ষের ভিতরকার স্থান বড় হয়, এইজন্য যে-সকল বাহিকা পরবর্তী বসন্তকালে উৎপন্ন হয় তাহারা প্রশস্ত হয়।

নূতন বর্ষবলয় গঠিত হইবার সময় পুরাতন বর্ষবলয়গুলি বাহিরের চাপে কেন্দ্রের দিকে সরিয়া যায়। পুরাতন কোষগুলির সংবহনের ক্ষমতা ক্রমশ বিলুপ্ত হয় এবং অবশেষে ইহাদের মধ্যে ট্যানিন ও অন্যান্য দ্রব্য জমা হইয়া কাল পিণ্ডের মত হয়। কেন্দ্রের এই অংশকে **সারকাষ্ঠ** (duramen) বলে। বাহিরের অংশ যাহাতে তরুণ বর্ষবলয় থাকে তাহা রস সংবহন করে এবং লঘুবর্ণের হয়। ইহাকে **রসবহ কাষ্ঠ** (alburnum) বলে।

(*b*) **বহিঃস্টেলীয় অঞ্চলে** (**In the extrastelar region**— ১৬২নং চিত্র) :

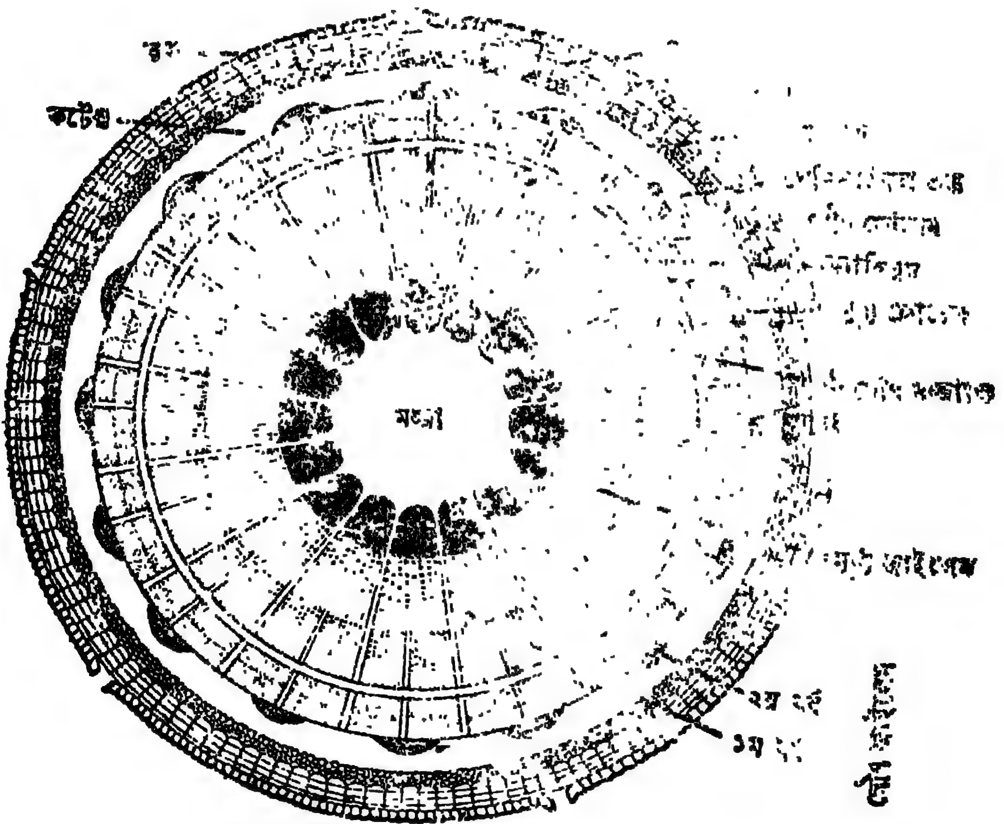
1. **পেরিডার্মের উৎপত্তি** (Formation of periderm)— গৌণ বৃদ্ধির সময় ক্যাম্বিয়ামের কর্মতৎপরতায় জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলা গঠিত হয়। এই নূতন কলা গঠনের সময় বৃক্ষের মধ্যে চাপ সৃষ্টি হয় এবং ইহার ফলে ত্বক ফাটিয়া যাইতে পারে। ইহা প্রতিরোধের জন্য কর্টেক্সে **পেরিডার্ম** (periderm) নামক নূতন গৌণ কলা গঠিত হয়। ইহা **ফেলোজেন** (phellogen) বা **কর্ক ক্যাম্বিয়াম** (cork cambium) নামক ভাজক কলা হইতে উৎপন্ন হয় (১৬৩নং চিত্র)। ফেলোজেন সাধারণত ত্বকের নীচের কোষে উৎপন্ন হয়। ইহা অন্যান্য



১৬২নং চিত্র—পেরিডার্মের উৎপত্তি

কলাতেও উৎপন্ন হইতে পারে ; যথা—উইলো গাছের ত্বকে ক্লিমেটিস্, আঙুর প্রভৃতিতে পেরিসাইকলে এবং আলুর ত্বকে ও অধস্ত্বকে উৎপন্ন হয়। ফেলোজেন বাহিরের দিকে যে-সকল কোষ গঠন করে উহাদের কোষমধ্যস্থ বস্তুসমূহ ক্রমশ সরিয়া যায়। ইহারা বায়ুতে পূর্ণ হয় ও শ্রেণীবদ্ধ থাকিয়া ত্বকের সহিত লম্বভাবে থাকে এবং উত্তমরূপে রক্ষণের জন্য অভেদ্য স্তর গঠন করে। ইহাদের প্রাচীর সুবারিনযুক্ত হয় এবং কোষ-মধ্যবর্তী স্থান থাকে না। এই মৃত কলাকে কর্ক (cork) বলে। কর্ক ও ফেলোজেন উভয়ে মিলিয়া গৌণ ত্বককলা গঠন করে। ফেলোজেন ভিতরের দিকে বহু ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত স্থায়ী কোষ উৎপন্ন করে। ইহাকে ফেলোডার্ম (phelloderm) বলে। ফেলোজেন, ফেলোডার্ম ও কর্ক মিলিত হইয়া পেরিডার্ম (Periderm) গঠন করে।

2. **বল্কলের উৎপত্তি** (Formation of bark)—ত্বকের স্থান প্রথমে পেরিডার্ম অধিকার করে ও পেরিডার্মের স্থান পরে বল্কল অধিকার করে। যখন ফেলোজেন স্তর



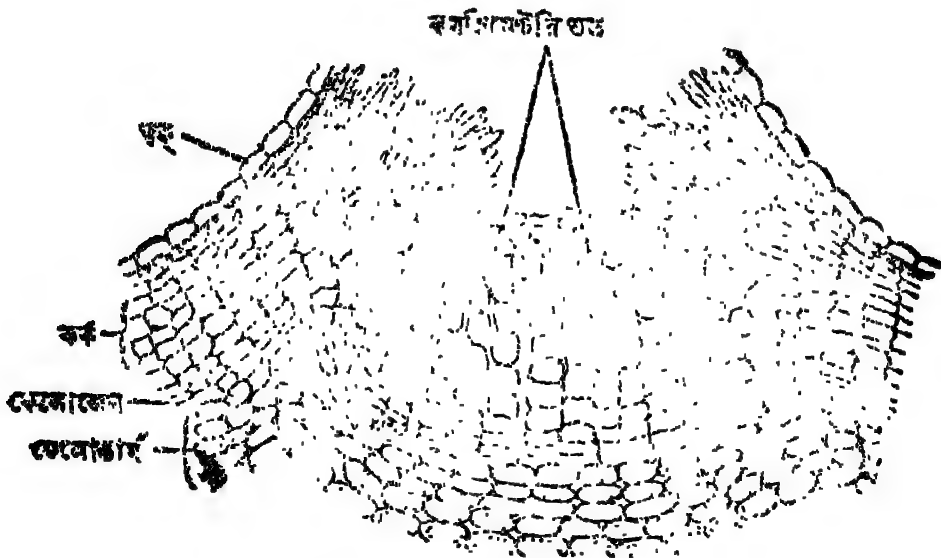
১৬৩নং চিত্র—গৌণ বৃদ্ধির পর কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ

গঠিত হয় তখন বাহিরে কলাগুলি রস পায় না, সুতরাং ইহারা শুষ্ক ও মৃত হয় এইরূপে ফেলোজেনের বাহিরের মৃত কলাকে বল্কল (bark) বলে।

কর্টেক্সের মধ্যে ক্রমাগত ফেলোজেন স্তর উৎপন্নের উপর বল্কলের পরিমাণ নির্ভর করে। প্রাথমিক ফেলোজেন কিছুদিন পরে অক্ষম হয় এবং ভিতর দিকে নূতন ফেলোজেন উৎপন্ন হয়। ইহা নূতন কর্ক উৎপন্ন করে। ফেলোজেন হইতে উৎপন্ন বল্কল যদি আঁইসের মত খসিয়া পড়ে, তবে উহাকে **শল্ক বল্কল** (scale bark) বলে, যথা—পাইন, পেয়ারা, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি। কিন্তু যদি পর্যায়ক্রমিক ফেলোজেন স্তরগুলি নিয়মিত ও বলয়াকার হয়, তবে বল্কল বলয়াকার হয়। এইপ্রকার বল্কলকে **বেষ্টনী বল্কল** (ringed bark) বলে; যথা—আঙুর, ভুর্জপত্র প্রভৃতি। এইরূপে বহুবর্ষজীবী গাছের শাখা প্রথমে ত্বক দ্বারা আবৃত থাকে, কিন্তু প্রথম বৎসরে পেরিডার্ম দ্বারা এবং কয়েক বৎসর পরে বল্কল দ্বারা আবৃত হয়।

কর্ক ও বল্কলের কার্য—(1) ইহা গাছকে তাপ ও শৈত্য হইতে রক্ষা করে। (2) বাতাবকাশবিহীন ও সুবারিনযুক্ত থাকায় ইহা প্রস্বেদন দমন করিতে সক্ষম হয়। (3) কর্কের পরিচলন করিবার শক্তি কম। (4) ইহা পরজীবী ছত্রাক ও ব্যাকটীরিয়ার আক্রমণ রোধ করে।

3. **লেন্টিসেল** (Lenticel—১৬৪নং চিত্র)—পেরিডার্ম ত্বকের স্থান অধিকার করে; সুতরাং পত্ররন্ধ্রের ও উহার কার্যের জন্য পত্ররন্ধ্রের ঠিক নিম্নে অবস্থিত ফেলোজেন



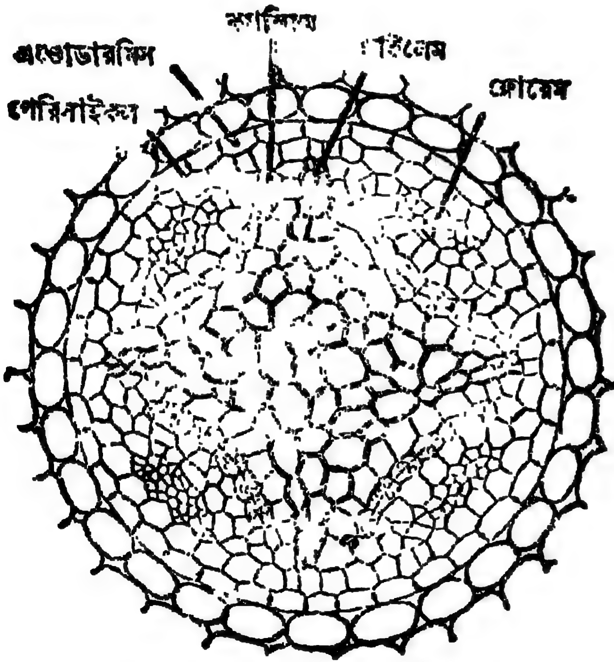
১৬৪নং চিত্র—লেন্টিসেলের দীর্ঘচ্ছেদ

কর্ক উৎপন্ন না করিয়া কতকগুলি শিথিল কলা উৎপন্ন করে। ইহার কোষগুলি পাতলা প্রাচীরযুক্ত, গোলাকার, বায়ুপূর্ণ এবং সুবারিনবিহীন; ইহাদিগকে **কমপ্লিমেন্টারি কোষ** (complementary cells) বলে। ইহাদের সুস্পষ্ট বাতাবকাশ আছে। এই কলার রসস্ফীতি ও বাতাবকাশ থাকার জন্য ইহা কর্ক অপেক্ষা অধিক স্থান অধিকার করে, অবশ্য ইহাদের পূর্ণ পরিণতির জন্য ত্বকের নিম্নের স্থান খুবই কম। এইজন্য ত্বক

শীঘ্রই বিদীর্ণ হয় এবং কমপ্লিমেণ্টারি কোষগুলি বাহির হইয়া পড়ে। এইপ্রকার কমপ্লিমেণ্টারি কোষবিশিষ্ট বিদীর্ণ ত্বককে লেণ্টিসেল (lenticel) বলে। শিথিল কমপ্লিমেণ্টারি কোষগুলি যাহাতে স্থানচ্যুত না হয় সেইজন্য ফেলোজেন একটি ঘনসন্নিবিষ্ট কোষের পর্দা উৎপন্ন করিয়া উহাদিগকে যথাস্থানে ধারণা করিয়া রাখে। লেণ্টিসেলকে বৃক্ষের বল্কলের উপর ডিম্বাকার ক্ষত চিহ্নের মত দেখায়। ইহাকে মূলের ও ফলের উপরও দেখিতে পাওয়া যায়।

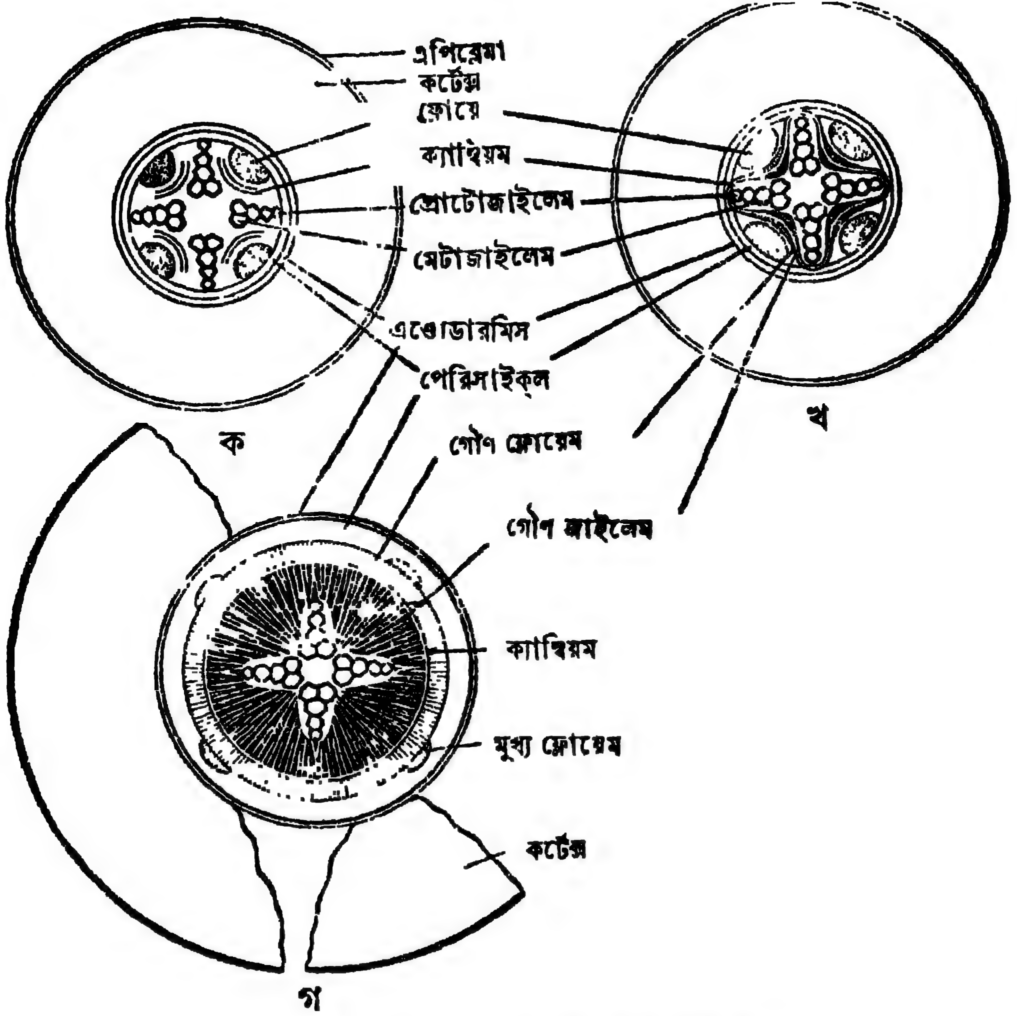
দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলের গৌণ বৃদ্ধি (Secondary Growth in Dicotyledonous Root—১৬৫ ও ১৬৬নং চিত্র)

মূলের গৌণ বৃদ্ধি আরম্ভ হইবার সময় ফ্লোয়েমের নিম্নে অবস্থিত conjunctive tissue বা যোজক কলার কোষগুলি বিভক্ত হয় এবং শীঘ্রই প্রত্যেক ফ্লোয়েমের নিম্নে ক্যাম্বিয়াম নামক একটি ভাজক কলা উৎপন্ন হয়। এইরূপে চারিটি ক্যাম্বিয়াম স্তরের উৎপত্তি হয় (১৬৫নং চিত্র)। প্রত্যেক ক্যাম্বিয়াম স্তর ক্রমশ বিভক্ত হইয়া উভয় দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে; অবশেষে ইহা প্রোটোজাইলেমের নিকটস্থ পেরিসাইকেলের সহিত মিলিত হয়। এখন একস্তর যুক্ত পেরিসাইকেল বিভক্ত হইয়া বহুস্তর-বিশিষ্ট হয় এবং উহার সর্বাপেক্ষা নিম্নের স্তরের কোষগুলি নিয়মিতরূপে বিভক্ত হইয়া নূতন ক্যাম্বিয়াম স্তর গঠন করে। এই নূতন ক্যাম্বিয়াম স্তরগুলি পূর্বেকার ক্যাম্বিয়াম স্তরের সহিত সংযুক্ত হইয়া একটি সম্পূর্ণ তরঙ্গায়িত ক্যাম্বিয়াম স্তর গঠন করে এবং ইহা ফ্লোয়েমের নিম্নে ও জাইলেমের উপরে থাকে। এখন ক্যাম্বিয়াম স্তর ক্রমশ বিভক্ত হইয়া ভিতর দিকে গৌণ জাইলেম ও বাহিরের দিকে গৌণ ফ্লোয়েম উৎপন্ন করে। গৌণ জাইলেমের পরিমাণ গৌণ ফ্লোয়েম অপেক্ষা অধিক বলিয়া উহার চাপে ক্যাম্বিয়াম স্তর বাহিরের দিকে সরিয়া যায় এবং উহা কাণ্ডমধ্যস্থ গোলাকার বেষ্টনীর মত (১৬৬নং চিত্র) হয়। সময় সময় ক্যাম্বিয়াম গৌণ জাইলেম ও ফ্লোয়েম উৎপন্ন না করিয়া কতকগুলি প্যারেনকাইমা



১৬৫নং চিত্র—দ্বিবীজপত্রী মূলের গৌণ বৃদ্ধি

কোষ উৎপন্ন করে; ইহাদিগকে প্রধান মজ্জাংশু (main medullarys) বলে। ইহারা প্রোটোজাইলেমের অগ্রভাগ হইতে উৎপন্ন হয়। মূলে সাধারণত মজ্জা নাই বলিয়া প্রাথমিক মজ্জাংশু থাকে না। গৌণ ফ্লোয়েমের চাপে প্রাথমিক ফ্লোয়েম ক্রমশ

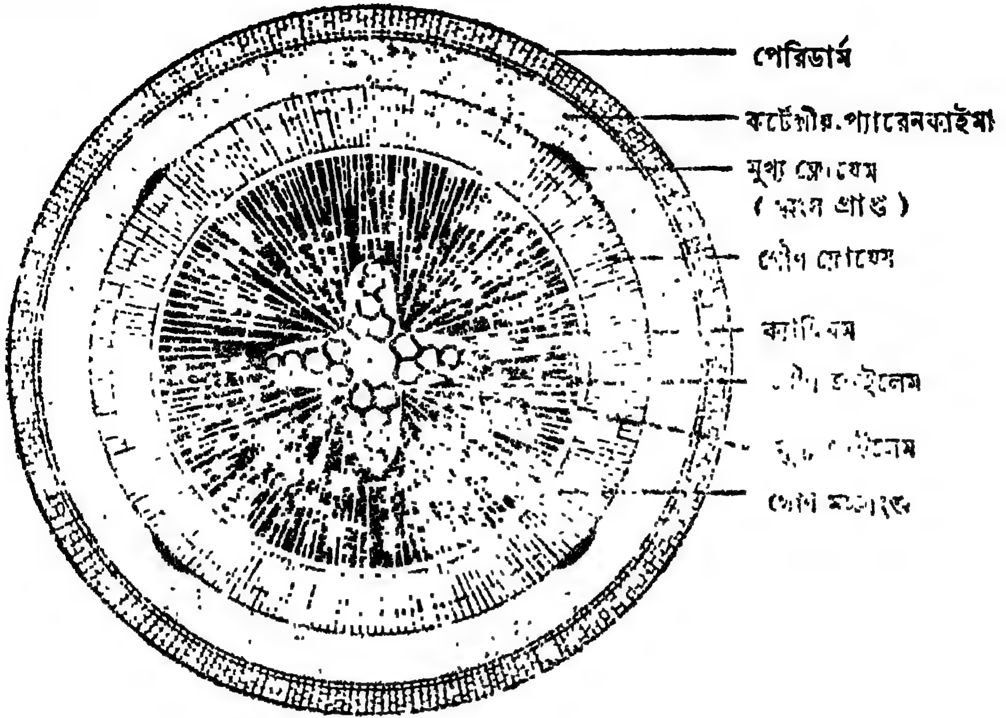


১৬৬নং চিত্র—দ্বিবীজপত্রীর মূলে গৌণ বৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থা

পরিধির দিকে চলিয়া যায় ও সংকুচিত হয় এবং অবশেষে ইহার বাস্টতন্তু ব্যতীত অপর সকল অংশই সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। প্রাথমিক ফ্লোয়েমের বাস্টতন্তুগুলি মজ্জাংশুগুলির মধ্যস্থলে খণ্ডভাবে অবস্থান করে। মেটাজাইলেম (বা গৌণ কাষ্ঠ) মূলের কেন্দ্রস্থলে এবং প্রোটোজাইলেম বাহিরের দিকে থাকে, কারণ, মেটাজাইলেম কেন্দ্রের দিকে ও প্রোটোজাইলেম বাহিরের দিকে উৎপন্ন হয়।

মূলের পুরাতন অংশগুলি কাণ্ডের ন্যায় পেরিডার্ম নামকরক্ষণশীল কলার দ্বারা আবৃত হয় (১৬৭নং চিত্র)। তবে ফেলোজেন সাধারণত পেরিসাইকেল হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা কেবলমাত্র বাহিরের দিকে কর্ক উৎপন্ন করে। প্রথমে যে-বল্কল উৎপন্ন হয় তাহা বেশ স্থূল হয়; কারণ, কর্টেক্স ও এণ্ডোডারমিসের কোষগুলি মৃত হইয়া বল্কল

গঠন করিতে সাহায্য করে ; কিন্তু ইহা শীঘ্রই খসিয়া পড়ে। সুতরাং যে-বল্কলগুলি পরে উৎপন্ন হয়, তাহারা ক্রমশ সূক্ষ্ম হয়।



১৬৭নং চিত্র—গৌণ বৃদ্ধির পর মূলের প্রস্থচ্ছেদ

গৌণ বৃদ্ধির ব্যতিক্রম (Anomalous Growth)

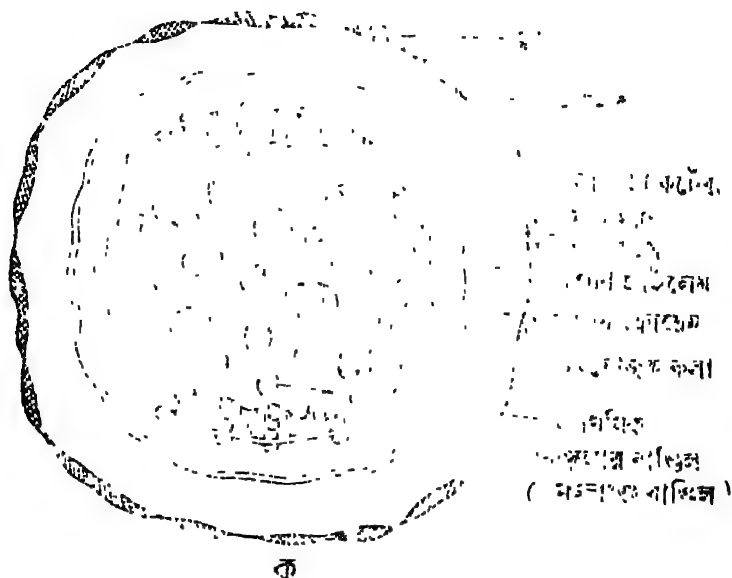
কয়েকটি ব্যক্তবীজী এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, সাধারণ পদ্ধতিতে গৌণ বৃদ্ধি না হইয়া, কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহাকে অনিয়ত গৌণ বৃদ্ধি (anomalous secondary growth) বলে। এইপ্রকার গৌণ বৃদ্ধি সাধারণত রোহিনী, কাষ্ঠল লতা, ভাণ্ডারমূল প্রভৃতি স্ফীত অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত প্রণালীতে গৌণ বৃদ্ধির ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

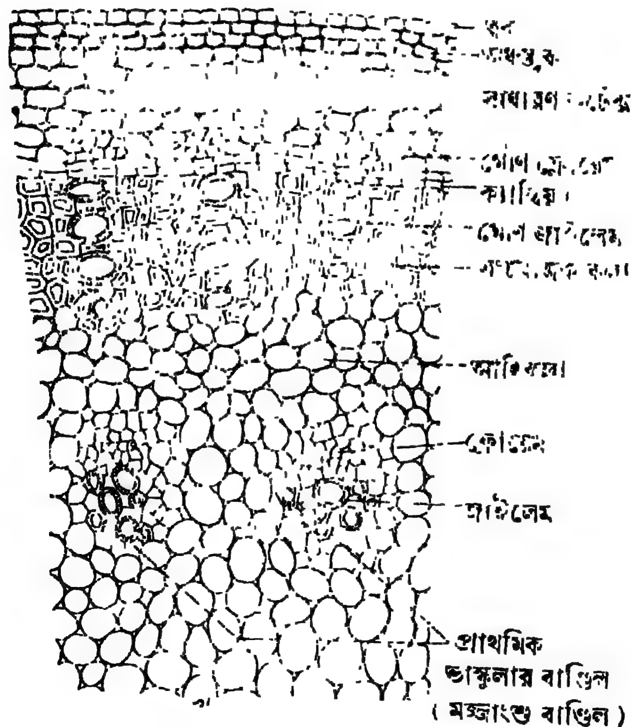
A. ক্যাম্বিয়াম প্রথমত স্বাভাবিকরূপে কার্য করে কিন্তু অনিয়ত হইয়া গৌণ-ফ্লোয়েমের পরিমাণ সর্বত্র সমভাবে উৎপন্ন করে না। এইরূপে প্রণালী দুই প্রকারের হইয়া থাকে। যথা—

(*a*) ক্যাম্বিয়ামের এইরূপ অনিয়ত কার্যের ফলে, কোন কোন স্থানে জাইলেমের পরিমাণ ফ্লোয়েম অপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হয় এবং অন্যত্র ফ্লোয়েমের পরিমাণ জাইলেম অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহার ফলে বেলনাকার জাইলেম খণ্ডিত হইয়া ফ্লোয়েমের সহিত একান্তররূপে অবস্থান করে। এইরূপ প্রণালী বিগনোনিয়াসী গোত্রীয় উদ্ভিদে (Fam. Bignoniaceae) দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে ক্যাম্বিয়ামের কার্য স্বল্প হইলে অথবা জাইলেম প্যারেনকাইমার বৃদ্ধির ফলে জাইলেম

বলয়টি অনিয়ত খণ্ডে বিভক্ত হইলে, অনুরূপ প্রনালী দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা, বাউহিনীয়া (Bauhinia) এবং অপর বিগনোনিয়াসী গোত্রীয় উদ্ভিদ।

(*b*) ক্যাম্বিয়ামের অস্বাভাবিক কার্যের ফলে, গৌণ ফ্লোয়েম সম্পূর্ণরূপে গৌণ জাইলেমের মধ্যে অবস্থান করে। এইরূপ ফ্লোয়েমকে জাইলেম মধ্যক ফ্লোয়েম (intra-





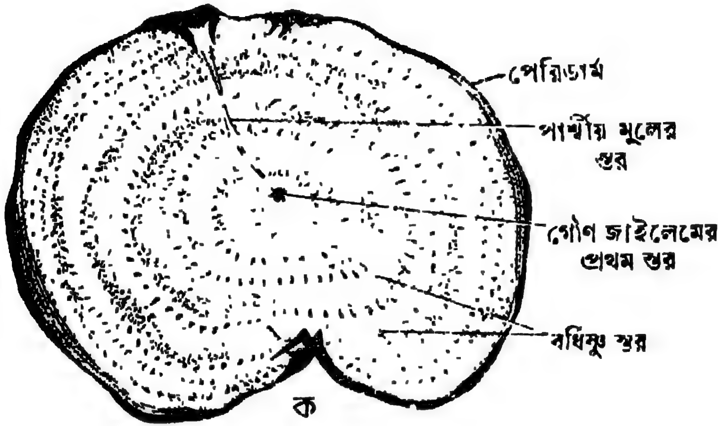
১৬৮নং চিত্র——পুনর্নবা কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ :
(ক) সম্পূর্ণ প্রস্থচ্ছেদ, (খ) আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

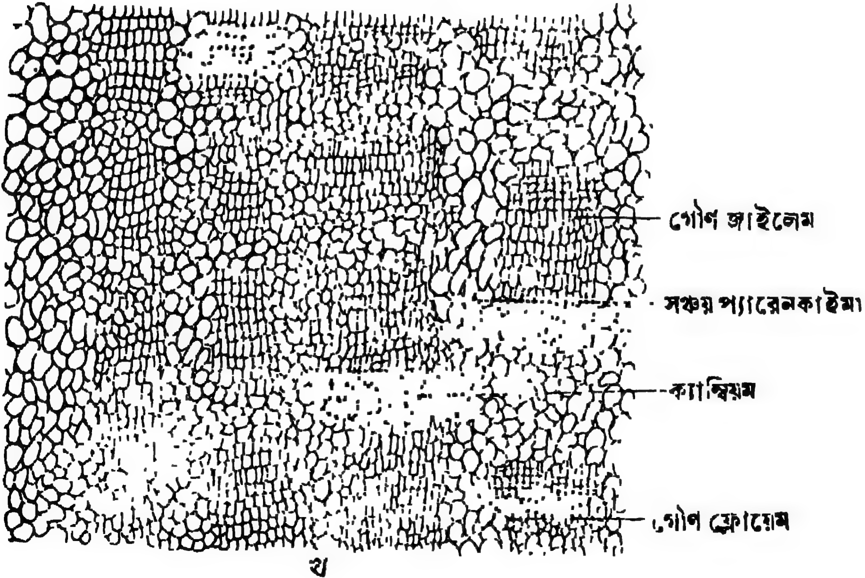
xylary or included phloem) বলে। ক্যাম্বিয়ামের অংশ নিম্নের দিকে গৌণ

জাইলেমের পরিবর্তে গৌণ ফ্লোয়েম উৎপন্ন করে, কিন্তু শীঘ্রই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় গৌণ জাইলেম গঠন করিতে থাকে। ফলে গৌণ ফ্লোয়েম গৌণ জাইলেমের মধ্যে নিহিত থাকে; যথা—কমব্রেটাম (Combretum) ইত্যাদি।

B. স্বাভাবিক স্থানে ক্যাম্বিয়াম উৎপন্ন না হইয়া, ক্যাম্বিয়ামের খণ্ড অস্বাভাবিক স্থানে গঠিত হয় অথবা আদি ক্যাম্বিয়াম স্তরটি বাহিরের দিকে পর্যায়ক্রমে নূতন ক্যাম্বিয়াম স্তর উৎপন্ন করিতে থাকে। এই প্রক্রিয়া দুই প্রকারের ঃ

(*a*) আদি ক্যাম্বিয়াম স্তরটি কয়েকটি খণ্ডে অবস্থান করে এবং কিছু সংখ্যক প্রাথমিক কলাকে আবৃত করিয়া থাকে। এই ক্যাম্বিয়াম খণ্ডগুলি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়





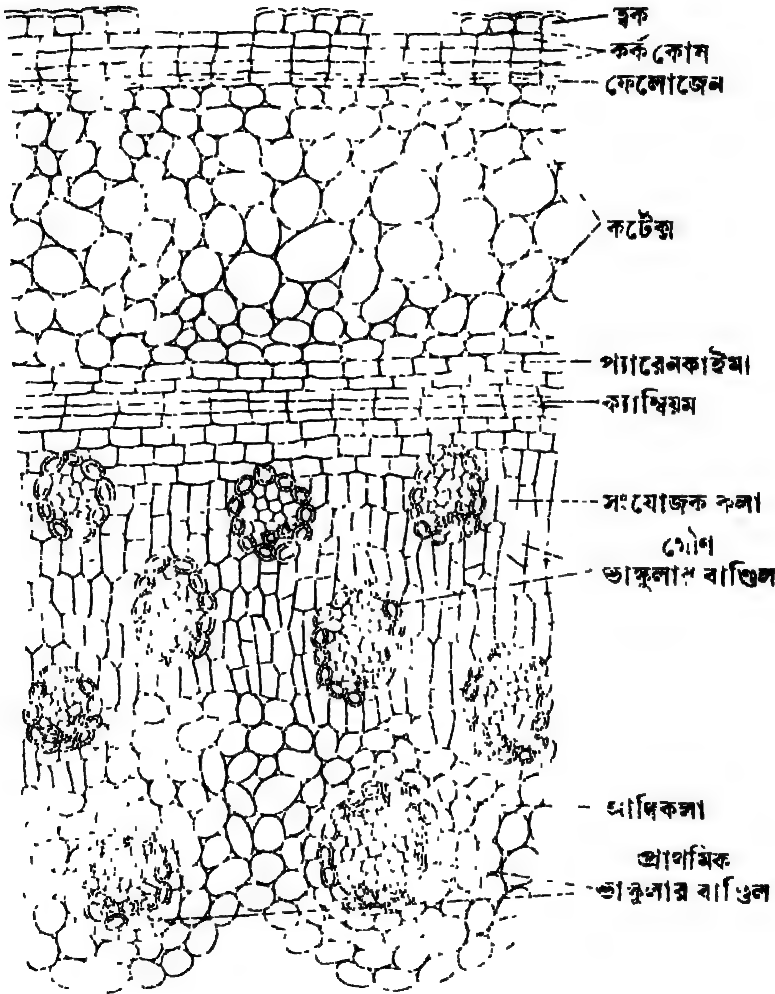
১৬৯নং চিত্র—বীটের মূলের প্রস্থচ্ছেদ : (ক) সম্পূর্ণ প্রস্থচ্ছেদ ; (খ) আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

বলয় আকারে গৌণ জাইলেম ও গৌণ ফ্লোয়েম উৎপন্ন করে। এইরূপে কাণ্ডটিকে কতকগুলি কাণ্ডযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; যথা, সারজানিয়া (Serjania)।

(*b*) আদি ক্যাম্বিয়াম স্তরটি স্বাভাবিক স্থানে উৎপন্ন হয়; কিন্তু শীঘ্রই বহির্ভাগে

অপর একটি ক্যাম্বিয়াম স্তর প্রতিস্থাপন করে যাহা অনুরূপ প্রক্রিয়ায় গৌণ জাইলেম ও ফ্লোয়েম সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়া কয়েকবার সংঘটিত হইতে পারে। ইহার ফলে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম অবিচ্ছিন্ন বলয় আকারে অথবা বিচ্ছিন্ন বাণ্ডিল আকারে গঠিত হয়; যথা, পুনর্নবা (Boerhaavia—১৬৮নং চিত্র), বেথুয়া শাক (Chenopodium) প্রভৃতি।

কর্টেক্স অথবা মজ্জাংশুতে উৎপন্ন বাণ্ডিল হইতেও অন্তর্গঠনের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, বীট (১৬৯নং চিত্র), নিকটাজিনেসী গোত্রীয় উদ্ভিদ (Fam. Nyctaginaceae) প্রভৃতি।



১৭০নং চিত্র—ড্রাসিনার কাণ্ডের আংশিক প্রস্থচ্ছেদ

বীটের মূলের ক্ষেত্রে, প্রথম ক্যাম্বিয়াম, প্রাথমিক জাইলেমের নিকট বাণ্ডিলের বলয় গঠন করে কিন্তু পরে পর্যায়ক্রমে বহির্ভাগে ক্যাম্বিয়াম উৎপন্ন করিতে থাকে যাহা হইতে ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল এবং প্রচুর প্যারেনকাইমা কোষ গঠিত হইতে থাকে। এই ক্যাম্বিয়াম স্তরগুলি বহুদিন যাবৎ সক্রিয় থাকে।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের গৌণ বৃদ্ধি (Secondary Growth in Monocotyledonous Stem—১৭০নং চিত্র)

শ্রেণী হিসাবে একবীজপত্রী উদ্ভিদে কোন গৌণবৃদ্ধি হয় না। উদ্ভিদদেহ প্রাথমিক কলাদ্বারাই গঠিত হয়। তবে চিহ্ন হিসাবে কতকগুলি গণের মধ্যে পত্রমূলের নিকট পর্বস্থানে ক্যাম্বিয়ামের কিছু কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া কিছু কাষ্ঠল এবং বৃহৎ শ্রেণীর, যেমন লিলিয়েসী গোত্রভুক্ত উদ্ভিদ, যথা ···

ড্রাসিনা (Dracaena), ইউক্কা (Yucca) অ্যালো (Aloe) প্রভৃতি কয়েকটি একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে বিশেষ ধরনের গৌণ বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায়, কাণ্ডের কয়েকটি কোষস্তরের নিম্নে এবং অন্য কলার মধ্যে গৌণ ভাজক কলা (secondary meristem) রূপে ক্যাম্বিয়াম স্তর উৎপন্ন হয়। এই ক্যাম্বিয়াম স্তর বহির্ভাগে প্যারেনকাইমা কোষ এবং ভিতরের দিকে গৌণ ভাস্কুলার বাণ্ডিল ও যোজক কলা উৎপন্ন করে। পরিণত গৌণ ভাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি লেপ্টোকেন্দ্রীয়

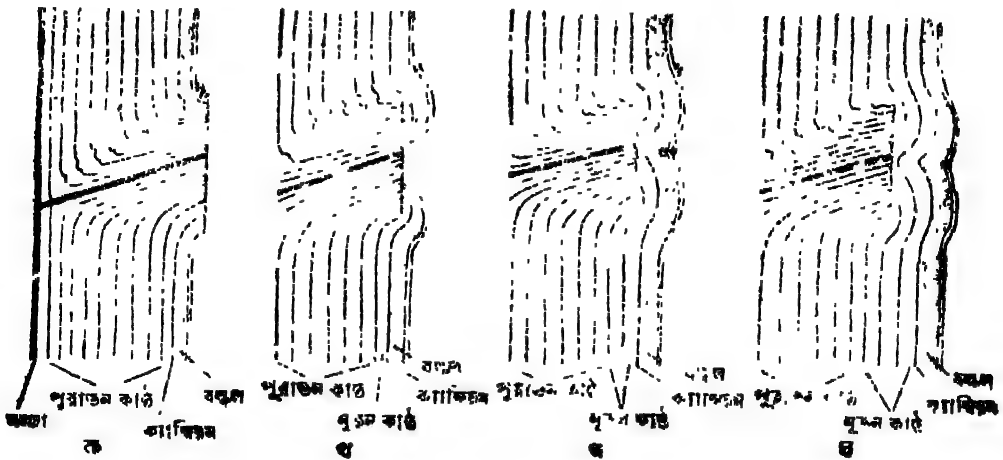
---

৭ ক্ষতপূরণ, টাইলোসিস এবং পত্রপতন
(Healing of Wounds, Tylosis and Leaf-Fall)

ক্ষতপূরণ (Healing of wounds—১৭১নং চিত্র)—উদ্ভিদের কোন অঙ্গ অথবা অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হইলে নিম্নলিখিত প্রণালীতে ইহার পূরণ হইয়া থাকে ; যথা :

(a) থ্যালোফাইটা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, কোন অংশ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, উহা পুনঃসৃষ্টির দ্বারা পূরিত হয়।

(b) উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, আঘাতপ্রাপ্ত কোষগুলি মৃত ও শুষ্ক হইয়া পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে। নিম্নস্থ কোষগুলি সুবেরিনযুক্ত হইয়া আভ্যন্তরীণ কোষগুলিকে শুষ্কতা হইতে রক্ষা করে।



১৭১নং চিত্র—ক্ষতপূরণের বিভিন্ন অবস্থা

(c) ক্ষীরতন্তু (Laticiferous tissue) হইতে তরুক্ষীর নিঃসৃত হইয়া জমাট বাঁধিলে ক্ষতস্থানটি আবৃত হয়।

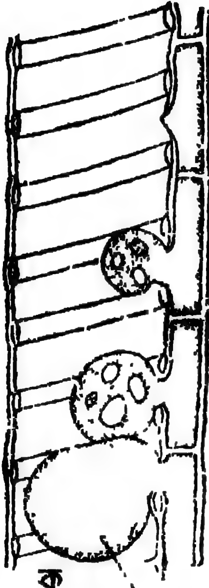
(d) কাণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হইলে, বাহির্ভাগের সুস্থ জীবিত কর্টেক্সের কোষগুলি একটি ভাজক কলা আবরণ অর্থাৎ ফেলোজেন (Phellogen) সৃষ্টি করে যাহা বহির্ভাগে একটি কর্কের স্তর (cork) গঠন করিয়া ভিতরের অংশকে রক্ষা করে।

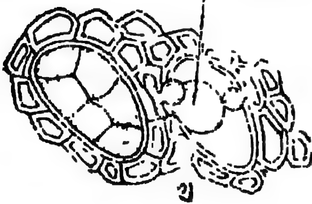
(e) কাষ্ঠল উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, ক্ষত গভীর হইলে, ক্ষতস্থানের নিম্নে অবস্থিত জীবিত কোষগুলি ভাজক কলারূপে পরিণত হইয়া ক্যালাস (callus) নামক প্যারেনকাইমা কোষ উৎপন্ন করে যাহা ক্ষতস্থানটি আবৃত করে। পরে বহির্ভাগে একটি কর্কের স্তর

গঠন করিয়া ক্ষতস্থানটি পূরণ করে। কিন্তু ক্যাম্বিয়াম পর্যন্ত যদি গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তখন ক্যালাস্ কোষে নূতন ক্যাম্বিয়াম উৎপন্ন হয় এবং ইহা অক্ষত ক্যাম্বিয়ামের সহিত যুক্ত হয়।

বৃক্ষের কাণ্ড বিচ্ছিন্ন অথবা কর্তিত হইলে, ক্ষতস্থানের মুক্ত প্রান্তে অবস্থিত ক্যাম্বিয়াম স্তর হইতে ক্যালাস্ উৎপন্ন হয়। ইহা ক্রমে গৌণ কোষ উৎপন্ন করিয়া ক্ষতস্থানটিকে আবৃত করে এবং ইহার মধ্যে ক্ষতস্থানটি সম্পূর্ণরূপে নিহিত থাকে। এইরূপেই বৃক্ষের গ্রন্থির (knots) উৎপত্তি হয় যাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ষতস্থান পূরিত না হইলে আহত কোষগুলি ছত্রাক, ব্যাক্টিরিয়া প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য উদ্যানপালকগণ ক্যালাস্ গঠনের পূর্বেই ক্ষতস্থানটিকে সিমেন্ট, আলকাতরা, মোম প্রভৃতির দ্বারা লেপন করিয়া বন্ধ করেন।





১৭২নং চিত্র টাইলোসিস

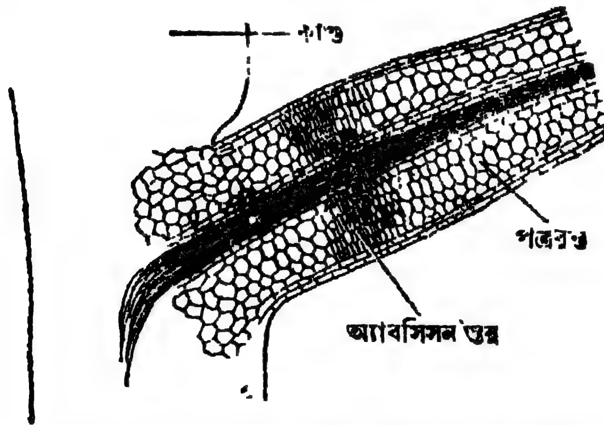
টাইলোসিস (Tyloses—১৭২নং চিত্র) —যখন সরস কাষ্ঠ (alburnum or sap wood) সার কাষ্ঠে (duramen or heart wood) পরিবর্তিত হয় তখন বাহিকা (trachea) সংলগ্ন জীবিত কোষগুলি বর্ধিত হইয়া বাহিকার গহ্বরে প্রবেশ করে এবং তথায় বিভক্ত হইতে থাকে। এইরূপ বাহিকা-মধ্যস্থ বেলুনের ন্যায় উপবৃদ্ধি গহ্বরটিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে এবং ইহাকে **টাইলোসিস** বা **ট্র্যাকিয়াল প্লাগ** (tylosis or tracheal plug) বলে। ইহা জাইলেম প্যারেনকাইমার অথবা মজ্জাংশুর কোষমধ্যস্থিত অর্ধ-সপাড় কূপের (half-bordered pits) গহ্বরের ঝিল্লীগুলি প্রসারিত হইয়া গঠিত হয়। ইহাকে সাধারণত গুপ্তবীজী উদ্ভিদের জাইলেমে দেখিতে পাওয়া যায়।

পত্রপতন (Leaf-fall—১৭৪নং চিত্র) —আমাদের দেশে, সাধারণত শীতকালে, প্রস্বেদন-ক্ষেত্র হ্রাসের (reduction of transpiring surface) প্রয়োজনীয়তার জন্য জলশোষণ-প্রণালীও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে পত্রবৃন্তের নিম্নে ফেলোজেন স্তর গঠিত হইয়া ইহাকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে। এই ফেলোজেন স্তরটি কাণ্ডস্থিত কর্কের (cork) সহিত অবিচ্ছিন্ন কর্কের স্তরের সৃষ্টি করে। যেহেতু কর্ক দ্রবণীয় খাদ্যপরিবহণে অক্ষম সুতরাং বহির্ভাগের সকল প্যারেনকাইমা কোষগুলিই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই বিনষ্ট কোষস্তরটিকে **যোজক স্তর** (abscission layer) বলে।

যোজকস্তর পত্রবৃন্তের সবথেকে দুর্বলতম স্থান। এই স্থান বাহির দিক হইতে খাঁজকাটা মত দেখিতে হয়। অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে পার্শ্বস্থ ত্বক-কোষ হইতে বর্ণের পার্থক্য দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। এই অঞ্চলে ভ্যাস্কুলারবাণ্ডিলের পরিধি সাধারণত কম থাকে ; স্ক্লেরেনকাইমা প্রায় থাকে না এবং কোলেনকাইমা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কোন কোন প্যারেনকাইমা কোষে ঘন সাইটোপ্লাজম সন্নিবিষ্ট হইতে দেখা যায়। যোজক-স্তরের কোষগুলি তাহার উপরের ও নীচের স্তরের কোষ হইতে আকৃতি ও গঠনের দিক হইতে ভিন্ন ধরনের হয়। ঐ সকল কোষে প্রচুর পরিমাণ স্টার্চ দানা থাকে এবং কোষ-গুলি আকারে খুব ছোট হয়। যোজকস্তরের নীচের দিকে ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলের প্রাথমিক কলাগুলি টাইলোসিস দ্বারা বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু পত্রে রসস্ফীতি রক্ষা করিবার জন্য গৌণ কলাগুলির মাধ্যমে রস সংবহন অব্যাহত থাকে।

পত্র পতনের কিছু পূর্বে কোষের মধ্যপর্দা, এবং বাহিরের কোষ প্রাচীর স্ফীত হয় এবং ক্রমশ আঠাল পদার্থে পরিণত হয়। অবশেষে, পতনের পূর্বে, সম্পূর্ণ গলিয়া যায়।

কাণ্ড হইতে নির্গত ভ্যাস্কুলার কোষদ্বারাই পাতাটি কাণ্ডের সহিত সংলগ্ন থাকে, কিন্তু যোজক স্তরের ভ্যাস্কুলার কোষগুলি বিচ্ছিন্ন হইলে পাতাটি বৃন্তের ভরে অথবা বায়ুপ্রবাহের দ্বারা ভূমিতে পতিত হয়। এই স্থানের ক্ষতচিহ্নটি শুকাইয়া যায় অথবা



১৭৩নং চিত্র—পত্রপতনের সময় যোজক স্তরের উৎপত্তি

উন্মুক্ত স্থানটিকে পূরণ করিবার জন্য নিম্ন দিকে অবস্থিত ভাজক কলা হইতে কর্ক উৎপন্ন হয়। চিহ্নিত স্থানের বাহিকাগুলি গঁদ অথবা মিউসিলেজ (mucilage) দ্বারা আবদ্ধ হয়। পত্রপতনের পূর্বে বর্জ্য পদার্থগুলি (waste products) পাতায় পরিবাহিত হয় এবং পত্রপতনের সাথে উহারাও পরিত্যক্ত হয়।

———

৮ স্টেল ও উহাদের ক্রমবিকাশ

(Stele and their evolution)

মূল ও কাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত ভ্যাস্কুলার কলার দ্বারা গঠিত স্তম্ভকে **স্টেল** (Stele) বলে। ইহা খাদ্য সংবহনে সহায়তা করে ; অন্যান্য কলাকে যথাযথ ধারণ করে ও উদ্ভিদদেহে দৃঢ়তা প্রদান করে। **ভ্যান টাইঘেম** (Van Tighem) নামক বিশেষজ্ঞের মতে স্টেল বলিতে কেবলমাত্র ভ্যাস্কুলার কলা বুঝায় না ; পরন্তু ইহা ভ্যাস্কুলার কলা, আদি কলা, পেরিসাইকল মজ্জা ও মজ্জাংশু লইয়া গঠিত। সাধারণত স্টেলকে দেহের অন্যান্য কলা হইতে এণ্ডোডারমিস দ্বারা পৃথক করা হয়। এণ্ডোডারমিসের বহির্ভাগে অবস্থিত অঞ্চলকে **বহিঃস্টেলীয় অঞ্চল** (extra-stelar region) বলে এবং ভিতরের অঞ্চলকে **অন্তঃস্টেলীয় অঞ্চল** (intra stelar region) বলে। অতিশয় আদি স্টেল হইতে আরম্ভ করিয়া উহার ক্রমবিকাশ পদ্ধতি নিম্নে আলোচিত হইল :

1. **প্রোটোস্টেল** (Protostele)—ইহা অতিশয় আদি ও সরল প্রকৃতির স্টেল। এই ক্ষেত্রে জাইলেম স্তম্ভ নিরেট ও কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং ফ্লোয়েম দ্বারা বেষ্টিত ও উহাদের চারিদিকে একটি পেরিসাইকলের স্তর আছে। প্রোটোস্টেলের বিকাশ তিন প্রকার :

(a) **হ্যাপ্লোস্টেল** (Haplostele)—জাইলেম স্তম্ভটি গোলাকার ও মসৃণ এবং সমকেন্দ্রীয় ফ্লোয়েম স্তর দ্বারা বেষ্টিত, যথা— লাইগোডিয়াম (Lygodium), সেলাজিনেলা ক্রাউসিয়ানা (Selaginella kraussiana), লাইকোপোডিয়াম সারনুয়াম (Lycopodium cernuum) প্রভৃতি।

(b) **অ্যাক্টিনোস্টেল** (Actinostele)—জাইলেম স্তম্ভটি খাঁজকাটা রশ্মির আকার ধারণ করে এবং উহার রশ্মিগুলির অংশের সহিত ফ্লোয়েম পর্যায়ক্রমে অবস্থান করে ; যথা— সাইলোটাম (Psilotum), লাইকোপোডিয়াম সেরেটাম (Lycopodium serratum), আইসোইটিস (Isoetes) প্রভৃতি।

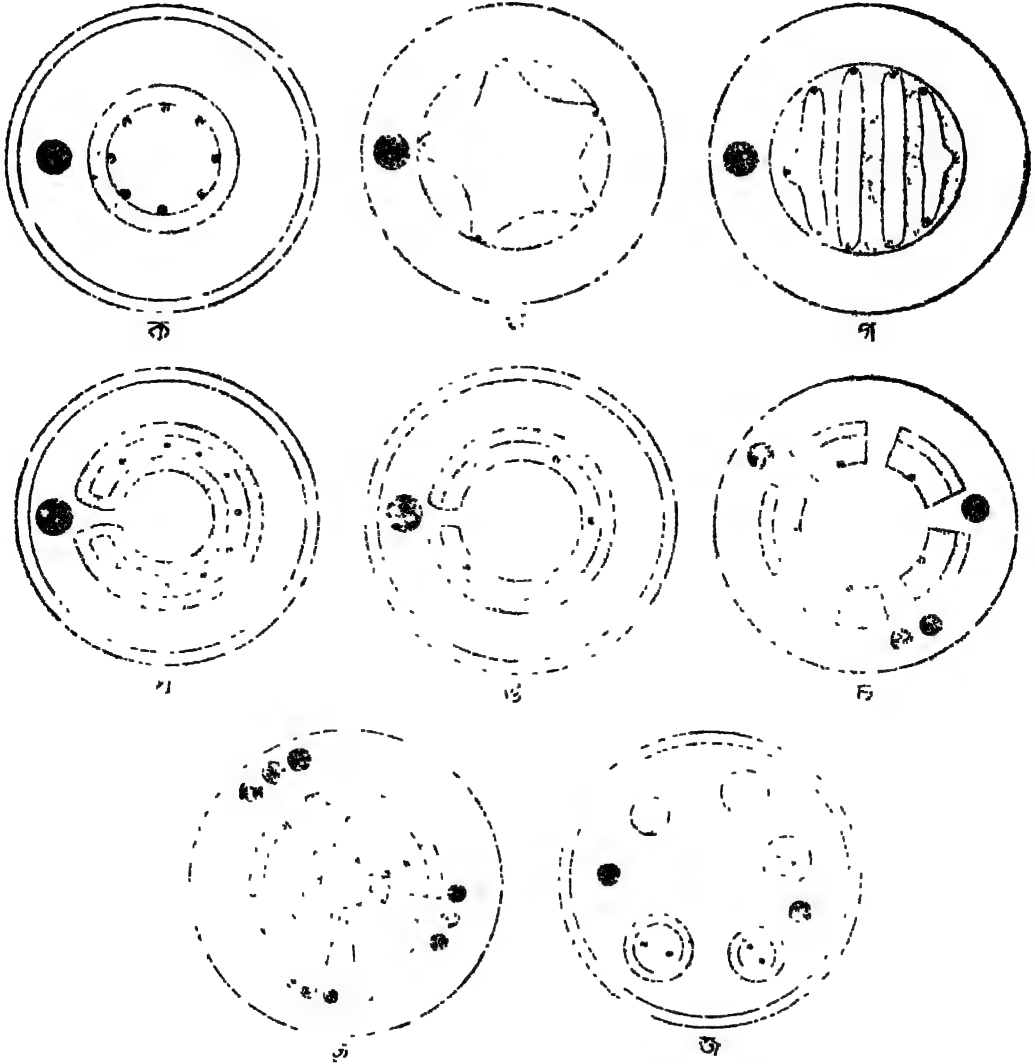
(c) **প্লেক্টোস্টেল** (Plectostele)—জাইলেম স্তম্ভটি প্লেটের ন্যায় অংশে বিভক্ত হইয়া পরস্পর প্রায় সমান্তরাল অবস্থান করে এবং ফ্লোয়েম জাইলেম প্লেটের সহিত পর্যায়ক্রমে থাকে ; যথা— লাইকোপোডিয়াম ভলিউবাইল (Lycopodium volubile), লা. ক্ল্যাভাটাম (L. clavatum) প্রভৃতি।

2. **সাইফনোস্টেল** (Siphonostele)—ক্রমবিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে জাইলেম স্তম্ভের কেন্দ্রাভিমুখে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারের প্যারেনকাইমা কোষ উৎপন্ন হয়। ইহাকেই মজ্জা গঠনের প্রারম্ভিক অবস্থা বলা হয়। মজ্জা সমেত এই প্রকার স্টেলকে **সাইফনোস্টেল** (Siphonostele) বলে। ইহা দুই প্রকারের হইয়া থাকে :

(*a*) **এক্টোফ্লোয়িক** (Ectophloic)—কেন্দ্রস্থলে মজ্জা থাকে এবং বহির্ভাগে একটি বেলনাকার ফ্লোয়েমের স্তর থাকে ; বট্রাইচিয়াম (Botrychium) ও সাধারণ বীজজ উদ্ভিদ।

(*b*) **অ্যাম্ফিফ্লোয়িক (Amphiphloic)**—কেন্দ্রস্থলে মজ্জা থাকে এবং বেলনাকার জাইলেম স্তরের উভয় পার্শ্বে ফ্লোয়েমের স্তর থাকে ; যথা—মার্শিলিয়া (Marsilea)।

(*c*) **ইউস্টেলিক (Eustelic)**—মজ্জা সমেত ফাঁপা ভাস্কুলার বলয়টি কতকগুলি সমপার্শ্বীয় (collateral) বান্ডলের বিভক্ত হয় এবং ইহারা সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে ; যথা, ইকুইজিটাম (Equisetum)।



৭৪নং চিত্র—বিভিন্ন প্রকার স্টেল : (ক) প্রোটোস্টেল, (খ) অ্যাক্টিনোস্টেল, (গ) প্লেক্টোস্টেল, (ঘ) অ্যাম্ফিফ্লোয়িক সাইফনোস্টেল, (ঙ) এক্টোফ্লোয়িক সাইফনোস্টেল, (চ) ডিক্টিওস্টেল, (ছ) পলিসাইক্লিক ডিক্টিওস্টেল, (জ) পলিস্টেল

3. **সলেনোস্টেল (Solenostele)**—ইহা এক প্রকার সাইফনোস্টেল কিন্তু ইহাতে একটি মাত্র পত্রাবকাশ (leaf gap) দেখা যায়। সলেনোস্টেল এক্টোফ্লোয়িক অথবা অ্যাম্ফিফ্লোয়িক হইতে পারে।

4. **ডিকটিওস্টেল** (Ditcyostele)—সাইফনোস্টেলে একাধিক পত্রাবকাশ থাকিলে ইহাকে **ডিকটিওস্টেল** (Dictyostele) বলে। এই ক্ষেত্রে পত্রাবকাশগুলির মধ্যবর্তী ভ্যাস্কুলার অঞ্চলকে **মেরিস্টেল** (meristele) বলে।

ডিকটিওস্টেলকে কখনও কখনও **বহুখণ্ডিত সাইফনোস্টেল** (much dissected siphonostele) নামেও অভিহিত করা হয়। অফিওগ্লসাম (Ophioglossum) নামক ফার্ন ও কয়েকটি বীরুৎ শ্রেণীর গুপ্তবীজী উদ্ভিদ (angiosperm) হইল ইহার উদাহরণ।

5. **পলিসাইক্লিক স্টেল** (Polycyclic stele)—যখন একাধিক স্টেল সমকেন্দ্রীক বিভিন্ন স্তরে সজ্জিত থাকে তখন ইহাকে **পলিসাইক্লিক স্টেল** (Polycyclic stele) বলে। ম্যাটনিয়া পেকটিনাটা (Matonia pectinata), টেরিডিয়াম অ্যাকুইলিনাম (Pteridium aquilinum) প্রভৃতি হইল ইহার উদাহরণ।

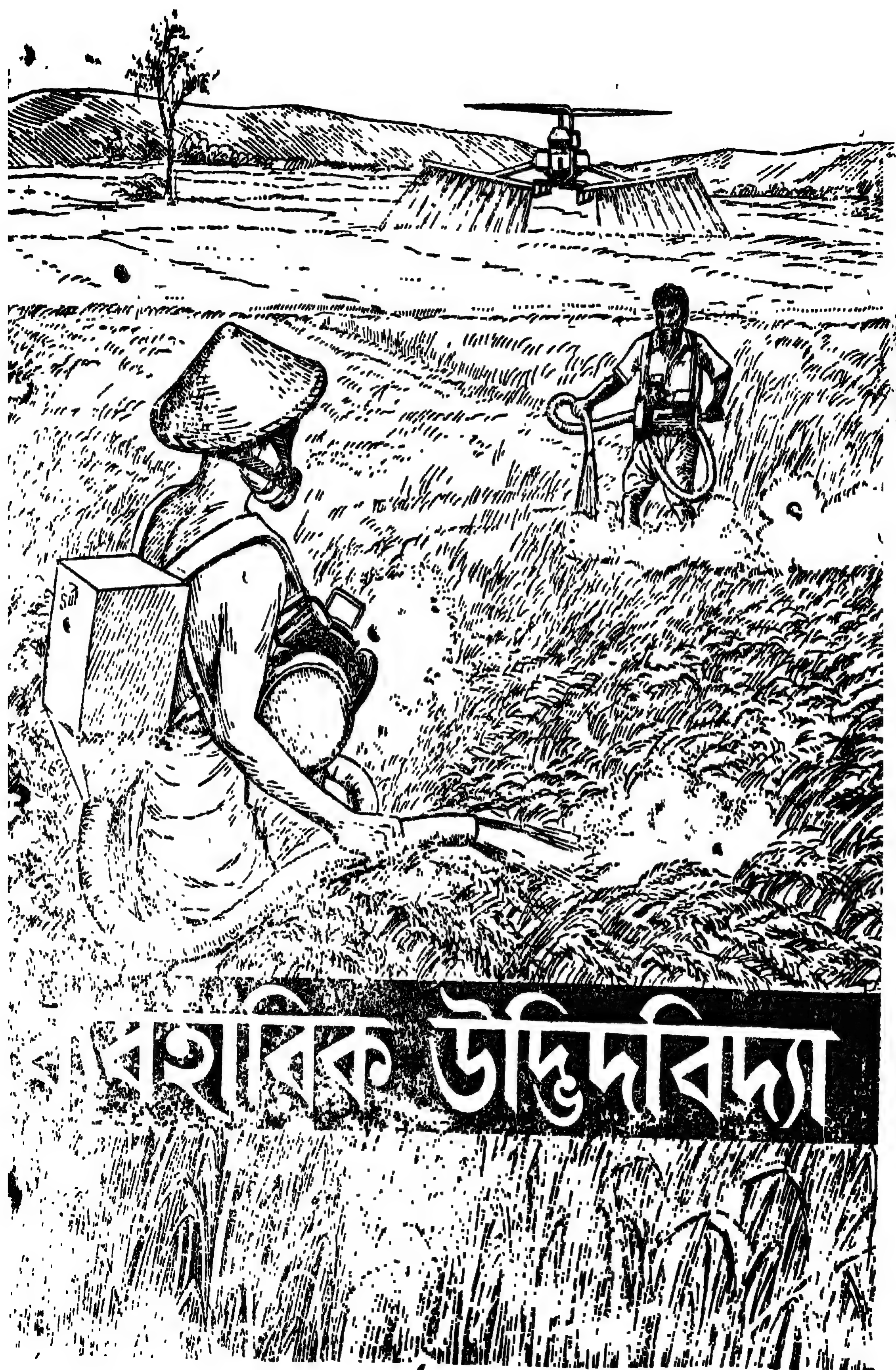
6 **পলিস্টেল** (Polystele)—কখন কখন স্টেলের ক্রমবিকাশের সাথে কতকগুলি হ্যাড্রোকেন্দ্রীয় বাণ্ডিলের আবির্ভাব ঘটে এবং প্রতি বাণ্ডিল এণ্ডোডারমিসের স্তর দ্বারা বেষ্টিত। এই প্রকার স্টেলকে কেহ কেহ **পলিস্টেল** (Polystele) নামে অভিহিত করেন। পলিপডিয়াম ভালগেয়ার (Polypodium vulgare) হইল ইহার উদাহরণ।

এই প্রকার স্টেল সম্ভবত সাইফনোস্টেল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ অনুমান করা হয়। ইমস (Eames) নামক বিজ্ঞানীর মতে পলিস্টেল নামটি ভ্রান্তিমূলক এবং ইহা বহুখণ্ডিত সাইফনোস্টেল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

প্রোটোস্টেল হইতে সাইফনোস্টেলের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে :

1. **বিস্তার তত্ত্ব** (Expansion theory)—এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রোটোস্টেলের জাইলেমের অংশ প্যারেনকাইমা কোষে পরিণত হয় এবং কেন্দ্রে সাইফনোস্টেলের মজ্জা গঠন করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ভ্যাস্কুলার অঞ্চল হইতে মজ্জার উৎপত্তি হইয়াছে।

2. **অনুপ্রবেশ তত্ত্ব** (Invasion theory)—এই তত্ত্ব অনুযায়ী ভ্যাস্কুলার অঞ্চলের বহির্ভাগে অবস্থিত কর্টেক্সের প্যারেনকাইমা কোষ বিশেষত পত্রাবকাশ ও শাখাবকাশের মধ্য দিয়া কেন্দ্রস্থলে অল্প প্রবেশ করে ও মজ্জা গঠন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বহিঃস্টেলীয় অঞ্চল হইতে মজ্জার উৎপত্তি হইয়াছে।


ব্যবহারিক উদ্ভিদবিদ্যা

১ ব্যবহারিক উদ্ভিদ
(Economic plants)

বহুপ্রকার উদ্ভিদ মানবজাতির নানা প্রকার কল্যাণ সাধন করে। যে উদ্ভিদবিদ্যার শাখা পাঠ করিলে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের ভেষজ, কৃষিকার্য প্রণালী প্রভৃতি নানা প্রকার উপকার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায় তাহাকে **ব্যবহারিক উদ্ভিদবিদ্যা** (Economic Botany) বলে।

সৃষ্টির আদি হইতে মানুষ বাঁচিবার জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছে। জীবনধারণ করিবার তিনটি প্রয়োজনীয় উপকরণ, যথা—খাদ্য, আশ্রয় এবং পরিধেয় বস্ত্র, উদ্ভিদই যোগাইতেছে। অধিকন্তু আমাদের বহুবিধ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য, যথা—কাগজ, নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতির জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের নিকট ঋণী। সাবান, প্রসাধন সামগ্রী, রবার, তৈল প্রভৃতি মূল্যবান শিল্পের জন্যও উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়।

খাদ্য—খাদ্য জীবনধারণের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। ইহা দেহের পুষ্টির জন্য বিশেষ প্রয়োজন। খাদ্য তিন প্রকারের ; যথা –**কার্বহাইড্রেট বা শ্বেতসার, প্রোটিন বা আমিষজাতীয় খাদ্য** এবং **চর্বি ও তৈলজাতীয় খাদ্য**। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ খাদ্যই আমরা উদ্ভিদ হইতে পাই এবং উহাদের মধ্যে অধিকাংশই আবার বাংলাদেশের ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মৃত্তিকায় জন্মায়। এই সকল উদ্ভিদের মধ্যে ধান হইতে অতি প্রয়োজনীয় শ্বেতসার খাদ্য চাউল পাওয়া যায়। ইহা ভারতবাসীর এবং বাংলাদেশের অধিবাসীর প্রধান খাদ্য। ইহা ব্যতীত এই সকল দেশে গম, ভুট্টা, জোয়ার, যব প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শ্বেতসারঘটিত উদ্ভিদেরও যথেষ্ট চাষ হয়। আলু, পটল, কুমড়া প্রভৃতি তরিতরকারিতেও প্রভূত শ্বেতসার পদার্থ থাকে। অধিকন্তু ইক্ষু, তাল, খেজুর প্রভৃতি হইতে যে রস উৎপন্ন হয় তাহা হইতে চিনি, গুড় এবং পাটালি প্রস্তুত হয়। আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, আতা, আঙুর, আপেল, কলা প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলেও শ্বেতসার পদার্থ থাকে এবং উহারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

প্রাণী হইতে যে প্রোটিন বা আমিষজাতীয় খাদ্য পাওয়া যায় তাহার তুলনায় উদ্ভিজ্জ প্রোটিন কোনো অংশেই কম নহে। ইহাদের মধ্যে দাইল অন্যতম। ছোলা, মুগ, মটর, মুসুর অড়হর, কলাই প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার দাইলের গাছ ভারত এবং বাংলাদেশের মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

উদ্ভিজ্জ তৈল ও চর্বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, বাদাম তৈল প্রভৃতি প্রধান। যে-সকল উদ্ভিদ হইতে উহারা উৎপন্ন হয় তাহাদের অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এই প্রকার তৈল আমাদের খাদ্যরূপে পরিগণিত হয়।

উপরিলিখিত উদ্ভিজ্জ খাদ্যে পুষ্টিকর পদার্থের অবস্থান থাকিলেও এমন এক প্রকার পদার্থ থাকা আবশ্যক যাহা ব্যতিরেকে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং নানারূপ রোগ দেখা

দেয়। এই জাতীয় পদার্থকে ভাইটামিন (vitamin) বলে। বিভিন্ন প্রকার সতেজ শাকসব্জী এবং চাউল, দাইল, গম প্রভৃতি খাদ্য শস্যে ও ফলের মধ্যে লেবু, আপেল, কলা, টমাটো, পেঁপে প্রভৃতিতে প্রচুর ভাইটামিন থাকে।

তন্তুজ দ্রব্য—বহু প্রকার তন্তুজ উদ্ভিদের মধ্যে কার্পাস প্রধান। ইহার তন্তু হইতে যে তুলা উৎপন্ন হয় তাহা আমাদের পরিধেয় বস্ত্র উৎপাদনে বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে। সেইজন্য প্রয়োজনীয়তার মান অনুসারে খাদ্যের পরই ইহার স্থান। পাট (ফ্যাক্স), হেম্প (hemp) প্রভৃতি হইতেও বস্ত্র প্রস্তুত হয়। অধিকন্তু শিমুল তুলায় বালিশ, গদি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বাংলাদেশে উৎপন্ন তন্তুজ উদ্ভিদের মধ্যে পাট অন্যতম। ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও ইহার যথেষ্ট চাষ হয়। পাট হইতে থলে, ক্যাম্বিস, আসন, গালিচা প্রস্তুত হয়।

বনজ কাষ্ঠ—ভারতে ও বাংলাদেশে যথেষ্ট বনভূমি দেখা যায়। ঐ সকল বনভূমি নিজ নিজ সরকারের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত। ইহাতে শাল, সেগুন, শিশু প্রভৃতি মূল্যবান কাষ্ঠ জন্মায়। বনজ কাষ্ঠ গৃহনির্মাণে প্রয়োজনীয় কড়ি, বরগা, দরজা, জানালা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। আমাদের জীবনযাত্রায় ইহারও প্রয়োজনীয়তা সমধিক। বনজ কাষ্ঠ হইতে আসবাবপত্র, আলমারি, খাট, তক্তপোষ, রেলের স্লিপার, সেতু প্রভৃতিও প্রস্তুত হয়। মেহগনি গাছের কাষ্ঠ অতি মূল্যবান এবং ইহা হইতে আসবাবপত্র নির্মিত হয়। নিকৃষ্ট প্রকৃতির কাষ্ঠ জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। পাইন বাবলা প্রভৃতি হইতে গদ, রঞ্জন প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

ভেষজ পদার্থ—ভারত ও বাংলাদেশে বহু উদ্ভিদই জন্মায় যাহা কিছু-না-কিছু ভেষজ গুণসম্পন্ন। আমাদের রোগ নিবারণের জন্য ঐ সকল ভেষজ উদ্ভিদের চাষ অপরিহার্য। এইরূপ বহু প্রকার ভেষজ উদ্ভিদ আছে যাহাদের ভেষজ গুণ সম্বন্ধে বর্তমানেও আমরা সুপরিচিত নহি। ইহাদের সম্বন্ধে পরীক্ষাগারে যথোপযুক্ত গবেষণা-কার্য চলিতেছে। অধিকাংশ ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে একপ্রকার alkaloid বা উপক্ষার থাকে যাহাদের প্রকৃতপক্ষে রোগ উপশমের কারণস্বরূপে বলা হয়; ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে সিনকোনা, কালমেঘ, বাকস, আয়াপান, কুর্চি, চিরতা, ইসবগুল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অত্যাশ্চর্য মহৌষধ পেনিসিলিন (penicillin), পেনিসিলিয়াম নোটেটাম (Penicillium notatum) নামক ছত্রাক হইতে প্রস্তুত হয়।

বিবিধ পদার্থ—কাগজ, রঞ্জক পদার্থ, সাবান, রবার প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই সকল শিল্পের অধিকাংশ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বাংলাদেশে অবস্থিত এবং উহাদের প্রস্তুত করিতে যে সকল উদ্ভিদের প্রয়োজন হয় তাহারাও এই সকল দেশে জন্মায়। কাগজ শিল্পের জন্য একপ্রকার ঘাস উৎপাদন করা হয়। পূর্বে এক প্রকার বাঁশ হইতে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত হইত কিন্তু বর্তমানে ইহার ব্যবহার বিশেষ প্রচলন নাই। বহু পূর্বে রঞ্জক শিল্পের জন্য নীল-গাছের চাষ করা হইত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে চা গাছ উৎপাদন করা হয়। চা, কফি, কোকো প্রভৃতি হইল উদ্দীপক পদার্থ। কফি ও কোকো

ভারতে উৎপন্ন হয়। তামাক, আফিং প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের গাছও এই সকল স্থানে জন্মায়। ধনে, মৌরী, জোয়ান, এলাইচ প্রভৃতি মশলার উদ্ভিদও ভারতে এবং বাংলাদেশে যথেষ্ট চাষ হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে উপরিলিখিত ব্যবহারিক উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তার সহিত আমাদের জীবনযাত্রার মান ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং ঐ সকল উদ্ভিদের উৎপাদনও অপরিহার্য।

ব্যবহারিক উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের নানারূপ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী উহাদিগকে নিম্নপ্রকার শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে ঃ

1 **কৃষি উদ্ভিদ** (Agricultural plants)—অর্থাৎ যে-সকল উদ্ভিদ হইতে ধান, গম, দাইল, ইক্ষু, তুলা, পাট, চা প্রভৃতি পাওয়া যায়।

2. **বনজ উদ্ভিদ** (Forest plants)—অর্থাৎ যে-সকল উদ্ভিদ হইতে মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়।

3. **উদ্যানপালন-সংক্রান্ত উদ্ভিদ** (Horticultural plants)—অর্থাৎ যে-সকল উদ্ভিদ উদ্যান পালনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

4 **ভেষজ উদ্ভিদ** (Medicinal plants)—যে-সকল উদ্ভিদ হইতে অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুত হয়।

5. **বিবিধ উদ্ভিদ** (Miscellaneous plants)—যথা, রেশম শিল্পের জন্য তুঁত গাছ, লাক্ষা প্রস্তুত করিতে কুল গাছ প্রভৃতি।

ভারতের প্রধান ব্যবহারিক উদ্ভিদ

বিশাল ভারতভূখণ্ডে ও বাংলাদেশে বহুপ্রকার মূল্যবান ব্যবহারিক উদ্ভিদ জন্মায়। ইহাদের মধ্যে অল্প কয়েকটির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

1. **খাদ্যশস্য** (Cereals)—যথা, ধান, গম, বার্লি প্রভৃতি।

2. **তন্তু-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ** (Fibre-producing plants)—যথা, তুলা, পাট, শন প্রভৃতি।

3. **শর্করা-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ** (Sugar-producing plants)—যথা ইক্ষু, বীট প্রভৃতি।

4. **তৈল-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ** (Oil-producing plants)—যথা, সরিষা, তিসি, নারিকেল, বাদাম ইত্যাদি।

5. **উত্তেজক দ্রব্য-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ** (Beverage-producing plants)—যথা, চা, কফি, কোকো।

6. **কাষ্ঠ-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ** (Timber-producing plants)—যথা, শাল, সেগুন, মেহগনী প্রভৃতি।

7. **রঞ্জন-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ** (Dye-producing plants)—যথা, নীল, হেমাটক্সিলিন প্রভৃতি।

8. **মসলা-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ** (Spice-producing plants)—যথা, লবঙ্গ, ধনে, জোয়ান, মৌরি প্রভৃতি।

9. **ভেষজ উদ্ভিদ** (Medicinal plants)—যথা, সিনকোনা, অ্যাকোনাইট্ প্রভৃতি।

10. **গঁদ, রজন প্রভৃতি উৎপাদনকারী উদ্ভিদ** (Gum, resin, ete. producing planls)—যথা, পাইন, বাবলা প্রভৃতি।

11. **মাদকদ্রব্য-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ** (Narcotic-producing plants)—যথা, তামাক, আফিং প্রভৃতি।

12. **কাগজ-প্রস্তুতকারী উদ্ভিদ** (Paper-producing plants)—যথা, বাঁশ, একপ্রকার ঘাস প্রভৃতি।

13. **রবার-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ** (Rubber-producing plants)—রবার ছাতিম প্রভৃতি।

14. **দাইল** (Pulses)—যথা, মটর, ছোলা প্রভৃতি।

15. **সব্জী** (Vegetables)—যথা, আলু, বেগুন, শাক প্রভৃতি।

16. **ফল** (Fruits)—যথা, আম, কাঁটাল, কলা প্রভৃতি।



২ খাদ্যশস্য
(Cereals)

খাদ্যশস্য সমগ্র এশিয়া মহাদেশের একটি প্রধান ফসল। পৃথিবীর সর্বত্রই ইহার চাষ করা হয়। ইহারা Fam. Graminaceae অন্তর্ভুক্ত বর্ষজীবী উদ্ভিদ। কাণ্ড সূক্ষ্ম এবং অস্থানিক মূলসম্পন্ন ; পাতা দ্বিসারী-বিন্যাসযুক্ত এবং পত্রমূল কাণ্ডবেষ্টক এবং লিগিউল আছে। পুষ্পবিন্যাস সাধারণত মঞ্জরী বা ইহার রূপান্তর মাত্র এবং ভুট্টা ব্যতীত ফুলগুলি সাধারণত উভলিঙ্গ। সুস্পষ্ট পুষ্পপুট না থাকিলেও ইহাদের লডিকিউল (lodicules) দ্বারা অভিহিত করা হয়। গর্ভাশয় এক-গর্ভপত্রী এবং ফল ক্যারিয়প্সিস্।

1. ধান (Paddy)

কোনো কোনো লেখকের মতে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় 2800 বর্ষ পূর্বে চীনদেশে ধান চাষের বিবরণী পাওয়া গিয়াছে। উদ্ভিদবিদ ডি-ক্যাণ্ডোলের (De Candolle) মতে চীনদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষ এবং অষ্ট্রেলিয়াতেও যে বহু পূর্ব হইতেই ধানের চাষ হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বর্তমানে কেহ কেহ মনে করেন যে, ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম রাজ্যই প্রথমে ধানের চাষ আরম্ভ করে। ক্রমে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ইহা প্রভূত বিস্তার লাভ করে এবং এইরূপে তথা হইতে লাওস, ভিয়েৎনাম এবং ক্যাম্বডিয়াতে বিস্তৃত হয়। প্রাচীন ভারতবাসী এবং পারস্যের অধিবাসীগণ ইহার চাষের প্রণালী জানিলেও চীনাদিগের পরে ইহারা প্রত্যক্ষ চাষ আরম্ভ করে।

ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে ধানের চাষ হয়। শুধু বাংলাদেশে এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ছোট দানা, বড় দানা, সুগন্ধযুক্ত দানা প্রভৃতির প্রায় 4,000 প্রকারের ধান উৎপন্ন হয়। যে জমিতে জলের পরিমাণ অত্যধিক নয়, তথায় উৎকৃষ্ট ধান জন্মায়। থাইল্যাণ্ডের গভীর জলে যে ধানগাছ জন্মায় জলতলের বৃদ্ধির সহিত তাহার কাণ্ডও বর্ধিত হইয়া 4 মিটার দীর্ঘ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ ব্যতীত, চীন, জাপান, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি সুদূর পূর্বখণ্ডে ধানের চাষ হয় এবং ইহাদের মধ্যে জাপানেই একর প্রতি সর্বাধিক ধান উৎপন্ন হয়।


১১৫নং চিত্র—ধান

ভারতীয় এবং বাংলাদেশের ধানকে—আউস, আমন ও বোরো—এই তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। আউসন ধান হইতে সাধারণত মোটা এবং লালচে চাউল উৎপন্ন হয় ; আমন ধান হইতে সরু ও মোটা উভয় প্রকার চাউলই পাওয়া যায় এবং ইহার বর্ণ আউস অপেক্ষা উজ্জ্বল। বোরো ধান হইতে উৎপন্ন চাউল খুব মোটা এবং কালচে।

1. **আউস ধান** (Aus rice)—শুদ্ধ ভাষায় ইহাকে আশু ধান্য ও বলা হয়। ইহাদের উচ্চ জমি, বালুকাময় নদীতীর অর্থাৎ যে জমিতে বৃষ্টির পর জল দাঁড়ায় না সেই স্থানে আবাদ করা হয়। কৃষিপর্যায় অবলম্বনে (Rotation of crops) আউস ধান চাষ করিলে সুফল পাওয়া যায়। প্রথমবর্ষে আউষ ধান চাষের পর দাইল বা তৈল বীজ বা উভয় প্রকার বীজ মিশ্রিত করিয়া চাষ করিতে হয় ; দ্বিতীয় বর্ষে পাট, তৃতীয় বর্ষে ইক্ষু এবং চতুর্থ বর্ষে ঐ জমিতে পুনরায় আউস ধান চাষ করা হয়। পঞ্চম বর্ষে আলু চাষ করা হয় এবং ষষ্ঠ বর্ষে কোনোরূপ চাষ না করিয়া গরুমহিষাদির চারণভূমিতে পরিণত করা হয়।

জমি প্রস্তুত করিতে গোবর সার, পুকুরের মাটি ও ছাই প্রয়োজন এবং গাছ একটু বড় হইলে প্রতি একরে প্রায় এক কুইন্টাল রেড়ির খইল অথবা 30 কিলো অ্যামোনিয়াম সালফেট এবং 40 কিলোগ্রামের মতন হাড়ের গুঁড়ো প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পলি, দো-আঁশ বা এঁটেল জমিতে আউস ধান ভাল জন্মায়। উচ্চ জমিতে উত্তমরূপে জলসেচন করা বিশেষ প্রয়োজন।

শীতের শেষে জমিতে চাষ করা হয়। এপ্রিল-মে মাসে বৃষ্টি হইলে জমিকে গভীরভাবে কর্ষণ করিয়া ও মই দিয়া broadcasting বা বীজ ছড়াইতে হয়। এইরূপে বীজবপন করিলে একর প্রতি প্রায় 10—12 কিলোগ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। গাছ বড় হইলে আগাছা তুলিয়া ফেলা কর্তব্য। সাধারণত সেপ্টেম্বরের শেষে ধান কাটা হয় ; অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে জুলাই অথবা আগস্ট মাসেও ধান কাটা হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে যে, আউস ধান কাটিতে দেরি করিলে পাকা ধান জমিতে ঝরিয়া পড়ে এবং ইহাদের খড়গুলিও সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। একর প্রতি 4·5—9 5 কুইন্টাল ধান পাওয়া যায়।

2 **আমন ধান** (Aman or winter rice)—আমন ধান হেমন্ত ঋতুতে পাকিয়া থাকে। সেইজন্য ইহাকে হৈমন্তিক ধান্যও বলা হয়। ইহা হইতে অতি উৎকৃষ্ট ধানের বিভিন্ন প্রকার সরু চাউল পাওয়া যায়। আমন ধান উচ্চ জমি অর্থাৎ যে জমিতে একবারে জল দাঁড়ায় না সেই স্থানে ইহা কোনো ক্রমেই উৎপন্ন হয় না। বর্ষার প্রারম্ভে seed bed বা বীজতলা উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া গোবর সার ও খইলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন বীজতলায় কোনোরূপে জল না দাঁড়ায়। 35 ঘন মিটার বীজতলায় প্রায় 250 গ্রাম পরিমিত বীজ ছড়াইয়া বপন করিতে হয়। বীজ বপন করিবার পূর্বে উহাদিগকে 10 শতাংশ লবণ জলে ভিজাইতে হয়। ভারী বীজ অর্থাৎ যে বীজগুলি ডুবিয়া যাইবে তাহাদের নির্বাচন করিয়া প্রতি কিলোগ্রাম বীজের সহিত অ্যাগ্রোসান জি এন (Agrosan GN) মিশাইতে হয়। পনর দিন পরে চারাগুলি বড় হইলে প্রতি বীজতলা 10 গ্রাম নারসারি স্প্রে (nursery spray) সাত লিটার জলে দ্রবীভূত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে আগাছা তুলিয়া ফেলা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে জুলাই মাসের শেষভাগে যে জমিতে transplant বা চারা গাছ রোপণ করিতে হইবে তাহা কয়েকবার কর্ষণ করিয়া জমিতে মই দিয়া সবুজসার অথবা

গোবর সার দিয়া পুনরায় জমি কর্ষণ করিতে হয়। পরে 4-5টি পাতাসহ সবল চারাগুলি ঐ জমিতে প্রায় 30 সেণ্টিমিটার ব্যবধানে গর্ত করিয়া এবং প্রতি গর্তে 2-3টি গাছ লইয়া রোপণ করিতে হয়। সাধারণত আগস্টের শেষ ভাগ পর্যন্ত চারা গাছ রোপণ করা হয়। প্রতি 10-12 দিন অন্তর আগাছা তুলিয়া ফেলা বিশেষ প্রয়োজন। ইহাতে মৃত্তিকা আল্গা থাকে। কিন্তু ফুল দেখা যাইলে আগাছা তোলা উচিত নহে। চারা রোপণে পর পোকামাকড় এবং ছত্রাক রোগের আক্রমণ প্রতিহত করিতে প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। ফুল আসিবার পূর্বে যেন জমিতে অন্তত 7 সেণ্টিমিটার জল থাকে কিন্তু ফুল দেখা দিবার 20-25 দিন পরে জমি হইতে সম্পূর্ণরূপে জল নিষ্কাশন করা প্রয়োজন। নভেম্বর হইতে ডিসেম্বরের মধ্যে সাধারণত ফসল কাটা হয়। একর প্রতি এই প্রকার ধান 15-19 কুইণ্টাল পর্যন্ত উৎপন্ন হয়।

বোরো ধান (Boro rice)—এইপ্রকার ধান আউস অথবা আমন অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। বৎসরে দুই বার এই প্রকার ধান উৎপাদন করা যাইতে পারে। সাধারণত বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের কোনো কোনো স্থানে ইহার চাষ হয়। বোরো ধান দুই প্রকার, যথা—(*a*) **খারিফ বোরো** (Kharif boro) জুন-জুলাই মাসে বীজ বপন করা হয়; জুলাই বা আগস্ট মাসে চারাগাছ রোপণ করিতে হয় এবং সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে ফসল কাটা হয়। (*b*) **রবি বোরো** (Rabi boro)—শীতের প্রারম্ভে অক্টোবর বা নভেম্বরে বীজ বপন করিতে হয়; নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারির মধ্যে কয়েকবার চারাগাছ রোপণ করিতে হয় এবং পরে মে মাসে ফসল কাটা হয়।

পুষ্করিণী বা নদীর ধারে নীচু বীজতলায় বীজ ছড়াইয়া বপন করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে চাষ করিবার পূর্বে জমিতে জল সেচন করিতে হইবে।

দেখা গিয়াছে যে, জমির উর্বরাশক্তি, বীজের প্রকার, জলসেচের সুবিধা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর একরপ্রতি ধানের উৎপাদন নির্ভর করে। ভারতের একর প্রতি গড়ে 3·5 কুইণ্টাল ধান উৎপন্ন হয় কিন্তু ভারতের তুলনায় জাপানে একর প্রতি গড়ে 13·5 কুইণ্টাল পর্যন্ত পাওয়া যায়। সেইজন্য আমাদের দেশে ধান উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য জাপান প্রথায় চাষ করা হয় এবং ইহাতে সুফল পাওয়া গিয়াছে।

জাপানী প্রথার ধানের চাষ—উৎকৃষ্ট ও উন্নত ধরনের সুস্থ বীজ উপযুক্তরূপে প্রস্তুত এবং জমি হইতে কয়েক সে. মি. উচ্চে অবস্থিত বীজতলায় আল্গাভাবে বপন করিতে হয়। ইহাতে চারাগাছ রোপণের সময় শিকড়গুলি বিনষ্ট হয় না। বীজগুলির অংকুরোদ্গমের 8-9 দিন পর আগাছা তুলিয়া ফেলা প্রয়োজন। চারা গাছগুলি সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলে বীজতলায় ·45 কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করিতে হইবে। গত বৎসরের আমন ধান কাটিবার পর, জমিতে লাঙ্গল দিতে হয় এবং প্রথম বর্ষণের পূর্বে একর প্রতি ·5 কুইণ্টাল সুপার-ফসফেট মিশাইয়া আরও চারিবার জমিতে লাঙ্গল দিয়া 9-12 কিলোগ্রাম সুস্থ বকফুলের বীজ বপন করিতে হয়। প্রায় 8 সপ্তাহের পর ঐ জমিতে মই দিয়া বকফুলের চারাগুলিকে মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয় এবং যখন ঐগুলি দুই সপ্তাহ ধরিয়া পচিতে থাকে তখন পুনরায় জমিতে লাঙ্গল দিতে হয়। ইহার পরিবর্তে একর

প্রতি 23 কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট এবং ·5 কুইণ্টাল সুপার ফসফেট সমেত গোবর সার অথবা পচা সার ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইরূপে জমি প্রস্তুত হইলে 15-18 সেণ্টিমিটার অন্তর গর্ত খুঁড়িয়া 2-3টি চারাগাছ সারিবন্ধভাবে রোপণ করিতে হয় যাহাতে প্রতি সারির মধ্যে 25 সেণ্টিমিটার ব্যবধান থাকে। আগস্ট মাসই বীজ বপনের উপযুক্ত সময় কিন্তু পরে হইলে অধিকসংখ্যক বীজ বপন করিতে হয়। পরে কয়েক বার আগাছা তুলিয়া ফেলা প্রয়োজন। ফুলগুলি দানা বাঁধিলেই জমি হইতে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন এবং বীজ পাকিলে শীঘ্রই ফসল কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

2. গম (Wheat)

বাংলাদেশ এবং ভারতের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শস্য যেমন ধান, ভারতের পশ্চিম অঞ্চলের সেইরূপ প্রধান শস্য হইল গম। বাংলাদেশে এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গমের চাষ অল্পই হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া, চব্বিশ পরগণা এবং বাংলাদেশের রাজসাহী, পাবনা প্রভৃতি জেলায় ইহার চাষ হয়। ভারতের বাহিরেও রাশিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও প্রধানত গম উৎপন্ন হয়। অস্ট্রেলিয়ার গম হইতে উৎকৃষ্ট ময়দা প্রস্তুত হয়।



১৭৬নং চিত্র—গম

গম প্রধানত দুই প্রকারের ; যথা, শীতকালীন গম এবং বসন্তকালীন গম। শেষোক্ত প্রকার গম প্রধানত কানাডা, সাইবেরিয়া প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে চাষ করা হয়। শক্ত ও নরম দানা ভেদে আবার গমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। শক্ত দানা গম হইতে আটা ও সুজি এবং নরম দানা গম হইতে উৎকৃষ্ট ময়দা প্রস্তুত হয়। উৎকৃষ্ট প্রকৃতির শক্তদানা গম গঙ্গা এবং সিন্ধুর পলিমাটিতে প্রচুর পরিমাণে চাষ করা হয়। গঙ্গা নদীর তীরে সমতল ভূমিতে কয়েকটি উৎকৃষ্ট জাতের গমের চাষ হয় যাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

1. দুধীয়া (Dudhia)—শ্বেতবর্ণের গোলাকৃতি নরম দানা। পাতাগুলি সর্বাপেক্ষা চওড়া। ইহা সাদা ময়দা প্রস্তুত করিবার উপযোগী।

2. গঙ্গাজলী (Gangajali)-হালকা ধূসর বর্ণের বড় আকারের শক্ত দানা। দানাগুলিতে awn বা শূক আছে। ইহা আটা ও সুজি প্রস্তুত করিবার উপযোগী।

4. খেড়ী (Kheri)—হাল্কা ধূসর বর্ণের মাঝারি আকারের শক্ত দানা। পাতাগুলি সবুজ, দানাগুলি শীঘ্রই পাকিয়া যায়। ইহা গুলাবী রাবাড়ি জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করিবার উপযোগী।

4. জামালী (Jamali)—হাল্কা লোহিত বর্ণের বড় আকারের নরম শস্য। পাতাগুলি সরু। ইহা পাউরুটি প্রস্তুত করিবার উপযোগী।

5. পুষা (Pusa)—ইহা উৎকৃষ্ট প্রকৃতির হাল্কা ধূসর বর্ণের ক্ষুদ্র শক্ত দানা পাতাগুলি সরু। ইহা পাউরুটি প্রস্তুত করিবার উপযোগী।

সারবিহীন ও শুষ্ক জমিতে গমের চাষ ভাল হয়। কর্দমাক্ত দো-আঁশ মৃত্তিকায় ভাল গম জন্মায়। ক্ষেত্রে উপযুক্ত জলসেচের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সাদা নরম দানার গম পলিমাটিতে ভাল চাষ হয়।

গমের জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া জমি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। কর্ষণ করিবার সময় একর প্রতি 8-10 গাড়ী গোবর সার প্রায় 28-30 কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট এবং প্রায় সম পরিমাণ সুপার ফসফেট বা হাড়ের গুঁড়া মিশাইতে হয়। চারাগুলি প্রায় 25-30 সেণ্টিমিটার বড় হইলে অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত। ইহার পর জমিতে উপযুক্ত মই দিয়া জল সিঞ্চন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত নভেম্বরের মাঝামাঝি হইতে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বীজ বপন করা হয়। বীজ বপনের পূর্বে ইহাদিগকে শোধন বা বীজাণুমুক্ত করা প্রয়োজন। সেইজন্য বীজগুলিকে তুঁতের জলে ভিজাইতে হয়। বীজ শোধনের পর একর প্রতি প্রায় 25-30 কিলোগ্রাম বীজ ছড়াইয়া বা যন্ত্রের সাহায্যে বপন করিতে হয়। জমি শুষ্ক হইলে তিন-চারি বার জলসেচন করা অবশ্য কর্তব্য। ইহা ছাড়াও মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ও আগাছা তুলিয়া ফেলা প্রয়োজন। গাছে মঞ্জরী আসিলে জল সেচন করা বিশেষ প্রয়োজন।

গমের দানাগুলি পাঁচ মাসের মধ্যে পরিণত হয় এবং মার্চ হইতে এপ্রিল মাসের মধ্যে পরিপক্ক ফল কাটা হয়। একর প্রতি সাধারণত 6-7 কুইণ্টাল ফল পাওয়া যায়। কিন্তু যত্নপূর্বক চাষ করিলে প্রায় 8-10 কুইণ্টাল ফলনও পাওয়া যাইতে পারে। গম চাষের পূর্বে চাল এবং পরে জোয়ার এবং অন্যান্য ফসল পর্যায়ক্রমে চাষ করিলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন রোগের আক্রমণ কম হয়।

উৎকৃষ্ট ফলন পাইতে হইলে নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন :

(*a*) রাস্ট নামক ছত্রাক রোগ প্রতিহতকারী বীজ নির্বাচন করিয়া স্মাট নামক ছত্রাক রোগ এবং পোকা মাকড়ের আক্রমণ দমন করিবার জন্য ইহাদিগকে যথোপযুক্ত সংরক্ষণ করিয়া তবে বপন করা প্রয়োজন।

(*d*) বীজগুলি গভীর মৃত্তিকায় বপন করা হয় এবং উপরে শোরা ছড়ান হয়।

(*c*) আবহাওয়া শীতল না হইলে বীজ বপন করা কর্তব্য নহে এবং বীজ উত্তমরূপে পাকিলে তবেই ফসল কাটা উচিত।

(*b*) বীজ না ছড়াইয়া যন্ত্রের সাহায্যে সারিবদ্ধভাবে বপন করা প্রয়োজন। একর প্রতি 25-30 কিলোগ্রাম বীজ বপনই যথেষ্ট।

———



দাইল
(Pulses)

পূর্বকাল হইতে দাইল মানুষের প্রধান খাদ্যরূপে গণ্য হইতেছে এবং খাদ্যশস্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। সকল দাইলই কিছু পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহপদার্থ এবং বেশী পরিমাণে নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ থাকে। সুতরাং ইহারা মাছ ও মাংসের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

সকল দাইল Fam. *Leguminosae* (লিগুমিনোসী) গোত্রের ও S. F. Papilionaceae (প্যাপিলিওনেসী) উপগোত্রের অন্তর্ভূক্ত। অড়হর ও মসুর ব্যতীত সকল দাইলগাছ দুর্বল কাণ্ডযুক্ত এবং আকর্ষের সাহায্যে কোনো অবলম্বনকে জড়াইয়া উপরে উঠে। পুষ্প papilionaceous বা প্রজাপতিসম এবং উভলিঙ্গ ; পুংকেশর 10টি, diadephous বা দ্বিগুচ্ছ ; গর্ভপত্র 1টি, গর্ভাশয় গর্ভপাদ এবং এককোষবিশিষ্ট। ফলকে লিগুম (legume) বলে এবং পরিপক্ক শুষ্ক বীজ দাইল রূপে গৃহীত হয়। মূলে একপ্রকার nodules (অর্বুদ বা গুঁটি) উৎপন্ন হয় এবং ইহার ভিতরে nitrogen-fixing বা নাইট্রোজেন স্থিতিকারক ব্যাকটেরিয়া বাস করে এবং ইহারাই মাটির বাতাসের নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া নাইট্রেটে পরিবর্তিত করে এবং পরে ইহা দাইল গাছগুলিকে দেয়। দাইল গাছগুলি উত্তম সার রূপে ব্যবহৃত হয় কারণ উহারা মাটির নাইট্রোজেন পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এজন্য ইহাদিগকে অন্যান্য ফসলের সহিত পর্যায়ক্রমে চাষ করিতে হয়।



১৭৭ নং চিত্র—মটর গাছ

1. **ছোলা** (Gram)—ছোলা একপ্রকার রবি-শস্য। আমাদের দেশে তিন জাতীয় ছোলা উৎপন্ন হয়। ইহা ভারতের উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে জন্মায়। সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর মাসে ধান অথবা পাট কাটা শেষ হইলে, কর্দমাক্ত অথবা দো-আঁশ মৃত্তিকা উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া ছোলার চাষ করা হয়। বীজগুলি ছড়াইয়া বপন করিতে হয়, এবং সরিষা, তিসি, গম প্রভৃতির সহিত ইহার চাষ করা যাইতে পারে। ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ মাসে ফল পাকিয়া ফাটিয়া যাইবার পূর্বেই গাছগুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়।

2 **মটর** (Pea)—Pisum sativum বা মটর গাছ প্রধানত ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে জন্মায়। বাংলাদেশেও ইহার চাষ হইয়া থাকে। ইহা একটি গুল্ম এবং ছোলার ন্যায় উত্তমরূপে কর্ষিত কর্দমাক্ত বা দো-আঁশ জমিতে গোবর এবং ছাই সার দিয়া ইহার চাষ করা হয়। সেপ্টেম্বর অথবা

অক্টোবর মাসে বীজগুলি সারিবন্ধভাবে প্রায় ৭০ সেণ্টিমিটার ব্যবধানে বপন করা হয়। মার্চ হইতে এপ্রিলের মধ্যে ফসল কাটা হয়।

3 **মুসুরী** (Lentil)—Lens esculenta বা মুসুরী গাছ প্রধানত ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশে, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে জন্মায়। বাংলাদেশেও ইহার চাষ হইয়া থাকে। ইহা বীরুৎ শ্রেণীর উদ্ভিদ। বড় ও ছোট, এই দুই প্রকার মুসুরী উৎপন্ন হয়। আর্দ্র নিম্ন ভূমিতে বীজ বপন করিতে হয়। এইরূপ জমিতে জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত থাকা দরকার। মার্চ মাসের শেষ ভাগে অথবা এপ্রিলের প্রথমে ফসল কাটা হয়।

4. **মুগ** (Mung)—Phaseolus mungo বা সোনা মুগ উৎকৃষ্ট জাতের মুগ। ইহা গুল্ম শ্রেণীয় উদ্ভিদ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ও মহারাষ্ট্রে ইহার চাষ হয়। বাংলাদেশেও ইহার চাষ করা হইয়া থাকে। সেপ্টেম্বর হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত দো-আঁশ মাটিতে বীজ ছড়াইয়া বপন করা হয়। জমি প্রস্তুত করিবার সময় মধ্যে মধ্যে গোবর সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। জানুয়ারি হইতে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ফসল কাটা হয়।

5. **অড়হর** (Pigeon pea)—Caianus indicus বা অড়হর গাছের আদি জন্মস্থান আফ্রিকাতে হইলেও বর্তমানে ভারতে ও বাংলাদেশে ইহা সুন্দরভাবে চাষ করা হয়। ইহারা বীরুৎ শ্রেণীর উদ্ভিদ এবং উচ্চতায় প্রায় 1 8 হইতে 2 4 মিটার পর্যন্ত হয়। দুই প্রকারের অড়হর গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। একপ্রকারের জানুয়ারি মাসে এবং অপর প্রকারের মার্চ মাসে ফসল কাটা হয়। শেষোক্ত প্রকার হইতে অধিক পরিমাণের ফসল পাওয়া যায় এবং বীজগুলিও আকারে বড়। মে মাস হইতে জুন মাসের মধ্যে কর্দমাক্ত বা দো-আঁশ জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া অন্তত দুই হাত ব্যবধানে বীজ বপন করা হয়।

6. **খেসারি** (Grass pea)—Lathyrus sativus বা খেসারি গাছ এ গুল্ম-জাতীয় উদ্ভিদ এবং প্রধানত উত্তর ভারতে ইহার চাষ করা হয়। ইহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর দাইল। ইহার চাষের জন্য নিম্ন সিক্ত জমি উপযোগী এবং জমিতে কোনোরূপ কর্ষণ করিবার বা সার দিবার প্রয়োজন হয় না। সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবরে আমন ধান উঠিলেই জমিতে বীজ ছড়াইয়া বপন করা হয়। ফেব্রুয়ারি হইতে মার্চ মাসের মধ্যে ফসল কাটা হয়। দীর্ঘ দিন ধরিয়া এই প্রকার দাইল সেবন করিলে একপ্রকার পক্ষাঘাত রোগ (lathyrism) আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

7. **কলাই** (Kelai)—Phaseolus toxburghii বা কলাই গাছ বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়। ইহা কর্দমাক্ত বা দো-আঁশ উচ্চ জমিতে চাষ করা হয়। অন্তত একবার জমি কর্ষণ করা প্রয়োজন কিন্তু কর্ষণ করা বা সার দেওয়াতে বিশেষ যত্নবান না হইলেও চলে। এপ্রিল হইতে মে মাসের মধ্যে বীজ ছড়াইয়া বপন করিতে হয় এবং সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসে ফসল কাটা হয়।

৪ তৈল-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ
(Oil-producing Plants)

বহুপ্রকার উদ্ভিদ হইতেই তৈল উৎপন্ন হয়। ইহারা প্রধানত দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—

(*a*) **উদ্বায়ী তৈল** (Volatile oils)—এইপ্রকার তৈলের একপ্রকার মিষ্ট গন্ধ থাকে এবং বায়ুর সংস্পর্শে উহারা উবিয়া যায়। ইহারা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের তৈল-গ্রন্থিতে উৎপন্ন হয়। ইহাদের সাধারণত পাতন বা পেষণ প্রক্রিয়ায় নিষ্কাশন করা হয়। তুলসী, পিয়াজ, লেবু প্রভৃতি গোত্রের উদ্ভিদে ইহারা উৎপন্ন হয়। সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে প্রধানত ইহার প্রয়োজন হয়। ইউক্যালিপটাস তৈল, কর্পূর তৈল প্রভৃতি হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়। তার্পিন তৈল বার্নিশ ও রং শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

(*b*) **চর্বিজাতীয় তৈল** (Fatty oils)—ইহারা সাধারণ তাপমাত্রা ও বায়ুর চাপে তরল অবস্থায় থাকে এবং কখনই উবিয়া যায় না। সেইজন্য ইহাদের আর একটি নাম fixed বা স্থায়ী তৈল। ইহারা জলে অদ্রবণীয় এবং পাতন প্রণালীর দ্বারা ইহাদের নিষ্কাশন করা যায় না। ইহারা প্রধানত বীজের মধ্যে সঞ্চিত থাকে কিন্তু ভূনিম্নস্থ কাণ্ড, বায়বীয় কাণ্ড, ফুল প্রভৃতির মধ্যেও উৎপন্ন হইতে পারে। খাদ্য এবং বিভিন্ন শিল্পে ইহারা ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ আবার ঔষধ প্রস্তুত করিতে এবং বাতি জ্বালাইতেও ব্যবহার করিয়া থাকে। রেড়ীর তৈল, সরিষার তৈল, বাদাম তৈল, কার্পাস বীজ তৈল, সূর্যমুখীর তৈল, তিসির তৈল, নারিকেল তৈল প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

1. **চীনাবাদাম তৈল** (Groundnut oil)—এইপ্রকার তৈল সর্বদাই তরল অবস্থায় থাকে এবং উন্মুক্ত রাখিলে কখনই ইহার উপরে পাতলা স্তর জমে না। ইহা চীনাবাদাম গাছের বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। Arachis hypogea বা চীনাবাদাম গাছ Fam. Leguminosae বা লিগুমিনোসী গোত্রের এবং Sub. Fam. Papilionaceae বা প্যাপিলায়নেসী উপগোত্রের অন্তর্গত।

সম্ভবত ব্রেজিল হইতে চীনাবাদামের আদি জন্মস্থান। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, বর্মা, চীন, জাপান, আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চল এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইহার চাষ হয়। আবার ভারতের মধ্যে তামিলনাড়ুতে সর্বাধিক চীনাবাদামের চাষ হইয়া থাকে এবং তৎপরে মহারাষ্ট্রের স্থান। ইহা ছাড়াও কর্ণাটক (মহীশূর), অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশেও ইহার চাষ হইয়া থাকে।

চীনাবাদাম গাছ বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহার প্রচুর শাখাপ্রশাখা উৎপন্ন হয়। ইহার সুস্পষ্ট প্রধান মূল ব্যতীত বহুসংখ্যক অস্থানিক মূল আছে। মূলেতে বহু সংখ্যক nodules বা অর্বুদ একপ্রকার ব্যাকটিরিয়ার আবাসস্থল যাহারা মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন স্থিতীকরণের দ্বারা উহাকে উর্বর করিয়া থাকে। পুষ্প দুই প্রকারের ; যথা উর্বর ও বন্ধ্যা। নিষেকের পর উর্বর পুষ্পগুলির বৃন্ত বাঁকিয়া মৃত্তিকার নিম্নে প্রবেশ করে এবং তথায় লিগুম (legume) নামক ফলে পরিণত হয়। ফলে দুইটি করিয়া বীজ থাকে এবং ইহাই প্রকৃত চীনাবাদাম।

বালুকাময় স্থানে সাধারণত চীনাবাদামের চাষ হইয়া থাকে। ইহাতে নিষিক্ত পুষ্পগুলি সহজেই মৃত্তিকায় প্রবেশ করিতে পারে এবং মৃত্তিকানিমজ্জ পুষ্পগুলি ফলে পরিণত হইলে উহাদের সহজেই অপসারণ করা যায়। বালুকাময় দো-আঁশ মাটি, পলিমাটি, এবং কৃষ্ণমৃত্তিকাতে ইহার চাষ করা হয়। মহীশূরের কৃষকগণ জমিকে উপযুক্ত উর্বর করিতে অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ফসফরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ ব্যবহার করেন। সুস্থ ও সবল ফল হইতে বীজগুলি সংগ্রহ করিয়া জমিতে প্রায় 20-30 সেন্টিমিটার ব্যবধানে সারিবদ্ধভাবে ছড়াইয়া বপন করিতে হয়। মে হইতে জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বীজ বপনের প্রকৃষ্ট সময়। বপনের পর বীজগুলিকে মৃত্তিকার দ্বারা আলগাভাবে আবৃত করা প্রয়োজন।

পরিণত উদ্ভিদগুলি পীতবর্ণ ধারণ করিলে এবং পাতা শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিলে প্রখর সূর্যালোকে উহাদিগকে মৃত্তিকা হইতে অপসারণ করা হয় এবং অধিকতর শুষ্ক করিবার উদ্দেশ্যে কোনো উন্মুক্ত স্থানে একত্রিত করিয়া রাখা হয়। উদ্ভিদগুলি যথেষ্ট শুষ্ক হইলে উহাদিগকে একখণ্ড দণ্ডের দ্বারা আঘাত করিয়া ফলগুলিকে পৃথক করা হয়। ফলগুলি প্রথমে স্বল্প সিক্ত থাকে এবং কয়েক দিন রৌদ্রে রাখিলে উহারা সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া যায়।

পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সর্বাধিক চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। ভারতে ফলনের পরিমাণ একর প্রতি প্রায় 400 কিলোগ্রাম কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পরিমাণ 500-550 কিলোগ্রাম পর্যন্ত হইতে পারে।

চীনাবাদামের অধিকাংশ পরিমাণই বালিতে ভাজিয়া অথবা লবণজলে সিদ্ধ করিয়া ও পরে শুষ্ক করিয়া খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে প্রায় 40 শতাংশ তৈল থাকে বলিয়া মাখন প্রস্তুত করিতে ও তৈল উৎপাদন করিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

2 **সরিষা (Mustard)** : সরিষার বীজ হইতে সর্বপ্রকার ভোজ্য তৈল উৎপন্ন হয় এবং উহা রন্ধন কার্যের একটি প্রধান উপাদান। সমগ্র ভারতে এবং বাংলাদেশে নানা জাতীয় তৈল বীজের আবাদ হয় কিন্তু তাহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সরিষার আবাদ উল্লেখযোগ্য। চীন জাপান এবং ইউরোপের কোনো কোনো স্থানে সরিষার চাষ হইয়া থাকে।

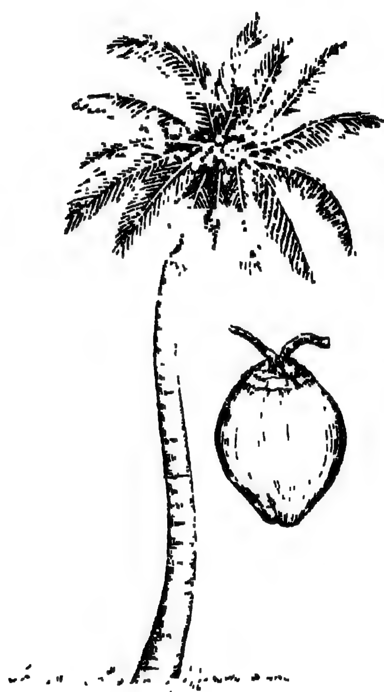
আমাদের দেশে এবং বাংলাদেশে রাই বা শ্বেত, কৃষ্ণ এবং **টোরি** বা **মাঘি** তিন জাতীয় সরিষার চাষের প্রচলন আছে। সরিষা Fam. Cruciferae বা ক্রুসিফেরী গোত্রীয় এবং (ব্রাসিকা) Brassica গণভুক্ত। (কৃষ্ণ সরিষা) Brassica nigra বর্ষজীবী এবং অনধিক এক মিটার দীর্ঘ; পত্র মৃৎকাণ্ডজ, বা কাণ্ডজ, সাধারণত মূলক পত্রাকার, অবৃন্তক; পুষ্পবিন্যাস রেসিম; পুষ্পগুলি উভলিঙ্গ, গর্ভপাদ; দলমণ্ডল ক্রুসাকার; পুংস্তবক দীর্ঘচতুষ্টয়ী, ফল বহুবীজী সিলিকুয়া। কিন্তু B. alba (শ্বেত সরিষা)-র পত্রগুলি সবৃন্তক এবং উদ্ভিদটি কেশদ্বারা আচ্ছাদিত। রাই সরিষার ঝাঁজ অন্য জাতীয় সরিষা অপেক্ষা অধিকতর তীব্র এবং ইহাতে প্রায় 20 ভাগ তৈল আছে। শ্বেত সরিষাতে শতকরা প্রায় 33 ভাগ তৈল পাওয়া যায় এবং আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই

ইহার চাষ করা হয়। মাথি বা টোরি জাতীয় সরিষাতে শতকরা প্রায় 40 ভাগ তৈল পাওয়া যায় এবং ইহার বীজ শীঘ্রই পরিপক্ক হয়।

বর্ষাকালের পর আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে বীজ বপন করা হয়। প্রতি 1·700 বর্গমিটার জমিতে প্রায় এক কিলোগ্রাম বীজের প্রয়োজন হয় এবং ইহাতে 55-75 কিলোগ্রাম সরিষা উৎপন্ন হয়। বালুকাময় বা প্রস্তরময় উচ্চ দো-আঁশ জমিতেও সরিষার চাষ করা যায়। প্রতি 1·700 বর্গমিটার জমিতে প্রায় 25-30 কিলোগ্রাম হাড়ের গুঁড়া, প্রায় 200 কিলোগ্রাম খইল এবং প্রায় 400 কিলোগ্রাম গোবর মিশ্রিত করা যাইতে পারে। বীজ বপন করিবার পূর্বে জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করা প্রয়োজন। ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ মাস হইতে বীজ পাকিতে আরম্ভ হয়। বীজ ঘানিতে পিষিয়া সরিষার তৈল বাহির করা হয়।



১৭৮ নং চিত্র—সরিষা



১৭৯ নং চিত্র—নারিকেল

3. নারিকেল (Coconut)—নারিকেল Fam. Palmaceae বা পামী গোষ্ঠীয় বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। কাণ্ড অশাখ, স্থায়ী পত্রমূল দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ইহার অগ্রভাগে পত্রমুকুট থাকে। মূলগুলি গুচ্ছমূল। পত্রগুলি পক্ষল এবং পুষ্পগুচ্ছ মঞ্জরী-যুক্ত। পুষ্পগুলি স্প্যাডিকস্ এবং পুষ্পগুলি কাঠল নৌকার ন্যায় স্পেদ দ্বারা আবৃত। পুং-পুষ্পে ও স্ত্রী-পুষ্পে দুই স্তবকে তিনটি করিয়া পুষ্পপত্র আছে। পুং-স্তবকে 3+3টি পুংকেশর এবং স্ত্রী-স্তবকে 3টি গর্ভপত্র, ও তিনকোষ্ঠবিশিষ্ট গর্ভাশয় আছে এবং প্রতি কোষ্ঠে একটি করিয়া ডিম্বক থাকে, কিন্তু একটি মাত্র ডিম্বক পরিণত প্রাপ্ত হয় এবং অবশিষ্টগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়।

সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে এবং লবণাক্ত আর্দ্র বায়ুতে নারিকেল
পার্বত্য প্রদেশে এবং শীতপ্রধান দেশে নারিকেল গাছ জন্মাইতে দেখা যায় না।

নারিকেল গাছের উৎপত্তি স্থান সম্বন্ধে নানা প্রকার মতবাদ আছে। উদ্ভিদবিজ্ঞানী ফ্যানডোসির মতে ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জই নারিকেলের আদি জন্মস্থান, কিন্তু উদ্ভিদবিজ্ঞানী কুক সাহেব বলিয়াছেন যে, নারিকেলের উৎপত্তিস্থান হইল আমেরিকা। বিখ্যাত ভ্রমণকারী মার্কো পোলো ত্রয়োদশ এবং কম্‌মস্‌ নামক অপর এক ভ্রমণকারী ষষ্ঠ শতাব্দীতে নারিকেলকে ভারতীয় ফসল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যই হইল প্রকৃতপক্ষে নারিকেলের আদি উৎপত্তিস্থান। সাধারণত ভারতের দক্ষিণ উপকূলে, পশ্চিমবঙ্গে, বাংলাদেশে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, শ্রীলঙ্কা (সিংহল), ফিলিপাইন প্রভৃতি সমুদ্র প্রাচ্যের স্থানসমূহে এবং আফ্রিকা ও আমেরিকার উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে নারিকেল গাছ জন্মায়।

দুই শ্রেণীর নারিকেল গাছ দেখা যায় ; যথা—(1) দীর্ঘাকার, যাহা 8-10 বৎসরে ফল ধারণ করে ও প্রায় 80 বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। (2) খর্বাকার যাহা 4-5 বৎসরে ফল ধারণ করে এবং প্রায় 30 বৎসর বাঁচিয়া থাকে। দীর্ঘাকার উদ্ভিদ অপেক্ষা খর্বাকার উদ্ভিদে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়।

অতিমাত্রায় পরিণত বা ঝুনা নারিকেল কোনো আর্দ্র ছায়াযুক্ত স্থানে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য রাখিতে হয়। অন্তত এক বৎসর পরে চারাগাছগুলি চার হাত অন্তর এক হাত গভীর ও দেড় হাত প্রশস্ত গর্ত করিয়া, কাঠের ছাই, গোবর ও পরিমাণ মত লবণ সার দ্বারা পূর্ণ করিয়া বসাইতে হয়। মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চারা বসাইবার উপযুক্ত সময়। চারা বসাইবার প্রায় 7 বৎসর পরে পুষ্পবিন্যাস বাহির হইতে দেখা যায়।

নারিকেলের শুষ্ক শস্যে প্রায় 50-70 শতাংশ তৈল থাকে। শুষ্ক শস্য টুকরা টুকরা করিয়া কাটিতে হয় এবং রৌদ্রে শুকাইয়া চাপ প্রয়োগে তৈল নিষ্কর্ষণ করা হয়। শোধিত এবং বিশুদ্ধ তৈল পাইতে হইলে শস্যখণ্ডগুলি জলের সহিত ফুটাইতে হয়। ইহাতে নিষ্কাশিত তৈল জলের উপর ভাসিতে থাকিবে। তাহা উপর হইতে ছাঁকিয়া তুলিয়া অন্যত্র রাখা হয়।

দক্ষিণ ভারতে রন্ধনকার্যে নারিকেল তৈল ব্যবহার করা হয়। ভারতের অন্যত্র ইহা কেশতৈলরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্রিম মাখন, সাবান প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুত করিতেও নারিকেল তৈলের প্রয়োজন।

ইহা ছাড়া নারিকেল বৃক্ষের বিভিন্ন অংশের নানারূপ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা আছে ; যথা, অশাখ কাণ্ডের তন্তু হইতে রজ্জু প্রস্তুত করা হয় এবং খুঁটি, কড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পত্রগুলি বুনন করিয়া মাদুর, টুপি, ঝুড়ি প্রভৃতি তৈয়ারি করা হয়। পত্রকগুলির শিরা হইতে ঝাঁটা, পাখীর খাচা প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়।

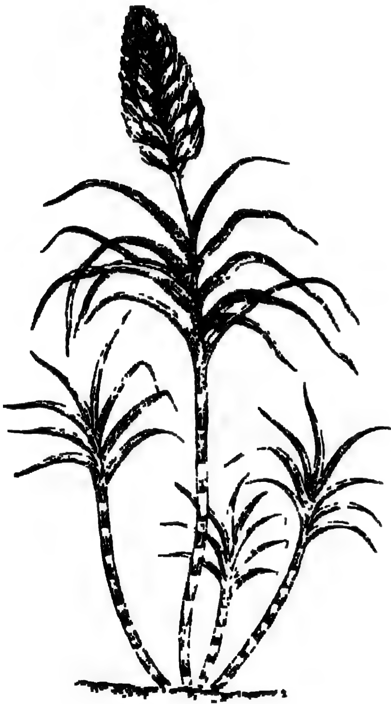
11

শর্করা-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ

(Sugar-producing Plants)

শর্করা মানুষের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা **Sugarcane** বা ইক্ষু **Sugar beet** বা বীট, **Palmyra plam** বা তালগাছ, ইত্যাদি হইতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ইক্ষু হইতে যে শর্করা প্রস্তুত হয় তাহা আমাদের প্রয়োজনে লাগে।

1. ইক্ষু (Sugarcane)—*Saccharum officinarum* বা ইক্ষু গাছ গ্রামিনী (Gramineæ) গোত্রের উদ্ভিদ। বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয়গণ কর্তৃক ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। বর্তমানে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে ইহার প্রচুর পরিমাণে চাষ হয় এবং কয়েকটি গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও ইহার চাহিদা সর্বাধিক। সাধারণ ক্ষেত্রে ইহা জন্মাইতে দেখা যায় না এবং চাষের উপরই ইহার উৎপাদন নির্ভর করে। ভারতে সর্বাধিক ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। অধিকন্তু বাংলাদেশ, আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, কিউবা, মেক্সিকো, আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানেও ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যে পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হয় তাহার মধ্যে 8-10 শতাংশ জমি উৎকৃষ্ট প্রকৃতির ইক্ষু উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যে নিয়োজিত। ভারতের মধ্যে উত্তর প্রদেশেই হইল ইক্ষু হইতে শর্করা উৎপাদনের মূল শিল্পকেন্দ্র। এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সর্বনিম্নে অবস্থিত।



১৮০নং চিত্র—ইক্ষু

ইক্ষু বহুবর্ষজীবী বলিষ্ঠ উদ্ভিদ। ইহাদের কাণ্ড বাঁশের মত দেখিতে এবং উচ্চতায় প্রায় 3-3·6 মিটার পর্যন্ত হইয়া থাকে। কাণ্ড নিরেট এবং ইহাতে প্রায় 40 শতাংশ রস থাকে। বিভিন্ন প্রকার ইক্ষুর রসে শর্করার পরিমাণেরও তারতম্য ঘটে। ইহার পুষ্পবিন্যাস বহু শাখান্বিত যৌগ রেসীম এবং পুষ্পগুলি উভলিঙ্গ হইলেও অঙ্গজ জননের দ্বারাই ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে।

সকল প্রকার মৃত্তিকাই ইক্ষু চাষের উপযোগী। নদী, ঝরণা প্রভৃতি জলাধারের পার্শ্বে অবস্থিত খনিজ পদার্থপূর্ণ লোহিত বর্ণযুক্ত মৃত্তিকায় ইক্ষুর ভাল চাষ হইয়া থাকে। চাষের জন্য বৎসরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় 200-250 সি. সি. মিটার এবং তাপমাত্রা প্রায় 24°-26·5° সেন্টিগ্রেড হওয়া প্রয়োজন।

পরিণত কাণ্ডের উপরের গ্রন্থি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড কাটিয়া মাটিতে বপন করিতে হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ঐ গ্রন্থিতে যেন তিন-চারিটি মুকুল থাকে। কর্তিত খণ্ডগুলি ছত্রাক এবং পতঙ্গ নিরোধক ঔষধ লেপনের পর সারজাত পদার্থ প্রয়োগে শুষ্ক করা হয়। এখন অগভীর গর্ত খনন করিয়া খণ্ডগুলিকে পুঁতিতে হয় এবং পরে ছাই, খড় ও অবশেষে মৃত্তিকার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া প্রায় দুই সপ্তাহ ধরিয়া এইরূপ অবস্থায় রাখা হয়। এই সময় অতিক্রান্ত হইলে দেখা যাইবে যে মুকুলগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া নূতন শাখাপ্রশাখা উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইতিমধ্যে যে জমিতে ইহাদের রোপণ করিতে হইবে তাহা উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া উপযুক্ত সার দিয়া রাখা হয়। প্রস্ফুটিত শাখাগুলিকে এই সময় ঐ জমিতে রোপণ করা হয়। যে কয়েক প্রকার সার ব্যবহার করা হয় তাহাদের মধ্যে আছে গোবর সার, অস্থিচূর্ণ, খইল, পটাসিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট ইত্যাদি। জমি আগাছা মুক্ত করা এবং মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা প্রয়োজন।

চারি বৎসর অন্তর একই জমিতে ইক্ষুর চাষ করা কর্তব্য। ইক্ষুর চাষের পূর্বে ঐ জমিতে সবুজ সারের জন্য অতসী, চিনাবাদাম, প্রভৃতি লিগুমিনোসী (Leguminosæ) গোত্রীয় উদ্ভিদের চাষ করা প্রয়োজন। আগস্ট মাসে ঐসকল উদ্ভিদের পুষ্পোৎপাদনের সময় উহাদের বিনষ্ট করিয়া অক্টোবর হইতে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ঐ জমিতে আলুর চাষ করিতে হয়। পর পর দুই বার ইক্ষুচাষের মধ্যবর্তী সময়ে গাজর, পেঁয়াজ, বেগুন, শশা প্রভৃতির চাষ করা যাইতে পারে।

বাংলাদেশের যে-সকল স্থানে উৎকৃষ্ট ইক্ষু উৎপাদন হয় সেইসকল স্থানে কখনও কখনও সার দিবার প্রয়োজন হয় না।

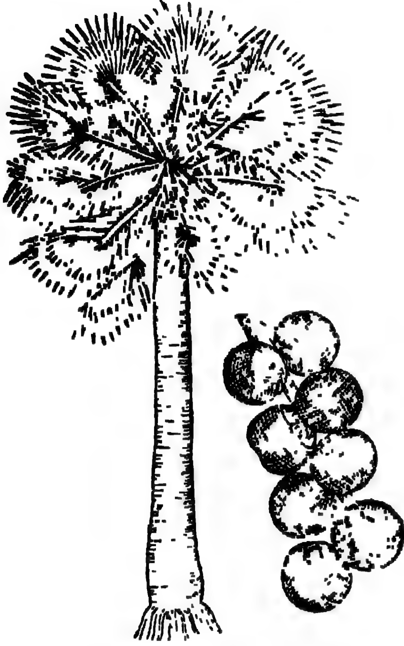
ইক্ষু গাছ রোপণ করা হইতে আরম্ভ করিয়া কাণ্ডগুলি কর্তন করা পর্যন্ত সময় লাগে দীর্ঘ আট মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত। ইক্ষুর পুষ্পগুলি যখন সবেমাত্র ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে তখন মৃত্তিকাতলের কিছু উপরিভাগ হইতে কাণ্ডগুলিকে কর্তন করিতে হয়। ঐ সময় ইহাদিগকে আঘাত করিলে একপ্রকার ধাতব শব্দ শুনা যায় এবং গ্রন্থির নিকট উহারা ভাঙ্গিয়া যায়। ভূনিম্নস্থ কাণ্ডগুলি হইতে পর পর দুই বার বা তিন বার ফসল পাওয়া যায়। ঐসকল ভূনিম্নস্থ কাণ্ডকে রেটুন (ratoons) বলে।

কাণ্ডগুলি কর্তন করিবার পর ইহাদের অনেকগুলি করিয়া একত্রে বাণ্ডিল বাঁধিয়া ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বাজারে অথবা শর্করা প্রস্তুত করিতে মিলে পাঠান হয়। ইক্ষুর রস হইতে গুড় প্রস্তুত হয়।

গুড় প্রস্তুত করিবার সময় ইক্ষুদণ্ডগুলিকে বলদচালিত পেষণযন্ত্রের সাহায্যে পেষণ করিয়া রস নিষ্কর্ষণ করা হয়। যে পাত্রে রস সঞ্চিত হইতে থাকে তাহা পূর্ণ হইলেই জাল দেওয়া কর্তব্য। অধিকক্ষণ ফেলিয়া রাখিলে রসের অম্লতা বৃদ্ধি পাইবে। অম্লতা দূর করিবার জন্য স্বল্প চুনের জল মিশান যাইতে পারে। রস ফুটিতে থাকিলে উহাতে জল ছিটাইতে হয়। ইহাতে রসের গাদ বা ময়লাভাব উপরে উঠিয়া ভাসিতে থাকে।

তখন ইহা ছাঁকিয়া তুলিয়া ফেলিতে হয়। যখন রস গাঢ় হইতে থাকে তখন অধিক জাল দেওয়া কর্তব্য। রস অধিক ঘন হইতে থাকিলে উহাকে নাড়িতে হয় এবং উপযুক্ত ঘন হইলে উহা গুড়ে পরিণত হয়। তখন পাত্রমধ্যস্থ গুড় অন্য পাত্রে ঢালিয়া শীতল স্থানে রাখিয়া দিলে দানাদার গুড় প্রস্তুত হয়।

2. **তাল** (*Palm or Palmyra Palm*)—*Borassus flabellifer* বা তালগাছ পাম্যসী (Palmaceae) গোত্রীর উদ্ভিদের অন্তর্গত। ইহা ভিন্নবাসী বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহার কাণ্ড অনধিক 12-15 মিটার উচ্চ এবং বহু সংখ্যক multicostate divergent venation বা বহুশিরাল অপশারী শিরাযুক্ত করতলাকার খণ্ডিত পাতা কাণ্ডের উপরিভাগে মুকুটের ন্যায় সজ্জিত থাকে। পত্রবৃন্ত সুদৃঢ় এবং পত্রমূল কাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া থাকে। কাণ্ডের উপর পাতাগুলি একান্তরূপে সাজান থাকে এবং পাতাগুলি বিচ্ছিন্ন হইলে ইহারা কাণ্ডের গাত্রে leaf scar বা পত্রক্ষত রাখিয়া যায়। পুষ্পমঞ্জরী হইল স্প্যাডিক্স (spadix) এবং পীতাভ সবুজ বর্ণের ক্ষুদ্র পুষ্পগুলি একটি বিশিষ্ট স্পেদ (spath) দ্বারা আবৃত থাকে। ফলগুলি হইল ড্রুপ (drupe)। তালগাছের চারিটি প্রজাতি আছে তাহার মধ্যে *B. flabellifer* নামক প্রজাতিটি ভারতে এবং বাংলাদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের জন্মস্থান আফ্রিকাতে হইলেও শ্রীলঙ্কা, বর্মা, মালয়েশিয়া, সমুদ্রের উপকূল অঞ্চল ও ভারতের শুষ্ক অঞ্চলেও ইহাদের জন্মাইতে দেখা যায়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্রে ইহাদের চাষ করা হয়।



১৮১ নং চিত্র—তাল

তালের রস হইতে তাড়ি প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে কিছু পরিমাণ শর্করাও উৎপাদন করা যায়। রস পাইতে হইলে প্রায় 30 বৎসরের পুরাতন পুং-এবং স্ত্রী-উদ্ভিদ নির্বাচন করা হয়। এই সময়ে অপ্রস্ফুটিত পুষ্পমঞ্জরীটির অগ্রভাগ কাটিয়া উহাতে চুন লেপন করা আবশ্যক। কিছুদিন পরে ঐ স্থান পুনরায় চাঁচিয়া ফেলিলে উহা হইতে রস নির্গত হইতে থাকে। তখন একটি পাত্র ঐ স্থানে ঝুলাইয়া দিলে উহাতে রস সংগৃহীত হয়। মনে রাখিতে হইবে যে তিন বৎসর পর পর রস সংগ্রহের পর চতুর্থ বৎসরে উদ্ভিদদিগকে বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন।

এইরূপে নূতন সংগৃহীত রসে প্রায় 12-14 শতাংশ শর্করা থাকে। ইহা স্বচ্ছ এবং ইহাতে একপ্রকার বিশিষ্ট গন্ধ আছে। ইহা ভাইটামিন বি-এর একটি মূল্যবান উৎস।

রস সংগ্রহের পর শীঘ্রই ইহা জারিত হইয়া কোহলে পরিণত হয় এবং 6-8 ঘণ্টার মধ্যেই ইহা প্রায় তিন শতাংশ কোহল উৎপন্ন করে।

তালের গুড় প্রস্তুত করিবার সময় রসকে ছাঁকিয়া ফুটাইতে হয়। ইহাতে রস ঘন হয়। ফুটাইবার সময় রসের উপরিভাগে স্বল্প পরিমাণ বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল মিশান প্রয়োজন। ইহাতে রসের উপরিভাগে সর পড়ে না। প্রায় দুই ঘণ্টা ফুটাইবার পর উনানের তাপমাত্রা হ্রাস করিয়া ঘন রসকে উত্তমরূপে নাড়িয়া ঠাণ্ডা করিতে হয়। রসটি উপযুক্ত ঘন হইলে একটি কাষ্ঠনির্মিত ছাচে ঢালিতে হয়। 15-20 মিনিটের মধ্যেই গুড় জমিয়ে পাটালি প্রস্তুত হয়।

তালের মিছরি প্রস্তুত করিবার সময় রসকে পূর্বের ন্যায় ফুটাইতে হয় কিন্তু অধিক ঘন করিবার প্রয়োজন হয় না। এইবার ইহাকে একটি বন্ধ পাত্রে রাখিয়া কয়েক মাস ধরিয়া মাটির নিচে পুঁতিয়া রাখা হয়। এইরূপে পাত্রের মধ্যে মিছরির কেলাস সঞ্চিত হয়।

তালের রস হইতে মিছরি এবং গুড় উৎপাদন নপাতা হইতে হাতপাখা প্রস্তুত হয় এবং উহাতে একপ্রকার শক্ত তন্তু আছে যাহা হইতে দাড় প্রস্তুত হয়।

3. খেজুর (Date Palm)—*Phoenix sylvestris* বা খেজুর গাছ পাম্যাসী Fam. Palmaceae) গোত্রের উদ্ভিদের অন্তর্গত। ইহা ভিন্নবাসী বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। প্রধান কাণ্ড দৃঢ়, সাধারণত অশাখ ও খাড়ভাবে দণ্ডায়মান। ইহার উপরিভাগে অবস্থিত পাতাগুলি মুকুটের ন্যায় সাজান থাকে। পাতাগুলি সুদৃঢ়, পক্ষল ও একান্তর রূপে সজ্জিত এবং পত্রের অগ্রভাগ কণ্টকাকৃতি কাণ্ডে বহুসংখ্যক স্থায়ী পত্রবৃন্তের নিম্নাংশ দেখা যায়। পুষ্পমঞ্জরী বহু শাখান্বিত যৌগ রেসীম এবং ইহা স্পেদ দ্বারা আবৃত।



১৮৩ নং চিত্র—খেজুর

ভারতবর্ষের এবং বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই খেজুর গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দেশের গাছ হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় রস পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে পাতলা ও দানাদার গুড় ও পাটালি প্রস্তুত করা হয়। ইহার মধ্যে নলেন গুড় নামক একপ্রকার সুগন্ধ পাতলা গুড় উল্লেখযোগ্য।

বর্ষাকালে ইহার বীজ বপন করা হয়। সুপক্ক বীজ হইতে চারা উৎপাদন করিয়া ঐ চারা পুনরায় রোপণ করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে যেখানে সেখানে বীজ পড়িয়া উহা অযত্নে অঙ্কুরিত হইয়া নূতন গাছ জন্মায়। খেজুর গাছ রোপণ

করিবার পর প্রতি বৎসরই গাছের গোড়ায় পাঁক মাটি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই সময় গাছের গোড়ার চতুর্দিকে খুঁড়িয়া এইরূপ অবস্থায় কিছুদিন ফেলিয়া রাখা হয়। ইহাতে গাছ সতেজ থাকে এবং বৃদ্ধি দ্রুততর হয়। সাত-আট বৎসরের মধ্যেই গাছের ফল পাওয়া যায়। ইহার ফল খাইতে মিষ্ট ও সুস্বাদু। ভারতীয় খেজুরের স্বল্প শাঁস থাকে এবং বীজ বড় হয় কিন্তু আরব দেশে একপ্রকার খেজুরের প্রজাতি পাওয়া যায় যাহার বীজ অতি ক্ষুদ্র কিন্তু শাঁসের পরিমাণ অধিক।

সাধারণত খেজুর গাছ তিন-চারি বৎসরের হইলেই তাহা হইতে রস সংগ্রহ করা যাইতে পারে। শীতের প্রারম্ভে অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারি পর্যন্ত রস সংগ্রহ করা চলে। প্রতি বৎসরই পত্রগুচ্ছের কিছু নিম্নে প্রায় 35 সেণ্টিমিটার স্থান চাঁচিয়া ফেলিতে হয়। কিছুদিন বিরতির পর ঐ স্থানের অর্ধাংশ আরও গভীরভাবে চাঁচিতে হয়। ইহাতে ঐ স্থান হইতে রস নির্গত হইতে থাকে। ইহার পর প্রায় সতের সেণ্টিমিটার দীর্ঘ একটি সরু নল বা একখণ্ড কঞ্চি লইয়া একদিক সরু করিয়া চাঁচিয়া সরু প্রান্তটি ঐ স্থানে প্রবেশ করান হয়। এখন ঐ নলের বা কঞ্চির নিম্নে একটি পাত্র ঝুলাইয়া রাখিলে উহাতে রস সঞ্চিত হয়। তিন-চারি দিন ধরিয়া এইরূপে প্রক্রিয়ায় রস সংগ্রহ করিয়া চার-পাঁচ দিন বিরতির পর পুনরায় ক্ষত স্থানটি চাঁছা হয়। ইহাতে উৎকৃষ্ট রস পাওয়া যায়। প্রাতঃকালেই গাছ হইতে রস নামাইয়া গুড় প্রস্তুত করা কর্তব্য নচেৎ বিলম্ব হইলে উহা জারিত হইয়া তাড়িতে পরিণত হয়। যে পাত্রে রস সংগ্রহ করা হয় তাহা উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া ভিতরে চুনের প্রলেপ দেওয়া হয়। গাছের কর্তিত অংশটিও উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া তবে রস সংগ্রহ করিবার পাত্র ঝুলান প্রয়োজন। রস জাল দিবার সময় তেঁতুলগোলা জল বা ফটকিরি মিশাইলে অতি উজ্জ্বলবর্ণের গুড় পাওয়া যায়। ইক্ষুর গুড় যে প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয় সেই প্রক্রিয়াতেই খেজুর রস জাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করা হয়।

———

৬

তন্তু-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ
(Fibre-Producing Plants)

সাধারণত বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ হইতে আমাদের নিত্যব্যবহার-উপযোগী উপাদান স্বরূপ তন্তু পাইয়া থাকি। প্রয়োজনের মান অনুসারে খাদ্যের পর ইহার স্থান দ্বিতীয়। এই সকল উদ্ভিদের মধ্যে তুলা, হেম্প, ফ্ল্যাক্স প্রভৃতি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পথের সহায়ক। তন্তু হইতে বস্ত্র, বয়নজাত সামগ্রী, টুপি, আসন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এমনকি কাগজশিল্পেও ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত উদ্ভিদের বিভিন্ন তন্তুজ কলা, পাতা, বীজের রোম প্রভৃতি হইতে তন্তু উৎপন্ন হয়। পাট, মেস্তা, ফ্ল্যাক্স প্রভৃতি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কাণ্ডের ফ্লোয়েম কলা ও তৎসংলগ্ন তন্তুজ কলা হইতে তন্তু পাওয়া যায়। কার্পাস, শিমুল প্রভৃতি গাছের বীজত্বকের উপর যে রোম দেখা যায় তাহা হইতেই তুলা পাওয়া যায়। আনারস, অ্যালো প্রভৃতির পাতার ভ্যাসকুলার বাণ্ডিলে ঘন লিগনিনযুক্ত স্ক্লেরেনকাইমা কলা থাকে যাহা ক্রমে তন্তুতে পরিণত হয়।

1. **কার্পাস তুলা** (Karpas Cotton)—কার্পাস তুলা শিল্পজগতের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। ইহা *Gossypium* (গসিপিয়াম) নামক গণের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতির বীজ হইতে উৎপন্ন হয়।

প্রাচীনকালে যখন অন্যান্য দেশে সভ্যতার আলোকমাত্র প্রবেশ করে নাই তাহারাও বহু পূর্বে ভারতে কার্পাস শিল্পের প্রচলন ছিল। ভারতেই যে ইহার আদি জন্মস্থান এসম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। প্রবাদ আছে যে আলেকজাণ্ডারের সাথে যে-সকল গ্রীক-দেশীয় ব্যক্তি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মাধ্যমেই ইউরোপের অধিবাসিগণ কর্তৃক তুলা গাছ সম্পর্কে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা জন্মায়। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ভারতবর্ষ হইতেই কার্পাস তুলার চাষ ও বস্ত্র শিল্পের প্রচলন আরম্ভ হয়। অধুনা আমেরিকা, জাপান, মিশর, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ ইহার চাষ ও শিল্পে ভারত অপেক্ষা অধিকতর উন্নত।



১৮৩নং চিত্র—কার্পাস

কার্পাস তুলার গাছ **বহুবর্ষজীবী** গুল্ম বা বৃক্ষ। ইহার উচ্চতা প্রায় তিন-চার মিটার পর্যন্ত হইয়া থাকে। পাতাগুলি একান্তর করতলাকার খণ্ডিত ; পুষ্পগুলি বৃহৎ ও দেখিতে মনোরম এবং ফলগুলি

বিদারী ক্যাপসিউল। বীজত্বকের কতকগুলি ত্বককোষ উদ্গত হইয়া সূক্ষ্ম রোমের সৃষ্টি করে ; তাহা তুলা নামে পরিচিত। কার্পাস তুলার বিভিন্ন varieties বা প্রকারে রোমের দৈর্ঘ্য ও অন্যান্য গুণাবলীর তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। পরিণত তন্তুগুলি কিয়ৎ চেপ্টা, এবং পাকান। এইরূপ স্বাভাবিক পাকের উপর তুলার মান নির্ভর করে। অধিকন্তু তন্তুর দৈর্ঘ্য, সূক্ষ্মতা, দৃঢ়তাও উৎকৃষ্ট তন্তুর মানের পরিচায়ক।

ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, বর্মা, চীন, জাপান, ইরান, সুদান, আরব প্রজাতন্ত্রী দেশগুলি, আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস তুলার চাষ হইয়া থাকে।

কার্পাস গাছের বিভিন্ন প্রজাতি আছে এবং ইহাদেরও আবার কয়েকটি varieties বা প্রকার দেখা যায়। ভারত ও বাংলদেশে অবস্থিত প্রজাতিগুলির বিষয় সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল।

(*a*) **বুড়ী কার্পাস** (Burhi cotton)—ইহা *Gossypium arboreum* (গসিপিয়াম আরবরিয়াম) নামক প্রজাতি হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা গুল্ম শ্রেণীর কার্পাস। বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় ইহা যথেষ্ট পরিমাণে জন্মায়।

(*b*) **নউসারি কার্পাস** (Nausari cotton)—ইহা *G. herbaceum* (গ. হারবেসিয়াম) নামক একটি ভারতীয় প্রজাতি। ইহা ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে জন্মায়।

(*c*) **মিশরদেশীয় কার্পাস** (Egyptian cotton)—এই প্রকার কার্পাস *G barbadense* (গ. বারবাডেন্স) নামক প্রজাতির একটি variety বা প্রকার এবং ইহা পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশে চাষ করা হয়।

(*d*) **ধারওয়ার কার্পাস** (Dharwar cotton)—ইহা *G. barbadense* (গ. বারবাডেন্স (নামক প্রজাতি হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার তন্তু অতি সূক্ষ্ম এবং বোম্বাই প্রদেশে ইহার চাষ হয়।

(*e*) **বাণী কার্পাস** (Bani cotton)—ইহা *G indicum* (গ. ইন্ডিকাম) নামক প্রজাতি হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার তন্তুও অতি সূক্ষ্ম এবং ইহার মধ্যপ্রদেশে চাষ হয়।

(*f*) **ঢাকা কার্পাস** (Dacca cotton)—ইহা বার্ষিক কার্পাস। বাংলাদেশের ঢাকা জেলা, যাহা পূর্বে অবিভক্ত বাংলার অন্তর্গত ছিল, ইহার আদি জন্মস্থান এবং ঐস্থানেই ইহার চাষ প্রচলন ছিল। ইহার সূতা হইতেই বিখ্যাত ঢাকার মসলিন প্রস্তুত হইত।

(*g*) **উচ্চভূমিতে অবস্থিত কার্পাস** (Upland cotton)—এইপ্রকার কার্পাস *G. hirsutum* (গ. হিরসুটাম) নামক প্রজাতির অন্তর্গত। ইহা প্রধানত উত্তরপ্রদেশে এবং বিহারে চাষ করা হয়।

(*h*) **কুমিল্লা কার্পাস** (Comilla cotton)—ইহা *G. cernuum* গ. সরনুয়াম) নামক প্রজাতিতে পাওয়া যায়। ইহার তন্তু ক্ষুদ্রাকার হইয়া থাকে।

(*i*) **সি আইল্যান্ড কার্পাস** (Sea island cotton)—**ইহা মার্কিন দেশীয় কার্পাস। মিশরদেশীয় তুলার ন্যায় ইহার তুলাও উৎকৃষ্ট প্রকৃতির। এখন ভারতে কৃতকার্যের সহিত ইহার চাষ হইতেছে।**

শুষ্ক অঞ্চলেই কার্পাস তুলার চাষ হয়। Black soil বা কৃষ্ণ মৃত্তিকা নামক একপ্রকার কর্দমাক্ত মৃত্তিকা ইহার চাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। এইপ্রকার মৃত্তিকায় সহজেই বায়ু চলাচল ও জল প্রবেশ করিতে পারে। সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর প্রান্তে পলিমাটিযুক্ত সমতল ভূমিতেও ইহার চাষ ভাল হয়।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে নাইট্রোজেন, পটাশ ও ফসফরিক অ্যাসিডের উপযুক্ত মিশ্রণের সার জমিতে প্রয়োগ করিলে গাছগুলি সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়। এই প্রকার সার 7.5 সেণ্টিমিটার গভীরতায় মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করা প্রয়োজন।

বর্ষার প্রারম্ভেই বীজ বপন করিতে হয়। বপন করিবার পূর্বে গ্রীষ্মকালে জমি কয়েকবার কর্ষণ করা প্রয়োজন। মে মাসে জমিতে সার দেওয়া হয় এবং জুন মাসে বীজগুলি একর প্রতি 4.5-7.5 কিলোগ্রাম করিয়া প্রায় 50 সেণ্টিমিটার কম ব্যবধানে বপন করিতে হয়। কৃষ্ণ মৃত্তিকায় বৃষ্টিপাতের ফলে বীজগুলি নষ্ট হইতে পারে; সেইজন্য সুষ্ঠু অঙ্কুরোদ্গমের জন্য পর পর যথাক্রমে দুইবার কিংবা তিনবার বীজ বপন করা প্রয়োজন। বীজগুলি অঙ্কুরিত হইলে জমি আগাছা মুক্ত করা কর্তব্য। চারাগাছগুলি প্রায় দশ সেণ্টিমিটার বৃদ্ধি পাইলে দুর্বল চারাগাছগুলিকে অপসারণ করিয়া সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর মাসে দুইটি সারির মধ্যবর্তী মৃত্তিকা পুনরায় কর্ষণ করিতে হয়। এইরূপ করিলে কৃষ্ণ মৃত্তিকার ক্ষেত্রে কখনও অসময়ে ফাটল জন্মায় না এবং ইহার জল ধারণ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অক্টোবর অথবা নভেম্বর মাস হইতেই বলিষ্ঠ গাছগুলিতে নূতন পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ করে। জানুয়ারী হইতে এপ্রিল—এই চারি মাস ধরিয়া চারবার অথবা পাঁচবার ফলগুলি সংগ্রহ করিতে হয়। ফলগুলিকে Bolls (বোল) বলে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারের সংগৃহীত বোল হইতে পরবর্তী ঋতুর চাষে উত্তম বীজ পাওয়া যায়। ইহার পরেও বহু দেশে বোল সংগ্রহ করিতে দেখা যায়। উৎকৃষ্ট কার্পাস তুলা পাইতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির উপর দৃষ্টি রাখা কর্তব্য ; যথা—

(*i*) গাছগুলি যেন বলিষ্ঠ হয় এবং সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি পায় ও ইহারা যেন রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা অর্জন করে।

(*ii*) বীজপ্রতি তন্তুর শতকরা পরিমাণ এবং একর প্রতি বীজ উৎপাদনের পরিমাণ।

(*iii*) তন্তুর দৈর্ঘ্য, সূক্ষ্মতা, উজ্জ্বলতা এবং বর্ণ।

আমেরিকার তুলনায় ভারতে স্বল্প পরিমাণ কার্পাস জন্মায়। দেখা গিয়াছে যে আমেরিকায় যে পরিমাণ কার্পাস উৎপন্ন হয় তাহা ভারতের তুলনায় তিন গুণ অধিক।

কার্পাস তুলা হইতে বিভিন্ন প্রকার সূতি বস্ত্র প্রস্তুত হয়। মোটর গাড়ীর টায়ার **উৎপাদনেও ইহার প্রয়োজন হয় এবং ইহাতে কেবলমাত্র সেলুলোজ থাকে বলিয়া বিভিন্ন সেলুলোজ শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ইহার ব্যবহার হয়।** বালিশের খোল এবং গদির

কাপড়ে কার্পাস তুলা ভরিয়া বালিশ ও গদি প্রস্তুত হয়। কার্পাস গাছের মূল ও বৃন্ত কাগজ ও ঔষধ প্রস্তুত করিতে প্রয়োজন হয়। কার্পাসের বীজ হইতে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায় যাহা খনিজ রৌপ্যের যৌগ হইতে ধাতব রৌপ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। ইহা রন্ধনকার্যে এবং সাবান প্রস্তুত করিতেও ব্যবহার করা যায়। তৈল নিষ্কর্ষণের পর যে খইল পাওয়া যাওয়া যায় তাহাতে পাঁচ শতাংশ নাইট্রোজেন থাকে এবং ইহা সার হিসাবে ও গৃহপালিত পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বীজগুলি পেশণ না করিলে ইহাতে **গসিপল** (gossypol) নামক একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ থাকে কিন্তু পেষণ করিলে পর ইহা বীজের প্রোটিনের সংস্পর্শে আসিয়া বিষমুক্ত হয় এবং কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন করিতে পারে না।

2. **পাট** (Jute)—বয়ন তন্তুর মধ্যে পাট অন্যতম, কারণ ইহা দামে সস্তা। ইহা Fam. Tiliaceae (টিলিয়াসী গোত্রীয়) উদ্ভিদের *Corchorus* (কর্কোরাস) গণভুক্ত। পাট বহু প্রকারের আছে। উহা সাধারণত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা *Corchorus capsulars* বা তেতো পাট এবং *corchorus oltiorius* বা মিটা পাট। মিঠা পাটের চাষ উচ্চ বা ডাঙ্গা জমিতে এবং তেতো পাটের চাষ নিম্ন বা জলা জমিতে হইয়া থাকে। মিঠা পাটের ফল লম্বাকৃতি এবং বীজ সবুজ বর্ণের ও তেতো পাটের ফল গোলাকার ও বীজ প্রায় লোহিত বর্ণের হয়। মিঠা পাট অপেক্ষা তেতো পাটের তন্তুগুলি অপেক্ষাকৃত শক্ত। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে অবিভক্ত বঙ্গদেশেই সর্বাধিক পাট উৎপন্ন হইত কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশেই সর্বাধিক পাট চাষ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত নেপাল, চীন, জাপান, ভিয়েৎনাম, রাশিয়া, মেক্সিকো, ব্রেজিল প্রভৃতি স্থানেও পাটের চাষ হয়।



১৮৪ নং চিত্র—পাট

প্রায় 79 শতাব্দীতে মিশরে সর্বপ্রথম টবে পাট গাছ উৎপন্ন করা হইত এইরূপ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। Jarrat (জ্যারাট) নামক একজন বিশেষজ্ঞের মতে পূর্বে দরিদ্র ব্যক্তিগণ যে কাপড় পরিধান করিত তাহা পাট হইতে প্রস্তুত করা হইত। Hamilton (হ্যামিলটন) নামক অপর এক বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশের দিনাজপুর জেলায় প্রথম ভারতীয় পাট চাষের সূত্রপাত হয়। ভারতীয় পাট চাষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই, বিহারের পূর্ণিয়া জেলায়, উড়িষ্যার কটক জেলায় এবং আসামের নওগাঁ, গোয়ালপাড়া এবং দারাং জেলায় বর্তমানে পাটের চাষ করা হয়। ইহা ব্যতীত ত্রিবাঙ্কুর, ত্রিপুরা, মনিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পাট চাষে

সুফল পাওয়া গিয়াছে। এই চাষের প্রসারের জন্য বর্তমানে বিশেষজ্ঞগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

পাট গাছ বর্ষজীবী উদ্ভিদ এবং উচ্চতায় 1·5 মিটার হইতে 4·5 মিটার পর্যন্ত হয়। কান্ড সূক্ষ্ম, একান্তর পত্রবিন্যাসযুক্ত; পুষ্পগুলি ক্ষুদ্র, পীতবর্ণের এবং ফলগুলি ক্যাপসিউল।

পাট গাছ বর্ষাকালের উদ্ভিদ। মার্চ হইতে মে মাসের মধ্যে মাঝারি পরিমাণ বৃষ্টিপাত এবং 16°-28° সেন্টিগ্রেড আর্দ্র উষ্ণতায় উদ্ভিদগুলির সুষ্ঠু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সর্বপ্রকার মৃত্তিকাতেই পাট জন্মায়। অবশ্য উহা অতিমাত্রায় কর্দমাক্ত অথবা বালুকাময় হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

বীজ বপনের পূর্বে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে অথবা মার্চের প্রথমে জমিকে পাঁচ ছয় বার কর্ষণ এবং তাহার পর আড়াআড়িভাবে কর্ষন করা প্রয়োজন এবং প্রতি কর্ষণের পর মৃত্তিকাকে উত্তমরূপে মই দিতে হয়। গোবর, কচুরিপানা প্রভৃতি সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অধুনা **অ্যামোনিয়াম সালফেট** (ammonium sulphate) মৃত্তিকাতে মিশ্রিত করা হয়।

ফেব্রুয়ারী হইতে জুন মাস পর্যন্ত প্রতি একর জমিতে 3-4·5 কিলোগ্রাম বীজ বপন করিতে হয়। নিম্নভূমিতে মার্চ মাসের মধ্যেই বীজ বপন করা প্রয়োজন। বীজ বপনের পর জমি কর্ষণ করা উচিত নয়, কিন্তু বীজগুলি আবৃত করিবার জন্যই মই দেওয়া প্রয়োজন। জমিতে উপযুক্ত জল থাকিলে তিন-চার দিনের মধ্যেই বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়। চারাগাছগুলি প্রায় 23 সেন্টিমিটার দীর্ঘ হইলে প্রতি পনের দিন অন্তর দুই বার অথবা তিন বার দুর্বল চারাগুলিকে তুলিয়া জমিকে আগাছা করা প্রয়োজন। উদ্ভিদগুলি প্রায় 30 সেন্টিমিটার দীর্ঘ হইলে আগাছা তুলিয়া জমিকে পুনরায় আগাছা করিতে হইবে।

একই জমিতে প্রতি বৎসর পাট গাছের চাষ করা যায় অথবা আলু অথবা ডাইল চাষের পর পাটের চাষ করা যাইতে পারে।

পাট গাছের ফুল হইতে ফলধারিবার কিছু পরে উদ্ভিদগুলি কাটিয়া ফেলা প্রয়োজন। ইহাতে উপযুক্ত তন্তু পাওয়া যায়। পরিণত গাছগুলি কাটিলে অধিক পরিমাণে তন্তু পাওয়া যায় বটে কিন্তু তন্তুগুলি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হয়। *C. capsularis* (কর্কোরাস ক্যাপসুলারিস) জুন হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাটা হয় কিন্তু *C. olitorius* (কর্কোরাস অলিটোরিয়াস) আগস্ট হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাটিতে হয়।

উৎকৃষ্ট প্রকৃতির তন্তু পাইতে হইলে পাট গাছের চারা যখন ছাত্রিশ-চল্লিশ দিনের মতন হয় তখন প্রতি পনের দিন অন্তর সকালবেলা একর প্রতি জমিতে 250 লিটার জলে 5 কিলোগ্রাম ইউরিয়া দ্রবীভূত করিয়া পাতায় স্প্রে করা প্রয়োজন।

উচ্চ জমিতে যে-সকল পাট গাছ জন্মায় তাহাদের কাটিবার পর পাতাগুলি যাহাতে ঝরিয়া যায় সেইজন্য কিছুদিনের জন্য ইহাদের জমিতে ফেলিয়া রাখা হয় এবং পরে বান্ডিল করিয়া বাঁধা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গাছ কাটিবামাত্র বান্ডিল বাঁধা

করিবার পর প্রতি বৎসরই গাছের গোড়ায় পাঁক মাটি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই সময় গাছের গোড়ার চতুর্দিকে খুঁড়িয়া এইরূপ অবস্থায় কিছুদিন ফেলিয়া রাখা হয়। ইহাতে গাছ সতেজ থাকে এবং বৃদ্ধি দ্রুততর হয়। সাত-আট বৎসরের মধ্যেই গাছের ফল পাওয়া যায়। ইহার ফল খাইতে মিষ্ট ও সুস্বাদু। ভারতীয় খেজুরের স্বল্প শাঁস থাকে এবং বীজ বড় হয় কিন্তু আবর দেশে একপ্রকার খেজুরের প্রজাতি পাওয়া যায় যাহার বীজ অতি ক্ষুদ্র কিন্তু শাঁসের পরিমাণ অধিক।

সাধারণত খেজুর গাছ তিন-চারি বৎসরের হইলেই তাহা হইতে রস সংগ্রহ করা যাইতে পারে। শীতের প্রারম্ভে অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারি পর্যন্ত রস সংগ্রহ করা চলে। প্রতি বৎসরই পত্রগুচ্ছের কিছু নিম্নে প্রায় 35 সেণ্টিমিটার স্থান চাঁচিয়া ফেলিতে হয়। কিছুদিন বিরতির পর ঐ স্থানের অর্ধাংশ আরও গভীরভাবে চাঁচিতে হয়। ইহাতে ঐ স্থান হইতে রস নির্গত হইতে থাকে। ইহার পর প্রায় সতের সেণ্টিমিটার দীর্ঘ একটি সরু নল বা একখণ্ড কঞ্চি লইয়া একদিক সরু করিয়া চাঁচিয়া সরু প্রান্তটি ঐ স্থানে প্রবেশ করান হয়। এখন ঐ নলের বা কঞ্চির নিম্নে একটি পাত্র ঝুলাইয়া রাখিলে উহাতে রস সঞ্চিত হয়। তিন-চারি দিন ধরিয়া এইরূপ প্রক্রিয়ায় রস সংগ্রহ করিয়া চার-পাঁচ দিন বিরতির পর পুনরায় ক্ষত স্থানটি চাঁছা হয়। ইহাতে উৎকৃষ্ট রস পাওয়া যায়। প্রাতঃকালেই গাছ হইতে রস নামাইয়া গুড় প্রস্তুত করা কর্তব্য নচেৎ বিলম্ব হইলে উহা জারিত হইয়া তাড়িতে পরিণত হয়। যে পাত্রে রস সংগ্রহ করা হয় তাহা উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া ভিতরে চুনের প্রলেপ দেওয়া হয়। গাছের কর্তিত অংশটিও উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া তবে রস সংগ্রহ করিবার পাত্র ঝুলান প্রয়োজন। রস জাল দিবার সময় তেঁতুলগোলা জল বা ফটকিরি মিশাইলে অতি উজ্জ্বলবর্ণের গুড় পাওয়া যায়। ইক্ষুর গুড় যে প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয় সেই প্রক্রিয়াতেই খেজুর রস জাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করা হয়।

7

উদ্দীপক পদার্থ-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ
(Beverage-producing Plants)

পৃথিবীর প্রতি সভ্য দেশের জনগণ নিজ নিজ উদ্দীপক পদার্থ-প্রদানকারী উদ্ভিদ উৎপাদন করেন। ইহাদের মধ্যে চা সর্বোৎকৃষ্ট; কারণ পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেই ইহার ব্যবহার করেন। বহু পূর্বকালে চীনদেশে ইহার প্রচলন ছিল এবং তাহারাই প্রথমে ইহাকে টী (tea) নামে আখ্যায়িত করেন। ক্রমে ষোড়শ শতাব্দীতে ইহা ইওরোপে এবং তথা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া রাশিয়া ও কানাডায় বিস্তার লাভ করে। প্রয়োজনীয়তার মান অনুযায়ী চা-এর পরে কফির স্থান। ইহা ব্যতীত আরও বহু প্রকারের উদ্দীপক পদার্থের গাছ আছে এবং উহাদের প্রত্যেকেরই ক্যাফিন (caffeine) নামক একপ্রকার alkaloid বা উপক্ষার থাকে যাহা স্নায়ু এবং মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করে।

1 **চা** (Tea) —Fam. Cameliaceae বা ক্যামেলিয়াসী গোত্রীর *Camelia thea* (ক্যামেলিয়া থিয়া) নামক উদ্ভিদের পাতা হইতে চা প্রস্তুত করা হয়। চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম চীনারা চা পান করিতে আরম্ভ করে। 1662 খ্রীষ্টাব্দে Albert de Mandello (এলবার্ট ডি ম্যানডেলেস্লো) নামক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেন যে সম্ভবত ইংরাজদের পূর্বে ভারতীয়রা চা পান অভ্যাস করে। ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে ইহা হল্যাণ্ডে লইয়া যায় এবং তথা হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়।

কেহ কেহ মনে করেন যে চা-গাছ আসাম এবং সন্নিকটবর্তী অঞ্চলের স্থানীয় উদ্ভিদ; আবার কাহারও মতে দক্ষিণ ইউনান এবং উত্তর ইন্দোচীনেই ইহার প্রাকৃতিক জন্মভূমি। বর্তমানে গ্রীষ্মমণ্ডল এবং নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চায়ের চাষ হইয়া থাকে। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে প্রধানত ভারতবর্ষ, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, জাপান চীন, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া এবং ফরমোসা প্রভৃতি স্থানে চায়ের চাষ হইয়া থাকে। আবার ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির পার্বত্য প্রদেশসমূহে, আসামের ব্রহ্মপুত্র এবং সুরমা উপত্যকাসমূহে, দক্ষিণ মালাবারের নীলগিরি পর্বতমালার এবং পশ্চিমঘাট পর্বতের পার্বত্য প্রদেশসমূহে চায়ের চাষ হয়।

উন্মুক্ত স্থানে অথবা 2 100 – 2.400 মি উচ্চ পর্বতগাত্রে বালুসিয় মমুন্ত আ্যসিড-মৃত্তিকায় চা-গাছ রোপণ করা হয়। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 230—500 সেন্টিমিটার এবং উষ্ণতা 20 – 30 সেন্টিগ্রেড হওয়া দরকার। মৃত্তিকার জল নিষ্কাশন-ব্যবস্থা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। সম্পূর্ণ উন্মুক্ত স্থান অপেক্ষা ঈষৎ ছায়াযুক্ত স্থানে উদ্ভিদগুলির বৃদ্ধি ভাল হয়।

যদিও সাধারণত বীজ হইতে চারাগাছ উৎপন্ন হয় তথাপি কাণ্ডের কলম করিয়াও চারা উৎপন্ন করা যায়। মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে উত্তমরূপে প্রস্তুত বীজতলায় 10—33 সেন্টিমিটার ব্যবধানে বীজ বপন করিতে হয়। ছয় মাস পরে চারাগাছগুলিকে

উত্তমরূপে কর্ষিত নাইট্রেট এবং পটাশ মিশ্রিত সার দেওয়া জমিতে রোপণ করা হয়। এই সময়ে চারাগুলিকে 1·5 মিটার ব্যবধানে square planting method বা বর্গরোপণ প্রণালী অথবা 1 5 মিটার ব্যবধানে trianglar planting method বা ত্রিভুজরোপণ প্রণালীতে রোপণ করা হয়। নূতন পাতার ঝোপ (bushes) সৃষ্টি করবার জন্য বর্ধণশীল উদ্ভিদটিকে বারংবার ছাঁটিবার প্রয়োজন।

রোপণের তৃতীয় অথবা চতুর্থ বৎসর হইতে প্রতি বৎসর মার্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া অক্টোবর মাসের প্রথম পর্যন্ত হস্তের দ্বারা অথবা কাঁচি দ্বারা ছাঁটিয়া চায়ের পাতা সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহের প্রকৃতি এবং ট্যানিনের পরিমাণ অনুযায়ী চায়ের পাতার বৈশিষ্ট্য নির্ভর বরে। দুইটি অগ্রস্থ পাতা সমেত একটি মুকুলই হইল একটি সম্পূর্ণ উৎকৃষ্ট সংগ্রহ। দুই-এর অধিক পাতা থাকিলে চায়ের বৈশিষ্ট্য কমিয়া যায়।

সাধারণত চারি প্রকার চায়ের প্রচলন আছে। যথা Black tea বা কৃষ্ণবর্ণের চা, Green tea বা সবুজ বর্ণের চা, Brick tea বা ইষ্টক বর্ণের চা এবং Oolong tea বা উলং চা।

1. **কৃষ্ণবর্ণের চা** (Black tea)—এইপ্রকার চায়ের পাতার চারিটি ক্রমিক পর্যায়ে প্রস্তুতকরণ সম্পন্ন হয়।

(*a*) শুষ্ককরণ প্রণালী (Withering)—সংগৃহীত হইবার পরই চায়ের পাতাগুলিকে তৎক্ষণাৎ বিস্তীর্ণ পাত্রে অথবা তাকে পাতলা স্তরে বিস্তার করিয়া প্রায় 18 ঘণ্টা ধরিয়া শুষ্ক করা হয়। ইহাতে পাতাগুলির জলের পরিমাণ বহুলাংশ কমিয়া যায়।

(*b*) গুটান প্রণালী (Rolling)—উপরোক্ত পাতাগুলি হইতে রস নিষ্কর্ষণের জন্য 10—20 মিনিট ধরিয়া যন্ত্রের সাহায্যে স্বল্প গুটাইতে হয়। গুটানো পাতাগুলিকে প্রথমে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া অনুপযুক্ত পাতাগুলিকে পুনঃ পুনঃ গুটাইতে হয়।

(*c*) জাগ-দেওয়া প্রণালী (Fermenting)—স্বল্প ও অধিক গুটান সর্বপ্রকার পাতাগুলিকেই প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্পপূর্ণ ঘরের মেঝেতে 2·5—5 সেন্টিমিটার পুরু করিয়া 2-6 ঘণ্টা ধরিয়া বিছাইয়া রাখিতে হয়। এই সময় সবুজ বর্ণের পাতাগুলি তাম্রবর্ণ ধারণ করে এবং উহা হইতে চায়ের গন্ধ নির্গত হয়।

(*d*) দহন প্রণালী অথবা জাগ দেওয়া প্রণালী (Firing or drying) পাতাগুলিকে যত শীঘ্র সম্ভব সম্পূর্ণ শুষ্ক করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রায় 45° সেন্টিগ্রেডে উহাদিগের উপর উত্তপ্ত বাতাস যন্ত্রের সাহায্যে চালনা করিতে হয় এবং ক্রমে 45°-76° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়। সমুদয় প্রণালীটি 30 40 মিনিট ধরিয়া সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে পাতার জলীয় বাষ্পের পরিমাণ প্রায় 3 4 শতাংশ দাঁড়ায়!

পরিশেষে শুষ্ক পাতাগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে পৃথক করিতে হয়।

গোল্ডেন পিকো (Golden pekoe) শ্রেণীর চা নব প্রস্ফুটিত মুকুল হইতে, অরেঞ্জ পিকো (Orange pekoe) শ্রেণীর চা, মুকুলের প্রথম পাতা হইতে এবং পিকো

(Pekoe) শ্রেণীর চা দ্বিতীয় পাতা হইতে প্রস্তুত হয়। অধিকন্তু পিকো সুচং (Pekoe souchong), সুচং (Suchong) এবং কংগু (Congu) শ্রেণীর চা তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম পাতা হইতে প্রস্তুত হয়। ইহাদের মধ্যে পূর্বোক্ত শ্রেণীতে যাহারা সূক্ষ্ম ও হাল্কা ও যাহাদের উপরিলিখিত শ্রেণীগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না তাহাদের ফ্যানিং (fannings) বলে এবং শেষোক্ত শ্রেণীতে যাহাদের চালুনির দ্বারা ছাঁকিবার পর যে অতি সূক্ষ্ম অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাদের গুঁড়া (dust) চা বলে।

2. **সবুজ বর্ণের চা** (Green tea)—চীন এবং জাপানে সবুজবর্ণের চায়ের পাতা প্রস্তুত করা হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালীতে withering বা শুষ্ককরণ এবং fermentation বা জাগ-দেওয়া প্রণালী আদৌ নাই ; পরন্তু পাতাগুলিকে প্রথমেই পাত্রে অথবা ফুটন্ত জলের বাষ্পে উত্তপ্ত করা হয়। ইহাতে এনজাইমগুলির ক্রিয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। পরে যথাযথ rolling বা গুটান এবং firing বা দহন প্রণালীর অনুসরণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় চায়ের পাতাগুলিকে ঘূর্ণায়মান পাত্রে ফ্রেঞ্চ চক (french chalk) বর্ণের দ্বারা পালিশ করা হয়।

3. **ইষ্টকবর্ণের চা** (Brick tea)—এইপ্রকার চা কেবলমাত্র তিব্বত এবং রাশিয়ায় প্রস্তুত করা হয়। ইহার প্রস্তুতকরণ প্রণালী নিম্নে বর্ণিত হইল :

(*a*) পাত্রে উত্তপ্তকরণ প্রণালী (Panning)- সবুজবর্ণের চায়ের ন্যায়, কাণ্ড-সমেত চায়ের পুরাতন পাতা লোহার পাত্রে প্রায় 10 মিনিট ধরিয়া উত্তপ্ত করা হয়।

(*b*) গুটান প্রণালী (Rolling)—পরে পাতাগুলিকে যন্ত্রের সাহায্যে গুটাইতে হয়।

(*c*) জাগ দেওয়া প্রণালী (Fermenting)- ইহার পরে পাতাগুলিকে 3-4 দিন ধরিয়া জাগ দেওয়া হয়। ইহার ফলে পাতাগুলির উষ্ণতা প্রায় 40°—50° সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পায়।

(*d*) শুষ্ককরণ প্রণালী (Drying)—পরে পাতাগুলিকে রৌদ্রে শুষ্ক করা হয়। অবশেষে ইহাতে পরিমিত ভাতের লেই প্রস্তুত করিয়া মিশাইয়া চাপ প্রয়োগে ইষ্টকের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট করা হয়।

4. **উলং চা** (Oolong tea)—এইপ্রকার চা কেবলমাত্র ফরমোসাতে প্রস্তুত করা হয়। ইহাদের পাতাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে জাগ দেওয়া হয় না বলিয়া ইহাদের একপ্রকার অদ্ভুত গন্ধ নির্গত হয়।

সুগন্ধি চা প্রস্তুত করিতে হইলে পাতাগুলিকে সুগন্ধি পুষ্পের পাপড়ির সহিত মিশাইয়া শুষ্ক করা হয় এবং পরে পাপড়িগুলিকে পৃথক করিতে হয়।

2. **কফি** (Coffee)—ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ভারতে কফি চাষের সূত্রপাত হয়। 1658 খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ প্রথমে শ্রীলঙ্কায় ও তৎপরে জাভায় কফির আমদানি করেন। তৎপরে জাভা হইতে ইহা পৃথিবীর বিভিন্ন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে কফি সরবরাহকারী দেশগুলির মধ্যে ব্রেজিলের স্থান সর্বপ্রথম ; পরন্তু এই বিষয়ে ভারতের স্থান সর্বনিম্নে। ব্রেজিল সারা বিশ্বের কফি আমদানি

প্রায় 65 শতাংশ সরবরাহ করে কিন্তু ভারতবর্ষ সেই স্থলে মাত্র এক শতাংশেরও কম সরবরাহ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কফি চাষের সূত্রপাত হয়। ভারতের কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং কেরলেই প্রধানত অর্ধেক পরিমাণ কফি উৎপন্ন হয়। আসাম, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশেও অতি স্বল্প পরিমাণ কফি পাওয়া যায়।

আশানুরূপ ফসল পাইতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য—

(*i*) মৃত্তিকা—স্বল্প ঢালু পর্বতগাত্রে গভীর কর্দমাক্ত-পলি মৃত্তিকায় জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত থাকিলে কফি গাছ সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি পায়।

(*ii*) বৃষ্টিপাত—মার্চ-এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি বৃষ্টিপাত (200—210 সেন্টিমিটার) হওয়া প্রয়োজন; ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাস অবধি শীতকালীন আবহাওয়া শুষ্ক হইলে ভাল হয়।

(*iii*) উচ্চতা—সমুদ্রতল হইতে 450-1520 মিটার পর্যন্ত উচ্চতা কফি চাষের উপযোগী।

(*iv*) জমির স্বাভাবিক পরিচয়—উত্তর ও পূর্বাভিমুখী জমি যাহাতে প্রবল বায়ু প্রবাহ প্রতিরোধের সুবন্দোবস্ত আছে তাহা কফি চাষের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট।

Coffea arabica (কফিয়া আরেবিকা) অর্থাৎ আরব দেশীয় কফি গাছের বীজ হইতে প্রায় 90 শতাংশ কফি উৎপাদিত হয়। এই সকল গাছ 900-1520 মিটার উচ্চতায় জন্মায় এবং বৎসরে প্রায় 23 00 মেট্রিক টন ফসল পাওয়া যায়; *C. canephora* (ক. কেনিফোরা) নামক কফি-গাছের ক্ষেত্রে ইহা মাত্র 11, 120 মেট্রিক টন হইয়া থাকে। *C. arabica* (ক. আরেবিকা) হইতে উৎকৃষ্ট কফি পাওয়া যায়। ইহা ঘন ডালপালা সমেত ছোট আকারের বৃক্ষ, পাতাগুলি অভিমুখ (opposite) ও কাণ্ডে দুইটি সারিতে সজ্জিত থাকে। পাতার কক্ষে উভয় প্রকার কাক্ষিক মুকুল যথা, কাক্ষিক মুকুল (axillary bud) ও বহিঃকাক্ষিক মুকুল (extra-axillary bud) দেখিতে পাওয়া যায়। পাতার কক্ষ হইতে মিষ্টি গন্ধের পতঙ্গপরাগী (insect pollinated) ফুলগুলি গুচ্ছাকারে বাহির হয়। ফলগুলি হইল দুইটি বীজযুক্ত বেরী (berry) এবং সস্য (endosperm) অদ্ভূতভাবে ভাঁজযুক্ত। পরিপক্ক ফলের বীজগুলিই কেবলমাত্র কফি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। *C arabica* (ক. আরেবিকা)-র একটি variety প্রকার হইল মোচা কফি (Mocha coffee) এবং ইহা হইতে সুন্দর গন্ধযুক্ত একপ্রকার কফি পাওয়া যায়। ইহার ফলগুলি সাধারণ *C. arabica* (ক. আরেবিকা)-র প্রজাতি অপেক্ষা আকারে ছোট ও অধিকতর গোলাকার। আরব দেশের কয়েকটি সীমাবন্ধ অঞ্চলে ইহার চাষ করা হয়।

ভারতীয় কফি গাছ আকারে বড় হয় বলিয়া সাধারণ বনাঞ্চলীয় চাষপ্রণালী এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকার ক্ষয় নিবারিত হয় এবং উত্তম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ভারতীয় কফি পাওয়া যায়।

বীজগুলি প্রথমে বীজতলায় বপন করিয়া পরে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত জমিতে চারাগাছগুলি পুনরায় রোপণ (transplant) করিতে হয়। তৃতীয় বর্ষ হইতেই গাছগুলিতে ফল দেখা দেয় এবং পনর বৎসর অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু অধিককাল পর্যন্ত ভাল ফসল প্রদান করে।

কফি গাছের ফল হইতে বাজারে বিক্রয়ার্থে কফি প্রধানত সিক্ত প্রণালী-র (wet method) দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় কফির পরিপক্ব ফলগুলিকে গাছ হইতে সংগ্রহ করিবার পর বাহিরের আবরণ ও অন্যান্য কোমল আঠালো অংশ অপসারণ করিবার উদ্দেশ্যে যন্ত্রে চালিত করিতে হয়। পরে ইহাদের জলে সিক্ত করিলে মিউসিলেজযুক্ত আবরণগুলি সন্ধান প্রক্রিয়ায় (fermentation) অপসারিত করা হয়। বীজত্বকযুক্ত বীজগুলি এখন রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। বীজগুলিকে অধিকতর শুষ্ক করিতে, খোলা ছাড়াইতে ও শ্রেণীবিন্যাস করিবার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে পাঠাইতে হয়। এই সকল প্রক্রিয়া শেষ হইলে অবশেষে যে কফি বাহির হইয়া আসে তাহাকে প্লানটেশন কফি (Plantation coffee) বলে। চেরী কফি (Cherry coffee) নামক আর একপ্রকার কফি শুষ্ক প্রণালীতে (dry method) প্রস্তুত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় পরিপক্ব ফলগুলিকে রৌদ্রে এইরূপে শুষ্ক করিতে হয় যাহাতে ফলের ত্বক ও মধ্যত্বকগুলি সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া husk বা তুষের ন্যায় আকার ধারণ করে। শুষ্ক ফলগুলিকে এখন তুষ অপসারণ যন্ত্রে পরিচালন করিয়া বীজগুলিকে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করা হয়।

৮

ভেষজ উদ্ভিদ
(Medicinal Plants)

ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহারিক উদ্ভিদবিদ্যার একটি অতি প্রয়োজনীয় শাখা। অধুনা এই শাখাকে ফারমাকগনোসি (Pharmacognosy) বলে। এই শাস্ত্র বলিতে ভেষজ উদ্ভিদের জীবনবৃত্তান্ত, সংরক্ষণ, উহাদের অথবা বিভিন্ন অংশের আমদানি ও রপ্তানি এবং অপরিশোধিত ঔষধ প্রস্তুতকরণ বুঝায়। পরিশোধিত ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী ব্রিটিশ এবং আমেরিকায় এই সংক্রান্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে এবং উহাদের যে-কোনটি হইতেই পরিশোধিত ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। ভারতে এইরূপ কোনো গ্রন্থ নাই, তথাপি আমাদের দেশের কবিরাজগণ চরক ও সুশ্রুত শাস্ত্রে লিখিত প্রণালী অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সুফল অর্জন করিয়াছেন। ভেষজ উদ্ভিদের alkaloid বা উপক্ষারের মাত্রার উপরই উহার গুণাগুণ নির্ভর করে এবং মনুষ্যদেহের বহির্ভাগে বা অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে ইহা সুনিশ্চিত কোনো জৈবনিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

কয়েকটি প্রধান ভেষজ উদ্ভিদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ; যথা—

(*a*) *Aconitum nopellus* (অ্যাকোনাইটাম ন্যাপেলাস বা কাঠবিষ গাছ)—ইহা র‍্যানানকুলেসি গোত্রীয় (Fam. Ranunculaceae) উদ্ভিদ। ইহাদের হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে প্রধানত দেখা যায়। ইহার মূল হইতে বাত এবং স্নায়ুশূল নিরাময়ের ঔষধ প্রস্তুত হয়।

(*b*) *Adhatoda vasica* (অ্যাডাটোডা ভ্যাসিকা বা বাসক)—ইহা অ্যাকানথেসি গোত্রীয় (Fam. Acanthaceae) উদ্ভিদ। ভারত এবং বাংলাদেশের সর্বত্রই ইহা জন্মায়। ইহার পাতার রস কাশি এবং ব্রংকাইটিস্ রোগের মহৌষধ এবং শুষ্ক পাতার ধূম্র হাঁপানি রোগের কষ্ট লাঘব করে।

(*c*) *Andrographis paniculata* (অ্যানড্রোগ্রাফিস প্যানিকিউলেটা বা কালমেঘ) —ইহা অ্যাকানথেসি গোত্রীয় (Fam. Acanthaceae) উদ্ভিদ। ভারত এবং বাংলাদেশের সর্বত্রই সমতলভূমিতে ইহা জন্মায়। ইহার মূল হইতে পাকস্থলী-সংক্রান্ত রোগের ঔষধ প্রস্তুত হয়। পাতার রস উদরাময় এবং লিভারের মহৌষধি।

(*d*) *Atropa belladona* (অ্যাট্রোপা বেলেডোনা)—ইহা (Fam. Solanaceae) সোলানেসি গোত্রীয় উদ্ভিদ। ইহা হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় এবং ভারতেও ইহার প্রচুর চাষ করা হয়। পুষ্পোৎপাদনের সময় শুষ্ক পাতাগুলি দেহের বহির্ভাগে বা অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। কাশি এবং অতিরিক্ত ঘাম হইলেও ইহাতে সুফল পাওয়া যায়। চক্ষুতারার রন্ধ্র বিস্তৃত করিতেও ইহার ব্যবহার হয়।

(*e*) *Bacopa monnieria* (ব্যাকোপা মোনিরী বা ব্রাহ্মী)—ইহা স্ক্রফুল্যারিয়েসি গোত্রীয় (Fam. Scrophulariaceae) উদ্ভিদ। ইহা বর্ষজীবী ব্রততী। পাতার নিষ্কর্ষণ হইতে স্নায়ুরোগ, মৃগীরোগ এবং মস্তিষ্ক বিকৃতির ঔষধ প্রস্তুত হয়।

(*f*) *Cinchona succirubra* (সিনকোনা সাক্সিরুব্রা)—ইহা রুবিয়েসি গোত্রীয়। (Fam. Rubiaceæ) উদ্ভিদ। সিনকোনা উদ্ভিদের আরও কয়েকটি প্রজাতি আছে কিন্তু ইহাদের সকলেরই বল্কলে কুইনাইন (quinine) নামক একপ্রকার alkaloid বা উপক্ষার থাকে যাহা ম্যালেরিয়া রোগের মহৌষধ। ভারতের দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে, আসামের খাসী এবং জয়ন্তিয়া পর্বতমালায়, নিলগিরি পর্বতে এবং দক্ষিণ ও মধ্যভারতের কয়েকটি অঞ্চলে ইহা জন্মায়।

(*g*) *Digitalis purpurea* (ডিজিট্যালিস পারপিউরীয়া)—ইহা স্ক্রফুল্যারিয়েসি গোত্রীয় (Fam. Scrophulariaceac) উদ্ভিদ। ইহা হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে জন্মায় এবং ভেষজ ও মনোরম উদ্ভিদরূপেও ইহার চাষ হয়। পরিণত উদ্ভিদের শুষ্ক পাতা কখনও কখনও হৃদরোগে ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার উদ্ভিদে ডিজিট্যালিন (digitalin) নামক উপক্ষার থাকে।

(*h*) *Eupatorium ayapana* (ইউপ্যাটোরিয়াম আয়াপানা বা আয়াপান)—ইহা ভারত ও বাংলাদেশের সর্বত্র জন্মায়। পাতার রস প্রয়োগে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(*i*) *Holarrhena antidysenterica* (হোলারহেনা অ্যান্টিডিসেনটেরিকা বা কুরচী)—ইহা অ্যাপোসায়ানেসি গোত্রীয় (Fam. Apocyanaceae) উদ্ভিদ। ইহা হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অথবা তাহার পাদদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সমতল ভূমিতেও ইহাদের জন্মাইতে দেখা যায়। ইহার বীজ উদরাময় এবং বায়ু প্রকোপে ব্যবহৃত হয়। মূল এবং কাণ্ডের বল্কলে একপ্রকার উপক্ষার থাকে যাহা আমাশয় এবং জ্বরের মহৌষধ।

(*j*) *Psychotria ipecacuanha* (সাইকোট্রিয়া ইপিক্যাকুয়ানা)—ইহা রুবিয়েসি গোত্রীয় (Fam Rubiaceac)। ইহা নিলগিরি পর্বতমালা এবং পশ্চিমবঙ্গের ও বাংলাদেশের উত্তরভাগের পার্বত্য অঞ্চলে জন্মায়। ইহার মূলে এমিটিন (emitin) নামক একপ্রকার উপক্ষার থাকে এবং ইহা হইতে যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহা আমাশয় রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

(*k*) *Strychnos nuxvomica* (স্ট্রিকনস্ নাক্স্ভমিকা)—ইহা লোগানিয়েসি গোত্রীয় (Fam. Loganiaceae) উদ্ভিদ। ইহা দক্ষিণ ভারতে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। বীজের নিষ্কর্ষণ মেরুদণ্ডের উদ্দীপক পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা হইতে স্নায়ুরোগের ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা মৃগীরোগ, উদরাময়, জলাতঙ্ক রোগ, কোষ্ঠবদ্ধতায় বিশেষ উপকার সাধন করে।

(*l*) *Swertia chirata* (সোয়ারসিয়া চিরতা বা চিরতা গাছ)—ইহা জেনসিয়ানেসি গোত্রীয় (Fam. Gentianaceae) উদ্ভিদ। ইহা কৃমি নিবারক ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং উদরাময় নিরাময় করে।

১। **সিঙ্কোনা** (Cinchona)—সিঙ্কোনা গাছ রুবিয়েসি গোত্রীয় (Fam. Rubiaceae) উদ্ভিদ এবং ইহা হইতে ম্যালেরিয়া রোগের মহৌষধ বিখ্যাত উপক্ষার

(alkaloid) যথা, কুইনিন (quinin) উৎপাদিত হয়। Sir George King (স্যার জর্জ কিং)-এর মতে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিষেধক হিসাবে সিংকোনা বল্কলের প্রকৃত ব্যবহার করা হইয়াছিল কিনা এই সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যায় নাই। যাহাই হউক এই ক্ষেত্রে পেরুরাজ্যের Spanish viceroy বা স্পেইন দেশীয় রাজ প্রতিনিধির স্ত্রী Countess of Cinchon বা সিঙ্কনের অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি 1640 খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকা হইতে কিছু পরিমাণ সিঙ্কোনা গাছের বল্কল ইউরোপে আমদানি করিয়াছিলেন। ইহার ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার শীঘ্রই সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং 1677 খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়া (*British Pharmacopoeia*) নামক গ্রন্থে ইহা স্থান পাইয়াছিল। 1770 খ্রীষ্টাব্দে মীর মহম্মদ নামক ব্যক্তির লিখিত বিবরণ হইতে ভারতে সিঙ্কোনার প্রথম ব্যবহার সম্বন্ধে জানিতে পারা যায়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সময় তৎকালীন viceroy বা রাজপ্রতিনিধির স্ত্রী লেডী ক্যানিং (Lady Canning)-এর প্রচেষ্টায় কৃতকার্যের সহিত ভারতে সিঙ্কোনা চাষের সূত্রপাত হয়। জাভা হইতে সিঙ্কোনা গাছ আনয়ন করিয়া কিরূপে বঙ্গদেশের পার্বত্য অঞ্চলে সাফল্যের সহিত ইহার চাষ করা যায় সেই বিষয়ে তিনি ভারতীয় তৎকালীন Royal Botanical Garden বা উদ্ভিদ উদ্যানের Dr. T. Anderson (ডাঃ টি. অ্যান্ডারসন)-এর সহিত বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই মহীয়সী নারী ম্যালেরিয়া রোগের আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। যাহা হউক ডাঃ অ্যান্ডারসন নিজে জাভা হইতে প্রচুর সংখ্যক সিঙ্কোনা গাছ আনয়ন করিয়া বহু পরিশ্রমের পর দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে কৃতকার্যের সহিত ইহার চাষ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনিও অবশেষে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। অতঃপর Sir George King (স্যার জর্জ কিং)-এর প্রচেষ্টায় সিঙ্কোনার চাষ এবং কুইনিনের ব্যাপক প্রচলন সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

সিঙ্কোনা গাছের 65টি প্রজাতি আছে এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই আদি জন্মস্থান হইল দক্ষিণ আমেরিকা। ইহারা চিরহরিৎ গুল্ম অথবা বৃক্ষ। ভারতে সিঙ্কোনা গাছের ব্যাপক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে চারি প্রকার প্রজাতির চাষ করা হয়। ইহারা হইল যথাক্রমে—1. *Cinchona ledgeriana* (সিঙ্কোনা লেজেরিয়ানা), 2. *C. officinalis* (সি. অফিসিনালিস), 3. *C. calisaya* (সি. ক্যালিসায়া) এবং 4. *C. succirubra* (সি. সাক্সিরুব্রা)। এই সকল প্রজাতির মধ্যে প্রজনের দ্বারা কতকগুলি কার্যকর সঙ্কর উদ্ভিদ উৎপাদন করা সম্ভবপর হইয়াছে এবং ইহাদের সকলেরই ভারতে চাষ করা হয়।

1. *Cinchona ledgeriana* (সিঙ্কোনা লেজেরিয়ানা)—এইপ্রকার উদ্ভিদ হইতে একপ্রকার লেজার বল্কল (Ledger Bark) পাওয়া যায়। উদ্ভিদটি দুর্বল কান্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ ও উচ্চতায় প্রায় 4-5 মিটার পর্যন্ত হইয়া থাকে। পাতাগুলি ডিম্বাকার, ফুলগুলি পীতবর্ণের ও ফলগুলি 8-13 মিলিমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ ক্যাপসুল

হয়। ভারতে ইহার ব্যাপক চাষ হইয়া থাকে। প্রায় 900-1850 মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় ইহারা সুষ্ঠু বৃদ্ধি পায়।

2. *Cinchona officinalis* (সিঙ্কোনা অফিসিনালিস)—এইপ্রকার উদ্ভিদ হইতে একপ্রকার লাক্সা অথবা ক্রাউন বল্কল (Loxa or Crown Bark) পাওয়া যায়। গাছগুলি 6-9 মিটার পর্যন্ত উচ্চ হয়। ইহারা সরু কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ, পত্রবৃন্ত প্রায় লোহিত বর্ণের হয়, ফুলগুলি গোলাপী বর্ণের ও ফলগুলি 17-20 মিলিমিটার দীর্ঘ ক্যাপসুল হইয়া থাকে। বল্কলটি বন্ধুর তলবিশিষ্ট পিঙ্গলবর্ণের (ভিতরের তলটি পীতবর্ণের) এবং ইহাতে ইতস্ততঃ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের দাগ দেখা যায়। 1830-2450 মিটার পর্যন্ত উচ্চতর স্থানে ইহারা সুষ্ঠুভাবে জন্মায়।

3. *Cinchona calisaya* (সিঙ্কোনা ক্যালিসায়া)—এইপ্রকার উদ্ভিদ হইতে ক্যালিসায়া (calisaya) অথবা পেরুদেশীয় (Peruvian) অথবা পীতবর্ণের বল্কল (Yellow Bark) পাওয়া যায়। উদ্ভিদটি উচ্চ সবল বৃক্ষ। পাতাগুলি আয়তাকার-বিডিম্বাকার), ফুলগুলি flesh coloured বা গাঢ়বর্ণের এবং ফলগুলি 8-17 মিলিমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ ক্যাপসুল। বল্কলটি মসৃণ, পুরু, শ্বেতবর্ণের ও ইতস্ততঃ বিদারিত। ইহা 450-900 মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে।

4. *Cinchona succirubra* (সিঙ্কোনা সাক্সিরুব্রা)—এইপ্রকার উদ্ভিদ হইতে লোহিতবর্ণের বল্কল (Red Bark) পাওয়া যায়। গাছগুলি 12-15 মিটার উচ্চ বৃক্ষ, ফুলগুলি গোলাপীবর্ণের এবং ফলগুলি 25-32 মিলিমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ ক্যাপসুল হইয়া থাকে। বল্কলটি পিঙ্গলবর্ণের এবং ইহাতে কতিপয় শ্বেতবর্ণের দাগ আছে ও আড়াআড়িভাবে অবস্থিত কতকগুলি বিদারণ দেখা যায়। সিঙ্কোনা গাছের প্রজাতিগুলির মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা সবল এবং সহজেই ইহার চাষ করা সম্ভবপর। 600-1830 মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন উচ্চতায় ইহারা সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে।

পেরু, কলাম্বিয়া, বলিভিয়া, ইকুয়েডর ও অ্যান্ডজ প্রভৃতি দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল সিঙ্কোনা গাছের আদি জন্মস্থান। ইন্দোনেশিয়া, ভারতবর্ষ, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, রাশিয়া প্রভৃতির বিভিন্ন স্থানে ইহার ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়। ভারতবর্ষের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় এবং আসামের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে *C. ledgeriana* (সি. লেজেরিয়ানা) র, তামিলনাড়ুর উটাকামণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে *C. officinalis* (সি. অফিসিনালিস) এর, নিলগিরির মোয়ার উপত্যকায় ও সিকিমে *C. Calisaya* (সি. ক্যালিসায়া)-র এবং সিকিম, দক্ষিণ ভারত ও মধ্যভারতের সাতপুরা পর্বতমালায় *C. succirubra* (সি. সাক্সিরুব্রা)-র ব্যাপক চাষ করা যায়।

সিঙ্কোনার সাফল্যজনক চাষের জন্য সচ্ছিদ্র অ্যাসিডযুক্ত মৃত্তিকার প্রয়োজন এবং ইহাতে যেন উত্তম জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকে। তাপমাত্রা 15·5—24° সেন্টিগ্রেড ও আবহাওয়া জলীয় বাষ্পপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিকমাত্রায় হইতে হইবে অর্থাৎ সারা বৎসর ধরিয়া প্রায় সমভাবে বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। যে-সকল

পর্বতের ঢালু অঞ্চল প্রবল বায়ুপ্রবাহ হইতে সুরক্ষিত উহা সাধারণত সিঙ্কোনা চাষের জন্য নির্বাচন করা হয়। মৃত্তিকায় জলের পরিমাণ স্বল্প হইলে উদ্ভিদগুলির বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং উপক্ষারের পরিমাণও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। দেখা গিয়াছে যে 915 মিটারের নিম্নে অথবা 1830 মিটার অপেক্ষা উচ্চতর স্থানেও উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও উপক্ষারের মাত্রাও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

সিঙ্কোনা গাছের বীজ বপন করিয়া অথবা cutting বা কলম বাধিয়া অথবা layering প্রভৃতি অঙ্গজ জননের দ্বারা বংশ বিস্তার করা হয় কিন্তু প্রথমোক্ত প্রণালীটিই ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত। যে পার্বত্য জঙ্গলের মৃত্তিকায় সিঙ্কোনা গাছের চাষ করিতে হয় তাহা উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ করিতে হয় এবং প্রায় 50 সেন্টিমিটার গর্ত করিয়া বীজগুলি বপন করিতে হয় ও পরে বালুকা দ্বারা মৃত্তিকা আবৃত করিতে হয়। বায়ুপ্রবাহ প্রতিরোধের জন্য জঙ্গলের কিছু অংশ চাষ না করিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়। প্রচুর পরিমাণে বীজ বপন করিয়া তাহার উপর জল ছিটাইতে হয়। এইরূপে 3-6 সপ্তাহের মধ্যেই বীজগুলি অংকুরিত হয়। চারাগাছগুলি প্রায় 2.5 সেন্টিমিটার দীর্ঘ হইলে এবং 2-3 জোড়া পাতা উৎপাদন করিলে উহাদের প্রথমে অনাত্র উপযুক্তভাবে প্রস্তুত মৃত্তিকায় অস্থায়িভাবে সারিবদ্ধ বসাইতে হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে প্রতি সারিতে যেন গাছগুলি 5 সেন্টিমিটার অন্তর বসান হয় এবং সারিগুলির মধ্যেও যেন পরস্পর 5 সেন্টিমিটারের প্রভেদ থাকে। প্রথমে গাছগুলিকে কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন ছায়ার নিচে রাখিতে হয় কিন্তু পরে ছায়া ক্রমে অপসারণ করিতে হয়। চারাগাছগুলি 14-18 মাসের হইলে এবং উহারা প্রায় 50 সেন্টিমিটার দীর্ঘ হইলে উহাদিগকে অন্যত্র উপযুক্ত মৃত্তিকায় পুনরায় রোপণ করিতে হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে রোপণের সময় যেন আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং রোপণের পরে যেন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই সময় গাছগুলির সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য যেন উভয় দিকে 2 মিটার ব্যবধান থাকে।

গাছগুলি চারি বৎসরের হইলেই বল্কল অপসারণের কাজ আরম্ভ হয়। 10-12 বৎসরের গাছের উপক্ষারের পরিমাণ সর্বাধিক এবং পরে বয়সের সাথে উহা ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে। উপযুক্ত সময় মৃত্তিকাতল হইতে প্রায় 1.5 মিটার উপর হইতে গাছের গুঁড়িটি কাটিয়া ফেলিতে হয়। এখন মূল সমেত অবশিষ্ট গুঁড়িটিকে মৃত্তিকা হইতে তুলিয়া যথাযথ পরিষ্কার করিয়া ছুরির সাহায্যে বল্কলটিকে অপসারণ করিতে হয়। অপসৃত বল্কলটি ছায়াযুক্ত স্থানে ধীরে ধীরে শুষ্ক করিতে হয়। মনে রাখিতে হইবে যে কখনই যেন বল্কলগুলি অধিকক্ষণ উন্মুক্ত সূর্যালোকে অথবা প্রায় 80 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার ঊর্ধ্বে না থাকে। শুষ্ক বল্কলগুলিকে কয়েক মাস ধরিয়া বস্তায় ভর্তি করিয়া রাখিলেও বিনষ্ট হয় না।

২। **সর্পগন্ধা** (Rauwolfia)— *Rauwolfia* (**সর্পগন্ধা** বা চন্দ্রা) অ্যাপোসায়ানেসী (Fam. Apocyanaceae) গোত্রীয় ক্ষুদ্র গুল্ম। ইহার ভারতীয় দুইটি প্রজাতির মধ্যে *R. serpentina* (রাউলফিয়া সারপেন্টিনা) নামক প্রজাতি প্রচুর

পরিমাণে চাষ করা হয়। ইহার শিকড়ের বল্কলে rauwolfin (রাউলফিন) নামক একপ্রকার উপক্ষার থাকে যাহা রক্তচাপবৃদ্ধি দমনে বিশেষ সহায়ক।

প্রধান মূলটি স্থূল, দৃঢ়, এবং দৈর্ঘ্য 20 সেণ্টিমিটার পর্যন্ত হয়। ইহার সাধারণত শাখামূল দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ইহা সুস্পষ্ট বল্কল দ্বারা আবৃত। পুষ্পেগুলি নিয়ত ছত্রবিন্যাসযুক্ত।

ভারতের সমতলে এবং পার্বত্য অঞ্চলের বহু স্থানেই ইহার চাষ করা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কলিকাতায় অবস্থিত ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চল, লক্ষ্ণৌ-এ অবস্থিত জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, দেরাদুনের বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, জম্মু এবং কাশ্মীরের আঞ্চলিক গবেষণাগার প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র স্বাভাবিকরূপে ইহাদের জন্মাইতে দেখা যায়।



৮৩ নং চিত্র—সর্পগন্ধা

সর্পগন্ধার চাষের জন্য কর্দমাক্ত অথবা দো-আঁশ মৃত্তিকা বিশেষ উপযোগী। ইহার চাষ বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না।

মূলের খণ্ড রোপণ করিয়া অথবা বীজ বপন করিয়া সর্পগন্ধার চাষ করা হয়।

মৃত্তিকা উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া মই দিতে হয়। রোপণ করিবার পূর্বে সবুজ সার মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিতে হয় এবং ঋতুর প্রারম্ভে উদ্ভিদগুলি রোপণ করিয়া সেপ্টেম্বরে চারাগাছগুলিকে তুলিয়া পুনরায় রোপণ করা হয়।

উদ্ভিদগুলি 3-4 বৎসরের হইলে, শীতকালে বল্কলসমেত শিকড়গুলি সংগ্রহ করিতে হয়, কারণ এই সময় উপক্ষারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। প্রধান মূলসমেত গুচ্ছমূলগুলি সংগ্রহ করিতে হয়, কারণ গুচ্ছমূলগুলিতেও উপক্ষারের পরিমাণ অধিক থাকে। মূলগুলিকে পরিষ্কার করিয়া শুষ্ক করিতে হয়। এইরূপ শুষ্ক মূলগুলি ঔষধ প্রস্তুত কারখানায় প্রেরণ করা হয়।

৯

দারু-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ
(Timber-yielding Plants)

দারু উৎপাদনকারী উদ্ভিদের কাষ্ঠল অংশ হইতেই দারু উৎপন্ন হয়। নিকৃষ্ট প্রকৃতির দারু জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট দারু কড়ি, বরগা, সেতু, ভেলা, রেলের স্লিপার, আসবাব পত্র, খাট, আলমারি, দরজা, জানালা, কাষ্ঠস্তম্ভ, প্যাকিং-বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। Heart wood বা সার কাষ্ঠ অথবা sap wood বা রসবহকাষ্ঠ হইতে দারু উৎপন্ন হয়। রসবহ কাষ্ঠ অপেক্ষা সার কাষ্ঠ অধিক মূল্যবান ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। কাষ্ঠের বর্ণ, গঠন এবং সূক্ষ্ম রন্ধ্রের পরিমাপের উপর ইহার মান নির্ভর করে।

১। **শাল** (Sal) *Shorea robusta* বা শাল গাছ ডিপটেরোকারপেসি (Dipterocarpaceae) গোত্রীয় উদ্ভিদ। ইহা এশিয়ার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।



১৮৬নং চিত্র--শাল

উদ্ভিদগুলি অতিশয় দীর্ঘ এবং ইহাদের গুঁড়ি স্থূল। উহা হইতে বহুল পরিমাণে পার্শ্বীয় শাখা নির্গত হয় এবং পাতাগুলির গঠন চর্মবৎ। পুষ্পগুলি উভলিঙ্গ এবং কাক্ষিক অথবা অগ্রস্থ নিয়ত যৌগমঞ্জরী গঠন করে। ফলগুলি অবিদারী সামারা এবং বৃতিগুলিই বৃদ্ধি হইয়া পক্ষে পরিণত হয়।

1876 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে Schlich (শ্লিচ্) নামক একব্যক্তি বাক্সা বিভাগের অন্তর্গত ধরমপুর নামক স্থানে সর্বপ্রথম শাল গাছ রোপণ করেন। পরে উত্তর প্রদেশের গোরখপুরে এবং পশ্চিমবাংলার জলপাইগুড়ি জেলায় ইহার চাষ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ, পশ্চিমবাংলা উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং আসামের বহু স্থানেই ইহার চাষ বিস্তৃত লাভ করিয়াছে। বিহারের অন্তর্গত সারান্দায় (Sarand) ভারতের বৃহত্তম শালের অরণ্য অবস্থিত।

শাল গাছ চূড়ান্ত পরিবেশেও জন্মাইতে পারে শীত-কালে হিমাঙ্কের নিম্নের তাপমাত্রা হইতে গ্রীষ্মকালে অত্যধিক তাপমাত্রা, বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ সি. সি. নিম্ন হইতে ঊর্ধ্বে 300 সি. সি. পর্যন্ত ইহারা সহ্য করিতে পারে।

বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকায় তুঙ্গিয়া প্রণালীতে (taungya system) শাল গাছের চাষ করা হয়। সারিবদ্ধভাবে শালের বীজ বপন করা হয়। মৃত্তিকার প্রকৃতি অনুযায়ী দুই সারি শালগাছের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ স্থানে বিভিন্ন ফসল

এবং নানাপ্রকার সব্জী রোপণ করা হয়। শালগাছগুলি পরিণত প্রাপ্ত হইতে 25 বৎসর সময় লাগে।

শালের কাষ্ঠের বিশেষত্ব হইল যে উহা অতিশয় কঠিন, ভারী এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী। ইহা হইতে জানালা, দরজা, টেলিগ্রাফের খুঁটি, কড়ি, রেলের স্লিপার প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। শাল গাছের বল্কল ছেদন করিলে একপ্রকার গঁদ নির্গত হয় যাহা স্পিরিট এবং রঙের সহিত মিশ্রিত করা হয়।

২। **সেগুন** (Teak)—*Tectona grandis* বা সেগুন গাছ ভার্বিনেসি (*Verbenaceae*) গোত্রীয় উদ্ভিদ। ইহা দীর্ঘাকায় বৃক্ষ। ইহা এশিয়ার অন্যতম উদ্ভিদ এবং ভারত, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া এবং ইন্ডোনেশিয়ায় ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক মৃত্তিকায় ইহার সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতে ইহার চাষ হয়। স্বাভাবিকভাবেও ইহাদের জন্মাইতে দেখা যায়।

উদ্ভিদের স্থূল কাণ্ডে বৃন্তযুক্ত বৃহৎ আকৃতির পাতাগুলি প্রতিমুখ অথবা আবর্তরূপে উৎপন্ন হয়। পুষ্পগুলি উভলিঙ্গ এবং সাধারণত অগ্রভাগে নিয়ত যৌগমঞ্জরী গঠন করে।

জানা গিয়াছে যে 1840 খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ রাজ্যের অন্তর্গত মালাবার উপকূলে অবস্থিত নিলাম্বু নামক স্থানে সর্বপ্রথম সেগুন গাছের কৃত্রিম অরণ্য উৎপন্ন করা হয়। তথা হইতে মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মাদ্রাজ, কেরল, মধ্য ও উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিম বাংলা এবং আসাম ও বাংলাদেশে ইহার রোপণ বিস্তৃতিলাভ করে। প্রতি বৎসরই বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া সেগুন গাছ রোপণ করা হয়।

বর্তমানে stump planting method বা কর্তিত উদ্ভিদের গুঁড়ি হইতে নূতন গাছ উৎপন্ন করা হয় তবে কর্দমাক্ত, বালুকাময়, কাঁকরযুক্ত অথবা কৃষ্ণ মৃত্তিকায় ইহার চাষ ভাল হয় না। রোপণের পর যথারীতি আগাছা তুলিয়া ফেলা প্রয়োজন। শালের ন্যায় 'তুঙ্গিয়া প্রণালীতে'ও ইহার চাষ করা হয়।

উদ্ভিদগুলি পরিণতপ্রাপ্ত হইতে অধিক সময় লাগে। ইহার কাষ্ঠ কঠিন, অধিকদিন স্থায়ী, পীত হইতে পিঙ্গল বর্ণের এবং বহুদিন উন্মুক্ত রাখিলেও ফাটল ধরে না। এইজন্য ইহা মূল্যবান আসবাবপত্র, রেলের কামরা, মেঝে, নৌকা ও জাহাজ নির্মাণে বিশেষ উপযোগী। ব্রহ্মদেশীয় সেগুন কাঠ ভারতীয় সেগুন কাঠ অপেক্ষা বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা হয়।

— —

১০

রবার-উৎপাদনকারী উদ্ভিদ
(Rubber-yielding Plants)

গ্রীষ্মপ্রধান অথবা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে রবার গাছ জন্মায়। ইহা প্যাপাভারেসি গোত্রীয় (Fam. Papaveraceae), ক্যারিকেসি গোত্রীয় (Fam. Caricaceae), মোরেসি গোত্রীয় (Fam. Moraceae), এরেসি গোত্রীয় (Fam. Araceae) স্যাপোটেসি গোত্রীয় (Fam. Sapotaceae), ইউফরবিয়েসি গোত্রীয় (Fam. Euphorbiaceae), অ্যাপোসায়ানেসি গোত্রীয় (Fam. Apocyanaceac), কম্পোসিটি গোত্রীয় (Fam. Compositae)। বিভিন্ন উদ্ভিদের তরুক্ষীর latex হইতে রবার উৎপন্ন হয়। এইপ্রকার তরুক্ষীর জল, বিভিন্ন প্রকার হাইড্রোকার্বন, রঞ্জন, তৈল, প্রোটিন, শর্করা প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণ। ইহা উদ্ভিদের কাণ্ড অথবা বায়বীয় মূলে অবস্থিত বল্কল, পাতা ও কোমল অংশের বিশিষ্ট প্রকৃতির কোষে উৎপন্ন হয়।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে একদল ফরাসীদেশীয় পণ্ডিত দক্ষিণ আমেরিকায় *Hevca brazilensis* (হিভিয়া ব্রেজিলেন্‌সিস) নামক উদ্ভিদ হইতে কাউচু (caoutchoue) নামক একপ্রকার রবারের ন্যায় পদার্থের আবিষ্কার করেন। 1770 খ্রীষ্টাব্দে Friestly (প্রিস্টলে) নামক ইংরাজ রাসায়নিক পণ্ডিত পরীক্ষা করিরা দেখান যে এইপ্রকার কাউচু পেন্সিলের দাগ মুছিতে সক্ষম। এইপ্রকার গুণের জন্য কাউচুর রবার নাম দেওয়া হইয়াছে। 1820 খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও ব্রিটেনে রবারের ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হয়। 1823 খ্রীষ্টাব্দে Mackintosh (ম্যাকিনটস) নামক একজন ইংরাজ বিশেষজ্ঞ রবারকে ন্যাপথা (naptha) নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থে দ্রবীভূত করিয়া একপ্রকার রং-এর আবিষ্কার করেন যাহা বর্ষাতিক waterproofing বা জল অভেদ্য করিতে ব্যবহৃত হয়। তাঁহার এই আবিষ্কার বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করে এবং এই প্রকারে বর্ষাতি শিল্পের ব্যাপক প্রচার আরম্ভ হয়। 1839 খ্রীষ্টাব্দে Goodyear (গুডইয়ার) নামক একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ রবারের ভালকানাইজিং প্রক্রিয়া (vulcanizing process) আবিষ্কারের সাথে এইরূপ শিল্পের ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটে।

মালয়েশিয়া, ইন্ডোনেশিয়া, ক্যাম্বোডিয়া, ভিয়েৎনাম, শ্রীলঙ্কা, ব্রেজিল, মেক্সিকো ও মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রবারের চাষ হয়। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, আফ্রিকা ও বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চলেও রবারের চাষ হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতের কেরল, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু এবং বাংলাদেশের অন্তর্গত চট্টগ্রাম জেলার কয়েকটি স্থানেও রবারের চাষ হয়। একমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই সারা পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রবার উৎপন্ন হয় এবং ইহার পরে ব্রিটেন ও ফরাসী দেশের স্থান।

টায়ার, টিউব, জুতা প্রস্তুত করিতে, কাপড়কে water proofing বা জলভেদ্য করিতে, তার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম insulate বা বিদ্যুৎ অপরিবাহী করিতে, surgical বা শল্যচিকিৎসামূলক সামগ্রী উৎপাদন করিতে, রেডিও, টেলিফোন প্রভৃতির

অংশ বিশেষ তৈয়ারী করিতে ও খেলনা প্রস্তুত করিতে রবারের ব্যাপক ব্যবহার হইয়া থাকে।

নিম্নে কয়েকটি রবার উৎপাদনকারী উদ্ভিদের বিবরণ দেওয়া হইল ঃ

1. প্যারা রাবার অথবা ব্রেজিল দেশীয় রবার (Para rubber or Brazilean rubber) এইপ্রকার রবার ইউফরবিয়েসি (Fam. Euphorbiaceae) *Hevea braziliensis* (হিভিয়া ব্রেজিলিয়েনসিস) নামক উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে সমগ্র রবার উৎপাদনকারী উদ্ভিদের প্রায় 95 শতাংশ রবার পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ব্রেজিলেই একমাত্র এইপ্রকার রবার উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রস্থল। এইপ্রকার রবার উৎপাদনের জন্য 24-30 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। গাছগুলি উচ্চতায় 30-40 মিটার এবং পরিধিতে প্রায় তিন মিটারও পর্যন্ত হইয়া থাকে ও গাছগুলি প্রায় দুই শত বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। পাতাগুলি ত্রিফলক (trifoliate) বিশিষ্ট, ফুলগুলি একলিঙ্গ (unisexual) এবং আকারে ক্ষুদ্র হয়। বীজগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জীবনীশক্তি হারাইয়া ফেলে।

দক্ষিণ ভারত, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা মধ্য আমেরিকা প্রভৃতি কয়েকটি স্থানেও এইপ্রকার রবারের ব্যাপক চাষ হয়। বঙ্গো এবং পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি স্থানেও ইহার চাষ হইয়া থাকে। বীজতলায় চারা উৎপাদন করিয়া এবং চারা গাছগুলিকে transplantation বা অন্যত্র উপযুক্ত স্থানে রোপণ করিয়া গাছের বিস্তার সাধন করা হয়। গাছগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং প্রায় পাঁচ বৎসরের মধ্যেই রবার উৎপাদনে সক্ষম হয়।

Budding বা মুকুলোদ্গম প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন গাছগুলি হইতেই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রবার উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ ভারতে একর প্রতি প্রায় 300 পাউন্ড ও ইন্দোনেশিয়াতে একর প্রতি প্রায় 1500 পাউন্ড পর্যন্ত রবার উৎপন্ন হয়।

রবার গাছ 4-7 বৎসরের হইলে ছোট কাঠের হাতুড়ি অথবা বাটালির ন্যায় যন্ত্রের আঘাতে latex বা তরুক্ষীর বাহির করা হয়। আঘাত করিবার সময় খাড়াভাবে ও বাঁকাভাবে এইরূপে আঘাত করিতে হয় যেন ইহা কাণ্ডের ক্যাম্বিয়ম পর্যন্ত গভীরতম অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছায়। এইরূপে প্রতিদিন অথবা একদিন অন্তর আঘাতের ফলে প্রায় চার সেন্টিমিটার খণ্ড তুলিয়া ফেলিলে দেখা যায় যে প্রায় অর্ধ ঘন্টা ধরিয়া ঐ স্থান হইতে তরুক্ষীর নির্গত হইতেছে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় গাছ প্রতি প্রায় 300 গ্রাম পর্যন্ত রবার পাওয়া যায়। হিভিয়া গাছের কর্টেক্স (cortex) এ যে-সকল ক্ষীরনালী (latex vessels) থাকে তাহা হইতে তরুক্ষীর নির্গত হইতে থাকে। দেখা গিয়াছে যে পরিণত ক্ষীরনালী হইতে অধিক পরিমাণ তরুক্ষীর নিঃসৃত হয়। তরুক্ষীর নির্গমনের সময় যেন ইহা জমাট বাঁধিয়া না যায় ইহা লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। সেইরূপে হইলে সংগ্রহপত্রে প্রয়োজনীয় ঔষধ লইয়া তরুক্ষীর সংগ্রহ করিতে হয়।

ইহার পর তরল তরুক্ষীর লৌহ-নির্মিত চ্যাপ্টা পাত্রে ঢালিয়া স্বল্প অ্যাসিটিক্ অ্যাসিড অথবা ফরমিক্ অ্যাসিড মিশ্রিত করিতে হয়। ইহাতে তরুক্ষীর জমাট বাঁধিয়া

রবারে পরিণত হয়। এই জমাট-বাঁধা রবারকে এখন পরিষ্কার জলে ধৌত করিলে রবারের চাদর সৃষ্টি হয়। এইবার ইহাকে এক জোড়া রোলারের মধ্য দিয়া পরিচালনা করিয়া চাপ প্রয়োগ করিলে অধিকাংশ জল ও অন্যান্য অনাবশ্যক পদার্থের দ্রবণ অপসারিত হয়। রবারের চাদরটিকে এখন একটি বদ্ধ প্রকোষ্ঠে প্রজ্বলিত কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন ধোঁয়ায় শুষ্ক করিতে হয়। ইহার পর সম্পূর্ণ শুষ্ক রবারের চাদরকে বিক্রয়ার্থে বাজারে পাঠান হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ায় শুধু যে রবারের চাদর প্রস্তুত করা যায় তাহাই নহে, ইহার দ্বারা অনিয়ত রবারের খণ্ড, সচ্ছিদ্র রবারের চাদর, রবারের সূক্ষ্ম টুকরা প্রভৃতি উৎপন্ন করা যায়।

2 ভারতীয় রবার (Indian rubber)—এইপ্রকার রবার মোরেসি গোত্রীয় (Fam. Moraceae) (*Ficus elastica*) (ফাইকাস ইলাসটিকা) নামক উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা আসাম বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে জন্মায়। গাছগুলি খুব বড় হয় এবং ইহাদের স্তম্ভমূল (Prop roots) থাকে। কাণ্ডে ও শিকড়ে আঘাত করিয়া তরুক্ষীর নিঃসরণ করা হয়। মোরেসি গোত্রীয় (Fam. Morceae) উদ্ভিদের অন্তর্গত (*Artocarpus chaplasa*) আরটোকারপাস চাপ্লাসা A. integra (আ. ইনটিগ্রা) এবং (Fam. Apocyanaceae) উদ্ভিদের অন্তর্গত *Alstonia scholaris* (অ্যালস্টোনিয়া স্কলারিস) নামক উদ্ভিদ হইতেও এইপ্রকার রবার উৎপাদিত হয়। শেষোক্ত উদ্ভিদটি একটি বড় আকৃতির গাছ এবং ইহা প্রধানত শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর ও পেনাং প্রভৃতি দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। বৎসরের শুষ্ক ঋতুতে তরুক্ষীর সংগ্রহ করা হয় গাছের গুঁড়িতে আঘাত করিয়া মাটি পাত্রে তরুক্ষীর সংগ্রহ করা হয়। আঘাতটি যেন অধিক গভীর না হয় এবং ভূমিতল হইতে যেন ইহা প্রায় এক মিটার উচে হয় এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অবশেষে তরুক্ষীর জমাট বাঁধিবার জন্য ফটকিরি মিশাইতে হয় ও পরে ইহাকে বাতাসে শুষ্ক করা হয় এই প্রক্রিয়ায় বৎসরে প্রায় গাছ প্রতি 100—600 গ্রাম রবার পাওয়া যায়। উদ্ভিদটির পরিণত হইতে প্রায় 40 বৎসর সময় লাগে।

3. পানামা রবার অথবা ক্যাস্টিওলা রবার (Panama rubber or Carstiola rubber)—এইপ্রকার রবার মোরেসি গোত্রীয় (Fam. Moraceae) *Castiola elastica* (ক্যাস্টিওলা ইলাসটিকা) নামক উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাকে প্রধানত মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার উদ্ভিদের ক্ষীরনালী (latex tube) হইতে তরুক্ষীর সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন। অধিকন্তু একটি উদ্ভিদ হইতে বৎসরে চারিবার অথবা পাঁচবারের অধিক তরুক্ষীর সংগ্রহ করা যায় না। গাছগুলি পলিমাটিতে প্রায় 15° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জন্মায় এবং উচ্চতায় প্রায় 45 মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তরুক্ষীর ফুটাইয়া অথবা বাতাসে উন্মুক্ত রাখিলে জমাট বাঁধিয়া যায়।

4. শিয়ারা রবার (Ceara rubber)—এইপ্রকার রবার ইউফরবিয়েসি গোত্রীয় (Fam. Euphorbiaceae) *Manihot glaziovii* (ম্যানিহট গ্ল্যাজিওভি) নামক

এক প্রকার ক্ষুদ্রাকার বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা প্রধানত ব্রেজিলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রস্তরযুক্ত শুষ্ক মৃত্তিকায় জন্মায় ও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভারতবর্ষে ও শ্রীলঙ্কায় বর্তমানে ইহার চাষ হইতেছে। উদ্ভিদটি 4 5 বৎসরের হইলেই তরুক্ষীর নির্গমন করা হয়। কাণ্ডে ও বড় স্ফীত মূলেও ক্ষীরনালী উৎপন্ন হয়। শিকড় অথবা পুরাতন কাণ্ড হইতে তরুক্ষীর নিঃসরণ করা হয় কিন্তু অপরিণত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বহিঃস্থ বল্কল অপসারণ করিয়া তরুক্ষীর বাহির করা হয়। অবিরত তরুক্ষীর নির্গমন উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক। উন্মুক্ত বাতাসে অথবা ধোঁয়াতে রাখিলে তরুক্ষীর জমাট বাঁধিয়া যায়।

5. গুয়াইল রবার (Guayale rubber)—কম্পোজিটি গোত্রীয় (Fam. Compositate) *Parthenium argentum* (পারথেনিয়াম আরজেনটাম) নামক একপ্রকার বহুবর্ষজীবী গুল্ম হইতে উৎপন্ন হয়। এই সকল উদ্ভিদ মেক্সিকো ও আমেরিকার দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রসমূহে জন্মায়। ইহাদের ক্ষীরনালী বা ক্ষীরকোষ দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু সমগ্র উদ্ভিদের বিভিন্ন কোষে দানাদার আকারে রবার উৎপন্ন হয় এবং ইহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর রবার।

নিম্নে কতকগুলি নিকৃষ্ট শ্রেণীর রবার উৎপাদনকারী উদ্ভিদের বিবরণ দেওয়া হইল—

অ্যাপোসায়ানেসি গোত্রীয় (Fam. Apocyanaceae) *Funtunia elastica* (ফুনটুনিয়া ইলাসটিকা) যাহা পশ্চিম আফ্রিকার উষ্ণপ্রধান অঞ্চলের একপ্রকার বড় আকারের গাছ. *Landolphia kirkii* (ল্যান্ডলফিয়া কির্কি) *L. heudelotii* (ল্যা. হিউডেলটি) *L. watsni* (ল্যা ওয়াটসনি) ও *L. owarensis* (ল্যা ওয়ারেনসিস) যাহারা আফ্রিকার বিশাল আকৃতির কাষ্ঠললতা ; *Apocynum cannabinum* (অ্যাপোসাইনাম ক্যানাবিনাম), *Cryptostegia grandiflora* (ক্রীপটোস্টিজিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা) ও *C. madagascariensis* (ক্রী. ম্যাডাগাসকারিয়েনসিস) , Fam. *Euphorbiaceae* (ইউফরবিয়েসি গোত্রীয়), *Euphorbia initisy* (ইউফরবিয়া ইনটিসি) যাহা আফ্রিকার মাদাগাস্কার অঞ্চলের একপ্রকার পাতাবিহীন গুল্ম ; অ্যাসক্লিপিয়াডেসি গোত্রীয় (Fam. Asclepiadaceae) *Asclepias subulata* (অ্যাসক্লিপিয়াস সুবুলাটা) ; কম্পোসিটি গোত্রীয় (Fam. Compositae) *Taraxacum koksaghyx* (টারাক্সাকাম কক্সাঘিজ) এবং *Salidago leanenworthii* (সলিডাগো লিয়ানেনওয়রথি) ও (স্যাপোটেসি গোত্রীয়) *Mimusops globosa*) (মাইমুসপস গ্লোবোসা) যাহা হইতে বালাটা রবার (balata rubber) প্রস্তুত হয়।

১১

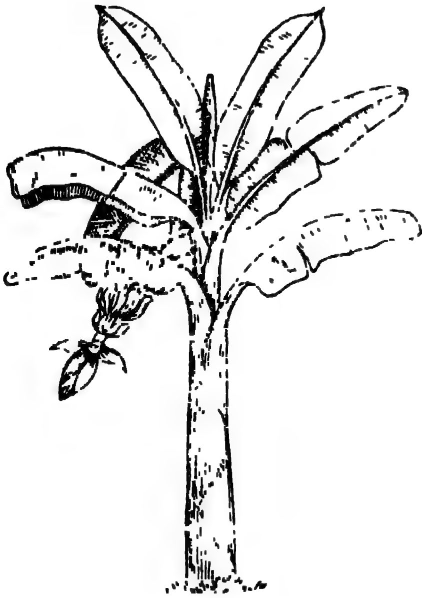
ফল
(Fruits)

ফল বলিতে নিষিক্ত ও পরিপক্ক গর্ভাশয় অথবা তৎসহ অন্যান্য ফুলের অংশগুলি বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে সকল ফল আমরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করি তাহারই যথার্থ ফল। আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, আনারস, পেঁপে প্রভৃতি প্রচুর সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ফল দেখা যায়।

কলা (Banana)—কলাগাছ মুজেসী গোত্রভুক্ত (Fam. Musaceae) উদ্ভিদ। ভারতবর্ষই ইহার জন্মস্থান এবং এখান হইতে ইহা পৃথিবীর সর্বত্রই বিস্তারলাভ করিয়াছে।

ভারত, বাংলাদেশ, সিংহল, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর বহু স্থানেই বিভিন্ন প্রকার কলা দেখিতে পাওয়া যায়।

কলাগাছ বর্ষজীবী উদ্ভিদ। ইহার ভূ নিম্নস্থ রাইজোম হইতে অস্থানিক মূল নির্গত হয়। রাইজোম হইতে sheathing leaf bases বা কান্ডবেষ্টিত পত্রমূলসম্পন্ন পাতাগুলি সর্পিলভাবে উৎপন্ন হইয়া পত্রবৃন্তগুলি একত্রে কান্ডের ন্যায় আকার ধারণ করে। ইহার inflorescence বা পুষ্পবিন্যাস হইল বহুসংখ্যক রঞ্জিত bracts বা মঞ্জরীপত্রযুক্ত স্প্যাডিক্স (spadix)। মঞ্জরীপত্রগুলির কক্ষ হইতে পুষ্পগুলি উৎপন্ন হয়। পুষ্পবিন্যাসের নিম্নস্থ পুষ্পগুলি স্ত্রী পুষ্প এবং অগ্রভাগের পুষ্পগুলি পুং-পুষ্প কিন্তু মধ্যের পুষ্পগুলি neuter flower বা ক্লীবপুষ্প অথবা hermaphrodite বা উভলিঙ্গ হইয়া থাকে। ফলবেরী (berry)। ইহা সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর।



১৮৭ নং চিত্র—কলাগাছ

কলাগাছ উষ্ণপ্রধান অথবা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে চাষ করা হয় এবং ইহার জন্য 25 সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং গড়ে প্রায় 200-350 সি সি. বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। বালুকাময় অথবা কর্দমাক্ত মৃত্তিকায় ইহা চাষ করা হয়। মৃত্তিকায় উপযুক্ত জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ঢালু পর্বতগাত্রেও অথবা পুষ্করিণী অথবা বৃহৎ জলাশয়ের ধারে কলাগাছের চাষ হইয়া থাকে।

জমি পরিষ্কার করিয়া উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে হয়। বর্ষাকালে 9-10 বর্গমিটার অন্তর মৃত্তিকা খুঁড়িয়া রাইজোমগুলিকে বসাইতে হয়। এই সময়ে আগাছাগুলি তুলিয়া ফেলা প্রয়োজন। এখন রাইজোমগুলিকে অল্প মৃত্তিকা এবং ছাই দিয়া চাপা দিতে হয়। কলাগাছের চাষে অ্যামোনিয়াম সালফেট (ammonium sulphate), সুপার সালফেট (super sulphate), ইউরিয়া (urea) প্রভৃতি সার ব্যবহার করা হয়। ফলগুলি পাকিয়া পীতবর্ণ ধারণ করিলে কাঁদিগুলি কাটিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থে প্রেরণ করা হয়।

প্রধানতঃ খাদ্য প্রদানকারী উদ্ভিদ (Plants mainly yielding food)

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
ধান বা চাউল (Paddy)	*Oryza sativa*	Poaceae = Gramineae	(a) ক্যারিয়প্সিস নামক দানার সস্যল অংশ। (b) ধান ঝাড়িবার পর উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ যাহাকে খড় বলে।	(a) খাদ্য শস্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (b) গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং গৃহাচ্ছাদানের কার্যেও ব্যবহৃত হয়।
গম (Wheat)	*Triticum aestivum*	ঐ	ক্যারিয়প্সিস নামক দানার সস্যল অংশ।	খাদ্য শস্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
ভুট্টা (Maize)	*Zea mays*	ঐ	ঐ	ঐ
ছোলা (Gram)	*Cicer arietinum*	Fabaceae = Sub-fam Papiliaceatae	লেগুম নামক ফলের বীজ অথবা বীজপত্র।	দাইল নামক খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।
মটর (Pea)	*Pisum sativum*	ঐ	ঐ	ঐ
মসুরী (Lentil)	*Lens esculenta*	ঐ	ঐ	ঐ
মুগ (Mung)	*Phaseolus mungo*	ঐ	ঐ	ঐ
অড়হর (Pigeon pea)	*Cajanus indicus*	ঐ	ঐ	ঐ
খেসারি (Grass pea)	*Lathyrus sativus*	ঐ	ঐ	ঐ
কলাই (Kalai)	*Phaseolus roxburghii*	ঐ	ঐ	ঐ

2. **প্রধানতঃ সব্জী প্রদানকারী উদ্ভিদ** (Plants mainly yielding vegetables)

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
বরবটী (Cowpea)	*Vigna senensis*	Leguminosae (Papilionaceae)	সবুজ বর্ণের ফল ও বীজ	উদ্ভিজ্জ সবজী (Vegetable) হিসাবে ব্যবহৃত হয়
সীম (Bean)	*Dolichos lablab*	ঐ	ঐ	ঐ
ফরাসী বীন (French bean)	*Phaseolus vulgaris*	ঐ	ঐ	ঐ
সোয়াবীন (Sayabean)	*Glycine max*	ঐ	ঐ	ঐ
মূলা (Radish)	*Raphanus sativus*	Brassicaceae = Cruciferae	স্ফীত প্রধান মূল	ঐ
গাজর (Carrot)	*Dancus carrota*	Umbelliferae	ঐ	ঐ
শালগম	*Brassica rapa*	Brassicaceae = Cruciferae	ঐ	ঐ
বীট (Beet)	*Beta vulgaris*	Chenopodiaceae	ঐ	ঐ
পিঁয়াজ (Onion)	*Allium cepa*	Liliaceae	কন্দের (bulb) স্ফীত শল্কপত্র	ঐ
রসুন (Garlic)	*Allium sativum*	ঐ	ঐ	ঐ
আলু (Potato)	*Solanum tuberosum*	Solanaceae	স্ফীত কন্দ	ঐ
পটল (Palwal)	*Trichosanthes dioica*	Cucurbitaceae	পেপো নামক ফলের মধ্যস্ত্বক ও অন্তস্ত্বক এবং গাছের পাতা	ঐ
কুমড়া (Gourd)	*Cucurbita maxima*	ঐ	ঐ	ঐ
লাউ (Bottle gourd)	*Lagenaria vulgaris*	ঐ	ঐ	ঐ
শশা (Sasha)	*Cucumies sativum*	ঐ	সম্পূর্ণ ফল	খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়

3. প্রধানতঃ ফল প্রদানকারী উদ্ভিদ (Plants mainly yielding fruits)

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
আম (Mango)	*Mangifera indica*	Andcardiaceae	(a) ড্রুপ নামক ফলের মধ্যত্বক (mesocarp) । (b) পরিণত কাণ্ড।	(a) সুস্বাদু ফল (খাদ্য ব্যবহৃত হয়। (b) প্যাকিং বাক্স ও প্লাইউড প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।
কাঁঠাল (Jack fruit)	*Artocarpus heterophyllus*	Moraceae	(a) সরোসিস নামক ফলের মঞ্জরীপত্র, পুষ্পপুট ও বীজ। (b) পরিণত কাণ্ড।	(a) সুস্বাদু ফল। (b) দরজা, জানাল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্য ত হয়।
লিচু ch	*Litc sis*	Sapindaceae	ফলের স্ফীত এরিল (a	সুস্ব দু ফল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়
পেঁপে Pepaw	*Carica papaya*	Caricaceae	বেরী নামক ফলের ফলত্বক (Pericarp) ।	ঐ
জামরুল (Water rose-apple)	*Syzygium aquanum*	acea	বেরী নামক ফলের যুক্ত পু ক ও ফলত্বক।	ঐ
গোলাপ জাম (Rose apple)	*Syzygium ja os*	ঐ	ঐ	ঐ
কালো জাম (Black plum)	*Syzygium cumini*	ঐ	ঐ	ঐ
আনারস (Pine apple)	*Ananasa sativa*	Bromaliaceae	সরোসিস নামক ফলের অক্ষ, মঞ্জরী-পত্র, পুষ্পপুট ও ফলত্বক যুক্ত।	ঐ

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
কমলালেবু (Orange)	*Citrus sinensis*	Rutaceae	হেসপেরিডিয়াম নামক ফলের অন্তস্ত্বক হইতে উদ্গত এককোষী রসাল রোম।	সুস্বাদু ফল খাদ্য হিসাবে বহৃত হয়
তরমুজ (Water melon	*Citrullus vulgaris*	Cucurbitaceae	পেপো নামক ফলের মধ্যস্ত্বক ও অন্তস্ত্বক।	ঐ
বেল (Wood apple)	*Aegle marmelos*	Rutaceae	স্ফীত অমরা সমেত মধ্যস্ত্বক ও অন্তস্ত্বক।	ঐ
আঙ্গুর (Grape)	*Vitis vinifera*	Vitaceae	বেরী নামক ফলের ফলত্বক ও অমরা।	ঐ
আপেল (Apple)	*Pyrus malus*	Rosaceae	পোম নামক ফলের স্ফীত পুষ্পাক্ষ।	ঐ
কলা (Banana)	*Musa paradisiaca* (কাঁচা কলা) *M. sapientum* (পাকা কলা)	Musaceae	(a) বেরী নামক ফলের মধ্যস্ত্বক ও অন্তস্ত্বক। (b) পাতা (c) পরিণত মঞ্জরীর শেষাংশ অর্থাৎ মোচা। (d) দীর্ঘ স্ফীত মঞ্জরী-দণ্ড বা থোড়।	a সুস্বাদু ফল হস ব্যবহৃত হয়। (b) রাখিবার পাত্র হস ব্যবহৃত হয়। (c) জী হিসাবে ব ত হয় ঐ
খেজুর (Date palm)	*Phoenix sylvestris*	Arecaceae Palmae	(a) ড্রুপ নামক ফলের মধ্যস্ত্বক। (b) কাণ্ডের অগ্রভাগ।	সুস্বাদু খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় সুমিষ্ট রস (খেজুর রস) যাহা হইতে গুড়

4. প্রধানতঃ তেল প্রদানকারী উদ্ভিদ (Plants mainly yielding oil)

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
নারিকেল (Coconut)	*Cocos nucifera*	Arecaceae = Palmae	(a) শুষ্ক শাঁস (Kernel) (b) তন্তুময় ফলের (ড্রুপ) সস্য ও বীজপত্র। (c) ফলের দৃঢ় উপরিত্বক (খোল)। (d) ফলের তন্তুময় মধ্যত্বক। (e) পরিণত পাতার উপ-মধ্যশিরা। (f) কাষ্ঠল দীর্ঘ কাণ্ড (গুঁড়ি)।	(a) বিশোধিত তৈল যাহা রন্ধন কার্যে সহায়ক, মাখিবার ও সুগন্ধী তৈল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (b) সুস্বাদু খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। (c) হুকা প্রস্তুত করিতে ,, (d) দড়ি প্রস্তুত করিতে ,, (e) ঝাঁটা, বুরুশ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। (f) গৃহ-নির্মাণের খুঁটি ও থাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
কাল সরিষা (Black mustard)	*Brassica nigra*	Brassicaceae = cruciferae	বীজ	বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহা রন্ধন কার্যে এবং গায়ে মাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।
রেড়ী (Caster)	*Ricinus communis*	Euphorbiaceae	বীজ	তৈল রেচক হিসাবে, পিচ্ছিলতা উৎপাদনে ও বাতের ঔষধ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
লবঙ্গ (Clove	*Syzygium aromaticum*	Myrtaceae	ফুলের শুষ্ক গর্ভাশয়	a) উৎপন্ন তৈল ঔষধ হিসাবে এবং জীববিদ্যা বিষয়ক পরীক্ষাগারে জীবদেহের পাতলা অংশ পরিষ্কার করিবার বিকারক হ র ব্যব ত হয়।
			ফল	b ম হসাবে ব্যবহৃত হয়।
বাদাম Gr ound nu	*Arach gea*	Fa aceae = Leguminosae	বীজ	a তৈল দা হিসাবে কৃত্রিম মাখন ও মিঠাই প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। খোস ও খৈল সার বে হৃত হয়।
তসি Lin seed	*L sita ss. nu*	L naceae	বীজ	তৈ শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায় বা য় লরে ক রং প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয় সাবান, ছ পার ক ল, অয়েল ক্লথ কৃত্রিম চামড়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেও ব্যবহৃত হয়।
মহুয়া Mahua	*Madi ca*	Sapotaceae	বীজ	(a) তৈল কৃত্রিম মাখন ও সাবান প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়.
			মঞ্জরী	(b) সন্ধান প্রক্রিয়ায় মদ প্রস্তুত হয়।

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
সরগুজা (Niger)	*Guizotia abissinica*	Asteraceae= Compositae	বীজ	(a) পরিশুদ্ধ তৈল . খাদ্য হিসাবে, বাতি জ্বালিতে ও সাবান প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। (b) খৈল গবাদি পশুর খাদ্য ও সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
কুসুম (Safflower)	*Carthamus tinctorius*	Asteraceae= Compositae	বীজ	তৈল রঞ্জক শিল্পে, চটের থলি, ত্রিপল, ওয়াটার প্রুফ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রস্তর ফলক ও কাঁচ আটিবার জন্যও ব্যবহৃত হয়।
তিল (Sesame)	*Sesamum indicum*	Pedaliaceae	বীজ	তৈল রন্ধন কার্যে, সুগন্ধ দ্রব্য, সাবান ও ছাপাইবার কালি, প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। পূজাতেও ইহার ব্যবহার সর্বজনবিদীত। খইল গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।
সূর্যমুখী (Sun-flower)	*Helianthus anuus*	Asteraceae= compositae	বীজ	রন্ধন করিবার তৈল, কৃত্রিম মাখম প্রভৃতি ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

5. **প্রধানতঃ তন্তু প্রদানকারী উদ্ভিদ (Plants mainly yielding fibres)**

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
কার্পাস তুলা (Cotton)	*Gossypium herbaceum* *g. arboreum.* *g. barbadense.* *g. hirsutum.*	Malvaceae	বীজ (বহিঃত্বক তন্তুযুক্ত)	তন্তু বিভিন্ন বয়ন শিল্পে, বালিশ কুশন, প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে, রবারের টায়ারে, বিভিন্ন সেলুলোজ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
			মূল ও বৃন্ত	কাগজ ও ঔষধ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।
			বীজ	পরিশুদ্ধ তৈল রন্ধন কার্যে, মাথায় মাখিবার তৈল হিসাবে এবং বাতি জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করা হয়।
মিঠা পাট (Tossa jute)	*Corchorus olitorius*	Tiliaceae	কাণ্ডের গৌণ ফ্লোয়েমের বাস্ট তন্তু।	চট, চটের থলি, দড়ি, সুতা, কার্পেট এবং মোটা কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।
তিতা পাট (White jute)	*C. Capsularis*	ঐ	ঐ	ঐ
মেস্তা (Mesta)	*Hibiscus sabdariffa*	Malvaceae	কাণ্ড	দড়ি ও সুতা প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।
সিমুল (Silk cotton)	*Salmulia malabarica*	Bombacaceae	(a) ফলের বিপরীত প্রাচীর	(a) নরম রেশমের ন্যায় তুলা দ্বারা বালিশ প্রস্তুত হয়।
			(b) কাণ্ড	(b) কাষ্ঠ হইতে প্যাকিং বাক্স, ফল রাখিবার বাক্স প্রস্তুত হয়। তন্তু হইতে পোশাক-পরিচ্ছদ, ক্ষৌমবস্ত্র প্রস্তুত হয়।

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
আলসি (Flax)	*Linum usitatissimum*	Linaceae	কাণ্ড	টোয়াইন সূতা ও মোড়কের কাগজ প্রস্তুত হয়।
6. প্রধানত শর্করা প্রদানকারী উদ্ভিদ (Plants mainly yielding sugar)				
আখ (Sugar cane)	*Saccharum officinarum*	Poaceae = gramineae	(a) কাণ্ড	(a) মিষ্ট রস হইতে দ্রাক্ষা শর্করা ও গুড় প্রস্তুত হয়।
			(b) রস নিষ্কাশনের পরে শুষ্ক কাণ্ড	(b) জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়।
তাল (Palm sugar)	*Borassus flabellifer*	Arecaceae = Palmae	(a) বীটপের অগ্রভাগ	নূতন অগ্রভাগ ছেদন করিলে মিষ্ট রস নির্গত হয় যাহা হইতে শর্করা, গুড় ও কোহল প্রস্তুত করা হয়।
			(b) ফল	খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় ও বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।
খেজুর (Date palm)	*Phoenix sylvestris*	ঐ	(a) বীটপের অগ্রভাগ	নূতন অগ্রভাগ ছেদন করিলে মিষ্ট রস নির্গত হয় যাহা হইতে শর্করা, গুড় ও কোহল প্রস্তুত করা হয়।
			(b) ফল	খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
বীট (Sugar beet)	*Beta vulgaris*	Chenopodiaceae	স্ফীত-মূল	(a) মিষ্ট রস হইতে শর্করা প্রস্তুত হয়। (b) সব্জী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

7. **প্রধানতঃ উদ্দীপক পদার্থ প্রদানকারী উদ্ভিদ** (Plants mainly yielding beverages)

চা (Tea)	*Camellia sinensis*	Ternstroemiaceae	কাণ্ডের অগ্রভাগের নূতন পত্র-মুকুল	চায়ের পাতা প্রস্তুত হয়।
কফি (Coffee)	*Coffea arabica*	Rubiaceae	বীজ	কফি চূর্ণ প্রস্তুত হয়।
কোকো (Cocoa)	*Theobroma cacao*	Sterculiaceae	বীজ	কোকো প্রস্তুত হয়।

৪. প্রধানতঃ রবার প্রদানকারী উদ্ভিদ (Plants mainly yielding rubber)

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
ভারতীয় রবার (India rubber)	*Ficus elastica*	Moraceae	কাণ্ড ও শাখা হইতে নির্গত তরুক্ষীর।	রবার নির্মিত বিভিন্ন প্রকার পদার্থ প্রস্তুত হয়।
পানামা রবার (Panama rubber)	*Castitilla elastica*	ঐ	কাণ্ড হইতে নির্গত তরুক্ষীর	ঐ
প্যারা রবার (Para rubber)	*Hevea brasiliensis*	Euphorbiaceae	ঐ	ইহা সর্বোৎকৃষ্ট রবার এবং অতি উত্তম রবার নির্মিত পদার্থ টায়ার, টিউব প্রভৃতি। ওয়াটার প্রুফ, কুশন, জুতা, তারের বিদ্যুৎ অপরিবাহী আবরণ, পুতুল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।
সিয়েরা রবার (Ceara rubber)	*Manihot glaziovii*	ঐ	কাণ্ড ও মূল হইতে নির্গত তরুক্ষীর	রবার নির্মিত বিভিন্ন প্রকার পদার্থ প্রস্তুত হয়।
গুয়েউল রবার (Guayule rubber)	*Parthenium argentatum*	Asteraceae = compositae	কলামধ্যস্থ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাউচু নামক পদার্থের দানা	প্রধানত রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত রবারের মিশ্রণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

9. প্রধানতঃ উত্তেজক পদার্থ প্রদানকারী উদ্ভিদ (Narcotics yielding plants)

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
তামাক (Tobacco)	*Nicotiana tabacum*	Solanaceae	পাতা	সিগারেট, চুরুট, নস্য প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।
গাঁজা ভাঙ (Ganja Bhang)	*Cannabis sativa*	Cannabinaceae	(a) একপ্রকার রজনযুক্ত স্ত্রী পুষ্প গাঁজার ক্ষেত্রে (b) পুং ও স্ত্রী উদ্ভিদের শুষ্ক মঞ্জরী উৎপাদনকারী বীটপ ও পাতা ভাঙের ক্ষেত্রে	(a) ধূমপান, উদ্দীপক পদার্থ ও মিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিতে গাঁজা ব্যবহৃত হয়। (b) উদ্দীপক পদার্থ হিসাবে ও ধূমপান করিতেও ভাঙ ব্যবহৃত হয়।
আফিম (Opium)	*Papaver somniferum*	Papaveraceae	অপরিণত ফলের তরুক্ষীর	নিদ্রাবিষ্ট করিতে ও যন্ত্রণা লাঘব করিতে সেবন করা হয়।

10. প্রধানতঃ কাষ্ঠ প্রদানকারী উদ্ভিদ (Plants mainly yielding timber)

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
বাঁশ (Bamboo)	(*a*) *Dendrocalamus haamiltonii* (*b*) *D. Strictus* (*c*) *Melocanua bambusioides* (*d*) *Bambusa tulda* (*e*) *B. pelida* (*f*) *B arundinacca* (*g*) *B halcooa* (*h*) *B. polymorpha* (*i*) *B. vulgaris*	Poaceae = Graminae	পরিণত কাণ্ড	বই, খাতা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত।
শাল (Sal)	*Shorea robusta*	Dipterocar-paceae	(a) পরিণত কাণ্ড (b) কাণ্ডের বল্কল	(a) জানালা, দরজা, কড়ি, বরগা ও আসবাবপত্র প্রস্তুত করিতে, গৃহনির্মাণ ও খুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (b) কাপড়, চামড়া, পিতলের বাসন প্রভৃতি রং করিতে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
সেগুন (Teak	*Tectona grandis*	Verbenace e	পরিণত কাণ্ড	জানালা, দরজা, আসবাবপত্র প্লাই উড প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।
জারুল (Jarul)	*Lagerstroemia parviflora* *L. flosregina* *L. speciosa*	Lythraceae	পরিণত কাণ্ড	জানালা, দরজা, জাহাজ নির্মাণ ঘরের মেঝে প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।
পাইন (Pine wood)	*Pinussps.*	Pinaceae	পরিণত কাণ্ড	গৃহনির্মাণে, প্যাকিং বাক্স, পেন্সিল, দেশলাই কাঠি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।
শিশু (Indian rose wood)	*Dalbergia lati* *D. sisoo*	Fabaceae	ঐ	আসবাব পত্র, চাষ আবাদের যন্ত্র, গরুর গাড়ীর চাকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।
তুন (Red ceder)	*Toona ciliata*	Meliaceae	ঐ	আসবাব পত্র প্রস্তুত করিতে, তেলের পিপা, সিগারেটের বাক্স, খেলনা, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।
ভিরা (Stain wood	*Chloroxylon swiete*	Rutaceae	ঐ	আসবাবপত্র, পাতলা তক্তার আবরণ, ছবির ফ্রেম প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	বহারিক প্রয়োজন ব্রত
গর্জন (Garjan)	*Dipterocarpus turbinatus* *D. macrocarpus* *D indicus*	Dipterocarpaceae	পরিণত কাণ্ড	(চায়ের পেটি, প্যা কং বাক্স প্রভৃতি ত করিতে ব্যবহৃত হয় (b) ইহা হইতে গর্জন তৈল নামক এক প্রকার তৈল পাওয়া যায় যাহা রং করিবার কার্যে ব্যবহৃত হয়।
বনমালা (Andaman red wood)	*Pterocarpus indicus* *P. marcopium*	Fabaceae	ঐ	মূল্যবান আসবাবপত্র ও গাড়ী প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।
লালচন্দন (Red sandal wood)	*P. santalium*		ঐ	(a) আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয় (b) কাপড়, চামড়া ভৃতি রং করিতে ব্যবহৃত হয়।
শ্বেত চন্দন (White sandal wood)	*Santalum album*	Santalaceae	ঐ	(a) বাক্স, খেলনা, আসবাবপত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। (b) চন্দন তৈল বহু প্রকার সুগন্ধযুক্ত পদার্থ প্রস্তুত করিতে ব র কর হয়

ফল

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
আবলুস কাষ্ঠ (Ebony)	*Diospyros ebenum* *D melanoxylon.*	Ebenaceae	সার কাষ্ঠ	ইহা অতিশয় কৃষ্ণবর্ণের এবং চলিবার লাঠি, মনোরম জিনিস, বন্দুকের পিছনের অংশ, পিয়ানোর চাবি, খেলাধুলার সরঞ্জাম, খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।
মেহগনি (Mahagony)	*Swietenia mahagoni*	Meliaceae	পরিণত কাণ্ড	আসবাবপত্র. খাট, আলমারি, গাড়ি. জাহাজ, নৌকা, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।
ওক (Oak)	*Quercus paciphyllum* *Q. dilatata* *Q. liniata* *Q lamilosa*	Fagaceae	ঐ	জাহাজ নির্মাণ, সেতু, আসবাবপত্র ও মেঝে প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।
শিরিস (Parrot tree)	*Albizzia lebbeck* *A. procera* *A. odoretissima*	Mimosaceae	ঐ	ছবির ফ্রেম, খেলনা, চিরুনি, গরুর গাড়ীর চাকা, নৌকা, খুঁটি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

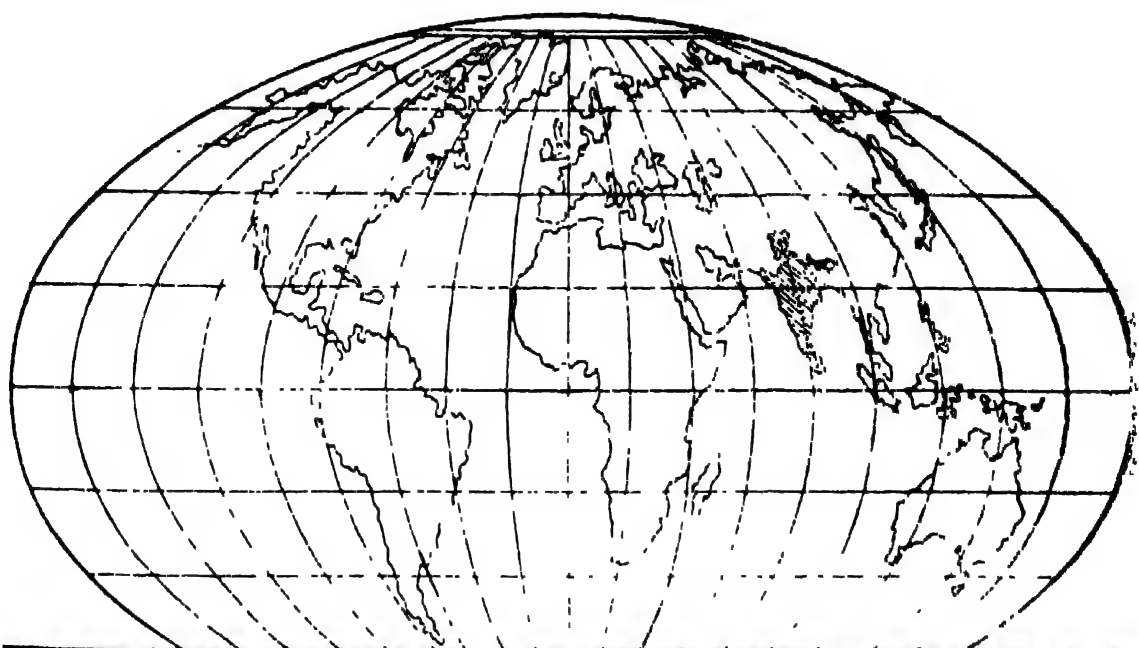
সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
সুলতান চাঁপা	*Calophyllum inophyllum*	Mimosaceae	পরিণত কাণ্ড	জাহাজ নির্মাণ, মাছ ধরিবার নৌকা, মহিষ-গাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।
দারু (Deodar)	*Cedrus deodara*	Pinaceae	ঐ	রেলের স্লিপার, সেতু, জানালা দরজা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

11. ভেষজ উদ্ভিদ (Medicinal plants)

কণ্টবিষ (অ্যাকোনাইটাম)	*Aconitum napellus.*	Ranunculaceae	মূল	বাত ও স্নায়ুশূল রোগের ঔষধ প্রস্তুত হয়।
বাকস (Bakas)	*Adhatoda vasica*	Acanthaceae	(a) পাতার রস (b) শুষ্ক পাতা	(a) কাশি ও ব্রংকাইটিস রোগের মহৌষধ। (b) হাঁপানি রোগের কষ্ট লাঘব করে।
কালমেঘ (Creat)	*Andrographis paniculata*	Acanthaceae	(a) মূল (b) পাতার রস	(a) পাকস্থলী সংক্রান্ত রোগের ঔষধ প্রস্তুত হয়। (b) উদরাময় এবং লিভারের মহৌষধ।

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
বেলেডোনা (Belladona)	*Atropa belladona*	Solanaceae	পুষ্প উৎপাদনের সময় শুষ্ক পাতা	দেহের বহির্ভাগে বা অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণার উপশম হয় এবং কাশি ও অতিরিক্ত ঘাম হইলে সুফল পাওয়া যায়। চক্ষু তারার রন্ধ্র বিস্তার করিতেও ইহার ব্যবহার করা হয়।
ডিজিটালিস (Fox glove)	*Digitalis purpurea*	Scrophulariaceae	পরিণত উদ্ভিদের শুষ্ক পাতা	হৃদরোগের ঔষধ প্রস্তুত হয়।
ব্রাহ্মী (Brahmi)	*Bacopa monnieria*	Scrophulariaceae	পাতার নিষ্কর্ষণ	স্নায়ুরোগ, মৃগীরোগ এবং মস্তিষ্ক বিকৃতির ঔষধ প্রস্তুত হয়।
আয়াপান (Ayapan)	*Eupatorium ayapana*	Asteraceae = compositae	পাতার রস	রক্তস্রাব বন্ধ হয়।
কুরচী (Easter tree)	*Holarrhena antidysenterica*	Apocyanaceae	(a) বীজ (b) মূল ও কাণ্ডের বল্কল,	উদরাময় ও বায়ু প্রকোপে ব্যবহৃত হয়। আমাশয় ও জ্বরের মহৌষধ।
ইপিক্যাক (Ipecac)	*Psychotria ipecacuanha*	Rubiaceae	মূল	এমিটিন নামক একপ্রকার উপক্ষার থাকে যাহা হইতে আমাশয়ের ঔষধ প্রস্তুত হয়।

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অংশ	ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা
নাক্সভমিকা (Nuxvomica)	*Strychnos nuxvomica*	Loganiaceae	বীজের নিষ্কর্ষণ	মেরুদণ্ডকে উদ্দীপীত করিতে ও স্নায়ু রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। মৃগীরোগ, উদরাময়, জলাতঙ্ক রোগ ও কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহার ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।
চিরতা (Chirata)	*Swertia chirata*	Gentianaceae	কাণ্ড	বলবর্ধক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় ও উদরাময় নিরাময় করে।
চালমুগরা (Chaulmugra)	*Taraktogenos kurzii*	Flacourtiaceae	বীজ নিষ্কাষিত তৈল	চর্মরোগ ও কুষ্ঠরোগে ব্যবহৃত হয়।
ইউক্যালিপটাস (Eucalyptus)	*Eucalyptus globosus*	Myrtaceae	শুষ্ক পাতা হইতে নিষ্কাষিত তৈল	নাক, গলা, হাঁপানি ও ব্রংকাইটিস রোগে ব্যবহৃত হয়।



উদ্ভিদ ভূগোলবিদ্যা

১ ভারতীয় উদ্ভিদের ভৌগোলিক অঞ্চল
(Phytogeographical regions of India)

উদ্ভিদ ভূগোলবিদ্যার সহিত প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে। পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশ এবং ইহার অন্তর্গত অসংখ্য দ্বীপ, জলাশয়, মরুভূমি, সমুদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন পরিবেশ বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করিয়াছে। উদ্ভিদের বিস্তার অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবী চারিটি মণ্ডলে বিভক্ত। বিষুব অঞ্চল সর্বাধিক উষ্ণ অঞ্চল এবং ইহা হইতে ক্রমদূরবর্তী অঞ্চলের তাপমাত্রাও ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে। এই কারণে ঐ সকল অঞ্চলের উদ্ভিদের বিস্তৃতিও বিভিন্ন। বিষুব অঞ্চলের উভয় পার্শ্বে যে চারিটি মণ্ডল আছে তাহারা হইল যথাক্রমে tropical zone বা গ্রীষ্মমণ্ডল, subtropical zone বা উপগ্রীষ্ম মণ্ডল, temperate zone বা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল, এবং artic অথবা সুমেরু বা Polar zone বা মেরু-মণ্ডল। হ্যানসেন (Hansen) নামক বিজ্ঞানী বিষুব অঞ্চলের উভয় পার্শ্বের সমগ্র অঞ্চলকে সূর্যের অবস্থান এবং latitude বা অক্ষাংশের সীমানা ধরিয়া আটটি মণ্ডলে ভাগ করিয়াছেন। ইহারা হইল যথাক্রমে equatorial zone বা বিষুবমণ্ডল, tropieal zone বা গ্রীষ্মমণ্ডল, subtropical zone বা উপগ্রীষ্ম মণ্ডল, warm temperate zone বা উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল, cold temperate zone বা শীতল নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল. subarctic zone বা উপসুমেরু মণ্ডল, arctic zone বা সুমেরুমণ্ডল এবং Polar zone বা মেরুমণ্ডল।

ভারতের রাজনৈতিক সীমানা যাহাই হউক না কেন ইহার উদ্ভিদ-ভৌগোলিক অঞ্চল বলিতে প্রকৃত ভারতবর্ষ, বর্মা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ. মালয়েশিয়া এবং সিংহল প্রভৃতি দেশ বুঝায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ ভারতীয় উদ্ভিদের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকটির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

1. 1898 খ্রীষ্টাব্দে C B. Clarke (সি. বি ক্লার্ক) নামক বিজ্ঞানী সমগ্র ভারতবর্ষকে এগারটি উদ্ভিদ-ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করেন। ইহারা হইল যথাক্রমে—

পশ্চিম হিমালয়. মরুভূমি, মালাবেরিয়া. শ্রীলঙ্কা, করোমণ্ডলীয়, গাঙ্গেয় সমতলভূমি, পূর্ব হিমালয়, আসাম, অ্যাভা, পেগু এবং মালয় উপদ্বীপ অঞ্চল।

ক্লার্ক এবং হুকার কর্তৃক নির্ধারিত অঞ্চলগুলি একই প্রকারের হইলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে উহাদের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ক্লার্ক নেপালের মধ্যাঞ্চলকে পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, পূর্ব আফগানিস্তান এবং সমগ্র বেলুচিস্তান এবং মধ্য ভারতকে সিন্ধুনদ সংলগ্ন সমতলভূমি অঞ্চলের এবং শ্রীলঙ্কাকে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ক্লার্কের মতে আসাম হইল একটি পৃথক উপঅঞ্চল, পূর্ব ও দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ হইতে পেগু নামক পৃথক উপঅঞ্চল, এবং অ্যাভা হইল উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব ব্রহ্মদেশের দেশগুলির সমষ্টি।

II. 1907 খ্রীষ্টাব্দে J. D. Hooker (জে. ডি. হুকার) ভারতবর্ষকে নয়টি উদ্ভিদ-ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করেন। ইহারা হইল যথ ক্রমে—

1. পূর্ব হিমালয়—এই অঞ্চল সিকিম হইতে উত্তর আসামের মিসমী পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত।

2. পশ্চিম হিমালয়—ইহা কুমায়ুন হইতে চিত্রল পর্যন্ত বিস্তৃত।

3. সিন্ধুনদ সংলগ্ন সমতলভূমি—এই অঞ্চল পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, রাজস্থানে, আরাবল্লী পর্বতমালার পশ্চিমভাগ, যমুনা, কচ্ছ এবং উত্তর গুজরাটের সমষ্টি।

4, গাঙ্গেয় সমতলভূমি—ইহা আরাবল্লী পর্বতমালা হইতে আরম্ভ করিয়া যমুনা এবং বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। সুন্দরবন, সিলেটের সমতলভূমি, আসামের সমতলভূমি, ওড়িশার নিম্নভূমি এবং মহানদীর উত্তরভাগ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলকে তিনটি উপঅঞ্চলে ভাগ করা হয়। যথা, উত্তরের শুষ্ক উপঅঞ্চল, নিম্নের আর্দ্র উপঅঞ্চল এবং সুন্দরবন।

5. মালাবার—ইহা গুজরাটের দক্ষিণ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ এবং লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত।

6 দাক্ষিণাত্য—এই অঞ্চল বলিতে গাঙ্গেয় সমতলভূমির এবং সিন্ধুনদ সংলগ্ন সমতলভূমির দক্ষিণে ও মালাবারের পূর্বদিকে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও উচ্চ মালভূমি বুঝায়। করমণ্ডলীয় উপকূলভাগ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

7. শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ।

8. ব্রহ্মদেশ—আন্দামান ও সম্ভবত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জও এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

9. মালয় উপদ্বীপ।

III. C. C Calder (সি. সি. ক্যালডার) নামক বিজ্ঞানী সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রথমে তিনটি প্রধান উদ্ভিদ-ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করেন, যথা হিমালয় অঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল এবং প্রতি অঞ্চলেই বিশিষ্ট প্রকৃতির উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। পরে অবশ্য জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক পরিস্থির উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ভারতবর্ষকে ছয়টি উদ্ভিদ অঞ্চলে ভাগ করেন। এই অঞ্চলগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল। যথা—

1. পূর্ব হিমালয় - এই অঞ্চলের উদ্ভিদগুলি প্রধানত সিকিমে দেখা যায়।

2 পশ্চিম হিমালয়।

3. সিন্ধুনদ সংলগ্ন সমতলভূমি—এই অঞ্চল পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং রাজস্থানে, আরাবল্লী পর্বতমালার পশ্চিমভাগ, যমুনা, কচ্ছ ও গুজরাটের সমষ্টি।

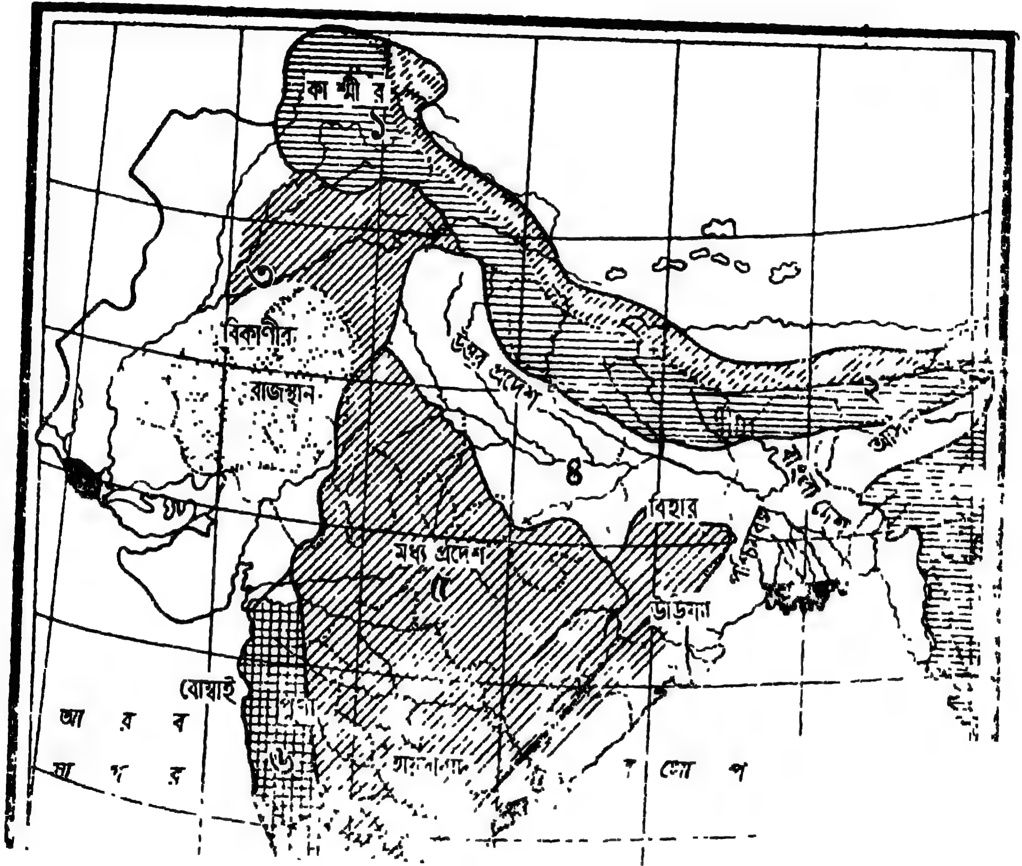
4. গাঙ্গেয় সমতলভূমি—ইহা তিনটি উপঅঞ্চলের সমষ্টি। যথা, উত্তর গাঙ্গেয় সমতলভূমি, মধ্য গাঙ্গেয় সমতলভূমি এবং নিম্ন গাঙ্গেয় সমতলভূমি। মধ্য গাঙ্গেয় সমতলভূমি বলিতে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশাকে বুঝায় এবং নিম্ন গাঙ্গেয় সমতলভূমি বলিতে সুন্দরবনের ব-দ্বীপ অঞ্চল বুঝায়।

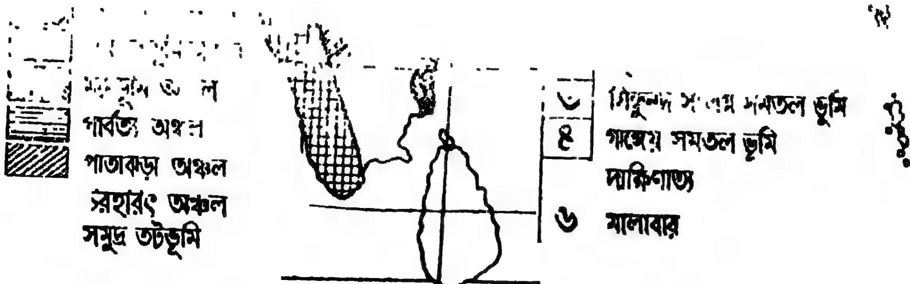
5. মালাবার—পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

6. দাক্ষিণাত্য—ইহা গাঙ্গেয় সমতলভূমির সমগ্র দক্ষিণ ভাগ এবং মালাবার উপকূলের পূর্ব ভাগ বুঝায়।

IV. D. Chatterjee (ডি. চ্যাটার্জী) নামক বিজ্ঞানী ভারতবর্ষকে প্রধানত দশটি উদ্ভিদ-ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করেন। ইহারা নিম্নে বর্ণিত হইল। যথা—

1. দাক্ষিণাত্য—এই অঞ্চল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী, হায়দরাবাদ এবং মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশ অংশের সমষ্টি।





১৮৮নং চিত্র : ভারতবর্ষের একটি রেখা মানচিত্রে তাহার বনভূমি ও উদ্ভিদ—ভৌগোলিক অঞ্চল দেখান হইল।

9. মালাবার—ইহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এবং ত্রিবেন্দ্রাম রাজ্যের অধিকাংশ অংশের সমষ্টি।

3. সিন্ধুনদ সংলগ্ন সমতলভূমি—ইহা প্রধানত দুইটি উপঅঞ্চলের সমষ্টি। যথা, সিন্ধু, রাজস্থান ও বালুচিস্তানের কিয়দংশের শুষ্ক মরুভূমি এবং পাঞ্জাবের আর্দ্র অঞ্চল।

4. গাঙ্গেয় সমতলভূমি—ইহাও প্রধানত তিনটি উপঅঞ্চলের সমষ্টি। যথা,—(*i*) উপরের শুষ্ক উপঅঞ্চল যাহা পাঞ্জাব হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর প্রদেশের অধিকাংশ ও পূর্বে এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত; (*ii*) নিম্নের আর্দ্র উপঅঞ্চল যাহা উত্তর প্রদেশের অবশিষ্টাংশ, বিহার, ওড়িশা এবং বঙ্গদেশকে বুঝায় কিন্তু গাঙ্গেয় ব-দ্বীপগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে; এবং (*iii*) সুন্দরবন উপঅঞ্চল।

5. আসাম।

6. পূর্ব হিমালয়—এই অঞ্চল দার্জিলিং, সিকিম ও ভুটানকে বুঝায় এবং ইহা মিসমী পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত।

7. নেপাল সমেত মধ্য হিমালয়।

8. পশ্চিম হিমালয়—এই অঞ্চল কুমায়ুন পর্বত হইতে আরম্ভ করিয়া কাশ্মীরের মধ্য দিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

9. উত্তর ব্রহ্মদেশ।

10. দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ।

যদিও ক্লার্ক এবং হুকার শ্রীলঙ্কাকে ভারতবর্ষের একটি উদ্ভিদ-ভৌগোলিক অঞ্চল রূপে গণ্য করিয়াছিলেন তথাপি চ্যাটার্জীর মতে ইহার ভারতের উদ্ভিদ-অঞ্চলের মধ্যে কোনো স্থান নাই। ইহার কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে যে শ্রীলঙ্কার উদ্ভিদগুলির অধিকাংশই বহিরাগত।

1960 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশ রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে খণ্ডিত ছিল এবং সেই কারণে ডি. চ্যাটার্জী ঐ সময়ে ভারতীয় উদ্ভিদ-ভৌগোলিক অঞ্চলের পুনর্বিন্যাস করেন। তাঁহার মতে দাক্ষিণাত্য, মালাবার- পূর্ব হিমালয় এবং মধ্য হিমালয় অঞ্চলের কোনো পরিবর্তন হয় নাই কিন্তু সিন্ধুনদের সংলগ্ন সমতলভূমি অঞ্চল বলিতে প্রধানত রাজস্থানের শুষ্ক মরু অঞ্চল, এবং পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের আর্দ্র অঞ্চল বুঝায়। গাঙ্গেয় সমতলভূমি অঞ্চল হইতে পূর্ব বাংলা ও সুন্দরবনের অধিকাংশ অঞ্চল বুঝায়। গাঙ্গেয় সমতলভূমি অঞ্চল হইতে পূর্ব পাকিস্তান যাহা অধুনা বাংলাদেশ নামে পরিচিত। অনুরূপে পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে বাদ দেওয়া হইয়াছে কারণ ইহা বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত।

২

ভারতীয় উদ্ভিদ অঞ্চলের উদ্ভিদের বিবরণ

(Flora of the Indian Phytogeographical regions)

ভারতের বিভিন্ন উদ্ভিদ-ভৌগোলিক অঞ্চলের যে-সকল উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

দাক্ষিণাত্যের উদ্ভিদ (Flora of the Deccan)

দাক্ষিণাত্য বলিতে গাঙ্গেয় সমতলভূমির সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এবং মালাবার বা পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সমগ্র পূর্ব অঞ্চলের বিস্তীর্ণ মালভূমি বুঝায়। ইহা দুইটি উপঅঞ্চলের সমষ্টি, যথা (*i*) পার্বত্য উচ্চ উপঅঞ্চল যাহা প্রকৃত দাক্ষিণাত্য নামে পরিচিত। ইহা পূর্বঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং (*ii*) করমণ্ডলীয় অঞ্চলের নিম্ন উপকূল অঞ্চল।

প্রথমোক্ত উপঅঞ্চলের উদ্ভিদগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক পূর্ব ও পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে, বঙ্গ, বিহার, আসাম ও ব্রহ্মদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে *Shorea robusta* বা শাল গাছ এবং *Tectona grandis* বা সেগুন গাছের জঙ্গলই প্রধান। অন্যান্য জাঙ্গল উদ্ভিদের মধ্যে *Michelia champaca* বা চম্পক গাছ, *Dillema aurea* বা চালতা গাছ, *Santalum album* বা শ্বেতচন্দন গাছ, *Cedrela toona* বা তুঁত গাছ, *Pterocarpus santalinus* বা লালচন্দন গাছ, *Butea frondosa* বা পলাশ গাছ, *Litsaea nitida* (লির্টসিয়া নাইটিডা) প্রভৃতি প্রধান।

গুল্মজাতীয় উদ্ভিদগুলির মধ্যে *Bauhinia* বা কাঞ্চন, *Zizyphus* বা কুল, *Grewia* বা ফলসা, *Lagerstoemea* বা জারুল, *Holarhena* বা কুরচী, *Phyllanthus* বা আমলকী, *Woodfordia* বা ধাত্রীফুল প্রভৃতি প্রধান।

বীরুৎ শ্রেণী উদ্ভিদগুলির মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিম বাংলা এবং বাংলাদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে অ্যাকানথেসী (Family Acanthaceae) এবং কমেলিনেসী (Commelinaceae) গোত্রীয় উদ্ভিদগুলি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। ইহা ব্যতীত, সিটামিনী (Family Scitamineae) এবং অরকীডেসী (Family Orchidaceae) গোত্রীয় উদ্ভিদ অতি অল্পই দেখা যায়। *Bombusa aurandjnacea* বা বাঁশ এবং পাম গোত্রীয় উদ্ভিদের মধ্যে *Dendrocalamus strictus* বা করাইল *Calamus viminalis* (ক্যালামাস ভিমিন্যালিস) এবং *Borassus flabellifer* বা তাল গাছ প্রধান।

রোহিণীর মধ্যে *Hiptage* বা মাধবীলতা, *Dioscoria* বা চুপড়ী আলু, *Vitis* ভাইটিস) *Smilax* বা কুমারীলতা, *Ipoemea* (আইপোমীয়া) প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যের একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে -এই অঞ্চলে black soil বা কৃষ্ণ মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। যে-সকল উদ্ভিদ এইরূপ মৃত্তিকায় জন্মায় তাহারা হইল *Cassia auriculata* (ক্যাসীয়া অরিকিউলাটা), *Calotropis procera* বা আকন্দ, *Hebiscus*

triomum (হিবিসকাস ট্রায়োমাম), *Capparis divaricata* (ক্যাপারিস ডাই-ভ্যারিকাটা) প্রভৃতি।

করমণ্ডলীয় উপঅঞ্চলে যে-সকল উদ্ভিদ জন্মায় তাহারা প্রকৃত দাক্ষিণাত্যের উদ্ভিদেরই অনুরূপ। কিন্তু নদীর মোহনার নিকট যে-সকল উদ্ভিদ জন্মায় তাহারা প্রকৃত দাক্ষিণাত্যের উদ্ভিদ হইতে স্বল্প ভিন্ন প্রকৃতির। এই অঞ্চলে প্রধানত *Spinifex squarrosus* (স্পিনিফেক্স স্কোয়ারোসাস) নামক একপ্রকার কণ্টকিত ঘাস এবং *Phoenix farinifera* (ফিনিক্স ফ্যারিনীফেরা) নামক একপ্রকার পাম গোত্রীয় উদ্ভিদের জঙ্গল দেখা যায়। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন প্রজাতির *Pterospermum* বা কনকচাঁপা, *Mimusops* বা বকুল, *Flacourtia* (ফ্ল্যাকুরটীয়া) *Strychnos nuxvomica* বা নাক্স ভোমিকা উদ্ভিদও দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের উদ্ভিদ

(Flora of the Eastern Himalayas)

পূর্ব হিমালয় উদ্ভিদ-ভৌগোলিক অঞ্চল বলিতে দার্জিলিং, সিকিম, ভুটান এবং মিসমী পর্বতমালা পর্যন্ত পূর্ব দিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বুঝায়। এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া আর্দ্র জলবায়ু ও উর্বর জৈব মৃত্তিকার প্রভাবে বিভিন্নপ্রকার উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। উচ্চতা অনুযায়ী এই অঞ্চলকে তিনটি মণ্ডলে ভাগ করা হয়। যথা—

(*a*) Tropical বা উষ্ণমণ্ডল—ইহা সমতলভূমি হইতে প্রায় 2000 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মণ্ডলের প্রধান প্রধান উদ্ভিদগুলির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

(*i*) বৃক্ষ—*Shorea robusta* বা শাল, *Mangifera indica* বা আম, *Anona squamosa* বা আতা, প্রভৃতি এবং লেগুমিনোসী (Families Leguminosae), মীরটেসী (Myrtaceae), রুবীয়েসী (Rubiaceae), ইউফরবিয়েসী (Euphorbiaceae) প্রভৃতি গোত্রের বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত *Quercus* (কুয়েরকাস), *Salix* (স্যালিক্স), *Populus* (পপুলাস), *Pinus* (পাইনাস), *Cycus* (সাইকাস) প্রভৃতি উদ্ভিদের কয়েকটি প্রজাতিও দেখা যায়।

জাঙ্গল উদ্ভিদের মধ্যে *Strobilanthes* (স্ট্রোবাইলানথিস) প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ইহা ব্যতীত *Malastoma* (মেলাস্টোমা), *Osbeckia* (অসবেকিয়া) প্রভৃতির প্রজাতিও দেখা যায়।

বীরুৎ শ্রেণী উদ্ভিদের মধ্যে মালভেসী Families (Malvaceae), অরকীডেসী (Orchidaceae), গ্রামিনী (Graminae), সিটামিনী (Scitamineae), প্রভৃতি গোত্রের উদ্ভিদগুলি প্রধান।

রোহিণীর মধ্যে প্রধানত Families কনভলভূলেসী (Convolvulaceae), কিউকারবিটেসী (Cucurbitaceae), অ্যাসক্লিপিয়াডেসী (Asclepiadaceae),

অ্যাপোসায়ানেসী (Apocyanaceae) ভাইটেসী (Vitaceae), ডায়োস্কোরীয়েসী (Dioscoriaceae), প্রভৃতি গোত্রের উদ্ভিদগুলি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

(*b*) Temperate zone বা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল—এই মণ্ডল 200 মিটার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় 3500 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মণ্ডলের অন্তর্গত নিম্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার অর্কিড দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ক্রমে যতই উচ্চে আরোহণ করা যায় Families রোজেসী (Rosaceae), এরিকেসী (Ericaceae), ল্যাবিয়েটী (Labiatae), প্রভৃতি গোত্রের উদ্ভিদ উহার স্থান অধিকার করে এবং উচ্চতা অধিকতর হইলে উহাদের পরিবর্তে Families প্রীমুলেসী (Primulaceae), স্যাক্সিফ্রাগেসী (Saxifragaceae), ক্রুসিফেরী (Cruciferae), প্রভৃতি গোত্রের উদ্ভিদ দেখা যায়। এই মণ্ডলের প্রধান প্রধান উদ্ভিদগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল। যথা—

(*i*) Coniferous forest বা কোনিফার জঙ্গল—*Pinus roxburghii*, (পাইনাস রক্সবারগী), *Pinus insularis* (পাইনাস ইনসুল্যারিস), *Taxus baccata* (টাক্সাস ব্যাক্কাটা), *Picea morinda* (পাইসিয়া মোরিণ্ডা), *Podocarpus latifolia* (পোডোকার্পাস ল্যাটিফোলিয়া), *Cephalotaxus manni* (কেফালোটাক্সাস ম্যানী), *Larix griffithii* (ল্যারিক্স গ্রীফিথী) প্রভৃতি অন্যান্য প্রধান উদ্ভিদগুলির মধ্যে *Magnolia campbellii* (ম্যাগনোলীয়া ক্যাম্পবেলী), *Pinus longifolia* (পাইনাস লঙ্গিফোলিয়া), *Quercus lamellosa* (কুয়েরকাস ল্যামেল্লোসা), *Betula alnoides* (বেটুলা অ্যালনয়ডিস), *Osbeckia* sp. (ওসবেকীয়ার প্রজাতি), *Vaccinium* sp. (ভ্যাক্সিনিয়মের প্রজাতি), *Rhododendron arboreum* (রডোডেণ্ড্রন আরবোরিয়ম), *Rubus* sp. (রুবাসের প্রজাতি), *Rosa* sp (গোলাপের প্রজাতি) প্রভৃতি এবং Families Rosaceae (রোজেসী), Labiatae (ল্যাবিয়েটী), Primulaceae (প্রীমুলেসী) প্রভৃতি গোত্রীয় উদ্ভিদের প্রাচুর্য দেখা যায়।

(*c*) Alpine zone (অত্যুচ্চ মণ্ডল)—এই মণ্ডল উচ্চতায় প্রায় 3500 মিটার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় 5500 মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মণ্ডলে Family Orchidaceae বা অর্কিডেসী গোত্রীয় উদ্ভিদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত এবং ইহার স্থানে Family Compositae বা কম্পোজিটী গোত্রীয় উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে। ইহা ব্যতীত প্রিমুলেসী (Family Primulaceae), স্যাক্সীফ্রাগেসী (Saxifragaceae), র‍্যানানকুলেসী (Ranunculaceae), ক্যারিওফাইলেসী (Caryophyllaceae), প্রভৃতি গোত্রের বিভিন্ন উদ্ভিদ এই মণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায়।

পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলের উদ্ভিদ

(Flora of the Western Himalayas)

পূর্ব হিমালয় অঞ্চল অপেক্ষা এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত কম বলিয়া আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শুষ্ক এবং শীতল। অধিকন্তু পূর্ব হিমালয় অঞ্চল অপেক্ষা এই অঞ্চলে

Family Orchidaceae বা রাসনা গোত্রীয় উদ্ভিদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং অ্যার্টিকেসী (Family Urticaceae), রুবীয়েসী (Rubiaceae) ও ইউফরবীয়েসী (Euphorbiaceae) সম্পূর্ণ বিলুপ্ত এবং ইহার স্থানে ল্যাবিয়েটী (Families Labiatae), র‍্যানানকুলেসী (Ranunculaceae) এবং ক্রুসীফেরী (Cruciferae) গোত্রের উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে। উচ্চতা অনুযায়ী এই অঞ্চলকে যথারীতি তিনটি মণ্ডলে ভাগ করা হইয়াছে। বিভিন্ন মণ্ডলের উদ্ভিদের বিস্তার নিম্নে বর্ণিত হইল। যথা—

(*a*) Tropical zone বা উষ্ণ মণ্ডল—সমতল ভূমি হইতে এই মণ্ডলের উচ্চতা প্রায় 1700 মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রধান উদ্ভিদগুলি হইল *Nerium indicum* বা করবী, *Punica granatum* বা ডালিম, *Coculus laurifolius* (ককুলাস লরিফোলিয়াস), *Callamus tenuis*বা বেত, *Roylea elegans* (রয়লীয়া এলিগ্যান্স) *Halopterea integrifolia* (হলোপটেরা ইন্টিগ্রিফোলিয়া), *Engelhardtia colebroo-keana* (এনজেলহার্ডটিয়া কোলিব্রুকীয়ানা)। *shorca robusta* বা শালগাছ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। ইহা ব্যতীত *Phoenix sylvestris* বা খেজুর, *Calamus tenuis* বা বেত *Dendrocalamus strictus* বা করাইল *Bulbophyllum* (বালবোফাইলাম) প্রভৃতি উদ্ভিদও পাওয়া যায়।

(*b*) Temperate zone বা নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল—এই মণ্ডলের উচ্চতা 1700 মিটার হইতে আরম্ভ করিয়া গড়ে প্রায় 3200 মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। Larix (ল্যারিক্স) ব্যতীত পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের সকল প্রকার Conifer (কোনিফার)-ই এই অঞ্চলে দেখা যায়। অধিকন্তু Conifer (কোনিফার) এর মধ্যে *Pinus longifolia* (পাইনাস লংগিফোলীয়া), *Pinus excelsa* (পাইনাস এক্সেলসা), *Pinus gerardiana* (পাইনাস জেরার্ডিয়ানা), *Abies pindrow* (অ্যাবিস পিণ্ড্রো), *Juniperous macropoda* (জুনিপেরস ম্যাক্রোপোডা), *Cupressus torulosa* কিউপ্রেসাস টরুলোসা), এবং অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যে *Quercus incana* (কুয়ারকাস ইনক্যানা), *Quercus dilatata* (কুয়েরকাস ডাইলেটেটা), *Betula utilis* (বেটুলা ইউটিলিস), *Prunus insititia* (প্রুনাস ইন্সিটিটিয়া), *Rosa webbiana*, এক-প্রকার গোলাপ, *Rosa moschata*, এক প্রকার গোলাপ, *Rhododendron* sp. (রোডোডেনড্রনের প্রজাতি), *Nymphaea alba* বা শালুক প্রভৃতি উদ্ভিদেরও প্রচুর সমাবেশ দেখা যায়। ইহা ব্যতীত Palm (পাম) ও কয়েক প্রকারের ক্ষুদ্র আকৃতির বাঁশ এই অঞ্চলে দেখা যায়।

(*c*) Alpine zone (অত্যুচ্চ মণ্ডল)—এই মণ্ডলও পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের ন্যায় 3500 মিটার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় 5500 মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব হিমালয়ের প্রিমুলেসী (Families Primulaceae) ও স্ক্রফুলারীয়েসী (Scrophulariaceae) গোত্রের উদ্ভিদগুলি এই অঞ্চলে সম্পূর্ণ লুপ্ত এবং ইহার পরিবর্তে লেগুমিনোসী (Families Leguminosae) এবং জেনসীয়ানেসী

(Gentianaceae) গোত্রীয় উদ্ভিদের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকার ঘাস এই অঞ্চলে প্রচুরপরিমাণ জন্মায়। অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যে *Potentillia* (পোটেনটিলিয়া), *Gentiana* (জেনসীয়ানা) *Juncus* (জানকাস), *Rheum* (রিয়াম), *Tanaceum* (ট্যানাসিয়াম), *Carex* (ক্যারেক্স), *Artemisia* (আরটিমিসিয়া) প্রভৃতি প্রধান।

গাঙ্গেয় সমতলভূমির উদ্ভিদ

(Flora of the Gangetic Plain)

গাঙ্গেয় সমতলভূমি অঞ্চল উত্তর ভারতের সিন্ধুনদ সংলগ্ন সমতলভূমি অঞ্চলের পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশের গঙ্গানদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বরাবর বিস্তৃত। ইহা তিনটি উপঅঞ্চলের সমষ্টি।

1. উপরের শুষ্ক উপঅঞ্চল—ইহা পাঞ্জাব হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর প্রদেশের অধিকাংশ ও পূর্ব এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের প্রধানত বালুকাময় দো-আঁশ মৃত্তিকা দেখা যায় এবং আবহাওয়া চরম। মৃত্তিকা উর্বর বলিয়া এই অঞ্চলে Wheat বা গম, Maize বা ভুট্টা, Sugarcane বা ইক্ষু প্রভৃতি ফসল প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। সাধারণ উদ্ভিদ নিম্নের উপঅঞ্চলের ন্যায় জন্মাইয়া থাকে।

2. নিম্নের আর্দ্র উপঅঞ্চল—এই উপঅঞ্চল বলিতে উত্তর প্রদেশের অবশিষ্টাংশ, বিহার, ওড়িশা এবং বঙ্গদেশকে বুঝায়। এই স্থানের বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়া মৃত্তিকা আর্দ্র ও উর্বর। সেইজন্য *Oryza sativa* বা ধান, *Corchorus capsularis* এবং *C. olitorius* বা পাট, *Saccharum officinarum* বা ইক্ষু, *Nicotiana tabacum* বা তামাক, *Triticum aestivum* বা গম, *Gossypium herbaceum* এবং *G. hirsutum* বা তুলা প্রভৃতির উত্তম চাষ হইয়া থাকে। সাধারণ বৃক্ষ এবং গুল্মের মধ্যে *Mangifera indica* বা আম. *Artocarpus integrefolia* বা কাঁঠাল, *Ficus benghalensis* বা বট, *F. religiosa* বা অশ্বত্থ, *Tectona grandis* বা সেগুন, *Tamarindus indicus* বা তেঁতুল, *Hibiscus rosasinesis* বা জবা প্রভৃতি প্রধান। বীরুৎ শ্রেণী উদ্ভিদের মধ্যে Croton (ক্রোটোন). *Brassica* বা সরিষা. *Oldenlandia* (ওলডেনল্যান্ডিয়া), *Lantana* (ল্যানটানা), *Lippia* (লিপ্পিয়া), প্রভৃতি দেখা যায়।

3. Sundarbans (সুন্দরবন)—গঙ্গা নদীর মোহনার নিকটে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব-দ্বীপ লইয়া সুন্দরবন উপঅঞ্চল গঠিত। Sir David Prain (স্যার ডেভিড প্রেন)-এর মতে এই উপঅঞ্চলে প্রায় তিন শত বিভিন্ন প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ এবং সতরটি বিভিন্ন প্রজাতির টেরিডোফাইট দেখিতে পাওয়া যায়।

সুন্দরবন উপঅঞ্চলের সাধারণ উদ্ভিদগুলিকে mangrove plants বা গরানজাতীয় উদ্ভিদ বলে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রজাতি সম্পূর্ণরূপে endemic বা স্থানীয়। গরানজাতীয় উদ্ভিদের একটি বিশেষত্ব হইল যে ইহাদের বহুসংখ্যক প্রজাতি মৃত্তিকাতল হইতে প্রচুর pneumatophores বা শ্বাসমূল নির্গত করে। সেইজন্য যে বনাঞ্চলে

এইপ্রকার উদ্ভিদ জন্মায় তাহাতে যাতায়াত করা সহজসাধ্য নহে। Vivipary বা জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম গরানজাতীয় উদ্ভিদের আরও একটি বিশেষত্ব। গরানজাতীয় উদ্ভিদের কয়েকটি প্রধান প্রজাতির সম্বন্ধে নিম্নে বর্ণিত হইল, যথা—*Rhizophora mucronata* বা বোড়া অথবা থামু, *Ceriops roxburghiana* বা গরান, *Sonneratia apetala* বা সুন্দরী, *Avicennia officinalis* বা বিনা, *Brugniera gymnorhiza* বা কাংক্রা, *Acanthus ilicifolius* বা হারগুজা প্রভৃতি। ইহা ব্যতীত *Nipa fruticans* বা গোলপাতা এবং *Phohnix paludosa* বা হিনটাল নামক দুই প্রকার *Palm* (পাম) দেখিতে পাওয়া যায়।

নদীর মোহনায় যে-সকল lianes বা কাষ্ঠল লতা জন্মায় তাহাদের মধ্যে *Mueuna gigantea* বা আলকুশী, *Sarcolobus globosus* বা বাদলীলতা, *Hibiscus tiliaceous* বা ভোলা, *Finlaysonia obovata* বা দুধীলতা, *Dalburgia torta* (ডালবারগীয়া টরটা) প্রভৃতি প্রধান।

নিম্ন উপঅঞ্চলের কয়েকটি উদ্ভিদও সুন্দরবন উপঅঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে *Aegle marmelas* বা বেল *Zizyphus mcuratiana* বা কুল, *Cassia fistula* বা সোন্দাল, *Vitex negundo* বা নিশিন্দা, Barringtonia acutangula (ব্যারিংটনিয়া আকুট্যানগুলা), Ixora parviflora বা রঙ্গন, *Kleinahovia hospita* বা খোলা *Calamus rotang* বা চাঁচীবেট প্রভৃতি প্রধান। ইহা ব্যতীত Oryza coarctata (ওরাইজা কোয়ার্কটাটা) এবং *Myriostachya wightiana* (মাইরীওস্টাকীয়া ওয়েটিআনা) নামক দুইটি দীর্ঘ আকৃতির ঘাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আশ্চর্য ব্যাপার যে সুন্দরবনের লবণাক্ত মৃত্তিকায় কোনও প্রকার বাঁশ জন্মাইতে দেখা যায় না।

কয়েক প্রকার পরাশ্রয়ী অর্কিডের প্রজাতি দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের মধ্যে *Cirrhopetalum* নামক প্রজাতিটি হইল স্থানীয়। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদগুলির মধ্যে সাধারণত *Cassytha* বা আকাশবেল, *Cuscuta* বা স্বর্ণলতা, *Loranthus* বা মান্দা এবং *Viscum* বা বান্দা প্রধান। জলজ উদ্ভিদগুলির মধ্যে *Utricularia* বা ঝাঁজি, *Pistia* বা টোপা পানা, *Hydrocharis* (হাইড্রোক্যারিস), *Eichhornia* বা কচুরি-পানা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। Families Lemnaceae (লেমনেসী) এবং Nymphyaceae (নির্মফিয়েসী) গোত্রীয় উদ্ভিদগুলি এই উপঅঞ্চলে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত।

প্রশ্নাবলী

১। ভারতীয় উদ্ভিদের ভৌগোলিক অঞ্চল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের উদ্ভিদ সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখ।

৩। গাঙ্গেয় সমতল ভূমি অঞ্চল বলিতে কি বুঝ? উহার বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্ভিদ প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। C. C. Calder ভারতবর্ষকে যে-সকল উদ্ভিদ-ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করিয়াছেন তাহাদের বিবরণ দাও।



উদ্ভিদ বাস্তু-সংস্থানবিদ্যা

১

বাস্তুসংস্থান
(Ecology)

পৃথিবীতে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভিদ জন্মায়। বরফাচ্ছাদিত পর্বত চূড়ায়, উষ্ণ প্রস্রবনে, নদী কিম্বা ঝরণার তীরবর্তী অঞ্চলে মালভূমির শুষ্ক বালুচরে এবং এমনকি ভগ্ন প্রাচীরের অতি সঙ্কীর্ণ ফাটলের মধ্যে ও বৃক্ষের বল্কলেও ইহাদের জন্মাইতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে বলা যায় যে বিশাল ভূখণ্ডে এমন কোন স্থান নাই যেখানে কোন না কোন উদ্ভিদ জীবনের অস্তিত্ব দেখা যায় না। অধিকন্তু স্থান হইতে স্থানান্তরে উদ্ভিদের প্রকৃতিগত পরিবর্তনও লক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপে বলা যায় যে পুষ্করিণীতে যে সকল উদ্ভিদ জন্মায় তাহারা নিকটস্থ শুষ্ক মৃত্তিকায় অবস্থিত উদ্ভিদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। পর্বতগাত্রে উৎপন্ন উদ্ভিদ সমতলের উদ্ভিদ হইতে বিভিন্ন। এইরূপে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উদ্ভিদের বণ্টন নীতি পরিবেশের (environment) প্রভেদের উপর নির্ভর করে। পরিবেশ বলিতে উদ্ভিদের বহির্ভাগে অবস্থিত আলোক, মৃত্তিকা, উষ্ণতা প্রভৃতি উপাদানগুলিকে বুঝায় যাহারা উদ্ভিদ জীবনকে প্রভাবিত করে। উদ্ভিদ-বিদ্যার যে শাখা পাঠ করিলে উদ্ভিদ ও পরিবেশের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা জানিতে পারা যায় তাহাকে **বাস্তুসংস্থান** (ecology) বলে। বাস্তু সংস্থান দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত ; যথা—**অটেকোলজি** (autecology), অর্থাৎ এই বিভাগে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা উদ্ভিদদিগের পুষ্টি, গঠন, বৃদ্ধি, জনন প্রভৃতির উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহা জানিতে পারা যায় এবং **সাইনেকোলজি** (synecology) বা **উদ্ভিদ সমাজবিজ্ঞান** (plant sociology) অর্থাৎ এই বিভাগে **উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের** (plant community) সহিত নিজেদের সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে পরিবেশের প্রকৃতির উপর উদ্ভিদের বিস্তার নির্ভর করে এবং তাহাদের গঠনও অনুরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন নির্দিষ্ট পরিবেশে যে সকল উদ্ভিদ জন্মায় তাহাদিগকে **ইকোটাইপ** (ecotypes) বলে। এইরূপ পরিবেশে উদ্ভিদ-গুলি নিজেদের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া লয়। কোন নির্দিষ্ট উদ্ভিদের এই প্রকার অভিযোজনকে (adaptation) **ইফারমণি** (epharmony) বলে। এই প্রকার পরিবেশে যে সকল উদ্ভিদ নিজেদের উপযোগী করিয়া তুলিতে অক্ষম তাহারা অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

বাস্তু সংস্থান পাঠের প্রয়োজনীয়তা (Scope of ecology)—কৃষিকার্যে এবং ফুল ও ফলের চাষে বাস্তু সংস্থান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, নগর পরিকল্পনা, বনশূন্য নূতন বনের পত্তন করা, মৃত্তিকাক্ষয় নিবারণ, মৃত্তিকা সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিতেও বাস্তু সংস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বনভূমি যথেষ্ট ধ্বংস করিলে স্বাভাবিক ঋতু পরিবর্তনের বিঘ্ন ঘটায় যাহার ফলে মূল্যবান শস্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধিকন্তু বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয় ভূমি ক্ষয় দ্বারা প্রচুর পরিমাণে উর্বর জমি বিনষ্ট হয়। ইহাতে আমাদের জাতীয় সম্পদের ক্ষতি সাধন হয়। সৌভাগ্যক্রমে ভারত সরকার প্রতিবৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থানে নূতন নূতন উদ্ভিদ বপন করিয়া বন মহোৎসব নামক উৎসব পালন করেন। ইহার লক্ষ্য হইল যে ঐ সকল নূতন উদ্ভিদ পরবর্তীকালে পরিণত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত উদ্ভিদগুলির স্থান অধিকার করিবে।

২

বাস্তু সংস্থানের কারণ
(Ecological Factors)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে উদ্ভিদের জীবন ধারনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। উপযুক্ত পরিবেশে উদ্ভিদের জৈবনিক ক্রিয়াগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রোটোপ্লাজমকে সতেজ ও সক্রিয় রাখিতে যেমন জলের প্রয়োজন হয়, অনুরূপভাবে খাদ্য প্রস্তুত করিতে আলোক ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও শ্বাস কার্যের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। পরিবেশের প্রতিটি অংশ যাহা উদ্ভিদের গঠন ও কার্যকে অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে তাহাকে **পরিবেশীয় কারণ** (environmental factors) অথবা **বাস্তু সংস্থানের কারণ** (ecological factors) বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বাস্তু সংস্থানের কারণগুলির পরিবর্তনের ফলে উদ্ভিদের প্রকৃতিরও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আবার সকল পরিবেশীয় কারণগুলি উদ্ভিদদিগের উপর সমভাবে প্রভাব বিস্তার করে না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বাতাসে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড এইরূপ স্বল্প পরিমাণে থাকে যে উদ্ভিদদিগের উপর উহাদের বাস্তু সংস্থানিক গুরুত্ব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না।

সমুদয় পরিবেশীয় কারণগুলি চারিটি ভাগে বিভক্ত :

A. **জলবায়ু সংক্রান্ত কারণ** (Climatic factors)—ইহার দ্বারা বায়বীয় পরিবেশ বুঝায়।

B. **মৃত্তিকা সংক্রান্ত কারণ** (Edaphic factors)—ইহারা কোন স্থানের মৃত্তিকার ভৌতিক ও রাসায়নিক গঠন নির্দেশ করে।

C. **জৈবিক কারণ** (Biotic factors)—ইহারা অন্যান্য উদ্ভিদ, প্রাণী ও এমনকি মানুষের কার্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

D. **সংস্থানিক কারণ** (Topographic factors)—ইহারা পৃথিবীর কোন স্থানের গঠন ও চরিত্র নির্দেশ করে।

A. জলবায়ু সংক্রান্ত কারণ (Climatic factors)

এই কারণগুলি বায়ুর মাধ্যমে উদ্ভিদদিগের উপর ক্রিয়া করে। প্রধান জলবায়ু সংক্রান্ত কারণগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল :

1. **উষ্ণতা** (Temperature)—বিপাকের সময় উষ্ণতা উদ্ভিদের ভৌতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। ইহা সালোকসংশ্লেষ, প্রস্বেদন, খাদ্য শোষণ, অংকুরোদ্গম প্রভৃতি জৈবনিক ক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত করে যাহার ফলে উদ্ভিদ দেহ গঠিত হয়। যে কোন উদ্ভিদ নির্দিষ্ট উষ্ণতার সীমার মধ্যে (range of temperature) বাঁচিয়া থাকে। উক্ত সীমার নিম্নে অথবা ঊর্ধ্বে ইহাদের জীবনহানী পর্যন্ত ঘটে। উক্ত উষ্ণতার সীমার যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় জৈবনিক ক্রিয়াগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। তাহাকে **পরিমিত উষ্ণতা** (optimum temperature) বলে। কিছু সংখ্যক উদ্ভিদ দেখা যায় যাহারা চূড়ান্ত উষ্ণতাতেও সুস্থ জীবনযাপন করে। সুমেরু অঞ্চলে

অবস্থিত কোন কোন শৈবাল 0° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রার নিম্নেও স্বাভাবিকভাবে জীবন ধারণ করে। এমনকি বরফ দ্বারা আচ্ছাদিত অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গেও কিছু সংখ্যক উদ্ভিদকে—27° সেঃ গ্রেঃ উষ্ণতাতেও বাঁচিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উষ্ণতারও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে ইহা 40° সেঃ গ্রেঃ ; কিন্তু উষ্ণ মরুভূমি অঞ্চলের কিছু উদ্ভিদ 70° সেঃ গ্রেঃ উষ্ণতাতেও জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। অতএব কোন নির্দিষ্ট স্থানে কি প্রকার উদ্ভিদ জীবিত থাকিবে অথবা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে তাহা নির্ণয় করিতে উষ্ণতাকে একটি প্রধান কারণরূপে গণ্য করা যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের উষ্ণতার তারতম্য অনুযায়ী উদ্ভিদদিগকে চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ

(*a*) **মেগাথার্ম** (megatherms)—এই প্রকার উদ্ভিদ অত্যুষ্ণ অঞ্চলে জন্মায় এবং ইহাদের জীবন ধারনের জন্য সারা বৎসর প্রখর ও স্থিতিশীল উষ্ণতার প্রয়োজন হয়।

(*b*) **মেসোথার্ম** (mesotherms)—ইহারা উষ্ণ প্রধান অঞ্চলের উদ্ভিদ কিন্তু বৎসরের কোন নির্দিষ্ট ঋতুতে ইহারা অপেক্ষাকৃত স্বল্প উষ্ণতাও সহ্য করিতে পারে।

(*c*) **মাইক্রোথার্ম** (microtherms)—এই প্রকার উদ্ভিদ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জন্মায় এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় ইহারা অপেক্ষাকৃত স্বল্প উষ্ণতা সহ্য করিতে পারে।

(*d*) **হেকিস্টোথার্ম** (hekistotherms)—ইহারা মেরু অঞ্চলের উদ্ভিদ এবং সারা বৎসর নিম্ন ও স্থিতিশীল তাপমাত্রা সহ্য করে।

2. **আলোক** (Light)—ইহা জলবায়ু সংক্রান্ত অতি প্রয়োজনীয় কারণ। আলোকের উপস্থিতিতে সবুজ বর্ণের উদ্ভিদের ক্লোরোফিল গঠিত হয় যাহা সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জৈব খাদ্য প্রস্তুত করিতে অত্যাবশ্যক। শুধু তাহাই নহে, প্রস্বেদন, এনজাইম ক্রিয়া, উদ্ভিদের বৃদ্ধির গতিপথ ও চলন, পাতার বিস্তার, পুষ্প উৎপাদন, পাতার আকৃতি আভ্যন্তরিক গঠন, উদ্ভিদের গঠন ও মৃত্তিকার উষ্ণতা প্রভৃতি জৈবনিক ও আকৃতিগত বৈশিষ্ঠ্যগুলি আলোক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। আলোকের তীব্রতা (intensity), প্রকৃতি (nature) ও স্থিতিকাল (duration) উদ্ভিদদিগের উপর বিভিন্নরূপে ক্রিয়া করে। সূর্য হইল সকল প্রকার আলোকের প্রধান উৎস যাহা উদ্ভিদদিগকে সৌরশক্তি প্রদান করে। সূর্য হইতে যে পরিমান আলোক এই পৃথিবীতে পৌঁছায় তাহা ঋতুভেদ, উচ্চতা এবং অক্ষাংশের (latitude) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার আর্দ্র, মেঘাচ্ছন্ন ও কুয়াসাবৃত আবহাওয়ায় আলোকের তীব্রতা বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। মরুভূমি ও উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে অবস্থিত উদ্ভিদগুলি তীব্র আলোকের সম্মুখীন হয় কিন্তু বনভূমি অঞ্চলের উদ্ভিদ স্বল্প আলোক প্রাপ্ত হয়। আলোক কর্তৃক উদ্ভিদ বহুলাংশে উপকৃত হইলেও অতিমাত্রায় তীব্র ও সরাসরি পতিত আলোক কোন কোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। আলোকের তীব্রতার তারতম্য অনুযায়ী দুই প্রকার উদ্ভিদ দেখা যায়। (a) **সূর্যালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ** (Sunplants) অথবা **হিলিওফাইলাস বা ফোটোফিলিক উদ্ভিদ** (heliophilous or photophilic

plants) এবং ছায়াযুক্ত স্থানের উদ্ভিদ (shade plants) অথবা হীলিওফোবিক বা ফোটোফোবিক উদ্ভিদ (heliophobous or photophobic plants)। এই দুই প্রকার উদ্ভিদের প্রধান পার্থক্যগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

সূর্যালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ (Sun Plants)	ছায়াযুক্ত স্থানের উদ্ভিদ (Shade Plants)
(a) আকৃতিগত পার্থক্য	
1. উদ্ভিদগুলি ঘন সন্নিবেশিত ; অপেক্ষাকৃত কাষ্ঠল ; পর্বমধ্যগুলি ; হ্রাসপ্রাপ্ত, ও ঘন রোম দ্বারা আচ্ছাদিত ; সাধারণত কণ্টকাবৃত।	1. উদ্ভিদগুলি সাধারণত পাতলা কিন্তু বৃহৎ হইলে স্ফীত; প্রায় রোমশূন্য, পর্বমধ্যগুলি দীর্ঘ ; কণ্টকিত নহে।
2. পাতাগুলি ক্ষুদ্র অথবা রেখাকার এবং স্থূল ; পত্রতল দীপ্তিমান যাহাতে অতিরিক্ত সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতে পারে।	2. পাতাগুলি বৃহৎ, প্রশস্ত এবং পাতলা ; পত্রতল সাধারণত উজ্জ্বল নহে।
3. পাতাগুলি সাধারণত ভাঁজযুক্ত অথবা কুঞ্চিত ও বক্রাকার।	3. পাতাগুলি সাধারণত চ্যাপ্টা এবং মসৃণ।
4. পাতাগুলি সূর্যকিরণের সহিত সূক্ষ্মকোণ উৎপন্ন করে।	4. পাতাগুলি সূর্যকিরণের সহিত সমকোণ উৎপন্ন করে এবং সাধারণত পত্রচনা (leaf mosaic) গঠন করে।
(b) আভ্যন্তরিক গঠনের পার্থক্য	
5. পাতার বহিস্ত্বক স্থূল, বহু স্তর যুক্ত হইতে পারে ; উপরিতল ক্লোরোফিল বিহীন ; ঘন কিউটিকল দেখিতে পাওয়া যায়।	5. পাতার বহিস্ত্বক পাতলা, একটি মাত্র স্তরযুক্ত ; কখন কখন ক্লোরোফিল যুক্ত হইতে পারে ; কিউটিকল পাতলা।
6. পত্ররন্ধ্র নিম্নতলে অবস্থিত এবং সাধারণত নিমজ্জিত (sunken)।	6. পত্ররন্ধ্র উভয়তলেই দেখা যাইতে পারে।
7. প্যালিসেড প্যারেনকাইমা ঘন-সন্নিবেশিত কিন্তু স্পঞ্জ প্যারেনকাইমা স্বল্প ও কোষমধ্যবর্তী স্থান ক্ষুদ্র।	7. প্যালিসেড প্যারেনকাইমা পাতলা বা কখনই দেখা যায় না ; স্পঞ্জ প্যারেনকাইমা অধিক পরিমাণে থাকে ও কোষ মধ্যবর্তী স্থান বড়।

আলোকের উপস্থিতিতে অক্সিন (auxin) গঠন বিঘ্নিত হয়। ইহার দ্বারা উদ্ভিদের আকার, আকৃতি, চলন ও বিভিন্ন অংশের গতিপথ নির্ধারিত হয়। সম্পূর্ণ অন্ধকারে

উদ্ভিদ জন্মাইলে, সর্বাধিক অঙ্কন গঠিত হয় যাহার ফলে ইহা অতিশয় দীর্ঘ হয়, কলাগুলি সুগঠিত ও বিন্যাসিত হয় না এবং কোন প্রকার অবলম্বন উৎপাদন করে না। অনুরূপ বনভূমি অঞ্চলের ঘন ছায়ার দ্বারা আবৃত উদ্ভিদগুলি দীর্ঘাকার হয়।

বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আলোকের প্রয়োজনীয়তাও বিভিন্ন। ট্যাক্সাস (Taxas) অ্যাবিস (Abis), পিসিয়া (Picea) উদ্ভিদ ছায়াযুক্ত স্থানেও সুষ্ঠুভাবে জীবন-যাপন করিতে পারে। ইহাদিগকে **ছায়া সহিষ্ণু উদ্ভিদ** (shade tolerant plants) বলে। আবার পাইন (Pinus), পপ্‌লার প্রভৃতি উদ্ভিদ ছায়া সহ্য করিতে পারে না। ইহাদের **ছায়া অসহিষ্ণু** উদ্ভিদ (shade intolerant plants) বলে। আলোক পাইবার উদ্দেশ্যে ইহারা দীর্ঘ হয় ও খাড়াভাবে উৎপন্ন কাণ্ডের অগ্রভাগে ঘনভাবে পাতা উৎপন্ন হইয়া মুকুটের ন্যায় আকার ধারণ করে।

3. **বৃষ্টিপাতের পরিমাণ** (Precipitation)—উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য জলের বিশেষ প্রয়োজন। এই জল উদ্ভিদ কর্তৃক সাধারণত মৃত্তিকা হইতে শোষিত হয়। ইহা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও গঠনের সহায়তা করে। জলের প্রধান উৎস হইল বৃষ্টিপাত, বরফ ও শিলাবৃষ্টি যাহা মৃত্তিকার ছিদ্রপথ দিয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। লাইকেন (lichens) কতিপয় পরাশ্রয়ী আর্কিড ও অন্যান্য অল্প কয়েকটি উদ্ভিদ সরাসরি বায়ুমণ্ডল হইতে জল গ্রহণ করে। কোন স্থানে যে সকল উদ্ভিদ জন্মায় তাহা প্রধানত ঐ স্থানের ঋতু অনুযায়ী বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। উষ্ণ প্রধান অঞ্চলের যে সকল স্থানে সারা বৎসর সমভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সেই সকল অঞ্চল চিরহরিৎ অরণ্যের (evergreen forests) সৃষ্টি করে। আবার যে সকল অঞ্চলে শীতকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বল্প হইয়া থাকে, ঐ সকল অঞ্চলে ক্ষুদ্র বৃক্ষ অথবা গুল্ম জন্মাইতে দেখা যায় এবং ইহাদের পাতাগুলি প্রশস্ত ও চর্মবৎ হইয়া থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বল্প হইলে ঐ সকল অঞ্চল তৃণভূমিতে পরিণত হয় এবং বৃষ্টিপাত অতিমাত্রায় স্বল্প হইলে মরুভূমির সৃষ্টি করে।

4. **বায়ুর আর্দ্রতা** (Atmospheric humidity)—বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কোন অঞ্চলে উদ্ভিদের বিস্তৃতিতে প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে কারণ ইহার দ্বারা উদ্ভিদের প্রস্বেদনের হার নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের সম্পৃক্ত ঘাটতি (saturation deficit) বলে। সম্পৃক্ত ঘাটতি বলিতে বায়ুতে অবস্থিত জলীয় বাষ্পকে সম্পৃক্ত করিতে অতিরিক্ত কি পরিমাণ জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন হইবে তাহা বুঝায়। বায়ুতে অবস্থিত জলীয় বাষ্পের শতকরা পরিমাণকে সাধারণত আপেক্ষিক আর্দ্রতায় (relative humidity) প্রকাশ করা হয়। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে আপেক্ষিক আর্দ্রতাও তদনুযায়ী হ্রাস অথবা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেহেতু আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রস্বেদনের হারকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই হেতু কোন নির্দিষ্ট স্থানে কিপ্রকার উদ্ভিদ জন্মাইবে তাহা ইহার উপর নির্ভর

করে। বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত অধিক আর্দ্রতায় ব্যাঙের ছাতা (mushrooms) রাস্ট (rust), স্মাট (smut) এবং অন্যান্য পরভোজী ছত্রাক সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি পায়।

5. বায়ুপ্রবাহ (wind)—বায়ুপ্রবাহ উদ্ভিদদিগের বিস্তারে সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে ক্রিয়া করে। প্রবল বায়ুপ্রবাহে উদ্ভিদ সমূলে উৎপাটিত হইতে পারে অথবা উহাদের শাখা প্রশাখা, কাণ্ড ও পাতা বিধ্বস্ত হয়। সেইজন্য যে সকল অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ অত্যধিক ঐ সকল অঞ্চলের উদ্ভিদগুলি শায়িত অথবা ভূনিম্নস্থ কাণ্ড গঠন করে। ঐ সকল অঞ্চলের বৃক্ষগুলি বায়ুপ্রবাহের দিকে বাঁকিয়া যায় অথবা ক্ষুদ্রাকৃতি (dwarfing) হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে বৃক্ষগুলির উপরিভাগের যে পার্শ্বটি প্রবল বায়ুপ্রবাহ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় সেই পার্শ্বের মুকুলগুলি বিনষ্ট হয় বলিয়া শাখা



১৮৯নং চিত্র—বায়ুপ্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত উদ্ভিদের গঠন প্রকৃতি

প্রশাখাগুলি কেবলমাত্র বিপরীত পার্শ্বে উৎপন্ন হয়। এইজন্য উদ্ভিদটিকে এক পার্শ্বীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় (১৮৯ নং চিত্র)। পরোক্ষভাবে বায়ুপ্রবাহ দ্বারা প্রস্বেদন হার অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় পরন্তু সমুদ্র হইতে আগত সিক্ত বায়ুপ্রবাহের দ্বারা প্রস্বেদন হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। মেরু অঞ্চলের উদ্ভিদ অতিশয় শীতল তুষার মিশ্রিত বায়ুপ্রবাহের সম্মুখীন হয় বলিয়া ঐ অঞ্চলে বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না; কেবলমাত্র ক্ষুদ্রাকৃতি বীরুৎ অথবা গুল্ম দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ুপ্রবাহের দ্বারা মরুভূমি অঞ্চলে বালিয়াড়ী গঠিত হয় এবং তথায় এক প্রকার বিশেষ প্রকৃতির উদ্ভিদ জন্মাইলে বালিকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে।

B. মৃত্তিকা সংক্রান্ত কারণ (Edaphic factors)

এই কারণগুলি মৃত্তিকার মাধ্যমে উদ্ভিদদিগের বিস্তারে অংশ গ্রহণ করে এবং প্রধানত উদ্ভিদ সম্প্রদায়গুলির (plant communities) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে।

মৃত্তিকা বলিতে ভূত্বকের উপরিভাগের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অবিন্যস্ত স্তর বুঝায় এবং ইহাতে উৎপন্ন উদ্ভিদদিগকে সোজাসুজি বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। মৃত্তিকা সংক্রান্ত কারণগুলি হইল মৃত্তিকা অথবা মৃত্তিকাস্থ জলে অবস্থিত খনিজ ও জৈব পদার্থের গঠন, মৃত্তিকার সহিত বায়ুর সম্বন্ধ মৃত্তিকাস্থ জীবাণুসমূহ, মৃত্তিকা রসের প্রকৃতি প্রভৃতি।

মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়া (Formation of soil)—কতকগুলি পরভোজী ও পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ ব্যতীত সকল উদ্ভিদই মূল দ্বারা মৃত্তিকা হইতে খনিজ ও জলীয় উপাদান সংগ্রহ করে। পর্বত বলিতে বহুবিধ খনিজ পদার্থের সমাবেশ বুঝায়। কঠিন পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া বিভিন্ন আকারের সূক্ষ্ম খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। পর্বত বিশ্লেষণের কারণগুলি হইল হিমবাহ চলনের দ্বারা উদ্ভূত বিভিন্ন শক্তি, দ্রুত জলস্রোত প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ, উষ্ণতার পরিবর্তন প্রভৃতি। জীবিত পদার্থগুলির মধ্যে লাইকেন ও মস প্রভৃতিও পর্বতকে বিশ্লিষ্ট করিয়া মৃত্তিকা গঠনে সহায়তা করে। দ্রুত জলস্রোত প্রস্তরকে ভাঙ্গিয়া বহু খণ্ডে পরিণত করে যাহারা ক্রমান্বয়ে ঘর্ষণের দ্বারা সূক্ষ্ম চূর্ণের আকার ধারণ করে এবং ক্রমে বহু দূরাবধি পরিবাহিত হয়। অবশেষে ঐ সকল সূক্ষ্ম পদার্থ জলের হাইড্রলিক ক্রিয়া (hydraulic action) এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের প্রভাবে বিশ্লিষ্ট হইয়া দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হয়। ইহা জৈব পদার্থের সহিত বিক্রিয়ার দ্বারা মৃত্তিকা গঠন করে।

হিউমাস গঠন প্রক্রিয়া (Formation of humus)—উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ নানাবিধ জীবাণুর সহায়তায় ক্রমে হিউমাসে পরিণত হয় যাহা প্রস্তরখণ্ডের সহিত মিশ্রিত হইয়া মৃত্তিকাকে উর্বর করে। মৃত্তিকার উপরিতল অধিকতর কার্যকরী এবং ইহার হিউমাস গঠন প্রক্রিয়াও অধিক। কিন্তু ক্রম নিম্নস্তরগুলিতে এইরূপ ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। মৃত্তিকা তলের পাশ্বচিত্র হইতে দেখা যায় যে ইহা তিনটি স্তরের সমষ্টি ; (a) উপরিস্তর অর্থাৎ হরাইজন-এ (horizon-A) ; (b) মধ্যস্তর বা অন্তর্মৃত্তিকা অর্থাৎ হরাইজন-বি (horizon-B) ; এবং নিম্নস্তর বা পর্বতস্তর অর্থাৎ হরাইজন-সি (horizon-C)। বিভিন্ন স্থানে মৃত্তিকার স্তরগুলির পরিমাণও বিভিন্ন এবং ইহা আবহাওয়ার অবস্থা এবং উপরিতলে অবস্থিত উদ্ভিদগুলির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে তৃণভূমি অপেক্ষা বনভূমি অঞ্চলে উপরিতলের (হরাইজন এ) পরিমাণ অধিক।

মৃত্তিকার গঠন (Composition of soil)—মৃত্তিকা প্রধানত চারিটি উপাদানের সমষ্টি ; (a) খনিজ পদার্থ (mineral matter)—খনিজ পদার্থ বলিতে বিভিন্ন আকারের ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিশ্লিষ্ট পর্বতখণ্ড বুঝায়। ইহা মৃত্তিকার আয়তনের শতকরা প্রায় 40 ভাগ (40%)। (b) জৈব পদার্থ (organic matter)—মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ বিভিন্ন প্রকার জীবাণুর দ্বারা বিশ্লিষ্ট হইয়া জৈব পদার্থে পরিণত হয়। ইহা মৃত্তিকার আয়তনের শতকরা প্রায় 10 ভাগ (10%)। (c) মৃত্তিকাস্থ জল (soil water)—ইহা মৃত্তিকার আয়তনের শতকরা প্রায় 25 ভাগ (25%) এবং (d) মৃত্তিকাস্থ বায়ু (soil air)—ইহা মৃত্তিকার আয়তনের শতকরা প্রায় 25 ভাগ (25%)।

মৃত্তিকা সংক্রান্ত কারণগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

1. **মৃত্তিকার প্রকৃতি** (Texture of soil)—মৃত্তিকার ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্ম ও জল ধারণ করিবার ক্ষমতা অনুযায়ী মৃত্তিকাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে।

*(a) **বালুকাময় মৃত্তিকা** (Sandy soil)—এই প্রকার মৃত্তিকা বালু, মাইকা* প্রভৃতির শিথিল কণিকার সমষ্টি ; সুতরাং ইহা সচ্ছিদ্র হইয়া থাকে। ইহার জলধারণ ক্ষমতা অতিশয় স্বল্প বলিয়া ইহা শীঘ্রই নত হইয়া যায়। ইহাতে পলি ও কর্দম কণিকার পরিমাণ 20 শতাংশ অপেক্ষা কম। এই প্রকার মৃত্তিকায় প্রধানত জাঙ্গল উদ্ভিদ (xerophytes) জন্মায়। আলু, পোঁয়াজ, শশা, তরমুজ প্রভৃতি ফসলী উদ্ভিদের পক্ষেও ইহা উপযোগী।

(b) **কর্দম বা এঁটেল মৃত্তিকা** (Clayay soil)—এই প্রকার মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত ভারী ও ইহা অধিকমাত্রায় জল ধারণ করিতে পারে। কিন্তু ইহার বাতান্বয়ন প্রণালী (aeration) উপযুক্ত নহে। ইহা প্রধানত কর্দম কণার সমষ্টি যাহার ফলে ইহা যথেষ্ট জল ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। ইহাতে অত্যধিক খনিজ পদার্থ থাকে বলিয়া ইহা অপেক্ষাকৃত ভারী। এই প্রকার মৃত্তিকার 30 শতাংশের অধিক কর্দম কণিকা থাকে বলিয়া ধান ও অন্যান্য শস্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদের পক্ষে উপযোগী। ইহাতে সকল প্রকার সাধারণ উদ্ভিদ (mesophytes) সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

(c) **দো-আঁশ মৃত্তিকা** (Loamy soil)—এই প্রকার মৃত্তিকায় কর্দম ও বালুকা কণার মিশ্রণ থাকে। ইহা সাধারণ উদ্ভিদের চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই প্রকার মৃত্তিকা অতিশয় উর্বর এবং ধান ও আখ গাছ ইহাতে অতি সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহা আলুর চাষের পক্ষেও উপযুক্ত। ইহা যথেষ্ট পরিমাণ জল ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। ইহা 47 শতাংশ বালুকা ও 23 শতাংশ কর্দম ও অবশিষ্টাংশ পলির সমষ্টি।

(d) **পলি মৃত্তিকা** (Silty soil)—ইহা পরিবাহিত মৃত্তিকা। ইহাতে প্রায় 50—60 শতাংশ অতি সূক্ষ্ম বালি 15—20 শতাংশ অপেক্ষাকৃত মোটা বালি এবং 20—30 শতাংশ কর্দম থাকে। সমগ্র পশ্চিম বাংলা, বাংলা দেশ ও উত্তর ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অতিশয় উর্বর এবং প্রায় সর্বপ্রকার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(e) **কঙ্কর মৃত্তিকা** (Gravelly soil)—এই প্রকার মৃত্তিকা মোটা বালি ও কাঁকরের সমষ্টি। ইহার জলধারণ করিবার ক্ষমতা উপযুক্ত নহে বলিয়া ইহাতে জাঙ্গল উদ্ভিদ (xerophytes) জন্মাইতে দেখা যায়।

(f)* **লবণাক্ত মৃত্তিকা** (Saline soil) ঃ নদীর মোহনায় এবং সমুদ্রতটে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে জল থাকিলেও ইহাতে অধিক পরিমাণে লবণ দ্রবীভূত থাকে বলিয়া জলশোষণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এইজন্য এই প্রকার মৃত্তিকাকে **ঊষর মৃত্তিকা** (Physiologically dry soil) বলে। ইহা

চাষের পক্ষে অনুপযোগী কিন্তু ইহাতে গরান জাতীয় উদ্ভিদ (mangrove plants) জন্মাইতে দেখা যায়।

(g) **চূণযুক্ত মৃত্তিকা** (Calcareous soil)—এই প্রকার মৃত্তিকায় অধিক পরিমাণে চূণ (প্রায় 50 শতাংশ) থাকে। এই কারণে ইহার জল-ধারণ করিবার ক্ষমতাও অধিক।

(h) **প্রস্তরময় মৃত্তিকা** (Rocky soil)—এই প্রকার মৃত্তিকা বহু প্রকার প্রস্তর কণার সমষ্টি এবং ইহা জল, বায়ু বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতির দ্বারা বিশ্লিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয়। প্রস্তর কণাগুলি সাধারণত ফেলস্পার অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকা প্রভৃতির দ্বারা গঠিত বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সমষ্টি। মৃত্তিকা অতিশয় অথবা সর্বদাই ভিজা থাকিতে পারে। শুষ্ক মৃত্তিকায় জাঙ্গল উদ্ভিদ জন্মায় কিন্তু ভিজা মৃত্তিকা সাধারণ উদ্ভিদের পক্ষে উপযোগী।

(i) **মরুভূমি অন্তর্গত মৃত্তিকা** (Desert soil)—এই প্রকার মৃত্তিকা বালুকা এবং স্বল্প পরিমাণ জৈব পদার্থ দ্বারা গঠিত। মৃত্তিকা অতিমাত্রায় ক্ষারীয় বলিয়া হইা চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত। বর্তমানে ইহাকে উর্বর মৃত্তিকায় পরিণত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

(j) **হিউমাস মৃত্তিকা** (Humus soil)—উদ্ভিদ এবং প্রাণীদেহের বিভিন্ন অংশ ও প্রাণীদিগের মলমূত্র প্রভৃতির পচনক্রিয়ার ফলে যে সকল জৈব পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহারা বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই প্রকার মৃত্তিকা গঠন করে। পচনক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে তাহাকে **সাধারণ হিউমাস** (Ordinary humus) বা **মৃদু হিউমাস** (mild humus) বলে, যাহা বৈজ্ঞানিক প্রয়োগে **মাল** (mull) নামে খ্যাত। ইহাতেই সাধারণত বালুকা, কর্দম, ছত্রাকের অনুসূত্র, কেঁচো, নাইট্রোজেন আত্তীকরণকারী ব্যাকটিরিয়া (nitrifying bactria) প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ক্ষারীয় অথবা উদাসীন প্রকৃতির (neutral) হইয়া থাকে এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য বিশেষ উপযোগী। উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, রাইজোম, পাতা, ছত্রাকের অনুসূত্র প্রভৃতির আংশিক পচনক্রিয়ার ফলে **অরূপান্তরিত হিউমাস** (rare humus) উৎপন্ন হয় যাহাকে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ **মর** (mor) বলে। ইহাতে কেঁচো অথবা নাইট্রোজেন আত্তীকরণকারী ব্যাকটিরিয়া দেখা যায় না। এবং ইহা অম্ল প্রকৃতির হইয়া থাকে। এই প্রকার মৃত্তিকায় মৃতজীবী ছত্রাক জন্মাইতে দেখা যায়। যে সকল উদ্ভিদ এই প্রকার মৃত্তিকায় জন্মায় তাহাদের দেহে সচরাচর মাইকোরাইজা গঠিত হইতে দেখা যায়। এই প্রকার মৃত্তিকা গঠনে জল বিশেষ প্রয়োজন।

আর এক প্রকার হিউমাস আছে যাহাকে **পিট হিউমাস** (peat humus) বলে। স্বল্প বায়ু প্রবাহের দ্বারা এবং জীবাণুগুলির ক্রিয়া অতিমাত্রায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে জৈব পদার্থগুলির অসম্পূর্ণ পচনক্রিয়া সংঘটিত হয়, যাহার ফলে এই প্রকার মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। ইহাতে কার্বনের পরিমাণ অত্যধিক এবং প্রধানত অম্ল প্রকৃতির। অন্যান্য

হিউমাস অপেক্ষা ইহার জলধারণ করিবার ক্ষমতা অত্যধিক। কিন্তু সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে চূর্ণের ন্যায় আকার ধারণ করে।

(k) **লোহিত মৃত্তিকা (Red soil)**—এই প্রকার মৃত্তিকা লোহিত বর্ণের দেখিতে হয়। মৃত্তিকায় অত্যধিক পরিমাণ লৌহ থাকে বলিয়া ইহা লোহিত বর্ণ ধারণ করে। ইহাতে চুণের পরিমাণ অতিশয় স্বল্প থাকে। নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পোটাসিয়াম ও জৈব পদার্থগুলিও অতি স্বল্প পরিমাণে থাকে। ইহা চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

(l) **কৃষ্ণ মৃত্তিকা (Black soil)** প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকা দেখা যায়। ভিজা হইলে ইহা আঠাল হয় কিন্তু শুষ্ক হইলে মৃত্তিকায় ফাটলের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার মৃত্তিকা অতিশয় উর্বর এবং ইহাতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও চুণ থাকে কিন্তু নাইট্রোজেন, ফসফোরাস ও জৈব পদার্থ অতিশয় স্বল্প পরিমাণে থাকে। ইহা তুলা চাষের অতিশয় উপযোগী।

2. **মৃত্তিকারসের বিক্রিয়া (Soil reaction)**—মৃত্তিকা রস আম্লিক ক্ষারীয় অথবা উদাসীন (neutral) প্রকৃতির হইতে পারে এবং ইহা মৃত্তিকা রসের হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব (hydrogen ion concentration) অর্থাৎ পি এইচ (pH) দ্বারা নির্ণীত হয়। মূল দ্বারা মৃত্তিকা রস শোষণ এবং শোষিত পদার্থের প্রকৃতি মৃত্তিকা-রসের আম্লিক ও ক্ষারীয় প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। তিসি (Flax), কয়েক প্রকার ঘাস প্রভৃতি আম্লিক মৃত্তিকায় জন্মাইলেও রডোডেনড্রন (Rhododendron) ভ্যাক্সিনিয়াম (Vaccinium) প্রভৃতি উদ্ভিদের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য কেবলমাত্র আম্লিক মৃত্তিকারই প্রয়োজন হয়। পরন্তু অধিকাংশ লেগুমিনসী গোত্রীয় উদ্ভিদ (leguminous plants) আম্লিক মৃত্তিকা কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারে না। আবার তামাক, পেঁয়াজ প্রভৃতি উদ্ভিদ আম্লিক মৃত্তিকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আলু (potato), বরবটি (cowpea) প্রভৃতি উদ্ভিদ মৃত্তিকায় অধিকমাত্রায় অম্লত্ব সহ্য করিতে পারে। আম্লিক মৃত্তিকায় ক্যালসিয়াম যুক্ত লবণের পরিমাণ স্বল্প থাকে বলিয়া এইরূপ মৃত্তিকায় যে সকল উদ্ভিদ জন্মায় তাহাদিগকে **ক্যালসিফোরাস উদ্ভিদ** (Calciphorous plants) বলে। পরন্তু মৃত্তিকায় পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি লবণের পরিমাণ অধিক হইলে এইরূপ মৃত্তিকাকে ক্ষারীয় মৃত্তিকা (alkaline soil) বলে। কয়েক প্রকার অর্কিড, সুয়েদা (Suaeda) প্রভৃতি উদ্ভিদ ক্যালসিয়াম-যুক্ত ক্ষারীয় মৃত্তিকায় সুষ্ঠভাবে বৃদ্ধি পায়। ঐ সকল উদ্ভিদকে ক্যালসিফাইলাস উদ্ভিদ (Calciphilous plants) বলে।

2. **মৃত্তিকাস্থ জলের পরিমাণ** (Available Soil water)—মূল দ্বারা শোষণের জন্য মৃত্তিকায় উদ্ভিদের উপযোগী জল থাকা প্রয়োজন। সাধারণত মৃত্তিকায় আয়তনে প্রায় 25% জল থাকে। প্রধানত বৃষ্টির জলই হইল মৃত্তিকাস্থ জলের উৎস। মৃত্তিকার ছিদ্রের মধ্য দিয়া বৃষ্টির জল অভিকর্ষ শক্তির সাহায্যে মৃত্তিকা স্তরের নিম্নে প্রবেশ করে

বলিয়া ইহাকে **অভিকর্ষীয় জল** (gravitational water) বলে। ইহার মধ্যে কিছু পরিমাণ জল মৃত্তিকা কণিকাগুলি কৈশিকত্বের (capillarity) সাহায্যে আবদ্ধ রাখে বলিয়া ইহাকে **কৈশিক জল** (capillary water) বলে। এই জল উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত হয়। ইহা ব্যতীত মৃত্তিকা অতিমাত্রায় শুষ্ক হইলেও মৃত্তিকা কণিকাগুলির চতুষ্পার্শ্বে পাতলা জলের স্তর দ্বারা আবৃত থাকে যাহাকে **জলগ্রাহী জল** (hygroscopic water) বলে। ইহাও উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত হয়। শেষোক্ত দুই প্রকার জলই হইল মৃত্তিকার জলধারণ করিবার ক্ষমতা। মৃত্তিকাস্থ জল কতকগুলি কারণের উপর নির্ভর করে: (*a*) বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, (*b*) মৃত্তিকার অভ্যন্তরে জলের অনুস্রাবণ (percolation), (*c*) বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, (*d*) মৃত্তিকা কণিকার কৈশিকত্ব (capillarity) প্রভৃতি।

মৃত্তিকায় অবস্থিত সম্পূর্ণ পরিমাণ জলকে হোলার্ড (holard) বলে ; ইহার মধ্যে যে পরিমাণ জল উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত হয় তাহাকে ক্রেসার্ড (chresard) বলে এবং যাহা অশোষিত থাকিয়া যায় তাহাকে ইকার্ড (echard) বলে। জলের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী উদ্ভিদদিগকে জলজ (hydrophytes), [illegible] (mesophytes), জাঙ্গল (xerophytes), লবণাম্বুজ (halophytes) প্রভৃতি বাস্তু সংস্থানিক শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে।

4. **মৃত্তিকাস্থ বায়ু** (Soil air)—মৃত্তিকায় বায়ু থাকা বিশেষ প্রয়োজন কারণ ভূনিমজ্জ উদ্ভিদের অংশের শ্বাসকার্য ও বৃদ্ধি ইহার উপর নির্ভর করে। মৃত্তিকায় অধিক মাত্রায় জল থাকিলে, ইহাতে বায়ুর পরিমাণও অনুরূপভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। জলপূর্ণ মৃত্তিকায় যে সকল উদ্ভিদ জন্মায় তাহার ক্ষুদ্রাকার দেখিতে হয় এবং শ্বাসকার্যের জন্য ইহারা বৃহৎ বাতাবকাশ (air cavities) সৃষ্টি করে। চাষ করিবার সময় মৃত্তিকার যথাযথ বাতানয়নের জন্য উহাকে উত্তমরূপে কর্ষণ করা প্রয়োজন।

5. **মৃত্তিকার উষ্ণতা** (Soil temperature)—মৃত্তিকার উষ্ণতা উদ্ভিদের বিস্তারে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। ইহা প্রধানত বায়ুর উষ্ণতা, মৃত্তিকার ভৌতিক ও রাসায়নিক গুণাবলী এবং প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম মৃত্তিকার আচ্ছাদনের উপর নির্ভর করে। মৃত্তিকায় প্রয়োজনীয় জল থাকিলেও ইহার উষ্ণতা স্বল্প হইলে জলশোষণ হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ইহার ফলে প্রস্বেদনও বিঘ্নিত হয়। ইহাতে চিরহরিৎ, উদ্ভিদের প্রচুর ক্ষতিসাধন হয়। মূলের বৃদ্ধি, জলশোষণ, শ্বাসকার্য প্রভৃতি মৃত্তিকার উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল।

মৃত্তিকা ক্ষয় (Soil erosion)

মৃত্তিকাতে যেমন নানাবিধ খনিজ লবণ ও জল সঞ্চিত থাকে, আমাদের নানাবিধ ফসলী উদ্ভিদ এই মৃত্তিকাতেই উৎপন্ন হয়। শুধু তাহাই নহে এই মৃত্তিকাতেই গৃহপালিত ও বন্য জন্তুগুলি বিচরণ করে। সেই কারণে এই মৃত্তিকাই আমাদের জাতীয় সম্পদ বলিয়া গণ্য করা হয়। যে সকল উদ্ভিদ আমাদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করে,

যে তন্তু হইতে আমাদের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করা হয় এবং যে সকল উপাদান হইতে আমাদের বাসস্থান নির্মিত হয় উহারা সকলেই এই মৃত্তিকাতেই উৎপন্ন হয়। আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সমুদয় সামগ্রী এই মৃত্তিকাই সরবরাহ করে। মৃত্তিকা উদ্ভিদের পুষ্টি-সাধন করে এবং মানুষ আবার এই সকল উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। এইজন্য মৃত্তিকার উর্বরতা ও জল সংরক্ষণ ক্ষমতা যাহাতে উপযুক্তরূপে বৃদ্ধি পায় তাহা লক্ষ্য রাখা আমাদের প্রধান কর্তব্য।

পৃথিবীর উপরিতলকে মৃত্তিকা বলে। বৃষ্টিপাতের সময় বৃষ্টি বিন্দুগুলি উন্মুক্ত পার্বত্য মৃত্তিকায় আঘাত করে। ইহার ফলে মৃত্তিকা কণিকাগুলি ঘন বিন্যস্ত হইয়া জল শোষণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এই সময় অতি স্বল্প পরিমাণ জল শোষিত হয় এবং ভাসমান মৃত্তিকা কণিকাগুলি বিশোধিত হইয়া পৃথক হয়। ইহারা মৃত্তিকা ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করিয়া দেয় যাহার ফলে স্বল্প পরিমাণ জলই মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অতিরিক্ত জল মৃত্তিকার উপরিভাগ দিয়া প্রবাহিত হয় এবং ইহার সহিত খনিজ লবণ, হিউমাস প্রভৃতি বহন করিয়া লইয়া যায়। মৃত্তিকার উপরিভাগের মৃত্তিকা কণিকার অপসারণকেই মৃত্তিকা ক্ষয় (Soil erosion) বলে। জল, বরফ ও বায়ুপ্রবাহ হইল মৃত্তিকা ক্ষয়ের প্রধান কারণ।

জল ও বরফ দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয় (Soil erosion by water and ice) · জল দ্বারা উপরিতলের মৃত্তিকা ধীর গতিতে অবিরত অপসারিত হইলে ইহাকে মৃত্তিকাপাত ক্ষয় (Sheet erosion) বলে। পর্বত গাত্রের ঢাল অধিক হইলে অথবা বহুক্ষণ ধরিয়া প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হইলে মৃত্তিকা ক্ষয়ও বৃদ্ধি পায়। অতিশয় দ্রুত প্রবাহিত জল গভীরতর মৃত্তিকা কণিকাগুলিকে অপসারণ করে এবং জলপথ (rill) অথবা ক্ষুদ্র নদীর সৃষ্টি করে। পর্বতগাত্রে নিম্নদিকে অবস্থিত এইরূপ কতকগুলি জলপথ মিলিত হইয়া প্রশস্ত গিরিখাত (gullyings) উৎপন্ন করে। এই মিলিত জলধারা দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইবার সময় গিরিখাতের তীরবর্তী মৃত্তিকাও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই প্রকার মৃত্তিকা ক্ষয়কে **গিরিখাত ক্ষয়** (gullying) বলে। আবার কতকগুলি গিরিখাত পরস্পর মিলিত হইয়া ঝরণার সৃষ্টি করে যাহা অবশেষে নদীর সহিত মিলিত হয়। বর্ষাকালে দ্রুত প্রবাহিত নদীর জল নদী তীরবর্তী মৃত্তিকা বহন করিয়া লইয়া যায় এবং এইরূপে তীরবর্তী মৃত্তিকাও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কখন কখন পর্বত চূড়ায় অবস্থিত বিশাল তুষার স্তূপ হিমগিরিরূপে (avalanches) নিম্নে বাহিত হয়। শীতকালে প্রচণ্ড তুষার পাতের পর গ্রীষ্মকালে উহা বিগলিত হয় এবং ইহার দ্রুত প্রবাহিত জলধারার দ্বারা নিম্নের মৃত্তিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে জলকে নিয়ন্ত্রণে রাখিলে ইহা উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত হইলে ইহা বন্যা ও মৃত্তিকা ক্ষয় দ্বারা আমাদের প্রভুত ক্ষতিসাধন করে।

বায়ুপ্রবাহে মৃত্তিকা ক্ষয় (Soil erosion by wind)—যে সকল অঞ্চলে বায়ু প্রবাহের দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয় হয় ঐ সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও অত্যল্প। গ্রীষ্মকালে মৃত্তিকার উপরিতল শুষ্ক চূর্ণে পরিণত হয়। প্রবল বায়ুপ্রবাহ অথবা ঝড়

হইলে ঐ সকল মৃত্তিকা চূর্ণ অথবা বালুকা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়। এই বালুকা কণাগুলি রাস্তা, গৃহ, গহ্বর, শস্যের খামার প্রভৃতি আবৃত্ত করে যাহার ফলে প্রভুত ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হয়। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল অথবা মরুভূমিতে এই প্রকার মৃত্তিকা ক্ষয় দেখিতে পাওয়া যায়। মরুভূমি অঞ্চলে যে বালিয়াড়ি দেখা যায় তাহা প্রবল বায়ুপ্রবাহে এক স্থান হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। অতি অল্পসংখ্যক উদ্ভিদ এই প্রকার অপ্রতিষ্ঠিত মৃত্তিকায় জন্মায়। প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহে ইহারা সমূলে উৎপাটিত হয় অথবা বালু গর্ভে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়। যে সকল স্থানে চাষ-আবাদ হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে বালুকা দ্বারা আবৃত হয় ও ক্রমে চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। যে দিকে বায়ুপ্রবাহ হয় মরুভূমিও সেইদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে।

মৃত্তিকা সংরক্ষণ (Soil conservation)

ইহা অবিদিত নহে যে উর্বর মৃত্তিকায় ফসলী উদ্ভিদ পুষ্টিসাধন করে। আমাদের বন সম্পদ ও গবাদি পশুর চারণস্থল হইল এই মৃত্তিকাই। ইহাদের উন্নতি বিধান করিতে হইলে মৃত্তিকা যাহাতে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মৃত্তিকা ক্ষয় হইতে মৃত্তিকাকে রক্ষা করিবার প্রক্রিয়াকে **মৃত্তিকা সংরক্ষণ** (Soil conservation) বলে। সংরক্ষণ বলিতে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে ধ্বংস, অপব্যবহার, ক্ষয়, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি হইতে রক্ষা করা বুঝায়। জল ধারণ (প্রধানত ঢালুস্থানে) ও ইহার প্রকৃত ব্যবহার, মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি ও উপযুক্ত ফসল উৎপাদনই হইল মৃত্তিকা সংরক্ষণ। চাষবাসের উন্নতি সাধনই হইল প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকা সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য।

কোন একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকা ক্ষয় নিবারণ সম্ভবপর নহে। কতকগুলি প্রক্রিয়ার সমষ্টিগত প্রয়োগে নির্ভরযোগ্য ফল পাওয়া যায়। মৃত্তিকার প্রকৃতি ও আবহাওয়ার অবস্থার উপর মৃত্তিকা সংরক্ষণের যথাযথ প্রয়োগ নির্ভর করে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রয়োগের বিবরণ বর্ণিত হইল ঃ

3. **স্ব-নির্ভরতা** (Self fertility)—মৃত্তিকা ক্ষয় হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে হইলে, মৃত্তিকা যাহাতে উর্বর থাকে ও শস্য উৎপাদনও অব্যাহত থাকে তাহা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মৃত্তিকার উর্বরতা উহার হিউমাসের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। মৃত্তিকা জলকে ধারণ করিয়া রাখে। ফসল অপসারণের পর উহার মূল, কাণ্ড প্রভৃতি অধিকাংশ অংশই মৃত্তিকাতেই পড়িয়া থাকে। ক্রমে ইহারা বিশ্লিষ্ট হয় ও জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া হিউমাস গঠন করে। উক্ত বিক্রিয়া চলিতে থাকিলে হিউমাস ক্রমে পুষ্টিকর খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। এইরূপে মৃত্তিকা পুনরায় তাহার উর্বরাশক্তি ফিরিয়া পায়। মৃত্তিকায় অবস্থিত জৈব পদার্থগুলির প্রয়োজনীয়তা হইল ঃ (1) ইহা জল শোষণের দ্বারা জলের প্রবাহের গতি হ্রাস করে ও (2) মৃত্তিকার বাতান্বয়ন (airation) বৃদ্ধি করে। অধিকন্তু মৃত্তিকার উর্বরতা বজায় রাখিতে হইলে ইহাতে পশুচারণ নিবৃত্তি ও উপযুক্ত সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

2. **শস্য পর্যায়** (Crop rotation)—একই জমিতে বিভিন্ন প্রকার ফসলী উদ্ভিদ পর্যায়ক্রমে চাষ করিলে ইহাকে শস্য পর্যায় (crop rotation) বলে। ইহাতে একদিকে যেমন এক প্রকার ফসল মৃত্তিকার পুষ্টিকর পদার্থগুলি গ্রহণ করিয়া উহার উর্বরা শক্তি হ্রাস করে অপরদিকে লেগুমিনসী (fam. leguminosae) গোত্রীয় উদ্ভিদ উক্ত মৃত্তিকায় পুনরায় বপন করিলে উহার উর্বরাশক্তিও ফিরিয়া পায়। সাধারণত লেগুমিনসী গোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে একপ্রকার অর্বুদ (nodules) উৎপন্ন হয় যাহা রাইজোবিয়াম (rhizobium) নামক একপ্রকার ব্যাকটিরিয়ার আবাসস্থল। ইহারা বায়বীয় নাইট্রোজেন স্থিতীকরণ দ্বারা (nitrogen fixation) নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ উৎপাদন করে। পরবর্তী পর্যায়ে ফসলী উদ্ভিদ উক্ত জমিতে চাষ করিলে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। অতএব বিভিন্ন ফসলী উদ্ভিদ ও লেগুমিনসী গোত্রীয় উদ্ভিদ একইজমিতে পর্যায়ক্রমে চাষ করিলে মৃত্তিকা উর্বরতার সমতা রক্ষা করিয়া চলে। কখন কখন দেখা গিয়াছে যে অন্যান্য ফসলী উদ্ভিদের সহিত পর্যায়ক্রমে ঘাস উৎপাদন করিলেও মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি রক্ষিত হয়।

3. **কর্ষণ করা কিন্তু অনাবাদী রাখা** (Fallowing)—এই প্রক্রিয়া বর্তমানে অনুসরণ করা হয় না। ইহাতে জমিকে কর্ষণ করা কিন্তু এক বৎসর ইহাতে আবাদ না করিয়া ফেলিয়া রাখা হয়। অনাবাদী রাখাকালে মৃত্তিকা প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থগুলি সঞ্চয় করে। এই প্রক্রিয়া অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ কিন্তু বর্তমানে ইহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। অধিকন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমিকে এক বৎসর অনাবাদী রাখাও যুক্তিসংগত নহে।

4. **নদী উপত্যকা পরিকল্পনা** (River valley project)—ভূমিক্ষয় নিবারণে নদী উপত্যকা পরিকল্পনার দ্বারা যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়াছে। বাঁধগুলি যে কেবলমাত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে তাহাই নহে, খরার সময় ব্যবহারের জন্য ইহারা অতিরিক্ত জল সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই প্রক্রিয়ায় নদী উপত্যকা পরিকল্পনা উৎপাদনের অনুপযোগী জমিকে প্রাচুর্যপূর্ণ শস্যক্ষেত্রে পরিণত করে। ভারতে কয়েকটি নদী উপত্যকা পরিকল্পনা রহিয়াছে যাহাদের মধ্যে কোশী, দামোদর, চম্বল, ভাক্রা, হিরাকুদ প্রভৃতি প্রধান। এই পরিকল্পনা ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও ইহা আমাদের অমূল্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয়।

5. **বনভূমি পুনঃপ্রবর্তন** (Reforestation)—মৃত্তিকা অধিকতর ঢালু ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এবং ইহাতে বনভূমি প্রবর্তন করিলে সুফল পাওয়া যায়। বৃক্ষরোপণের পূর্বে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন কারণ বৃক্ষগুলি উপযুক্ত রূপে পরিণত হইতে বহু বৎসর লাগিয়া যায়। একবার সুরক্ষিত হইলে মৃত্তিকাক্ষয়ও যথেষ্ট পরিমাণে নিবারিত হয়। বনভূমির বৃক্ষগুলি প্রচুর পরিমাণে হিউমাসের স্তর গঠন করে যাহা ভূমিক্ষয় নিবারণের সহায়ক। উদ্ভিদের মূলগুলি প্রাকৃতিক বাঁধের ন্যায় ক্রিয়া করে এবং ইহা বৃষ্টির জলকে ধারণ করিয়া রাখে ও মৃত্তিকা ধৌত নিবারণ করে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বৃক্ষচ্ছেদন রোধ

করা অথবা ইহা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। অগ্নিকাণ্ডের ফলে বনভূমি যাহাতে বিনষ্ট না হয় এবং যাহাতে এই অগ্নি চতুর্দিকে বিস্তৃত না হয় তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। পতঙ্গের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বহু মূল্যবান বনজ উদ্ভিদ বিনষ্ট হয়। সেই দিকেও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

বনভূমি আমাদের জাতীয় সম্পদ। বনভূমি আমাদের জ্বালানী কাষ্ঠ ও প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রী প্রদান করে। কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করিতে এবং গঁদ, রজন, তার্পিন প্রভৃতি ব্যবহার্য দ্রব্যগুলি উদ্ভিদেরই অবদান। আবার হরিতকি, কুইনাইন প্রভৃতি ভেষজ উদ্ভিদ এবং খাদ্য ও বাসস্থানের যাবতীয় উপকরণ বনভূমিই যোগায়। বন্যা ও মৃত্তিকা ক্ষয় নিবারণেও বনভূমি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। অতীতে মানুষ যথেচ্ছভাবে অপরিকল্পিত রূপে বনভূমির বৃক্ষচ্ছেদন করিয়া উহার যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিয়াছে। কিন্তু পুনঃপ্রবর্তন করে নাই। অগ্নিকাণ্ডের ফলে লক্ষ লক্ষ একরের সমৃদ্ধশালী বনভূমি বিনষ্ট হইয়াছে। বনভূমির বিনাশ সাধন করিয়া বন্য প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস ও মূল্যবান মৃত্তিকার যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে এই সকল সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া **বন মহোৎসব** (Van Mahotsav) নামক বৃক্ষরোপণ উৎসব প্রবর্তন করেন। এই উৎসব প্রতিবৎসর ফেব্রুয়ারী ও জুলাই মাসে সপ্তাহব্যাপি পালিত হয়। এই সময় দেশের সর্বত্র বৃক্ষরোপণ করা হয়। শহর ও গ্রামের সর্বত্র উন্মুক্ত ও অব্যহৃত জমিতে এই উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবই হইল ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা। এই সময় বহু পুরাতন বৃক্ষগুলিকে অপসারণ করিয়া উহার স্থলে নূতন চারাগাছ রোপণ করা হয়। অগ্নি-বিধ্বস্ত অঞ্চলেও এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়।

কেবলমাত্র প্রথারূপে অপরিকল্পিত বনমহোৎসব পালন করিলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করি না। দেখা যায় যে বৃক্ষরোপণের পরে উহারা অযত্নে পড়িয়া থাকে। ইহার ফলে মাত্র কয়েকটি বৃক্ষ স্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পায় কিন্তু অধিকাংশই বিনষ্ট হয়। গ্রামাঞ্চলে এই প্রকার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণই অধিক। যে সকল উদ্ভিদ বিস্তীর্ণ ছায়া প্রদান করে তাহাদিগকে অপসারণ করিয়া ঐ স্থানে নূতন নূতন গৃহ নির্মাণ করা হয়। কখন কখন দেখা যায় যে বনভূমি উচ্ছেদ করিয়া উহাকে চাষের জমিতে পরিণত করা হইয়াছে। উচ্ছেদের পরে বনজ উদ্ভিদের কাষ্ঠকে জ্বালানী অথবা ব্যবহার উপযোগী কাষ্ঠে পরিণত করা হয়।

বনমহোৎসবের সুফল পাইতে হইলে ইহার কর্মসূচি যথাযথরূপে প্রচার করা কর্তব্য যাহাতে দেশের সর্বত্রই ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, খরা অঞ্চলে এইরূপ বৃক্ষ রোপন করা প্রয়োজন যাহা তাপ ও উষ্ণতা সহ্য করিতে পারে। ইহা ভূমিক্ষয় ও মরুভূমির অগ্রসরতা প্রতিরোধ করিতে সক্ষম। মৃত্তিকায় অধিকমাত্রায় জল থাকিলে এইরূপ স্থানে ইউক্যালিপটাসের চারা রোপণ করিলে সুফল পাওয়া যায় কারণ ইহার মূল মৃত্তিকাস্থ জলতলকে অধিকতর নিম্নে সরিয়া যাওয়ায় সহায়তা করে

6. **তৃণভূমির উন্নতিসাধন** (Development of grasslands)—বনভূমির পরেই তৃণভূমির উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন। তৃণগুলি মৃত্তিকা কণিকাকে যথাযথ ধারণ করিয়া রাখে ও উহার ক্ষয় নিবারণ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাঁসপাতাল, অফিস, বাসস্থান, সহরাঞ্চল, এবং নদী ও খালের তীরবর্তী স্থানে বহু পতিত জমি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থানে তৃণ উৎপাদন করা প্রয়োজন। ফলের বাগান ও বনভূমিতে অবস্থিত বৃক্ষগুলির মধ্যে যে অব্যবহৃত মৃত্তিকা থাকে তাহাও তৃণাচ্ছাদিত করা প্রয়োজন। তৃণ যে গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহাই নহে, ইহা জলশোষণ ও মৃত্তিকার স্থিতিস্থাপকতা ও উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে।

7. **পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ** (Control of grazing)-মানুষ উদ্ভিদের ক্ষতি সাধন করিলেও পশুও উদ্ভিদের যথেষ্ট বিনাশ সাধন করে। ইহা মৃত্তিকাক্ষয়ের একটি প্রধান কারণ। পশুদিগের পদচারণে পিষ্ট হইয়া শুধু যে অংকুরিত বৃক্ষচারা, গুল্ম প্রভৃতি বিনষ্ট হয় তাহাই নহে মৃত্তিকা কণিকাগুলি ঘন-বিনাস্ত হইয়া কঠিন আকার ধারণ করে এবং উদ্ভিদদিগের সুষ্ঠ বৃদ্ধির পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়ে। বিভিন্ন পশুর ক্ষেত্রে চারণক্ষেত্রের প্রকৃতিও বিভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে তৃণাচ্ছাদিত ভূমি গবাদি পশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী, ভেড়া গুল্ম প্রধান ক্ষেত্র পছন্দ করে এবং উটদিগের পক্ষে উচ্চ বৃক্ষ সম্পন্ন ক্ষেত্র অতিশয় প্রিয়। কয়েক বৎসর পরে উক্ত মৃত্তিকা দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ইহার উপরিস্তর বায়ুপ্রবাহে বিক্ষিপ্ত হয় অথবা জলপ্রবাহে ধৌত হয়। সেইজন্য অতিরিক্ত পশুচারণ সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা প্রয়োজন।

8. **কনটুর প্রথায় চাষ** (Contour cultivation)—ঢালু পর্বত গাত্র সাধারণত **কনটুর প্রথায় চাষ** (contour cultivation) করা হয়। ইহাতে মৃত্তিকা কর্ষণ, বীজ বপন ও ফসল সংগ্রহ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় ঢালু স্থানের দৈর্ঘ্য বরাবর কর্ষণ না করিয়া আড়াআড়িভাবে কর্ষণ হয় এবং ইহা পূর্ব প্রক্রিয়া অপেক্ষা সহজসাধ্য। ইহার ফলে কতকগুলি নিম্নস্থান বা খাঁজের সৃষ্টি হয় যাহা জলধারণ করে ও শোষণে সহায়তা করে। অধিকন্তু ইহা নিম্ন প্রবাহিত জলধারার গতি রোধ করে যাহার ফলে শোষণ কাল বৃদ্ধি পায়। ঢালু স্থানের দৈর্ঘ্য বরাবর চাষ করিলে মৃত্তিকার উপরিতল ক্ষয়প্রাপ্ত (sheet erosion) হয় ও গিরিখাত গঠনের (gullying) সম্ভাবনা থাকে।

9- **ঢালু স্থান খন্ডিত করিয়া বা স্ট্রিপ গঠন প্রক্রিয়ায় চাষ** (Strip cropping) —সমগ্র ঢালু স্থানে একই প্রকার উদ্ভিদ চাষ করিলে দেখা যায় যে বৃষ্টির জল ঢাল বরাবর প্রবাহিত হইয়া নিম্নাঞ্চল সঞ্চিত হয়। ঢালু স্থান দীর্ঘ হইলে বৃষ্টিধারার গতিও দ্রুততর হয় যাহার ফলে গিরিখাত উৎপাদন অথবা মৃত্তিকাপাত ক্ষয়ের সম্ভাবনা প্রবল হয়।

অধুনা, দীর্ঘ ঢালুস্থানকে আড়াআড়ি ভাবে কাটিয়া কতকগুলি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। একটি মৃত্তিকাখণ্ডে ঘাস ও অন্যান্য মৃত্তিকা আচ্ছাদনকারী উদ্ভিদ সারিবদ্ধ রূপে ও আড়াআড়িভাবে রোপণ করা হয় ও পরবর্তী খণ্ডে ভুট্টা, আলু প্রভৃতি ফসলী

উদ্ভিদের চাষ করা হয়। এইরূপ পর্যায়ক্রমিক খণ্ডের চাষে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যেন সারিমধ্যস্থ কিছু পরিমাণ জমি উন্মুক্ত থাকে। ইহাতে মৃত্তিকাপাতের ক্ষয় স্বল্প নিবারিত হইলেও জল প্রবাহের গতি রুদ্ধ হয়: কর্ষিত মৃত্তিকাসহ জল পরিস্রুত হয় ও জলশোষণ মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়ায় গিরিখাত গঠন নিবারিত হয়।

10. **টেরাস বা চত্বর নির্মাণ করিয়া চাষ** (Terrace cultivation)—ঢালু স্থানকে কতকগুলি ক্ষুদ্র আয়তনের সমতল ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়। ইহাদিগকে **চত্বর** বা **টেরাস** (terrace) বলে। প্রতি চত্বরে প্রান্তে একটি করিয়া ঈষৎ ঢালু ও গভীর জলপথ নির্মাণ করা হয় এবং ইহাদের প্রধান জলনির্গম পথের সহিত সংযোগ স্থাপন করা হয়। ইহার ফলে ক্ষেত্রের এক পার্শ্ব দিয়া স্তিমিত গতিতে জলধারা প্রবাহিত হয় এবং মৃত্তিকা ক্ষয় নির্ধারিত হয়।

11. **গিরিখাত গঠন নিয়ন্ত্রণ** (Gull control)—পর্বত গাত্রে জলপ্রবাহ দ্রুত হইলে গভীর গিরিখাতের (gullis) সৃষ্টি হয় এবং চাষ আবাদে অসুবিধার সৃষ্টি করে। সেইজন্য গিরিখাতের সহিত আড়াআড়িভাবে বাঁধ নির্মাণ করিলে ইহার গঠন নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এই সকল বাঁধ পলিমাটিকে ধারণ করিয়া রাখে। কখন কখন তৃণ, গুল্ম অথবা বৃক্ষ গিরিখাতের সহিত আড়াআড়িভাবে উৎপন্ন করিলে অথবা জল-প্রবাহকে নিয়মিত বাধা প্রদান করিলে সুফল পাওয়া যায়।

12. **বালুকা বন্ধনকারী উদ্ভিদ উৎপাদন** (Growing of sand binders) —বায়ুপ্রবাহে বালুকা বিক্ষিপ্ত হইয়া বালিয়াড়িতে সঞ্চিত হয়। অবিরত প্রবল বায়ু-প্রবাহে বালুকা ক্রমে অধিকতর দূরে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং কৃষিক্ষেত্র, বাসগৃহ প্রভৃতি আবৃত করিয়া প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। ইহাকে প্রতিহত করিতে কয়েক প্রকার বালুকা বন্ধনকারী উদ্ভিদ (sand binders) উৎপাদন করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে দুর্বাঘাস (*Cynodon dactylon*), আকন্দ (*Calotropis procera*) প্রভৃতি মরুভূমিতে উৎপন্ন করা যায়। Spinifex squarrosus নামক তৃণ, ধতুরা (*Datura stramonium*) প্রভৃতি সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে উৎপাদন করা যায়।

জৈবিক কারণ (Biotic factors)—জীবিত উদ্ভিদ অথবা প্রাণী পৃথকরূপে অথবা একত্রে উদ্ভিদের বিস্তারের অংশ গ্রহণ করে এবং ইহাতে ইহারা বিভিন্ন জৈবিক কারণের বশবর্তী হইয়া থাকে। বিভিন্ন জৈবিক কারণগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

1. **উদ্ভিদদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা** (Competition among plants)—উদ্ভিদদিগের বিভিন্ন প্রজাতি যথোপযুক্ত স্থান, আলোক, বায়ু, জল প্রভৃতির সাহায্যে জীবনধারণের জন্য সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ভিদদিগের বিস্তার এইরূপ জীবন-সংগ্রাম (struggle for existance) দ্বারা নির্ধারিত হয়। উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ জীবন সংগ্রামের প্রতিযোগিতা অতিশয় প্রবল। উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের যে সকল প্রজাতি কোন নির্দিষ্ট পরিবেশে উপযুক্তরূপে অভিযোজনে সক্ষম তাহারাই জীবিত থাকে এবং অপরগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়।

2. **মৃত্তিকাস্থ জীবাণু** (Soil organism)—শৈবাল, ছত্রাক বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ, কেঁচো এবং বহুপ্রকার জীবাণু মৃত্তিকার আবশ্যকীয় ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন সাধন করিয়া উহাকে উর্বর বা অনুর্বর ভূমিতে পরিণত করে। ইহার ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও গঠনের পরিবর্তন হয় এবং উদ্ভিদের বিস্তারও ইহার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

3. **পরজীবী উদ্ভিদ ও প্রাণী** (Parasitic plants and animals)—পরজীবী ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া, কয়েক প্রকার পতঙ্গ প্রভৃতি কোন অঞ্চলের উদ্ভিদকে আক্রমণ করিয়া উহাদের দেহের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গুরুতর ব্যাধির সৃষ্টি করে। ইহার ফলে যে সকল উদ্ভিদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাহাদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয় অথবা তাহারা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে ইহা উদ্ভিদ বিস্তারের একটি প্রয়োজনীয় কারণ।

4 **অন্যোন্যজীবিত্ব** (Symbiosis)—কখন কখন দুইটি বিভিন্ন জীব একত্রে বসবাস করে এবং পরস্পরের সাহচর্যে বাঁচিয়া থাকে। এই প্রকার নির্ভরতাকে অন্যোন্যজীবিত্ব বলে ও জীবগুলিকে অন্যোন্যজীবী (symbionts) বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এক প্রকার শৈবাল ও এক প্রকার ছত্রাকে পারস্পরিক সাহচর্যে **লাইকেন** (lichen) নামক উদ্ভিদশ্রেণীর জন্ম। কয়েকটি লেগুমিনসী-গোত্রীর উদ্ভিদের (leguminous plants) মূলে রাইজোবিয়াম (Rhizobium) নামক ব্যাকটিরিয়া অন্যোন্যজীবীরূপে বসবাস করিয়া অর্বুদ (nodules) সৃষ্টি করে। ইহাতে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং উদ্ভিদের বিস্তারে সহায়তা করে।

5. **চারণশীল পশু** (Grazing animals)—গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি দ্বারা পদদলিত হইয়া বহু উদ্ভিদই বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে যে স্থানের উদ্ভিদই চারণশীল পশুর দ্বারা সর্বদাই পদদলিত হয় তাহাদের মধ্যে যাহারা পদদলন প্রতিহত করিতে সক্ষম তাহারাই জীবিত থাকে এবং বীজের পরিবর্তে অঙ্গজ জনন দ্বারা বিস্তারলাভ করে।

6. **মানুষের প্রভাব** (Human agency)—ইহা উদ্ভিদের বিস্তার অতি প্রয়োজনীয় কারণ বলিয়া গণ্য। কখন কখন মানুষ জ্ঞাতসারে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মনোমত উদ্ভিদ আনিয়া অপর কোন অঞ্চলে রোপণ করে। এইরূপে এক অঞ্চলের উদ্ভিদ ক্রমে অপর অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। কখন কখন মানুষের অগোচরেও এই প্রকার বিস্তার সম্ভবপর হইতে দেখা গিয়াছে।

D. সংস্থানিক কারণ (Topographic factors)

কোন স্থানের উচ্চতা, উহার ঢাল বা খাড়া অবস্থা, উহা কি পরিমাণ সূর্যালোক প্রাপ্ত হয় অথবা বায়ুপ্রবাহের সম্মুখীন হয় এবং পর্বতশ্রেণীগুলি কোন্ দিকে বিস্তৃত প্রভৃতি স্থান বিবরণ কারণগুলি ঐ স্থানের উদ্ভিদদিগের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এই সকল কারণগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

1. **উচ্চতা** (Altitude)—সমতলভূমি অপেক্ষা পার্বত্য অঞ্চলেই উচ্চতার প্রভাব

বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। উচ্চতার ক্রম পরিবর্তনের সাথে আবহাওয়ারও পরিবর্তন লক্ষিত হয় এবং ইহার সাথে উদ্ভিদের প্রকৃতিরও পরিবর্তন হইতে দেখা যায়। হিমালয় পর্বতের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ শৃঙ্গ পর্যন্ত আরোহণ করিলে এইরূপ পরিবর্তন সহজেই প্রতীয়মান হয়।

2 **ঢালু অবস্থা** (Slopes)—মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ও উহার উপরিতলে কি পরিমাণ জল থাকে তাহার উপর মৃত্তিকার চরিত্র নির্ভর করে এবং এইরূপে ইহা উদ্ভিদ প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। ঢালু অধিক হইলে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও অতি স্বল্প পরিমাণ জল মৃত্তিকা কর্তৃক শোষিত হয়। সেইজন্য এইরূপ অঞ্চলে জাঙ্গল উদ্ভিদ (xerophytes) জন্মাইতে দেখা যায়। অধিকন্তু এইরূপ অঞ্চলে মৃত্তিকা ক্ষয়প্রাপ্ত (Soil erosion) হইতে দেখা যায়। পরন্তু উপর হইতে আগত মৃত্তিকা নিম্নাঞ্চলের সঞ্চিত সারযুক্ত মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া একপ্রকার নূতন মৃত্তিকা গঠন করে যাহা প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ জন্মাইতে সহায়তা করে।

3. **সূর্যালোক প্রাপ্তকাল** (Exposure)—ঢালু পর্বতগাত্র কি পরিমাণ সূর্যালোক প্রাপ্ত হয় তাহার উপর উদ্ভিদ বিস্তারের প্রকৃতি নির্ভর করে। পর্বতগাত্র দক্ষিণ দিকে ঢালু হইলে উহা উত্তরদিকের ঢালু অবস্থা অপেক্ষা অধিক মাত্রায় সূর্যালোক প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য দক্ষিণ দিকে ঢালু পর্বতগাত্রে সাধারণ প্রকৃতির উদ্ভিদ (mesophytes) জন্মাইতে দেখা যায় কিন্তু উত্তরদিকে ঢালু পর্বতগাত্রে প্রধানত জাঙ্গল উদ্ভিদের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়।

4. **পর্বতশ্রেণীর বিস্তার পথ** (Direction of mountain chains)—জলবায়ুপূর্ণ বায়ুপ্রবাহ বৃষ্টিপাতের কারণ। এইরূপ বায়ুপ্রবাহ পর্বতশ্রেণীর বিস্তার পথ কর্তৃক মুক্ত বা বিঘ্নিত হইতে পারে। সেই কারণে ইহা উদ্ভিদ বিস্তারের কারণ বলিয়া গণ্য করা হয়।

---

৩ বাস্তু-সংস্থানের একক
(Ecological units)

বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ জন্মাইতে দেখা যায়। পুষ্করিণী, ময়দান অথবা পর্বতমালার প্রান্ত দিয়া ভ্রমণ করিলে, প্রতিটি পৃথক পরিবেশে এইরূপ শত শত উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। একই প্রাকৃতিক পরিবেশের উদ্ভিদসমষ্টির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান থাকিলে তাহাকে **উদ্ভিদ-সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী** (Plant community) বলে। অবশ্য উদ্ভিদ-সম্প্রদায়ের উদ্ভিদরাজ্যে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান আছে, কিন্তু দুইটি সম্প্রদায়কে একটি নির্দিষ্ট রেখা টানিয়া পৃথক করা সহজসাধ্য নয়। বিভিন্ন সম্প্রদায় একত্রিত হইয়া একটি **মিশ্র সম্প্রদায়** (mixed community) গঠন করে। অধিকন্তু সভ্যতা বিকাশের সাথে আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্প্রদায়গুলিকে ক্রমে **কৃত্রিম সম্প্রদায়ে** (artificial community) রূপান্তরিত করিতেছি।

উদ্ভিদ-সংগঠন (Plant formation) উদ্ভিদ-সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ অংশকে **উদ্ভিদ-সংগঠন** (plant formation) বলে। একটি উদ্ভিদ-সংগঠন বলিতে কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্ভিদের সমষ্টি বুঝায়। সুতরাং উদ্ভিদ-সংগঠন দুই প্রকারের হইতে পারে ; যথা—**জলবায়ু-সংক্রান্ত সংগঠন** (climatic formation) এবং **মৃত্তিকা-সংক্রান্ত সংগঠন** (edaphic formation)। জলবায়ু-সংক্রান্ত সংগঠনগুলি বায়ুস্থ কারণগুলির উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, হিমালয়ের নিম্নপার্বত্য বনভূমি, আসামের চিরহরিৎ বনভূমি, রাজপুতনার মরুভূমি প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। পরন্তু, মৃত্তিকা সংক্রান্ত সংগঠনগুলি মৃত্তিকার স্বাভাবিক প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। গঙ্গা এবং সিন্ধুনদের মোহনায় গরানজাতীয় উদ্ভিদ (mangrove vegetation) হইল ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কতকগুলি সংগঠন জলবায়ু এবং মৃত্তিকা-সংক্রান্ত উভয় কারণগুলির উপর নির্ভর করে। ইহাদের **গুল্মাচ্ছাদিত সংগঠন** (heath formation) বলে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মহারাষ্ট্রের সাধারণ জলবায়ু এবং কৃষ্ণ মৃত্তিকা তুলাগাছের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আবার মানুষও উদ্ভিদ সংগঠনে বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করে এবং বহুক্ষেত্রেই ইহা অন্যতম কারণ বলিয়া গণ্য করা হয়। এইরূপ সংগঠনকে **অ্যান্থ্রোপোজেনিক সংগঠন** (anthropogenic formation) বলে।

প্রতি উদ্ভিদ-সংগঠনে কতকগুলি বিশিষ্ট উদ্ভিদের প্রাধান্য (dominance) দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রচুর বৃষ্টিপাতসম্পন্ন বনভূমির প্রধান উদ্ভিদ হইল বৃক্ষ এবং ময়দানের প্রধান উদ্ভিদ হইল ঘাস।

সংগঠনের মধ্যে দুইটি অথবা তিনটি উদ্ভিদের সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য দেখা গেলে ইহাকে **চরম সংগঠন** (climax formation) বলে। উদাহরণস্বরূপ সিডার-হেমলক্ চরম সংগঠনের (ceder-hemlock formation) উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রাকৃতিক উদ্ভিদবিস্তৃতির মধ্যে একাধিক প্রধান উদ্ভিদ

থাকিলে এইপ্রকার সংগঠনকে **অ্যাসোসিয়েশন্** (association) বলে এবং যখন ইহাতে একটিমাত্র প্রধান উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায় তখন সংগঠনকে **কনসোসিয়েশন** (consociation) বলে। উদাহরণস্বরূপ শর-তৃণযুক্ত জলাভূমি সংগঠনের (reed-swamp formation) মধ্যে হোগলা (*Typha sp.*) নামক উদ্ভিদের একপ্রকার উদ্ভিদের কনসোসিয়েশন্ দেখিতে পাওয়া যায় এবং শর-তৃণযুক্ত হ্রদে স্কীর্পাস প্রজাতির (*Scirpus* sp.) এবং নলখাগড়া প্রজাতির (*Phragmites* sp.) অ্যাসোসিয়েশন দেখা যায়।

অ্যাসোসিয়েশন অথবা কনসোসিয়েশনের অন্তর্গত প্রধান উদ্ভিদ উচ্চ বৃক্ষ হইলে সাধারণত ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদগুলি অল্পবিস্তর চারিটি স্তরে (strata) সজ্জিত থাকে। ইহাদিগকে যথাক্রমে বৃক্ষস্তর, গুল্মস্তর, বীরুৎস্তর এবং ভূমিস্তর বলে। প্রতি স্তরের উদ্ভিদের গঠন উহাদের অবস্থান অথবা পারিপার্শ্বিক কারণ অনুযায়ী বিভিন্ন। কিন্তু নিম্নস্তরের উদ্ভিদের প্রকৃতি এবং অস্তিত্ব বহুলাংশে উচ্চস্তরের উদ্ভিদ প্রকৃতি এবং অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। ঋতুর পরিবর্তনের সাথে বিভিন্ন স্তরের উদ্ভিদের গঠন পরিবর্তিত হইতে পারে।

অ্যাসোসিয়েশন অথবা কনসোসিয়েশনের অন্তর্গত স্থানীয় উদ্ভিদসম্প্রদায়ে একটি মাত্র স্থানীয় নিম্নপ্রধান (subdominant) প্রজাতি থাকিলে উহাকে **উদ্ভিদসমাজ** (society) বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে উদ্ভিদ রুঙ্গিয়া (*Rungia*) অথবা নেলসোনিয়া (*Nelsonia*) নামক অ্যাকানথেসী গোত্রীয় (Fam. Acanthaceae) উদ্ভিদের প্রজাতি ক্ষণকালের জন্য প্রচুর পরিমাণে জন্মাইতে দেখা যায়। অতএব বলা যাইতে পারে এইসকল প্রজাতি বিভিন্ন সমাজ গঠন করে।

উদ্ভিদপর্যায় (Plant succession)—উদ্ভিদে অ্যাসোসিয়েশন, কনসোসিয়েশন এবং সমাজ সর্বদাই পরিবর্তনশীল, যদিও ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্থিতি-অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। এই পরিবর্তনগুলির হ্রাস-বৃদ্ধি হইলেও বহু বৎসর পরে বহু প্রকার পরিবর্তনের দ্বারা সাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবার একটি প্রচেষ্টা থাকে। এই পরিবর্তন অগ্রগতিশীল পরিবর্তনকে **উদ্ভিদপর্যায়** (Plant succession) বলে। এই পরিবর্তন-গুলি জলবায়ু, জৈব অথবা স্থানবিবরণ (topography) সংক্রান্ত কারণগুলির দ্বারা সংঘটিত হয়। ইহাদের প্রথম দশায় কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে **উদ্ভিদ-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক** (pioneer community) প্রতিষ্ঠিত হয় ক্রমে নূতন পরিবেশের সহিত সমন্বয়ের ফলে অন্তর্বর্তী সম্প্রদায় (intermediate communities) প্রতিষ্ঠালাভ করে। অবশেষে জলবায়ুর ক্রিয়ায় উদ্ভিদপর্যায়ের অবসান ঘটিয়া **চরম সম্প্রদায়** (climax community) সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহা সর্বপ্রকার পরিবেশের সহিত সমন্বয় স্থাপন করিতে সক্ষম।

ক্রমপর্যায়ের দ্বারা কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায় যখন চরম সম্প্রদায়ে পরিণত হয় তখন তাহাকে **সেরি** (sere) বলে। উদ্ভিদবিহীনভূমি ক্রমে চরম সম্প্রদায়ে পরিণত হয় তখন ইহাকে **মুখ্য সেরি** (primary sere) বলে। বহু বৎসর ধরিয়া বহু পরিবর্তনের দ্বারা

যে মুখ্য সেরি গঠিত হয় তাহা প্রায়ই মনুষ্যসমাজের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বহিঃস্থ বাধা অপসারিত হইলে প্রকৃতি গৌণ পর্যায়ের দ্বারা (secondary succession) নূতন চরম সম্প্রদায় গঠনে সচেষ্ট হয় এবং ইহার ফলে **সাবসেরি** (subsere) গঠিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে পর্ণমোচী বনভূমির (deciduous forests) বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলিলে শীঘ্রই ঐ স্থানে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ জন্মাইতে দেখা যায় এবং ক্রমে কর্তিত অংশ হইতে বহু নূতন উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়া পুনরায় উচ্চ বৃক্ষসম্পন্ন বনভূমি গঠন করে।

কোন অঞ্চলের জলের পরিমাণের উপর সেরির শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। সেরির উৎপত্তি জলে হইলে উহাকে **হাইড্রোসেরি** (hydrosere) বলে। মরুভূমিতে হইলে **জেরোসেরি** (xerosere) এবং লবণাক্ত স্থানে হইলে **হেলোসেরি** (helosere) বলে।

উন্মুক্ত স্থানে নূতন উদ্ভিদসম্প্রদায় গঠিত হইবার কালে প্রথমে অল্প কয়েকটি উদ্ভিদের প্রজাতি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়। এইরূপ সম্প্রদায়কে **মুক্ত উদ্ভিদসম্প্রদায়** (open plant community) বলে। ক্রমে অধিক সংখ্যক প্রজাতি জন্মাইয়া একটি ঘন সম্প্রদায় গঠন করে, যাহার মধ্যে কয়েকটি প্রজাতির প্রাধান্য দেখা যায়। এইপ্রকার সম্প্রদায়কে **বন্ধ সম্প্রদায়** (closed community) বলে।

উদ্ভিদ-আক্রমণ (Plant invasion)—কখনও একটি বা একাধিক প্রজাতি এক স্থান হইতে অন্যত্র বিস্তৃত হয়। ইহাকে উদ্ভিদ **প্রচরণ** (migration) বলে। পরে ঐ স্থানে এইপ্রকার বহুসংখ্যক উদ্ভিদ একত্রিত হইয়া উহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা যাহারা জীবিত থাকে তাহারাই ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে **উদ্ভিদ-আক্রমণ** (Plant invasion) বলে। নিম্নলিখিত প্রণালীতে উদ্ভিদ-আক্রমণ সংঘটিত হইতে পারে ; যথা—

1. অবিরাম (Continuous)—বহু বৎসর ধরিয়া স্বাভাবিকরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও পরে কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে আক্রমণকারী উদ্ভিদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

2. সবিরাম (Intermittent)—আক্রমণকারী উদ্ভিদ নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাহাদের আদি বা স্বস্থান হইতে ক্রমশ দূরে স্থানান্তরিত হয় কিন্তু কখনই ইহা সুষ্ঠু পর্যায় (successful succession) পৌঁছায় না।

3. সম্পূর্ণ (Complete)—আক্রমণকারী উদ্ভিদ ঐ অঞ্চলের সমস্ত প্রাথমিক উদ্ভিদগুলিকে বিনষ্ট করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

4. অসম্পূর্ণ (Partial)—আক্রমণকারী উদ্ভিদ ঐ অঞ্চলের প্রাথমিক উদ্ভিদগুলির মধ্যে উপযোগী করিয়া লয় কিন্তু ইহাদের আকৃতির কোনও বাস্তব পরিবর্তন হয় না সম্পূর্ণ উদ্ভিদ-আক্রমণ অপেক্ষা এইপ্রকার আক্রমণ সাধারণত অধিক-মাত্রায় সংঘটিত হয়।

5. স্থায়ী (Permanent)—আক্রমণকারী উদ্ভিদ অসম্পূর্ণ আক্রমণের পর ঐ অঞ্চলের স্থায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

---

৪ বাস্তু সংস্থান অনুযায়ী উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ
(Ecological classification of plants)

বাস্তু সংস্থান বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাস্তু সংস্থান সম্বন্ধীয় কারণের উপর উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে জলবায়ু সংক্রান্ত কারণের উপর 1903 খৃষ্টাব্দে সিম্পার (Shimper). মৃত্তিকাস্থ জলের পরিমাণের উপর 1901 খৃষ্টাব্দে ওয়ারমিং (Warming) এবং অন্যান্য কারণের উপর 1916 খৃষ্টাব্দে ক্লেমেণ্ট (Clement) উল্লেখযোগ্য।

ওয়ারমিং 1909 খৃষ্টাব্দে মৃত্তিকাস্থ জলের পরিমাণ অনুযায়ী উদ্ভিদদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলিতে বিভক্ত করেন ঃ

(i) **জলজ উদ্ভিদ** বা **হাইড্রোফাইট** (Hydrophytes)—মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে জল থাকিলে অথবা জলজ পরিবেশে এই শ্রেণীর উদ্ভিদ জন্মায়।

(ii) **সাধারণ উদ্ভিদ** বা **মেসোফাইট** (Mesophytes)—মৃত্তিকায় জলের পরিমাণ স্বাভাবিক থাকিলে অর্থাৎ অত্যধিক বা অত্যল্প না হইলে এই শ্রেণীর উদ্ভিদ দেখা যায়।

(iii) **জাঙ্গল উদ্ভিদ** বা **জেরোফাইট** (Xerophytes)—মৃত্তিকায় জলের পরিমাণ অত্যল্প বা প্রায় শুষ্ক হইলে এই শ্রেণীর উদ্ভিদ জন্মায়।

(iv **ট্রোপোফাইট** (Tropophytes —এই শ্রেণীর উদ্ভিদ সাধারণ শ্রেণীর উদ্ভিদের ন্যায় কিন্তু ঋতুর পরিবর্তনের সাথে ইহারা বিভিন্ন পর্যায়ে সাধারণ উদ্ভিদ ও জাঙ্গলে উদ্ভিদের ন্যায় চরিত্র ধারণ করে।

(v) **লবণাম্বুজ উদ্ভিদ** বা **হ্যালোফাইট** (Halophytes)—এই শ্রেণীর উদ্ভিদ সমুদ্র উপকূলবর্তী লবণাক্ত পরিবেশে জন্মায়। এই স্থানের মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে জল থাকিলেও উহাতে অত্যধিক লবণ দ্রবীভূত থাকায় উদ্ভিদদিগের প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহের পরিমাণ অতিমাত্রায় হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই প্রকার মৃত্তিকাকে ঊষর মৃত্তিকা (Physiologically dry soil) বলে।

(vi) **পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ** বা **এপিফাইট** (Epiphytes)—এই শ্রেণীর উদ্ভিদ অন্যান্য উদ্ভিদের আশ্রয় জন্মায় এবং বিশেষ অঙ্গ দ্বার বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প শোষণ করে।

I. জলজ উদ্ভিদ (Hydrophytes)

এই শ্রেণীর উদ্ভিদ জলজ পরিবেশে জন্মায়। তিন প্রকারের জলজ উদ্ভিদ দেখা যায় A. **প্লবমান** (floating), B. **নিমজ্জিত** (submerged) এবং C. **আর্দ্রভূমিজ** (hydrophytes)।

A. **প্লবমান উদ্ভিদ** (Floating plants)—ইহারা সম্পূর্ণরূপে প্লবমান হইতে পারে। কচুরিপানা (*Eichhornia*), টোপাপানা (*Pistia*), ক্ষুদিপানা (*Lemna*) স্যালভিনিয়া (*Salvinia*), অ্যাজোলা (*Azolla*) প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। ইহারা

আবার আংশিক প্লবমান হইতে পারে। পদ্ম (*Nelumbium*), শালুক (*Nymphaea*) প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

1. **সম্পূর্ণ প্লবমান উদ্ভিদ** (Free floating plants)—উদ্ভিদের মূল যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয় অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে মূলরোম কখনই উৎপন্ন হয় না। স্যালভিনিয়া (*Salvinia*), উলফিয়া (*Wolffia*) প্রভৃতি উদ্ভিদ মূলহীন হইয়া থাকে। টোপাপানা, ক্ষুদিপানা, কচুরিপানা, অ্যাজোলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে মূলত্রাণ দেখা যায় না। কেশদামের (*Jussiaea*) ক্ষেত্রে শ্বাসমূল থাকিলেও উদ্ভিদকে জলে ভাসমান রাখিতে প্লবমান মূল (*floating roots*) উৎপন্ন হয়। কাণ্ড অতিশয় নরম হয়। ক্ষুদিপানার (*Lemna*) ক্ষেত্রে কাণ্ড ও পাতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। ইহার বিষমপৃষ্ঠ থ্যালাসের ন্যায় দেখিতে বিটপটি পাতার ন্যায় কার্য করে। পাতা তাম্বুলাকার ও ছত্রবন্ধ (cordate and peltate) যাহা উদ্ভিদকে ভাসমান রাখিতে সাহায্য করে।

প্লবমান উদ্ভিদের ত্বক কোষে কিউটিকল গঠিত হয় না এবং থাকিলেও ইহা অতিশয় পাতলা হইয়া থাকে। ত্বককোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। কর্টেক্সে বৃহদাকার বাতাবকাশ থাকে যাহা উদ্ভিদকে জলে ভাসিতে সহায়তা করে ও ইহার বায়ুপূর্ণ বলিয়া উদ্ভিদগুলি শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে। স্ক্লেরেনকাইমা ও অন্যান্য স্তম্ভন কলার পরিমাণ অতিশয় অল্প। ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিলগুলি কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত।

2. **আংশিক প্লবমান উদ্ভিদ** (Partly floating plants)—আংশিক প্লবমান উদ্ভিদ সাধারণত রাইজোম দ্বারা কর্দমাক্ত মৃত্তিকায় শায়িত অবস্থায় বর্ধিত হয়। ইহাদের মূল অতিশয় অল্প পরিমাণে জন্মায়। প্লবমান পাতাগুলি আকারে বৃহৎ গোলাকার দেখিতে হয় ও দীর্ঘ পত্রবৃন্তের সহিত সংলগ্ন থাকে। জলের গভীরতা অনুযায়ী পত্রবৃন্তের দৈর্ঘ্য নির্ধারিত হয়। গভীরতা বৃদ্ধি অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে পত্রবৃন্তের দৈর্ঘ্যও দীর্ঘ অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় যাহাতে পত্রফলকটি জলতলে ভাসিতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফুলগুলি উজ্জ্বলবর্ণের দেখিতে হয়। ফল অস্ফোটক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাদের প্লবমান কৌশল থাকে। সাধারণত অঙ্গজ প্রক্রিয়ায় ইহারা জননকার্য সম্পাদন করে।

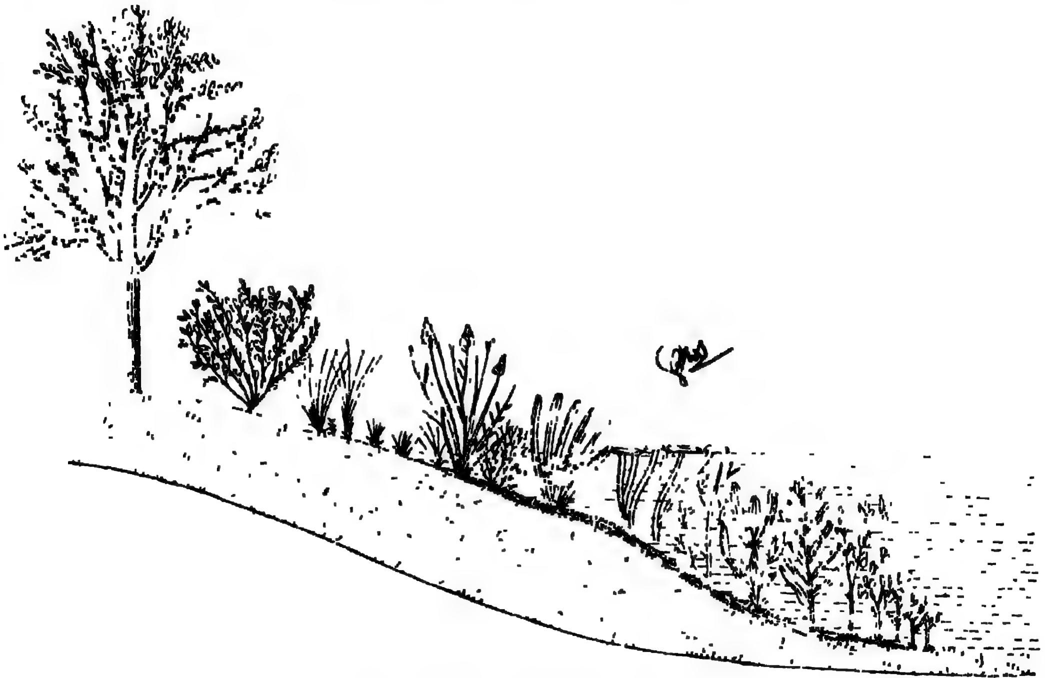
পত্রবৃন্তে বহুসংখ্যক বৃহদাকার বাতাবকাশ থাকে। ত্বককোষে স্থূল মোমযুক্ত কিউটিকল দেখা যায়। পত্র ফলকের উপরিতলে পত্ররন্ধ্র অবস্থিত। পাতার উপরিতল দ্বারা গ্যাসীয় ব্যাপন সম্পাদিত হয় এবং নিম্নতল জল শোষণে অংশ গ্রহণ করে।

B. **নিমজ্জিত উদ্ভিদ** (Submerged plants)—এই শ্রেণীর উদ্ভিদ জলে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত থাকে। পাটাশেওলা (*Vallisneria*), ঝাঁঝি (*Utricularia*), সেরাটোফাইলাম (*Ceratophyllum*). হাইড্রিলা (*Hydrilla*), কারা (*Chara*), নাইটেলা (*Nitella*) প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। ইহাদেরও মূল অতিশয় অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সেরাটোফাইলাম, ঝাঁঝি প্রভৃতির মূল কখনই জন্মায় না। পাটাশেওলা, হাইড্রিলা প্রভৃতির মূল থাকিলেও পাতার সাহায্যে ইহারা জল শোষণ করে। নিমজ্জিত

কাণ্ডগুলি দীর্ঘ ও শীর্ণ হয়। পাতাগুলি দীর্ঘ ফিতার ন্যায় দেখিতে হয় অথবা ইহারা বহুখণ্ডিত হইয়া থাকে। ইহাতে পাতার বিস্তৃত অঞ্চলই জলশোষণে অংশ গ্রহণ করে এবং জলের স্রোতে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। সাধারণত যে সকল উদ্ভিদ স্থির জলে জন্মায় তাহাদের পাতা ফিতার ন্যায় দেখিতে হয় কিন্তু স্রোতস্বিণীর ক্ষেত্রে পাতা বহুখণ্ডিত হইয়া থাকে। ঝাঁঝির ক্ষেত্রে কতকগুলি খণ্ডিত পাতা ক্ষুদ্র থলির ন্যায় আকার ধারণ করে যাহা জলজ কীটপতঙ্গ ধরিবার ফাঁদে (bladder) পরিণত হয়।

নির্মজ্জিত উদ্ভিদের কান্ডের কর্টেক্স বৃহত্তর এবং ইহাতে বাতাবকাশ আছে। ভ্যাস্কুলার কলা অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পাতাগুলিতে পত্ররন্ধ্র দেখা যায় না। মেসফিল কলা সাধারণত প্যালিসেড ও স্পঞ্জ প্যারেনকাইমায় বিভেদিত হয় না। প্লাস্টিডগুলি বৃহত্তর দেখিতে।

C. **আর্দ্রভূমিজ উদ্ভিদ** (Hydrophytes)—আর্দ্রভূমিজ উদ্ভিদ ডোবা, পুষ্করিণী, হ্রদ, বিল প্রভৃতির কিনারায় জন্মায় কিন্তু বর্ষাকালে আংশিক জলে নিমজ্জিত থাকে। শুষণি (*Marsilea*) পানমরিচ (*Polygonum*), হিঞ্চা (*Enhydra*), কলমি শাক (*Ipomoca repens*) ব্রাহ্মী শাক (*Bocopa*) হোগলা (*Typha*),



১৯০ নং চিত্র—জলজ ও স্থলজ উদ্ভিদের বিন্যাস

কচু (*Colocasia*) কয়েক প্রকার জলজ ঘাস প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। ইহাদের নিমজ্জিত অংশগুলির চরিত্র জলজ উদ্ভিদের ন্যায় কিন্তু বায়বীয় অংশগুলি স্থলজ সাধারণ উদ্ভিদের (mesophytes) চরিত্র ধারণ করে। এই প্রকার উদ্ভিদশ্রেণীকে হেলোফাইট (helophytes) নামেও অভিহিত করা হয়। ইহাদের মূল সাধারণত মৃত্তিকায় আবদ্ধ

থাকে। উদ্ভিদের বায়ব অংশের পাতাগুলি বিভিন্ন আকৃতির ও আয়তনের হইয়া থাকে কিন্তু নিমজ্জিত পাতাগুলি অতি খণ্ডিত হয়। মৃত্তিকায় জলের পরিমাণ অতিমাত্রায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে কেহ কেহ সাধারণ উদ্ভিদের ন্যায় আচরণ করে। ইহাদের সাধারণত শাখাযুক্ত ও মূলরোমবিশিষ্ট সুগঠিত অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। যে সকল উদ্ভিদ অগভীর জলে জন্মায় তাহাদের জলতলের নিম্নে অবস্থিত পাতাগুলি আকারে বৃহৎ ও অখণ্ডিত (entire) হইয়া থাকে। উদ্ভিদের এইরূপ দুই প্রকার পাতা ধারণ করিবার বৈশিষ্ট্যকে **দ্বিবিধপত্র** (heterophylly) বলে।

জলজ পরিবেশে উদ্ভিদগুলি জন্মায় বলিয়া ইহাদের সকল অংশেই বাতাবকাশ থাকে। পাতার মেসোফিল কলা প্যালিসেড ও স্পঞ্জ প্যারেনকাইমায় বিভেদিত। স্পঞ্জ কলার আয়তন প্যালিসেড কলা অপেক্ষা অধিকতর এবং ইহাদেরও বৃহৎ বাতাবকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল সুগঠিত। কাণ্ডেও বাতাবকাশ দেখা যায়। প্রস্বেদন হার হ্রাস করিবার জন্য এপিডারমিস স্থূল হইয়া থাকে। যে সকল পাতা সর্বদাই জলতলে নিমজ্জিত থাকে তাহাদের নিমজ্জিত উদ্ভিদের ন্যায় কিউটিকল গঠিত হয় না।

II. সাধারণ উদ্ভিদ (Mesophytes)

যে স্থানের মৃত্তিকায় জলের পরিমাণ স্বাভাবিক অর্থাৎ অত্যধিক বা অত্যল্প নহে সেইরূপ পরিবেশে সাধারণ উদ্ভিদ জন্মায়। ইহাদের জীবনধারণের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত ও নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার প্রয়োজন। আম (Mangifera indica) জাম (*Syzygium*), কাঁঠাল (*Artocarpus*) প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। এই শ্রেণীর উদ্ভিদের মূল সুগঠিত। কাণ্ড সাধারণত শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট। পাতাগুলি বিভিন্ন আকৃতির দেখিতে হয় এবং প্রান্ত খণ্ডিত হইতে পারে। পাতায় সাধারণত রোমের বা মোমের আবরণ দেখা যায় না।

বায়ব অংশের শাখাগুলিতে কিউটিকল দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ পাতা বিষমপৃষ্ঠ ও পত্ররন্ধ্র নিম্নত্বকে থাকে অবশ্য কোন কোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পত্ররন্ধ্র উভয়-তলেই থাকিতে পারে। স্তম্ভন কলা ও সংবহন কলা সুগঠিত।

III. জাঙ্গল উদ্ভিদ (Xerophytes)

মৃত্তিকায় জলের পরিমাণ অত্যল্প হইলে সেই প্রকার মৃত্তিকার এই শ্রেণির উদ্ভিদ জন্মায়। ফনিমনসা (*Opuntia*), বিভিন্ন প্রকার ক্যাকটাস (*cacti*), বাবলা (*Acacia*), আকন্দ (*Calotropis*), করবী (*Nerium*) প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। মৃত্তিকার প্রকৃতি অনুযায়ী তিন প্রকারের জাঙ্গল উদ্ভিদ দেখা যায়ঃ (*a*) যে সকল উদ্ভিদ পার্বত্য মৃত্তিকায় জন্মায় তাহাদের **লিথোফাইট** (lithophytes) বলে; (*b*) যাহারা বালি ও কাঁকর পূর্ণ মৃত্তিকায় জন্মায় তাহাদের **স্যামোফাইট** (psammophytes) বলে এবং (*c*) যাহারা মরুভূমির শুষ্ক বালুকাময় মৃত্তিকায় জন্মায় তাহাদের **চেরসোফাইট** (chersophytes) বলে। অধুনা বিজ্ঞানীগণ উদ্ভিদিগের

শুষ্কতা প্রতিরোধ ক্ষমতা অনুযায়ী উহাদিগকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন : (*a*) **স্ফীত জাঙ্গল** (succulents) ও **প্রকৃত জাঙ্গল** (true xerophytes)।

মৃত্তিকায় জলের পরিমাণ অতি স্বল্প বলিয়া শোষণ বিঘ্নিত হয়। সেইজন্য এই প্রকার অভিযোজনের বৈশিষ্ট্য হইল শোষণ অঙ্গের সম্প্রসারণ। অধিকন্তু উদ্ভিদদেহে জলধারণ করিয়া রাখিবার জন্য প্রস্বেদন হার হ্রাসের ব্যবস্থা।

জাঙ্গল উদ্ভিদের মূল সুগঠিত ও মৃত্তিকার বহু নিম্ন পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং শাখা ও প্রশাখামূলগুলি চতুর্দিকে বহুদূর বিস্তার লাভ করে। কাণ্ড মৃদগত (রাইজোম, কর্ম) প্রভৃতি অথবা ইহা কাষ্ঠল হয়। কখন কখন কাণ্ড শাখাকণ্টকে (thorns) পরিণত হইতে পারে। ফণিমনসা, বিভিন্ন প্রকার ক্যাকটাস, শতমূলি (*Asparagus*) প্রভৃতির ক্ষেত্রে পাতা পত্রকণ্টকে (spines) পরিণত হয়। আকাশমনি (*Acacia moniliformis*) নামক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পত্রবৃন্ত ফলকের ন্যায় আকার ধারণ করে (phyllode)। কতকগুলি চেনোপোডিয়েসী গোত্রীয় (fam. Chenopodiaceae) উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পাতাগুলি জলসঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য স্ফীত হয়। ফুলগুলি সাধারণত গ্রীষ্ম অথবা বর্ষাঋতুর প্রারম্ভে উৎপন্ন হয়।

কাণ্ড ঘন রোম দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ইহাদের জল সঞ্চয় কলা ও তরুক্ষীর (lalex) দেখিতে পাওয়া যায়। পাতাগুলিও ঘন রোম, কিউটিকল বা মোমদ্বারা আবৃত থাকে। পত্ররন্ধ্র ও কোষ মধ্যবর্তী স্থান অতীব হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কখন কখন পত্ররন্ধ্রগুলি গহ্বর মধ্যে নিমজ্জিত (sunken into pits) থাকে আবার কখন কখন ইহাদিগকে নিম্নত্বকে গঠিত গহ্বরের মধ্যে দীর্ঘ ঘন রোম দ্বারা আবৃত থাকিতে দেখা যায়। প্যালিসেড প্যারেনকাইমা স্পঞ্জ প্যারেনকাইমা অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণ উৎপন্ন হয়। স্ফীত উদ্ভিদ ব্যতীত জাঙ্গল উদ্ভিদদিগের পাতার স্তম্ভনকলা অতিশয় সুগঠিত।

IV. ট্রপোফাইট (Tropophytes)

এই শ্রেণীর উদ্ভিদ গ্রীষ্ম অথবা শীত ঋতুতে জাঙ্গল উদ্ভিদের ন্যায় চরিত্রধারণ করে কিন্তু বৎসরের অবশিষ্ট সময় ইহারা সাধারণ উদ্ভিদের ন্যায় আচরণ করে। আবার বর্ষাকালে কখন কখন ইহাদের জলজ উদ্ভিদের ন্যায় অভিযোজন দেখা যায়। শিমুল (*Salmalia malabarica*), আমড়া (*Spondias mangifera*), বট (*Ficus benghalensis*), শাল (*shorea robusta*), সেগুন (*Tectoma grandis*) প্রভৃতি উদ্ভিদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। শীতের প্রারম্ভে ইহাদের পাতা ঝরিয়া পড়িতে দেখা যায়। আবার বসন্ত অথবা বর্ষার প্রারম্ভে ইহাদের নূতন পাতা বা ফুল উৎপন্ন হয়।

V. লবণাম্বুজ উদ্ভিদ (Halophytes)

এই শ্রেণীর উদ্ভিদ সাধারণত লবণাক্ত জলে বা মৃত্তিকায় জন্মায় ইহাতে প্রচুর পরিমাণে লবণ দ্রবীভূত থাকে বলিয়া শোষণকার্য প্রায় রুদ্ধ হইয়া যায়। এই প্রকার

মৃত্তিকাকে **উষর মৃত্তিকা** (physiologically dry soil) বলে। সুতরাং জাঙ্গল উদ্ভিদের ন্যায় ইহাদের প্রস্বেদন হার হ্রাসের প্রয়োজন। উদ্ভিদগুলি সাধারণত খর্বাকার দেখিতে হয়। হার গোজা (*Acanthus illicifolius*) নামক উদ্ভিদের কাণ্ড স্ফীত হয়। আবার স্যালসোলা (*Salsola*) ও সুয়েডা (*Sueda*), পুঁই (*Basella*) প্রভৃতির পাতা স্ফীত ও রসাল হয়। মূল সুগঠিত ও বিস্তৃত। গুল্ম প্রকৃতির উদ্ভিদের কাণ্ড শায়িত, অনিয়ত শাখাবিন্যাসযুক্ত এবং রোম অথবা মোম দ্বারা আবৃত থাকিতে পারে। পাতার প্রান্ত সাধারণত অখণ্ড। পাতা রেখাকার চমসাকার, ডিম্বাকার বা গোলাকার হইতে পারে। ট্যামারিক্স গ্যালিকা (*Tamarix gallica*) নামক উদ্ভিদটি পত্রবিহীন হইয়া থাকে।

জাঙ্গল উদ্ভিদের ন্যায় কাণ্ডের স্তম্ভন কলা ও সংবহন কলা অতিশয় সুগঠিত কিন্তু কোষ মধ্যবর্তী স্থান অতিশয় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। পত্ররন্ধ্র গহ্বরে নিমজ্জিত নহে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে রোম দ্বারা আবৃত থাকিতে দেখা যায়। প্যালিসেড কলা সুগঠিত।

যে সকল হ্যালোফাইট সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণাক্ত মৃত্তিকায় জন্মায় তাহাদের **গরান জাতীয় উদ্ভিদ** (mangrove plants) বলে। গরান (*Ceriops roxburghiana*), সুন্দরী (*Sonneratia apata*), বোড়া (*Rhizophora*), ক্যাংড়া (*Bruguiera gynorhiza*) বিনা (*Avicennia officinalis*) প্রভৃতি উদ্ভিদ ইহার অন্তর্গত।

এই শ্রেণীর উদ্ভিদ সাধারণত খর্বাকার বা গম্বুজাকার দেখিতে হয়। কর্দমাক্ত মৃত্তিকায় আবদ্ধ রাখিতে ইহারা **স্তম্ভমূল** (prop roots) বা ঠেস মূল (stilt roots) উৎপন্ন করে। শ্বাসকার্যের জন্য ইহাদের শাখামূল হইতে কতকগুলি প্রশাখা মূল মৃত্তিকা ভেদ করিয়া মুক্ত বায়ুতে উঠিয়া আসে। ইহাদের রন্ধ্র থাকে ও রন্ধ্রের সাহায্যে ইহারা শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে। এই প্রকার মূলকে **শ্বাসমূল** (Pneumatophores) বলে। এইজন্য প্রধান কাণ্ডের নিম্নে মৃত্তিকার চতুর্দিকে এইরূপ বহু সংখ্যক শ্বাসমূল কণ্টকের ন্যায় বিস্তৃত থাকিতে দেখা যায়। পাতাগুলি মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখিতে। ফলগুলি শাখার সহিত সংলগ্ন থাকাকালীন ও বীজ মুক্ত হইবার পূর্বে ফলের মধ্যেই বীজের অংকুরোদ্গম হয়। অবশেষে অঙ্কুরিত বীজ অংকুরিত দীর্ঘ, স্থূলও ছুঁচাল অগ্রভাগ সম্পন্ন বীজ পত্রাবকাণ্ড (hypocotyle) কর্দমাক্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত হয় এবং শীঘ্রই পুনরায় অংকুরিত হইয়া বীজটিকে মৃত্তিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এই প্রকার অঙ্কুরোদ্গমকে **জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম** (viviperous germination) বলে। অতএব শ্বাসমূল উৎপাদন ও জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম হইল লবণাম্বুজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। সুন্দরী গাছের ক্ষেত্রে অবশ্য জরায়ুজ অংকুরোদ্গম দেখা যায় না।

VI. পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ (Epiphytes)

পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ অপর উদ্ভিদ দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে কিন্তু ইহা হইতে খাদ্য আহরণ করে না। বিভিন্ন প্রকার রাসনা (orchids), কয়েক প্রকার মস (mosses),

ফার্ন (ferns), লাইকেন (Lichens) প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অতিশয় অল্প বলিয়া পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ কিছু জাঙ্গল উদ্ভিদের ন্যায় চরিত্র ধারণ করে। ইহাদের সাধারণত দুই প্রকার অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। এক প্রকার অস্থানিক মূলের সাহায্যে ইহারা উদ্ভিদটিকে আশ্রয় দাতা উদ্ভিদের সহিত আবদ্ধ রাখিতে সাহায্য করে এবং অপর প্রকার মূলগুলি বাতাসে ঝুলিয়া থাকে যাহাদের **বায়বীয় মূল** (aerial roots) বলে। এই-বায়বীয় মূলের অভ্যন্তরিক গঠন পরীক্ষা করিলে এক প্রকার বহু স্তরের প্যারেনকাইমা কোষ যুক্ত বিশেষ আবরণ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাকে **ভেলামেন** (Valamen) বলে। ইহা বায়ু হইতে জলীয় বায়ু শোষণে অংশ গ্রহণ করে: উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে ডিসচিডিয়া (*Dischidia rafflesiana*) এক পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ দেখা যায় যাহার পাতা ভবিষ্যতের জন্য জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে কলসীর ন্যায় আকার ধারণ করে। এই জল পর্ব সন্ধি হইতে নির্গত কলসীর মধ্যে অস্থানিক মূল কর্তৃক শোষিত হয়। টিলান্ডসিয়া বালবোসা (*Tillandsia bulbosa*) উদ্ভিদের পাতাগুলি একত্রিত হইয়া একটি পাত্রের ন্যায় আকার ধারণ করে এবং ইহাতে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করিয়া রাখে। অবশেষে এই জল পাত্রমধ্যস্থ শল্কপত্রের দ্বারা শোষিত হয়।

জলজ উদ্ভিদ, জাঙ্গল উদ্ভিদ ও লবণাম্বুজ উদ্ভিদের মধ্যে তুলনা
(Comparison between hydrophytes, xerophytes and halophytes)

জলজ উদ্ভিদ (Hydrophytes)	জাঙ্গল উদ্ভিদ (Xerophytes)	লবণাম্বুজ উদ্ভিদ (Halophytes)
1. মূল সুগঠিত নহে। কখন কখন মূল কখনই উৎপন্ন হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে মূল-রোম বা মূলত্রাণ গঠিত হয় না।	1. মূল সুগঠিত। প্রধান মূল মৃত্তিকার গভীরে প্রবেশ করে ও শাখামূলগুলি চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করে।	1. প্রধানমূল সুগঠিত কিন্তু মৃত্তিকার গভীরে প্রবেশ করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্বাসমূল দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন স্তম্ভমূল বা ঠেসমূল উৎপন্ন হয়।
2. নিমজ্জিত উদ্ভিদগুলি সাধারণত ভূনিম্নস্থ কাণ্ড বা রাইজোমের দ্বারা বিস্তার লাভ করে এবং বহুসংখ্যক অস্থানিক মূল দ্বারা মৃত্তিকায় আবদ্ধ থাকে।	2. কাণ্ড বায়বীয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাড়াভাবে উৎপন্ন হয়। কখন কখন কাণ্ড পাতার ন্যায পর্ণকাণ্ড অথবা ক্ল্যাডোডে পরিণত হয়	2. বায়বকাণ্ড অতীব সুগঠিত এবং প্রচুর শাখা-প্রশাখাযুক্ত। উদ্ভিদটি গুল্ম হইলে সাধারণত শয়ান অবস্থায় মৃত্তিকার উপর বর্ধিত হয়

জলজ উদ্ভিদ (Hydrophytes)	জাঙ্গল উদ্ভিদ (Xerophytes)	লবণাম্বুজ উদ্ভিদ (Halophytes)
3. কাণ্ড নরম ও নমনীয়। কখন কখন পর্বমধ্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।	3. কাণ্ড দৃঢ় ও সুগঠিত।	3. কাণ্ড নরম হইতে কঠিন সর্বপ্রকার হইতে পারে।
4. বিভিন্ন আকৃতির পাতা দেখিতে পাওয়া যায়। নিমজ্জিত পাতা পাতলা ও অতি-খণ্ডিত এবং পাতা বড়, অখণ্ডিত অথবা ঈষৎ খণ্ডিত হইতে পারে।	4. পাতা পাতলা অথবা দৃঢ়, পুরু এবং চর্মবৎ হইতে পারে। কখন কখন পাতা কণ্টকে পরিণত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পাতা কখনই গঠিত হয় না।	4 পাতা দেখিতে পুরু। ইহা চমসাকার, উপবৃত্তাকার, আয়ত অথবা শল্কপত্রে পরিণত হইতে পারে।
5. কাণ্ড অথবা পত্রতলে রোম অথবা মোমের আবরণ দেখা যায় না।	5. পত্রতলে মোম সঞ্চিত হয় ও রোম দ্বারা আবৃত থাকে।	5. জাঙ্গল উদ্ভিদের অনুরূপ।
6. ত্বকের উপরিভাগে কিউটিকল গঠিত হয় না।	6. কিউটিকল সুগঠিত।	6. জাঙ্গল উদ্ভিদের অনুরূপ।
7. পত্ররন্ধ্র সাধারণত দেখা যায় না কিন্তু দেখা যাইলেও ইহা পাতার উপরিতলে দেখা যায়।	7. পত্ররন্ধ্র পাতার নিম্নতলে অবস্থিত। কখন কখন ইহাদিগকে গহ্বরে নিমজ্জিত দেখা যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রোম দ্বারা আবৃত থাকে।	7. পত্ররন্ধ্র পাতার নিম্নতলে অবস্থিত।
8 উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে বায়ুবকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।	8. বায়ুবকাশ দেখা যায় না কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধস্ত্বকে জল সঞ্চয় কলা দেখা যায়। ত্বক-কোষে কখন কখন মিউসিলেজ দেখিতে পাওয়া যায়।	8. জাঙ্গল উদ্ভিদের অনুরূপ
9. মেসফিল কলা কদাচিৎ প্যালিসেড ও স্পঞ্জ কলায় বিভেদিত।	9 মেসফিল কলা প্যালিসেড ও স্পঞ্জ কলায় বিভেদিত ও কোষ মধ্যবর্তী স্থান অতিশয় ক্ষুদ্র।	9. জাঙ্গল উদ্ভিদের অনুরূপ।

জলজ উদ্ভিদ (Hydrophytes)	জাঙ্গল উদ্ভিদ (Xerophytes)	লবণাম্বুজ উদ্ভিদ (Halophytes)
10. স্তম্ভন কলা সুগঠিত নহে।	10. স্তম্ভন কলা সুগঠিত।	10. স্তম্ভন কলা সুগঠিত নহে।
11. গ্রন্থিযুক্ত রোম অথবা বহিঃক্ষরিত কোষ উৎপন্ন হয় না।	11. গ্রন্থিযুক্ত রোম ও বহিঃক্ষরিত কোষ দেখিতে পাওয়া যায়।	11. অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাইড্রাথোডের ন্যায় বহিঃক্ষরিত কোষ দেখিতে পাওয়া যায়।
12. প্রস্বেদন হার হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।	12 প্রস্বেদন হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং রোম, মোম ও গহ্বরে নিমজ্জিত পত্ররন্ধ্র গঠনের দ্বারাও প্রস্বেদন হার নিয়ন্ত্রিত হয়।	12 জাঙ্গল উদ্ভিদের ন্যায় এবং পাতার বিভিন্ন প্রকার রূপান্তর দ্বারা প্রস্বেদন হার নিয়ন্ত্রিত হয়।
13 অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্ভিদের সমগ্র অংশ জল, খনিজ লবণ শোষণে অংশ গ্রহণ করে।	13. গভীর মৃত্তিকায় আবদ্ধ মূল দ্বারা জল ও	13. লবণাক্ত মৃত্তিকায় উদ্ভিদ জন্মায় বলিয়া মূল কর্তৃক ধীরে জল ও খনিজ লবণ শোষিত হয়।
14. মৃদগত কাণ্ডের দ্বারা উদ্ভিদের অঙ্গজ বিস্তার সম্পন্ন হয়। বীজ দ্বারা বিস্তার কদাচিৎ দেখা যায়।	14. প্রধানত বীজ দ্বারা উদ্ভিদের বিস্তার হয়।	14 প্রধানত বীজ দ্বারা উদ্ভিদের বিস্তার হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বীজের জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম দেখিতে পাওয়া যায়।
15. শ্বাসমূল কদাচিৎ দেখা যায়।	5. শ্বাসমূল দেখা যায় না	15. শ্বাসমূল দেখা যায়।

5

বাস্তব্য-তন্ত্র

Ecosystem

পরিবেশের সহিত উদ্ভিদ, প্রাণী ও মৃত্তিকার পারস্পরিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। উদ্ভিদ, প্রাণী ও মৃত্তিকার গঠন ও বিস্তার জলবায়ু কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। পরন্তু মৃত্তিকান্তরে উদ্ভিদের বিস্তার প্রকৃতির চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিস্তার পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃত পক্ষে কোন জীবই একান্তভাবে একাকী বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সুষ্ঠুভাবে জীবন ধারণ করিতে হইলে একদিকে পরিবেশ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঙ্গে এবং অপরদিকে জল, বায়ু, মৃত্তিকা, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিমাণ প্রভৃতি ভৌত রাসায়নিক উপাদানগুলির (components) সহিত সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। এই পারস্পরিক জটিল বিক্রিয়াকে জৈব জটিলতা (biotic complex) বা বাস্তব্য-তন্ত্র (ecosystem) বলা হয়। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে উদ্ভিদ, প্রাণী ও জীবাণুগুলি পারস্পরিক সাহায্য ও বিস্তারের দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে ভৌত ও রাসায়নিক পদার্থগুলি চক্রাকারে আনিয়া ব্যবহার করিয়া প্রকৃতিতে একটি স্থায়ী বসবাস নীতি গঠন করিয়া জীবনধারণ করে। ই পি ওডাম (E. P. Odum) নামক বিশেষজ্ঞের মতে **বাস্তব্য-তন্ত্র** (ecosystem) বলিতে জীব, প্রকৃতি ও উহাদের আনুষঙ্গিক উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিক্রিয়ার মূল কার্যকরী একক (basic functional unit) বুঝায়।

বাস্তব্য তন্ত্রের উপাদান (Components of ecosystem)—পূর্বে বলা হইয়াছে যে জীবিত উদ্ভিদ, প্রাণী ও মৃতপরিবেশ লইয়া বাস্তব্য-তন্ত্র গঠিত। সমগ্র জীবিত সম্প্রদায়কে বাস্তব্য-তন্ত্রের **জৈব উপাদান** (biotic components) বলা হয় এবং অপর নির্জীব পদার্থকে **অজৈব উপাদান**(abiotic components) বলে।

A অজৈব উপাদান (Abiotic components)

অজৈব উপাদান নিম্নলিখিত পদার্থ দ্বারা গঠিত :

1. **অজৈব পদার্থ** (Inorganic substances)—ইহা জল ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফসফেট, নাইট্রেট ও সালফেটের বিভিন্ন প্রকার লবণ ও অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি বিভিন্ন গ্যাসের সমষ্টি যাহারা সবুজ [illegible]দের পুষ্টিসাধন করে।

2, **জৈব পদার্থ** (Organic substances)—ইহা মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিশ্লিষ্ট দেহ হইতে উৎপন্ন প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, লাইপিড, প্রভৃতি জৈব পদার্থ এবং বিশ্লেষণ শেষে গঠিত হিউমাস (humus), ইউরিয়া প্রভৃতির সমষ্টি। জীবিত উদ্ভিদ ও প্রাণী ইহাদের দ্বারা পুষ্টি সাধন করে। মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ ও লবণ দ্বারা গঠিত। মৃতজীবী ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাকের সহায়তায় ঐ সকল খনিজ পদার্থ অজৈব পদার্থে পরিণত হয় যাহা পুনরায় উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত হয়।

3. **ভৌত বিক্রিয়া** (Physical activity)—পরিবেশের এই অংশ আলোক, তাপমাত্রা, বায়ু প্রভৃতি লইয়া গঠিত। সৌরশক্তি হইল প্রধান ভৌত উপাদান যাহা সবুজ

বর্ণ উদ্ভিদের প্লাস্টিড কর্তৃক শোষিত হয়। ইহা রাসায়নিক শক্তিরূপে জৈব খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। এই শক্তিই সমগ্র জীবিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবাহিত হয় ও জীব সম্প্রদায়কে রক্ষা করিয়া চলে।

B. **জৈব উপাদান (Biotic components)**

ইহা উদ্ভিদ, প্রাণী ও জীবাণু লইয়া গঠিত। ইহাদের সকলেরই জীবনধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য হইতে ইহারা শক্তি আহরণ করে। সকল শক্তিরই প্রধান **উৎস** হইল সৌর শক্তি যাহা বাস্তব্য-তন্ত্রের সকল জীবিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবাহিত হয়। জীবদিগকে কতকগুলি খাদ্য স্তরে বা শক্তি স্তরে (energy level) ভাগ করা হইয়াছে। প্রতি স্তরকে **ট্রফিক স্তর** (trophic level) বলে। বিভিন্ন ট্রফিক স্তর নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

1. **অটোট্রফ** (autotrophs)—অটোট্রফ বলিতে সালোকসংশ্লেষকারী উদ্ভিদ বুঝায়। সৌর শক্তির সহায়তায় ইহারা অজৈব পদার্থ হইতে জৈব খাদ্য প্রস্তুত করে এবং অক্সিজেন পরিত্যাগ করে যাহা জীবিত সম্প্রদায়ের জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। জৈব খাদ্যের মধ্যেই সৌর শক্তি সঞ্চিত থাকে। সালোক সংশ্লেষকারী উদ্ভিদকে **প্রাথমিক উৎপাদক** (Primary producer) বলে।

2. **হেটারোট্রফ** (heterotrophs)—ইহাদের ক্লোরোফিল থাকে না এবং সবুজ বর্ণের উদ্ভিদ অর্থাৎ উৎপাদকের দেহ হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করে। ইহারা প্রধানত প্রাণী এবং ইহারা খাদক (consumers) নামে পরিচিত। ইহাদিগকে নিম্নলিখিত ট্রফিক স্তরে ভাগ করা হইয়াছে।

(a) **তৃণভোজী প্রাণী** (Herbivores)—ইহারা কতিপয় পরভোজী প্রাণী যাহারা পূর্বোক্ত সালোক সংশ্লেষকারী উদ্ভিদকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। ইহাদের **প্রথম পর্যায়ের খাদক** (consumers of the first order) বলা হয়। উৎপাদক কর্তৃক প্রস্তুত কিয়ৎ পরিমাণ খাদ্য ইহাদের দেহ গঠনে ব্যবহৃত হয়। ফড়িং (grasshopper), প্রজাপতি (butterfly), মৌমাছি (honey bees)প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ নেংটি ইঁদুর (mouse), গরু (cow), হরিণ (deer), ছাগল (goat), হাতি (elephant) প্রভৃতি পশু এবং তোতাপাখী (parrot), বুলবুল (bulbul) প্রভৃতি পক্ষী এই পর্যায়ের অন্তর্গত।

(b) **মাংসাশী প্রাণী** (Carnivores)—ইহারা উপরোক্ত তৃণভোজী প্রাণীদিগকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করে। সেইজন্য ইহাদিগকে **দ্বিতীয় পর্যায়ের খাদক রূপে** (consumers of the second order) বলিয়া গণ্য করা হয়। ঝিঁঝি পোকা (crickets), গুবরেপোকা (beetler) প্রভৃতি পতঙ্গ, ব্যাঙ (frogs and toads), টিকটিকি (lizards), সর্প (snakes), কাক (crow), চড়ুই পাখী (sparrows), কাঠ ঠোক্‌রা (wood pecker) প্রভৃতি পক্ষী এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

(c) **সর্বোচ্চ মাংসাশী প্রাণী** (Top carnivores)—ইহারা অপর প্রাণী কর্তৃক খাদ্যরূপে গৃহীত হয় না ; পরন্তু ইহারা উপরোক্ত মাংসাশী প্রাণীদিগের বিনাশ সাধন করিয়া খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। কুমির (crocodiles), হাঙর (sharks), পেঁচা (owl), চিল (kite), বাজপাখী (hawk), সারসপাখী (stork), হাঁস (duck), শঙ্খচীল (gulls), ব্যাঘ্র (tiger), সিংহ (lion), প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

C. **বিশ্লিষ্টকারক** (**Decomposers**)

ইহারা কতিপয় মৃতজীবী ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া যাহারা মৃত উৎপাদক ও খাদকের দেহ আক্রমণ করে এবং জটিল রাসায়নিক পদার্থকে প্রয়োজনীয় সরল পদার্থে পরিণত করে, যাহা উৎপাদকের জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশক।

বাস্তব্যতন্ত্রের মাধ্যমে শক্তির প্রবাহ (Energy flow through ecosystem)

সবুজ বর্ণের উদ্ভিদই একমাত্র সৌরশক্তিকে খাদ্যশক্তিতে (food energy) স্থিতীকরণ করে। পরভোজী প্রাণী ও উদ্ভিদ খাদ্যের জন্য সবুজবর্ণের উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে এবং খাদ্য মধ্যে সঞ্চিত শক্তি আহরণ করে। সেইজন্য সবুজ বর্ণের উদ্ভিদকে প্রাথমিক উৎপাদক (Primary producer) বলা হয়।

পৃথিবীর উপর পতিত প্রায় 55 শতাংশ আলোক সবুজ বর্ণের উদ্ভিদ শোষণ করে। ইহারও প্রায় অর্ধাংশ ক্লোরোপ্লাস্ট কর্তৃক শোষিত হয়। সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় মাত্র এক শতাংশ আলোক খাদ্যশক্তির মধ্যে স্থিতিকরণ হয়। এই সৌর শক্তিই উৎপাদক হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন পর্যায়ের খাদকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। এইরূপে ক্রমপর্যায়ে শক্তির প্রবাহকে খাদ্যশৃঙ্খল (food chain) বলে। বিশ্লিষ্টকারক ব্যাকটিরিয়াও ছত্রাক আবার মৃত উৎপাদক ও সর্বস্তরের খাদক হইতে শক্তি আহরণ করে।

বাস্তব্যতন্ত্রে একাধিক খাদ্যশৃঙ্খলও থাকিতে পারে। ইহারা পরস্পরের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া চলে এবং ইহাদের ফুড ওয়েব (food web) বলে।

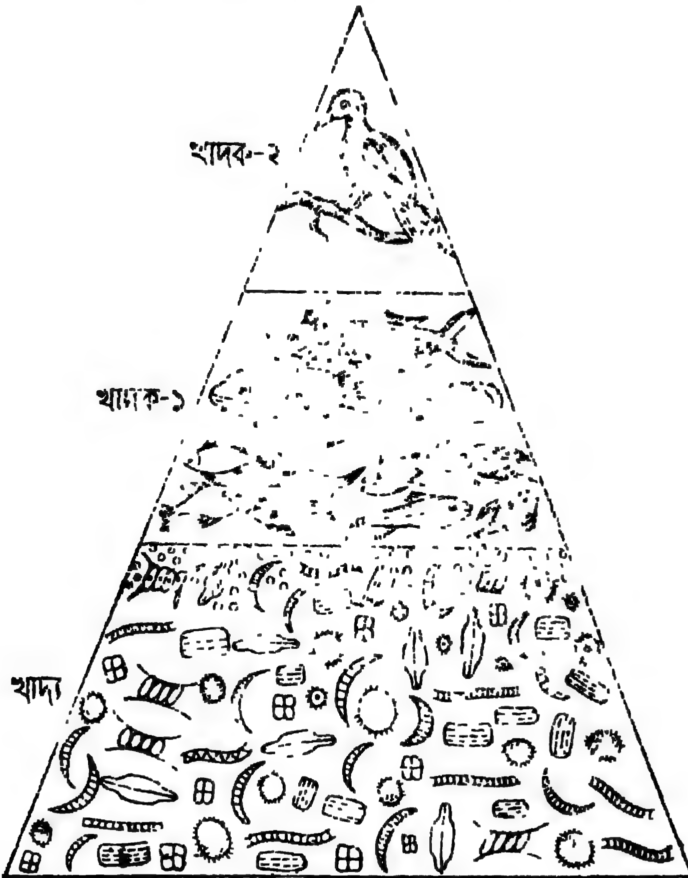
দেখা গিয়াছে যে যখনই একটি ট্রফিক স্তর হইতে পরবর্তী ট্রফিক স্তরে শক্তি প্রবাহিত হয়, তখন প্রায় ৭০ শতাংশ শক্তি তাপশক্তিরূপে বিনষ্ট হয়। এইরূপে ক্রমপর্যায়ে অবস্থিত খাদকগুলির মধ্যে শক্তি সঞ্চয়ের পরিমাণও হ্রাস পাইতে থাকে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে ক্রম পর্যায় অবস্থিত খাদকগুলির সংখ্যাও হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

বাস্তু সংস্থানিক পিরামিড (Ecological pyramids)

বাস্তব্যতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খল বলিতে প্রাথমিক উৎপাদক হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বোচ্চ খাদক পর্যায় পর্যন্ত কতকগুলি খাদ্যস্তর বুঝায়। প্রতি খাদ্য শৃঙ্খলের এক একটি ধাপ। এই ধাপগুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে বাস্তব্যতন্ত্রের একটি নির্দিষ্ট কার্যকর গঠন বা আকৃতি আছে। দেখা গিয়াছে যে, এই সুনির্দিষ্ট আকৃতিকে পিরামিড আকারে প্রকাশ করা যায়। ইহাকে

বাস্তু সংস্থানিক পিরামিড (ecological pyramid) বলে। উক্ত পিরামিডের নিম্নদিকে প্রাথমিক উৎপাদকের স্থান এবং ক্রমপর্যায়ভুক্ত খাদকগুলি যথাক্রমে উপরিভাগে অবস্থান করে প্রতি ট্রফিকস্তরে জীবদিগের সংখ্যা, জীবদেহের ভর অথবা শক্তি প্রবাহের দ্বারা তিন প্রকার পিরামিড গঠন করা যায় :

1. জীবদিগের সংখ্যাজনিত পিরামিড (Pyramid of num ers)—এই ক্ষেত্রে প্রতি ট্রফিক স্তরে প্রতি একক ক্ষেত্রফল যুক্ত স্থানে জীবদিগের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। প্রাথমিক উৎপাদকের জীবদেহের আকারের উপর পিরামিডের আকার নির্ভর করে। খাদকের তুলনায় প্রাথমিক উৎপাদক ক্ষুদ্রাকার হইলে পিরামিড খাড়া হয়। দেখা গিয়াছে যে পুষ্করিণীর বাস্তব্যতন্ত্রে প্রাথমিক উৎপাদক হইল সবুজ বর্ণের শৈবাল ও ক্ষুদ্রাতি



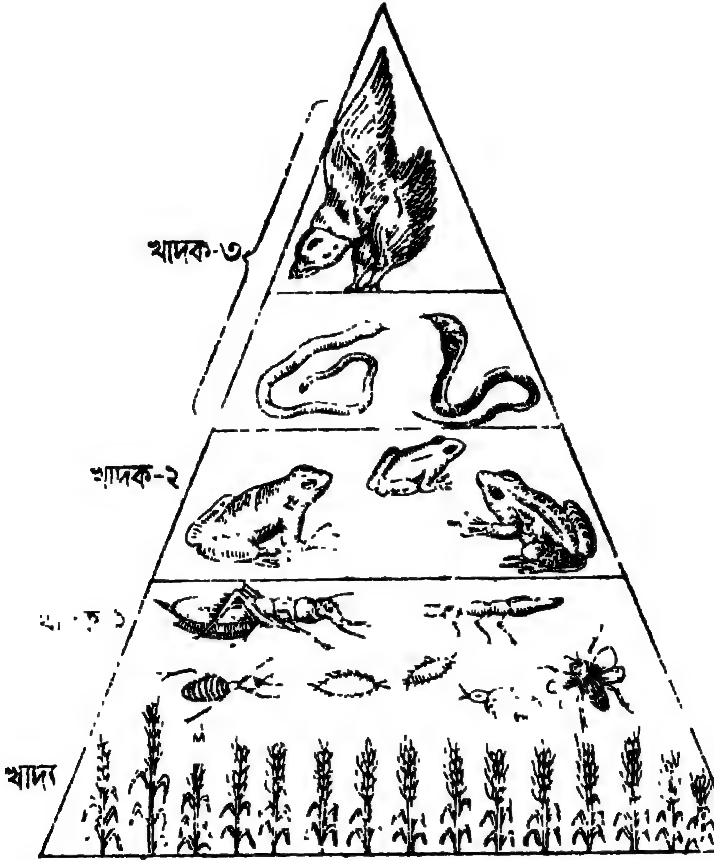
১৯১ নং চিত্র—পুষ্করিণীর বাস্তব্যতান্ত্রিক পিরামিড

ক্ষুদ্র ডায়াটম প্রভৃতি। ইহাদের সংখ্যাও অত্যধিক। সেইজন্য পিরামিডের নিম্নভাগ দেখিতে বৃহৎ ও প্রশস্ত। উৎপাদকদিগের সংখ্যা ক্রমপর্যায়ে হ্রাস পাইতে থাকে। সেই জন্য এই ক্ষেত্রে খাড়া পিরামিড গঠিত হয়। শস্যক্ষেত্রের পিরামিডের আকৃতিও অনুরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু বৃক্ষযুক্ত বাস্তব্যতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎপাদক হইল বৃক্ষ এবং সেইজন্য এই ক্ষেত্রে উল্টান পিরামিড গঠিত হয়।

2. জীবদিগের ভরজনিত পিরামিড (Pyramid of biomass)—বিভিন্ন ট্রফিক

স্তরে একক ক্ষেত্রফল যুক্ত স্থানে জীবদেহের ওজন অনুযায়ী এইপ্রকার পিরামিড গঠিত হয়। প্রাথমিক উৎপাদকের ওজন অধিক হইলে এবং বিভিন্ন খাদকস্তরের ওজন ক্রম-পর্যায়ে হ্রাস পাইলে একটি খাড়া পিরামিড গঠিত হয়। সাধারণত বনভূমির বাস্তব্য-তন্ত্রে এই প্রকার খাড়া পিরামিড গঠিত হয়। কিন্তু পুষ্করিণীর বাস্তব্যতন্ত্রে বিপরীত ঘটনা পরিলক্ষিত হয় বলিয়া উল্টান পিরামিড উৎপন্ন হয়।

3. **শক্তিজনিত পিরামিড** (Pyramid of energy)—ট্রফিক স্তরের স্তরগুলিতে ধাপে ধাপে শক্তি প্রবাহিত হয়। উৎপাদক হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বোচ্চ খাদক স্তর



১৯২ নং চিত্র—স্থলভাগের বাস্তব্যতান্ত্রিক পিরামিড

পর্যন্ত প্রতি ধাপে তাপশক্তিরূপে শক্তির অপচয় হয়। অতএব এই ক্ষেত্রে একটি খাড়া পিরামিড গঠিত হয়। মনে রাখিতে হইবে যে বাস্তব্যতন্ত্রের সকল ক্ষেত্রেই শক্তিজনিত পিরামিডের আকৃতি খাড়া হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ শারীরবিদ্যা

১ কোলয়ডীয় দ্রবণ
(Colloidal Solution)

লবণ অথবা শর্করা জলে দ্রবীভূত করিলে যে দ্রবণ উৎপন্ন হয় উহাতে লবণ অথবা শর্করার আকৃতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় এবং উহারা অণু অথবা আয়নে বিভেদিত হইয়া জলে ইতস্ততঃ ভাসমান অবস্থায় থাকে। ইহাকেই প্রকৃত দ্রবণ বলা হয়। কিন্তু খড়িমাটির অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ লইয়া জলে নিক্ষেপ করিলে যে দ্রবণ উৎপন্ন হয় তাহাতেও ঐ চূর্ণগুলি ভাসমান অবস্থায় থাকে কিন্তু পরে উহা থিতাইয়া পাত্রের তলদেশে জমা হয়। এই প্রকার দ্রবণকে suspension বা অবলম্বন বলে। আবার তৈল এবং জলের মিশ্রণ লইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে দেখা যাইবে যে তৈল জল হইতে পৃথক হইয়া উপরে ভাসিতে থাকে। এইরূপ দ্রবণকে emulsion বা অবদ্রব বলে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অবলম্বন ও অবদ্রব উভয় প্রকার দ্রবণেই পদার্থের নিজ নিজ আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। এবং দ্রবণের পদার্থগুলি কিয়ৎক্ষণ রাখিবার পর পরস্পর পৃথক হইয়া যায় বলিয়া ইহা অস্থায়ী দ্রবণ। অস্থায়ী অবদ্রবের ক্ষেত্রে emulsifier বা অবদ্রব ধারক পদার্থ দ্রবণে মিশ্রিত করিলে স্থায়ী অবদ্রব প্রস্তুত করা যায়। এই প্রকার অবলম্বন বা অবদ্রবকে colloidal solution বা কোলয়ডীয় দ্রবণ বলা হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে কোলয়ডীয় দ্রবণের দুইটি phase বা দশা আছে ; যথা, dispersing বা continuous phase বা অবিচ্ছিন্ন দশা অর্থাৎ যে দশায় মাধ্যমটি পদার্থের কণিকাগুলিকে বিক্ষিপ্ত বা অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় ধারণ করিয়া রাখে এবং dispersed বা discontinuous phase বা বিচ্ছিন্ন দশা অর্থাৎ যে দশায় পদার্থের কণিকাগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মাধ্যমে অবস্থান করে

কোলয়ডীয় দ্রবণ তরল হইলে তাহাকে সল (sol) বলে এবং সল ক্রমশ ঘনীভূত হইলে তখন ইহাকে জেলীর ন্যায় দেখিতে হয়। এইরূপ ঘনীভূত সলকে gel (জেল) বলে।

প্রোটোপ্লাজমের কোলয়ডীয় ধর্ম (Colloidal properties of Protoplasm)

অতি উচ্চ শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটোপ্লাজমকে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ইহাতে এক প্রকার চর্বিজাতীয় পদার্থ একটি তরল মাধ্যমে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে। সেই কারণে প্রোটোপ্লাজমকে অবদ্রব শ্রেণীর অন্তর্গত কোলয়ডীয় দ্রবণ বলিয়া গণ্য করা হয়

প্রোটোপ্লাজমের বহির্ভাগে একটি পাতলা membrane বা ঝিল্লী থাকে যাহা প্রোটোপ্লাজমকে বহির্মাধ্যম হইতে পৃথক করিয়া রাখে। অনুরূপে সাইটোপ্লাজম ও ভ্যাকুওলের সংযোগ স্থলে অপর একটি পাতলা ঝিল্লী থাকে। এই ঝিল্লীগুলিকে যথাক্রমে outer and inner plasma membranes বা বহিঃ এবং অন্তঃপ্লাজমা ঝিল্লী বলা হয়। এই ঝিল্লীগুলি semipermeable বা আংশিক ভেদ্য অর্থাৎ ইহাদের মধ্য দিয়া diffusion বা ব্যাপনক্রিয়ার দ্বারা বহিঃস্থ জল কোষমধ্যে প্রবেশ করে। প্রোটোপ্লাজমের কোলয়ডীয় ধর্ম আছে বলিয়া এই প্রকার ব্যাপনক্রিয়া সম্ভবপর।

প্রোটোপ্লাজমের তাপমাত্রা অথবা অম্লতার পরিবর্তন সাধন করিলে অথবা ইহাকে বিদ্যুৎ স্পর্শ করিলে ইহার viscosity বা সান্দ্রতার পরিবর্তন হয়। এই প্রকার গুণ কোলয়ডীয় দ্রবণেও দেখিতে পাওয়া যায়।

কোলয়ডীয় কণাগুলিকে বিশেষ প্রকৃতির অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ইহাদের ইতস্ততঃ চলন আছে। এই প্রকার চলনকে Brownian movement বা ব্রাউনীয় চলন বলে। কোলয়ডীয় কণিকাগুলির বিভিন্ন দশায় পজিটিভ অথবা নেগেটিভ আধানযুক্ত হয়। সমধর্মী আধানযুক্ত কণিকাগুলির পরস্পর বিকর্ষণের ফলেই ব্রাউনীয় চলন দেখা যায় কিন্তু ইহাদের মধ্যে কখনই সংঘাত ঘটে না। কণিকাগুলি কোনো নির্দিষ্ট আকার অতিক্রম করিলেই ব্রাউনীয় চলন বন্ধ হইয়া যায়। জলে ভাসমান pollen grains বা পরাগের ব্রাউনীয় চলন সহজেই দেখা যায়।

কোলয়ডীয় দ্রবণের মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি পাঠাইলে দেখা যাইবে যে দ্রবণের মধ্যে রশ্মিটি স্পষ্ট উজ্জ্বল আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার কারণস্বরূপ বলা যায় যে আলোক রশ্মিটি কোলয়ডীয় কণাগুলি কর্তৃক polarised বা সমবর্তিত হয় বলিয়া দ্রবণের মধ্যে ইহা উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হয় কিন্তু কণিকাগুলি ইহাতে দৃষ্টিগোচর হয় না। এইরূপ ঘটনাকে Tyndal phenomena বা টিণ্ডাল ঘটনা বলে।

বিভিন্ন পদার্থ কর্তৃক কঠিন অথবা জলীয় পদার্থের অতিশয় পাতলা স্তরকে ধারণ করিয়া রাখিবার ক্ষমতাকে অ্যাডসর্পশন (adsorption) বলে। ইহা অবিদিত নহে যে স্টার্চ আয়োডিনের সংস্পর্শে আসিলে ইহা নীল হইতে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এই ক্ষেত্রে স্টার্চ আয়োডিনের দ্রবণকে অ্যাডসর্পশন প্রক্রিয়ায় ধারণ করিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়া সাধন করে। অনুরূপে উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর, ক্রোমোজোম প্রভৃতি অ্যাডসর্পশন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন stains বা রঞ্জক পদার্থ গ্রহণ করে। প্রোটোপ্লাজমের কোলয়ডীয় ধর্ম আছে বলিয়া প্রায় সকল জীবিত কোষেই অ্যাডসর্পশন দেখা যায়। বিভিন্ন উৎসেচক (enzyme) কর্তৃক উদ্ভিদের বিপাকীয় কার্য প্রধানত জলের অ্যাডসর্পশনের ফলেই সংঘটিত হয়।

শোষণ এবং অ্যাডসর্পশনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between absorption and adsorption)

শোষণ	অ্যাডসর্পশন
1. এই প্রক্রিয়ায় capillary force বা কৈশিক শক্তি ক্রিয়া করে।	1. এই প্রক্রিয়ায় surface force বা তরলের উপরিস্তর হইতে উদ্ভূত শক্তি ক্রিয়া করে।
2. ইহা cohesion বা সংশক্তি প্রণালীর বশবর্তী।	2. ইহা অ্যাঢেশন (adhesion) প্রণালীর বশবর্তী।
3. স্পঞ্জ বা ব্লটিং কাগজ কর্তৃক জলশোষণ হইল ইহার উদাহরণ।	3. কাঠ কয়লা কর্তৃক রঞ্জক পদার্থ গ্রহণ হইল ইহার উদাহরণ।

ইমবাইবিশন (Imbibition)

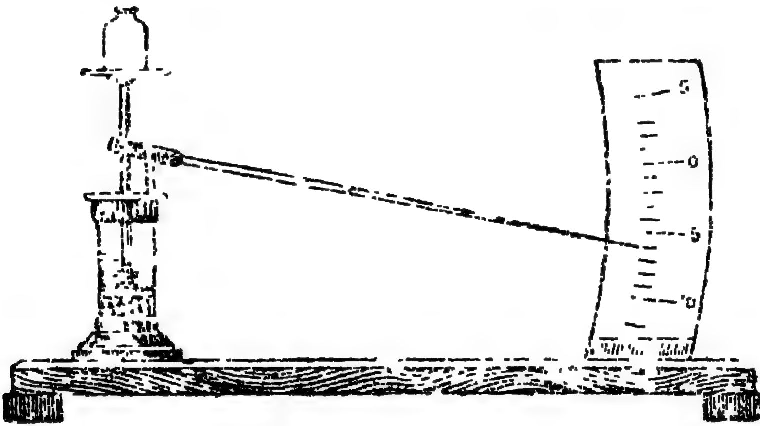
শুষ্ক অথবা আংশিক শুষ্ক অবস্থায় বহু পদার্থই জল শোষণ করে। এই শোষণের ফলে উহাদের আয়তন বৃদ্ধি পায়। এই ঘটনাকে ইমবাইবিশন (imbibition) বলে। সেলুলোজ, স্টার্চ, প্রোটিন, গদ প্রভৃতি বহু প্রকার পদার্থের এইরূপ জল শোষণ করিবার ক্ষমতা দেখা যায়। জলের অভাব ঘটলে ঐ সকল পদার্থের আয়তন সংকুচিত হয়। ইহা প্রধানত osmosis বা অভিস্রবণের ন্যায় একপ্রকার diffusion বা ব্যাপন-ক্রিয়া এবং সম্ভবত capillarity বা কৈশিকত্ব ইহাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। যে সকল পদার্থের এইরূপ ইমবাইবিশন দেখা যায় তাহাদের অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে যাহার মধ্য দিয়া জল উহাতে প্রবেশ করে। উহাদের সহিত জলের এক প্রকার আকর্ষণ শক্তিও ক্রিয়া করে। ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় পদার্থ এবং তরলের মধ্যে একটি সম্পর্ক দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একখণ্ড রবার প্রচুর ইথার শোষণ করিতে পারে কিন্তু জল শোষণ করিতে পারে না, কিন্তু ফার্ন গাছের শুষ্ক রেণু অথবা অঙ্কুরিত হইবার সময় বীজ প্রচুর জল শোষণ করে ; কিন্তু ইথার শোষণ করিতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে যে জীবিত উদ্ভিদ কোষ ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র জল শোষণ করে। কোষমধ্যস্থ জলের diffusion pressure বা ব্যাপন চাপ এবং বহিঃস্থ জলের ব্যাপন চাপের মধ্যে যতক্ষণ পার্থক্য থাকিবে ততক্ষণ ইমবাইবিশন প্রক্রিয়া সংঘটিত হইতে থাকিবে কিন্তু উহারা পরস্পর সমান হইলেই ইহা বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহাতে পদার্থগুলি অ্যাডসর্পশন প্রক্রিয়ায় জল ধারণ করিয়া রাখে এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটি কোষপ্রাচীরের কোলয়ডীয় প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। বহিঃস্থ তরলের তাপমাত্রা, *pH*-এর মান, প্রভৃতির সহিত এই প্রক্রিয়ার সম্পর্ক রহিয়াছে এবং ইমবাইবিশন সংঘটিত হইলে বহিস্থ তরলের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায়। দেখা গিয়াছে যে ইমবাইবিশন প্রক্রিয়া

সংঘটিত হইবার পর পদার্থ এবং শোষিত জলের মিলিত ওজন ইমবাইবিশনের পূর্বে পদার্থ এবং অশোষিত ঐ জলের মিলিত ওজন অপেক্ষা কম। ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ার ফলে বহিঃস্থ তরলে প্রচুর চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপকে imbibition pressure বা ইমবাইবিশন চাপ বলে। নিম্নে ইমবাইবিশন প্রক্রিয়াটি একটি পরীক্ষার দ্বারা বুঝান হইল ঃ

১নং পরীক্ষা ঃ ইমবাইবিশন (Imbibition) - ১৯৩ নং চিত্র)

একটি ধাতব ঢাকনি সমেত কাচের পাত্র লও। ঢাকনির মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র আছে যাহার মধ্যে একটি পিস্টন (piston) প্রবেশ করান হইয়াছে। পাত্রের বাহির্ভাগে অবস্থিত পিস্টন দণ্ডের শেষপ্রান্তে একটি ওজন রাখিবার পাত্র আছে। এই পাত্রের কিছু নিম্নে একটি নির্দেশক কাঁটা (pointer) এইরূপভাবে ঢোকান আছে যাহাতে উহা পিস্টনের অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে কিছুদূরে অবস্থিত সংখ্যাঙ্কিত স্কেলের উপর ঘুরিতে পারে।

এখন পাত্রের মধ্যে কিছু শুষ্ক মটরের বীজ লইয়া স্বল্প জলদ্বারা সিক্ত কর। পিস্টনটিকে এইরূপে স্থাপন কর যাহাতে ইহার বিস্তৃত প্রান্ত বীজগুলির উপরের তলকে



১৯৩ নং চিত্র [illegible]

স্পর্শ করে। এখন ওজন রাখিবার পাত্রে উপযুক্ত ওজন রাখিয়া নির্দেশক কাঁটার প্রারম্ভিক গতি লক্ষ্য কর। 2 3 ঘণ্টা পরে দেখা যাইবে যে নির্দেশক কাঁটার অবস্থানের পরিবর্তন হইয়াছে অর্থাৎ ইহা নামিয়া গিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ইমবাইবিশনের ফলে বীজগুলি ঊর্দ্ধচাপ প্রয়োগ করে। নির্দেশক কাঁটার এইরূপ অবস্থানের পরিবর্তনের হিসাব করিয়া ঊর্দ্ধচাপের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

———

২

ব্যাপনক্রিয়া ও অভিস্রবণ

(Diffusion and Osmosis)

পদার্থের Kinetic theory বা গতিসূত্র অনুযায়ী কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থের অণু অথবা পরমাণুগুলির বিভিন্ন গতিপথে সর্বদাই চলন দেখা যায়। এই প্রকার চলন কখনই gravitation বা অভিকর্ষের বশবর্তী নহে। পদার্থের এই প্রকার গুণকে diffusion বা ব্যাপনক্রিয়া বলে। বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণকে একটি membrane বা ঝিল্লীর দ্বারা পৃথক করিলে দেখা যায় যে প্রতিটি পদার্থের ক্ষেত্রে অধিক ঘনত্বের অথবা উচ্চচাপ-সম্পন্ন অণু বা আয়নগুলি সর্বদাই স্বল্প ঘনত্বের অথবা নিম্নচাপ সম্পন্ন অণু অথবা আনয়নগুলির দিকে ব্যাপিত হয়। এককথায় বলিতে গেলে ব্যাপনক্রিয়া কোনো পদার্থের অধিক কার্যকর অঞ্চল হইতে স্বল্প কার্যকর অঞ্চলে সম্পাদিত হয়।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও ব্যাপনক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অক্সিজেন পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়া উদ্ভিদকোষে ব্যাপিত হয়। অনুরূপে খনিজ লবণ ও জল, এই প্রক্রিয়ায় মূলরোমের মধ্য দিয়া উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে। সালোকসংশ্লেষ, শ্বাসকার্য, প্রস্বেদন, জলশোষণ, খাদ্য-সংবহন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জৈবনিক ক্রিয়াগুলিতে ব্যাপনক্রিয়া অতি প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে।

ঝিল্লীর মাধ্যমে ব্যাপনক্রিয়া (Diffusion through membranes)

তিন প্রকারের ঝিল্লী সচরাচর দেখা যায় ; যথা—

(*a*) *Permeable membrane* বা ভেদ্য ঝিল্লী—এই প্রকার ঝিল্লীর মধ্য দিয়া solute বা দ্রাব solvent বা দ্রাবক উভয় প্রকার পদার্থের কণিকাই ব্যাপিত হয়। নবগঠিত সেলুলোজ-নির্মিত কোষপ্রাচীর হইল এই প্রকারের ঝিল্লী।

(*b*) *Impermeable membrane* বা অভেদ্য ঝিল্লী—এই প্রকার ঝিল্লীর মধ্য দিয়া দ্রাব অথবা দ্রাবক, কোনো পদার্থের কণিকাই ব্যাপিত হয় না। সুবেরীনযুক্ত বা অতিমাত্রায় কিউটিনযুক্ত কোষপ্রাচীর হইল অভেদ্য ঝিল্লী।

(*c*) *Semipermeable membrane* বা আংশিক ভেদ্য ঝিল্লী—এই প্রকার ঝিল্লীর মধ্য দিয়া কেবল মাত্র solvent বা দ্রাবক পদার্থের কণিকাগুলিই ব্যাপিত হয় কিন্তু solute বা দ্রাব পদার্থগুলি অব্যাপিত থাকিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে osmosis বা অভিস্রবণ হইল এই প্রকার ব্যাপনক্রিয়া। মূলরোমের সেলুলোজনির্মিত কোষপ্রাচীর আংশিক ভেদ্য ঝিল্লীর ন্যায় আচরণ করে। সেইজন্য বহিস্থ কতিপয় প্রয়োজনীয় selected বা মনোনীত পদার্থের জলীয় দ্রব ইহার মধ্য দিয়া মূলরোমে প্রবেশ করে।

অভিস্রবণ (Osmosis)

কোনো পদার্থের দুইটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ, যথা, একটি লঘু এবং অপরটি ঘন একটি semipermeable membrane বা আংশিক ভেদ্য ঝিল্লীর দ্বারা পৃথক করিলে দেখা যায় যে লঘু দ্রবণ হইতে জলের অণু ব্যাপিত হয়। এই প্রকার ব্যাপনকে osmosis বা অভিস্রবণ বলে। যতক্ষণ না দুইটি দ্রবণ একই ঘনত্বে পরিণত হয় অর্থাৎ ইহার

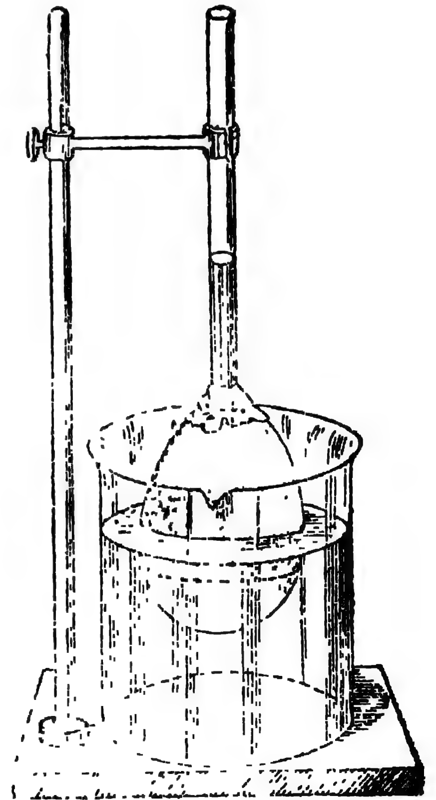
equilibrium বা সাম্য অবস্থায় উপনীত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এইরূপে অভিস্রবণ চলিতে থাকে। ঝিল্লীটি আংশিক ভেদ্য হইলেও দেখা যায় যে স্বল্প পরিমাণ জল অথবা দ্রাব পদার্থের অণু ইহার মধ্য দিয়া ঘন দ্রবণ হইতে লঘু দ্রবণে প্রবেশ করে। অভিস্রবণের ফলে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাহাকে osmotic Pressure বা অভিস্রবণ চাপ বলে।

নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলির দ্বারা অভিস্রবণ চাপ নির্ণয় করা যায় ; যথা-

২নং **পরীক্ষা :** অসমোসকোপ Osmoscope—১৯৪নং চিত্র)

১৯৪নং চিত্র—অসমোসকো

একটি কাচের ফানেল লইয়া ইহার চওড়া মুখটি একটি পার্চমেণ্ট কাগজ (parchment paper) বা মাছের পটকার (fish bladder) দ্বারা বাঁধ। ফানেল দণ্ডের সহিত একটি দীর্ঘ কাচনল রবার নলের দ্বারা সংযুক্ত কর। বাঁধন ও সংযোগ স্থলগুলি উপযুক্তরূপে জলরোধক ও বায়ুরোধক কর। এখন কাচনলের মধ্য দিয়া ফানেলের মধ্যে কিছু শর্করার দ্রবণ ঢাল ও উহার মুখটিকে একটি জলপূর্ণ বীকারে ডুবাইয়া দাও। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন কাচনলটি খাড়াভাবে থাকে। কাচনলে শর্করা দ্রবণের অবস্থান লক্ষ্য কর। 2 3 ঘণ্টা পরে পুনরায় দ্রবণের অবস্থান লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে ইহার তল কিছু উপরে উঠিয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে অভিস্রবণ (osmosis) প্রক্রিয়ায় বীকারের জল পার্চমেণ্ট কাগজ অথবা মাছের পটকার মধ্য দিয়া ফানেলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।



১৯৫নং চিত্র—ডিম্ব অসমোসকোপ

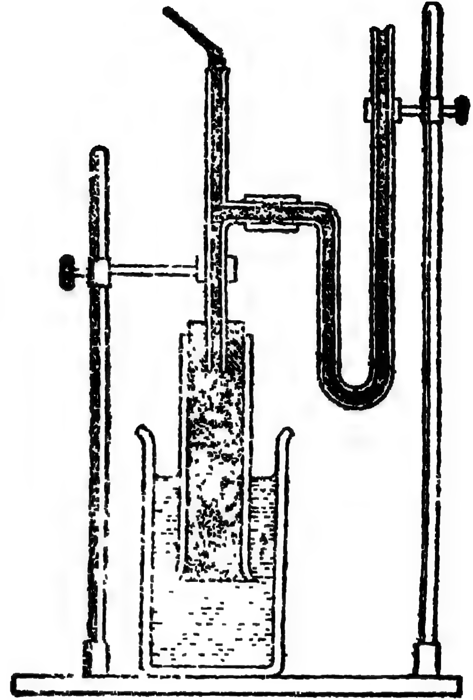
৩নং **পরীক্ষা :** ডিম্ব অসমোসকোপ (Egg osmoscope—১৯৫নং চিত্র)

একটি ডিম লইয়া উহার উপরিভাগে একটি ছিদ্র করিয়া ভিতরের অংশগুলি বাহির কর। ছিদ্রের মধ্যে একটি কাচনল সংযুক্ত করিয়া সংযোজক স্থানটিকে বায়ুরোধক কর। ডিমের খোলার প্রায় অর্ধাংশ লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলে কঠিন অংশ দ্রবীভূত হইয়া একটি পাতলা ঝিল্লী দেখা যাইবে। এখন ইহাকে ভাল করিয়া ধুইয়া ইহাতে শর্করার দ্রবণ এমনভাবে ঢাল যেন ডিমের খোলাটি সম্পূর্ণরূপে

এবং কাচনলটি আংশিক ইহার দ্বারা পূর্ণ হয়। এইবার ইহাকে জলপূর্ণ কাচের বিকারে খাড়াভাবে রাখিয়া 2-3 ঘণ্টা পরে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে কাচনলে শর্করা দ্রবণের তল বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৪নং পরীক্ষা ঃ ১৯৬নং চিত্র

একটি ক্ষুদ্র কাচের cylinder বা চোঙ লইয়া উহার একপ্রান্তে একটি পার্চমেণ্ট কাগজ দিয়া বাঁধ এবং অপর প্রান্ত রবার কর্কদ্বারা উত্তমরূপে আঁটিয়া তাহার মধ্য দিয়া একটি T-আকৃতি-বিশিষ্ট নল প্রবেশ করাও। T-নলের পার্শ্বে একটি পারদ ম্যানোমিটার (manometer) রবার নলের সাহায্যে বায়ুরোধ করিয়া যুক্ত কর। এখন T-নলের উপর হইতে ঘন শর্করার দ্রবণ এরূপভাবে ঢাল যেন চোঙ, T নল এবং ম্যানোমিটারের কিছু অংশ ইহার দ্বারা পূর্ণ এইবার চোঙটিকে জলপূর্ণ বিকারে রাখিলে কিছুক্ষণ বাদে দেখা যাইবে যে পার্চমেণ্ট কাগজের মধ্য দিয়া ইহাতে জল প্রবেশ করিয়াছে। এই জল প্রবেশের ফলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে শর্করা দ্রবণে osmotic pressure বা অভিস্রবণ চাপের সৃষ্টি হইয়াছে। ম্যানোমিটারের দুইটি বাহুর পারদতলের প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া এই চাপের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।



১৯৬নং চিত্র—অসমোসিসের পরীক্ষা

সাধারণত জীবিত উদ্ভিদকোষে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল প্রবেশ করে। কোষপ্রাচীর ও plasma membrane বা প্লাজমা ঝিল্লী semipermeable বা আংশিক ভেদ্য ঝিল্লীর ন্যায় আচরণ করে। ইহা সুদৃঢ় এবং জলভেদ্য। প্রোটোপ্লাজমে এবং cell sap বা কোষরসে প্রোটিন ও চর্বিজাত পদার্থগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ভাসমান থাকিয়া ঘন কোলয়ডীয় দ্রবণ গঠন করে। অতএব উদ্ভিদকোষে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল প্রবেশ করে। এইরূপ অভিস্রবণকে এন্ডসমোসিসও (endosmosis) বলা হয়। কিন্তু অভিস্রবণের ফলে যখন উদ্ভিদকোষ হইতে জল বাহির হইয়া আসে তখন ইহাকে এক্সসমোসিস (exosmosis) বলে। যাহাই হউক অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কোষের মধ্যে জল প্রবেশ করিলে cell sap বা কোষরস এবং elastic বা স্থিতিস্থাপক কোষ প্রাচীরের মধ্যে এক প্রকার প্রবল চাপের সৃষ্টি হয় যাহার ফলে কোষপ্রাচীরটি প্রসারিত হয়। এই প্রসারণশীলতাকে turgidity বা turgescence বা রসস্ফীতি বলে। কোষমধ্যে জল প্রবেশের ফলে যে প্রকৃত চাপের সৃষ্টি হয় তাহাকে turgour pressure বা রসস্ফীতি

চাপ বলে। কোষ সর্বোচ্চ পরিমাণ জল শোষণ করিলে তখন ইহাকে fully turgid বা সম্পূর্ণ রসস্ফীত বলা হয় এবং এই সময় ইহার রসস্ফীতি চাপের মানও সর্বোচ্চ। কোষকে সম্পূর্ণ রসস্ফীত করিতে অতিরিক্ত জল শোষিত হইতে পারে। এই অতিরিক্ত চাপকে suction pressure বা শোষণচাপ বলে।

ভি এ, গ্রীউল্যাচ (V A Greulach) নামক বিজ্ঞানীর মতে অভিস্রবণ সম্পাদন করিতে সক্ষম এইরূপ সক্রিয় কোষ এবং বিশুদ্ধ জল যদি জলভেদ্য ঝিল্লীর দ্বারা পৃথক করা হয় তাহা হইলে কোষের যে সর্বোচ্চ রসস্ফীতি চাপের সৃষ্টি হয় তাহাকে osmotic pressure বা অভিস্রবণ চাপ বলে।

এইরূপ ক্ষেত্রে কোন বিচ্ছিন্ন কোষে ক্রিয়াশীল চাপগুলি যখন equilibrium বা সাম্য অবস্থায় উপনীত হয় তখন রসস্ফীতি চাপের মান অভিস্রবণ চাপের মানের সমান হইবে।

যদি P= অভিস্রবণ চাপ এবং T= রসস্ফীতি চাপের মান হয় তাহা হইলে

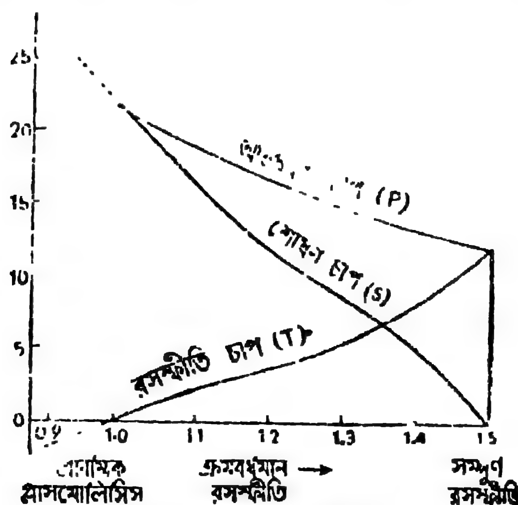
$P=T$, অথবা $P-T=0$;

এই $P-T$-এর মানই হইল শোষণ চাপ এবং ইহাকে S এই অক্ষর দ্বারা সূচিত করা হয়।

অর্থাৎ $P-T=S$.

উপরোক্ত সূত্র হইতে দেখা যাইতেছে যে কোষ মধ্যে রসস্ফীতি চাপ বৃদ্ধি পাইলে অভিস্রবণ চাপ এবং শোষণ চাপও সেই পরিমাণে কমিয়া যাইবে। আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল যে বহিঃস্থ মাধ্যমটি কেবলমাত্র বিশুদ্ধ জল হইলেই এই সূত্রটি প্রযোজ্য হইবে।

উপরিলিখিত সূত্রটিকে একটি graph বা রেখাচিত্রের দ্বারা বুঝান যায় ; যথা—



১৯৭নং চিত্র—গ্রাফচিত্র।

রসস্ফীতির জন্য প্রয়োজনীয় কারণ (Conditions necessary for turgidity)

রসস্ফীতি নিম্নলিখিত কারণগুলির উপর নির্ভর করে। যথা—

1. কোষের মধ্যে অম্ল, শর্করা প্রভৃতি osmotic substance বা অভিস্রব পদার্থের উপস্থিতি প্রয়োজন, কারণ ইহাদের জলের প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকে বলিয়া কোষের মধ্যে জল প্রবেশ করে।

2. কোষপ্রাচীরের ভিতরে আংশিক ভেদ্য প্রোটোপ্লাজমের স্তর জলকে কোষের বাহিরে যাইতে বাধা প্রদান করে এবং এইজন্য কোষের ভিতর উচ্চ চাপের সৃষ্টি হয়।

3. কোষপ্রাচীরটি elastic বা স্থিতিস্থাপক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন কারণ elasticity বা স্থিতিস্থাপকতা না থাকিলে কখনই উচ্চ চাপের সৃষ্টি হয় না।

4. বাহির হইতে কোষের মধ্যে নিয়মিত জলের সরবরাহ প্রয়োজন।

রসস্ফীতির আবশ্যকতা (Utility of turgescence)

রসস্ফীতির জন্য উদ্ভিদের কয়েকটি প্রয়োজনীয় জৈবনিক কার্য সম্পাদিত হয়। যথা—

1. বৃদ্ধির জন্য রসস্ফীতির একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে কোষের আয়তন অস্থায়িভাবে বৃদ্ধি পায় এবং নূতন পদার্থ গঠিত হইয়া উহাকে ক্রমে স্থায়ী করে।

2. রসস্ফীতির পরিবর্তনের জন্য নানাবিধ আবশ্যকীয় movement বা চলন সম্পাদিত হয়; যথা, nutation বা নমন, পত্ররন্ধ্রের আয়তন বৃদ্ধি অথবা হ্রাস প্রভৃতি।

3. মূলের ক্ষেত্রে কর্টেক্সের রসস্ফীতির জন্য জাইলেম নালিকার মধ্যে জল প্রবেশ করে।

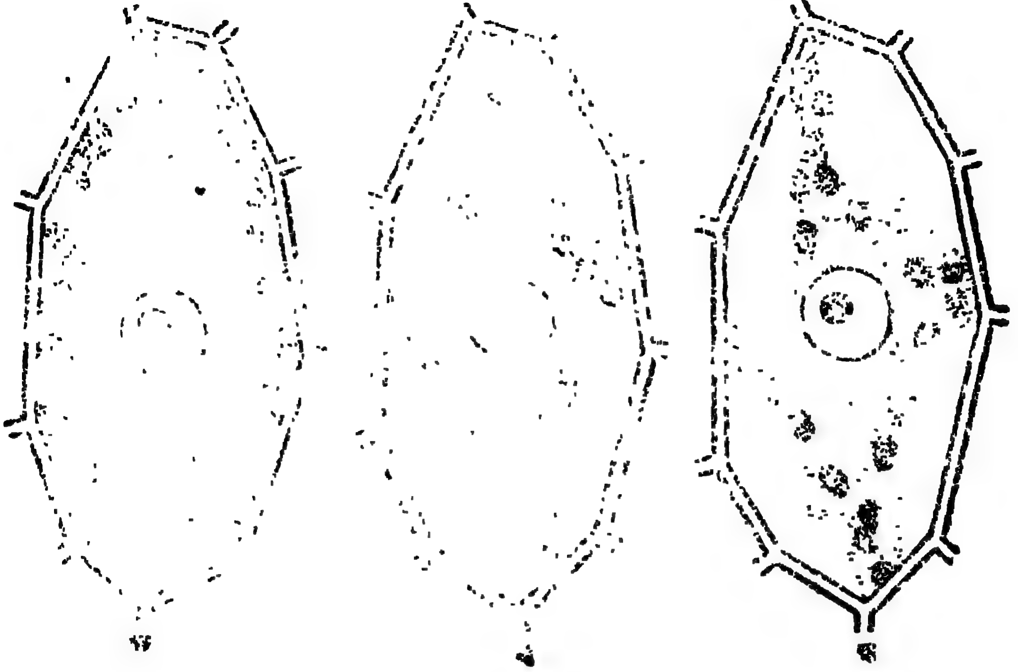
4. নরম কাণ্ডের ক্ষেত্রে প্যারেনকাইমা কোষের রসস্ফীতি উহাদের দৃঢ়তা প্রদান করে।

প্লাসমোলিসিস (Plasmolysis)

জীবিত কোষে প্রোটোপ্লাজম সর্বদাই কোষপ্রাচীরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকে। একটি সবীজ উদ্ভিদ কোষকে গাঢ় শর্করার বা লবণের দ্রবণে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে দেখা যায় যে প্রোটোপ্লাজম কোষপ্রাচীর হইতে সংকুচিত হইয়া কোষের কেন্দ্রস্থলে অনিয়ত আকারে অবস্থান করে। প্রোটোপ্লাজমের এই প্রকার সঙ্কোচনকে প্লাসমোলিসিস (Plasmolysis) বলে। ভ্যাকুওলস্থিত কোষরসের ঘনত্ব বহিঃস্থ দ্রবণের ঘনত্ব অপেক্ষা লঘু বলিয়া অধিক মাত্রায় বহিঃঅভিস্রবণ (exosmosis) সংঘটিত হয়, যাহার ফলে কোষরস হইতে অত্যধিক জল বাহির হইয়া যায়। ইহাতে কোষপ্রাচীর ও সংকুচিত প্রোটোপ্লাজমের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি ভ্যাকুওলস্থিত কোষরস দ্বারা পূর্ণ থাকে।

৫নং পরীক্ষা ঃ (১২৮নং চিত্র) Rheo discolor বা জহর চাঁপা পাতার নিম্নত্বকের কিছু অংশ তুলিয়া লইয়া উহাকে শর্করা অথবা লবণের নির্দিষ্ট লঘু দ্রবণে ডুবাইয়া দাও। যদি দেখা যায় যে প্লাসমোলিসিস হইল না তখন বিভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ লইয়া

অনুরূপভাবে আরও কয়েকটি ঐ পাতার নিম্নত্বকের অংশ প্রতিটি দ্রবণে ডুবাইয়া দাও। পরীক্ষাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিলে দেখা যাইবে যে কোনো একটি নির্দিষ্ট ঘনত্বের দ্রবণে প্লাসমোলিসিস সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে অর্থাৎ প্রোটোপ্লাস্ট কোষপ্রাচীর হইতে সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে বহিঃস্থ দ্রবণের ঘনত্ব কোষরসের ঘনত্বের



১৯৮নং চিত্র— প্লাসমো - লিসেস পরীক্ষা।

প্রায় সমান অথবা কিঞ্চিৎ অধিক হইতে পারে। এই অবস্থার প্লাসমোলিসিসকে incipient plasmolysis বা প্রারম্ভিক প্লাসমোলিসিস বলে এবং দ্রবণটিকে আইসোটোনিক দ্রবণ (isotonic solution) বলে। অতএব বহিঃস্থ দ্রবণের ঘনত্ব জানা থাকিলে কোষরসের ঘনত্ব নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়।

যে ঘনত্ব প্লাসমোলিসিসের সূচনা হয় এবং তাহার পূর্বের ঘনত্ব যাহাতে প্লাসমোলিসিস হয় না—এই দুইটি ঘনত্বের গড় কোষরসের ঘনত্বের সমান। কোষরসের ঘনত্ব জানা হইলে কোষের অভিস্রবণ চাপ (osmotic pressure) নিম্নলিখিত সূত্রের (formula) সাহায্যে সহজেই বাহির করা যায়।

$P = CRT$, এখানে P = অভিস্রবণ চাপ (অ্যাটমসফিয়ারে প্রকাশিত করা হয়); C = মোলারিটি দ্বারা প্রকাশিত কোষরসের ঘনত্ব ; R = সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক (universal gas constant) যাহা প্রতি মোল ও প্রতি ডিগ্রীতে 0.082 লিটার অ্যাটমোসফিয়ার ; এবং T = পরম উত্তাপ (absolute temperature) [= 273 + ঘরের তাপ—সেণ্টিগ্রেডে মাপা হয়] ;

উপরিউক্ত সূত্রের সাহায্যে যে মান পাওয়া যায় তাহাকে প্রারম্ভিক প্লাসমোলিসিস অবস্থার অভিস্রবণ চাপ বলা হয়।

দ্রবণের ঘনত্বের একক (Concentration units of solution)

মোলার দ্রবণ (Molar solution)—এক মোল পরিমাণ যে কোন দ্রাব বস্তু এরূপ পরিমাণ পাতিত জলে (distilled water) গুলিতে হইবে যাহাতে উহা এক লিটার পরিমাণ দ্রবণে পরিণত হয় ; ইহাই 1 মোল দ্রবণ (1M)। একমোল পরিমাণ রাসায়নিক বস্তু হইল ঐ পদার্থের আণবিক গুরুত্ব যাহা গ্রামে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ আণবিক গুরুত্বের সমান গ্রাম বস্তুটি লইতে হইবে।

মোলাল দ্রবণ (Molar solution)—এক মোল পরিমাণ তরল রাসায়নিক পদার্থ এক লিটার পাতিত জলে গুলিলে যে দ্রবণটি প্রস্তুত হয় তাহাকে এক মোলাল দ্রবণ বলে (ইহাকে ওয়েট মোলার [weight molar] দ্রবণও বলা হইয়া থাকে)।

শতকরা দ্রবণ (Per cent solution)—শতকরা এক ভাগ দ্রবণ প্রস্তুত করিতে (1 per cent solution) এক গ্রাম পরিমাণ দ্রাব বস্তুকে এরূপ পরিমাণ পাতিত জলে গুলিতে হইবে যাহাতে সম্পূর্ণ দ্রবণটি 100 মিলিমিটার দ্রবণে পরিণত হয়।

নরমাল দ্রবণ (Normal solution)—দ্রবণে ইলেকট্রোলাইটের ঘনত্ব নরমালিটির দ্বারা প্রকাশ করা যায়। একটি যে কোন ইলেকট্রোলাইটের নরমাল দ্রবণে ঐ বস্তুটির তুল্যাঙ্ক গুরুত্ব (equivalent weight) যাহা গ্রামে প্রকাশিত হয়, পরিমাণ এক লিটার পরিমাণ দ্রবণের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

তুল্যাঙ্ক গুরুত্ব

$$= \frac{\text{আণবিক গুরুত্ব}}{\text{প্রতি অণুতে অপসারিত হয় এইরূপ } H^+ \text{ অথবা } OH^- \text{ আয়নের সংখ্যা}}$$

———

৩ শোষণ
(Absorption)

পূর্বে ধারণা ছিল যে absorption বা শোষণ একটি ভৌত প্রণালী যাহার দ্বারা উদ্ভিদ মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তর হইতে মূলের সাহায্যে জল ও বিভিন্ন প্রকার লবণের দ্রবণ গ্রহণ করে। কিন্তু বর্তমানে এইরূপ ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমানে ইহা সুনিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে জল শোষণ ও লবণ শোষণ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক প্রক্রিয়া।

A. জলের শোষণ প্রণালী (Absorption of water)

জল না হইলে উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না। সেইজন্য উদ্ভিদ-জীবনে জল একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। অধিকন্তু উদ্ভিদ কোষগুলির বিভিন্ন জৈবনিক কার্য সম্পাদন করিতে নিয়মিত জল সরবরাহের প্রয়োজন ; কারণ ইহা বিভিন্ন লবণ ও গ্যাসকে দ্রবীভূত করে এবং জলের মাধ্যমেই সকল প্রকার metabolism বা বিপাকীয় কার্য সম্পন্ন হয়। জীবিত প্রোটোপ্লাজমে অন্তত শতকরা 80 ভাগ জলের প্রয়োজন হয়।

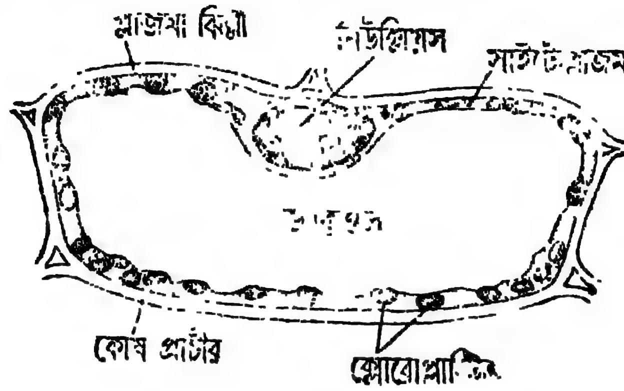
স্থলজ উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতে জল গ্রহণ করে। মৃত্তিকা বলিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাণী বা উদ্ভিদদেহ হইতে গঠিত বিভিন্ন জৈব পদার্থ এবং শিলা প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষের ক্ষুদ্র কণিকার সমষ্টি। মৃত্তিকা কণিকাগুলি বিভিন্ন আকারের হইতে পারে এবং সেইজন্য কাঁকর, কর্দমাক্ত দো-আঁশ মাটি প্রভৃতি মৃত্তিকার শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্তিকার কণিকাগুলির মধ্যে অতি সূক্ষ্ম স্থান থাকে যাহা অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস দ্বারা পূর্ণ।

মৃত্তিকায় জল পতিত হইলে উহার কিয়দংশ gravity বা অভিকর্ষের দ্বারা percolation বা অনুস্রাবিত হয়। এই জলকে gravitational water বা অভিকর্ষীয় জল বলে। মৃত্তিকা কণিকাগুলিও কিছু পরিমাণ জল ধারণ করিয়া রাখে। মৃত্তিকা হইতে জল বাষ্পীভবন হইলে কিছু পরিমাণ জল capillary action বা কৈশিক প্রণালীতে মৃত্তিকা কণিকাগুলির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই জলকে capillary water বা কৈশিক জল বলে। মনে রাখিতে হইবে যে মৃত্তিকা যতই শুষ্ক হউক না কেন মৃত্তিকা কণিকাগুলির চতুর্দিকে একটি অতি পাতলা জলের স্তর সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। ইহাকে hygroscopic water বা জলাকর্ষী জল বলে। ইহাকে দূরীভূত করিতে অতি উচ্চ তাপ ও চাপের প্রয়োজন হয়।

ইহা অবিদিত নহে যে উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রধানত মূলরোমের সাহায্যে জল শোষিত হয়। মূলরোম না থাকিলে নবগঠিত মূলের দ্বারা শোষণকার্য সম্পন্ন হয়। উদ্ভিদ মূলরোমের সাহায্যে osmosis বা অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকা হইতে

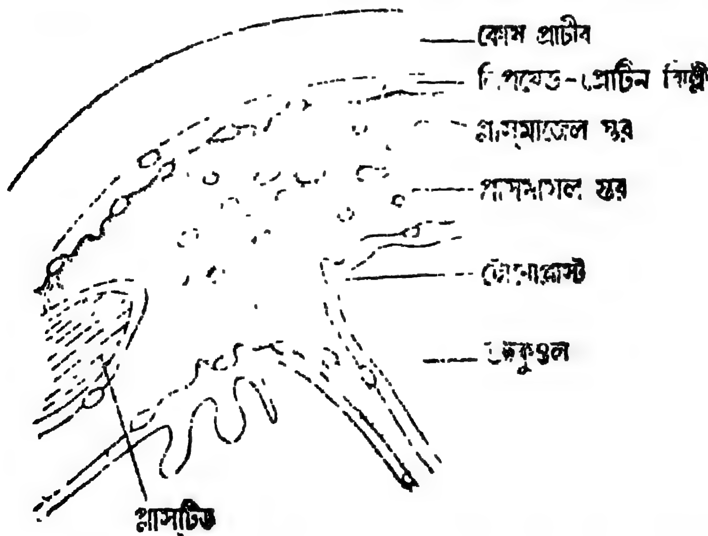
জল শোষণ করে। ইমবাইবিশন (Imbibition) প্রক্রিয়াতেও কিছু জল গৃহীত হইতে পারে।

মূলে যে এককোষী মূলরোমগুলি দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা মৃত্তিকায় প্রবেশ করিলে capillary water বা কৈশিক জলের নিবিড় সংস্পর্শে আসে। প্রতি মূলরোমে



১৯৯নং চিত্র—আদর্শ উদ্ভিদকোষের গঠন

একটি সেলুলোজ-নির্মিত পাতলা permeable বা ভেদ্য কোষপ্রাচীর, একটি সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াসযুক্ত পাতলা প্রোটোপ্লাজমের স্তর (১৯৯নং চিত্র) যাহা প্রাইমর্ডিয়াল ইউট্রিকল (primordial utricle) নামে পরিচিত এবং একটি কেন্দ্রীয় ভ্যাকুওল আছে। প্রাইমর্ডিয়াল ইউট্রিকলটি কয়েকটি স্তর লইয়া গঠিত। কোষপ্রাচীর সংলগ্ন অতিশয় পাতলা স্তরটিকে hyaline membrane বা স্বচ্ছস্তর বলে যাহাকে এক্টোপ্লাজম (ectoplasm) নামেও অভিহিত করা হয়। এই স্তরের ভিতরের দিকে জলবিহীন



২০০নং চিত্র—একটি জীবন্ত উদ্ভিদকোষের গঠন এবং উহাতে সাইটোপ্লাজম, ভ্যাকুওল ও টোনোপ্লাস্টের বিভিন্ন স্তর দেখান হইয়াছে

স্তরটিকে protoplasmic membrane বা প্রোটোপ্লাজমীয় স্তর বলে। ভ্যাকুওলের চতুর্দিকে একটি সুদৃঢ় স্তর আছে যাহাকে টোনোপ্লাস্ট (tonoplast) বা ভ্যাকুওলার

স্তর (vacuolar membrane) বলে (২০০নং চিত্র)। প্রোটোপ্লাজমীয় স্তর ও ভ্যাকুওলার স্তরের মধ্যবর্তী প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকলের অংশকে এন্ডোপ্লাজম (endosplasm) বলে। ভ্যাকুওলস্থিত কোষরস হইল বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থের জটিল দ্রবণ যাহার মধ্যে কতকগুলি পদার্থ collodial state বা কোলয়ডীয় অবস্থায় থাকে। যে পর্দার সাহায্যে মূলরোমে অসমোসিস বা অভিস্রবণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহা সাধারণ অভিস্রবণ পর্দা অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এই পর্দার কিছু অংশ সজীব সুতরাং ইহা অভিস্রবণ প্রক্রিয়াকে সংযত করে। মূলরোমের প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকল সমেত মৃত permeable বা ভেদ্যকোষ প্রাচীরটি হইল osmotic membrane বা অভিস্রবণ স্তর যাহার সজীব অংশটি হইল প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকল্ এবং ইহা semipermeable বা আংশিক ভেদ্য। আংশিক ভেদ্যতা প্রোটোপ্লাজমীয় স্তর ও টোনোপ্লাস্টের উপর নির্ভর করে এবং ইহার মধ্য দিয়া কেবলমাত্র কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ কোষে প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু অপরগুলি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

মূলরোমের বহির্ভাগে অবস্থিত কৈশিক জলে নানাবিধ খনিজ লবণ দ্রবীভূত থাকিলেও ইহা অতিশয় লঘু। মূলরোমের ভ্যাকুওলস্থিত কোষরস অপেক্ষাকৃত গাঢ়। এইরূপ অভিস্রাবণের শর্তগুলি পূরণ হইলে কোষরস ও কৈশিক জলের মধ্যে diffusion বা ব্যাপনক্রিয়া সংঘটিত হয়। ইহার ফলে মৃত্তিকার লঘু দ্রবণ মূলরোমে প্রবেশ করে। মূলরোমে এইরূপ জল প্রবেশের ফলে কোষপ্রাচীরটি turgid বা স্ফীত হয়।

জীবিত মূলরোমে কৈশিক জল প্রবেশ করিবার সাথেই কোষরস অতি ধীরে ধীরে exosmosis বা বহিঃঅভিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় কোষের বাহিরে আসিতে থাকে। এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে জলশোষণ ক্রমশ কমিতে কমিতে অবশেষে বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় কোষের মধ্যে অত্যধিক চাপের সৃষ্টি হয়। এইরূপে কোষের মধ্যে যে অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি হয় তাহার ফলে ইহার মধ্যে জলের অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। ইহাকে কোষরসের রসস্ফীতি চাপ বলে (turgour pressure of the cell sap)।

অতএব দেখা যাইতেছে যে শোষণের সময় কৈশিক জল endosmosis বা অন্তঃঅভিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় মূলরোমে প্রবেশ করে। ইহার ফলে মূলরোমের রসস্ফীতি চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু মূলরোমের কোষরসের ঘনত্ব কৈশিক জলের ঘনত্ব অপেক্ষা সর্বদাই অধিক থাকে বলিয়া exosmosis বা বহিঃঅভিস্রাবণ সম্ভবপর নহে। মূলের প্রথম সারির কর্টেক্সের কোষগুলির কোষরসের ঘনত্ব মূলরোমের কোষরসের ঘনত্ব অপেক্ষা অধিক বলিয়া মূলরোমস্থিত জলীয় দ্রাবক কর্টেক্সের প্রথম কোষস্তরে প্রবেশ করে। এখন পূর্ব বর্ণিত $S=P-T$: এই সঙ্কেতটি এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে কারণ মূলরোম ও কর্টেক্সের প্রথম স্তরের কোষের নিজস্ব osmotic pressure বা অভিস্রাবণ চাপ এবং turgidity বা রসস্ফীতি চাপ আছে। অতএব পরপর দুইটি কোষস্তরের অভিস্রাবণ চাপকে P এবং P' ও রসস্ফীতি চাপকে T এবং T' ও উহাদের মধ্যে শোষণ

চাপকে S' দ্বারা সূচিত করিলে cell to cell osmosis বা কোষান্তর অভিস্রাবণের ক্ষেত্রে $S = (P' - P) - (T - T')$—এই সঙ্কেতটি প্রযোজ্য হইবে।

এইরূপে কর্টেক্সের প্রথম স্তরটি turgid বা রসস্ফীত হইলে, কোষরস প্রথম স্তর হইতে অনুরূপ কারণে দ্বিতীয় কোষস্তরে প্রবেশ করে, কারণ ইহার ঘনত্ব এখন প্রথম কোষস্তর অপেক্ষা অধিক। এইরূপে দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় কোষস্তরে এবং এই প্রকারে cell to cell osmosis বা কোষান্তর অভিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় কোষরস অবশেষে জাইলেম নালিকা সংলগ্ন কোষগুলির মধ্যে প্রবেশ করে। এইরূপ অবস্থায় কর্টেক্সের কোষগুলি এবং মৃত জাইলেম নালিকার মধ্যে কোনরূপ অভিস্রাবণ সংঘটিত হয় না, কিন্তু তথাপি কর্টেক্সের কোষগুলির রসস্ফীতিজনিত চাপ বৃদ্ধির ফলে জাইলেম নালিকার কোষপ্রাচীরে পাতলা স্থান দিয়া উহার মধ্যে জল প্রবেশ করে ও তথা হইতে কাণ্ডের মধ্য দিয়া পাতায় পরিবাহিত হয়।

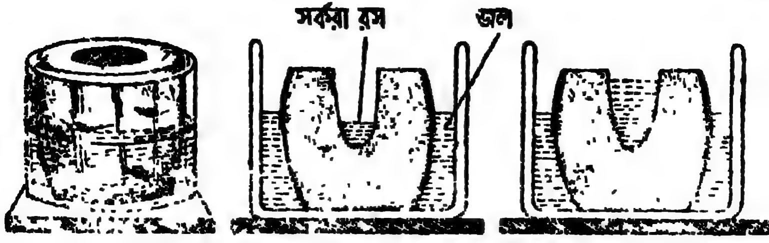
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মূলরোম হইতে আরম্ভ করিয়া জাইলেম কলা পর্যন্ত কোষ সমূহে ক্রমান্বয়ে একটি ব্যাপন চাপের হ্রাস-ক্রম (diffusion pressure deficit gradient) থাকে। এই চাপের হ্রাস-ক্রমের মাত্রা মূলরোম হইতে বৃদ্ধি পাইয়া জাইলেম কলা সংলগ্ন কোষে সর্বাপেক্ষা অধিক হয়। মূলরোমের ব্যাপন চাপ হ্রাস (diffusion pressure deficit or D P D) মৃত্তিকাস্থিত জলের DPD অপেক্ষা অনেক বেশী থাকে। এই কারণে ব্যাপন চাপের হ্রাস ক্রমের বিরুদ্ধে—মৃত্তিকা হইতে জল মূলে প্রবেশ করে। এবং মূলরোম হইতে জাইলেম কলা পর্যন্ত জলের স্রোত ভিতর দিকে বহিতে থাকে।

ব্যাপন চাপের হ্রাস (Diffusion pressure deficit)—বিশুদ্ধ জলের ব্যাপন চাপ উহার কোন দ্রবণের ব্যাপন চাপ অপেক্ষা অধিক হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে দুইটি প্রকোষ্ঠের মাঝে অর্ধস্বচ্ছ পর্দা দ্বারা আড়াল করিয়া দুইদিকে বিশুদ্ধ জল লইয়া যদি একদিকের জলে অল্প শর্করা যোগ করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে অর্ধস্বচ্ছ পর্দার দুই পার্শ্বে ব্যাপন চাপের তারতম্য হইতেছে। এবং ইহার ফলে বিশুদ্ধ জল প্রথম প্রকোষ্ঠ হইতে পর্দার মধ্য দিয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এইরূপ ব্যাপন যতক্ষণ না দুই পার্শ্বের ব্যাপন চাপ সমান হইতেছে ততক্ষণ চলিতে থাকে। দ্রবণের ঘনত্ব যত বাড়ান যায় দ্রাবকের ব্যাপন চাপ ততই হ্রাস পাইতে থাকে। সেইজন্য বিশুদ্ধ জলের ব্যাপন চাপ সর্বাধিক থাকে এবং মূলরোমের কোষরসের ব্যাপন চাপ কম থাকে।

৬নং পরীক্ষা : কোষান্তর অভিস্রাবণ (Cell to Cell Osmosis) **আলু অসমোস্কোপ** (Potato osmoscope) :

২০১নং চিত্র—একটি বড় আলু লইয়া ইহার উপরের ও নিচের অংশ এইরূপে কাট যেন ইহাকে খাড়াভাবে বসান যায়। উপরের তল হইতে কিছু আলুর অংশ অপসারণ করিয়া একটি গহ্বর প্রস্তুত কর। এইবার আলুর নিম্নভাগ হইতে এইরূপে খোসা ছাড়াও যেন উহা গহ্বরের তল পর্যন্ত পৌঁছায়। এমন গহ্বরের মধ্যে কিছু শর্করার দ্রবণ ঢালিয়া

আলুটিকে একটি জলপূর্ণ কাচের পাত্রে এইরূপে রাখ যেন উহার উপরের অংশ জল-



২০১নং চিত্র—আলু অসমোস্কোপ

তলের উপরে থাকে। 2/3 ঘণ্টা পরে দেখা যাইবে যে শর্করার দ্রবণ ক্রমে গহ্বরটিকে পূর্ণ করিয়াছে।

জলশোষণের জন্য প্রয়োজনীয় কারণ (Conditions necessary for absorption of water)

মূলরোম কর্তৃক জল শোষণের হার বিবিধ কারণের উপর নির্ভর করে। এই সকল কারণগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল—

A. বহিঃস্থ কারণ (External factors)

1. মৃত্তিকাস্থিত জলের পরিমাণ (Water content of the soil)—মৃত্তিকায় জলের পরিমাণ অধিক হইলে জলশোষণ হার বৃদ্ধি পায় কিন্তু water-logged soil বা জলবদ্ধ মৃত্তিকায় শোষণ ভাল হয় না। সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত ব দ্বীপ অঞ্চলের মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে লবণ দ্রবীভূত থাকে বলিয়া শোষণ বহুলাংশে ব্যাহত হয়, কারণ ইহার ঘনত্ব কোষরসের ঘনত্ব অপেক্ষা অধিক। এই প্রকার মৃত্তিকাকে physiologically dry soil বা ঊষর মৃত্তিকা বলে।

2. মৃত্তিকার অম্লতা বা ক্ষারীয়তা (Acidity and alkalinity of the soil)—মৃত্তিকাস্থিত দ্রবণের pH এর উপর শোষণহার বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। কিন্তু আম্লিক বা ক্ষারীয় মৃত্তিকার সহিত শোষণহারের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় নাই। কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকের মতে আম্লিক মৃত্তিকায় শোষণহার বৃদ্ধি পায় আবার কাহারও মতে ক্ষারীয় মৃত্তিকায় ইহা বৃদ্ধি পায়।

3. মৃত্তিকার তাপমাত্রা (Temperature of the soil)—একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মৃত্তিকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইলে শোষণহারও বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

4. মৃত্তিকায় অক্সিজেনের পরিমাণ (Oxygen content of soil)—মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন। ইহাতে শোষণহার বৃদ্ধি পায়।

B. অন্তঃস্থ কারণ (Internal factors)

1. মূলরোমের অভিস্রাবণ চাপ (Osmotic pressure of root hairs)—মূলরোমস্থ কোষরসের অভিস্রাবণ চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইলে শোষণহারও বৃদ্ধি পায়।

2. মূলজ প্রেষ (Root pressure)—যেহেতু মূলজ প্রেষ মূলরোম অঞ্চল হইতে জাইলেম নালিকায় বিভিন্ন প্রকার লবণের অপসারণে অংশ গ্রহণ করে সেইজন্য শোষণও অবিরাম চলিতে থাকে।

3. অতিরিক্ত জল অপসারণ (Removal of excess of water)—Transpiration বা প্রস্বেদন অথবা exudation বা নিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত জল অপসারণের দ্বারা শোষণহার বৃদ্ধি পায়।

লবণ শোষণ (Absorption of Salts)

উদ্ভিদ তাহার বৃদ্ধি ও গঠনের জন্য কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ব্যতিরেকে মৃত্তিকা হইতে মূলের সাহায্যে বিভিন্ন অজৈব লবণ হইতে বিভিন্ন প্রকার মৌলিক পদার্থ গ্রহণ করে। পূর্বে বিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে উদ্ভিদ ঐ সকল লবণ মৃত্তিকাস্থিত জলের দ্রবণ হিসাবে গ্রহণ করিত। অধুনা ইহা সঠিকভাবে নিরূপণ হইয়াছে যে জল শোষণের সহিত লবণ শোষণের কোন সম্পর্ক নাই। ইহার কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে যে অত্যধিক প্রস্বেদনের সময় অধিক পরিমাণে জল শোষিত হইলেও সেই পরিমাণ লবণ শোষিত হয় না ; আবার স্বল্প প্রস্বেদনে জল শোষণ হ্রাস পাইলেও লবণ শোষণ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

লবণগুলি প্রধানত ইলেকট্রোলাইট অবস্থায় অবস্থান করে। বর্তমানে গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে ইলেকট্রোলাইটগুলি অধিকাংশই তাহাদের আয়ন অবস্থায় (ionic form) শোষিত হয়। সুতরাং শোষণের পূর্বে ইলেকট্রোলাইটগুলি পজিটিভ (+ve) ও নেগেটিভ (−ve) আয়ন-এ বিশ্লিষ্ট হয় এবং ঐ সকল আয়ন পরবর্তী কালে উদ্ভিদ গ্রহণ করিয়া থাকে। লবণ শোষণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হইল—

১। লবণ শোষণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ; ইহার সহিত জল শোষণের কোন সম্পর্ক নাই।

২। যখন মৃত্তিকার পরিবেশে একটি মাত্র অজৈব লবণ উপস্থিত থাকে তখন তাহার শোষণ সাধারণ এবং সহজতর হয়। কিন্তু যখন পরিবেশে একাধিক লবণ উপস্থিত থাকে লবণ শোষণ পদ্ধতি বহুলাংশে জটিল হইয়া পড়ে ; কারণ তখন একধরণের আয়ন শোষণ অন্য একটি আয়নের শোষণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। ইহাকেই এ্যাণ্টাগনিজম (Antagonism) বলা হয়।

৩। প্লাজমা ঝিল্লীর দুই পার্শ্বে একই প্রকৃতির আয়ন সমসংখ্যায় আদানপ্রদান হয় অথবা বিপরীত প্রকৃতির আয়ন (+ve or −ve) একই সঙ্গে ঝিল্লীর মধ্য দিয়া চলিয়া যায়।

৪। একটি কোষের মধ্যে দ্রাবের (solute) প্রবেশের হার সেই কোষের অভ্যন্তরের ও বাহিরের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। শুধু তাহাই নহে প্লাজমা ঝিল্লীর ভেদ্যতার (permeability) উপরও ঐ পদার্থটির প্রবেশ নির্ভর করে। ইহা ছাড়া তাপ ও

অন্যান্য পরিবেশীয় সর্তাদি, যেমন, আলো ও অন্যান্য পদার্থের উপস্থিতি বস্তুটির কোষ অভ্যন্তরে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

৫। বিপরীত আয়নগুলি অসম পরিমাণে কোষ অভ্যন্তরে শোষিত ও পুঞ্জীভূত হয়।

৬। আয়ন শোষণ কোষরসের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ কোষের আভ্যন্তরীণ ও বাহিঃ ঘনত্বের সমতা থাকিলেও কম বেশী আয়ন শোষিত হইতে পারে।

৭। শোষিত আয়ন কোষ অভ্যন্তরে একই অবস্থায় জমা হইতে পারে, অথবা সেগুলি কোন বস্তুর গাত্রে অ্যাড্‌সর্বড্‌ হইয়া থাকিতে পারে অথবা অন্য কোন পদার্থের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হইতে পারে।

৮। শোষিত আয়ন ঝিল্লীগাত্রে অবস্থিত থাকিতে পারে অথবা আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া টোনোপ্লাস্টের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া ভ্যাকুওলের মধ্যে জমা হয় এবং ফলে কোষরসের ঘনত্ব বৃদ্ধি হয়।

আয়ন শোষণের জন্য প্রচুর শক্তির প্রয়োজন। শ্বাসকার্যের দ্বারাই উদ্ভিদ প্রকৃতপক্ষে এই শক্তি সঞ্চয় করে। দেখা গিয়াছে যে বার্লি গাছের মূলকে লবণের দ্রবণে রাখিয়া উহার মধ্য দিয়া অক্সিজেন সঞ্চালন না করিলে মূলের কোষে এইরূপ লবণ সঞ্চিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু লবণের দ্রবণে অক্সিজেন সরবরাহ করিলে শ্বাসকার্যের ফলে কোষের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গঠিত হয়। ইহা কোষমধ্যস্থ জলের সহিত বিক্রিয়ার দ্বারা কার্বনিক অ্যাসিড (Carbonic acid) অর্থাৎ HCO_3-তে পরিণত হয়। কার্বনিক অ্যাসিড, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ (Carbonic anhydrase) নামক এনজাইমের সহায়তার H^+ ও HCO_3^- আয়নে বিশ্লিষ্ট হয়। এই H^+ (ক্যাটায়ন) এখন কোষ হইতে বাহিঃস্থ মাধ্যমে নির্গত হয় এবং একই প্রকার বৈদ্যুতিক আধান (charge) বিশিষ্ট অপর একপ্রকার অণু বাহিঃস্থ মাধ্যম হইতে কোষ মধ্যে প্রবেশ করে। এইরূপে কোষের মধ্যে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে কোষ ও বাহিঃস্থ মাধ্যমের মধ্যে সেই প্রকার আয়নের বিনিময় সম্পন্ন হয়। লুন্ডিগার্ড (Lundegardh) ও বার্স্ট্রম (Burstrom) নামক বিজ্ঞানীদ্বয়ের মতে (1933) শ্বাসক্রিয়ার সহিত ক্যাটায়ন শোষণের কোন সম্বন্ধ নাই। শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা কেবল মাত্র অ্যানায়ন শোষিত হয়।

একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে খনিজ লবণের শোষণ আয়নগুলির ঘনত্ব, প্রস্বেদন, তাপমাত্রা, মৃত্তিকার বাতান্বয়ন (aeration) এবং শ্বাসক্রিয়াশীল পদার্থের উপর নির্ভর করে। দেখা গিয়াছে যে অ্যামোনিয়াম (ammonium) ও নাইট্রেট (nitrate) আয়ন সোডিয়াম (sodium) অথবা ক্লোরাইড (chloride) আয়ন অপেক্ষা দ্রুত শোষিত হয়।

আয়ন পুঞ্জীভবন (Accumulation of ions)—বৈশ্লেষিক পদ্ধতির (analytical methods) দ্বারা উদ্ভিদ কোষের মধ্যে এরূপ বহু দ্রাবের (solutes) কথা জানিতে পারা গিয়াছে যাহার ঘনত্ব পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের ঘনত্ব অপেক্ষা বহুগুণে বেশী। ঐ সকল দ্রাব বস্তুগুলি কোষ অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়। ইহাকেই পুঞ্জীভবন

accumulation) বলে। এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আলুর কয়েকটি টুকরা যদি কিছু পরিমাণ পোষক রসের (nutrient solutions) মধ্যে রাখা যায় তাহা হইলে দুই-একদিন পরেই দেখা যায় যে পোষক রসের বিভিন্ন আয়নের ঘনত্ব প্রায় শূন্যাঙ্কে নামিয়া আসিয়াছে। এবং এই সময়ের মধ্যে কোষ গহ্বরে কোন কোন আয়নের ঘনত্ব খুব বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন কোন সবুজ শৈবালের কোষে পটাসিয়ামের (potassium) ঘনত্ব তাহার পরিবেশীয় মাধ্যম অপেক্ষা বহুগুণ বেশী থাকে।

সামুদ্রিক শৈবালের ক্ষেত্রেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন শৈবাল খুব সামান্যই সোডিয়াম গ্রহণ করে, অপরদিকে অন্য একটি শৈবালে এই সোডিয়াম আয়ন সমুদ্রের জলের ঘনত্ব অপেক্ষা কম পরিমাণে কোষের মধ্যে সঞ্চিত হয়। কিন্তু এই উভয় প্রজাতিই প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম সংগ্রহ করে। ইহাদের মধ্যে একটি প্রজাতি অন্যটি অপেক্ষা বেশী ক্লোরাইড সংগ্রহ করে। সুতরাং ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে সকল উদ্ভিদ কোষে একই প্রকার দ্রাব বা আয়ন সমপরিমাণে সঞ্চিত হয় না বা তাহারা গ্রহণ করে না। বিভিন্ন প্রজাতি বিভিন্ন ধরনের আয়ন বা দ্রাব বস্তু বিভিন্ন পরিমাণে কোষ অভ্যন্তরে পুঞ্জীভূত করে।

অ্যান্টাগনিজম (Antagoni·m) এবং সাইনারজি (Synergy)

একটি চারা গাছকে বিশুদ্ধ পটাসিয়াম ক্লোরাইডের (potassium chloride) লঘু দ্রবণের মধ্যে রাখিলে অল্প সময়ের মধ্যেই মারাত্মক বিষক্রিয়া লক্ষিত হয়। পটাসিয়াম এবং ক্লোরাইড আয়ন উভয় শোষিত হয় এবং তাহা চারা গাছের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়। কিন্তু ঐ দ্রবণের মধ্যে যদি সামান্য পরিমাণ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (calcium chloride) মিশ্রিত করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে পটাসিয়াম বা ক্যালসিয়াম আয়নের কোনটিই ক্ষতিকারক মাত্রায় শোষিত হইতেছে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সামান্য পরিমাণ ক্যালসিয়াম আয়ন পটাসিয়াম আয়নের ক্ষতিকারক প্রভাবকে অপসারিত করিতেছে বা বাধা দিতেছে (antagonize)। উদ্ভিদ জগতে এইরূপে বহু উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে ক্যালসিয়াম আয়ন সোডিয়াম আয়নের ক্ষতিকারক প্রভাবকে অপসারিত করিতেছে অথবা, অপরপক্ষে পটাসিয়াম বা সোডিয়াম আয়ন ক্যালসিয়াম আয়নের ক্ষতিকারক প্রভাবকে বাধা দিতেছে।

সামুদ্রিক শৈবাল ল্যামিনারিয়ার (*Laminaria* sp.) ক্ষেত্রেও অ্যান্টাগনিজমের উদাহরণ অতি সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। যদি ল্যামিনারিয়াকে পাতিত জলে রাখা যায় তাহা হইলে সেখানে উদ্ভিদটি কিছুকাল বাঁচিয়া থাকে। অপরদিকে, উদ্ভিদটিকে সোডিয়াম ক্লোরাইডের (NaCl) দ্রবণে (যে দ্রবণে NaCl-এর পরিমাণ বা ঘনত্ব সমুদ্রের জলে NaCl-এর পরিমাণের সমান) রাখিলে তাহা শীঘ্রই মরিয়া যায়। কিন্তু ঐ জলে অল্প পরিমাণ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) যোগ করিলে উদ্ভিদটি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এইরূপে যদি ঐ জলে আরও কয়েকটি লবণ যোগ করা যায়, যেমন, পটাসিয়াম লবণ, ম্যাগনেসিয়াম লবণ ইত্যাদি, তাহা হইলে সেই দ্রবণে

উদ্ভিদটি প্রায় স্বাভাবিকভাবেই বাঁচিয়া থাকে। এইক্ষেত্রে যখন শুধুমাত্র সোডিয়াম ক্লোরাইড ছিল তখন উদ্ভিদ দেহে দ্রুত সোডিয়াম ও ক্লোরিন আয়ন প্রবেশ করিতেছিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা ক্ষতিকারক মাত্রায় পৌঁছাইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য লবণের উপস্থিতি কোন বিশেষ আয়নের অতিরিক্ত শোষণে বাধা আরোপ করে ফলে তাহা কখনই ক্ষতিকারক মাত্রায় পৌঁছাইতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় যে, উদ্ভিদটি বেশী দিন বাঁচিয়া থাকে। এইরূপ ঘটনাকে, অর্থাৎ একটি আয়নের প্রবেশে অন্য আয়নের "বাধা সৃষ্টি" করার ঘটনাকে, **অ্যান্টাগোনিজম** বা **"আয়নের বাধা দান"** বলা হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল পর্যায় সারণী (periodic table)তে যে সকল মৌলগুলি পরস্পর নিকট সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ একই দলভুক্ত (same group) তাহাদের মধ্যে বেশী পারস্পরিক "বাধাদান" দেখিতে পাওয়া যায় না, যতটা দেখিতে পাওয়া যায় দূর সম্পর্ক যুক্ত বা ভিন্ন দলভুক্ত মৌলগুলির মধ্যে। সেইজন্য দেখা যায় সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের (Group I) পারস্পরিক বাধাদান সোডিয়াম-ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ম-ম্যাগনেসিয়ামের (between Gr. I & II) মত অত তীব্র নহে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে বাধাদানকারী আয়নের অতি সামান্যই (trace) এই কার্যের পক্ষে যথেষ্ট।

এখন পর্যন্ত এইরূপ বাধা সৃষ্টির যে সকল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনটাই বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য হয় নাই। যেমন, একটি ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে ক্যালসিয়াম মাখনের ন্যায় অবদ্রব (butter type emulsion) এবং সোডিয়াম ক্রিমের ন্যায় অবদ্রব (cream type emulsion) সৃষ্টি করে। উক্ত অবদ্রবগুলি ঝিল্লীর ভেদ্যতার (permeability) উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এইরূপ অবদ্রব সৃষ্টি করিতে যত পরিমাণ আয়ন প্রয়োজন হয় তাহার তুলনায় বাধা সৃষ্টি করিতে আয়নের প্রয়োজন হয় অতি নগণ্য।

অপরদিকে উদ্ভিদ জগতে অ্যান্টাগোনিজমের বিপরীত ঘটনা, সাইনারজি (synergy) দেখিতে পাওয়া যায়। এইক্ষেত্রে একটি আয়নের উপস্থিতি অন্য আয়নের প্রবেশকে ত্বরান্বিত করে।

আয়ন শোষণের পদ্ধতি (Mechanism of Ion absorption)

উদ্ভিদের লবণ শোষণ শুধুমাত্র একটি ভৌত ঘটনা (physical phenomenon) নহে, উহা কোষের বিপাকীয় অবস্থা দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং উদ্ভিদের লবণ শোষণ দুই ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে, যথা, নিষ্ক্রিয় শোষণ (passive absorption) এবং সক্রিয় শোষণ (active absorption)।

(ক) নিষ্ক্রিয় শোষণ বহিঃমাধ্যম ও কোষের আভ্যন্তরীণ আয়নের **ঘনত্ব (ionic concentration)** দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শোষণ। ইহা **ঝিল্লীর ভারসাম্য (membrane equilibrium)** এবং ম্যাস অ্যাকসান **তত্ত্ব (law of mass action)** দ্বারা পরিচালিত হয়।

(খ) সক্রিয় শোষণ হইল বিপাকীয় অবস্থার সহিত সম্বন্ধযুক্ত আয়ন শোষণ। সক্রিয় শোষণে কোষ রাসায়নিক বিভব-ক্রমের বিরুদ্ধে (against chemical potential gradient) আয়ন সঞ্চয় করে বলিয়া প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়।

ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় আয়ন শোষণ সম্পন্ন হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোষের বাহির ও ভিতরের দ্রাবের ঘনত্ব পরস্পর সমান না হয় ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। যদি বাহিরের দ্রাবের ঘনত্ব বেশী হয় অর্থাৎ তাহার রাসায়নিক বিভব (chemical potential) কোষের অভ্যন্তরের দ্রাবের রাসায়নিক বিভব অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে বাহির হইতে কোষ অভ্যন্তরে ঝিল্লীর মধ্য দিয়া দ্রাবের অণু প্রবেশ ঘটিতে থাকিবে। এই শোষণে উভয় প্রকার আয়নই (ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন) শোষিত হইতে পারে। কিন্তু যখন রাসায়নিক বিভব ক্রমের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ বাহিরের দ্রাবের ঘনত্ব কোষের অভ্যন্তরে ঘনত্ব অপেক্ষা কম থাকে) আয়ন শোষিত হয় তখন সেই শোষণকে সক্রিয় শোষণ বলা হয়।

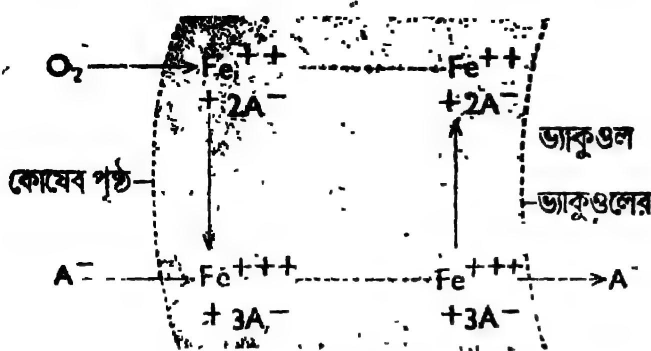
সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন তথ্যের দ্বারা লবণ শোষণ প্রণালীর ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেই ব্যাখ্যাগুলি নিয়ে নিয়ে আলোচনা করা হইল—

1. বৈদ্যুতিক রাসায়নিক তথ্য (Electrochemical theory)—এই তথ্যের প্রবর্তক হইলেন বিজ্ঞানী লুন্ডিগার্ড (Lundegardh)। তিনি মনে করেন যে মৃত্তিকার অবস্থিত মূলের বহিঃত্বকে পজেটিভ ও নেগেটিভ আধান (charge) যুক্ত পদার্থ থাকে যাহাদিগের খনিজ লবণের নেগেটিভ ও পজেটিভ আধান যুক্ত আয়নগুলি যথাক্রমে যুক্ত হয়। জীবিত উদ্ভিদ কোষে সাইটোক্রোম (cytochrome) নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এই সাইটোক্রোম নামক পদার্থটি cyanide নামক বিষাক্ত পদার্থের দ্বারা দূষিত হইতে পারে এবং সেই কারণে ইহা শ্বাসকার্যের বিঘ্ন ঘটাইয়া লবণের শোষণে বাধা প্রদান করে। সাইটোক্রোম অক্সিডেজ (Cytochrome oxydase) নামক একপ্রকার এনজাইমের সাহায্যে সাইটোক্রোম বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত (oxidized) হয়। জারিত সাইটোক্রোমে তিনটি পজেটিভ আধানযুক্ত লৌহ পরমাণু (Fe^{+++}) ফেরিক অবস্থায় (ferric state) থাকে যাহা বিজারিত (reduced) হইলে দুইটি পজেটিভ আধানযুক্ত (Fe^{++}) ফেরাস (Ferrous) অবস্থায় পরিণত হয়।

জীবিত কোষের কোষপ্রাচীরের বহিঃপৃষ্ঠটি বাহিঃস্থ মাধ্যমের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকে। কোষপ্রাচীরের ভিতর দিকে এবং উহার সহিত সংলগ্ন প্লাজমা ঝিল্লী (Plasma membrane) অবস্থান করে। ইহার পরবর্তী স্তরে সাইটোপ্লাজমের একটি মাধ্যম (matrix) আছে যাহা টোনোপ্লাস্ট (tonoplast) দ্বারা ভ্যাকুওল (vacuole) হইতে পৃথক। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে সাইটোক্রোম ব্যাপিত অবস্থায় (diffused state)

১। সাইটোক্রোম একটি অত্যন্ত জটিল রঞ্জিত (pigmented) রাসায়নিক যৌগ বস্তু যাহার সহিত হিমোগ্লোবিনের অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহার মধ্যে লৌহ আছে। সাইটোক্রোম শ্বসনকালে অংশগ্রহণ করে এবং প্রধানত হাইড্রোজেন বহনকারী হিসাবে কাজ করে (hydrogen carrier)।

থাকে। লুনডিগড় মনে করেন যে শোষণের পূর্বে মৃত্তিকাস্থিত লবণ অ্যানায়ন (anions) বা (A^-) ও ক্যাটায়ন (cations) বা (K^+)-এ বিশ্লিষ্ট হয়। বহিঃস্থ মাধ্যমের মধ্য দিয়া অ্যানায়ন কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সাইটোক্রোম ইহাকে গ্রহণ করিয়া সাইটোক্রোম অ্যানায়নের একটি জটিল পদার্থ $CYt^{+++}A^-$(cytochrome anion complex) গঠন করে। এই পদার্থটি পরবর্তী সাইটোক্রোমে ইহার অ্যানায়নটিকে (A^-) স্থানান্তরিত করে। ইহার ফলে উহাও অনুরূপ অ্যানায়নের জটিল পদার্থে পরিণত হয়। এইরূপে সাইটোক্রোম হইতে সাইটোক্রোমে অ্যানায়ন কোষমধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে প্রতিটি সাইটোক্রোমের দুইটি অবস্থা আছে অর্থাৎ জারিত অবস্থা (Cyt^{+++}) এবং বিজারিত অবস্থা (Cyt^{++})। প্রারম্ভিক অবস্থায় সাইটোক্রোম বিজারিতভাবে অবস্থান করে। বিজারিত সাইটোক্রোম একটি ইলেকট্রন (electron) যুক্ত করিয়া জারিত হয়। এই জারিত সাইটোক্রোম (Cyt^{+++}) ক্রমে জটিল অ্যানায়নঘটিত পদার্থ গঠন করে। এই অ্যানায়ন সাইটোক্রোম হইতে সাইটোক্রোমে সঞ্চারিত হয়। আবার কোন একটি বিজারিত সাইটোক্রোম যখন ইলেকট্রন বিমোচনের দ্বারা জারিত হয় তখন এই মুক্ত ইলেকট্রন পূর্ববর্তী জারিত সাইটোক্রোমের সহিত যুক্ত হইয়া উহাকে বিজারিত করে। এইরূপে দেখা যায় যে কোনো একটি সাইটোক্রোম একবার জারিত ও পুনরায় বিজারিত হইতেছে। এইপ্রকার জারণ বিজারণের ফলে অ্যানায়নসমূহ কোষের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে ও ইলেকট্রনগুলি বিপরীত পথ অনুসরণ করিয়া কোষের বাহিরে নির্গত হয়। ইলেকট্রনগুলি বহিঃস্থ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সহিত ক্রিয়ার দ্বারা জলে পরিণত হয়। কোষের মধ্যে অ্যানায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবার ফলে কোষমধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজম ও বহিঃস্থ মাধ্যমের মধ্যে বিভব প্রভেদ-এর (Potential difference) সৃষ্টি হয়, যাহার ফলে বহিঃস্থ ক্যাটায়ন (K^+) কোষ মধ্যে প্রবেশ করে।



২০২নং চিত্র—নেগেটিভ আয়নের শোষণ

2. **নির্বাচনী শোষণ তথ্য** (Selective absorption theory)—বৈদ্যুতিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিপক্ষে যাহারা মত পোষণ করেন তাঁহাদের ধারণা হইল যে উদ্ভিদকোষ সকল প্রকার লবণের আয়ন শোষণ করিতে পারে না। তাঁহাদের মতে কতকগুলি বিশেষ প্রকৃতির লবণের আয়নই উদ্ভিদকোষ কর্তৃক নির্বাচন দ্বারা শোষিত হয়।

3. স্টিউয়ার্ড (Steward) এবং তাঁহার সমসাময়িক বিশেষজ্ঞগণের মতে লবণের শোষণ ও প্রোটিন সংশ্লেষ (Protein synthesis)-এর মধ্যে নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান।

তাহাদের মধ্যে কোষ অথবা কোষসমষ্টির বাহিরে ফসফরাস-ঘটিত প্রোটিন (Phospho-Proteins) কয়েক প্রকার লবণের সহিত বিক্রিয়ায় একপ্রকার জটিল রাসায়নিক পদার্থ গঠন করে যাহা কোষের মধ্যে অ্যানায়ন ও ক্যাটায়ন প্রবেশে সহায়তা করে।

4. **বেনেট-ক্লার্কের মতবাদ** (Bennet-Clark's hypothesis)—1956 খ্রীষ্টাব্দে বেনেট-ক্লার্ক নামক বিজ্ঞানীদ্বয় এই মত প্রকাশ করেন যে, কোষ মধ্যে উভয় অ্যানায়ন ও ক্যাটায়ন প্রবেশের জন্য একটিমাত্র বাহক (carrier)-এর প্রয়োজন হয়। তিনি বলেন যে এই বাহকটি হইল লেসিথিন (lecithin) নামক একপ্রকার ফশফোলাইপিড (Phospholipid) এই বাহকটিতে একটি কলিন (cholin) ও একটি ফসফ্যাটাইড (Phosphatide)-এর গোষ্ঠী আছে। কলিনগোষ্ঠী অ্যানায়নগুলির বন্ধনে এবং ফসফ্যাটাইড গোষ্ঠী ক্যাটায়ন যুক্তকরণে সহায়তা করে।

যখন অ্যানায়ন ও ক্যাটায়ন উভয়ই লেসিথিনের বহিঃস্থ তলের সংস্পর্শে আসে তখন উহারা লেসিথিনের আভ্যন্তরিক তলে পরিবাহিত হয়। এই সময় লেসিথিন কলিন (cholin) ও ফসফ্যাটিডিক অ্যাসিড (Phosphatidic acid)-এ বিশ্লিষ্ট হয় এবং ইহার ফলে উভয় অ্যানায়ন ও ক্যাটায়ন মুক্ত করে। কলিন ও ফসফ্যাটিডিক অ্যাসিড পুনরায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হইয়া লেসিথিন পুনর্গঠিত করে। প্রথমে কলিন অ্যাসিটিলেজ (*cholin acetylase*) নামক *এনজাইম* ও *সহ-এনজাইম* ATP-এর সহায়তায় অ্যাসিটিল কলিন (*acetycholin*) গঠিত হয় যাহা কলিন এসটারেজ (cholin esterase) নামক এনজাইমের সহায়তায় লেসিথিনে পরিণত হয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে কিরূপে কোষ হইতে কোষান্তরে আয়নগুলি পরিবাহিত হয়। এই বিষয়ে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে একটি মতবাদ হইল যে উদ্ভিদদেহের সকল জীবিত কোষই একটিমাত্র জীবন্ত একক রূপে বা সিমপ্লাস্ট (symplast) নামে পরিগণিত হয় কারণ সকল জীবিত কোষগুলির মধ্যেই প্লাস-মোডেসমীয় সংযোজন (Plasmodesmal connection) দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই এই সিমপ্লাস্টের diffusion gradient বা ব্যাপন মাত্রার প্রভেদের ফলে আয়ন পরিবাহিত হয়। অপর মতবাদটির প্রবর্তক হইল লুনডিগড় (Lundegardh)। তাঁহার মতে মূলের বহির্ভাগে আয়নগুলির ঘনত্ব সর্বাধিক। কর্টেক্স হইতে আরম্ভ করিয়া স্টেল (stele)-এর অভ্যন্তর পর্যন্ত এই ঘনত্ব ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে।

৪

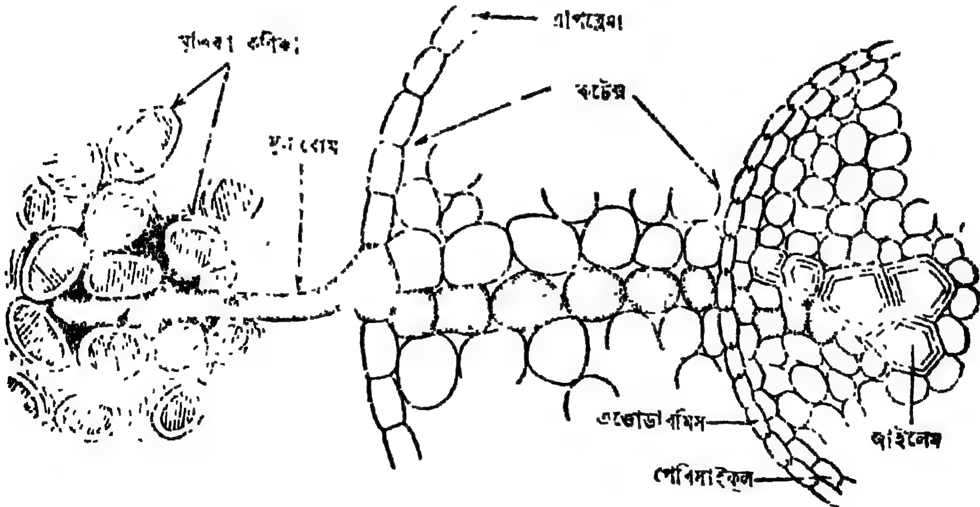
জল সংবহন
(Conduction of Water)

মূলরোম কর্তৃক মৃত্তিকা হইতে শোষিত জল Root pressure বা মূলজ প্রেষ এবং transpiration বা প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদদেহে সংবাহিত হয়।

মূলজ প্রেষ (Root Pressure)

মূলজ প্রেষের প্রক্রিয়া (Mechanism of root pressure)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মৃত্তিকাস্থিত কৈশিক জল বা capillary water এন্ড-অসমোসিস প্রক্রিয়ায় মূলরোমে প্রবেশ করে। এখন মূলরোম সংলগ্ন কর্টেক্সের কোষের কোষরস মূলরোমের কোষরস অপেক্ষা ঘন বলিয়া অভিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় কর্টেক্সের কোষমধ্যে জল প্রবেশ করে। কর্টেক্সের কোষগুলি এইরূপে জলশোষণের ফলে রসস্ফীত হয় ও মূলরোমগুলি শ্লথ হইয়া পড়ে। শ্লথ মূলরোম পুনরায় অভিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকা হইতে কৈশিক জল শোষণ করে। অনুরূপে কর্টেক্সের দ্বিতীয় স্তরের কোষের ঘনত্ব প্রথম স্তর অপেক্ষা অধিক বলিয়া উহা প্রথম স্তর হইতে অভিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় জল শোষণ



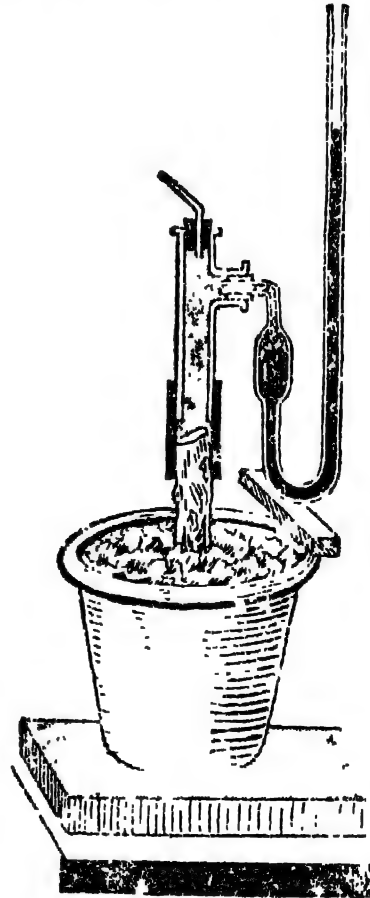
২০৩ নং চিত্র—মূলের মধ্যে মৃত্তিকাস্থিত কৈশিক জলের প্রবেশ

করিয়া রসস্ফীত হয়। এইরূপে কোষান্তর অভিস্রাবণ বা cell to cell osmosis (২০৩নং চিত্র) প্রক্রিয়ায় জল কর্টেক্সের কোষ হইতে জাইলেম নালিকা সংলগ্ন কোষে প্রবেশ করে। ইহার ফলে কোষগুলি পর্যায়ক্রমে রসস্ফীত ও শ্লথ হয়। জাইলেম নালিকাটি মৃত এবং ইহার সুদৃঢ় প্রাচীরগাত্রে অসংখ্য সূক্ষ্ম পাতলা অঞ্চল আছে যাহাদের pits

বা গহ্বর বলে। এখন জাইলেম নালিকা সংলগ্ন সজীব কোষ ও মৃত জাইলেম নালিকার মধ্যে অভিস্রাবণ প্রক্রিয়া চলিতে পারে না। সুতরাং ঐ সকল সজীব কোষের গহ্বরের মধ্য দিয়া জল জাইলেম নালিকার মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাতে কর্টেক্সের কোষগুলি পুনরায় শ্লথ হয় এবং পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে থাকে। মূলের কর্টেক্সের কোষগুলি এইরূপ সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে উহারা একপ্রকার চাপের সম্মুখীন হয় যাহাকে মূলজ প্রেষ root pressure বলে। উদ্ভিদবিজ্ঞানী গ্রীন (Green)-এর মতে যে চাপের প্রভাবে অতিমাত্রায় স্ফীত কর্টেক্সের কোষ হইতে কিছু পরিমাণ রস জাইলেম নালিকার মধ্যে প্রবেশ করে তাহাকে মূলজ প্রেষ বলে। উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্টাইলস্ (Styles)-এর মতে যে চাপের প্রভাবে মূলের সজীব কোষ হইতে রস জাইলেম নালিকায় প্রবেশ করে তাহাই হইল মূলজ প্রেষ। সাধারণভাবে বলা যায় যে জাইলেম নালিকা সংলগ্ন কর্টেক্সের কোষগুলির মিলিত রসস্ফীতির ফলে একপ্রকার চাপের সৃষ্টি হয় যাহার জন্য রস জাইলেম নালিকায় প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিতে থাকে। এই চাপকে মূলজ প্রেষ বলে।

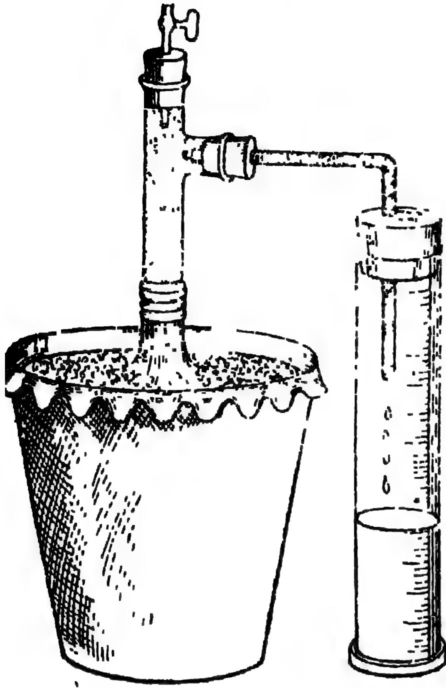
বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা উদ্ভিদের মূলজ প্রেষ প্রমাণ করা যায়। ইহারা নিম্নে বর্ণিত হইল ; যথা—

৭নং পরীক্ষা (২০৪নং চিত্র)— একটি চবের গাছের কাণ্ডকে মৃত্তিকার কিছু উপরে কাটিয়া ইহার সহিত একটি T-আকৃতি বিশিষ্ট কাচনল রবার নলের সাহায্যে সংযুক্ত কর। T-নলের horizontal বা শায়িত অংশের সহিত একটি mercury manometer বা পারদ ম্যানোমিটার যুক্ত কর। ম্যানোমিটারটি একটি U নল বিশেষ যাহার ছোট বাহুতে একটি বালব আছে এবং ইহার অর্ধেক পারদ দ্বারা পূর্ণ থাকে। সংযোগ স্থানগুলিকে প্যারাফিন দ্বারা উপযুক্তরূপে বায়ুরোধক কর। এইবার T-নল ও বাল্বের উপরের অংশ জলপূর্ণ করিয়া উহার উপরের অংশটিকে কর্কের সাহায্যে বন্ধ কর। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা যাইবে যে ম্যানোমিটারের দীর্ঘ বাহুর পারদ তলটি কিছু উপরে উঠিয়াছে। এইরূপে দুইটি বাহুর পারদ তলের পার্থক্য হইতে মূলজ প্রেষের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।



২০৪নং চিত্র—মূলজ প্রেষ

৮নং পরীক্ষা (২০৫নং চিত্র)—একটি বাঁকানো পার্শ্বনল সমেত কাচনল লও। ইহার উপর প্রান্তে একটি স্টপকক্ আছে। একটি টবের গাছের কাণ্ডকে মৃত্তিকার কিছু উপরে কাটিয়া ইহার সহিত কাচনলটিকে রবার নলের সাহায্যে যুক্ত কর। একটি মাপক চোঙ বা measuring cylinder লও যাহার মুখটি ছিপির দ্বারা বন্ধ। এখন কাচনলের পার্শ্বনলটিকে ঐ ছিপির ছিদ্রের মধ্য দিয়া মাপক চোঙে প্রবেশ করাও এবং সংযোগ স্থানগুলিকে প্যারাফিন দ্বারা উপযুক্তরূপে বায়ুরোধক কর। এই প্রক্রিয়ায় মাপক চোঙস্থ সঞ্চিত জলের বাষ্পীভবন বন্ধ হইয়া যাইবে। এখন স্টপকক্‌টি খুলিয়া কাচনলের ভিতর এইরূপে জল ঢাল যাহাতে ইহার তল পার্শ্বনল পর্যন্ত পৌঁছায়। দুই-একদিন বাদে দেখা যাইবে যে মাপক চোঙের মধ্যে জল সঞ্চিত হইয়াছে। সঞ্চিত জলের পরিমাণই হইল মূলজ চাপের মানের পরিচায়ক।



২০৫নং চিত্র—মূলজ প্রেষ

মূলজ প্রেষ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় কারণগুলি

(Conditions necessary for root pressure)

অনেকগুলি কারণ দ্বারা মূলজ প্রেষ নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় কারণগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল ; যথা—

1. তাপমাত্রা (Temperature)—মৃত্তিকা অথবা বায়বীয় তাপমাত্রা মূলজ প্রেষকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রায় 35° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রার সীমার মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পাইলে মূলজ প্রেষও বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পায়।

2. বাতান্বয়ন (Aeration)—মৃত্তিকার বাতান্বয়ন বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পাইলে মূলজ প্রেষও বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পায়।

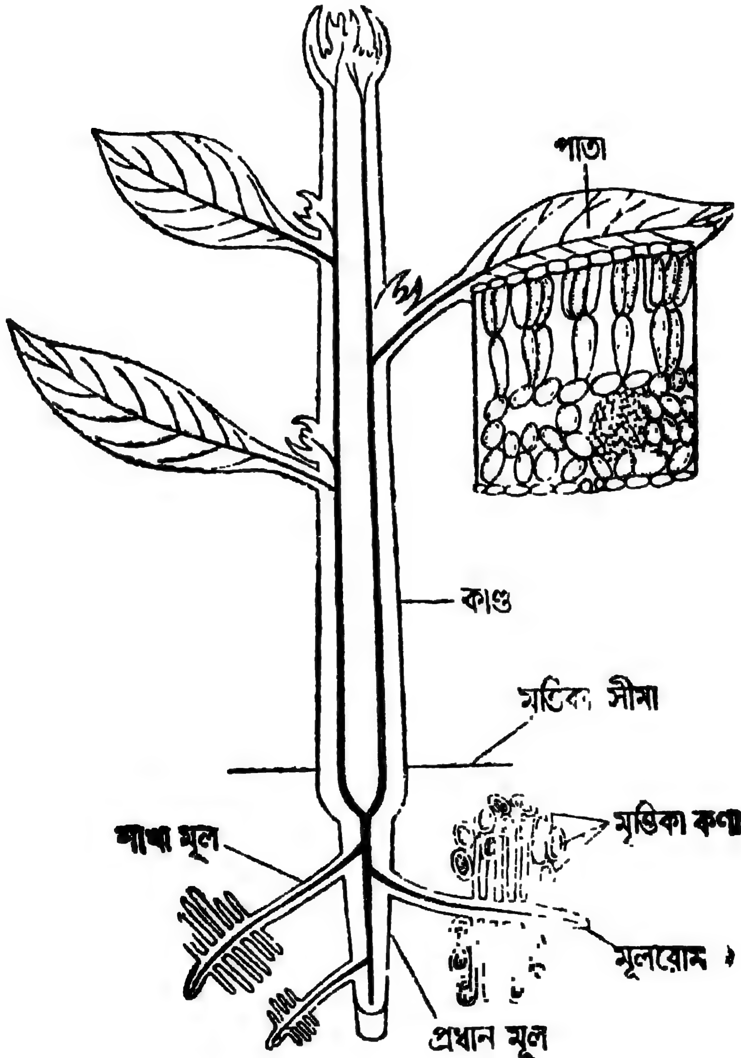
3. জল (Moisture)—মৃত্তিকায় কৈশিক জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে জলশোষণও বৃদ্ধি পায় এবং ইহাতে মূলজ প্রেষের পরিমাণও প্রচুর বৃদ্ধি পায়।

4. মৃত্তিকায় লবণ দ্রবণের ঘনত্ব (Concentration of salt in the soil)—অধিক হইলে শোষণ মাত্রা তথা মূলজ প্রেষও হ্রাস পায়।

প্রস্বেদন (Transpiration)

ইহা অবিদিত নহে যে জলই উদ্ভিদের জীবন। বিভিন্ন জৈবনিক কার্য সম্পাদনের জন্য উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণ জল মৃত্তিকা হইতে শোষণ করে কিন্তু ইহার অল্প পরিমাণই উদ্ভিদের প্রয়োজনে আসে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল উদ্ভিদ পাতা, কাণ্ড প্রভৃতি বায়বীয় অংশ হইতে বাষ্পাকারে বহির্মাধ্যমে বাহির করিয়া দেয়। এই ঘটনাকে transpiration বা প্রস্বেদন বলে।

মূলদ্বারা শোষিত জল পাতার শিরায় পৌঁছায় এবং তথা হইতে পাতার মেসোফিল কোষে প্রবেশ করে (২০৬নং চিত্র)। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ইমবাইবিশন (imbibition)

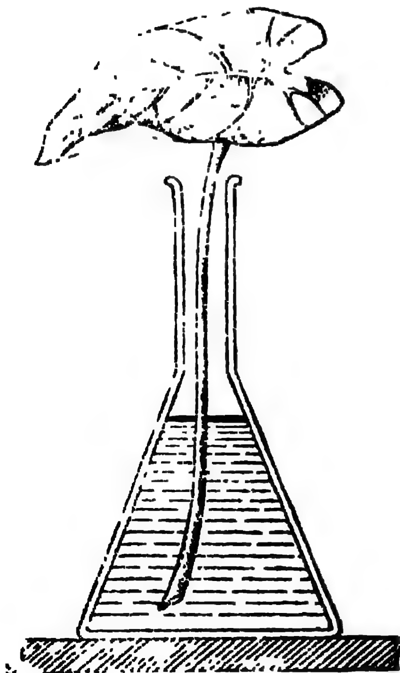


২০৬নং চিত্র—উদ্ভিদের কোষের মধ্যে জলের অনুপ্রবেশ ও বহির্গমন দেখান হইয়াছে

প্রক্রিয়ায় মেসোফিল কোষের ভিতর হইতে বাহিরে আসে। ইহার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাহা কোষরসের অভিস্রাবণ চাপ বা osmotic pressure অপেক্ষা অধিক। যদি জলীয় বাষ্প দ্বারা বায়ু সংপৃক্ত বা saturated না হয় কেবল তখনই ইমবাইবিশন প্রক্রিয়া ক্রিয়া করে। মেসোফিল কোষের বহির্ভাগে অবস্থিত জল এখন বাষ্পীভবন হইয়া কোষ-

মধ্যবর্তী বায়ুপূর্ণ স্থানগুলিকে ব্যাপন ক্রিয়ার বা diffusion সাহায্যে ইহার দ্বারা পূর্ণ করে। এই জলীয় বাষ্পের অধিকাংশই এখন কোষমধ্যবর্তী স্থান হইতে পত্ররন্ধ্রের বা substomatal air chamber-এর বাহিরে আসে। অতএব যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মূল-দ্বারা প্রচুর পরিমাণে জল শোষিত হইয়া রসস্রোতের বা transpiration current-এর সাহায্যে উদ্ভিদের বায়বীয় অংশে পরিবাহিত হইয়া অবশেষে প্রোটোপ্লাস্ট কর্তৃক বাষ্পাকারে নির্গত হয় তাহাকে প্রস্বেদন বলে। মনে রাখিতে হইবে যে প্রস্বেদন ও বাষ্পীভবন বা evaporation একই প্রক্রিয়া নহে। যদি তাহা হইত সমপরিমাণ জল সমান ক্ষেত্রফলের জলতল ও সজীব উদ্ভিদের তল হইতে একই সময়ে বাষ্পাকারে নির্গত হইত। দেখা গিয়াছে যে নির্দিষ্ট সময়ে উদ্ভিদের সজীব তলের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফল হইতে যে পরিমাণ প্রস্বেদন হয় তাহা ঐ ক্ষেত্রফলের জলতলের বাষ্পীভবন অপেক্ষা কিছু কম। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে প্রস্বেদন বাষ্পীভবনের রূপান্তর মাত্র এবং ইহার পরিমাণ কোষস্থিত প্রোটোপ্লাজম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রস্বেদন প্রধানত তিন প্রকারের হয়, যথা—(*a*) পত্ররন্ধ্রীয় বা stomatal, (*b*) কিউটিকলীয় বা cuticular এবং (*c*) লেণ্টিসেলীয় বা lenticular। সাধারণত পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন অন্যান্য অপেক্ষা অধিক মাত্রায় সংঘটিত হয়; কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষত বায়ুতে জলীয় বাষ্পের প্রাচুর্য ঘটিলে কিউটিকলীয় প্রস্বেদন পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে অতিশয় ঘন কিউটিকলের মধ্য দিয়াও প্রস্বেদন হইতে পারে। কতিপয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে লেণ্টিসেলীয় প্রস্বেদন হইতে দেখা যায়।



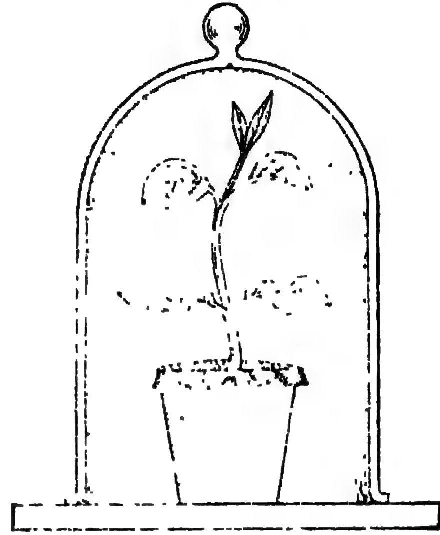
২০৭নং চিত্র—প্রস্বেদন

নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় প্রস্বেদন নির্ণয় করা যায়। যথা—(*i*) উদ্ভিদের ওজনের হ্রাস দ্বারা, (*ii*) একক সময় যে পরিমাণ জল বাষ্পাকারে নির্গত হইবে, অথবা (*iii*) উদ্ভিদ কর্তৃক জল শোষণ ও জল মোচনের হার নির্ণয়ের দ্বারা। নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা প্রস্বেদন প্রক্রিয়া কিরূপে হয় তাহা জানিতে পারা যায়; যথা,—

৯নং পরীক্ষা (২০৭নং চিত্র)—একটি ত্রিকোণাকার চ্যাপ্টা ফ্লাস্ক লইয়া প্রায় অর্ধেক জলপূর্ণ কর। এখন একটি বৃন্তযুক্ত পাতা (যথা, কচুপাতা) লইয়া বৃন্তটিকে জলে ডুবাইয়া দাও। জলে কয়েক ফোঁটা অলিভ তৈল ঢালিয়া ফ্লাস্কটিকে ওজন কর। 2-3 ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইলে ফ্লাস্কটিকে পুনরায় ওজন কর। দেখা যাইবে যে ইহার ওজন

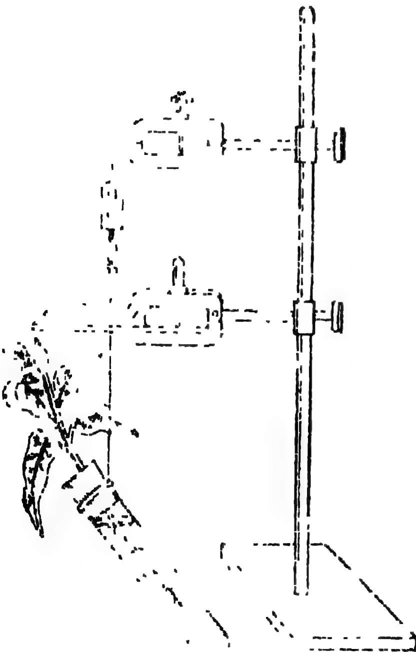
কমিয়াছে। দুইটি ওজনের পার্থক্যের পরিমাপই হইল ঐ নির্দিষ্ট সময়ের প্রস্বেদনের পরিমাণ।

১০নং পরীক্ষা (২০৮নং চিত্র)—অনেকক্ষণ সূর্যালোকে আছে এইরূপ একটি টবের গাছ লইয়া একখণ্ড রবারের চাদরের সাহায্যে কাণ্ডের চারিদিক দিয়া টবের মৃত্তিকা আবৃত কর। এইবার টবটিকে একটি কাঁচের বেলজারের মধ্যে রাখ। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা যাইবে যে বেলজারের ভিতরের গায়ে জলকণা সঞ্চিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে উদ্ভিদ প্রস্বেদনের সময় যে জলীয় বাষ্প নির্গত করে তাহা বেলজারের শীতল গাত্রের সংস্পর্শে আসিয়া জলকণায় পরিণত হয়।



২০৮নং চিত্র—প্রস্বেদন

১১নং পরীক্ষা (২০৯নং চিত্র)—পাতা সমেত একটি কাণ্ডের অংশ জলের নিচে কাটিয়া উহাকে যত শীঘ্র সম্ভব একটি জলপূর্ণ টেস্টটিউবে রাখ। ইহাতে বিপরীত চাপের সৃষ্টি হয় না এবং উদ্ভিদদেহে সহজেই জল প্রবেশ করিতে পারে। এখন বাষ্পীভবন দমন করিবার জন্য জলে স্বল্প অলিভ তৈল ঢাল। এইবার টেস্ট-টিউবটিকে স্প্রিং-তুলা বা spring balance হইতে ঝুলাইয়া দিয়া উহার ওজন নির্ণয় কর। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে পুনরায় উহার ওজন নির্ণয় কর। দেখা যাইবে যে উহার ওজন কিছু কমিয়াছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে পাতা সমেত কাণ্ডটি প্রস্বেদন দ্বারা জলমোচন করিয়াছে যাহার ফলে টেস্ট-টিউবের ওজন হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

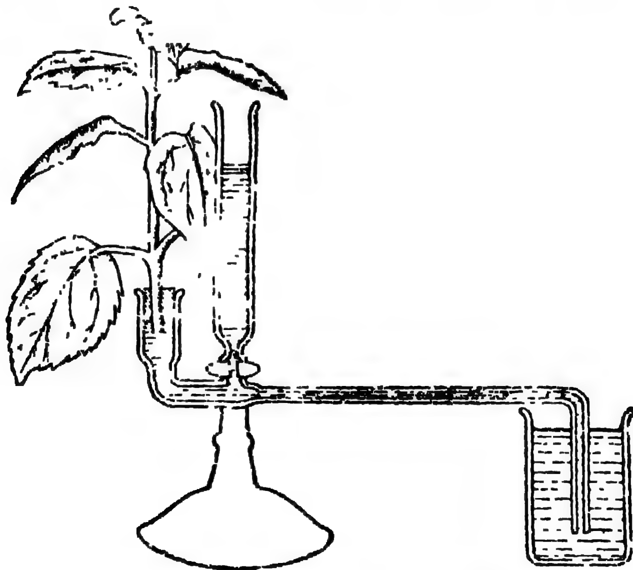


২০৯নং চিত্র—স্প্রিং-তুলার সাহায্যে প্রস্বেদন

১২নং পরীক্ষা: সাধারণ পোটোমিটার বা Common potometer সমান ব্যাসের ছিদ্রযুক্ত একটি দীর্ঘ কাচনল লইয়া জলপূর্ণ কর এবং ঐ জলের পরিমাণ মাপক চোঙের বা measuring cylinder সাহায্যে নির্ণয় কর। যে পরিমিত নলের দৈর্ঘ্য এক মিলিমিটার জল ধারণ করিতে পারে উহা মাপ এবং ঐ হিসাবে একটি graph

paper বা গ্রাফ কাগজ অংশাঙ্কিত করিয়া নলের সহিত যুক্ত কর। এখন কাচনলটির উভয় প্রান্তের কিছু অংশ সমকোণীরূপে বিপরীত দিকে বাঁকাইয়া দুইটি বাহু গঠন কর। ইহার একটি বাহুর সহিত একটি রবার নল রাখ এবং সমগ্র যন্ত্রটিকে জলপূর্ণ পাত্রে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দাও। এখন পাতা সমেত একটি ক্ষুদ্র কাণ্ড জলের মধ্যে কাটিয়া রবার নলের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং সংযোগ স্থলগুলিকে বায়ুরুদ্ধ কর। এখন কাচ-নলটিকে জল হইতে তুলিয়া অপর বাহুটিকে জলপূর্ণ বীকারে ডুবাইয়া দাও। ইহার পূর্বে ঐ বাহুটিকে জল হইতে ঈষৎ তুলিয়া মৃদু আঘাত করিয়া একটি ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্ গঠন কর। সমগ্র যন্ত্রটিকে এইরূপে স্থাপন কর যেন বুদ্‌বুদটি কাণ্ড হইতে দূরে অবস্থান করে। এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে বুদ্‌বুদটি কাণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এখন স্টপ ওয়াচের সাহায্যে বিভিন্ন সময় বুদ্‌বুদটির অবস্থান নির্ণয় করিয়া একক সময় উহার অবস্থান হিসাব করিলে প্রস্বেদন হার জানিতে পারা যায়।

১৩নং পরীক্ষা ঃ (২১০নং চিত্র) গ্যানোর পোটোমিটার (*Ganong's Potometer*)—গ্যানোর পোটোমিটার হইল একটি শায়িত অংশাঙ্কিত কাচনল যাহার উভয় প্রান্তের কিছু অংশ সমকোণীরূপে বাঁকিয়া দুইটি বাহু গঠন করিয়াছে। উপরের বাহুর শেষপ্রান্তটি অপেক্ষাকৃত চওড়া এবং ইহা একটি ছিদ্রযুক্ত রবার কর্ক দ্বারা বন্ধ করা যায়। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটি বিটপের কাণ্ড প্রবেশ করান যায়। শায়িত নলের

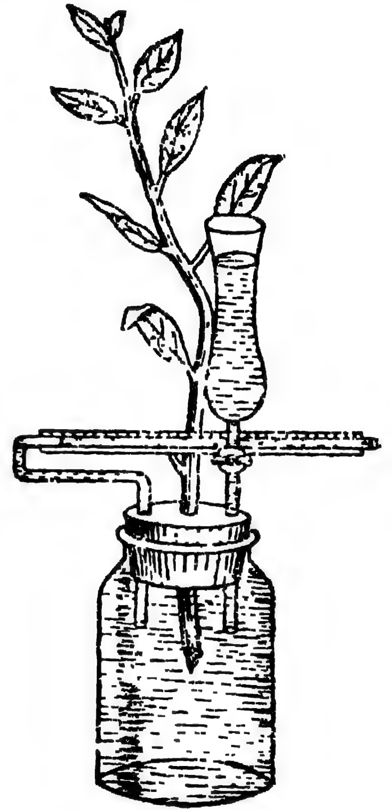


২১০নং চিত্র—গ্যানোর পোটোমিটার

এই প্রান্তের নিকট স্টপকক্ যুক্ত একটি কাচের জলাধার খাড়াভাবে উহার সহিত যুক্ত করা হইয়াছে।

পোটোমিটারকে প্রথমে জলে ডুবাইয়া রাখ। একটি বিটপকে জলের মধ্যে কাটিয়া তাড়াতাড়ি খণ্ডিত কাণ্ডটিকে রবার কর্কের ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কর্কটিকে চওড়া

প্রান্তের যথাযথ স্থানে স্থাপন কর। ইহাতে বিপরীত চাপের সৃষ্টি হয় না এবং উদ্ভিদ দেহে সহজেই জল প্রবেশ করিতে পারে। এখন সংযোগ স্থানগুলিকে প্যারাফিন দ্বারা উপযুক্তভাবে বায়ুরোধক কর। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে জলাধারের স্টপকক্‌টি যেন বন্ধ থাকে নলের সরু বাহুটিকে এখন একটি জলপূর্ণ বীকারের জলে ডুবাইয়া দাও। কয়েক মুহূর্তের জন্য ইহাকে বীকারের জল হইতে তুলিয়া একটি ক্ষুদ্র বুদবুদ শায়িত নলের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং ইহার অবস্থান লক্ষ্য কর। এইরূপে যত সময় যাইবে দেখা যাইবে যে বুদবুদটি ক্রমে শায়িত নলের বিটপটির দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিপট কর্তৃক প্রস্বেদনের ফলেই বুদবুদটি এইরূপে সরিয়া যাইতেছে। স্টপ-ওয়াচের সাহায্যে বিভিন্ন সময় বুদবুদটির অবস্থান লক্ষ্য করিয়া একক সময় ইহার অবস্থান হিসাব করিয়া দেখিলেই প্রস্বেদনের হার জানিতে পারা যায়। বুদবুদটি জলাধার নলের প্রায় শেষপ্রান্তে পৌঁছাইলে ইহার স্টপকর্ক খুলিয়া বুদবুদটিকে পূর্বতন স্থানে আনয়ন করা যায় অথবা পূর্বের ন্যায় নূতন বুদবুদ সৃষ্টি করা যায়।



২১১নং চিত্র—ফারমারের পোটোমিটার

১৪নং **পরীক্ষা**ঃ ফারমারের পোটোমিটার (*Farmer's Potometer*—২১১নং চিত্র)—ইহা একটি আয়তাকার মুখ-বিশিষ্ট কাচের বোতল এবং মুখটি তিনটি ছিদ্রযুক্ত রবারের ছিপি দ্বারা বন্ধ। একটি ছিদ্রের মধ্যে পাতা সমেত কাণ্ডের অংশ প্রবেশ করাইতে হয় এবং অবশিষ্ট দুইটির মধ্যে একটিতে স্টপকক্‌ যুক্ত জলের আধার ও অপরটিতে তিনবার বাঁকানো অংশাংকিত একটি কাচনলের নল প্রবেশ করান হইয়াছে।

গ্যানোর পোটোমিটারের ন্যায় এই পোটোমিটারের মূল নীতি একই প্রকার। শায়িত নলের অংশটি শোষণের হার নির্দেশ করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যন্ত্রটির ওজনের তারতম্য হইতে ঐ সময়ে প্রস্বেদনের পরিমাণ জানিতে পারা যায়।

পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন প্রণালী (Mechanism of Stomatal transpiration)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে stomata বা পত্ররন্ধ্রগুলি প্রস্বেদনের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ। ইহারা দিবাভাগে খুলিয়া যায় কিন্তু রাত্রে বন্ধ থাকে। যদিও আমরা বলিয়া থাকি পত্ররন্ধ্রের রন্ধ্রটি বন্ধ হইয়া যায় তথাপি উহাদের কদাচিৎ সম্পূর্ণ

বন্ধ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি পত্ররন্ধ্র দুইটি lenticular বা মসূরাকার guard cells বা রক্ষিকোষ ও pore বা রন্ধ্রের সমষ্টি। রক্ষিকোষের রন্ধ্রসংলগ্ন ভিতরের প্রাচীরটি স্থূল কিন্তু বহির্ভাগের কোষপ্রাচীর পাতলা। রক্ষিকোষগুলি পাতার একপ্রকার epidermal বা ত্বককোষ হইলেও ইহাদের ক্লোরোপ্লাস্ট (chloroplast) থাকে যাহা অন্যান্য ত্বককোষে দেখা যায় না এবং প্রতি রক্ষিকোষে একটি করিয়া সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে। বর্তমানে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে রক্ষিকোষের turgidity বা রসস্ফীতির তারতম্যের ফলে পত্ররন্ধ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। পত্ররন্ধ্রের এইপ্রকার চলন প্রধানত বিভিন্ন প্রকার পত্ররন্ধ্রের গঠনের উপর নির্ভর করে। পত্ররন্ধ্রের প্রকৃত হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ নির্ণয়ে প্রভূত মতবিরোধ থাকিলেও সাধারণভাবে বলা যায় যে সূর্যালোকে রক্ষিকোষের অন্তর্গত শ্বেতসার পদার্থগুলির hydrolysis বা আর্দ্র-বিশ্লেষণের ফলে উহারা দ্রবণে পরিণত হয়, যাহার ফলে উহাদের রসস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। ইহাতে রক্ষিকোষের বহির্ভাগের পাতলা প্রাচীরটি ভিতরের স্থূল প্রাচীর অপেক্ষা অধিক মাত্রায় প্রসারিত হয় এবং ইহার ফলে রন্ধ্রের আকার বৃদ্ধি পায়। কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন যে, রাত্রি আগমনের সাথে শ্বাসকার্যের ফলে রক্ষিকোষগুলিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যাহার ফলে উহাদের কোষরসের অম্লতাও বৃদ্ধি পায়। ইহাতে কোষমধ্যস্থ কোলয়ডীয় পদার্থগুলি পৃথক হইয়া রন্ধ্রগুলিকে বন্ধ করিয়া দেয়। আবার দিবাভাগে শ্বাসকার্যের দ্বারা নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড photo-synthesis বা সালোকসংশ্লেষে ব্যয়িত হয়। ইহাতে রক্ষিকোষগুলির কোষরসের অম্লতা হ্রাস হওয়ায় কোলয়ডীয় পদার্থগুলি ইমবাইবিশন (imbibition) প্রক্রিয়ায় পুনরায় জল গ্রহণ করে এবং তাহার ফলে রন্ধ্রগুলির আকার বৃদ্ধি পায়। পরন্তু প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণের মতে রক্ষিকোষের ক্লোরোপ্লাস্ট সূর্যালোকের সাহায্যে দ্রবণীয় শর্করা উৎপাদন করে যাহার জন্য উহাদের রসস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে পত্ররন্ধ্রের আকার অপেক্ষা stomatal frequency বা রক্ষিকোষের সংখ্যাধিক্যের অর্থাৎ পত্রতলের একক ক্ষেত্রফলে যে পরিমাণ পত্ররন্ধ্র থাকিবে তাহার উপর প্রস্বেদনহার অধিক মাত্রায় নির্ভর করে।

পত্ররন্ধ্রের প্রাত্যহিক হ্রাস-বৃদ্ধি প্রায় নিয়মিতরূপে সংঘটিত হয় এবং ইহা কতকগুলি কারণের উপর নির্ভরশীল। কারণগুলি হইল যথাক্রমে, আলোক তাপমাত্রা রক্ষিকোষে জলের পরিমাণ এবং উহাদের pH-এর মান।

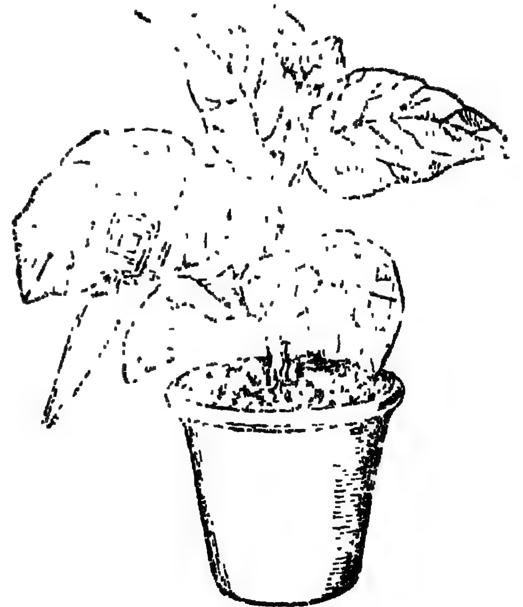
Lyoid (লয়েড) নামক বিজ্ঞানী পরীক্ষার দ্বারা পত্ররন্ধ্রের আকার নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং Darwin (ডারউইন) নামক বিজ্ঞানী তাঁহার পরীক্ষার দ্বারা বিভিন্ন উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির হারের পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরীক্ষাগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল—

১৫নং পরীক্ষা ঃ লয়েডের পরীক্ষা (*Lyoid's experiment*)—দিবা ভাগে *Rheo discolor* বা জহরচাঁপা এবং অন্যান্য উদ্ভিদের পত্রত্বকগুলির অংশ ছাড়াইয়া লইয়া সত্বর absolute alcohol বা নির্জল কোহলে ডুবান হইল। অল্পক্ষণ পরে অণুবীক্ষণ

যন্ত্রের সাহায্যে ইহাদের পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে পত্ররন্ধ্রগুলি দ্রুত জল বিমোচন করিলেও ইহারা কুঞ্চিত হয় না এবং রন্ধ্রগুলির আকার অপরিবর্তিত থাকে। এখন মাইক্রোমিটার (*micrometer*) দ্বারা বিভিন্ন প্রত্বকের পত্ররন্ধ্রের আকার মাপিতে হইবে। ইহাতে রন্ধ্রগুলির আকারের তারতম্য জানিতে পারা যাইবে।

১৬নং পরীক্ষা: ডারউইন নির্মিত পোরোমিটার (*Darwin's Porometer*)—এই যন্ত্রের সাহায্যে পত্ররন্ধ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণের হার নির্ণয় করা যায়। ইহা এক প্রকার কাঁচের T নল বিশেষ যাহার পার্শ্বীয় বাহু দুইটি রবারের নলদ্বারা যুক্ত। এই নলের খাড়া বাহুটি একটি পারদপূর্ণ অথবা জলপূর্ণ বীকারে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে। নলের শায়িত অংশের একটি বাহু রবার নলের সাহায্যে একটি ফানেলের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। অপর বাহুটিও একটি রবারের নলের সহিত যুক্ত এবং ইহা একটি clip (ক্লীপ) দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছে। এখন পাতা সমেত একখণ্ড কাণ্ডকে কাটিয়া সত্বর জলপূর্ণ বীকারে ডুবাইয়া দাও। পাতার যে অংশে পত্ররন্ধ্র থাকে সেই স্থানে ফানেলটি স্থাপন করিয়া জিলেটিন বা গ্লু দ্বারা বায়ুরোধক করিয়া পরীক্ষা আরম্ভের পূর্বে ক্লীপটি আলগা করিয়া রবার নলে মুখ দিয়া কিছু বায়ু টানিয়া লও। ইহাতে খাড়া নলের মধ্য দিয়া পারদ অথবা জল কিছু উপরে উঠিবে। এই অবস্থায় রবার নলের ক্লীপটি দ্রুত বন্ধ কর। পাতার যে অঞ্চলে ফানেলটি স্থাপন করা হইয়াছে সেই অঞ্চলে যদি পত্ররন্ধ্র না থাকে তাহা হইলে খাড়া নলের পারদস্তম্ভ বা জলস্তম্ভটি স্থির থাকিবে কিন্তু ঐ অঞ্চলে পত্ররন্ধ্র থাকিলে উহা ক্রমশ নামিয়া যাইবে। স্টপওয়াচের সাহায্যে পারদস্তম্ভ বা জলস্তম্ভের পতনের হার নির্ণয় কর। এইরূপে বিভিন্ন উদ্ভিদ লইয়া এই পরীক্ষা সম্পাদন করিলে দেখা যাইবে যে বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ইহা বিভিন্ন।

দেখা গিয়াছে যে প্রস্বেদনের পরিমাণ নানাবিধ বহিঃস্থ কারণের উপর নির্ভর করে ঐ সকল কারণগুলিকে NTPতে রাখিয়া কোন নির্দিষ্ট উদ্ভিদ বা উদ্ভিদসমষ্টি প্রতি একক ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট অঞ্চল হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল বায়ুতে বাষ্পাকারে ত্যাগ করে। ইহাকে ঐ উদ্ভিদের বা উদ্ভিদসমষ্টির transpiration coefficient বা প্রস্বেদনাঙ্ক বলে।



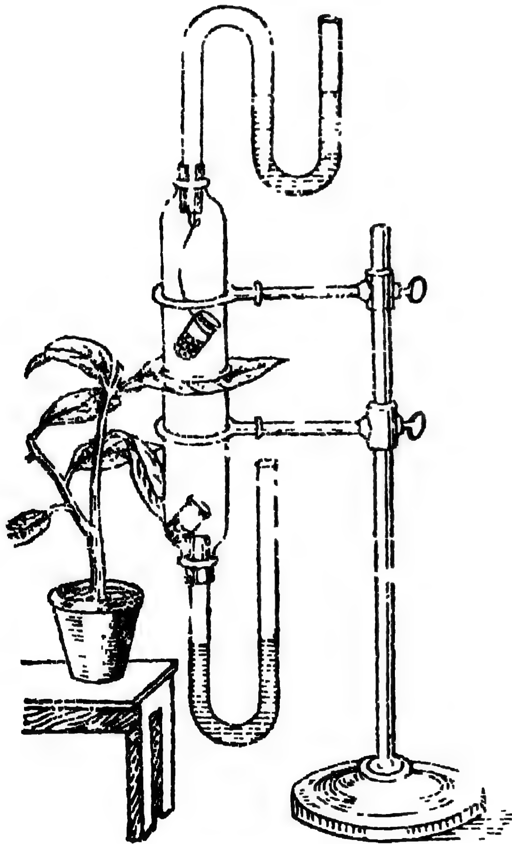
২১২নং চিত্র—তুলনামূলক প্রস্বেদন

তুলনামূলক প্রস্বেদন (Comparative transpiration)—পাতার উভয় তলে পত্ররন্ধ্রগুলি সমভাবে বণ্টিত নহে। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিষমপৃষ্ঠ পাতার নিম্নতলে, একবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উভয় তলে এবং ভাসমান পত্রের ক্ষেত্রে

পাতার উপরিতলে পত্ররন্ধ্র দেখা যায়। ইহার ফলে পাতার উভয় তলে প্রস্বেদনের তারতম্য ঘটে। নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা ইহা বুঝান হইয়াছে—

১৭নং পরীক্ষা—দুইটি rectangular বা আয়তক্ষেত্রের আকারবিশিষ্ট Cobalt chloride paper বা কোবল্ট ক্লোরাইড কাগজ লও এবং উহাদের একটি dorsiventral leaf বা বিষমপৃষ্ঠ পাতাযুক্ত টবের গাছের পাতার উভয় তলে স্থাপন করিয়া দুইটি কাচের প্লেট দ্বারা উহাদের আবৃত কর। এখন ক্লীপ দ্বারা প্লেট দুইটিকে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া কিনারায় ভেসলিন লাগাইয়া উহাদের উপযুক্তরূপে বায়ুরোধক কর। কয়েক ঘণ্টা পরে ক্লীপ ও প্লেট খুলিলে দেখা যাইবে যে পাতার নিম্নতলে অবস্থিত কাগজটি ঈষৎ লোহিত বর্ণের হইয়াছে কিন্তু উপরের পাতাটি প্রায় একই রূপ রহিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে বিষমপৃষ্ঠ পাতার ক্ষেত্রে উপরিতল অপেক্ষা নিম্নতলে অধিক মাত্রায় প্রস্বেদণ হইয়া থাকে।

১৮নং পরীক্ষা—দুইটি সমব্যাসযুক্ত কাচের ছোট বেলজার লও। ইহাদের মুখগুলির প্রত্যেকটি একটি ছিদ্রযুক্ত রবারের ছিপি দ্বারা বন্ধ। যে বেলজারটি পাতার উপরিতলে স্থাপন করিতে হইবে তাহার ছিপির ছিদ্র দিয়া দুইবার বাঁকানো একটি manometer tube বা ম্যানোমিটার নল প্রবেশ করাও এবং বেলজারের ভিতরের দিকে ছিপির সহিত একটি হুক আটকাইয়া দাও। অনুরূপে অপর বেলজারের ছিপির ছিদ্র দিয়া কেবলমাত্র একবার বাঁকানো একটি ম্যানোমিটার নল প্রবেশ করাও। একটি টেস্ট-টিউবে নির্ধারিত ওজনের কিছু ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (calcium chloride) লইয়া উপরের জারের হুক হইতে সুতার দ্বারা ঝুলাইয়া দাও এবং সম ওজনের অপর একটি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডপূর্ণ টেস্ট-টিউব দ্বিতীয় বেলজারে রাখিয়া দাও। ম্যানোমিটার নলগুলিতে কিছু অলিভ অয়েল (olive oil) লও। এখন বিষমপৃষ্ঠ পাতাযুক্ত একটি টবের গাছ লইয়া একটি পাতার উভয় তলে বেলজার দুইটিকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন কর এবং সংযোগ স্থানগুলিকে ভেসলিন দ্বারা বায়ুরোধক কর। কয়েক ঘণ্টা পরে টেস্ট-টিউব দুইটিকে বেলজার হইতে বাহির করিয়া পুনরায় ওজন করিলে দেখা যাইবে যে নিম্নের বেলজারের অন্তর্গত টেস্ট-টিউবের ওজন উপরের


২১৩নং চিত্র—তুলনামূলক প্রস্বেদন

বেলজারের টেস্ট-টিউবের ওজন অপেক্ষা অধিক। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে বিষমপৃষ্ঠ পাতার ক্ষেত্রে উপরিতল অপেক্ষা নিম্নতলে অধিক মাত্রায় প্রস্বেদন হইয়া থাকে।

প্রস্বেদনের গুরুত্ব (Significance of transpiration)—প্রস্বেদন সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য জানা যাইলেও ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক বিবরণ এখনও অজ্ঞাত। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে প্রস্বেদন হইল necessary and unavoidable evil অর্থাৎ প্রয়োজনীয় কিন্তু অপরিহার্য ক্ষতিকারক কার্য। আবার কাহারও কাহারও মতে ইহা উদ্ভিদের একটি অত্যাবশ্যক জৈবনিক কার্য। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের যুক্তি হইল যে (*a*) প্রস্বেদন দ্বারা উদ্ভিদ অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় জল শোষণ করে; (*b*) ইহা শোষণ করিতে যে শক্তি ব্যয়িত হয় তাহা উদ্ভিদ অন্যান্য জৈবনিক কার্য সমাধানে ব্যবহার করিতে পারিত এবং (*c*) দ্রুত প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

যে সকল বিজ্ঞানীর মতে প্রস্বেদন হইল একটি অত্যাবশ্যক জৈবনিক কার্য তাঁহাদের যুক্তিগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল—

(*a*) খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য পাতায় অজৈব লবণ সরবরাহ করা প্রস্বেদনের একটি প্রধান কার্য;

(*b*) প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদ মূলরোম দ্বারা শোষিত অতিরিক্ত জল দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়;

(*c*) মূল হইতে পাতায় রস পরিচালনার ব্যাপারে প্রস্বেদনই আংশিক দায়ী;

(*d*) ইহা উষ্ণপ্রধান অঞ্চলের উদ্ভিদকে অপেক্ষাকৃত শীতল রাখে;

(*e*) প্রস্বেদনের দ্বারা পত্ররন্ধ্রের যে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় তাহা সালোকসংশ্লেষ ও শ্বাস-কার্যকে প্রভাবিত করে।

প্রস্বেদন প্রভাবিত করিতে প্রয়োজনীয় কারণগুলি (Factors influencing transpiration)

বাহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ উভয় প্রকার কারণই প্রস্বেদনকে প্রভাবিত করিতে পারে। ইহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

A. বহিঃস্থ কারণ (External factors)

1. **আলোক (*Light*)**—আলোক প্রস্বেদনহারকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে। ওয়াইজনার (Wiesner) নামক বিজ্ঞানী প্রমাণ করিয়াছেন যে উন্মুক্ত সূর্যালোকে এবং এমনকি diffused daylight বা বিকীর্ণ দিবালোকেও প্রস্বেদনহার বৃদ্ধি পায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পত্ররন্ধ্র খুলিতে বা বন্ধ করিতে আলোকের যথেষ্ট প্রভাব আছে। দিবালোকে পত্ররন্ধ্র খুলিয়া যায় এবং আলোকের অভাব ঘটিলে উহারা বন্ধ হইয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে intensity of light বা আলোকের তীব্রতার দ্বারা প্রস্বেদনহার নিয়ন্ত্রিত হয়। অধুনা বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে আলোকের

সাহায্যে প্রোটোপ্লাজম অধিকমাত্রায় permeable বা ভেদ্য হয় বলিয়া কোষপ্রাচীরগুলি দ্রুত সিক্ত হইয়া প্রস্বেদনহার বৃদ্ধি করে।

2. **আর্দ্রতা** (*Humidity*)—বায়ুমণ্ডলের relative humidity বা আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিবর্তন হইলে প্রস্বেদনহারেরও পরিবর্তন হয়। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অধিক হইলে প্রস্বেদন হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ইহা স্বল্প হইলে প্রস্বেদনও বৃদ্ধি পায়।

3. **তাপমাত্রা** (*Temperature*)—ইহার সহিত প্রস্বেদনের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নাই। ইহার কারণ বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার তারতম্য ঘটিলে ইহার আর্দ্রতারও তারতম্য ঘটে, যাহার ফলে প্রস্বেদনের হ্রাস বা বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইলে ইহাতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় যাহার ফলে প্রস্বেদনও বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য অত্যুষ্ণ দিবসে অত্যধিক প্রস্বেদনের ফলে পাতাগুলি নিস্তেজ হইয়া ঝুঁকিয়া পড়ে। মনে রাখিতে হইবে আর্দ্রতা অপরিবর্তিত রাখিয়া তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিলে অথবা তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রাখিয়া আর্দ্রতা হ্রাস পাইলে প্রস্বেদনও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়।

4. **বায়ুপ্রবাহ** (*Wind*)—বায়ুপ্রবাহের ফলে পাতা হইতে সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের স্তর দূরীভূত হয় যাহার ফলে প্রস্বেদনহারও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য দিবাভাগে শুষ্ক বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইলে প্রস্বেদন মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হইল যে দিবাভাগে বায়ুপ্রবাহ অতিমাত্রায় প্রবল হইলে পত্ররন্ধ্রগুলি বন্ধ হইয়া যায় যাহার ফলে প্রস্বেদন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

5. **বায়ুমণ্ডলের চাপ** (*Atmospheric pressure*)—বায়ুমণ্ডলের চাপের স্বল্প পরিবর্তন হইলে প্রস্বেদনহার প্রায় অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়। পরীক্ষার দ্বারা অবশ্য প্রমাণ করা যায় যে বায়ুমণ্ডলের চাপ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে প্রস্বেদনহার বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য উচ্চ পর্বতের উপর অবস্থিত উদ্ভিদগুলির ক্ষেত্রে প্রস্বেদনহার বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়, অবশ্য মৃত্তিকা এবং অন্যান্য বায়বীয় কারণগুলির মাত্রা যদি সঠিকভাবে বজায় থাকে।

6. **মৃত্তিকায় জল সরবরাহ** (*Water supply in the soil*)—মৃত্তিকায় অধিক-মাত্রায় জল সরবরাহ করিলে জলশোষণ বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে প্রস্বেদনহারও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পরন্তু সরবরাহ হ্রাস হইলে প্রস্বেদনও হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

B. অভ্যন্তরস্থ কারণ (Internal factors)

1. **পত্ররন্ধ্র** (*Stomata*)—পূর্বে মনে করা হইত যে পত্ররন্ধ্রগুলিই একমাত্র প্রস্বেদনহার নিয়ন্ত্রিত করে; কিন্তু অধুনা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে জৈবনিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাই একমাত্র প্রস্বেদনহার নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। লফট্‌ফিল্ড (Loftfield) নামক বিজ্ঞানীর মতে পত্ররন্ধ্রগুলির আকার অর্ধেকের অধিক হইলে ইহারা প্রস্বেদনহার নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ অক্ষম।

2. **মেসোফিল কলায় জলের পরিমাণ** (*Water content of the mesophyll tissue*)—মেসোফিল কলায় জলধারণ করিবার ক্ষমতার উপর প্রস্বেদনহার নির্ভর করে। মেসোফিল কলা হইতে ক্রমাগত জলের পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকিলে ইহার জল ধারণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যাহার ফলে প্রস্বেদনহার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

অতিরিক্ত প্রস্বেদন রোধ করিবার উপায় (Contrivances for checking excessive transpiration)

অতিমাত্রায় প্রস্বেদন বিভিন্ন প্রণালীতে রোধ হইয়া থাকে। ইহাদের নিম্নে বর্ণনা করা হইল ; যথা—

1. **প্রস্বেদন ক্ষেত্রের হ্রাস** (*Reduction in transpiring surface*)—(*a*) প্রস্বেদন ক্ষেত্রের অস্থায়ী হ্রাস (*i*) শীতকালীন শুষ্ক আবহাওয়াতে অথবা শীত আগমনের পূর্বে বহু গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িতে দেখা যায়। ইহাতে প্রস্বেদনহার বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ; (*ii*) পাতাগুলি এইরূপভাবে গুটাইয়া যায় যে পাতার যে পৃষ্ঠে পত্ররন্ধ্র থাকে তাহা পাতার ভিতরের দিকে অবস্থান করে ; সুতরাং পাতাগুলি এমন স্থানে থাকে যেখানে বায়ু স্বভাবতই অনেকটা স্থির।

(*b*) প্রস্বেদন ক্ষেত্রের স্থায়ী হ্রাস—(*i*) পাতা আকারে ক্ষুদ্র হয় ; (*ii*) পাতাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে ; (*iii*) পাতা সূচ্যাকার বা রসাল হয় ; (*iv*) কাণ্ড রসাল হয় ; (*v*) বৃন্ত পর্ণবৃন্তে পরিণত হয় ও (*vi*) দেহমধ্যে তরুক্ষীর সঞ্চিত হয়।

2 **প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রিত করিতে কলাস্থানের গঠন** (*Histological structures controlling transpiration*)—কর্ক, কিউটিকল, মোম, মিউসিলেজ, sunken stomata বা নিহিত পত্ররন্ধ্র প্রভৃতির দ্বারা প্রস্বেদনহার হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

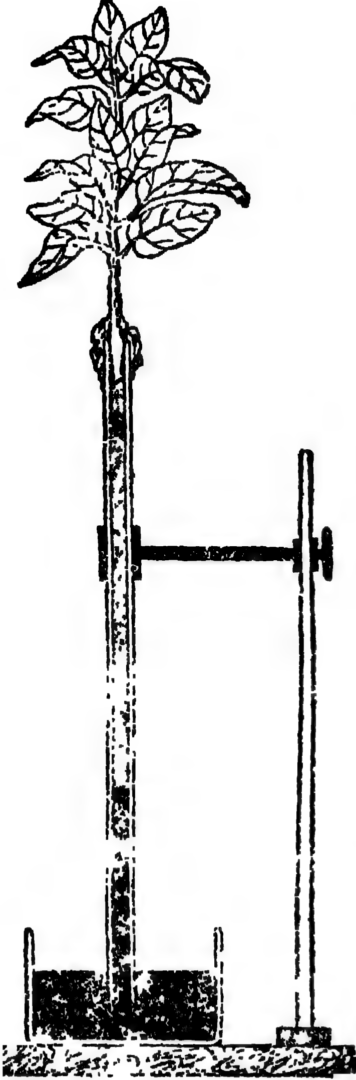
3. **প্রস্বেদন সংযত করিতে নূতন অঙ্গাবরণ** (*Investing organs for reducing transpiration*)—রোম, মুকুলাবরণ, উপপত্র প্রভৃতি আবরণের দ্বারা প্রস্বেদন সংযত হয়।

4. **দীপন নিয়ন্ত্রণ** (*Regulation of illumination*)—আলোকের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে প্রস্বেদনহারও বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য পাতাগুলি খাড়াভাবে অথবা আলোকরশ্মির সমান্তরালভাবে সজ্জিত হইতে দেখা যায়। ইহাতে অল্পসংখ্যক আলোকরশ্মি পাতার উপর পতিত হয়।

রসস্রোত (Transpiration current)

প্রস্বেদনের ফলে মেসোফিল কোষের কোষরস গাঢ় হয়। সেই কারণে ইহা osmosis বা পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় নিকটবর্তী কোষ হইতে জল আকর্ষণ করে। জলের এই আকর্ষণ ক্রমে cell to cell osmosis বা কোষান্তর পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় পাতার জাইলেম নালিকা

পর্যন্ত পৌঁছায়। এখন পাতার জাইলেম হইতে মূলের জাইলেম নালিকা অবিচ্ছিন্ন ও অতি সূক্ষ্ম এবং ইহার মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন জলের স্তর থাকে। কাজেই প্রস্বেদনের ফলে মেসোফিল কোষে অবস্থিত জলের আকর্ষণের জন্য জাইলেম নালিকায় প্রবল suction force বা শোষণ বলের সৃষ্টি হয়। ইহাতে জাইলেম নালিকার মধ্য দিয়া ক্রমাগত জল উপরে উঠিতে থাকে, যাহার ফলে ইহাতে একপ্রকার স্রোতের সৃষ্টি হয়। এই স্রোতকে transpiration current বা রসস্রোত বলে।



২১৪নং চিত্র—প্রস্বেদনকালে জলের শোষণ

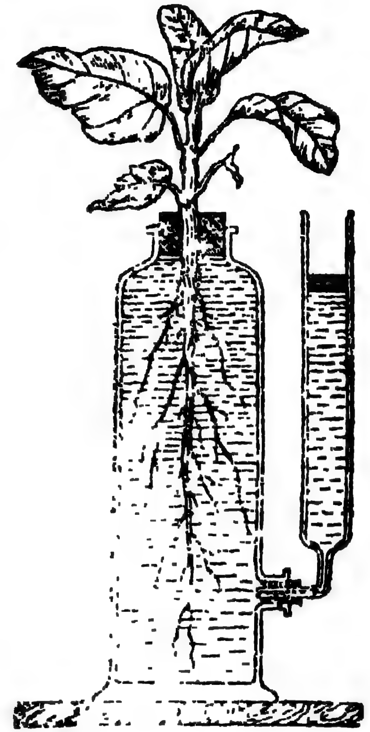
১৯নং **পরীক্ষা:** প্রস্বেদনকালে জলের শোষণ (*Suction due to transpiration*—২১৪নং চিত্র)—নয়নতারা বা হাস্নাহানার একটি বিটপ জলের মধ্যে কাটিয়া ইহাকে সত্বর একখণ্ড রবার নলের সাহায্যে জলের মধ্যে অবস্থিত একটি কাচ নলে প্রবেশ করাও। সংযোগ স্থলগুলিকে উপযুক্তরূপে বায়ুরোধক কর। এখন বিটপ সমেত কাচনলটিকে একটি পাত্র মধ্যস্থ পারদে এইরূপে ডুবাইয়া দাও যাহাতে কোন বায়ুর বুদ্বুদ কাচনলে প্রবেশ না করে। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা যাইবে যে কাচনলের মধ্যে কিছু পারদ প্রবেশ করিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রস্বেদনকালে বিটপটি কাচনল হইতে জল শোষণ করে, যাহার ফলে কাচনলমধ্যস্থ জলে একপ্রকার suction force বা শোষণ বলের সৃষ্টি হয়। এই শোষণ বল পারদস্তম্ভে সঞ্চারিত হয় বলিয়া ইহা উপরে উঠে।

প্রস্বেদনের সহিত শোষণের সম্বন্ধ (Relation between transpiration and absorption)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রস্বেদনের সময় উদ্ভিদ যে পরিমাণ জল নির্গত করে তাহা মূলরোম দ্বারা মৃত্তিকা হইতে ক্রমাগত শোষিত জলের সাহায্যে পূরণ হয়। যদি এই জলত্যাগের পরিমাণ জল শোষণের পরিমাণের সমান হয় তাহা হইলে পাতাগুলি সতেজ থাকে; কিন্তু যদি জলত্যাগের পরিমাণ অধিক হয় তাহা হইলে অত্যধিক প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদের বায়বীয় অংশের কোষগুলিতে রসস্ফীত চাপ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়

যাহার ফলে ইহা শ্লথ হইয়া ঝুঁকিয়া পড়ে। এইরূপ ঘটনাকে উইল্টিং বা শ্লথ অবস্থা (wilting) বলে। মৃত্তিকার যে শতাংশ জলে কোন নির্দিষ্ট উদ্ভিদ বা উদ্ভিদসমষ্টির এইপ্রকার শ্লথ অবস্থা দেখা যায় তাহাকে মৃত্তিকার coefficient of wilting বা শ্লথ অবস্থার গুণাঙ্ক বলে। যে সকল উদ্ভিদ স্থায়িভাবে এইরূপ শ্লথ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, মৃত্তিকায় জল সরবরাহ করিলে তাহারা পুনরায় সতেজ হইয়া উঠে।

২০নং **পরীক্ষা**ঃ প্রস্বেদনের সহিত শোষণের সম্বন্ধ (*Relation between transpiration and absorption*—২১৫নং চিত্র)—একটি চওড়া মুখযুক্ত এইরূপ একটি কাচের বোতল লও যাহার নিম্নভাগে একটি ছিদ্র আছে। ছিদ্রটি একটি ছিপির দ্বারা বন্ধ। বোতলের চওড়া মুখটিও একটি দ্বিখণ্ডিত রবারের ছিপির দ্বারা বন্ধ। নিম্নদিকে অবস্থিত ছিপির মধ্যে একটি বাঁকানো অংশাঙ্কিত পার্শ্বনল প্রবেশ করান হইয়াছে। এখন বোতলটি জলপূর্ণ কর। নয়নতারা অথবা অনুরূপ ছোট গাছ লইয়া দ্বিখণ্ডিত ছিপির মধ্য দিয়া এইরূপে বোতলে প্রবেশ করাও যাহাতে ইহার মূলটি সম্পূর্ণ জলের মধ্যে থাকে। সংযোগ স্থানগুলিকে উপযুক্ত রূপে বায়ুরোধক কর। এইবার পার্শ্বনলস্থ জলতলে অল্প olive oil বা অলিভ তৈল ঢাল কারণ ইহাতে জলমধ্যস্থ উন্মুক্ত জলতল হইতে বাষ্পীভবন বন্ধ হইবে। এখন বোতলটির ওজন লও এবং পার্শ্বনলস্থ জলতলের উচ্চতা নির্ণয় কর। কিছু সময় অতিবাহিত হইলে বোতলটির ওজন ও পার্শ্বনলের জলতলের উচ্চতা পুনরায় কর। দেখা যাইবে যে, ওজন এবং উচ্চতা উভয়ই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে পরিমাণ ওজন হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা প্রস্বেদনের পরিমাণ এবং যে পরিমাণ উচ্চতা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা জলশোষণের আয়তন নির্দেশ করে। যেহেতু 20° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এক মিলিলিটার আয়তন জলের ওজন এক গ্রাম, সেইজন্য শোষিত জলের আয়তন সংখ্যায় প্রকাশ করিলে উহার ওজনের সমান হইবে। এই পরীক্ষাটি নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে সম্পন্ন করিলে দেখা যাইবে যে, যে পরিমাণ জল প্রস্বেদনের দ্বারা নির্গত হয় তাহা শোষিত জলের ওজনের প্রায় সমান।



২১৫নং চিত্র— প্রস্বেদনের সহিত শোষণের সম্পর্ক

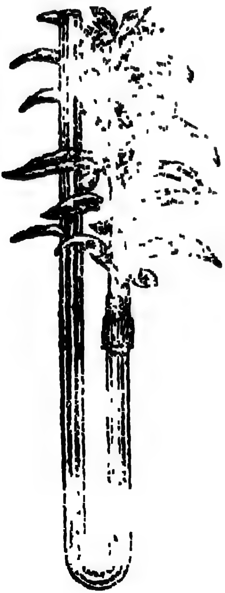
নিস্রাবণ (Exudation or Guttation)

পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রস্বেদনের সময় উদ্ভিদদেহ হইতে অতিরিক্ত জল যদি

তরল অবস্থাতেই উদ্ভিদদেহ হইতে নির্গত হয় তখন ইহাকে **exudation or guttation** বা নিস্রাবণ বলে। বহু প্রকার দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এইপ্রকার নিস্রাবণ দেখা যায়। কচু, দোপাটি, ট্রোপিওলাম (*Tropeolum*), বিভিন্ন প্রকার ঘাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে পাতার অগ্রভাগে অথবা প্রান্তে নিস্রাবণের দ্বারা জলবিন্দু জমিতে দেখা যায়।

সাধারণত জলশোষণ বৃদ্ধি এবং প্রস্বেদনহার হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে এইরূপ নিস্রাবণ দেখা যায়। সেইজন্য মৃত্তিকার উষ্ণতা, তাপমাত্রা ও জলীয় বাষ্পপূর্ণ আবহাওয়া এই প্রক্রিয়ার সহায়ক। নিস্রাবণের সহিত **root pressure** বা মূলজ প্রেষের নিকট সম্বন্ধ আছে। মূলজ প্রেষের বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলে নিস্রাবণ প্রক্রিয়ারও বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে। মৃত্তিকায় শর্করা বা লবণের জলীয় দ্রবণ মিশাইলে জলশোষণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে মূলজ প্রেষ ও নিস্রাবণও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং এমনকি ইহা বন্ধ হইয়াও যাইতে পারে। সাধারণত আর্দ্র ও উষ্ণ রাত্রিশেষে অথবা অতি প্রত্যূষে নিস্রাবণ হইতে দেখা যায়।

হাইডাথোড (Hydathode) অথবা **water stomata** বা জলরন্ধ্র নামক এক-প্রকার বিশেষ রন্ধ্রের মধ্য দিয়া নিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় জল নির্গত হয়। প্রতি রন্ধ্রের নিম্নে একটি **air chamber** বা বাতাবকাশ আছে যাহা এপিথেম (epithem) নামক এক-প্রকার প্যারেনকাইমা কোষদ্বারা বেষ্টিত। প্রতি বাতাবকাশের নিম্নে পাতার কোন একটি শিরার জাইলেম নালিকা অবস্থিত। জল শোষণের ফলে জাইলেম নালিকায় যে চাপের সৃষ্টি হয় তাহাতে কোষ-মধ্যবর্তী স্থানে জল প্রবেশ করে এবং তথা হইতে এই জল রন্ধ্রের মধ্য দিয়া বাহিরে নির্গত হয়। কোনো কোনো ঘাস এবং **Leguminosae** বা লেগুমিনোসী গোত্রীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়াও নিস্রাবণ হইয়া থাকে। নিস্রাবণ প্রক্রিয়ার দ্বারা নির্গত জল বিশুদ্ধ হইতে পারে অথবা ইহা শর্করা বা লবণের জলীয় দ্রবণও হইতে পারে।


২১৬নং চিত্র—নিস্রাবণ

২১নং পরীক্ষা : (২১৬ নং চিত্র)—একটি U-নল জলপূর্ণ করিয়া ইহার একটি মুখ ছিপির দ্বারা বন্ধ কর। একটি দোপাটি অথবা অনুরূপ কোন বিটপ জলের নিম্নে কাটিয়া উহাকে দ্রুত ছিপির ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাও। প্যারাফিন দ্বারা সংযোগ স্থানগুলিকে উপযুক্তরূপে বায়ু-রোধক কর। এখন U-নল হইতে কিছু জল বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া খোলা মুখ দিয়া কিছু পারদ ঢালিতে থাক। দেখা যাইবে যে পাতাগুলির প্রান্ত ও অগ্রভাগ দিয়া নিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় বিন্দু বিন্দু জল নির্গত হইতেছে।

প্রস্বেদন ও নিস্রাবণের প্রভেদ (Distinction between transpiration and exudation)

প্রস্বেদন (Transpiration)	**নিস্রাবণ (Exudation)**
1. জল বাষ্পাকারে নির্গত হয়।	1. জল তরল অবস্থায় নির্গত হয়।
2. নির্গত জল সর্বদাই বিশুদ্ধ।	2. নির্গত জলে লবণ অথবা শর্করা দ্রবীভূত থাকিতে পারে।
3. প্রস্বেদন সাধারণত পত্ররন্ধ্র, কিউটিক্‌ল্‌ অথবা লেন্টিসেলের মধ্য দিয়া সংঘটিত হয়।	3. নিস্রাবণ সাধারণত জলরন্ধ্র অথবা হাইডাথোডের মধ্য দিয়া সংঘটিত হয়।
4. পত্ররন্ধ্রের কার্যকলাপের দ্বারা প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রিত হয়।	4. নিস্রাবণ বলিতে গেলে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।
5. প্রস্বেদনের ফলে পাতার তাপমাত্রা হ্রাস পায়।	5 নিস্রাবণের ফলে পাতার তাপমাত্রার বিশেষ তারতম্য হয় না।
6. প্রস্বেদন প্রধানত দিবাভাগে হইয়া থাকে।	6. নিস্রাবণ প্রধানত রাত্রিশেষে অতি প্রত্যূষে সংঘটিত হয়।

রস-মোক্ষণ (Bleeding)—উদ্ভিদের কাণ্ড বা অন্যান্য অংশ কর্তন করিলে বা উহা আঘাত প্রাপ্ত হইলে ঐ স্থান হইতে একপ্রকার রস নির্গত হয়। ইহাকে bleeding বা রস-মোক্ষণ বলে। তাল, খেজুর প্রভৃতি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এইপ্রকার রস-মোক্ষণের দ্বারা উহাদের রস সংগ্রহ করা হয়।

উদ্ভিদদেহের অভ্যন্তরে জল সংবহন (Movement of water within the plant body)

বহুকাল পূর্ব হইতেই বিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে মূলদ্বারা শোষিত জল জাইলেম নালিকার দ্বারা উপর দিকে প্রবাহিত হইয়া পাতা অথবা উদ্ভিদের অন্যান্য সবুজ অংশে পৌঁছায় এবং ঐ স্থানে খাদ্য প্রস্তুত করার পর উহা ফ্লোয়েম দ্বারা উদ্ভিদের বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে অথবা সঞ্চয় অঙ্গে পরিবাহিত হয়। উদ্ভিদের আকার ক্ষুদ্র হইলে এইরূপ জল পরিবহনে স্বল্প চাপেরই প্রয়োজন হয়, কিন্তু উচ্চতা অধিক হইলে ঐ চাপের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম উদ্ভিদ হইল সিকুয়া (*Sequoca*) নামক এক-প্রকার প্রাচীন ব্যক্তবীজী পাইন জাতীয় উদ্ভিদ, যাহার উচ্চতা প্রায় 100 মিটারেরও অধিক হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত বর্তমান যে সকল উদ্ভিদ দেখা যায় তাহাদের মধ্যে ইউক্যালিপটাস (*Eucalyptus*), কয়েক প্রকার Palmae বা পাম গোত্রীয় উদ্ভিদও প্রচুর উচ্চতাসম্পন্ন হয়। জানা গিয়াছে যে প্রতি মিটার উচ্চতার জলের স্তরকে

যথাযথ ধারণ করিতে প্রায় 10 গুণ বায়বীয় চাপের প্রয়োজন হয় কিন্তু উহা যখন জাইলেম নালিকার মধ্য দিয়া উপরে উঠিতে থাকে তখন ঐ চাপের পরিমাণও প্রায় দ্বিগুণ হইয়া যায়।

রসের উৎস্রোত (Ascent of sap)—যে প্রক্রিয়ার দ্বারা রস উদ্ভিদের শোষণ অঞ্চল হইতে *gravity* বা অভিকর্ষের বিরুদ্ধে উহার উচ্চতম অংশে উত্থিত হয় তাহাকে *ascent of sap* বা রসের উৎস্রোত বলে।

রসের উৎস্রোত সম্বন্ধে মতবাদ (Theories of ascent of sap)

রসের উৎস্রোতের সঠিক কারণ নির্ণয়ে বর্তমানেও বিভিন্ন মতভেদ রহিয়াছে। বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন সময়ে এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় মতবাদ হইল ; যথা---

1. **মূলজ প্রেষসংক্রান্ত মতবাদ** (*Root pressure theory*)—কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করিতেন যে গুল্ম বীরুৎ শ্রেণী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জল শোষণের ফলে জাইলেম নালিকায় যে মূলজ প্রেষের সৃষ্টি হয় তাহার ফলে জল উপরে উঠিয়া পাতা ও শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে। কিন্তু উচ্চ বৃক্ষের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মূলজ প্রেষ এইরূপ রস উত্তোলনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। দেখা গিয়াছে যে রস উঠিতে হইতে প্রায় দুইগুণ বায়বীয় চাপের প্রয়োজন হয় কিন্তু উদ্ভিদের এই চাপের পরিমাণ অত্যধিক।

2. **অধিপ্রাণবাদ** (*Vitalistic theory*)—অধিপ্রাণবাদের মূল তত্ত্ব হইল যে মূলে জাইলেম নালিকাসংলগ্ন জীবিত কোষগুলি রসস্রোতে অংশগ্রহণ করে। গড্‌লিউস্কি (Godlewski) এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় এই তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। 1884 খ্রীষ্টাব্দে গড্‌লিউস্কির প্রকাশিত মতবাদ হইল যে medullary rays বা মজ্জাংশুস্থিত জীবিত কোষের নিয়মিতভাবে সংকোচন ও প্রসারণের ফলে উহাদের osmotic pressure বা অভিস্রবণ চাপেরও নিয়মিত হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে থাকে, যাহার ফলে রসস্রোতের সৃষ্টি হয়। আচার্য বসু বিশদ পরীক্ষার দ্বারা গড্‌লিউস্কির মতবাদ সমর্থন করিয়া রসের উৎস্রোত সম্বন্ধে অধিকতর বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। পরীক্ষাকালে তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে ডাল্ডেন এন্ডোডারমিস সংলগ্ন কর্টেক্সের জীবিত কোষের সহিত একটি গ্যালভানোমিটার (galvanometer) এর সংযোগ স্থাপন করিলেই ইহার needle বা কাঁটার deflection বা বিক্ষেপ ঘটে। ইহার দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সর্বনিম্ন কর্টেক্সের কোষগুলিতে একপ্রকার rhythmic pulsation বা স্পন্দন মাত্রার সৃষ্টি হয় যাহাকে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সহিত তুলনা করা যায়। তাঁহার মতে কোনো একটি কোষ সংকুচিত হইলে উহার কোষরস pumping action বা পাম্পের ক্রিয়ার সাহায্যে উহার উপরে অবস্থিত কোষে সংবাহিত হয়। এইরূপে কোষ হইতে ক্রমে উপরিভাগে অবস্থিত কোষান্তরে রস সংবহনে একপ্রকার relay

pump বা পর্যায়ক্রমিক পাম্পের ন্যায় কার্যের সৃষ্টি হয়। তাঁহার মতে ইহাই রসস্রোতের মূল কারণ।

স্ট্রাস্‌বারগার (Starsburger) নামক বিজ্ঞানী উপরিলিখিত মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, জাইলেম নালিকাই একমাত্র রস উত্তোলনে অংশ গ্রহণ করে এবং কর্টেক্সের মধ্য দিয়া নহে। ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেন যে কোনো কাণ্ডকে ঘন পিকরিক অ্যাসিড অথবা ফুটন্ত জলে ডুবাইয়া পরে সাধারণ শীতল জলে ডুবাইলে *দেখা যাইবে যে যদিও কর্টেক্সের কোষগুলি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে তথাপি জাইলেম* নালিকা দিয়া কিছুক্ষণ জল সংবহন হইতে থাকে।

3. **ভৌতশক্তি সংক্রান্ত মতবাদ** (*Physical force theories*)—এই মতবাদের মূল তত্ত্ব হইল যে জীবিত উদ্ভিদ কোষরসের উৎস্রোতে কোনো প্রকার অংশ গ্রহণ করে না। পরন্তু কয়েকটি physical forces বা ভৌতশক্তি ক্রিয়া করিবার ফলে রসের উৎস্রোতের সৃষ্টি হয়। এই সকল ভৌতশক্তিগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল ; যথা—

(*a*) **বায়বীয় চাপ** (*Atmospheric pressure*)—পূর্বে ইহাকে রসস্রোতের একটি কারণ বলা হইত কিন্তু অধুনা এইরূপ ধারণার আর প্রচলন নাই। ইহার কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে যে কেবলমাত্র বায়বীয় চাপের দ্বারা 10 মিটার পর্যন্ত জল উঠিতে পারে।

(*b*) **কৈশিক বল** (*Capillary force*)—কতিপয় বিজ্ঞানী মনে করেন যে জাইলেম নালিকা ও ট্রাকিডগুলি অতি সূক্ষ্ম capillaries বা কৈশিক ঝিল্লী বিশেষ। রস ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে তখন ঐ সকল কৈশিক ঝিল্লী একপ্রকার capillary force বা কৈশিক বল প্রয়োগ করে যাহার ফলে রসের উৎস্রোত হয়। কিন্তু উচ্চ বৃক্ষ বা জাইলেম নালিকাবিহীন ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই মতবাদ রসের উৎস্রোত প্রমাণ করে না।

(*c*) **ইমবাইবিশন বল** (*Imbibition force*)—স্যাকস্ (Saches) নামক বিজ্ঞানী মনে করিতেন যে লিগনিনযুক্ত জাইলেম নালিকার কোষপ্রাচীর রসের উপর একপ্রকার imbibition force বা ইমবাইবিশন বল প্রয়োগ করে যাহার ফলে ইহার উৎস্রোত ঘটে। তাঁহার মতে নালিকার গহ্বরের মধ্য দিয়া রস উত্থিত হয় না। তিনি বায়বীয় চাপের প্রায় 100 গুণ অবধি ইমবাইবিশন বলের পরিমাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং এই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি উচ্চ বৃক্ষের ক্ষেত্রে রসের উৎস্রোত প্রমাণে সচেষ্ট হইয়াছিলেন ; কিন্তু কোনো কোনো বিজ্ঞানী তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, জাইলেম নালিকা বন্ধ করিলে রসের উৎস্রোত বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং ইমবাইবিশন বল রসের উৎস্রোতের প্রকৃত কারণ নহে

(*d*) **সংশক্তিজনিত বল** (*Cohesive force*)—1805 খ্রীষ্টাব্দে ডিক্সন্ ও জলি (Dixon and Jolly) নামক বিজ্ঞানীদ্বয় প্রত্যক্ষ করেন যে জলের অণুগুলি পরস্পর পরস্পরকে একপ্রকার প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ করে। জাইলেম নালিকার মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন জলের স্তর থাকে যাহা কখনই বায়ুর বুদ্‌বুদ্ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয় না। প্রস্বেদনের ফলে এই অবিচ্ছিন্ন জলের স্তরটি উপরের দিকে একপ্রকার longitudinal

pull বা দৈর্ঘ্যটানের বশবর্তী হয় যাহাকে transpiration pull বা প্রস্বেদন টানও বলা হয়। ঐ সকল নিরীক্ষার দ্বারা উপরিউক্ত বিজ্ঞানীদ্বয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে উদ্ভিদের মূল হইতে পাতায় যে অবিচ্ছিন্ন জলের স্তর থাকে তাহা প্রস্বেদন টানের সহায়তায় অতি উচ্চে উঠিতে সক্ষম। উত্তম সংশক্তির জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলি থাকা প্রয়োজন ঃ যথা—(*a*) কাণ্ডের উপরিভাগে অবস্থিত প্যারেনকাইমা কোষগুলিতে higher osmotic concentration বা অধিক মাত্রায় পরিস্রাবণ সংক্রান্ত ঘনত্ব থাকা প্রয়োজন যাহাতে রস উপরে উঠিতে পারে ; (*b*) জলের সংশক্তি বল যথেষ্ট থাকা প্রয়োজন ; (*c*) জলের স্তরে কোনো প্রকার বায়ুর বুদ্‌বুদ প্রবেশ করিতে না পারে ; এবং (*d*) জাইলেম নালিকাটি সুদৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। যদিও সংশক্তিজনিত বল সম্বন্ধে মতবাদের কিছু কিছু ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি রসের উৎস্রোতের ইহাই প্রকৃষ্ট সত্যতা প্রমাণ করে।

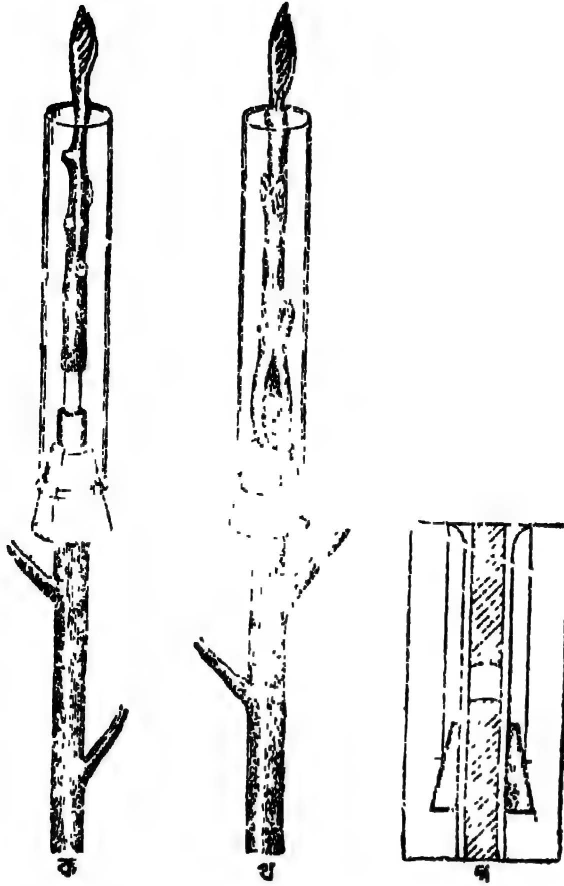
অতএব উপরি-উক্ত বিভিন্ন মতবাদ হইতে এইরূপ ধারণা করা যায় যে জাইলেম নালিকা মধ্যস্থ জলকণা capillary force বা কৈশিক বল ও cohesive force বা সংশক্তিজনিত বলের বশবর্তী হয় বলিয়া মূল হইতে পাতা পর্যন্ত অতি সূক্ষ্ম জাইলেম নালিকার মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন জলের স্তর গঠন করে। প্রস্বেদনের সময় উহার উপর একপ্রকার longitudinal pull বা দৈর্ঘ্য টান অথবা transpiration pull বা প্রস্বেদন টান ক্রিয়া করে যাহার ফলে অতি উচ্চ বৃক্ষের ক্ষেত্রেও উহা ক্রমাগত উত্থিত হইতে পারে।

রসের উৎস্রোত পথ (Path of the ascending sap) –জাইলেম নালিকা দিয়া যে রস উত্থিত হয় তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়—

২২নং পরীক্ষা ঃ রসের উত্থানের পথ (২১৭নং চিত্র)—একটি নরম কাণ্ড যুক্ত Balsam বা দোপাটি গাছের মূলটিকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া eosine বা ইওসিন দ্রবণে ডুবাইয়া রাখ, কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা যাইবে যে পাতার শিরাগুলি লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। এখন কাণ্ডটির দৈর্ঘ্য অথবা প্রস্থচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে জাইলেম নালিকার প্রাচীরটি লোহিত বর্ণে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে জাইলেম নালিকা দিয়া ইয়োসিন উত্থানের ফলেই ইহার প্রাচীর লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

২৩নং পরীক্ষা ঃ বলয় আকারে কর্তন পরীক্ষা (*Ringing experiment*)—ক্রোটোন অথবা অনুরূপ উদ্ভিদ লও যাহার বাহিরের নরম অংশ ভিতরের কাষ্ঠল অংশ হইতে সহজেই পৃথক করা যায়। এইরূপ উদ্ভিদের দুইটি শাখা লইয়া জলের মধ্যে কাটিতে হইবে। এখন ধারালো ছুরির সাহায্যে একটি শাখার ফ্লোয়েম সমেত বাহিরের প্রায় 25 মিলিমিটার দৈর্ঘ্য স্থান বলয় আকারে কাট। অপর শাখাটির ক্ষেত্রে বিপরীত পার্শ্বের স্থান দৈর্ঘ্য ছেদ করিয়া ভিতর হইতে কাষ্ঠল অংশটি এইরূপে সযত্নে কাটিয়া অপসারণ কর যাহাতে বাহিরের ফ্লোয়েমের অংশের কোনো প্রকার ক্ষতি না হয়। এখন শাখা দুইটিকে একটি কাচের বিকারে জলের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিলে দেখা

যাইবে যে প্রথম শাখাটির পাতাগুলি সতেজ রহিয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় শাখাটির পাতাগুলি
১ শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে জাইলেম নালিকা দিয়াই জল উপরে উত্থিত হয়।



[illegible] চিত্র — [illegible] (ক) শাখার ফ্লোয়েম কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, (খ) শাখার জাইলেম কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, (গ) [illegible] অংশ বর্ধিত করিয়া দেখান হইয়াছে

২৩নং পরীক্ষা : জাইলেম নালিকা বন্ধকরণ পরীক্ষা (Clogging of the xylem vessels)—একটি উদ্ভিদের শাখাকে জলের নিম্নে কাটিয়া তৎক্ষণাৎ গলিত প্যারাফিন (paraffin)এ কিয়ৎক্ষণ ডুবাইয়া রাখ। এখন শাখাটিকে প্যারাফিনের গলন হইতে তুলিয়া যে প্রান্তটিকে কাটা হইয়াছে তাহার স্বল্পাংশ ছেদ করিয়া অপসারণ কর এবং উহাকে জলে ডুবাইয়া রাখ। প্রায় 24 ঘণ্টা পরে দেখা যাইবে যে জাইলেম নালিকাটির প্যারাফিন দ্বারা বন্ধ হওয়ার ফলে জলশোষণ ব্যাহত হইয়াছে।

পূর্বে বিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে জাইলেম তন্তুর মধ্য দিয়া জল পরিবাহিত হয় কিন্তু বর্তমানে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কেবলমাত্র জাইলেম নালিকা এবং ট্রাকিডের গহ্বরই জল সংবহনে অংশ গ্রহণ করে। স্ট্রাসবারগার (Strasburger) নামক বিজ্ঞানী পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে জাইলেম নালিকার উপর এবং নিম্ন উভয় দিক দিয়াই জল পরিবাহিত হয়।

11 উদ্ভিদদেহের রাসায়নিক গঠন ঃ খনিজ পুষ্টিবিধান
(Chemical composition of Plants : Mineral nutrition)

উদ্ভিদের খাদ্য বলিতে নানা প্রকার জৈব ও অজৈব পদার্থ বুঝায়। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং fats and oils বা স্নেহ ও তৈল জাতীয় জৈব খাদ্য ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার অজৈব খনিজ লবণ প্রোটোপ্লাজম গঠন করিতে বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই সকল অজৈব খাদ্য উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতে দ্রব অবস্থায় শোষণ করে ও ইহার দ্বারা উদ্ভিদের গঠন ও পুষ্টিসাধন হয়। এই প্রক্রিয়াকে mineral nutrition বা খনিজ পুষ্টিবিধান বলে।

1656 খ্রীষ্টাব্দে Glauber (গ্লবার) নামক বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে মৃত্তিকায় পটাসিয়াম নাইট্রেট মিশ্রণের ফলে উদ্ভিদ সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে উপরোক্ত পদার্থের মৌলগুলি উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও গঠনের প্রধান সহায়ক। 1840 খ্রীষ্টাব্দে Liebig (লাইবীগ) নামক বিজ্ঞানী এই তথ্য নির্ধারণ করেন যে মৃত্তিকায় উদ্ভিদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় মৌলগুলি বর্তমান থাকিলেও যদি কোনো একটি অত্যাবশ্যক মৌল অনুপস্থিত থাকে তাহা হইলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও গঠন যথেষ্ঠ ব্যাহত হয়। 1865 খ্রীষ্টাব্দে Knop (নপ্) Sachs (স্যাক্স) প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ খনিজ পুষ্টিবিধান সম্বন্ধে যথাযথ পরীক্ষা করিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ culture solutions বা পুষ্টিবিধান সহায়ক বিশেষ দ্রবণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এই সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা হইয়াছে এবং বর্তমানেও গবেষণা কার্য চলিতেছে।

উদ্ভিদদেহের মৌলিক উপাদান (Elements constituting the plant body)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে উদ্ভিদের খাদ্য বলিতে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং স্নেহ ও তৈল জাতীয় জৈব খাদ্য বুঝায়। ইহারা কতকগুলি মৌলিক উপাদান লইয়া গঠিত এবং synthesis বা সংশ্লেষ প্রণালীতে প্রোটোপ্লাজম কর্তৃক ইহারা গঠিত হয়। Chemical analysis বা রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা জানা যায় যে ঐ সকল জৈব খাদ্য কার্বন (C), হাইড্রোজেন, (H), অক্সিজেন (O), নাইট্রোজেন (N), গন্ধক (S), ফস্‌ফরাস (P), পটাসিয়াম (K), ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), লৌহ (Fe) প্রভৃতি মৌল উপাদানের সমষ্টি। এই সকল মৌলগুলি বিভিন্ন অজৈব পদার্থ হইতে সংগৃহীত হয়। ইহা অবিদিত নহে যে সবুজ বর্ণের উদ্ভিদ সাধারণত জৈব খাদ্য মৃত্তিকা হইতে সরাসরি গ্রহণ করিতে সক্ষম। সেইজন্য খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া অনুযায়ী দুই প্রকার উদ্ভিদ দেখা যায় ; যথা—autotrophic বা স্বভোজী এবং heterotrophic বা পরভোজী। ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা দেখা গিয়াছে যে উপরোক্ত মৌলগুলির মধ্যে কতকগুলি উদ্ভিদের দেহ গঠনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ইহাদের essential elements বা অপরিহার্য মৌল বলে।

অপরিহার্য মৌল বলিতে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক, ফসফরাস, ক্লোরিন, আয়োডিন, বোরোন, সিলিকন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, তাম্র, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ, মলিবডেনাম প্রভৃতি বুঝায়। ইহারা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; (*a*) ম্যাক্রো-নিউট্রিয়েণ্ট (Macronutrients) অর্থাৎ পরিপোষণে সহায়তা করিতে যাহাদের প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়, যথা কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ও ম্যাগনেসিয়াম এবং (*b*) মাইক্রো-নিউট্রিয়েণ্ট (Micronutrients) অর্থাৎ পরিপোষণে সহায়তা করিতে যাহা স্বল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয় ; যথা, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম, ক্লোরিন, আয়োডিন, লৌহ, তাম্র, দস্তা, বোরোন প্রভৃতি অবশিষ্ট অপরিহার্য মৌল। সেইজন্য ইহাদের trace elements বা স্বল্পমাত্রায় মৌল নামেও অভিহিত করা হয়। লৌহকে (Fe) পূর্বে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েণ্ট বলিয়া মনে করা হইত কিন্তু বর্তমানে প্রমাণিত হইয়াছে যে Fe মাইক্রোনিউট্রিয়েণ্ট দলভুক্ত মৌল উপাদান।

কতকগুলি মৌল পদার্থ আছে যাহারা কোন কোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মাইক্রো-নিউট্রিয়েণ্ট কিন্তু অন্য উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েণ্ট রূপে কার্য করে। যেমন, কোবল্ট (Co), কতকগুলি মাইক্রোঅর্গানিজম এবং মিথোজীবী উদ্ভিদে মাইক্রোনিউ-ট্রিয়েণ্ট রূপে কার্য করে। ভ্যানাডিয়াম (V), সিনেডেসমাস অবলিকাস (*Scenedesmus obliquus*) উদ্ভিদে অপরিহার্য মৌল ; যেমন কোন নীলাভ সবুজ শৈবালে ও লবণাম্বু উদ্ভিদে সোডিয়াম (Na) প্রয়োজন হয় এবং সিলিকন (Si) ডায়াটমের বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। যদিও বোরোন (B) উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজন হয় কিন্তু ইহা মাইক্রোঅর্গানিজমের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েণ্ট বিভিন্ন ধরনের কোষ গঠনের জন্য প্রয়োজন হয়। অপরদিকে মাইক্রোনিউট্রিয়েণ্ট প্রধানত উদ্দীপক (Activators) অথবা এনজাইমের অন্যতম উপাদানস্বরূপে বা অংশস্বরূপে কার্য করে। কেবলমাত্র চারিপ্রকার মৌল উপাদান ব্যতিরেকে, যেমন, অক্সিজেন (O_2) কার্বন (CO_2 রূপে,) নাইট্রোজেন (N_2) এবং সালফার (SO_2 রূপে), যাহাদের প্রধান উৎস হইল বাতাস। অন্যান্য মৌল উপাদানগুলি উদ্ভিদ মাটি হইতে সংগ্রহ করে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা তাহাদের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ বস্তুগুলি প্রধানত উদ্ভিদ হইতে সংগ্রহ করে।

মৌলপদার্থগুলির অপরিহার্যতার লক্ষণ (*Criteria of essentiality*)—বিজ্ঞানী হোগল্যাণ্ড (Hoagland) উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য একটি মৌল পদার্থের প্রয়োজনীয়তার নিম্নলিখিত লক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন ঃ (ক) অন্যান্য সকল মৌল পদার্থ ও অন্যান্য শর্তাদির উপস্থিতি সত্ত্বেও কোন একটি বিশেষ মৌলের অভাবে উদ্ভিদ তাহার জীবনচক্র সম্পূর্ণ করিতে পারে না ; (খ) ঐ আলোচ্য মৌলটির কোন প্রতিকল্প সম্ভব হয় না ; এবং (গ) মৌলটি উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য সরাসরি প্রয়োজন হয়। ইহা কোন বিশেষ

অবস্থার জন্য অর্থাৎ কোন মাইক্রোঅর্গানিজমের আক্রমণ প্রতিহত করিতে অথবা বিষ-জনিত কোন প্রতিক্রিয়া প্রশমিত করা ইত্যাদি, প্রয়োজন হয় না।

উপরিউক্ত নীতিগুলি ছাড়া ইহা দেখান যাইতে পারে যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হ্রাস বা রহিত হইলে কোন বিশেষ মৌল পদার্থটিকে সরাসরি পাতায় প্রয়োগ করিয়া বা উদ্ভিদ দেহে ইনজেক্‌শান করিয়া দিলে উক্ত অসুবিধা অতিক্রম করা যায়।

মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টগুলি অপরিহার্যতার লক্ষণ (*Criteria of essentiality of the micronutrients*)—বিজ্ঞানী আরনন্ (Arnone 1048-50)-এর মতে মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্টগুলির নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়—

(ক) মৌল উপাদানগুলির অভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি অথবা তাহার জীবনচক্র স্বাভাবিকরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না।

(খ) এই উপাদানগুলি অপরিহার্য ও বিশেষরূপে নির্দিষ্ট (specific) এবং উহাদের কোন ক্রমেই অন্য কোন উপাদান দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয় না।

(গ) মৌল উপাদানগুলি বিপাকীয় কার্যে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে।

কতিপয় অপরিহার্য মৌলের কার্য (Role of a few essential elements)

1. **নাইট্রোজেন** (Nitrogen)—নাইট্রোজেন মৃত্তিকা হইতে নাইট্রেট, নাইট্রাইট ও অ্যামোনিয়ামের দ্রবণীয় লবণ হিসাবে উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত হয়। ইহা প্রোটোপ্লাজম, ক্লোরোফিল এবং প্রোটিনের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও গঠনের জন্যও ইহার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। নাইট্রোজেনের অভাব ঘটিলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ছত্রাক ও নানাবিধ ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা ইহারা সহজেই আক্রান্ত হইতে পারে।

2. গন্ধক (Sulphur)—উদ্ভিদের দেহগঠনে গন্ধকের বিশেষ প্রয়োজন। ইহার উপস্থিতিতে শোষণ-অঞ্চল অর্থাৎ মূল উপাদানকারী অঞ্চল দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ক্লোরোফিলের সবুজ বর্ণও উহার উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। গন্ধকের অভাব ঘটিলে ক্লোরোপ্লাস্টের সবুজ বর্ণ ম্লান হইয়া যায়। ইহার উপস্থিতিতে leguminous plants বা লেগুমিনোসী গোত্রীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে nodules বা অর্বুদ উৎপাদনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

3. **ফসফরাস** (Phosphorus)—উদ্ভিদের বিপাকীয় কার্য সমাধানের জন্য ফসফরাস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মৃত্তিকায় ফস্‌ফরাসের পরিমাণ বর্ধিত করিলে ফসল উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। ফসফরাসের অভাব ঘটিলে পাতাগুলি বেগুনী লোহিত বর্ণে পরিণত হয়, পটাসিয়ামের শোষণ ব্যাহত হয়, স্বাভাবিক শ্বাসকার্যের ব্যাঘাত ঘটে ও প্রোটিন সংশ্লেষ বিঘ্নিত হয়।

4 **পটাসিয়াম** (Potassium)—বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পটাসিয়াম বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্য সমাধান করে। ইহার উপস্থিতিতে উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধক শক্তি বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিদের জলধারণ করিবার ক্ষমতা পটাসিয়ামের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য বিশেষত কার্বোহাইড্রেট বিপাকে, প্রোটোপ্লাজম গঠনে এবং দ্রুত কোষ বিভাজনে ইহা অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়াতে পটাসিয়াম catalyst বা অনুঘটকরূপে আচরণ করে। ইহার অভাব ঘটিলে ফসল উৎপাদন বিঘ্নিত হয় এবং storage organs বা সঞ্চয় অঙ্গগুলি ক্ষুদ্রাকৃতির হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে কয়েকটি enzyme action বা এনজাইমের ক্রিয়ায় পটাসিয়াম বিশেষ অংশ গ্রহণ করে; আবার কাহারও কাহারও মতে প্রোটিন সংশ্লেষে ইহা অত্যাবশ্যক।

5. **ক্যালসিয়াম** (Calcium)—উদ্ভিদের দেহ গঠনের জন্য ক্যালসিয়াম বিশেষ প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত কার্বোহাইড্রেট সংবহন এবং মৃত্তিকা হইতে রস শোষণের জন্যও ইহার বিশেষ প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদের বিপাকের জন্য এই প্রক্রিয়ায় অক্সালিক অ্যাসিড প্রভৃতি যে সকল অনিষ্টকারী পদার্থ উৎপাদন হয় তাহাদিগকে neutralise বা প্রশমিত করিতে ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হয়। ক্যালসিয়ামের অভাবে বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের কোষবিভাজন ব্যাহত হয়। নাইট্রোজেনের বিপাকেও ইহা বিশেষ অংশ গ্রহণ করে।

6. **ম্যাগনেসিয়াম** (Magnesium)—ম্যাগনেসিয়ামকে ফসফরাসের বাহকরূপে গণ্য করা হয়। ইহা খাদ্যশোষণ ও শ্বাসক্রিয়ায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ইহা অত্যাবশ্যক ক্রিয়া করে এবং ইহা ক্লোরোফিলের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। ম্যাগনেসিয়ামের অভাব ঘটিলে উদ্ভিদের অগ্রভাগ wilted বা শ্লথ হইয়া শুষ্ক হইয়া যায় এবং ক্রমে ঝরিয়া পড়ে।

7. **লৌহ** (Iron)—ক্লোরোফিল গঠন করিতে লৌহের বিশেষ প্রয়োজন। শ্বাসকার্যেও ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্বাসকার্যের সময় প্রয়োজনীয় এনজাইমে যে লৌহঘটিত পদার্থ থাকে তাহাই শ্বাসকার্যে অংশ গ্রহণ করে। লৌহের অভাবে উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা পীতবর্ণে পরিণত হয়। এইরূপ অবস্থাকে ক্লোরোসিস (chlorosis) বলে।

8. **ক্লোরিন** (Chlorine)—উদ্ভিদের বিপাকের সময় যদিও ক্লোরিন প্রত্যক্ষ কোনো প্রকার অংশ গ্রহণ করে না তথাপি পুষ্টিবিধানে ইহা পরিপোষক পদার্থগুলির মধ্যে ions বা আয়নগত পারস্পরিক সম্বন্ধের পরিবর্তন সাধন করে এবং ইহার ফলে বিভিন্ন উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রকারে প্রভাবিত হয়।

9. **বোরোন** (Boron)—বর্তমানে উদ্ভিদের উপর বোরোনের প্রভাব সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য জানা গিয়াছে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং গঠন ইহার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু পরিমাণ অধিক হইলে ঐ সকল গুণাবলী ব্যাহত হয়। প্রতি দশ লক্ষের মধ্যে

এক ভাগেরও কম পরিমাণ বোরোনই উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট। বোরোনের অভাব ঘটিলে মূলে অথবা কাণ্ডের অগ্রস্থ ভাজক কলাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। Leguminous plants বা লেগুমিনোসী গোত্রীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বোরোনের সহায়তায় মূলের nodules বা অর্বুদ উৎপন্ন হয়। ইহা ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের বিপাকে এবং প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে। বোরোনের অভাব ঘটিলে conducting system বা সংবহন কলাতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পাতাগুলি শ্লথ হইয়া ঝুঁকিয়া পড়ে, কাণ্ড ও পত্রবৃন্ত ভঙ্গুর হইয়া পড়ে এবং মূলের উপাদান ব্যাহত হয়। ইহার অভাবে বীট, আলু, শালগম, ফুলকপি প্রভৃতি উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রকার রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

10. **সিলিকন** (Silicon)—সিলিকন ফসফরাসঘটিত যৌগ পদার্থের গ্রহণ ও বিপাকে সহায়তা করে। কেহ কেহ মনে করেন যে, সিলিকনের উপস্থিতিতে কোষপ্রাচীর দৃঢ় হয় এবং কীটপতঙ্গ ও ছত্রাক আক্রমণে ইহা বাধা প্রদান করে।

11. **সোডিয়াম** (Sodium)—উদ্ভিদের উপর সোডিয়ামের ক্রিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। সোডিয়ামের উপস্থিতিতে উদ্ভিদে পটাসিয়ামের শোষণ ব্যাহত হয়। পটাসিয়ামের অভাবে কখনও কখনও ইহা পটাসিয়ামের কার্যও সম্পাদন করে। কতিপয় লবণের বিষক্রিয়ার প্রতিষেধরূপেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

12. **অ্যালুমিনিয়াম** (Aluminium)—উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফসল উৎপাদনে অ্যালুমিনিয়াম বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। ইহা উদ্ভিদ ও মৃত্তিকার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন ও কোষের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। অ্যালুমিনিয়ামের অভাবে স্টার্চ (starch) উৎপাদন ব্যাহত হয়, প্রোটোপ্লাজমের permeability বা ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায় যাহার ফলে শর্করার পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এনজাইমের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং photosynthesis rate বা সালোকসংশ্লেষ হার ব্যাহত হয়। ফুলের বিচিত্র রঙের উপরও ইহার যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়।

13. **তাম্র** (Copper)—তাম্র oxidizing-reducing বা জারণ-বিজারণ এনজাইমের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। উদ্ভিদের শ্বাসক্রিয়ার উপরও ইহার যথেষ্ট প্রভাব আছে। তাম্রের অভাব ঘটিলে লেবু ও অন্যান্য উদ্ভিদ একপ্রকার রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং পাতাগুলি শ্লথ হইয়া ঝুঁকিয়া পড়ে।

14. **দস্তা** (Zinc)—রাই, মটর, পিঁয়াজ প্রভৃতি উদ্ভিদের ফসল উৎপাদনে ইহা অংশ গ্রহণ করে। অ্যাসপারজিলাস (Aspergillus) নামক ছত্রাকের ক্ষেত্রে ইহা একপ্রকার stimulant বা উদ্দীপক পদার্থরূপে ক্রিয়া করে। ইহা কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ (carbonic anhydrase) নামক এনজাইমের এবং indole acetic acid (IAA) বা ইনডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিডের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। ইহার অভাব ঘটিলে লেবু, ভুট্টা প্রভৃতি উদ্ভিদ কয়েক প্রকার রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। উদ্ভিদের স্বাভাবিক বিপাকীয় কার্য চালাইতে অতি স্বল্প পরিমাণ দস্তা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। দস্তার অভাবে মূলের অগ্রভাগের বৃদ্ধি ও বীজ উৎপাদন ব্যাহত হয়।

15. **ম্যাঙ্গানীজ** (Manganese)—উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য ইহার প্রয়োজন হইয়া থাকে। শ্বাসকার্যে ইহা catalyst বা অনুঘটকরূপে কার্য করে। ইহার অভাবে কার্বোহাইড্রেটের বিপাক বিঘ্নিত হয় ; ক্লোরোফিলের উৎপাদন হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ; উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং জননকার্যের ব্যাঘাত ঘটে।

16. **মলিবডেনাম** (Molybdenum)—ইহা অতি অল্প পরিমাণে প্রয়োজনে লাগে। উদ্ভিদের নাইট্রেটের পরিমাণ হ্রাস করিতে ইহা অংশ গ্রহণ করে। অ্যাজোটোব্যাকটার (Azotobacter) এবং রাইজোবিয়াম (Rhizobium) নামক nitrogen-fixing bacteria অথবা নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে অতি স্বল্প পরিমাণ মলিবডেনামের উপস্থিতিতে নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ কার্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

17. **কোবল্ট** (Cobalt)—ইহা একটি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট। নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ করিতে পারে (N_2-fixation) এইরূপ শৈবাল ও মাইক্রোঅর্গানিজম ; লেগুমিনাস উদ্ভিদের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত অথবা সম্বন্ধহীন অন্যোন্যজীবীর (Sym bionts) পক্ষে ইহা অপরিহার্য উপাদান। কোষের মধ্যে এই মৌলটি NAA ও IAA-এর সহিত কার্য করে ; সম্ভবত অক্সিনের কার্য-নিয়ন্ত্রকরূপে কার্য করে।

18. **ভ্যানাডিয়াম** (Vanadium)—সিনেডেসমাস্ অবলিকাস উদ্ভিদে ভ্যানাডিয়ামের অভাবে ক্লোরোফিল উৎপাদন হ্রাস পায়। ইহার অভাবে জোড়াল আলোয় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় O_2 উৎপাদনের হার কমিয়া যায়, কিন্তু ভ্যানাডিয়াম প্রয়োগে পুনরায় O_2 উৎপাদন স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরিয়া আসে।

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের মৌলিক উপাদানের উৎপত্তি-স্থান (Sources of various kinds of food elements)

উদ্ভিদ পুষ্টিকারক পদার্থগুলিকে মৌলরূপে গ্রহণ করে না ; পরন্তু ইহারা যৌগ-রূপেই গৃহীত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় মৌলের উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইয়াছে ; যথা—

কার্বন (Carbon)—উদ্ভিদদেহ প্রধানত কার্বন দ্বারা গঠিত। বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতেই উদ্ভিদ কার্বন সংগ্রহ করিয়া থাকে। নিমজ্জিত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে কার্বন গৃহীত হয়।

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন (Hydrogen and oxygen)—মৃত্তিকাস্থিত জল প্রধানতঃ বিশ্লেষিত হইয়া উদ্ভিদকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সরবরাহ করে ; তবে নানাবিধ লবণ ও অক্সাইড হইতেও উদ্ভিদ অক্সিজেন সংগ্রহ করে।

নাইট্রোজেন (Nitrogen)—নাইট্রোজেন, নাইট্রেট (nitrate) ও অ্যামোনিয়াম লবণ (ammonium salt) আকারে গৃহীত হয়। কয়েকটি leguminous plants বা লেগুমিনোসী গোত্রীয় উদ্ভিদের মূলের অর্বুদে অবস্থিত ব্যাকটিরিয়া, রাইজোবিয়াম, নাইট্রোজেন স্থিতীকরণ করে। ফলে ঐ উদ্ভিদও সরাসরি নাইট্রোজেন যৌগপ্রাপ্ত হয়। কিছু নীলাভ-সবুজ শৈবাল ও মুক্ত ব্যাকটিরিয়া বায়বীব নাইট্রোজেন স্থিতীকরণের দ্বারা

উক্ত মৌলটি প্রাপ্ত হয়। ইহার সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। পতঙ্গভুক উদ্ভিদ মৃত পতঙ্গের দেহ হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।

পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহ (Potassium, Calcium, Magnesium and Iron)—এই সকল পদার্থ মৃত্তিকা হইতে নানাবিধ ধাতব যোগ হিসাবে উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত হয়। পটাসিয়াম প্রধানত নাইট্রেট (nitrate)-রূপে এবং কখনও কখনও ক্লোরাইড (chloride) ও সালফেট (sulphate)-রূপেও উদ্ভিদ গ্রহণ করে।

ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন (Chlorine, Bromine and Iodine)—ইহারা ক্লোরাইড (chloride), ব্রোমাইড (Bromide) ও আয়োডাইড (Iodide)-রূপে উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

সিলিকন ও বোরোন (Silicon and Boron)—ইহাদিগকে উদ্ভিদ সিলিকেট (silicate) ও বোরেট (borate)-রূপে সংগ্রহ করে।

উদ্ভিদদেহ গঠনের জন্য যে সকল মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন হয় নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলির দ্বারা ইহাদিগের বিষয়ে জানিতে পারা যায় ; যথা—

(*a*) রাসায়নিক বিশ্লেষণ (*Chemical analysis*) এবং (*b*) অনুশীলনী পরীক্ষা (*culture experiments*)।

(*a*) **রাসায়নিক বিশ্লেষণ** (*Chemical anal sis*)—এই প্রণালীতে উদ্ভিদ অথবা উহার কোনও অংশকে নির্গম নলযুক্ত একটি বৈদ্যুতিক চুল্লীতে উত্তপ্ত করা হয়। নির্গম নল হইতে নির্গত গ্যাসগুলি সংগ্রহ করিয়া বিশ্লেষণ করা হয়। অবশিষ্ট পদার্থটি ash বা ভস্মে পরিণত হইলে ইহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয়।

২৫নং **পরীক্ষা**ঃ ভস্ম বিশ্লেষণ পরীক্ষা (*Ash analysis experiment*) —একটি সম্পূর্ণ উদ্ভিদ বা উহার অংশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কাটিয়া একটি crucible বা মুচিতে লইয়া ওজন কর। এইবার ইহাকে electric furnace বা বৈদ্যুতিক চুল্লিতে প্রায় 100° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত কর। ইহাতে জলীয় অংশ বাষ্পাকারে দূরীভূত হইয়া যাইবে। পুনরায় মুচিটিকে ঠাণ্ডা করিয়া ওজন কর। এই দুইটি ওজনের পার্থক্য হইতে উদ্ভিদদেহে কি পরিমাণ জল ছিল তাহা নির্ধারণ করা যায়। মুচিতে অবস্থিত শুষ্ক পদার্থটিকে এখন bunsen flame বা বুনসেন শিখায় প্রায় 600° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এইরূপে উত্তপ্ত কর যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা হইতে কার্বন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। মুচিতে অবস্থিত পদার্থটির ধূসর বর্ণের সর্বশেষ চিহ্নটি অদৃশ্য হইলেই বুঝা যাইবে যে ইহা হইতে কার্বন সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইয়াছে। এখন মুচিতে যে ash বা ভস্ম পড়িয়া রহিল তাহাকে ডেসিকেটর (dessicator)-এ শীতল করিয়া পুনরায় ওজন কর। উক্ত ওজন হইতে উৎপন্ন ভস্মের ওজন পাওয়া যাইবে। এখন নিম্নলিখিত রাসায়নিক প্রণালীতে ভস্মের বিশ্লেষণ কর ; যথা—

(*i*) কিয়ৎ পরিমাণ ভস্ম লইয়া লঘু HNO_3 বা নাইট্রিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত

করিয়া filter বা পরিস্রাবিত কর। নিম্নলিখিত প্রণালীতে filtrate বা পরিস্রুতের রাসায়নিক পরীক্ষা কর :

পরীক্ষা (Experiment)	নিরীক্ষা (Observation)	সিদ্ধান্ত (Inference)
(*a*) পরিস্রুতে কয়েক ফোঁটা $AgNO_3$ বা সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ মিশাইলে,	একপ্রকার শ্বেত বর্ণের precipitate বা অধঃক্ষেপ পড়িতে দেখা যায় ;	ক্লোরিনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।
(*b*) পরিস্রুতে অ্যামোনিয়াম মলিবডেট (Ammonium molybdate) দ্রবণ মিশাইয়া ইহাকে steam-bath বা স্টীম গৃহে উত্তপ্ত করিয়া তৎপরে শীতল করিলে,	একপ্রকার হলুদ বর্ণের crystalline বা কেলাষিত অধঃক্ষেপ পড়িতে দেখা যায়,	ফসফরাসের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।
(*c*) পরিস্রুতের সহিত অ্যাসিটিক অ্যাসিড জিঙ্ক অ্যাসিটেট (zinc acetate) ও ইউর্যানিল অ্যাসিটেট (uranyl acetate) মিশ্রিত করিলে,	একপ্রকার পাণ্ডুর পীতবর্ণের অধঃক্ষেপ পড়িতে দেখা যায় ;	সোডিয়ামের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

(ii) পুনরায় কিয়ৎ পরিমাণ ভস্ম লইয়া লঘু উত্তপ্ত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করিয়া filter বা পরিস্রাবিত কর এবং নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় পরিস্রুতের রাসায়নিক পরীক্ষা কর :

পরীক্ষা (Experiment)	নিরীক্ষা (Observation)	সিদ্ধান্ত (Inference)
(*a*) পরিস্রুতে বেরিয়াম ক্লোরাইড (Barium chloride) মিশ্রিত করিলে,	শ্বেত বর্ণের কেলাসিত অধঃক্ষেপ পড়িতে দেখা যায় ;	গন্ধকের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।
(*b*) পরিস্রুতে লঘু অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড (NH_4OH) ও কয়েক ফোঁটা অতিরিক্ত সংপৃক্ত অ্যামোনিয়ম অক্সালেট দ্রবণ মিশ্রিত করিলে,	শ্বেত বর্ণের অধঃক্ষেপ পড়িতে দেখা যায় ;	ক্যালসিয়ামের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

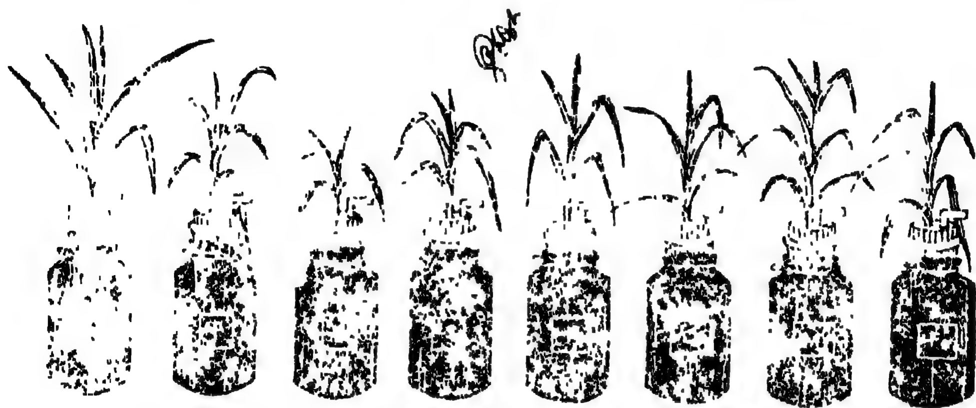
পরীক্ষা (Experiment)	নিরীক্ষা (Observation)	সিদ্ধান্ত (Inference)
(c) পরিস্রুতে লঘু অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড (NH_4OH) এবং অতিরিক্ত সম্পৃক্ত অ্যামোনিয়াম অক্সালেট দ্রবণ মিশ্রিত করিয়া পরিস্রাবিত করিতে হইবে। পরিস্রুতে ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট মিশ্রিত করিলে,	একপ্রকার কেলাস উৎপন্ন হইতে দেখা যায়;	ম্যাগনেসিয়ামের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।
(d) পরিস্রুতে কয়েক ফোঁটা পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট মিশ্রিত করিলে,	ইহা রক্তবর্ণ ধারণ করে।	লৌহের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

দেখা গিয়াছে যে, যে-সকল উপাদান লইয়া ভস্ম গঠিত তাহাদিগের পরিমাণ বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন উদ্ভিদের বৃদ্ধির সাথে উহার কলায় অবস্থান, অবস্থা, মৃত্তিকা ও অন্যান্য বায়বীয় কারণের জন্যই ভস্মের উপাদানের এইরূপ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে পুরাতন উদ্ভিদ অপেক্ষা নূতন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ভস্ম উপাদানের পরিমাণ অধিক এবং কাণ্ড ও পাতার ভস্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের শতকরা পরিমাণও অধিক। অনুরূপে বীজগুলিতে ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়ামের সর্বোচ্চ শতকরা পরিমাণ দেখা যায়।

(b) **অনুশীলনী পরীক্ষা** (*Culture experiments*) - উদ্ভিদদেহ কি কি মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত তাহা chemical analysis বা রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা জানিতে পারা যায়; কিন্তু ঐ সকল পদার্থ কিরূপে উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত হয় অথবা উহারা পুষ্টিবিধানে সহায়ক কিনা তাহা এই পরীক্ষার দ্বারা জানিতে পারা যায় না। সেইজন্য বিজ্ঞানীগণ গবেষণার দ্বারা আর একপ্রকার পরীক্ষা নির্ধারণ করেন যাহার দ্বারা যে সকল অত্যাবশ্যকীয় মৌল উদ্ভিদের বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতিতে এবং ক্রমে নূতন কলাগঠনে অংশ গ্রহণ করে সেই সকল বিষয়ে জানিতে পারা যায়। উক্ত পরীক্ষার মূল তথ্য হইল যে মৃত্তিকার পরিবর্তে বিশুদ্ধ বালু, কাঁকর অথবা লবণের দ্রবণে উদ্ভিদকে জন্মাইতে দিয়া উহার বৃদ্ধি ও গঠন লক্ষ্য করা। শেষোক্ত ক্ষেত্রের লবণের দ্রবণকে জল অনুশীলন (water cultures) বা দ্রবণ অনুশীলন (solution cultures) বলা হয়। কিন্তু এই পরীক্ষার একটি অসুবিধা হইল যে এই প্রক্রিয়ায় দ্রবণকে আলোড়িত করিবার ও বায়ু চালনা করিবার বন্দোবস্ত করিতে হয় যাহা সাধারণ

মৃত্তিকার প্রয়োজন হয় না। বর্তমানে water culture বা জল অনুশীলনের পরিবর্তে sand culture বা বালুকা অনুশীলনে অথবা gravel culture বা কাঁকর অনুশীলনে উদ্ভিদকে জন্মাইতে দিয়া উহার বৃদ্ধি ও গঠন লক্ষ্য করা হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় লবণ দ্রবণ অপেক্ষা উহাদের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সহজ এবং ইহাতে কৃত্রিম প্রণালীতে বায়ু চালনা করিবার প্রয়োজন হয় না। এইরূপ মৃত্তিকাবিহীন উপযুক্ত রাসায়নিক পদার্থযুক্ত মাধ্যমে টমাটো, কুমড়া, বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জি প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন করা হয় এবং এইরূপ ব্যবস্থাকে হাইড্রপনিক্স (hydroponics) বলে।

২৬নং পরীক্ষা : উদ্ভিদের জল অনুশীলনী দ্রবণ পরীক্ষা (*Water culture experiment*)—একই আকারের আটটি জার অথবা বোতল লও (২১৮নং চিত্র)।



২১৮নং চিত্র : উদ্ভিদের জল অনুশীলনী পরীক্ষা।

জারগুলিকে যথোপযুক্ত পরিষ্কার করিয়া প্রথমে নাইট্রিক অ্যাসিড ও পরে distilled water বা পাতিত জল দিয়া ধুইয়া জীবাণুমুক্ত কর। প্রতি জারের মুখ দুইটি করিয়া ছিদ্রযুক্ত ছিপির দ্বারা বন্ধ করা যায় (একটি ছিদ্র ছিপির মধ্যস্থলে এবং অপরটি পার্শ্বে)। ছিপির মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিদ্রের মধ্য দিয়া কোনো উদ্ভিদের মূল ও পার্শ্বের ছিদ্র দিয়া একটি বাঁকানো কাচনল প্রবেশ করান হয়। মূলগুলিকে সহজে প্রবেশ করাইবার জন্য বিদীর্ণ ছিপি লওয়া হয়।

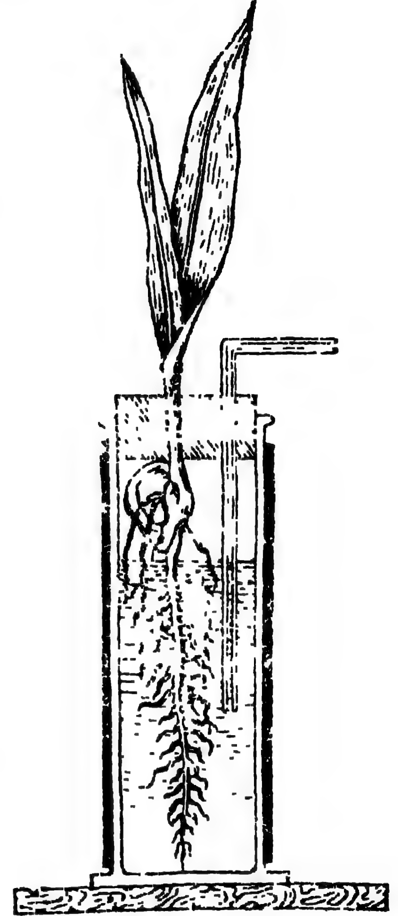
এখন normal culture solution বা সাধারণ অনুশীলনী দ্রবণ প্রস্তুত করিয়া প্রথম জারে ঢাল। পুনরায় সাত প্রকার পদার্থের দ্রবণ এইরূপে প্রস্তুত কর যাহাতে পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, নাইট্রোজেন, গন্ধক ও ফসফরাস পর্যায়ক্রমে বাদ দেওয়া হয়। ইহাদিগকে যথাক্রমে—K, Ca,—Mg প্রভৃতির দ্বারা যথাযথ চিহ্নিত সাতটি জারে ঢালিয়া পূর্ণ কর।

সাধারণ অনুশীলনী দ্রবণ হইতে কোনো একটি নির্দিষ্ট মৌলিক বাদ দিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে উহার সহিত লবণ গঠনকারী অন্য কোনো মৌল বাদ না যায়। সুতরাং উক্ত মৌলের পরিবর্তে যে নূতন মৌলের দ্বারা লবণ প্রস্তুত করিতে হইবে

খনিজ লবণের নাম	*Sach's Soln.* বা স্যাকের দ্রবণ গ্রামে ওজন	*Knop's Soln.* বা নপের দ্রবণ গ্রামে ওজন	*Pfaffer's Soln.* বা ফেফারের দ্রবণ গ্রামে ওজন	*Crone's Soln.* ক্রোনের দ্রবণ গ্রামে ওজন	*Hoagland's Soln,* বা হোগল্যাণ্ডের দ্রবণ গ্রামে ওজন
পটাসিয়াম নাইট্রেট	1 00	1·00	0·80	1·00	0·61
ক্যালসিয়াম নাইট্রেট	—	1·00	1·00	—	0 95
ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট	0·50	—	—	0·25	—
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	0·50	1 00	1·00	0·25	0·49
ক্যালসিয়াম সালফেট	0·50	—	—	0·25	—
সোডিয়াম ক্লোরাইড	0·25	—	—	—	—
ফেরাস সালফেট	অতি স্বল্প	—	—	—	—
পটাসিয়াম ডাই-হাইড্রোজেন ফস্‌ফেট	—	1 00	1 00	—	—
আয়রন ফস্‌ফেট	—	—	—	0·25	—
ফেরিক ক্লোরাইড	—	অতি স্বল্প	অতি স্বল্প	—	—
পটাসিয়াম ক্লোরাইড	—	—	·20	—	—
অ্যামোনিয়াম ডাই-হাইড্রোজেন ফস্‌ফেট	—	—	—	—	0·12
ফেরিক টারটারেট[4]	—	—	—	—	0·005
পাতিত জল	1 লিটার পর্যন্ত	1 লিটার পর্যন্ত	1 লিটার পর্যন্ত	1 লিটার পর্যন্ত	1 লিটার পর্যন্ত

তাহার valency বা যোজ্যতার কোনো প্রকার পরিবর্তন সাধিত না হয় এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

1860 খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে সকল বিজ্ঞানী যে-সকল সাধারণ অনুশীলনী দ্রবণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাদিগের বিবরণ তালিকাকারে প্রদত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে **Knop's Solution** বা নপের দ্রবণই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।



১১৯নং চিত্র—ভুট্টার চারার সাহায্যে জল অনুশীলনী পরীক্ষা

এখন সুস্থ ও সরল ভুট্টার অথবা অনুরূপ উদ্ভিদের আটটি এইরূপ চারাগাছ নির্বাচন কর যাহাদের বৃদ্ধি, উচ্চতা প্রভৃতি সমান ও যাহাদের সমান সংখ্যক পাতা আছে। উহাদের মূল-গুলিকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া ছিপির মধ্যস্থলের ছিদ্র দিয়া এইরূপে প্রবেশ করাও যাহাতে উহারা জারে অবস্থিত দ্রবণে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত থাকে এবং বীজাণুমুক্ত তুলার সাহায্যে চারাগাছগুলিকে খাড়াভাবে দণ্ডায়মান রাখ। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ছিপি ও তুলা যেন সম্পূর্ণ শুষ্ক থাকে। এইবার জারগুলিকে কালো কাগজ অথবা কাপড় দ্বারা এইরূপে ঢাকিয়া দাও যাহাতে মূলগুলিতে আলোক না পৌঁছায় জারগুলিকে এখন আলোকিত কিন্তু আচ্ছাদিত স্থানে রাখিতে হইবে।

প্রতিদিনে প্রায় পনের মিনিট ধরিয়া পাম্পের সাহায্যে দ্রবণে বায়ু চালনা কর এবং চারাগাছগুলির বৃদ্ধি লক্ষ্য কর। প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া জারগুলির পারস্পারিক দ্রবণ-গুলিকে পরিবর্তন কর। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে দ্রবণগুলি যেন সর্বদাই আম্লিক থাকে এবং প্রয়োজনবোধে শতকরা পাঁচ ভাগ ফসফরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিতে হইবে। ক্রমান্বয় ছয় সপ্তাহ ধরিয়া এই প্রকার পরিবর্তন সাধন করিয়া যাইতে হইবে।

নিরীক্ষা (*Observation*)—লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে প্রথম জারে অবস্থিত চারাগাছটির বৃদ্ধি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কিন্তু পরবর্তী দুইটি জারের অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জারের চারাগাছগুলির বৃদ্ধি ব্যাহত হইয়াছে। চতুর্থ ও পঞ্চম জারের চারাগুলির পাতার বর্ণ chlorotic বা পাণ্ডুর ভাব ধারণ করিয়াছে এবং শেষোক্ত তিনটি জারে অবস্থিত চারাগুলি বিনষ্ট হইয়াছে।

উৎসেচকের অ-প্রোটিন অংশটি যখন প্রোটিন অংশটিতে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে তখন তাহাকে প্রসথেটিক গ্রুপ (Prosthatic group) এবং যখন শিথিলভাবে প্রোটিন অংশটিতে যুক্ত থাকে তখন তাহাকে কো-এনজাইম (co-enzyme) বলা হয়। প্রসথেটিক গ্রুপ জৈব বা অজৈব হইতে পারে উৎসেচকের অজৈব প্রসথেটিক গ্রুপ হিসাবে সাধারণত ক্যাট আয়ন থাকে, যথা, Mo^{++}, Cu^{++} ইত্যাদি। আবার উৎসেচকের কো-এনজাইম অংশটি সাধারণত জটিল জৈব পদার্থ বিশেষ, যথা, NAD (nicotinamide adenine dinucleotide), NADP (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) ইত্যাদি হইয়া থাকে।

কখনও কখনও উৎসেচকের কার্যক্ষমতা কতকগুলি পদার্থের উপস্থিতিতে বৃদ্ধি পায়। উহাদের সক্রিয়কারক (activators) বলে। সক্রিয়কারক জৈব—যৌগ, যথা গ্লুটাথায়ন (glutathione) অথবা অজৈব আয়ন, যথা, Mg^{++}, Ca^{++} ইত্যাদি হইতে পারে। অবার কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ উৎসেচকের কার্যক্ষমতায় প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। উহাদের প্রতিরোধকারী (inhibitors) বলে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ম্যালোনিক অ্যাসিড (malonic acid), স্যাক্সিনিক ডিহাইড্রোজিনেজ (succinic dehydrogenase) নামক উৎসেচকটির কর্মক্ষমতায় প্রতিরেধ সৃষ্টি করে।

জলের উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোন উৎসেচকই কার্যক্ষম হইতে পারে না। উৎসেচক নিয়ন্ত্রিত বিক্রিয়াগুলি উষ্ণতা ও কোষের হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্বের (H—ion concentration) উপর নির্ভরশীল। সাধারণত বিশুদ্ধ জলের অনরূপ হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্বে (PH70) এবং 25° হইতে 30° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় অধিক সক্রিয় থাকে। উৎসেচকের কার্যক্ষমতা ইহার ঘনত্ব, সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের (end product) ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল।

উৎসেচকের নামকরণ (Naming of Enzymes)

উৎসেচক যে পদার্থের উপর ক্রিয়া করে, তাহাকে সাবস্ট্রেট (substrate) বলা হয়। কতকগুলি ক্ষেত্রে, সাবস্ট্রেটের নামের সহিত "এজ" যুক্ত করিয়া উৎসেচকের নাম করণ করা হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে, যে উৎসেচকটি ম্যালটোজের (maltose) উপর ক্রিয়া করে, তাহাকে ম্যালটেজ (maltase) বলে। আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে, যেমন, জারণ বিক্রিয়ায় (oxidative reaction) অংশ গ্রহণকারী উৎসেচককে অক্সিডেজ (oxidase) নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে উৎসেচকের নাম করণের সময় সাবস্ট্রেটের নাম ও বিক্রিয়ার ধরন উভয় বিষয়েরই বিবেচনা করা হইয়া থাকে, যেমন, যে উৎসেচকটি গ্লুকোজ জারিত করে, তাহাকে, গ্লুকোজ অক্সিডেজ (glucose oxidase) নামে অভিহিত করা হয়। অবশ্য কতকগুলি ক্ষেত্রে উপোরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ পেপ্‌সিন্ (pepsin), ট্রিপ্‌সিন্ (trypsin) ইত্যাদি প্রোটিন বিশ্লেষণকারী উৎসেচকের (proteolytic enzymes) নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বর্তমানে বিক্রিয়ার প্রকৃতি অনুসারে উৎসেচকের শ্রেণী বিভাগ করা হয় বিক্রিয়ার প্রকার ভেদে উৎসেচকগুলি ছয়টি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

উৎসেচকের শ্রেণীবিভাগ (Classification of enzymes)

(1) **অক্সিডোরিডাকটেজস** (*Oxidoreductases*)—ইহারা সাবাসট্রেটের জারণ-বিজারণ-বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে, যথা—গ্লুকোজ অক্সিডেজ (glucose oxidase)।

(2) **ট্রান্সফ্যারেজস** (*transferases*)—ইহারা সাবসট্রেটকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহাতে অন্য কোন যৌগের অংশ বিশেষ জুড়িয়া দিয়া থাকে, যথা—হেক্সোকাইনেজ (hexokinase)।

(3) **হাইড্রোলেজেস** (*hydrolases*)—ইহারা সাবসট্রেট অণুর আদ্র বিশ্লেষণ (hydrolysis) ঘটাইয়া থাকে যথা—ম্যালটেজ (maltase)।

(4) **ল্যায়েজস** (*lyases*)—ইহার জল ব্যাতিরেকেই সাবসট্রেট অণুর বিশ্লেষণ ঘটাইয়া থাকে, যথা—কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ (carbonic anhydrase)।

(5) **আইসোমারেজস** (*isomerases*)—ইহারা সাবসট্রেট অণুর **সমাংশকরণে** (*isomerization*) সহায়তা করিয়া থাকে. যথা. ফসফোগ্লুকো আইসোমারেজ phosphogluco-isomerase)।

(6) **লাইগেজেস** (*ligases*)*—ইহারা নূতন অণু সংশ্লেষণে সহায়তা করিয়া থাকে. যথা—অ্যাসিটিল কে-A সিন্থেটেজ (acetyl Co-A synthetase)।

উৎসেচকের ধর্ম (Properties of enzymes)

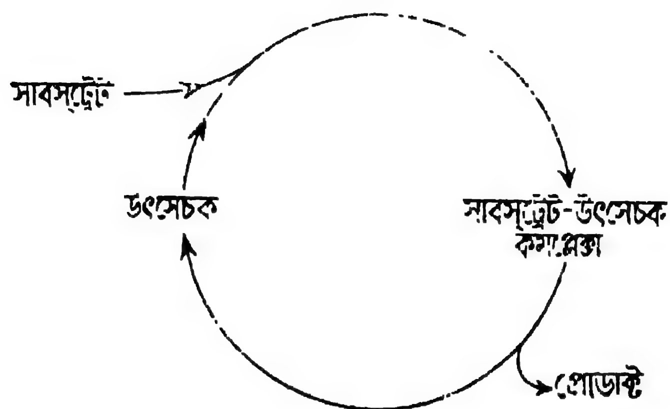
উৎসেচক জল, গ্লিসারল (glycerol) এবং লঘু দ্রবণ ইত্যাদিতে দ্রবণীয় কিন্তু জলীয় কোহলের দ্রবণে ইহা অদ্রবণীয়। ইহারা পিকরিক অ্যাসিড (picric acid) ও ফসফোটাংস্টিক অ্যাসিড (phosphotungstic acid) কর্তৃক অধঃক্ষিপ্ত হয়। উৎসেচকের নির্বাচনী ধর্ম আছে এবং ইহারা নির্দিষ্ট সাবসট্রেটের উপর ক্রিয়া করে কিন্তু এমন কতকগুলি এনজাইম বা উৎসেচক আছে যাহারা একাধিক সাবসট্রেটের উপর ক্রিয়া করিতে পারে। উৎসেচক অনুঘটকের ন্যায় ক্রিয়া করে। ইহা উভয়মুখী বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। সম্পূর্ণ উৎসেচকটি প্রোটিন জাত হইলে ইহার সুস্পষ্ট কোলয়ডীয় ধর্ম দেখা যায়, কিন্তু ইহা দুইটি অংশে বিভেদিত হইলে প্রোটিন অংশটিতে কোলডীয় এবং প্রোটিনবিহীন অংশটিতে কেলাসিত (crystalloid) ধর্ম দেখা যায়। অধিক উত্তাপ বা আলোকে উৎসেচকের কার্যক্ষমতা লোপ পায়।

উৎসেচকের কার্যপদ্ধতি (Mechanism of Enzyme action)

প্রতিটি বিক্রিয়া শুরু করিতে গেলে একটি শক্তির বাধা অতিক্রম করিতে হয়। ইহাকে **কার্যকর শক্তি** (*activation energy*) বলে। উৎসেচকের প্রভাবে কার্যকর শক্তি

* ইহাদের সিনথেটেজসও (synthetases) বলা হইয়া থাকে

হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিরূপে তাহা হয় সেই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। তবে অনুঘটকরূপে ক্রিয়া করিবার সময় একটি উৎসেচক প্রথমে উহার নির্দিষ্ট সাবস্ট্রেটের সহিত মিলিত হয় (২২০নং চিত্র); এই মিলনের ফলে একটি **সাবস্ট্রেট উৎসেচক কমপ্লেক্স** (substrate enzyme complex) গঠিত হয়। উৎসেচকের সহিত সাবস্ট্রেটের



২২০নং চিত্র উৎসেচকের কার্যপদ্ধতি

মিলন কেবলমাত্র উহার বিক্রিয়া কেন্দ্র (active site) গুলিতেই হইয়া থাকে। সেই বিক্রিয়া কেন্দ্রগুলিতে সাধারণত সালফিড্রিল গ্রুপ (—SH) মূলক (radical) থাকে। কমপ্লেক্স গঠিত হইবার পর সাবস্ট্রেটটির বিশ্লেষণ বা সংশ্লেষণের মাধ্যমে নূতন যৌগ বস্তু (product) উৎপন্ন হয় এবং উৎসেচকটি মুক্ত হয়।

৭

শ্বাসকার্য
(Respiration)

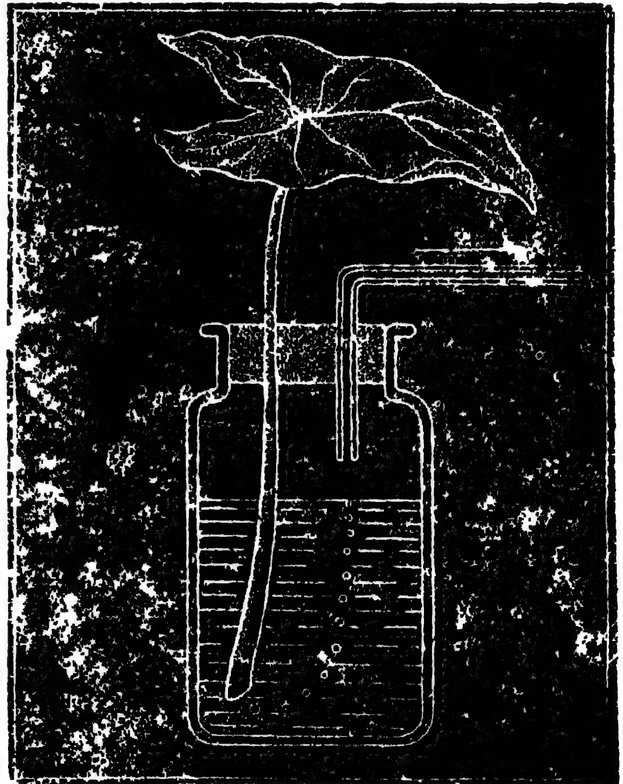
সকল জীবই শ্বাসকার্য করে। শ্বাসকার্য বলিতে আমরা সাধারণত অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যক্ত হওয়া বুঝি। কিন্তু এই প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে এইরূপ সরল নহে, কারণ এই প্রক্রিয়ার দ্বারা শক্তি সঞ্চারিত হয়। শ্বাসকার্যের সময় বায়ুস্থ অক্সিজেন দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খাদ্যকে জারিত করে যাহার ফলে শক্তি সঞ্চারিত হয়। এই শক্তির সাহায্যে সকল প্রকার জৈবিক কার্য সম্পন্ন হয়।

শ্বাসকার্যের অঙ্গ (Organs of respiration)

প্রাণীর যেরূপ শ্বাসযন্ত্র আছে উদ্ভিদের সেইরূপ কোনো যন্ত্র নাই। পত্ররন্ধ্র, লেন্টিসেল ও কোষমধ্যবর্তী স্থান গ্যাসীয় ব্যাপনে সাহায্য করে। যেসকল অঙ্গে জীবিত কোষগুলির দ্বারা শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয় না তাহা মৃত বলিয়া গণ্য হয়।

শ্বাসকার্যের প্রণালী (Process of respiration)

অক্সিজেনযুক্ত বায়ু পত্ররন্ধ্র ও লেন্টিসেলের ভিতর দিয়া কোষমধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশ করে। উদ্ভিদদেহের কোষমধ্যবর্তী স্থান অবিচ্ছিন্ন থাকে বলিয়া এই বায়ু সকল কোষেই পৌঁছায় এবং জীবিত কোষগুলির মধ্যে যে জৈব খাদ্যদ্রব্য থাকে তাহাকে জারিত করে। ইহার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড পত্ররন্ধ্র ও লেন্টিসেলের মধ্য দিয়া দেহ হইতে বাহির হইয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়।



২২১নং চিত্র—কোষমধ্যবর্তী স্থানের অবিচ্ছিন্নতা

নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ কোষমধ্যবর্তী স্থানের মধ্য দিয়া জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে।

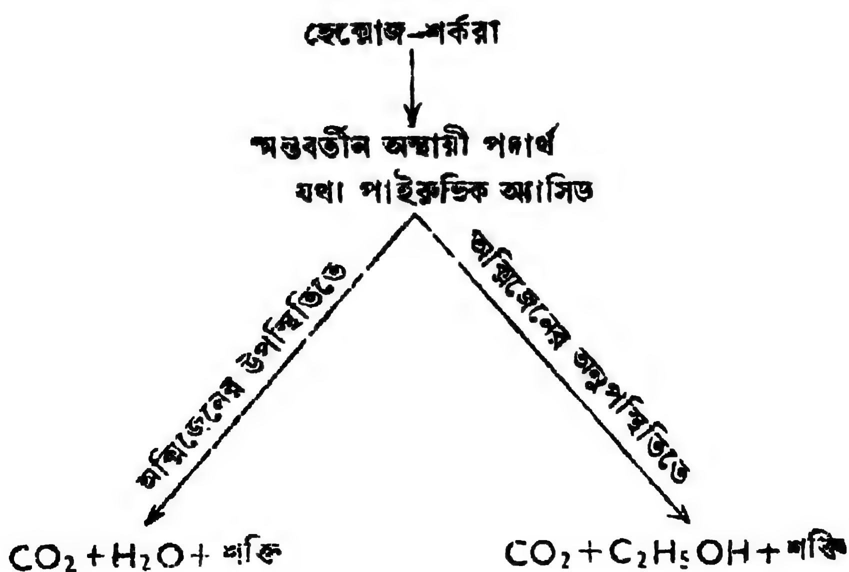
উদ্ভিদের কোষমধ্যবর্তী স্থান অবিচ্ছিন্ন থাকে; ইহা নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

২৭নং **পরীক্ষা ঃ** কোষ-মধ্যবর্তী রন্ধ্রের অবিচ্ছিন্নতা (*Continuity of inter-cellular space* ২২১নং চিত্র)—একটি চওড়া মুখযুক্ত বোতল লও এবং ইহার তিন-চতুর্থাংশ জলে পূর্ণ করিতে হইবে। এইটি দুই ছিদ্রযুক্ত রবারের ছিপি দিয়া

বোতলের মুখ বন্ধ করা হইল। একটি ছিদ্রের ভিতরে কোনো গাছের পত্রবৃন্ত এরূপভাবে প্রবেশ করাইতে হইবে যাহাতে ইহা বোতলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে এবং অপর ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাঁকা কাচনলকেও এরূপভাবে প্রবেশ করাইতে হইবে যাহাতে ইহা ঠিক জলতলের উপরে থাকে। সংযোগস্থানগুলি প্যারাফিনের দ্বারা বায়ুরোধক করা হইল। এখন বোতলের বায়ু টানিয়া অথবা বায়ু নিষ্কাশন পাম্প (exhaust pump)-এর সাহায্যে বায়ু নিষ্কাশন করিতে হইবে। দেখা যাইবে, জল বুদবুদ সৃষ্টি হইয়া পত্রবৃন্তের অগ্রভাগ হইতে নির্গত হইতেছে।

সবাত ও অবাত শ্বাসকার্য (Aerobic and anaerobic resperation

প্যালাডিন (Paladin) ও কস্টিচেভ (Kostychev) নামক বিজ্ঞানীদ্বয়ের মতে শ্বাসকার্য দুই প্রকারের হইয়া থাকে : **সবাত** (Aerobic) ও **অবাত** (Anaerobic)। সবাত শ্বাসকার্যের সময় বায়ু হইতে অক্সিজেন গৃহীত হয়। কিন্তু অক্সিজেনবিহীন শ্বাসকার্যও হইয়া থাকে এইরূপ প্রক্রিয়াকে অবাত শ্বাসকার্য (anaerobic respiration) বলে। প্রথমোক্ত প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন খাদ্যকে সম্পূর্ণরূপে জারিত করে করে ফলে অধিক পরিমাণ শক্তি সঞ্চারিত হয়। কিন্তু শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন বায়ু হইতে গৃহীত হয় না। কোষমধ্যস্থিত খাদ্য একপ্রকার এনজাইমের দ্বারা আংশিক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল, কিছু পরিমাণ কোহল উৎপন্ন হয় এবং অল্পপরিমাণ শক্তি সঞ্চারিত হয়।



পেফার (Pfeffer) এবং ফ্লুজার (Pflugar) নামক বিজ্ঞানীদ্বয়ের মতে অবাত শ্বাসকার্যের ফলে যে ইথাইল কোহল উৎপন্ন হয় তাহা বায়ুর অক্সিজেনের সংস্পর্শে জারিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের সৃষ্টি করে। বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ এইরূপ

ধারণা পোষণ করেন যে সমগ্র শ্বাসকার্য প্রক্রিয়াটি দুইটি ক্রম পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্যায়ে হেক্সোজ শর্করা গ্লাইকোলিসিস (glycolysis) নামক প্রক্রিয়ার দ্বারা একপ্রকার অন্তবর্তী অস্থায়ী পদার্থ (labile intermediate products) উৎপন্ন করে যাহা দ্বিতীয় পর্যায়ে অক্সিজেনের সংস্পর্শে জারণ প্রক্রিয়ার দ্বারা (oxidation process জারিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল গঠন করে। কিন্তু অক্সিজেনের সরবরাহ না থাকিলে উহা ইথাইল কোহল এবং কার্বন ডাই আক্সাইড সৃষ্টি করে। পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্র হইতে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হেক্সোজ শর্করা (hexoses ugar) অথাৎ গ্লুকোজই হইল প্রধান শ্বাসকার্যজনিত পদার্থ। অতএব অবাত শ্বাসকার্য মোটামুটি সংকেত দ্বারা নির্দেশ করিলে এইরূপ হইবে ; যথা—



$C_6H_{12}O_6+6O_2=6CO_2+6H_2O+674$ কিলো ক্যালরি তাপশক্তি

উল্লিখিত সংকেত হইতে বুঝা যায় যে জীব শ্বাসকার্যের সময় 6 অনু অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া 6 অণু কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। পরিত্যক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এবং গৃহীত অক্সিজেনের পরিমাণের অনুপাতকে অর্থাৎ $\frac{CO_2}{O_2}$কে, শ্বাসহার (Respiratory quotient or, R. Q.) বলে।

হেক্সোজ শর্করার ক্ষেত্রে ইহাকে সম্পূর্ণ জারিত করিতে যে পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তাহা নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের সমান অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে $RQ=1$.

শ্বাসক্রিয়াজনিত পদার্থ প্রোটীনজাতীয় অথবা চর্বিজাতীয় হইলে ইহার জারণের জন্য নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইডের তুলনায় অধিক পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় ; অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে $RQ<1$.

ইহা নিম্নলিখিত সংকেত দ্বারা সূচিত করা যায়



$C_{51}H_{98}O_6+72{\cdot}5O_2\longrightarrow 51CO_2+49H_2O+7590,000$ ক্যালরি

এই ক্ষেত্রে $\frac{CO_2}{O_2}=0{\cdot}7$

শ্বাসক্রিয়াজনিত পদার্থে সাধারণ হেক্সোজ শর্করা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ অক্সিজেন থাকিলে অর্থাৎ জৈব অ্যাসিডের ক্ষেত্রে ইহার সম্পূর্ণ জারণের জন্য অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। অতএব এই ক্ষেত্রে $RQ>1$. সংকেত সূচিত করিলে ইহা এইরূপ দাঁড়ায় ; যথা :



$C_4H_6O_5+3O_2\rightarrow 4CO_2+3H_2O+320{,}000$ ক্যালরি

এই ক্ষেত্রে $\frac{CO_2}{O_2}=1{\cdot}33$

কখনও কখনও দেখা যায় যে হেক্সোজ শর্করার জারণক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে আংশিক জারিত বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড গঠিত হয় যাহার ফলে RQ-এর মান একক অপেক্ষা কম হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে স্ফীত অঙ্গবিশিষ্ট কয়েকটি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হেক্সোজ শর্করা আংশিক জারিত হইয়া ম্যালিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে কার্বন ডাই-অক্সাইড বলিতে গেলে একেবারেই উৎপন্ন হয় না। ইহা নিম্নলিখিত সংকেতের সাহায্যে বুঝান হইয়াছে ; যথা :



$$2C_6H_{12}O_6 + 3O_2 \longrightarrow 3C_4H_6O_5 + 2H_2O + 386,000 \text{ ক্যালরি}$$

শক্তির উৎস (Source of energy)

সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ শর্করাজনিত জৈব খাদ্য প্রস্তুত করে। এই সময় সূর্যালোক হইতে প্রাপ্ত শক্তি জৈব খাদ্যের মধ্যে স্থিতিশক্তি (potential energy)-রূপে অবস্থান করে। জীবের শ্বাসক্রিয়া চলাকালে জৈব খাদ্য বিশ্লেষিত হয় এবং ইহার ফলে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি গতিশক্তি (kinetic energy)-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে শ্বাসকার্যজনিত শক্তির উৎস হইল প্রকৃতপক্ষে সৌরশক্তি যাহা জৈব খাদ্যের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। জৈব পদার্থের উপাদানসমূহ অর্থাৎ কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুগুলি একপ্রকার বন্ধন শক্তির দ্বারা আবদ্ধ থাকে। জৈব পদার্থের দ্রুত দহন ঘটাইলে পরমাণুগুলির বন্ধনশক্তি আলোক ও তাপ শক্তিতে পরিণত হয় ; কিন্তু শ্বাসকার্যের সময় দহন ধীরে ধীরে সংগঠিত হইতে থাকে যাহার ফলে পরমাণুগুলির বন্ধনশক্তি শিথিল হইয়া উহা মুক্ত হয় এবং জীবের প্রয়োজনীয় জৈবনিক কার্য সম্পাদনে ইহা ব্যয়িত হয়।

উদ্ভিদকোষের সাইটোপ্লাজমে একপ্রকার দণ্ডাকার অংশ। সূত্রাকার জীবিত পদার্থ থাকে যাহাকে মাইটোকণ্ড্রিয়া (mitocondria) বলে। মাইটোকণ্ড্রিয়া দুইটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং ইহার আভ্যন্তরিক প্রাচীরটি উদ্গত যাহাকে ক্রাইস্টি (cristae) বলে। শ্বাসকার্যের সময় মাইটোকণ্ড্রিয়া একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। ইহাতে ADP অর্থাৎ অ্যাডিনসিন ডাই-ফসফেট (*Adenosine diphosphate*) নামক একপ্রকার এনজাইম থাকে। জৈব খাদ্য দহনকালে ইহা মুক্ত শক্তি সংগ্রহ করে ও ফসফেটের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার যুক্ত হইয়া ATP অর্থাৎ অ্যাডিনসিন ট্রাই-ফসফেট (*Adenosine triphosphate*)-এ পরিণত হয়। এই ATP-কে শক্তির বাহকরূপে গণ্য করা হয় কারণ ইহা মাইটোকাণ্ড্রিয়া হইতে বাহির হইয়া সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে ও জীবের বিভিন্ন জৈবিক কার্য সম্পাদনে শক্তি সরবরাহ করে। এই সময় ATP বিশ্লেষিত হইয়া পুনরায় ADP তে পরিণত হয়।

শ্বাসকার্যের সময় জল উৎপাদনে বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া পদ্ধতি (Mechanism of enzyme reaction during respiration with the formation of water)

সবাত শ্বাসকার্যে গ্লুকোজ (glucose) প্রভৃতি হেক্সোজ শর্করার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের

দ্বারা যে জল উৎপন্ন হয় তাহাতে বিভিন্ন প্রকার এনজাইম একটির পর একটি ক্রিয়া করিতে থাকে। ইহা নিম্নে বুঝান হইয়াছে ; যথা ঃ

শ্বাসকার্যজনিত পদার্থ

↓ ডিহাইড্রোজেনেজ (*Dehydrogenase*) এবং ইহার সহ-এনজাইম (NADP) পদার্থ হইতে দুই পরমাণু হাই-ড্রোজেন অপসারণ করিয়া স্বয়ং বিজারিত হয়।

বিজারিত ডিহাইড্রোজেনেজ (2H)

↓ বিজারিত ডিহাইড্রোজেনেজ ফ্ল্যাভোপ্রোটীন (*Flavoprotein*)-এর সহিত বিক্রিয়ায় ইহা হইতে দুই পরমাণু হাইড্রোজেন অপসারণ করিয়া স্বয়ং বিজারিত হয়।

বিজারিত ফ্ল্যাভোপ্রোটীন (2H)

বিজারিত ফ্ল্যাভোপ্রোটীন বায়বীয় অক্সিজেনের $\frac{1}{2}O_2$ দ্বারা জারিত হইতে পারে

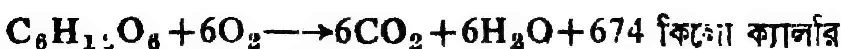
↓ বিজারিত ফ্ল্যাভোপ্রোটীন সাইটোক্রোম (*Cytochrome*)-এর সহিত বিক্রিয়ায় ইহার দুই পরমাণু হাইড্রোজেন দ্বারা সাইটো-ক্রোমকে বিজারিত করে।

বিজারিত সাইটোক্রোম

↓ বিজারিত সাইটোক্রোম বায়বীয় $\frac{1}{2}O_2$ এবং সাইটোক্রোম অক্সিডেজ (*Cytochrome oxydase*) নামক এনজাইমের সহায়তায় H_2O ও O উৎপন্ন করে।

শ্বাসকার্যের প্রক্রিয়া (Mechanism of respiration)

সাধারণত উদ্ভিদ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে শ্বাসকার্য করিয়া থাকে এই অক্সিজেন বায়ু অথবা জল হইতে উদ্ভিদ দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কোষান্তরে ব্যাপিত হয় এবং তথায় খাদ্য বস্তুকে জারিত করে। খাদ্য বস্তুর জারণের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্বাসকার্যের সময় গ্লুকোজকে উপকরণ হিসাবে গণ্য করিলে দেখা যায়, এক অণু গ্লুকোজ ও ছয় অণু অক্সিজেনের মিলনের ফলে ছয় অণু কার্বন ডাই-অক্সাইড, ছয় অণু জল ও শক্তি উৎপন্ন হয়। নিম্নে শ্বাসকার্যের রাসায়নিক সংকেত দেওয়া হইল ঃ



$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 674 \text{ কিলো ক্যালরি}$$

শ্বাসকার্যের সময় গ্লুকোজ অণুর অভ্যন্তরে নিহিত স্থিতিশক্তি (potential energy)

গতিশক্তিতে (kinetic energy) রূপান্তরিত হয়। পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এক গ্রাম-অণু (gram-mole) গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে জারিত হইলে প্রায় 674 কিলো ক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

কোষের অভ্যন্তরে সংঘটিত একটি অতি জটিল প্রক্রিয়া বলিয়া শ্বাসকার্যকে চিহ্নিত করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ ও অক্সিজেনের জারণে সরাসরি কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয় না। প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি বিক্রিয়া পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হইলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ উহারা তিনটি দশার অন্তর্ভুক্ত, যথা,—**গ্লাইকোলিসিস** (glycolysis), (খ) **ট্রাইকার্বক্সাইলিক অ্যাসিড চক্র** (tricarboxylic acid cycle) এবং (গ) **প্রান্তীয় শ্বাসকার্য** (terminal respiration)।

(ক) গ্লাইকোলিসিস (Glycolysis)

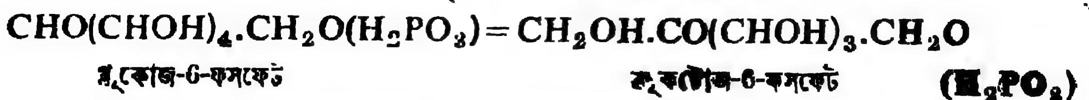
এই দশায় এক অণু গ্লুকোজ হইতে দুই অণু পাইরুভেট বা পাইরুভিক অ্যাসিড (pyruvic acid) উৎপন্ন হয় (অক্সিজেনের অভাবে পাইরুভিক অ্যাসিড হইতে অ্যাসিট্যাল ডিহাইড এবং তাহা হইতে ইথাইল অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়)। ইহাকে এম্‌বডেন মায়ারহফ পরনস পথ (Embden Meyerhof Parnas Pathway) বা সংক্ষেপে ই. এম. পি. পথও (EMP pathway) বলে।

গ্লাইকোলিসিসের বিভিন্ন বিক্রিয়াগুলি পর্যায়ক্রমে সাইটোপ্লাজমের তরল অংশে সংঘটিত হয়। নিম্নে পর্যায়ক্রমিক রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি বর্ণিত হইল।

(i) হেক্সোকাইজেন (hexokinase) নামক উৎসেচকের সাহায্যে গ্লুকোজ অণুতে ফসফেট অংশের অনুপ্রবেশের ফলে গ্লুকোজ-6-ফসফেট (glucose-6-Phosphate) উৎপন্ন হয় এবং তখন ATP ফসফেট অংশ প্রদান করিয়া ADP-তে পরিণত হয়।

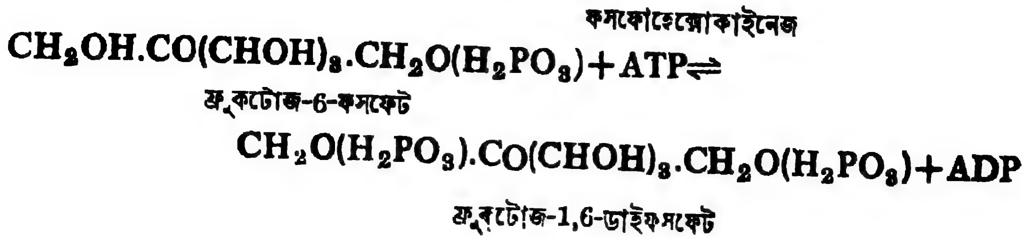


(ii) ফসফোগ্লুকো আইসোম্যারেজ (Phosphogluco isomerase) নামক উৎসেচকের সাহায্যে গ্লুকোজ-6-ফসফেট, ফ্রুক্টোজ-6-ফসফেটে (fructose-6-Phosphate) পরিণত হয়।

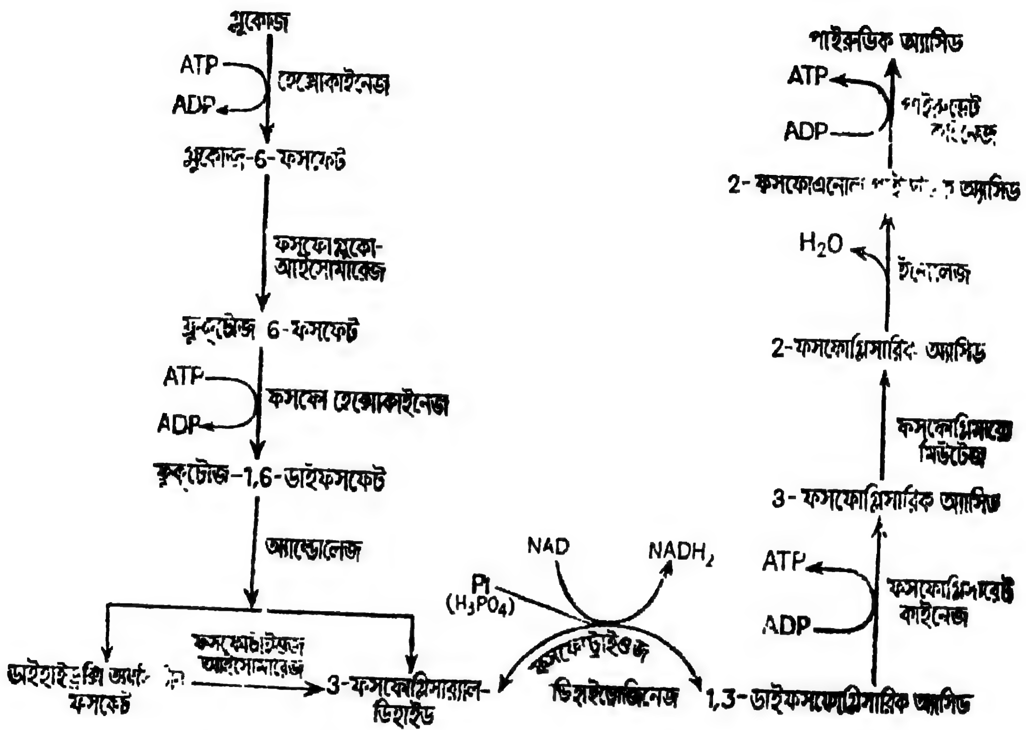


(iii) ফসফোহেক্সোকাইনেজ (Phosphohexokinase) নামক উৎসেচকের সাহায্যে ফ্রুক্টোজ-6-ফসফেট অণুতে ফসফেট অংশের অনুপ্রবেশের ফলে ফ্রুক্টোজ

1, 6-ডাইফসফেট (fructose-1, 6-diphosphate) উৎপন্ন হয় এবং তখন ATP ফসফেট অংশ দান করিয়া ADP-তে পরিণত হইয়া থাকে।

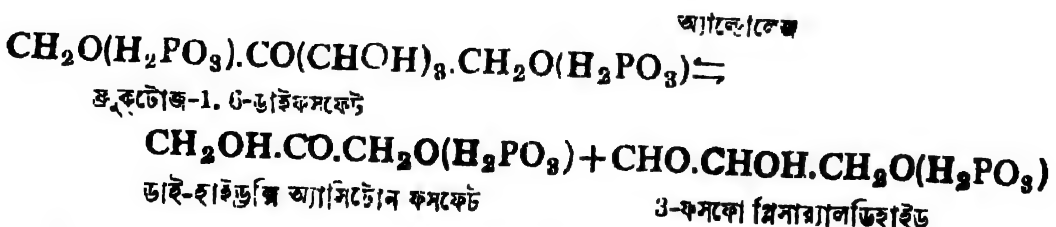


$$\underset{\text{ফ্রুকটোজ-6-ফসফেট}}{CH_2OH.CO(CHOH)_3.CH_2O(H_2PO_3)} + ATP \xrightleftharpoons{\text{ফসফোহেক্সোকাইনেজ}} \underset{\text{ফ্রুকটোজ-1,6-ডাইফসফেট}}{CH_2O(H_2PO_3).CO(CHOH)_3.CH_2O(H_2PO_3)} + ADP$$



২২২নং চিত্র—ই এম পি-পথ অথবা গ্লাইকোলিসিসের প্রধান প্রধান বিক্রিয়াগুলি

(iv) অ্যালডোলেজ (aldolase) নামক উৎসেচকের সাহায্যে ফ্রুকটোজ-1, 6-ডাইফসফেট বিশ্লিষ্ট হইয়া ডাই-হাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট (di-hydroxy acetone Phosphate) এবং 3-ফসফো গ্লিসার্যালডিহাইড (3-phospho-glyceraldehyde)-এ পরিণত হয়।

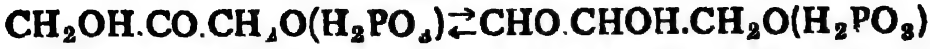


$$\underset{\text{ফ্রুকটোজ-1, 6-ডাইফসফেট}}{CH_2O(H_2PO_3).CO(CHOH)_3.CH_2O(H_2PO_3)} \xrightleftharpoons{\text{অ্যাল্ডোলেজ}} \underset{\text{ডাই-হাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট}}{CH_2OH.CO.CH_2O(H_2PO_3)} + \underset{\text{3-ফসফো গ্লিসার্যালডিহাইড}}{CHO.CHOH.CH_2O(H_2PO_3)}$$

(v) ফসফো ট্রাইওজ-আইসোমারেজ (Phospho-triose-isomerage) নামক

উৎসেচকের উপস্থিতিতে ডাই-হাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট ও 3-ফসফো গ্লিসারাল—ডিহাইড উভয়েই একটি অপরটিতে পরিণত হয়।

ফসফো ট্রাইওজ আইসোমারেজ



$$CH_2OH.CO.CH_2O(H_2PO_3) \rightleftarrows CHO.CHOH.CH_2O(H_2PO_3)$$

ডাই-হাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট 3-ফসফোগ্লিসার‍্যাল ডিহাইড

(vi) ফসফো-ট্রাইওজ-ডিহাইড্রোজিনেজ (Phospho-triose dehydrogenase) নামক উৎসেচক ও অজৈব ফসফেট (inorganic Phosphate)-এর উপস্থিতিতে 3-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড হইতে 1, 3-ডাইফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (1, 3-di-phosphoglyceric acid) উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় NAD হাইড্রোজেন বাহকের কাজ করে ফলে NAD বিজারিত হইয়া $NADH_2$-তে পরিণত হয়*।

ফসফো ট্রাইওজ ডিহাইড্রোজিনেজ



$$CHO.CHOH\ CH_2O(H_2PO_3)+Pi+NAD \rightleftarrows COO(H_2PO_3)CHOH.$$

3-ফসফো গ্লিসারিক ডিহাইড



$$CH_2O(H_2PO_3)+NADH_2$$

1,3-ডাই-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড

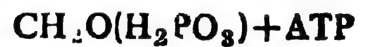
(vii) ফসফো-গ্লিসারেট কাইনেজ (Phosphoglycerate Kinase) নামক উৎসেচকের সাহায্যে 1, 3-ডাই-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড হইতে ফসফেটঅংশ স্থানান্তরিত হয়। ফলে 3-ডাই-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় ADP ফসফেট অংশ গ্রহণ করিয়া ATP-তে পরিণত হইয়া থাকে।

ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ



$$COO(H_2PO_3)\ CHOH.CH_2O(H_2PO_3)+ADP \leftrightarrows COOH.CHOH.$$

1, 3-ডাই-ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড



$$CH_2O(H_2PO_3)+ATP$$

3 ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড

(viii) ফসফো-গ্লিসারোমিউটেজ (Phospho-glycero-mutase) নামক উৎসেচকের সাহায্যে 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড 2-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

ফসফো-গ্লিসারো-মিউটেজ

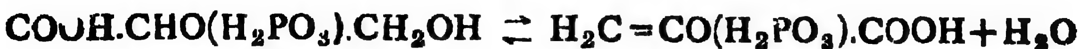


$$COOH.CHOH.CH_2O(H_2PO_3) \rightleftarrows COOH.CHO(H_2PO_3).CH_2OH$$

3-ফসফো-গ্লিসারিক অ্যাসিড 2 ফসফো-গ্লিসারিক অ্যাসিড

(ix) ইনোলেজ (enolase) নামক উৎসেচকের সাহায্যে 2-ফসফো-গ্লিসারিক অ্যাসিড হইতে 2-ফসফো-এনোল পাইরুভিক অ্যাসিড ও জল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইনোলেজ



$$COOH.CHO(H_2PO_3).CH_2OH \rightleftarrows H_2C=CO(H_2PO_3).COOH+H_2O$$

2-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড 2-ফসফো-এনোল পাইরুভিক অ্যাসিড

(x) সর্বশেষে পাইরুভেট কাইনেজ (Pyruvate Kinase) নামক উৎসেচকের

---

* প্রকৃতপক্ষে NAD^+ বিজারিত হইলে $NADH+H^+$ উৎপন্ন হয়।

সাহায্যে 2-ফসফো-এনোল পাইরুভিক অ্যাসিড হইতে পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় 2-ফসফো-এনোল পাইরুভিক অ্যাসিড হইতে ADP ফসফেট অংশ গ্রহণ করিয়া ATP-তে পরিণত হইয়া থাকে।

পাইরুভেট কাইনেজ



$$H_2C=CO(H_2PO_3)COOH+ADP \rightleftharpoons CH_3CO\,COOH+ATP$$

2-ফসফো-এনোল পাইরুভিক অ্যাসিড পাইরুভিক অ্যাসিড

এইরূপে সবাত শ্বাসকার্যের সময় গ্লাইকোলিসিসের পথে এক অণু গ্লুকোজ হইতে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

(খ) সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র (Citric acid cycle)

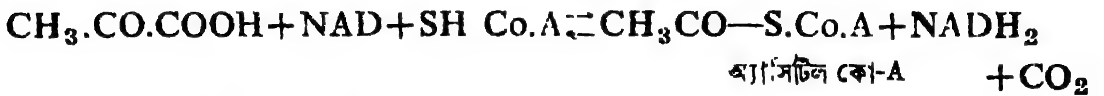
সবাত শ্বাসকার্যের সময় পাইরুভিক অ্যাসিড জারিত হইয়া বিভিন্ন প্রকার জৈব অ্যাসিডে বিপাকিত হয়। এই প্রকার জারণের দ্বারা পাইরুভিক অ্যাসিড রাসায়নিক

১৯৩নং চিত্র—সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র অথবা ক্রেবস-এর টি সি এ-চক্র

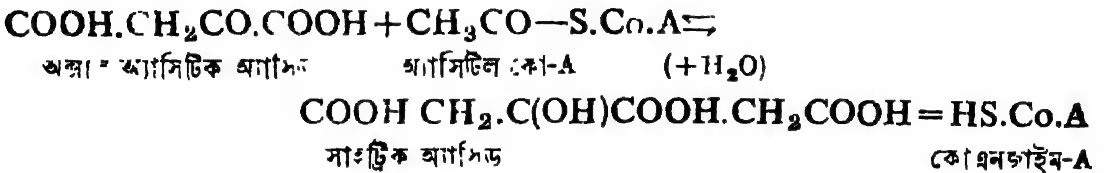
বিক্রিয়ার দ্বারা একটির পর একটি ধাপে বিভিন্ন প্রকার জৈব অ্যাসিড গঠন করিয়া অবশেষে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। এই চক্রের বিভিন্ন জৈব অ্যাসিডগুলির মধ্যে সাইট্রিক

অ্যাসিড নামক তিনটি যুক্ত যৌগ বস্তুর স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 1937 খ্রীষ্টাব্দে হ্যান্‌স ক্রেবস্‌ (Hans Krebs) সর্বপ্রথম চক্রটির নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। সেইজন্য এই চক্রটিকে ক্রেবসের ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড চক্র (Krebs' tricarboxylic acid cycle or krebs' TCA cycle) নামেও অভিহিত করা হয়। এই চক্রের বিভিন্ন বিক্রিয়াগুলি মাইটোকনড্রিয়ার মধ্যে সংঘটিত হয়। পূর্ব পৃষ্ঠায় (২২·নং চিত্র) পর্যায়ক্রমিক রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি বর্ণিত হইয়াছে।

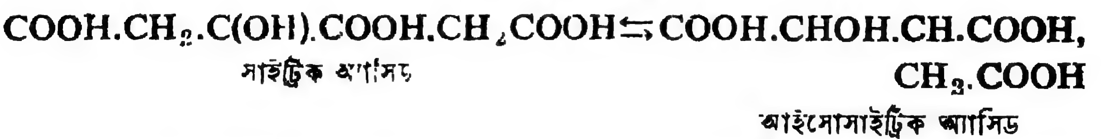
(i) পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ (pyruvate dehydrogenase) নামক উৎসেচকের সাহায্যে কো-A (coenzyme-A) ও NAD-এর উপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন ও কার্বক্সিল গ্রুপ (COOH) মুক্ত করিয়া অ্যাসিটিল কো-A $NADH_2$ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে।



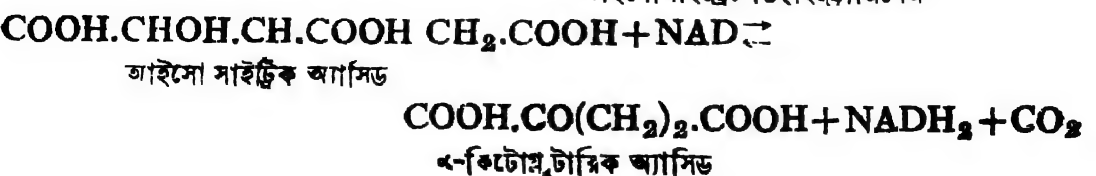
(ii) সাইট্রেট সিন্থেটেজ (Citratesynthetase) নামক উৎসেচকের সাহায্যে অ্যাসিটিল কো-এনজাইম-A ও অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে সাইট্রিক অ্যাসিড ও কো-এনজাইম-A উৎপন্ন হয়।



(iii) অ্যাকোনাইটেজ (aconitase) নামক উৎসেচকের সাহায্যে সাইট্রিক অ্যাসিড হইতে অ্যাকোনাইটিক অ্যাসিডের মাধ্যমে আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।



(iv) আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজিনেজ (isocitrate dehydrogenase) নামক উৎসেচকের সাহায্যে এবং NAD-এর উপস্থিতিতে আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড হাইড্রোজেন ও কারবক্সিল গ্রুপ মুক্ত করিয়া α-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড, $NADH_2$ ও CO_2 উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ার মধ্য পথে অক্সালো সাক্সিনিক অ্যাসিড উৎপন্ন হইতে পারে (উৎসেচকের সহিত যুক্ত অবস্থায়)।



(v) α-কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজিনেজ (α-ketoglutarate dehydrogenase) নামক উৎসেচকের সাহায্যে এবং NAD ও কো-A-এর উপস্থিতিতে α-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড জারিত হইয়া সাক্সিনিল কো-A, $NADH_2$ ও CO_2 উৎপন্ন করে।

α-কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজিনেজ



$$COOH.CO(CH_2)_2COOH + HS.Co.A + NAD \rightleftharpoons$$

α-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড



$$COOH(CH_2)_2CO-S\,Co\,A + NADH_2 + CO_2$$

সাক্সিনিল-কো-A

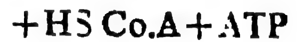
(vi) সাক্সিনিল-কো-A সিন্থেটেজ (succinyl Co.A synthetase) নামক উৎসেচকের সাহায্যে সাক্সিনিল-কো-A-এর আদ্র বিশ্লেষণের ফলে সাক্সিনিক অ্যাসিড ও কো-A উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় যে শক্তি মুক্ত হয় তাহা ADP হইতে ATP উৎপাদনে ব্যয়িত হয়।

সাক্সিনিল কো-A সিন্থেটেজ



$$COOH(CH_2)_2CO-S.Co\,A + ADP + Pi \rightleftharpoons COOH(CH_2)_2COOH$$

সাক্সিনিল কো-A — সাক্সিনিক অ্যাসিড

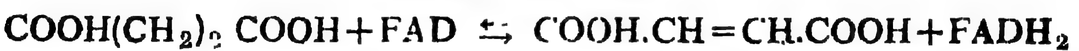


$$+ HS\,Co.A + ATP$$

কো-A

(vii) সাক্সিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ (succinate dehydrogenase) নামক উৎসেচকের সাহায্যে ও FAD-এর উপস্থিতিতে সাক্সিনিক অ্যাসিডের জারণের ফলে ফিউমারিক অ্যাসিড (fumaric acid) ও $FADH_2$ উৎপন্ন হয়।

সাক্সিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ



$$COOH(CH_2)_2\,COOH + FAD \rightleftharpoons COOH.CH{=}CH.COOH + FADH_2$$

সাক্সিনিক অ্যাসিড — ফিউমারিক অ্যাসিড

(viii) ফিউমারেজ (fumarase) নামক উৎসেচকের সাহায্যে ও জলের উপস্থিতিতে ফিউমারিক অ্যাসিড, ম্যালিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

ফিউমারেজ



$$COOH\,CH{=}CH\,COOH + H_2O \rightleftharpoons COOH.CH_2.CHOH.COOH$$

ফিউমারিক অ্যাসিড — ম্যালিক অ্যাসিড

(ix) ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেজ (malate dehydrogenase) নামক উৎসেচকের সাহায্যে ও NAD-এর উপস্থিতিতে ম্যালিক অ্যাসিডের জারণের ফলে অক্সাল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও $NADH_2$ উৎপন্ন হয়।

ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেজ



$$COOH.CH_2.CHOH.COOH + NAD \rightleftharpoons COOH.CH_2.CO\,COOH$$

ম্যালিক অ্যাসিড — অক্সাল অ্যাসিটিক অ্যাসিড



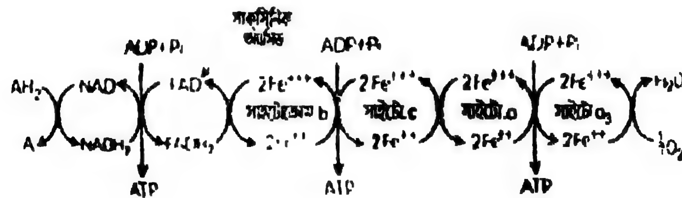
$$+ NADH_2$$

অক্সাল অ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপাদনের সাথেই চক্রটি পুনরায় সংঘটিত হইতে থাকে। এই চক্রটি (২২৩নং চিত্র) লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে কোন্ কোন্ পর্যায় অ্যাসিডের অণু হইতে হাইড্রোজেন ও কার্বক্সিল গ্রুপ বিমুক্ত হয়। প্রতি পাইরুভিক অ্যাসিডের অণুর জারণের ফলে তিন অণু CO_2 উৎপন্ন হয়। কিন্তু এক অণু হেক্সোজ শর্করা হইতে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। সুতরাং শ্বসন প্রক্রিয়ায় সর্বমোট ছয় অণু কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

শ্বাসকার্য জনিত পদার্থ হইতে হাইড্রোজেন বিমোচিত হইয়া ক্রম পর্যায়ে হাইড্রোজেন বাহকতন্ত্র (hydrogen transport system)-এর মাধ্যমে শ্বাসকার্যের পরিসমাপ্তি-কালে অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়ায় জল এবং ATP গঠন করে। $NADH_2$ এবং $FADH_2$ প্রভৃতি বিজারিত হাইড্রোজেন বাহকের জারণের ফলে জলের অণু গঠিত হয়। দেখা গিয়াছে যে পাইরুভিক অ্যাসিডের সম্পূর্ণ জারণের ফলে চার অণু $NADH_2$ ও এক অণু $FADH_2$ উৎপন্ন হয় ও গ্লাইকোলিসিসের সময় এক অণু $NADH_2$ গঠিত হয়। এই ছয় অণু হাইড্রোজেন বাহকের জারণের ফলে ছয় অণু জল উৎপন্ন হয়। সুতরাং শ্বসন কার্যে এক অণু গ্লুকোজ ও ছয় অণু অক্সিজেনের মধ্যে জারণের ফলে ছয় অণু কার্বন ডাই-অক্সাইড, ছয় অণু জল ও শক্তি উৎপন্ন হয়।

(গ) প্রান্তীয় শ্বাসকার্য (Terminal respiration)

শ্বাসকার্যের অন্তিমলগ্নে মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে পূর্বের দশাগুলিতে উদ্ভূত বিজারিত হাইড্রোজেন বাহকগুলি অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিয়া জারিত হইয়া থাকে। তাহারই ফলস্বরূপ জল ও ATP উৎপন্ন হয়। নানা প্রকার জৈবনিক কার্যে ATP ব্যবহৃত হয়। শ্বাসকার্যের অন্তিম লগ্নে সংঘটিত হইয়া থাকে বলিয়া এই দশাকে **প্রান্তীয় শ্বাসকার্য** (terminal respiration) বলে। এই দশায় NAD, FAD ও সাইটোক্রোম (cytochrome) নামক বিভিন্ন হাইড্রোজেন বাহকগুলি অংশ গ্রহণ করে। বিভিন্ন ধরনের সাইটোক্রোম রহিয়াছে। উহারা লৌহ ঘটিত এক প্রকার জৈব যোগ।



২২৪নং চিত্র — প্রান্তীয় শ্বাসকার্যের বিক্রিয়াগুলি

AH_2 = রেসপিরেটরি সাবস্ট্রেট ; A = জারিত সাবস্ট্রেট

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে এই দশায় ATP উৎপন্ন হয়। মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেনের বন্ধনের ফলস্বরূপ ATP উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য এই পদ্ধতিটিকে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশান (oxydative phosphorylation) বলা হয় (২২৪নং চিত্র)।

অবাত শ্বাসকার্য (Anaerobic respiration)

পূর্বেই বলা হইয়াছে হেক্সোজ শর্করা গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ায় পাইরুভিক অ্যাসিড (Pyruvic acid) নামক একপ্রকার অন্তর্বর্তী অস্থায়ী পদার্থ গঠন করে। অবাত শ্বাসকার্য (Anaerobic respiration)-কালে ইহা ক্রেবসের চক্র (Krebs' Cycle) অনুসরণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জারিত না হইয়া অসম্পূর্ণরূপে জারিত হয় যাহার ফলে ইহা বিশ্লেষিত হইয়া বিভিন্ন প্রকার জৈব অ্যাসিড, কোহল প্রভৃতি গঠন করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়। যখন এই প্রকার অবাত শ্বাসকার্য ছত্রাক, জীবাণু প্রভৃতি কয়েকটি নিম্নশ্রেণী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয় তখন ইহাকে সন্ধান (fermentation) বলে।

অবাত শ্বাসকার্যে যে-সকল রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল ; যথা—

(*a*) পাইরুভিক অ্যাসিড এনজাইম কার্বক্সাইলেজ (*carboxylase*)-এর সাহায্যে অ্যাসিট্যালডিহাইড (acetaldehyde) ও CO_2 (কার্বন ডাই-অক্সাইড)-এ বিশ্লেষিত হয় ; যথা—


$$CH_3.CO.COOH \xrightleftharpoons{\text{কার্বক্সাইলেজ}} CH_3.CHO+CO_2$$

(*b*) অ্যাসিট্যালডিহাইড, সহ এনজাইম $NADH_2$-এর সহিত বিক্রিয়ায় ইথাইল কোহল (ethyl alcohol) এবং NAD গঠন করে ; যথা—


$$CH_3.CHO+NADH_2 \xrightleftharpoons{\text{অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ}} CH_3.CH_2OH+NAD$$

কখনও কখনও জীবাণু সন্ধান (bacterial fermentation)-কালে পাইরুভিক অ্যাসিড $NADH_2$-এর সহিত বিক্রিয়ায় ল্যাকটিক অ্যাসিড (lactic aid) ও NAD উৎপন্ন করে ; যথা—


$$CH_3.CO.COOH+NADH_2 \rightleftharpoons CH_3.CHOH.COOH+NAD$$

অবাত শ্বাসকার্য ও কোহল সন্ধান (Anaerobic respiration and alcoholic fermentation)

অবাত শ্বাসকার্য ও কোহল সন্ধান. উভয় ক্ষেত্রেই হেক্সোজ শর্করাকে প্রাথমিক পদার্থরূপে গণ্য করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটিলে কোহল উৎপন্ন হয়, কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয় এবং সম পরিমাণ শক্তি মুক্ত হয়। কোহল সন্ধানের সময় কয়েক প্রকার ছত্রাক, জীবাণু প্রভৃতি নিম্নশ্রেণী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বহির্ভাগে অবস্থিত হেক্সোজ শর্করার মাধ্যমটি কোহল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয় কিন্তু

অবাত শ্বাসকার্যে কোহল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড কোষের অভ্যন্তরে গঠিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে কোহল-সন্ধানের ক্ষেত্রে উদ্ভিদদেহে কোহল দ্বারা বিষক্রিয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এবং যতক্ষণ বহিস্থ মাধ্যমটি উপস্থিত থাকিবে ততক্ষণ কোহল সন্ধানও চলিতে থাকিবে। অধিকন্তু ইহার দ্বারা কোষের বহির্ভাগে যে শক্তি মুক্ত হয় তাহার দ্বারা কোষঝিল্লীর নিকট অবস্থিত ADP, ATP-তে পরিণত হয়। কিন্তু অবাত শ্বাসকার্যে কোষমধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পায় বলিয়া এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকিলে কোষগুলি তথা প্রোটোপ্লাস্ট কোহলের দ্বারা বিষক্রিয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোহল সন্ধান হইল কয়েকটি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের স্বাভাবিক জৈবনিক কার্য কিন্তু উচ্চশ্রেণী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অবাত শ্বাসকার্যকে স্বাভাবিক শ্বাসকার্যের একটি অস্থায়ী প্রতিকল্পরূপে গণ্য করা হয়। ইহার দ্বারা যে শক্তি উন্মুক্ত হয় তাহা কোষের মধ্যেই সঞ্চিত থাকে।

শ্বাসকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় কারণসমূহ (Factors influencing respiration)

অন্যান্য জৈব প্রক্রিয়ার ন্যায় শ্বাসকার্যও কতকগুলি কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহাদের নিম্নে বর্ণনা করা হইল ; যথা—

(ক) বহিঃস্থ কারণ (External factors)

1. তাপমাত্রা (*Temperature*)—দেখা গিয়াছে যে নির্দিষ্ট তাপ সীমার মধ্যে অর্থাৎ 0°-45° সেন্টিগ্রেডের তাপমাত্রার মধ্যে তাপমাত্রা নিয়মিতরূপে বৃদ্ধি করিলে শ্বাসকার্যের হারও নিয়মিতরূপে বৃদ্ধি পায় কিন্তু ইহা 45° সেন্টিগ্রেডের যতই অধিক হইবে ততই শ্বাসকার্যের হারও দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকিবে এবং ইহার সহিত অন্যান্য জৈবনিক কার্যেরও ততই অবনতি ঘটিবে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে 0°-35° সেন্টিগ্রেড তাপসীমার মধ্যে শ্বাসকার্যের হার নিয়মিত বৃদ্ধি পায় কিন্তু 35° সেন্টিগ্রেডের ঊর্ধ্বে তাপমাত্রা অধিকক্ষণ রাখিলে শ্বাসকার্য ব্যাহত হয়। এইরূপ অধিকক্ষণ উচ্চতর তাপ-মাত্রায় থাকিলে প্রোটোপ্লাজমের কিছু অংশ (সম্ভবতঃ কিছু এনজাইম) বিনষ্ট হইয়া শ্বাসকার্যের পতন ঘটায়। এতদ্ব্যতীত 35° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার ঊর্ধ্বে কোষের মধ্যে স্বল্পহারে অক্সিজেন প্রবেশ করিলে অথবা শ্বাসকার্যজনিত পদার্থের পরিমাণ অপরিমিত হইলে অথবা কোষমধ্যে অত্যধিক কার্বন ডাই-অক্সাইড সঞ্চিত হইলে শ্বাসকার্য বিঘ্নিত হয়। দেখা গিয়াছে যে 30° সেন্টিগ্রেডে উদ্ভিদ সুষ্ঠুভাবে শ্বাসকার্য সম্পাদন করে এবং ইহার নিম্নেও শ্বাসকার্যের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয় না।

2. অক্সিজেনের ঘনত্ব (*Concentration of oxygen*)—বর্তমানে পরীক্ষার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে অক্সিজেনের সরবরাহের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাইবে শ্বাসকার্যের হারও তদনুপাতে বর্ধিত হইবে।

পরীক্ষার দ্বারা শ্বাসহার (R. Q.) মাপিবার সময় দেখা গিয়াছে যে অক্সিজেন সরবরাহের ঘনত্ব (0-5) শতাংশ অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে (0-2) শতাংশ হইলে

অবাত শ্বাসকার্যের সমাপ্তি ঘটে। অক্সিজেন সরবরাহের এইরূপ ঘনত্বকে সমাপ্তি বিন্দু (extinction point) বলে। এই সমাপ্তি বিন্দুর ঊর্ধ্বে সবাত শ্বাসকার্যের সূচনা হয়। দুইটি তথ্যের দ্বারা ইহা প্রমাণ করা যায়। প্রথমটি হইল যে সমাপ্তি বিন্দুর ঊর্ধ্বে শ্বাসকার্যজনিত এনজাইমগুলি জারিত হইয়া কার্যকরী হয়। দ্বিতীয় তথ্যটি এফ. এফ. ব্ল্যাকম্যান (F. F. Blackmann) নামক বিজ্ঞানী উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়া আরম্ভের পূর্বে অক্সিজেন সরবরাহ কার্বোহাইড্রেট চলাচলে এবং ইহাকে কার্যকরী করিতে সহায়তা করে যাহার ফলে শ্বাসকার্যের হার পরোক্ষভাবে বৃদ্ধি পায়।

3. আলোক (*Light*)—অতীতে বিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে ক্লোরোফিলবিহীন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আলোকের সহিত শ্বাসকার্যের কোনোরূপ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু অধুনা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে এইপ্রকার উদ্ভিদকে আলোক সরবরাহ করিলে শ্বাসকার্যের হার কুড়ি শতাংশ হইতে শত শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

সবুজ বর্ণের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে শ্বাসকার্যের উপর আলোকের প্রতিক্রিয়া সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সহিত জড়িত। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আলোকের তীব্রতা (intensity of light) বর্ধিত করিলে শ্বাসকার্যজনিত পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ইহাতে শ্বাসকার্যের হারও বৃদ্ধি পায়।

4. লবণ, অ্যাসিড, ক্ষার, বিষাক্ত পদার্থ এবং উত্তেজক জৈব পদার্থ (*Salts, acids, alkalies, poisonous substances and stimulating organic substances*)—দেখা গিয়াছে যে ইথার, ফরম্যালডিহাইড, কোকেন, মরফিন প্রভৃতি কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের লঘু দ্রবণ স্বল্পক্ষণ ধরিয়া প্রয়োগ করিলে শ্বাসকার্যের হার বৃদ্ধি পায় কিন্তু ঐ সকল পদার্থের ঘন দ্রবণ অধিক্ষণ প্রয়োগে শ্বাসকার্যের ব্যাঘাত ঘটায়।

5. রোগ এবং আঘাত (*Disease and injury*)—উদ্ভিদকোষগুলি রোগগ্রস্ত বা আঘাত প্রাপ্ত হইলে উহাদের শ্বাসকার্যও বৃদ্ধি পায়। ইহা আঘাতপ্রাপ্ত অথবা রোগগ্রস্ত কোষের বিস্তারের উপর নির্ভর করে।

6. কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব (*Carbon dioxide concentration*)—বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটিলে শ্বাসকার্যের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয় না; কিন্তু মৃত্তিকায় ইহার পরিবর্তন ঘটিলে শ্বাসকার্যেরও প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়।

7. জল সরবরাহ (*Water supply*)—সাধারণ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জল সরবরাহের সহিত শ্বাসকার্যের কোনো প্রকার সম্বন্ধ না থাকিলেও জাঙ্গল উদ্ভিদের (Xerophytes) ক্ষেত্রে জলসরবরাহ শ্বাসকার্য হারের যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করে।

(খ) অন্তস্থ কারণ (Internal factors)

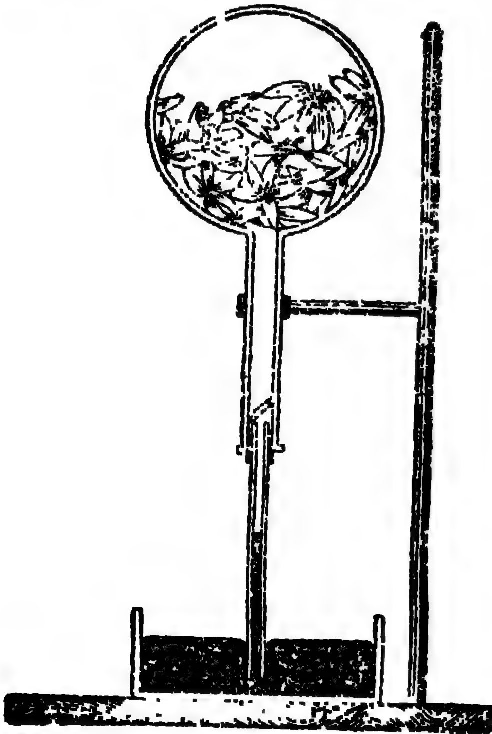
1. খাদ্য বা শ্বাসকার্যজনিত পদার্থ (*Food or Respirable materials*)—বহু পরীক্ষার দ্বারা বিজ্ঞানীগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কোষমধ্যস্থ সঞ্চিত

শ্বাসকার্যজনিত পদার্থের দ্রবণের পরিবর্তন ঘটিলে শ্বাসকার্যের হারও সেই অনুপাতে পরিবর্তিত হয়।

2. কোষমধ্যস্থ জলের পরিমাণ (*Water content of the cells*)—কোষমধ্যস্থ জলের পরিমাণের উপর শ্বাসকার্য নির্ভরশীল। শুষ্ক বীজ স্বভাবতঃই অতি ধীরে শ্বাসকার্য সম্পাদন করে কিন্তু ইহাদিগকে সিক্ত করিলে শ্বাসকার্যের হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বীজগুলিকে অতি মাত্রায় সিক্ত করিলে শ্বাসকার্যের হার ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে। সিক্ত করিলে যে শ্বাসকার্য বৃদ্ধি পায় তাহার কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে যে ইহাতে শ্বাসকার্যজনিত পদার্থ জলে দ্রবীভূত হইয়া শ্বাসকার্যজনিত এনজাইম ও হরমোনগুলিকে কার্যকরী করিয়া থাকে যাহার ফলে প্রোটোপ্লাজমের শ্বাসকার্য বর্ধিত হয়।

শ্বাসকার্য বুঝাইবার জন্য কয়েকটি পরীক্ষা (Experiments demonstrating respiration)

২৮নং পরীক্ষা : সবাত শ্বাসকার্য (*Aerobic respiration*—২২৫নং চিত্র)—কতকগুলি সূর্যমুখী ফুলের সবুজ মঞ্জরী পত্রাবরণ (involucre of bracts) অপসারণ করিয়া উহাদিগকে একটি ফ্লাস্কের মধ্যে রাখিয়া জল দ্বারা সিক্ত কর। ফ্লাস্কের মুখ একটি ছিদ্রযুক্ত ছিপির সাহায্যে বন্ধ করিয়া ইহার ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটি কাচনল প্রবেশ করাও। এখন ফ্লাস্কটিকে এইরূপে উপুড় কর যাহাতে কাচনলটি খাড়াভাবে একটি পারদপূর্ণ পাত্রে ডুবিয়া থাকে। এইরূপ করিবার পূর্বে অবশ্য ফ্লাস্কের মধ্যে কিছু কস্টিক পটাশের টুকরো লইয়া ইহার মুখটিকে মোমের সাহায্যে উপযুক্তরূপে বায়ুরোধক করিতে হইবে। ইহার অনুরূপ আর একটি পরীক্ষা সম্পাদন কর কিন্তু এই ক্ষেত্রে ফ্লাস্কে কোনো কস্টিক পটাশের টুকরা থাকিবে না।

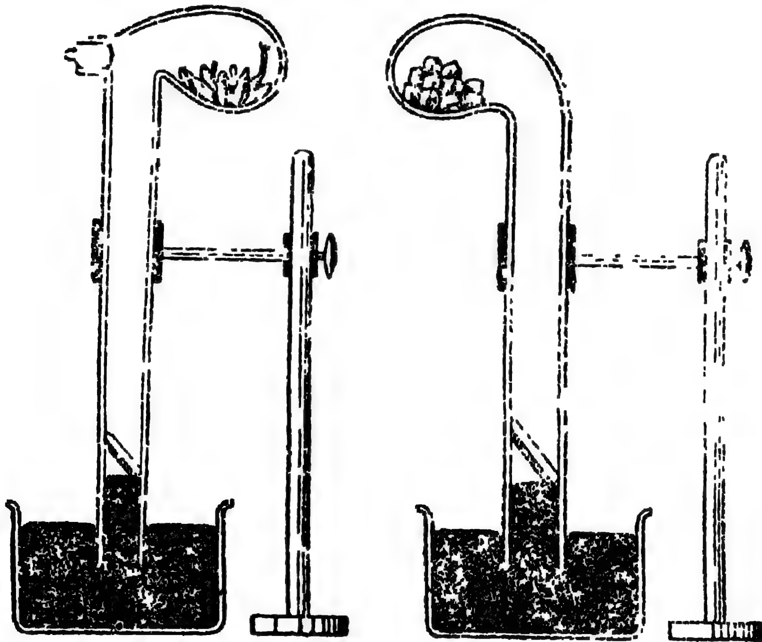


২২৫নং চিত্র—সবাত শ্বাসকার্যের পরীক্ষা

এইরূপ অবস্থায় ফ্লাস্ক দুইটিকে কিছুক্ষণ ক্ল্যাম্পের সাহায্যে আটকাইয়া রাখিলে দেখা যাইবে যে প্রথমোক্ত কাচনলের মধ্য দিয়া কিছু পারদ প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে কাচনলের মধ্য দিয়া পারদ প্রবেশ করে নাই।

ইহার কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে যে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ফ্লাস্কমধ্যস্থ বায়ুতে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে তাহা কস্টিক পটাশ শোষণ করিয়া লয়। ফুলের পাপড়িগুলি এই কার্বন ডাই-অক্সাইডবিহীন বায়ু হইতে শ্বাসকার্যের দ্বারা অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত করে যাহা কস্টিক পটাশের টুকরা শোষণ করিয়া লয়। ইহাতে ফ্লাস্ক-মধ্যস্থ বায়ুর চাপ ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে যাহার ফলে কাচনল দিয়া পারদ উপরে উঠে। কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে কাচনলে কস্টিক পটাশের টুকরার অভাবে শ্বাসকার্যের দ্বারা মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষিত হয় না যাহার ফলে কাচনলের পারদতলের বিশেষ তারতম্য হয় না।

২৯নং পরীক্ষা—রেসপিরোস্কোপ (Respiroscope—২২৬নং চিত্র)—সবাত শ্বাসকার্যের পরীক্ষা—(*Experiment to demonstrate respiration*) এই পরীক্ষাটি ২৮নং পরীক্ষারই অনুরূপ। এই ক্ষেত্রে যন্ত্রটি হইল একটি দীর্ঘ কাচনল যাহার এক প্রান্তে রহিয়াছে স্ফীত ও বাঁকানো একটি বাল্‌ব্ (bulb) (চিত্রে যেরূপ দেখান হইয়াছে)। বাল্‌বের এক প্রান্তে একটি ছিদ্র আছে যাহা স্টপ কক (stop cock) দ্বারা বন্ধ। বাল্‌বের মধ্যে কিছু ফুলের পাপড়ি অথবা সিক্ত ও অঙ্কুরিত

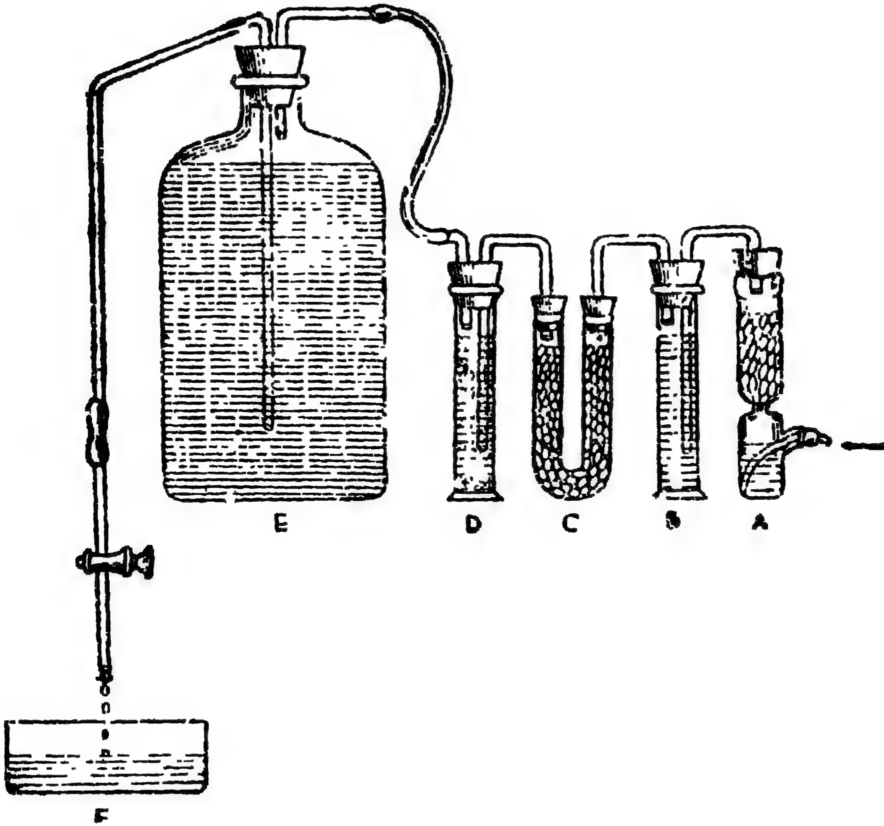


২২৬নং চিত্র—রেসপিরোস্কোপের সাহায্যে সবাত শ্বাসকার্যের পরীক্ষা।

ছোলা বা মটরের বীজ, যাহাদের বীজত্বক অপসারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ প্রবেশ করাও ও অল্প কয়েকটি কস্টিক পটাশের টুকরা স্টপ কক্ অপসারণ করিয়া ইহাতে প্রবেশ করাও। এখন কাচনলটিকে পারদপূর্ণ পাত্রে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে দেখা যাইবে যে ইহার মধ্যে পারদ প্রবেশ করিয়াছে। বাল্‌বের মধ্যে কস্টিক পটাশের টুকরা

না লইয়া কাচনলটিকে কস্টিক পটাশের দ্রবণে ডুবাইয়া রাখিলে অনুরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যাইবে।

৩০নং পরীক্ষা—একটি U-নল C, দুইটি কাচের জার B ও D এবং একটি কস্টিক পটাশপূর্ণ পাত্র A লও (২২৭নং চিত্র)। B ও D এই দুইটি কাচের জারে চুনের জল এবং U-নলC-তে কিছু অংকুরিত বীজ লও যাহার বীজত্বকগুলি অপসারণ করা হইয়াছে। একটি বড় কাচের জার E-এর সহিত একটি বাতচোষক (aspirator) সংযুক্ত কর। বাতচোষকের কল খুলিলে সমগ্র যন্ত্রের মধ্য দিয়া দ্রুত বাতাস ঢুকিতে থাকিবে। কস্টিক পটাশ জার A-এর মধ্য দিয়া বাতাস প্রবেশ করিলে ইহা কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত হইবে।

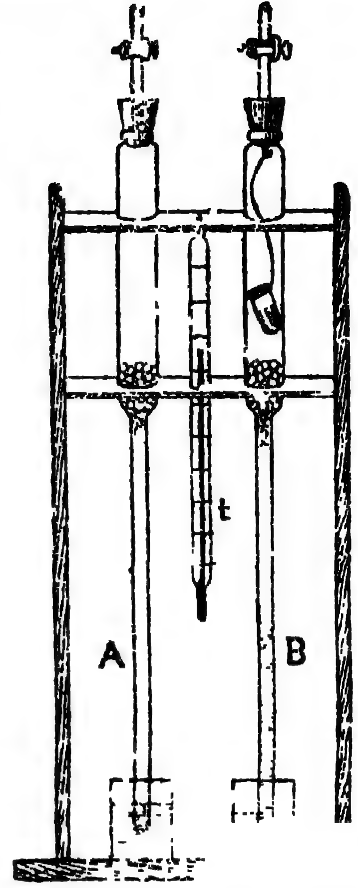


২২৭নং চিত্র—অঙ্কুরিত বীজের শ্বাসকার্যের সময় যে CO_2 উৎপন্ন হয় তাহার প্রমাণ

এই কারণে B জারে অবস্থিত চুনের জল ঘোলাটে হয় না। U-নল C-এর মধ্য দিয়া বাতাস প্রবেশ করিবার সময় ইহা অংকুরিত বীজের সংস্পর্শে আসে। এই স্থানে বায়ুস্থ অক্সিজেনের সাহায্যে বীজগুলি শ্বাসকার্য সম্পাদন করে ও কার্বন ডাই-অক্সাইড D কাচ জারে প্রবেশ করিলে ইহাতে অবস্থিত চুনের জল ঘোলাটে হইয়া যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে শ্বাসকার্যকালে কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত হয়।

৩১নং পরীক্ষা—সবাত শ্বাসকার্যে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত হয় তাহার পরীক্ষা (*Experiment showing evolution of carbon dioxide during*

aerobic respiration—২২৮নং চিত্র)—একটি কাষ্ঠনির্মিত ফ্রেমে দুইটি কাচনল A ও B খাড়াভাবে রাখা হইয়াছে (চিত্রে যেরূপ দেখান হইয়াছে)। প্রতি কাচনলের নিম্নভাগ দীর্ঘ ও সরু কিন্তু উপরিভাগ প্রশস্ত এবং ইহা রবারের ছিপির দ্বারা বন্ধ। কাচনলের সরু অংশগুলিকে জলপূর্ণ বীকারে ডুবাইয়া রাখ। উভয় নলেরই প্রশস্ত অংশগুলিতে অঙ্কুরিত বীজ লইয়া বীজত্বক ছাড়াইয়া প্রবেশ করাও এবং বীজগুলি যাহাতে সরু নলের অংশে প্রবেশ না করিতে পারে সেইজন্য প্রশস্ত ও সরু অংশের সংযোগস্থলে কিছু গ্লাসউল (glass-wool) লও। এখন একটি ক্ষুদ্র নলে কিছু কস্টিক পটাশ লইয়া B-নলের ছিপি হইতে ঝুলাইয়া দাও। নলগুলিকে উপযুক্তরূপে বায়ু-রোধক কর। দুইটি নলের মধ্যস্থলের ফ্রেম হইতে একটি থারমোমিটার ঝুলাইয়া দাও। সমগ্র যন্ত্রটিকে এইরূপ স্থানে রাখ যেখানে তাপমাত্রা প্রায় সমভাবে থাকে। থারমোমিটার কর্তৃক পরীক্ষাকালীন তাপমাত্রা নির্দেশিত হইবে। কয়েক দিন বাদে দেখা যাইবে যে B কাচনলে বীকারের জল প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু A কাচনলে করে নাই। ইহার কারণস্বরূপ বলা হয় যে B কাচনলে অবস্থিত কস্টিক পটাশ শ্বাসকার্যের দ্বারা উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে যাহার ফলে ইহাতে জল প্রবেশ করে।

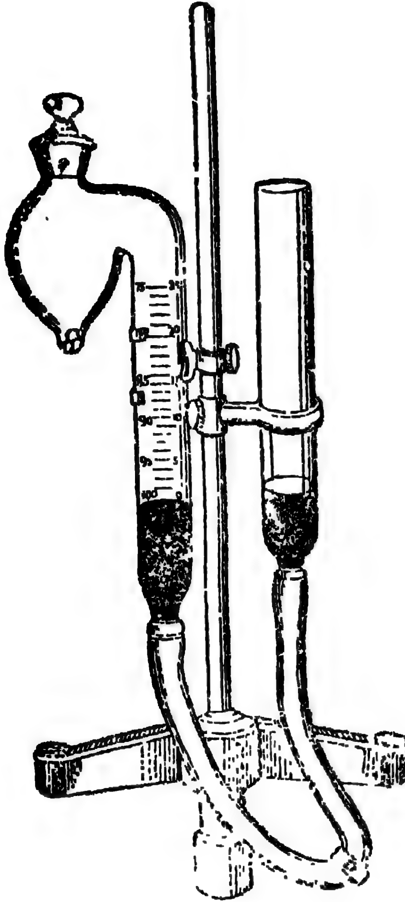


২২৮নং চিত্র—শ্বাসকার্যের সময় যে CO_2 মুক্ত হয় তাহা এই যন্ত্রের সাহায্যে বুঝান হইয়াছে

৩২নং পরীক্ষা ঃ গ্যানোর রেসপিরোমিটার (*Ganong's respirometer*—২২৯নং চিত্র)—শ্বাস-হার নির্ধারণ যন্ত্র (An apparatus for determination of R.Q.) গ্যানোর রেসপিরোমিটার নামক যন্ত্রটি দুইটি কাচনলের সমষ্টি, যাহার একটি অংশাঙ্কিত (graduated) এবং ইহার অগ্রভাগের এক পার্শ্বে একটি বাল্ব আছে। বাল্বের নিম্নাংশ স্বল্প উদ্গত। বাল্বের উপরিভাগের খোলা মুখটি একটি স্টপ কক (stop cock) দ্বারা বন্ধ। স্টপ কক্ ও বাল্বের উপরিভাগে উভয়েরই একটি করিয়া ছিদ্র আছে। বাল্বের মুখে স্টপ কক্‌টিকে চাপিয়া ঘুরাইলে দুইটি ছিদ্রই যখন মিলিয়া যাইবে তখন বাল্বের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিবে। স্টপ ককের অন্য অবস্থায় ইহা বায়ুরোধক হয়। বাল্ব ব্যতীত নলটি 100 m.l. দাগে অংশাঙ্কিত করা হইয়াছে এবং বাল্বটির উদ্গত অংশ ব্যতীত ইহার আয়তন 2m.l. দাঁড়ায়। অপর কাচনলটির উপরিভাগ বায়ুতে মুক্ত এবং ইহাকে আধার নল (reservoir tube) বলে। ইহার

নিম্নভাগে একটি নির্দিষ্ট দাগ চিহ্নিত করা আছে। উভয় নলেরই নিম্নাংশ একটি নল দ্বারা যুক্ত।

বাল্‌বের উদ্গত অংশে বীজত্বক-ছাড়ানো কয়েকটি বীজ রাখ যাহাতে উহার আয়তন 2 c.c. দাঁড়ায়। এখন আধার নলে পারদ ঢাল যাহাতে অংশাঙ্কিত নলে 100 c.c. চিহ্নে পারদতল দাঁড়ায়। বাল্‌বটিকে স্টপ কক্ দ্বারা নির্দিষ্ট অবস্থানে বন্ধ করিয়া সম্পূর্ণ যন্ত্রটিকে ছায়াযুক্ত স্থানে খাড়াভাবে ক্ল্যাম্প এবং দণ্ডের সাহায্যে আঁটিয়া রাখ। প্রায় 72 ঘণ্টা পরে আধার নলটিকে অপসারণ করিয়া কস্টিক পটাশ দ্রবণপূর্ণ পাত্রে ডুবাইয়া দাও। এখন ধীরে ধীরে আধার নল হইতে পারদ অপসারণ করিয়া সম্পূর্ণ যন্ত্রের মধ্যে কস্টিক পটাশ দ্রবণ প্রবেশ করাও। আধার নলে কস্টিক পটাশ দ্রবণ নির্দিষ্ট চিহ্নে রাখিয়া অংশাঙ্কিত নলের কস্টিক পটাশ দ্রবণের তল লক্ষ্য কর। দেখিবে যে ঐ তল উপরে উঠিয়া গিয়াছে। আবদ্ধ 100 c.c. অংশাঙ্কিত নলের বায়ুতে শ্বাসকার্যের ফলে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হইয়াছে তাহা কস্টিক পটাশ দ্রবণে দ্রবণীয় বলিয়া উহার তল অংশাঙ্কিত নলের উপরে উঠিয়াছে। শ্বাসকার্যের পরে অংশাঙ্কিত নলে অবশিষ্ট অক্সিজেনের আয়তন নির্ণয় করিবার জন্য উপরোক্ত প্রণালীতে কস্টিক পটাশ দ্রবণের পরিবর্তে ইহার মধ্যে ক্ষারীয়

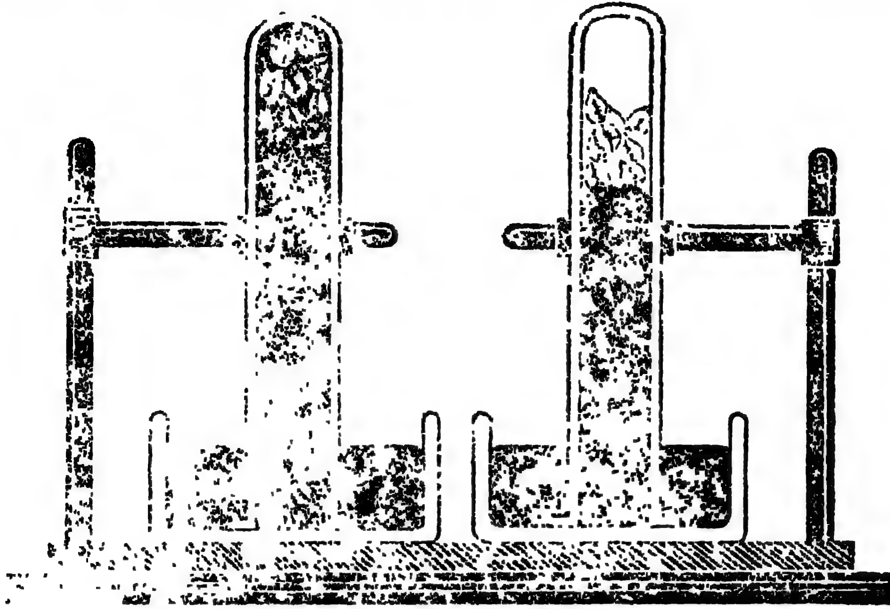


২২৯নং চিত্র—গ্যানোর রেসপিরোমিটারের সাহায্যে শ্বাসকার্যের পরীক্ষা

পাইরোগ্যালেট দ্রবণ প্রবেশ করাও। এই পরীক্ষার দ্বারা গৃহীত অক্সিজেনের পরিমাণ এবং শ্বাসকার্যের ফলে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় এবং ইহা হইতে শ্বাসহার (R.O.) নির্ণয় করা সম্ভব।

৩নং পরীক্ষা : অবাত শ্বাসকার্য (*Anaerobic respiration*)—একটি টেস্ট-টিউব পারদে পূর্ণ কর এবং ইহাকে একটি পারদপূর্ণ পাত্রের মধ্যে উপুড় কর ও খাড়াভাবে রাখিবার জন্য বন্দোবস্ত কর। এখন কতকগুলি ভিজা ছোলার বীজত্বক ছাড়াইয়া ফরসেপস (বাঁকা চিমটা)-এর সাহায্যে উহাদিগকে টেস্ট টিউবের মধ্যে প্রবেশ করাও ২৩০নং চিত্র। দুই এক দিন পরে দেখিবে, পারদস্তম্ভ নীচে নামিয়া গিয়াছে ও টেস্ট-টিউবের উপরিভাগ গ্যাসদ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। এইবার একটি কস্টিক পটাশের টুকরা

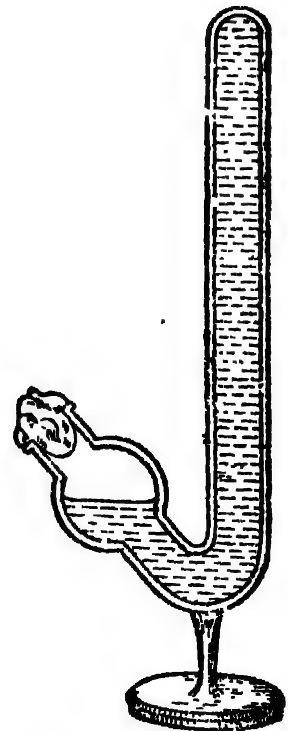
টেস্ট-টিউবের মধ্যে প্রবেশ করাও। দেখিবে, গ্যাস শোষিত হইয়াছে এবং টেস্ট-টিউবটি



২৩০নং চিত্র—অবাত শ্বাসকার্য : (ক) পরীক্ষার পূর্বে ; (খ) পরীক্ষার পরে

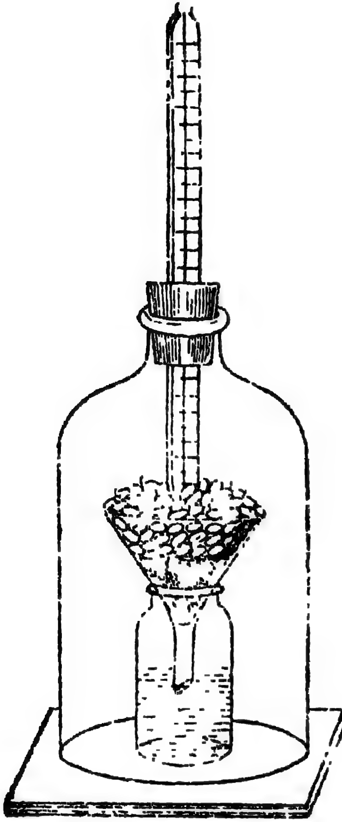
পুনরায় পারদে পূর্ণ হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় নিষ্কাশিত গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৩৪নং পরীক্ষা : কুনের সন্ধান পাত্র (*Kuhene's fermentation vessel*—২৩১নং চিত্র)—ইহা একটি বক্রাকার কাচের নল যাহার একটি বাহু দীর্ঘ এবং উপরিভাগে আবদ্ধ এবং অপর ক্ষুদ্রাকার বাহুর অগ্রভাগে একটি বাল্ব আছে যাহার মুখ উন্মুক্ত। ইহার দীর্ঘ বাহু হইতে বায়ু সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করিয়া 10% গ্লুকোজ দ্রবণ দ্বারা পূর্ণ কর এবং বাল্বের মধ্য দিয়া ইহাতে কিছু ইষ্ট গুঁড়া মিশ্রিত কর। বাল্বটির মুখ তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া কয়েক ঘন্টা রাখিয়া দাও। দেখিবে যে, দীর্ঘ বাহুতে একপ্রকার গ্যাস নির্গত হইয়া গ্লুকোজ দ্রবণ নিম্নে অপসারণ করিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। এখন উহার মধ্যে একটি কষ্টিক পটাশ দণ্ড প্রবেশ করাইয়া সাবধানে নাড়িতে থাক। দেখিবে যে দীর্ঘ বাহু পুনরায় গ্লুকোজ দ্রবণ দ্বারা পূর্ণ হইবে। গ্লুকোজ দ্রবণটির রাসায়নিক পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে উহার মধ্যে অ্যালকোহল সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়



২৩১নং চিত্র—কুনের সন্ধান

যে ইষ্ট কর্তৃক গ্লুকোজ দ্রবণ সন্ধানের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত এবং কোহল উৎপন্ন হয়।



২৩২নং চিত্র—শ্বাসকার্যের সময় তাপের বিকাশ

৩৫নং পরীক্ষা: শ্বাসকার্যে তাপের বিকাশ (*Heat evolved during respiration*—২৩২নং চিত্র)—একটি কাচের বীকার লও। ইহার তিন চতুর্থাংশ জলে পূর্ণ কর এবং উহার উপরে একটি ফানেল এরূপভাবে রাখ, যাহাতে ইহার নল সম্পূর্ণ জলে ডুবিয়া থাকে। এখন একটি ফিল্টার কাগজ ভাঁজ করিয়া ফানেলের ভিতরে এরূপভাবে রাখ যাহাতে ইহা সহজে বীকারের জল শোষণ করিয়া ভিজা থাকে। এইবার ফানেলটি কতকগুলি ভিজা বীজদ্বারা পূর্ণ কর এবং ফানেল-সমেত বীকারটি একটি বেলজারের ভিতরে রাখ; বেলজারের উপরিস্থ কর্কের ভিতর দিয়া একটি থার্মোমিটার (thermometer) বীজগুলির মধ্যে প্রবেশ করাও। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখিবে থার্মোমিটারের পারদস্তম্ভ উপর দিকে উঠিয়াছে। এই পরীক্ষার দ্বারা প্রমান করা যায় যে শ্বাসকার্যের সময় তাপের সৃষ্টি হয়।

৮

কার্বন আত্তীকরণ

(Carbon assimilatin)

উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল হইতে রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা কার্বন ঘটিত যৌগ পদার্থ বা কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুত করে এবং উহা প্রোটোপ্লাজমে পরিণত হইয়া উদ্ভিদদেহ গঠনে অংশ গ্রহণ করে। সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে কার্বন আত্তীকরণ (carbon assimilation) বলে। সবুজ বর্ণের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুত করিবার জন্য সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় বলিয়া এই প্রক্রিয়াটিকে (সালোকসংশ্লেষ) photo-synthesis) বলে।

সালোকসংশ্লেষের সময় ক্লোরোফিলযুক্ত কোষগুলি আলোকশক্তি শোষণ করিয়া ইহাকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে। এই শক্তি, রাসায়নিক বিক্রিয়া শেষে যে হেক্সোজ শর্করা গঠিত হয় তাহাতে potential energy বা স্থৈতিক শক্তিরূপে সঞ্চিত থাকে। ইহা যথা সময়ে kinetic energy বা গতিশক্তিতে পরিণত হইয়া উদ্ভিদের বিভিন্ন জৈবনিক কার্য সম্পাদনে অংশ গ্রহণ করে। অধিকন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ার শেষে অক্সিজেন by-product অর্থাৎ উপজাত পদার্থরূপে নির্গত হয়। আলোকশক্তি ফোটন (photons) নামক অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম পদার্থের সমষ্টি। এই সকল ফোটন কণাগুলি ক্লোরোপ্লাস্টকে আঘাত করিলে ক্লোরোপ্লাস্ট উত্তেজিত হয়। ইহার ফলে ক্লোরোপ্লাস্টে অবস্থিত রঞ্জক পদার্থগুলির ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। সালোকসংশ্লেষের সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটিকে রাসায়নিক সংকেত দ্বারা সূচিত করা যায়।



$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলোক শক্তি}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

উপরোক্ত সংকেত হইতে সহজেই বুঝা যায় যে মুক্ত অক্সিজেনের পরিমাণ এবং গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় সমান। ইহাদের পরিমাণের এইরূপ অণুপাতকে অর্থাৎ $\left(\frac{O_2}{CO_2}\right)$ কে সালোকসংশ্লেষ হার (photosynthetic quotient) অথবা P Q. বলে।

ক্লোরোফিল (*Chlorophyll*)—পূর্বে বলা হইয়াছে যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি বুঝিতে হইলে ক্লোরোফিলের গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ইহা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হইল ঃ

সকল সবুজ বর্ণের উদ্ভিদেই ক্লোরোফিল পাওয়া যায়। উইলস্টাটার ও স্টোল (Willstatter and Stoll)-এর মতানুযায়ী ক্লোরোফিল প্রকৃতপক্ষে চারিটি উপাদানের সমষ্টি, যথা ক্লোরোফিল-এ, (Chlorophyll-a) ক্লোরোফিল-বি, (Chlorophyll-b) ক্যারোটিন (Carotene) ও জ্যান্থোফিল (Xanthophyll)। এই সকল উপাদানের মধ্যে প্রথম দুইটি উপাদানই সবুজ বর্ণের এবং শেষোক্ত দুইটির মধ্যে ক্যারোটিন হইল কমলা-পীত বর্ণের ও জ্যান্থোফিল হইল পীত বর্ণের। সাধারণ সবুজ বর্ণের উদ্ভিদের

ক্ষেত্রে এই সকল উপাদানের পরিমাণের বিশেষ তারতম্য হয় না। দেখা গিয়াছে যে, সবুজ বর্ণের উপাদানগুলি অন্যান্য বর্ণের তুলনায় প্রায় ওজনে দশগুণ অধিক থাকে।

ক্লোরোফিলের চারিটি উপাদান রাসায়নিক সংকেত দ্বারা নির্দেশ করিলে এইরূপ হইবে ; যথা—

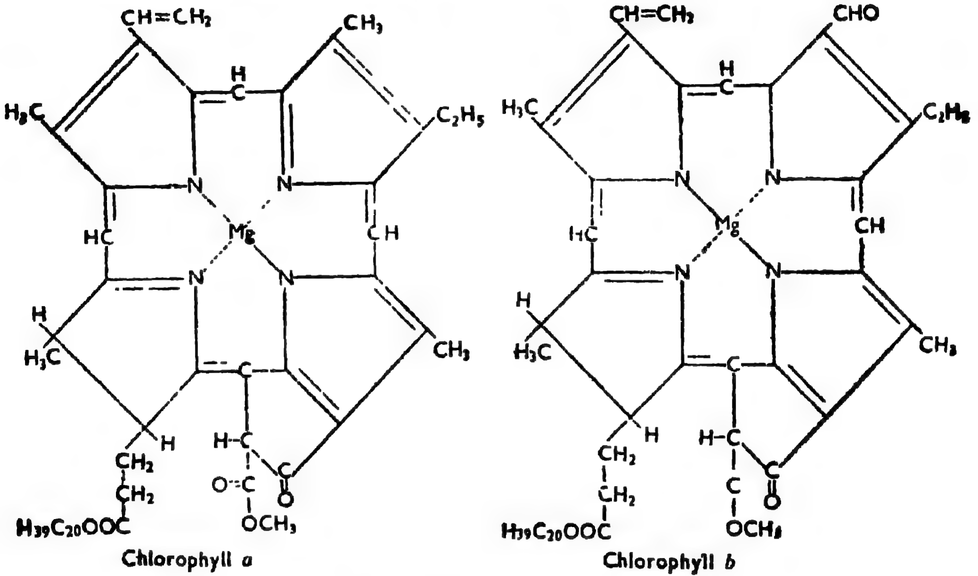
ক্লোরোফিল-এ, $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$ অথবা ($MgN_4C_{32}H_{30}O$)
$(COOCH_3)$ $(COOC_{20}H_{39})$

ক্লোরোফিল-বি, $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$ অথবা $(MgN_4C_{32}H_{28}O_2)$
$(COOCH_3)$ $(COOC_{20}H_{39})$

ক্যারোটিন, $C_{40}H_{59}$

জ্যান্থোফিল, $C_{40}H_{56}O_2$

উপরোক্ত সংকেত হইতে সহজেই বুঝা যায় যে ক্লোরোফিল-বি হইল ক্লোরোফিল-এ-



২৩৩নং চিত্র—ক্লোরোফিল-এ ও ক্লোরোফিল-বি-এর গঠন

এর একটি জারণ অবস্থা (একটি CH_3 গ্রুপের পরিবর্তে সেই স্থলে একটি অ্যালডিহাইড গ্রুপ যুক্ত হয়) এবং ক্যারোটিন জারিত হইয়া জ্যান্থোফিলের উৎপত্তি হইয়াছে।

উইলস্টারের মতে ক্লোরোফিলের একটি প্রধান উপাদান হইল ম্যাগনেসিয়াম কিন্তু পরে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে ক্লোরোফিলের সহিত সাইটোক্রোম (cytochromes) নামক একপ্রকার লৌহঘটিত পদার্থের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে ফিশ্চার (Fischer) নির্দেশিত ক্লোরোফিল-এ ও ক্লোরোফিল-বি-এর গঠনমূলক সংকেত উপরে দেওয়া হইল (২৩৩নং চিত্র)। ক্যাটালেজ, (Catalase) সাইটোক্রোম অক্সিডেজ, (*Cytochrome Oxydase*) কার্বোক্সাইলেজ (Carboxylase) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার এনজাইম, সহ-এনজাইম প্রভৃতির উপস্থিতিতে ক্লোরোপ্লাস্টের অর্থাৎ ক্লোরোফিল-বহনকারী পদার্থের বিপাকীয় কার্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

ক্লোরোফিলের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ইহা প্রোটোক্লোরোফিল (Protochlorophyll) নামক একপ্রকার পদার্থ হইতে গঠিত। প্রোটোক্লোরোফিলের রাসায়নিক গঠন হইতে জানা যায় যে ইহাতে ক্লোরোফিলের তুলনায় দুইটি হাইড্রোজেনের পরমাণু কম থাকে। অতএব বলা যায় যে প্রোটোক্লোরোফিল বিজারিত হইয়া ক্লোরোফিল গঠিত হইয়াছে।

অধুনা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (electron microscope)-এর সাহায্যে ক্লোরোপ্লাস্টের আকৃতি নির্ণয় করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহা দুইটি স্তরের আবরণ দ্বারা বেষ্টিত (১৫নং চিত্র)। এই দ্বিস্তরবিশিষ্ট আবরণের মধ্যে অনেকগুলি যুগ্ম পদার্থ পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। ইহাদিগকে ল্যামেলী (lamellae) বলে। ক্লোরোফিল এবং ইহার আনুষঙ্গিক রঞ্জক পদার্থগুলি এই ল্যামেলীতে সমভাবে অথবা কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হইয়া অবস্থান করে। যখন ইহারা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে স্তরীভূত হইয়া জমা হয় তখন সমগ্র স্তরটিকে গ্র্যানাম (granum) বলে। প্লাস্টিডের সাধারণ মাধ্যমটি প্রোটিনজাতীয় এবং ইহাকে স্ট্রোমা (stroma) বলে।

ক্লোরোফিলের বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থের উপাদানগুলিকে ইথাইল কোহল, ক্লোরোফর্ম, বেনজিন, অ্যাসিটোন, কার্বন ডাই-সালফাইড প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগে পৃথক করা যায়। গাছের সবুজ অংশ ইথাইল কোহল দ্বারা উষ্ণ করিলে ইহা তরল অবস্থায় নিষ্কাশিত হয়। এখন সম পরিমাণ এই দ্রবণ ও বেনজিন একটি টেস্ট-টিউবের মধ্যে মিশ্রিত করিয়া, ঝাঁকাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে দেখা যায় যে ইহা দুইটি স্তরে পৃথক হয়—উপরের স্তরে ক্লোরোফিল-এ ও ক্লোরোফিল-বি বেনজিনে দ্রবীভূত থাকে এবং নীচের স্তরে ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল কোহলে দ্রবীভূত থাকে।

ক্লোরোফিল-এ এবং কোরোফিল-বি-এর দ্রবণে লোহিত বর্ণের স্ফুরজ্যোতি (flourescence) দেখা যায় কিন্তু কোলয়ডীয় জলীয় দ্রবণে এইরূপ দেখা যায় না। ইথার ক্লোরোফিলের দ্রবণ 75° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় প্রায় 30 সেকেণ্ড ধরিয়া উত্তপ্ত করিলে অথবা প্রোটিওলিটিক এনজাইম প্রয়োগ করিলে দেখা যায় যে ইহার স্ফুরজ্যোতি ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে ক্লোরোফিল হইল প্রোটিনজাতীয় পদার্থ।

ইথারে ক্লোরোফিলের দ্রবণকে দিবালোকে বর্ণালীবীক্ষণ (Spectroscope) দ্বারা পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে বর্ণালীতে নীলাভ বেগুনী অংশের শোষণ সর্বাধিক এবং তাহার পরে স্বল্প লোহিত অংশের স্থান। এই সকল শোষিত অংশগুলি বর্ণালীর নির্দিষ্ট অংশে কাল দাগ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্যারটিনয়েড (*Carotenoids*)—ক্যারটিনয়েড উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার রঞ্জিত অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা লোহিত, পীত, বাদামী প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে সাধারণত ক্যারোটিন (carotene) এবং জ্যান্থোফিল (xanthophyll) নামক দুই প্রকার ক্যারোটিনয়েড উদ্ভিদে দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যারোটিন এবং জ্যান্থোফিলের সহিত প্রোটিন নিবিড় সন্নিবেশিত হইয়া জটিল

ক্লোরোফিল-প্রোটিন উৎপন্ন করে। ক্যারটিনয়েড ক্লোরোপ্লাস্টের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ হইলেও ইহারা সালোকসংশ্লেষে অংশ গ্রহণ করে না।

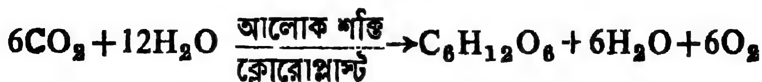
ক্যারোটিনয়েড অসংপৃক্ত এবং সহজেই জারণশীল রাসায়নিক পদার্থ। ইহাদের ক্লোরোফর্ম, ইথাইল ইথার, কার্বন ডাই-সালফাইড প্রভৃতি দ্রবণের সাহায্যে উদ্ভিদ অংশ হইতে নিষ্কাশন করা যায় এবং ক্লোরোফিলের ন্যায় ইহাদের বিভিন্ন উপাদানে পৃথক করা যায়।

অ্যানথোসায়ানিন, অ্যানথোসায়ানিডিন প্রভৃতি (*Anthocyanin Anthocyanidin etc.*)—উপরি উক্ত বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে আরও কয়েক প্রকার জলে দ্রবণীয় লোহিত, পীত, নীল অথবা বেগুনী বর্ণের রঞ্জক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে অ্যানথোসিয়ান (anthocyans) বলে। ইহারা প্রধানত cell sap (কোষরস)-এ অবস্থান করে। অ্যানথোসানকে অ্যাসিড, ক্ষার বা এনজাইম দ্বারা আদ্রবিশ্লেষণ (hydrolysis) করিলে ইহা অ্যানথোসায়ানিন (anthocyanin) নামক একপ্রকার বর্ণহীন শর্করাতে এবং অ্যানথোসায়ানিডিন (anthocyanidin) নামক বর্ণযুক্ত অংশে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়।

অ্যানথোসিয়ান গঠনে অনেকগুলি কারণ আছে যাহার মধ্যে উষ্ণতা অন্যতম 20°—30° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে অত্যধিক অ্যানথোসিয়ান উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদের ফসফরাস এবং নাইট্রোজেনের অভাব হইলে অধিক পরিমাণে অ্যানথোসিয়ান গঠিত হয়।

সালোকসংশ্লেষের প্রণালী (Mechanism of Photosynthesis)

উদ্ভিদের পত্র ও অন্যান্য অঙ্গে সালোকসংশ্লেষ সংঘটিত হইয়া থাকে। পত্রের মেসোফিল কলার কোষগুলির মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টগুলিকে সালোকসংশ্লেষের মূল কেন্দ্রস্থল বলিয়া গণ্য করা হয়। অবশ্য নীলাভ সবুজ শৈবাল ও কতকগুলি স্বভোজী ব্যাকটিরিয়ার কোষে ক্লোরোপ্লাস্টের পরিবর্তে ক্রোম্যাটোফোরে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। স্থলজ উদ্ভিদ বায়ু হইতে পত্ররন্ধ্রের সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং মৃত্তিকা হইতে মূলরোমের সাহায্যে জল শোষণ করে। জল জাইলেম কলার মাধ্যমে কাণ্ডের মধ্য দিয়া ঊর্ধ্বে প্রবাহিত হইয়া পত্রের মেসোফিল কলায় পৌঁছায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড বাষ্প ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে মেসোফিল কলার কোষগুলির মধ্যে প্রবেশ করে। জলজ উদ্ভিদ জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করিয়া থাকে। সালোকসংশ্লেষের সময় আলোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোপ্লাস্টের অভ্যন্তরে ছয় অণু কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বার অণু জলের রাসায়নিক মিলনের ফলে এক অণু গ্লুকোজ, ছয় অণু জল ও ছয় অণু অক্সিজেন উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিম্নে সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক সমীকরণটি প্রদত্ত হইল ঃ



$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোপ্লাস্ট}]{\text{আলোক শক্তি}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$$

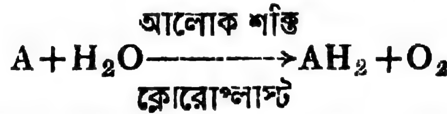
সালোকসংশ্লেষের সময় যে বিচ্ছুরিত আলোক শক্তি শোষিত হয়, তাহা গ্লুকোজ

অণুতে স্থিতিশক্তি (potential energy) রূপে সঞ্চিত হইয়া থাকে। পরীক্ষালব্ধ তথ্য হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রতি গ্রাম অণু (gram-molecule) গ্লুকোজ অর্থাৎ 180 গ্রাম গ্লুকোজে আনুমানিক 673 কিলো-ক্যালোরি (kilo-calorie) শক্তি নিহিত থাকে।

সালোকসংশ্লেষ একটি অতি জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের রাসায়নিক মিলনের ফলে সরাসরি শর্করা উৎপন্ন হয় না। প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়া পর্যায়ক্রমে ঘটিবার ফলে শর্করা উৎপন্ন হয়। ঐ বিক্রিয়াগুলি দুইটি দশার অন্তর্গত, যথা, (ক) আলোক দশা (light phase) এবং (খ) আলোক বিহীন দশা (dark phase)।

আলোক দশা (Light phase)

এই দশার বিক্রিয়াগুলি আলোকের উপস্থিতিতে বা আলোকের সাহায্যে সংঘটিত হয় বলিয়া ইহাকে আলোক দশা বা **আলোরাসায়নিক বিক্রিয়া** (photochemical reaction) বলা হয়। এই বিক্রিয়াগুলি ক্লোরোপ্লাস্টের আভ্যন্তরীণ ল্যামেলা অংশে (lamellar system) অনুষ্ঠিত হয়। আলোক দশা বলিতে প্রধানত বিজারণ বুঝায় এবং 1937 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী রবিন হিল (Robin Hill) সর্বপ্রথম এই তথ্যের বাস্তবতা প্রমাণিত করেন। তিনি দেখান যে আলোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোপ্লাস্টে উপযুক্ত বিজারণ পদার্থ (A) সরবরাহ করিলে ইহা অক্সিজেন উৎপাদন করে।

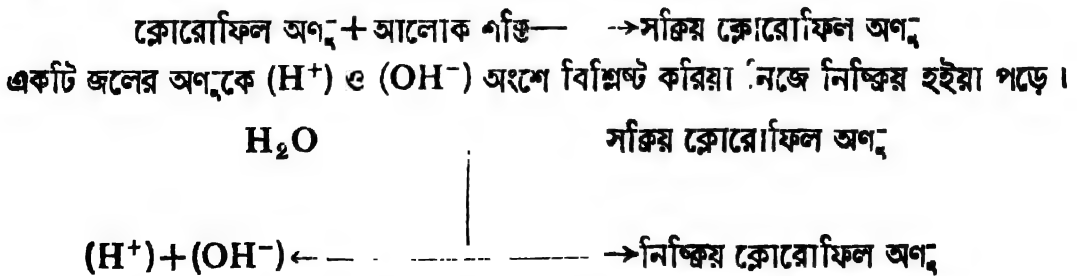


উপরিউক্ত বিক্রিয়াকে **হিল বিক্রিয়া** (Hill reaction) বলে। হিল বিক্রিয়া হইতে জানা যায় যে সালোকসংশ্লেষে অক্সিজেনের উৎস হইল জল। অক্সিজেনের সমস্থানিক (isotopic oxygen) যুক্ত জল অর্থাৎ, H_2O^{18}, ব্যবহার করিয়া হিলের তথ্যটি প্রমাণ করা যায়।

আলোক দশার প্রারম্ভে আলোক শোষণ করিয়া ক্লোরোফিল অণু সক্রিয় হয়। সেই সক্রিয় ক্লোরোফিল অণুটি

ক্লোরোফিল অণু + আলোক শক্তি ⟶ সক্রিয় ক্লোরোফিল অণু

একটি জলের অণুকে (H^+) ও (OH^-) অংশে বিশ্লিষ্ট করিয়া নিজে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।



আলোকের উপস্থিতিতে জলের অণু বিশ্লিষ্ট হয় বলিয়া এই পদ্ধতিটিকে **জলের আর্দ্র বিশ্লেষণ** (photolysis of water) বলে। জলের আর্দ্র বিশ্লেষণের ফলে উদ্ভূত OH^- অংশটি হইতে অক্সিজেন উৎপন্ন হইয়া থাকে, $(OH^-) \cdots\cdots \rightarrow O_2$ এবং H^+

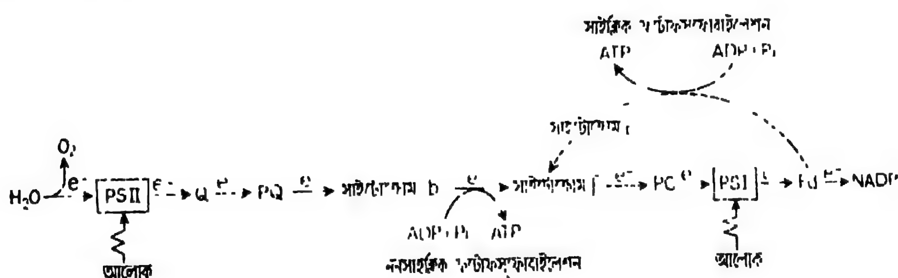
NADP নামক হাইড্রোজেন বাহক (hydrogen carrier)-এর সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে বিজারিত করে। প্রকৃতপক্ষে NADP-র পূর্বে আরও অনেক হাইড্রোজেন বাহক অংশগ্রহণ করে। সালোকসংশ্লেষের সময় NADP-এর বিজারণের ফলে ADP ও অজৈব ফসফেটের (Pi) সংযোজনে ATP উৎপন্ন হয়।

$2(H^+) + NADP$  $ADP + Pi$

$NADPH_2$ ←  → ATP

ইহা ব্যতীত (H^+) অংশটি (OH^-) অংশটির সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় জলের অণুতে পরিণত হইয়া থাকে এবং ATP উৎপাদন করে। সালোক সংশ্লেষের সময় যে পদ্ধতির মাধ্যমে ATP উৎপন্ন হয় তাহাকে **ফোটোফসফোরাইলেশান** (photo-phosphorylation) বলা হয়। ATP অণুর মধ্যে শক্তি সঞ্চিত থাকে।

ফোটোসিস্টেম (Photosystem): বর্তমানে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সবুজ উদ্ভিদে দুইটি আলোক বিক্রিয়া রহিয়াছে। উহাদের যথাক্রমে ফোটোসিস্টেম I (PSI) ও ফোটোসিস্টেম II (PS II) নামে অভিহিত করা হয়। একটি বিশেষ ধরনের ক্লোরোফিল (P700) ফোটোসিস্টেম I-এ এবং সালোকসংশ্লেষে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য রঞ্জক পদার্থ অর্থাৎ সাহায্যকারী রঞ্জক পদার্থ (accessory pigments) ফোটোসিস্টেম II-এ রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত উভয় ফোটোসিস্টেমে অন্যান্য উপাদানও থাকে। দুইটি ফোটোসিস্টেমের মধ্যে প্লাসটোসিয়ানিন সংযোগ সাধন করে. নিম্নে জলের অণু হইতে বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে হাইড্রোজেন অর্থাৎ ইলেকট্রনের NADP-তে আগমনের নক্সা দেওয়া হইল।



২৩৪নং চিত্র—ফোটোসিস্টেম I ও II

ফোটোসিস্টেম II-এর দ্বারা আলোক শোষিত হইলে জলের অণু হইতে ইলেকট্রন বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে ফোটোসিস্টেম I-এ আসিয়া পৌঁছায়। সেই সময় অক্সিজেন নির্গত হয়। ফোটোসিস্টেম I পুনরায় আলোক শোষণ করিলে ফেরেডক্সিনের মাধ্যমে ইলেকট্রন NADP-তে আসিয়া পৌঁছায়। ইলেকট্রন ফেরেডক্সিন হইতে পুনরায় সাইটোক্রোম b_6-এর মাধ্যমে সাইটোক্রোম f-এও ফিরিয়া যাইতে পারে। সালোকসংশ্লেষে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হওয়ার ফলস্বরূপ ATP তৈয়ারী হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে আলোক দশায় ইলেকট্রন দুইভাবে স্থানান্তরিত হয়, যথা, **নন-সাইক্লিক ইলেকট্রন গমন**

(non-cyclic electron flow) ও **সাইক্লিক ইলেকট্রন গমন** (cyclic electron flow)। নন-সাইক্লিক ইলেকট্রনগমনের ফলে ATP তৈয়ারী হওয়ার পদ্ধতিকে **নন-সাইক্লিক ফোটোফসফোরাইলেশান** (non-cyclic photophosphorylation) বলে। অপরপক্ষে, সাইক্লিক ইলেকট্রন গমনের ফলে ATP তৈয়ারী হওয়ার পদ্ধতিকে **সাইক্লিক ফোটোফসফোরাইলেশান** (cyclic photophosphorylation) বলা হয়। ফোটো-সিস্টেম II কেবলমাত্র নন-সাইক্লিক ইলেকট্রন গমনের সহিত জড়িত। অপরপক্ষে, ফোটোসিস্টেম I নন-সাইক্লিক ইলেকট্রন গমন ও সাইক্লিক ইলেকট্রন গমন উভয়ের সহিতই জড়িত।

আলোক বিহীন অথবা রাসায়নিক বিক্রিয়া অথবা সালোক-সংশ্লেষণে কার্বন ডাই-অক্সাইড স্থিতিকরণ (Dark or Chemical reaction or photosynthetic CO_2-fixation)

1905 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ব্ল্যাকম্যান (Blackmann, 1905) সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন। তিনি সর্বপ্রথম লক্ষ্য করিলেন যে একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় আলোকের তীব্রতা (intensity of ilumination) বৃদ্ধি করিলেও সালোকসংশ্লেষের হারের কোন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হইতেছে না। এই নিরীক্ষা হইতে পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী ওয়ারবুর্গ (Warburg, 1930) এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে একমাত্র আলোক বিক্রিয়া নহে। এই-স্থলে এমন কোন বিক্রিয়া সংঘটিত হয় যাহা অনুষ্ঠিত হইতে কোন আলোকের প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ আলোক-উদাসী (light indifferent reaction)। ইহাকেই তিনি **আলোক বিহীন বিক্রিয়া** (Dark reaction) বলিয়া উল্লেখ করিলেন।

ব্ল্যাকম্যানের পূর্বে এইরূপ ধারণা ছিল যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের ক্রমউন্নতির ফলে ঐরূপ ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে। এক্ষণে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া দুইটি দশায় অনুষ্ঠিত হয়, যথা, আলোক দশা এবং আলোকবিহীন দশা।

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় যে আলোক ও আলোক বিহীন দশা রহিয়াছে তাহার স্বপক্ষে যুক্তিগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

1. ব্ল্যাকম্যান লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে আলোকের তীব্রতা বৃদ্ধি করিলে সালোক-সংশ্লেষের হার বৃদ্ধি হয়। তবে এই বৃদ্ধির নির্দিষ্ট পরিসর আছে, যাহার বাহিরে আলোকের তীব্রতা বৃদ্ধি করিলেও হার বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং তিনি এইরূপ ইঙ্গিত করিলেন যে, সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় একটি অংশ বিশেষ মাত্র আলোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যখন সেই অংশটি পূর্ণ হয় তখন আলোর তীব্রতা বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও সালোকসংশ্লেষের হার বৃদ্ধি হয় না।

2. যথেষ্ট পরিমাণ CO_2 রহিয়াছে এইরূপ পরিবেশে সক্রিয় ভাবে সালোকসংশ্লেষ সংঘটিত হইতেছে এইরূপ সবুজ পত্রসমূহে উচ্চ আলোক তীব্রতায় Q_{10}-এর মান 2

অথবা আরও বেশী (যাহা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক)। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম আলোক তীব্রতার মধ্যে Q_{10}-এর মান হয় 1 (যাহা আলোক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। বিজ্ঞানী ওয়ারবুর্গ 1930 খ্রীষ্টাব্দে ব্ল্যাকম্যানের এই পরীক্ষা-লব্ধ ফলের যথাযথ ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার বিক্রিয়াগুলি দুইটি প্রধান দশায় বিভক্ত, যথা আলোক বিক্রিয়া ও ব্ল্যাকম্যান বিক্রিয়া বা আলোক বিহীন বিক্রিয়া।

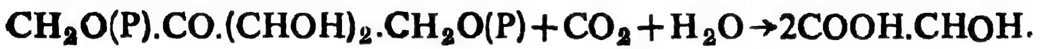
3. 1905 খ্রীষ্টাব্দে ব্রাউন ও এস্কম্ব (Brown and Escombe) নামক বিজ্ঞানীগণ সবুজ শৈবাল ক্লোরেল্লা (*Chlorella* sp.) লইয়া একটি সালোকসংশ্লেষের পরীক্ষা সম্পাদন করেন। তাঁহারা একটি উপায় বাহির করিলেন যাহাতে আলোর তীব্রতা না কমাইয়া মাঝে মাঝে আলোর বিরতি হয়। এই পরীক্ষায় তাঁহারা একটি নির্দিষ্ট ছিদ্র যুক্ত গোলাকার চাকতি আলোকের উৎসের সম্মুখে রাখিলেন এবং এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন যাহাতে চাকতিটি একটি নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরিতে থাকে। এই ঘূর্ণয়মান চাকতির নীচে ক্লোরেল্লোর কালচার (কৃষ্টি) রাখিলেন। এইরূপ করার ফলে ক্লোরেল্লা-গুলি সালোকসংশ্লেষের জন্য সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট তীব্রতা সম্পন্ন আলোক, নির্দিষ্ট বিরতি অন্তর পাইতে থাকে। বিজ্ঞানীদ্বয় অত্যন্ত আশ্চর্যের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে এইরূপ বিরতি যুক্ত আলোক প্রাপ্ত হইয়াও সালোকসংশ্লেষের হার, অবিরাম, এবং সমতীব্রতা সম্পন্ন আলোকপ্রাপ্ত সালোকসংশ্লেষের হার অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। এইরূপ ঘটনা কেবলমাত্র দুইটি বিক্রিয়ার উপস্থিতির ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করা যায়। একটি বিক্রিয়া, যাহা আলোকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং অন্যটি, যাহা আলোকের অবর্তমানে অনুষ্ঠিত হয়।

4. সমতীব্রতা সম্পন্ন স-বিরাম আলোক রশ্মি (alternate light and dark) ব্যবহার করিয়া এমারসন ও আরনন (Emerson and Arnon) 1932 খ্রীষ্টাব্দে ক্লোরেল্লার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেন যে অক্সিজেন নিষ্কাশনের হার অবিরাম আলোকপ্রাপ্ত ক্লোরেল্লা অপেক্ষা অধিক। তাঁহারা আরও লক্ষ্য করিলেন যে প্রতিবার আলোর ঝলকের সময় যদি আরও হ্রাস করা যায় তাহা হইলেও সালোকসংশ্লেষের হার বৃদ্ধি হয়। এইরূপ নিরীক্ষা হইতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায়, (ক) একান্তর-ভাবে আলোক ও আলোক বিহীন পর্যায় রহিয়াছে ; (খ) আলোক দশা অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন হয় ; এবং (গ) আলোক বিহীন দশায় শুধুমাত্র আলোক দশায় উৎপন্ন বস্তু-গুলি ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া এই দশায় ক্লোরোপ্লাস্ট পুনরায় তাহার কার্যক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

আলোক বিহীন দশায় কার্বন ডাই-অক্সাইড স্থিতিকরণ (CO_2 fixation in dark reaction) :—

আলোক বিহীন দশায় সরাসরি আলোকের প্রয়োজনে হয় না। অবশ্য আলোক-দশায় উদ্ভূত রাসায়নিক পদার্থগুলি, যেমন, ATP ও $NADPH_2$, আলোকবিহীন

দশায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দশায় কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সংযোজন ঘটে। 1949 খ্রীষ্টাব্দে কেলভিন (calvin) ও তাঁহার সহকর্মিগণ C_{14}, অর্থাৎ কার্বনের একটি তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক (radioactive isotope) যুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ক্ল্যামাইডোমোনাস (*chlamydomonas sp.*) নামক সবুজ শৈবালে প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ করেন যে, রাইবিউলোজ—I,5—ডাইফসফেট (ribulose—1, 5—diphosphate) নামক ফসফেট ঘটিত একটি শর্করায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড সংযোজিত হয়। একটি রাইবিউলোজ 1, 5—ডাই-ফসফেট অণুতে একটি কার্বন-ডাই-অক্সাইড অণুর সংযোজন ঘটিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা বিশ্লেষিত হইয়া থাকে, ফলে দুই অণু 3-ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড (3-phosphoglyceric acid) উৎপন্ন হয়।



$$CH_2O(P).CO.(CHOH)_2.CH_2O(P)+CO_2+H_2O \rightarrow 2COOH.CHOH.CH_2O(P)$$

রাইবিউলোজ-1,5-ডাইফসফেট   3-ফসফো-গ্লিসারিক অ্যাসিড



$$[(P)=-H_2PO_3]$$

3-ফসফোগ্লিসারিকঅ্যাসিড $NADPH_2$ নামক বিজারিত হাইড্রোজেন বাহকের সাহায্যে 3-ফসফোগ্লিসার্যাল ডিহাইডে (3-phosphoglyceraldehyde) পরিণত হইয়া থাকে। এই বিক্রিয়ায় শক্তির প্রয়োজন হয় বলিয়া ATP বিশ্লেষিত হইয়া ADP ও অজৈব ফসফেট (Pi) উৎপন্ন করে। অতঃপর 3-ফসফোগ্লিসার্যালডিহাইড (দুই অণু) হইতে বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ফসফেট মুক্ত হইলে গ্লুকোজ অণু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

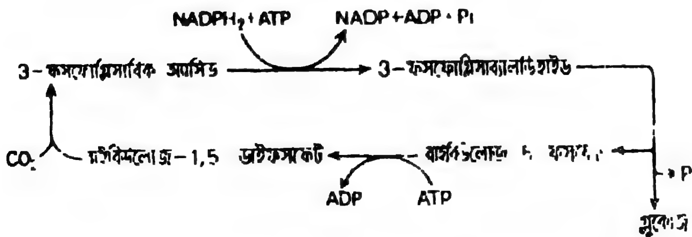


$$COOH.CHOH.CH_2O(P)+NADPH_2+ATP \rightarrow CHO.CHOH.CH_2O(P)+ADP+Pi$$

3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড   3-ফসফোগ্লিসার্যাল ডিহাইড

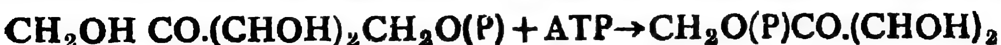


$$[Pi=H_3PO_3]$$



২৩৫ নং চিত্র—সংক্ষিপ্ত কেলভিন চক্র

সেই সময় অন্য কতকগুলি বিক্রিয়ার মাধ্যমে রাইবিউলোজ 5-ফসফেটে ATP-র একটি ফসফেট অংশ সংযোজিত হইলে রাইবিউলোজ-1,5-ডাইফসফেট উৎপন্ন হইয়া থাকে।

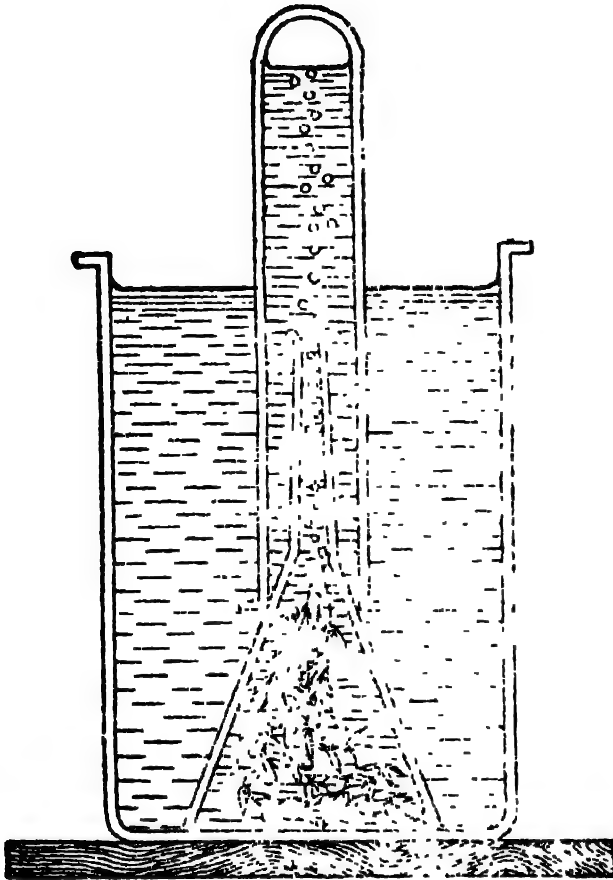


$$CH_2OH\ CO.(CHOH)_2CH_2O(P)+ATP \rightarrow CH_2O(P)CO.(CHOH)_2CH_2O(P)+ADP$$

রাইবিউলোজ-5-ফসফেট   রাইবিউলোজ-1,5-ডাইফসফেট

এইভাবে আলোক বিহীন দশার বিভিন্ন বিক্রিয়াগুলি চক্রাকারে চলিয়া থাকে। এই চক্রটিকে **কেলভিন চক্র** (calvin cycle) নামে অভিহিত করা হয় (২৩৫নং চিত্র)। এই চক্রের বিভিন্ন বিক্রিয়াগুলি স্ট্রোমায় সংঘটিত হইয়া থাকে।

৩৬নং পরীক্ষা ঃ সালোক-সংশ্লেষের সময় অক্সিজেনের নিষ্কাশন (*Evolution of oxygen during photosynthesis* ২৩৬ নং চিত্র) ঃ—একটি কাচের বীকার লও এবং ইহাতে জলজ উদ্ভিদের, যথা হাইড্রিলা (Hydrilla) অথবা কারা (Chara) প্রভৃতি কতকগুলি টাটকা বীটপ রাখ। এখন ইহাদিগকে একটি কাচের ফানেলের দ্বারা এরূপভাবে আবৃত কর যাহাতে বীটপের কাণ্ডগুলি উপরের দিকে থাকে। পরে বীকারে এইরূপ পরিমাণ জল ঢাল যাহাতে ফানেলের নলটি সম্পূর্ণ জলের মধ্যে থাকে। একটি টেস্ট টিউব জলে পূর্ণ কর। ইহার মুখটিকে জলমধ্যস্থ ফানেলের নলের মধ্যে এইরূপে প্রবেশ করাও যাহাতে টেস্ট-টিউব হইতে জল বাহির হইয়া না যায়। এইবার বীকারটিকে সূর্যালোকে রাখ। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে যে বীটপের কাণ্ডের প্রান্ত হইতে একপ্রকার গ্যাস নির্গত হইয়া টেস্ট-টিউবের জল অপসারণ করিয়া সঞ্চিত হইতেছে। কিছু পরিমাণ গ্যাস সংগৃহীত হইলে, টেস্ট-টিউবের মুখ আঙ্গুল দিয়া বন্ধ করিয়া বীকারটির বাহিরে আন। এখন শিখাহীন জ্বলন্ত কাঠি ইহাতে প্রবেশ করাইলে দেখিবে যে ইহা উজ্জ্বল শিখায় জ্বলিয়া উঠিল। অধিকন্তু বর্ণহীন ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট দ্রবণ (alkaline pyrogallate solution)-এ গ্যাসটি শোষিত হইবে এবং দ্রবণটি বাদামী বর্ণে পরিণত হইবে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে সংগৃহীত গ্যাসটি অক্সিজেন ব্যতীত আর কিছুই নয়।

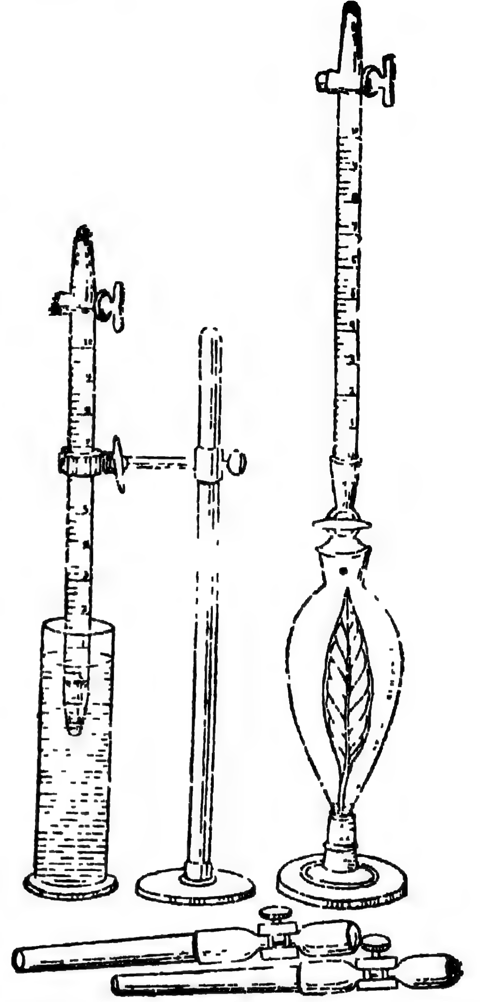


২৩৬নং চিত্র—সালোকসংশ্লেষে অক্সিজেনের নিষ্কাশন

উপরোক্ত পরীক্ষাটি অন্ধকারে সম্পন্ন করিলে দেখিবে যে অক্সিজেন নিষ্কাশিত হয় না। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষের সময় অক্সিজেন নিষ্কাশিত হয়।

৩৭নং পরীক্ষা ঃ গ্যানোর ফটোসিন্থোমিটার (*Ganong's photosythometer*) (২৩৭নং চিত্র)—ইহা একটি কাচের বাল্‌ব এবং দুই প্রান্তে স্টপ কক্‌যুক্ত একটি

অংশাঙ্কিত কাচের নলের সমষ্টি। ২৩৭নং চিত্রে যেরূপে দেখান হইয়াছে সেইরূপে বাল্বের মধ্যে একটি সবুজপাতা লও। এখন অংশাঙ্কিত নলের উপরের স্টপ কক্‌টি বন্ধ করিয়া বাল্বের সহিত সংযুক্ত কর এবং নীচের স্টপ কক্‌টি খুলিয়া দাও। এইরূপে অবস্থায় যন্ত্রটিকে কয়েক ঘণ্টা সূর্যালোকে রাখিয়া নিম্নের স্টপ কক্‌টি বন্ধ করিয়া দাও। এখন অংশাঙ্কিত নলটিকে বাল্ব্ হইতে অপসারণ করিয়া ইহার নিম্নভাগ ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট দ্রবণে ডুবাইয়া নিচের স্টপ কক্‌টি খুলিয়া দাও। দেখিবে যে নিষ্কাশিত অক্সিজেন পাইরোগ্যালেট দ্রবণ কর্তৃক শোষিত হইবার ফলেই ইহা নলের উপরে উঠিয়াছে। বাল্বের মধ্যে পাতা না লইয়া উপরোক্ত পরীক্ষাটি সম্পন্ন করিলে দেখিবে যে পাইরোগ্যালেট দ্রবণ অতি অল্পই উপরে উঠিয়াছে। ইহার কারণ, নলমধ্যস্থ বায়ুতে যে স্বল্প-পরিমাণ অক্সিজেন ছিল তাহা পাইরোগ্যালেট দ্রবণ কর্তৃক শোষিত হইবার ফলেই দ্রবণটি অতি অল্পই নলের উপরে উঠিয়াছে। অক্সিজেনের শোষণের তারতম্য হইতে সালোকসংশ্লেষের সময় নিষ্কাশিত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।



২৩৭নং চিত্র—গ্যানোর ফটোসিন্থোমিটার

সালোকসংশ্লেষ ও শ্বাসকার্যের সম্বন্ধ (Interrelationship between photosynthesis and respiration)

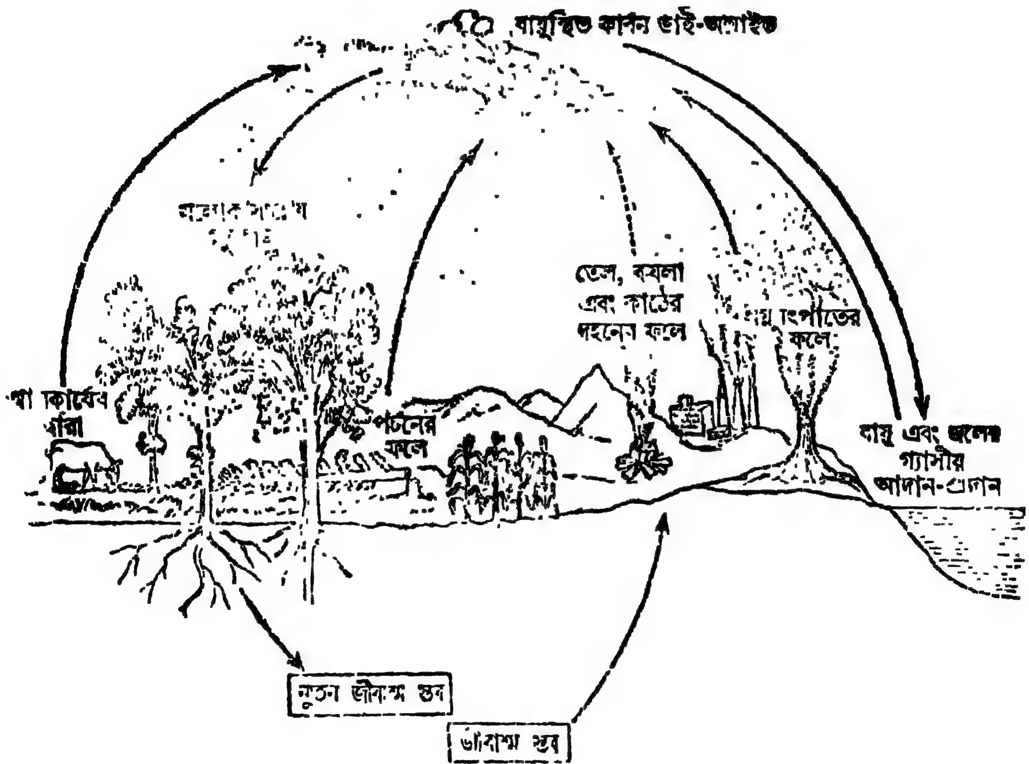
সালোকসংশ্লেষের সময় জৈব অ্যাসিড হইতে যে রাইবোজ শর্করা (ribose sugar) উৎপন্ন হয় তাহা প্রধানত উদ্ভিদের শ্বাসকার্যের ফলে গঠিত হয়। অধিকন্তু রাইবোজ ফসফেট (ribose phosphate) হইতে 6-কার্বন ফসফেট (6-carbon phosphate) প্রস্তুত হয় তাহার জন্য শ্বাসকার্যজনিত শক্তির প্রয়োজন হয়। গ্লাইকোলিসিস (Glycolysis) প্রক্রিয়ায় বিপরীত রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (phosphoglyceric acid) হেক্সোজ শর্করাতে পরিণত হয় এবং অন্তর্বর্তী পদার্থগুলিও হেক্সোজ শর্করাতে পরিণত হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে উদ্ভিদের শ্বাসকার্য এবং সালোকসংশ্লেষের মধ্যে নিকট সম্পর্ক আছে। শ্বাসকার্য না হইলে সালোকসংশ্লেষের সময় আলোকবিহীন দশা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নহে।

সালোকসংশ্লেষের প্রয়োজনীয় কারণগুলি (Factors influencing photosynthesis)

A. বহিঃস্থ কারণ (External Factors)

1. কার্বন-ডাই-অক্সাইড (*Carbon dioxide*)—উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। জীবনধারণের জন্য কার্বন একান্ত আবশ্যক। ইহা খাদ্যের একটি বিশিষ্ট উপাদান। শ্বাসকার্যের সময় খাদ্য হইতে যে শক্তি সঞ্চারিত হয় তাহা জীবকে কার্যকরী রাখে।

সজীব প্রাণী অবিরত শ্বাসকার্য করিতেছে। ইহারা প্রশ্বাসের সময় বায়ুমণ্ডল হইতে যে অক্সিজেন গ্রহণ করে তাহা দেহমধ্যস্থিত কার্বনের সহিত মৃদু দহনের ফলে



১৩৮ নং চিত্র—কার্বনচক্র

কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করিতেছে। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিশ্বাসের সময় বায়ুতে পরিত্যক্ত হইতেছে। কাঠ, কয়লা, মোম প্রভৃতি কার্বনঘটিত পদার্থগুলির দহনে বায়ুতে কিছু পরিমাণ অক্সিজেন খরচ হইয়া যায় এবং তৎপরিবর্তে উহাতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাতের সময় প্রচুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়। আবার জীবজন্তুর মৃতদেহ পচিবার সময় কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হইয়া বায়ুমণ্ডলে মিশে। সুতরাং উক্ত প্রকার ক্রিয়াগুলির ফলে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়া বায়ুমণ্ডল দূষিত হইয়া পড়িতেছে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে কোন জীব বাঁচিতে পারে না। সুতরাং স্বভাবতই ইহাতে সকল জীব অচিরে মরিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হয় না, কারণ প্রকৃতিতে পাশাপাশি আর একটি ব্যাপার ঘটিতেছে।

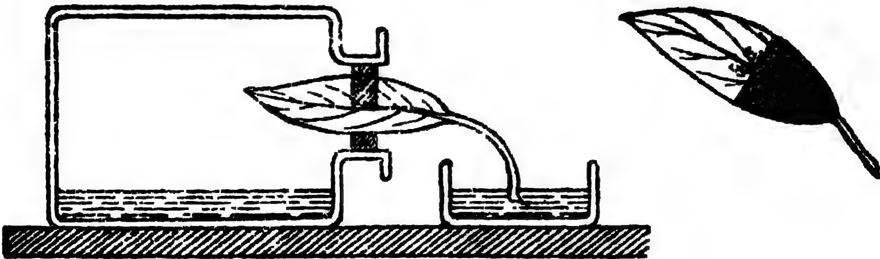
ইহা অবিদিত নহে যে উদ্ভিদদেহে, বিশেষত পাতায়, ক্লোরোফিল নামক একপ্রকার সবুজ রং আছে। যখন সূর্যালোক পাতার উপর পড়ে তখন পত্ররন্ধ্রগুলি (stomata) খুলিয়া যায়। তখন বায়ুসমেত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাতার মধ্যে প্রবেশ করে। উদ্ভিদ মাটি হইতে মূলরোম দ্বারা জল শোষণ করে। ক্লোরোফিল ও সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এই জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে নানাপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে থাকে। ইহার ফলে, কার্বন হইতে খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং অক্সিজেন গ্যাস পত্ররন্ধ্রের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়া আসে।

উক্ত প্রকার বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইডও একটি চক্রের ন্যায় আবর্তন করিতেছে। জীবজন্তুর দেহের ভিতর কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হইয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিতেছে ; আবার এই কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদের দেহের ভিতরে যাইয়া অক্সিজেনে পরিণত হইতেছে। এই প্রকারে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের পরিমাণের সমতা বজায় থাকে। ইহাকেই প্রকৃতিতে **কার্বন-চক্র** (carbon cycle) বলে (২৩৮নং চিত্র)।

সাধারণত পত্ররন্ধ্র এবং লেন্টিসেলের মধ্য দিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে। কখনও কখনও ইহা ত্বকের মধ্য দিয়াও উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করিতে পারে।

বায়ুতে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে তাহা 15-20 ভাগ বৃদ্ধি পাইলে সালোকসংশ্লেষ হারও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক হইলে সালোকসংশ্লেষ হারও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় কারণ ইহা উদ্ভিদের পক্ষে বিষতুল্য।

৩৮নং **পরীক্ষা**ঃ কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষ (*Photo synthesis in presence of carbon dioxide*)ঃ (২৩৯নং চিত্র)—একটি টবের

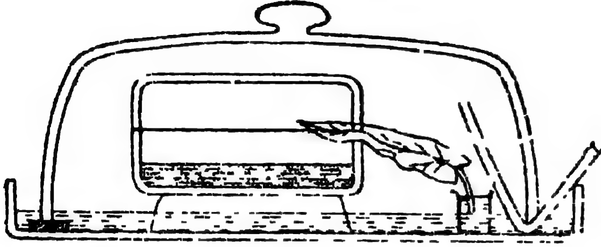


২৩৯নং চিত্র—সালোকসংশ্লেষে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আবশ্যকতা

উদ্ভিদকে একদিন অন্ধকারে রাখ, যাহাতে পাতাগুলি স্টার্চবিহীন হয়। একটি চওড়া মুখযুক্ত বোতল লইয়া উহার মুখটি একটি বিদীর্ণ ছিপি দ্বারা বন্ধ কর। এখন পরের দিন প্রত্যূষে উপরোক্ত উদ্ভিদের একটি পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া বিদীর্ণ ছিপির মধ্য দিয়া উহার অর্ধাংশ বোতলের মধ্যে প্রবেশ করাও। বোতলটি টেবিলের উপর শায়িত রাখ

এবং উহার মধ্যে কিছু কস্টিক পটাশের দ্রবণ লও। পত্রবৃন্তটিকে একটি ছোট কাচপাত্রের জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখ। এখন কিছুক্ষণের জন্য বোতলটি সূর্যালোকে রাখ। পরে পাতাটিকে বাহির করিয়া উষ্ণ কোহলে বিবর্ণ কর এবং লঘু আয়োডিনের দ্রবণের দ্বারা পরীক্ষা কর। দেখিবে পাতার যে অংশ বোতলের মধ্যে ছিল তাহা ব্যতিত অন্য অংশ অর্থাৎ যাহা বোতলের বাহিরে ছিল, নীলবর্ণে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় কাবর্ন ডাই-অক্সাইড ব্যতীত সালোকসংশ্লেষ হয় না।

৩৯নং **পরীক্ষা**ঃ মলের পরীক্ষা (*Moll's experiment*)ঃ ২৩০নং চিত্র)—পূর্বোক্ত প্রণালীতে একটি টবের গাছের পাতাগুলিকে স্টার্চবিহীন কর। একটি ঢাকনিযুক্ত আয়তাকার পাত্রে কিছু কস্টিক পটাশ দ্রবণ লও। সূর্যোদয়ের পূর্বে উক্ত গাছের একটি পাতাকে ছিঁড়িয়া, উহার ফলকের অর্ধাংশ ইহাতে রাখিয়া ঢাকনিটি বন্ধ কর। এইরূপে আবন্ধ পাত্রটিকে অপর একটি বড় জলপূর্ণ পাত্রে (২৪০নং চিত্রে যেরূপ দেখান হইয়াছে) রাখ এবং সমগ্র যন্ত্রটিকে একটি বড় বেলজার দ্বারা আবৃত কর। মনেরাখিতে হইবে যে পত্রবৃন্তটি যেন একটি জলপূর্ণ বীকারে ডুবান থাকে। বায়ু চলাচলের জন্য একটি বাঁকা কাচের নল (উভয় দিক খোলা) বেলজারের কিনারা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করাও এবং সমগ্র যন্ত্রটিকে কিছুক্ষণ সুর্যালোকে রাখ। পরে পাতাটিকে বাহির করিয়া পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় উষ্ণ কোহল দ্বারা বিবর্ণ করিয়া যথারীতি লঘু আয়োডিন দ্রবণ দ্বারা পরীক্ষা কর। দেখিবে বে, ফলকের যে অংশটি পাত্রের মধ্যে ছিল তাহা অবিকৃত রহিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় কার্বন ডাই-অক্সাইডের সংস্পর্শে আছে তাহা নীল হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যতীত সালোকসংশ্লেষ হয় না।



২৪০নং চিত্র—মলের পরীক্ষা

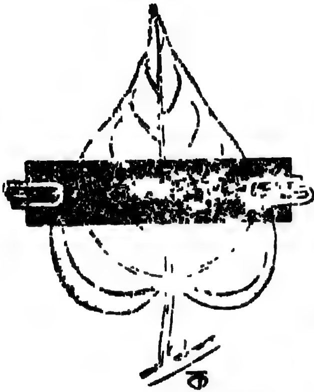
2. আলোক (*Light*)—সালোকসংশ্লেষ হার সাধারণত আলোকের তীব্রতা, প্রকৃতি এবং আলোক কাল (duration of light)-এর উপর নির্ভর করে।

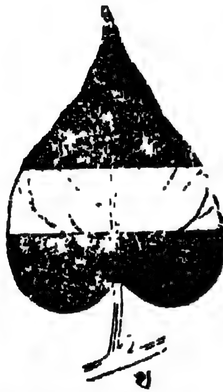
আলোকের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সালোকসংশ্লেষ হারও বৃদ্ধি পায় কিন্তু আলোকের অত্যধিক তীব্রতায় সালোকসংশ্লেষ হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। স্বল্প আলোকে পত্ররন্ধ্রের আকার ক্ষুদ্র হইয়া যায়, যাহার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রবেশ তথা সালোকসংশ্লেষ হারও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আলোকের অত্যধিক তীব্রতায় মেসোফিল কোষের জলের পরিমাণ কমিয়া যায় যাহার ফলে সালোকসংশ্লেষ হার স্বল্প হয়। ইহার আর একটি কারণ হইল যে অত্যধিক তীব্রতাসম্পন্ন আলোকে ক্লোরোফিল বিশ্লিষ্ট হইরা যায়। যে পরিমাণ আলোক উদ্ভিদের উপর পতিত হর তাহার মধ্যে অধিক পরিমাণে অদৃশ্য অবলোহিত রশ্মি (infra red rays) প্রতিফলিত হইয়া যায়। আলোকের দৃশ্য বর্ণালীর মধ্যে প্রথমে লোহিত এবং তাহার পরে সবুজ রশ্মি প্রতিফলন সর্বাধিক।

সাধারণত আলোক কাল বৃদ্ধি পাইলে সালোকসংশ্লেষ হার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

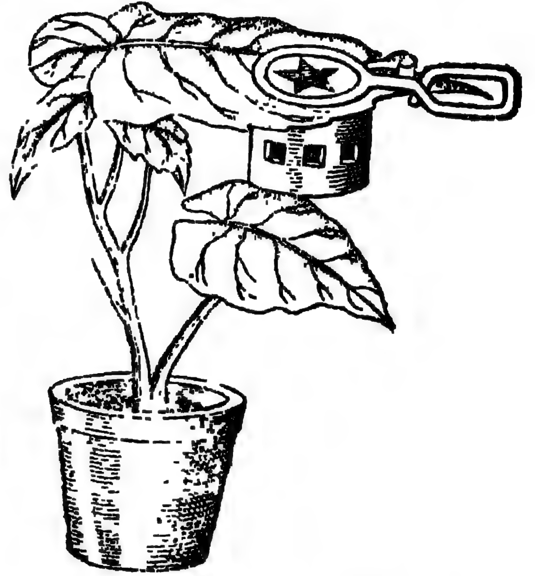
আলোক ব্যতীত সালোকসংশ্লেষ হয় না তাহা নিম্নোক্ত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

৪০নং পরীক্ষা: আলোকের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষ (*Photosynthesis in presence of light*): (২৩১নং চিত্র)—একটি টবের গাছকে একদিন অন্ধকারে রাখ যাহাতে ইহা স্টার্চবিহীন হয়। পরের দিন প্রত্যূষে ইহার একটি পাতার মধ্যস্থলের কিছু অংশ একটি টিনের পাত দিয়া এইরূপ ভাবে আবৃত কর যাহাতে আলোক প্রবেশ করিতে না পারে। এইবারে উদ্ভিদটিকে সূর্যালোকে রাখ। ঘণ্টা দুই পরে ঐ পাতাটি তুলিয়া টিনের পাত খুলিয়া ফেল এবং পরে উষ্ণ কোহলে রাখিয়া উহাকে বর্ণহীন কর। এই বিবর্ণ পাতাটিকে আয়োডিনের দ্রবণে কিছুক্ষণ রাখ। দেখিবে মধ্যস্থলের যে অংশটি টিনের পাতা দ্বারা আবৃত ছিল তাহা সম্পূর্ণ অবিকৃত রহিয়াছে এবং পাতার অবশিষ্ট অংশ যাহা আলোকে ছিল, তাহা নীলবর্ণে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতে জানিতে পারা যায়, আলোকব্যতীতসালোকসংশ্লেষ হয় না।





২৪১নং চিত্র : সালোকসংশ্লেষে আলোকের আবশ্যকতা



২৪২নং চিত্র : গ্যানোর আলোক-পর্দা

৪১নং পরীক্ষা: গ্যানোর আলোক পর্দা (*Ganong's light screen*): (২৪২নং চিত্র)—গ্যানোর আলোক-পর্দা নামক যন্ত্রটি একটি গোলাকার দ্বি-প্রাচীর বিশিষ্ট টিনের কৌটাবিশেষ যাহার মুখ একটি ঢাকনি দ্বারা বন্ধ করা যায়। কৌটাটির গাত্রে কতকগুলি ছিদ্র আছে (চিত্রে যেরূপ দেখান হইয়াছে) এবং ভিতরের প্রাচীরের নিম্নভাগ উন্মুক্ত যাহাতে বাহির হইতে ভিতরে সহজেই বায়ু চলাচল করিতে পারে। ঢাকনিটি কৌটার সহিত স্প্রিং দ্বারা যুক্ত এবং ইহার মধ্যস্থলে একটি নির্দিষ্ট আকারের ছিদ্র আছে। ঢাকনিসমেত কৌটাটি কালো রং করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত একটি স্টার্চবিহীন উদ্ভিদ লও। সূর্যোদয়ের পূর্বে কৌটার মুখে একটি পাতা রাখিয়া ঢাকনিটি বন্ধ করিয়া দাও। কয়েক ঘণ্টা এইরূপে সূর্যালোকে রাখিয়া পাতাটি বাহির কর। এখন উষ্ণ কোহল দ্রবণে পাতাটিকে বর্ণহীন করিয়া আয়োডিন দ্রবণে

যথারীতি পরীক্ষা কর। দেখিবে, পাতার যে অংশ সূর্যালোকের সংস্পর্শে ছিল কেবলমাত্র তাহাই নীলবর্ণে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে আলোক না পাইলে সালোকসংশ্লেষ হয় না।

3. উষ্ণতা (*Temperature*)—উদ্ভিদ বিভিন্ন উষ্ণতার সীমার মধ্যে সালোকসংশ্লেষ সম্পন্ন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কয়েক প্রকার শৈবাল 60° সেণ্টিগ্রেডের অধিক উষ্ণতায়ও সালোকসংশ্লেষ সম্পন্ন করিতে সক্ষম ; কিন্তু আবার কতকগুলি উচ্চ পার্বত্য উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ইহা 35° সেণ্টিগ্রেডের নিম্নেও সংঘটিত হয়। সাধারণ সবুজবর্ণের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে 30° সেণ্টিগ্রেড হইতে 40° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত উষ্ণতা বৃদ্ধি করিলে সালোকসংশ্লেষ হার বৃদ্ধি পায় কিন্তু ইহার অধিক উষ্ণতায় প্রোটোপ্লাজমের কার্যক্ষমতা ক্রমে হ্রাস পায় বলিয়া সালোকসংশ্লেষ হারও ব্যাহত হয়।

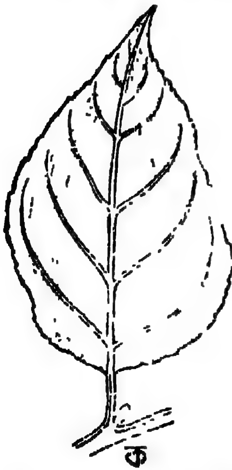
4. জল (*Water*) সালোকসংশ্লেষ সম্পন্ন করিতে উদ্ভিদের অতি স্বল্প পরিমাণ জলের প্রয়োজন। দেখা গিয়াছে যে পাতার জলের পরিমাণ হ্রাস পাইলে সালোকসংশ্লেষ হারও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

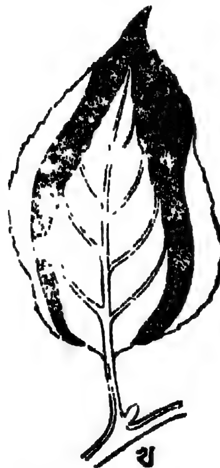
5. অক্সিজেন (*Oxygen*)—বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সালোকসংশ্লেষ হার ব্যাহত হয়। ইহার কারণ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় এনজাইমগুলি অধিক মাত্রায় অক্সিজেন পাইলে বিপরীতমুখী রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদন করে।

6. বিষাক্ত পদার্থ (*Toxic substances*)—ইথার, ক্লোরোফর্ম, অ্যামোনিয়াম-ঘটিত লবণ, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড ইত্যাদি অতি অল্পপরিমাণে ব্যবহার করিলে সালোকসংশ্লেষ হারের ব্যাঘাত ঘটে।

অন্তঃস্থ কারণ (Internal Factors)

1. ক্লোরোফিল (*Chlorophyll*)—ইহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণের সহিত সালোকসংশ্লেষ হারের কোনো সম্বন্ধ নাই। প্রতি এক গ্রাম ক্লোরোফিলে প্রতি ঘণ্টায় যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষিত হয় তাহাকে সালোকসংশ্লেষ সংখ্যা (photosynthetic number) বলে।





২৪৩নং চিত্র : সালোকসংশ্লেষে ক্লোরোফিলের আবশ্যকতা

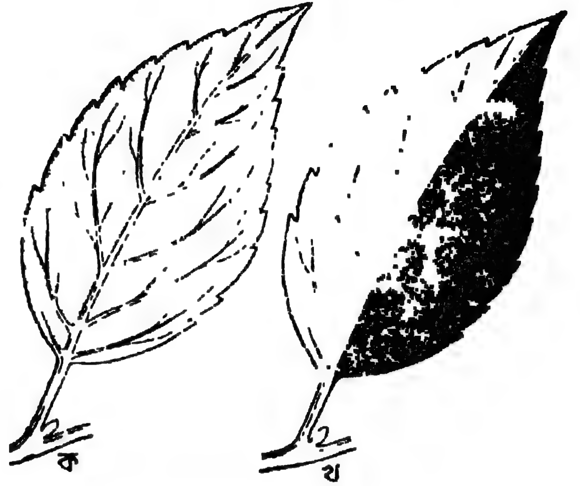
সালোকসংশ্লেষের জন্য যে ক্লোরোফিলের প্রয়োজন হয় তাহা নিম্নের পরীক্ষার দ্বারা বুঝান হইয়াছে। যথা—

৪২নং পরীক্ষা : (২৪৩নং চিত্র)—একটি (*variegated*) বা বিচিত্র বর্ণের পত্রযুক্ত টবের গাছ (যথা, কোলিয়াস্ বা ক্রোটন লও)। এখন একটি পাতা নির্বাচন করিয়া

উহার কোন্ কোন্ স্থানে সবুজ অংশ আছে তাহা লক্ষ্য কর। এইবার গাছটিকে কয়েক ঘণ্টা সূর্যালোকে রাখিয়া পাতাটি গাছ হইতে ছিন্ন কর। ইহাকে কোহলে বিবর্ণ কর এবং লঘু আয়োডিনের দ্রবণের দ্বারা পরীক্ষা কর। দেখিবে, পাতার সবুজ অংশগুলিই নীলবর্ণ হইয়াছে; অপর অংশগুলি সম্পূর্ণ অবিকৃত রহিয়াছে। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে ক্লোরোফিল ব্যতীত সালোকসংশ্লেষ হয় না।

2. **পত্ররন্ধ্রের উন্মোচন** (*Opening condition of stomata*)

৪৩নং পরীক্ষা ঃ পত্ররন্ধ্রের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ (২৪৪নং চিত্র)—পূর্বোক্ত পরীক্ষাগুলির মত একটি টবের গাছের পাতাগুলি স্টার্চবিহীন কর। একটি পাতার উপর ও নীচের তলের অর্ধেক অংশে ভ্যাসেলিন লেপন কর। এখন উদ্ভিদটিকে সূর্যালোকে রাখ। ঘণ্টা দুই পরে পাতাটি ছিন্ন করিয়া উষ্ণ কোহলে বিবর্ণ কর ও লঘু আয়োডিনের দ্রবণের দ্বারা পরীক্ষা কর। দেখিবে যে পাতার উভয় তলের যে অর্ধেক অংশে ভ্যাসেলিন লেপন করা হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ অবিকৃত রহিয়াছে, অবশিষ্ট অর্ধাংশ নীলবর্ণে পরিণত হইয়াছে।



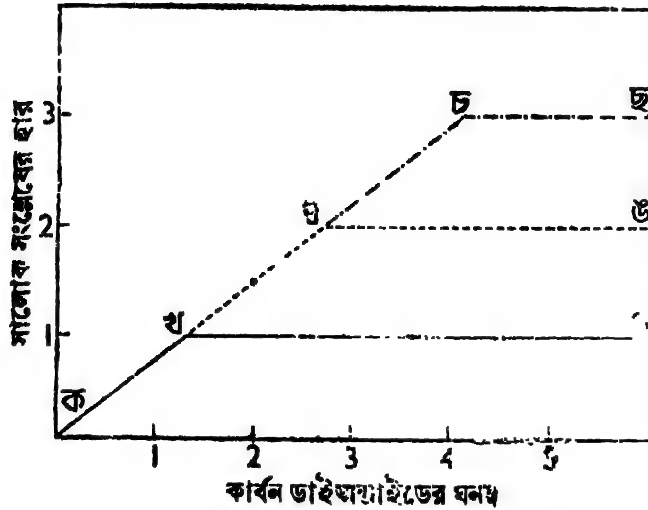
২৪৪নং চিত্র—উন্মুক্ত পত্ররন্ধ্রের সাহায্য সালোকসংশ্লেষ

কারণ-নিয়ন্ত্রণ সূত্র (Law of limiting factors)

উপরি উক্ত কারণগুলি পৃথকভাবে ক্রিয়া করিলে তাহা সালোকসংশ্লেষের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে সেই সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখন উহাদের সম্মিলিত প্রভাবে সালোকসংশ্লেষের কিরূপ পরিবর্তন হইবে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। F. F. Blackman (এফ. এফ. ব্ল্যাকম্যান) নামক জীববিজ্ঞানী 1905 খ্রীস্টাব্দে এই সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা করেন এবং অবশেষে Law of limiting factors (কারণ-নিয়ন্ত্রণ সূত্র) নির্ণয় করেন। তাঁহারই নামানুসারে ইহাকে Blackman's law of limiting factors (ব্ল্যাকম্যানের কারণ-নিয়ন্ত্রণ সূত্র) বলা হয়। তাঁহার সূত্রটি হইল—যখন দ্রুত ক্রিয়াশীল কারণ সমূহ কোনো প্রক্রিয়ায় একত্রে ক্রিয়া করে তখন ঐ প্রক্রিয়ার হার সর্বাপেক্ষা মন্থর কারণের গতির উপর নির্ভর করে।" এই সূত্রটি বুঝিতে ব্ল্যাকম্যান কর্তৃক সম্পাদিত পরীক্ষাটি উদ্ধৃত করা হইল। এখানে আলোক এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড, এই দুইটি কারণ একত্রে ক্রিয়া করিলে সালোকসংশ্লেষের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে তাহাই দেখান হইয়াছে।

এমন একটি উদ্ভিদ লওয়া হইল যাহা কোনো নির্দিষ্ট আলোকের তীব্রতায় প্রতি ঘন্টায় 10 মিলিগ্রাম CO_2 গ্রহণে সক্ষম। এইরূপ অবস্থায় ইহাতে প্রতি ঘন্টায় এক মিলিগ্রাম করিয়া CO_2 প্রবেশ করান হইতেছে। দেখা যাইবে যে সালোকসংশ্লেষ হার কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘনত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এখন কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব 10 মিলিগ্রাম পর্যন্ত বর্ধিত করিলে সালোকসংশ্লেষ হারও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে ; কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব 10 মিলিগ্রামের অধিক হইলে সালোক-সংশ্লেষ হার আর বৃদ্ধি পাইবে না। অতএব আলোকের তীব্রতা একটি নিয়ন্ত্রিত কারণ। এখন সালোকসংশ্লেষ হার বর্ধিত করিতে হইলে আলোকের তীব্রতাকে বর্ধিত করিতে হইবে।

ব্ল্যাকম্যান কর্তৃক সম্পাদিত উপরি উক্ত পরীক্ষাটি নিম্নলিখিত লেখচিত্রের দ্বারা (২৪৫নং চিত্র) সহজেই বুঝান হইয়াছে। লেখটির ভুজ (abscissa) কার্বন ডাই-



২৪৫নং চিত্র—ব্ল্যাকম্যানের কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয় লেখচিত্র

অক্সাইডের ঘনত্ব এবং কোটী (ordinate) সালোকসংশ্লেষ হার নির্দেশ করে। এই ক্ষেত্রে আলোকের তীব্রতা সমান রাখিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব যথাক্রমে 1-2% 2-3% ইত্যাদিতে ক্রমে বর্ধিত করা হইল। দেখা যাইবে, যতক্ষণ এই নির্দিষ্ট তীব্রতা-সম্পন্ন আলোকের জন্য যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রয়োজন তাহা ব্যবহৃত হইতেছে ততক্ষণ সালোকসংশ্লেষ হারও বর্ধিত হইতেছে। ইহা লেখর খ-বিন্দু নির্দেশ করে। কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব ইহার অধিক হইলে দেখা যাইবে যে সালোকসংশ্লেষ হার আর বৃদ্ধি পাইতেছে না অর্থাৎ লেখটি খ-বিন্দু হইতে ভুজের সমান্তরাল হইবে। এখন আলোকের তীব্রতা দ্বিগুণ হইলে সালোকসংশ্লেষ হার লেখর ঘ-বিন্দু পর্যন্ত বর্ধিত হইয়া পরে ভুজের সমান্তরাল হইবে। অনুরূপে আলোকের

তীব্রতা তিন গুণ বর্ধিত করিলে, লেখটি চ-বিন্দুটি পর্যন্ত যাইয়া পুনরায় ভুজের সমান্তরাল হইবে।

রাসায়নিক সংশ্লেষণ (Chemo-synthesis)

এমন কতকগুলি শৈবাল এবং ব্যাক্‌টিরিয়া আছে যাহারা অক্সিজেন নিষ্কাশন না করিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড বিজারিত করিতে সক্ষম, যাহার ফলে বিভিন্ন প্রকার জৈব পদার্থ ইহাদের দেহে সংশ্লিষ্ট হয়। ইহাতে আলোকশক্তির কোনো প্রয়োজন হয় না। এই প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক সংশ্লেষ (*chemo-synthesis*) বলে। এইপ্রকার উদ্ভিদের দেহে হাইড্রোজেন সালফাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতির যে-সকল রাসায়নিক পদার্থ থাকে তাহা জারিত হইয়া যে শক্তি নির্গত হয় তাহারই সাহায্যে রাসায়নিক সংশ্লেষ সম্পন্ন হয়।

অতএব, সালোকসংশ্লেষ ও রাসায়নিক সংশ্লেষের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল যে প্রথমোক্ত প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র সবুজ বর্ণ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয় এবং ইহার জন্য আলোকশক্তির প্রয়োজন ও ইহাতে অক্সিজেন নির্গত হয়; কিন্তু শেষোক্ত প্রক্রিয়াটি শৈবাল, ব্যাক্‌টিরিয়া প্রভৃতি কয়েকটি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ কর্তৃক সংঘটিত হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন নির্গত হয় না অথবা ইহাতে আলোকশক্তিরও প্রয়োজন হয় না।

৭ খাদ্য সংবহন ও সঞ্চয়

(Translocation and storage of food)

উদ্ভিদের বৃদ্ধি, গঠন ও জনন কার্য উদ্ভিদ কর্তৃক প্রস্তুত জৈব খাদ্যের প্রকৃতি এবং বন্টনের উপর নির্ভর করে।

1920 খ্রীষ্টাব্দে শারীরবিদগণ মনে করিতেন যে দ্রবণীয় পদার্থ জাইলেমের মধ্য দিয়া উর্ধ্বে এবং প্রস্তুত খাদ্য ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়া নিম্ন দিকে সংবাহিত হয়। বিজ্ঞানী কার্টিস (Curtis) মনে করেন যে, শর্করা দ্রব্য ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়া উর্ধ্বে এবং নিম্নে উভয় দিকেই পরিচালিত হয়।

পদার্থের সংবহন সম্বন্ধে বহু মতবাদ প্রচলিত আছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়া জৈব পদার্থের দ্রবণ এবং জাইলেমের মধ্য দিয়া অজৈব পদার্থের দ্রবণ প্রবাহিত হয়।

নিম্ন দিকে সংবহন (Downward conduction)

বলয়-করণ পরীক্ষার (Ringing experiments) দ্বারা দেখা গিয়াছে যে বলয়ের উপরিভাগে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে জৈব পদার্থ উর্ধ্ব হইতে নিম্ন দিকে পরিচালিত হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে, যখন জল জাইলেমের মধ্য দিয়া উর্ধ্ব দিকে প্রবাহিত হয় তখন সেই সাথে জৈব্য খাদ্য উহার মধ্য দিয়া নিম্ন দিকে সংবাহিত হয়।

1935 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী বুর (Burr) পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে জৈব খাদ্য পাতা হইতে উর্ধ্বে এবং নিম্নে, উভয় দিকেই পরিচালিত হয়।

উর্ধ্ব সংবহন (Upward conduction)

বহু পরীক্ষার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, জাইলেম নালিকার মধ্য দিয়া জল উর্ধ্বে সংবাহিত হয়। বিজ্ঞানী ক্লিমেণ্টস (Clements) এবং ম্যাসন্ (Mason) প্রমাণ করেন যে, খনিজ লবণ জাইলেম নালিকার মধ্য দিয়া উর্ধ্বে বাহিত হয়। বিজ্ঞানী কাটিস ও ক্লার্ক (Curtis and Clark) জাইলেম নালিকা বন্ধ করিয়া দেখান যে নাইট্রোজেন ঘটিত জৈবা খাদ্য ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়া উর্ধ্বে পরিচালিত হয়। বিজ্ঞানী হোগল্যাণ্ড (Hogland) মনে করেন যে খনিজ লবণের সংবহন প্রধানত জাইলেমের মধ্য দিয়া এবং কিছু অংশ ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়া সংঘটিত হয়।

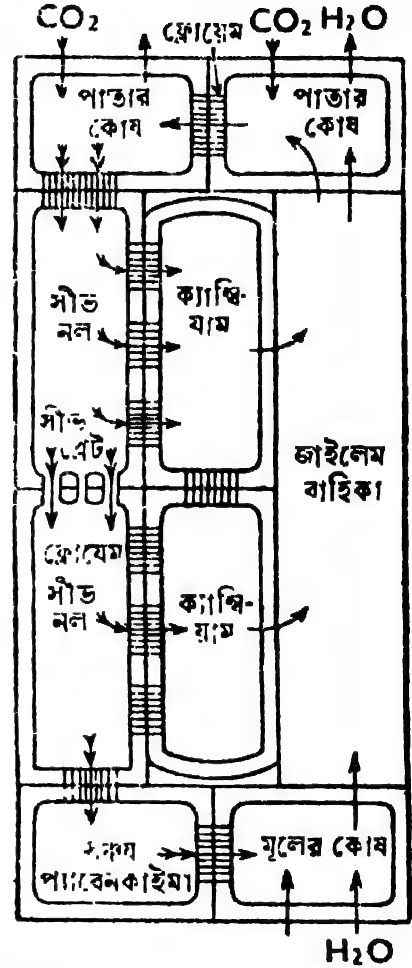
পার্শ্বীয় সংবহন (Lateral conduction)

হোগল্যান্ড (Hogland) পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, জৈব খাদ্যের দ্রবণ জাইলেম নালিকা এবং ফ্লোয়েম হইতে পার্শ্বীয়ভাবে সংবাহিত হয়। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, কাণ্ডের এক পার্শ্ব পত্রবিহীন করিলে দেখা যাইবে যে ঐ পার্শ্ব পুষ্প এবং ফল ধারণ করিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঐ পার্শ্বে পার্শ্বীয় সংবহনের অভাব ঘটিয়াছে।

সংবহন প্রণালী (Mechanism of translocation)

মাঞ্চের প্রকল্প (*Munch's hypothesis*)—1930 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী **মাঞ্চের** (Munch) মতে জল অথবা দ্রবণীয় পদার্থ ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়া অভিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র একই দিকে সংবাহিত হয়। ২৪৬নং চিত্রে ইহা সহজেই বুঝান হইয়াছে ঃ

দুইটি ভেদ্য পর্দাযুক্ত পাত্র, ক এবং খ, (বামদিকের চিত্র) একটি নল দ্বারা সংযুক্ত করা হইল এবং সমগ্র যন্ত্রটিকে জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখা হইল (২৪৬ক নং চিত্র)। ক পাত্রে অধিক ঘনত্বযুক্ত শর্করা দ্রব আছে এবং খ পাত্রে জল আছে। এখন অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল ক পাত্রে প্রবেশ করিবে। ইহাতে ক পাত্রের তরলের চাপ বৃদ্ধি পাইয়া পাশ্বীয় নলের মধ্য দিয়া খ পাত্রে সঞ্চারিত হইবে, যাহার ফলে খ পাত্রস্থ জল পর্দার মধ্য দিয়া বহিস্থ পাত্রের জলে প্রবেশ করিবে। কাজেই ক পাত্র হইতে খ পাত্রে নলের মধ্য দিয়া দ্রবণের প্রবাহ হইতে থাকিবে। শর্করা দ্রব ক পাত্র হইতে খ পাত্রে প্রবেশ করিলে খ পাত্রস্থ জলের ঘনত্ব ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে ইহার চাপও



২৪৬নং চিত্র—মাঞ্চের পরীক্ষা

বাম দিকের চিত্রে ক, শর্করা, দ্রবণ ; খ, জল , ডান দিকের চিত্রে খাদ্য সংবহন প্রণালী দেখান হইয়াছে

বৃদ্ধি পাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ক পাত্রের দ্রবণের ঘনত্ব যতক্ষণ খ পাত্রের ঘনত্ব অপেক্ষা অধিক থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা হইতে খ পাত্রে দ্রবণের প্রবাহ চলিতে থাকিবে।

এখন ভেদ্য পর্দাবিশিষ্ট পাত্র দুইটি যথাক্রমে জীবিত কোষরূপে গণ্য করিলে খাদ্যের দ্রবণ ক কোষ হইতে খ কোষে পরিবাহিত হইবে। অধিকন্তু খ কোষের সমস্ত খাদ্য যদি উদ্ভিদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে ক কোষ হইতে খ কোষে খাদ্যের দ্রবণ অবিরাম প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

মাঞ্চ (Munch) এই মত পোষণ করেন যে, উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থ ফ্লোয়েমের মধ্যে সংবাহিত হয়। ভেদ্য পদার্থযুক্ত ক এবং খ পাত্রের পরিবর্তে ডানদিকের চিত্রে পাতার কোষ এবং মূলের কোষ গণ্য করা হইয়াছে। ইহারা ক্যাম্বিয়ম, ফ্লোয়েম এবং জাইলেম নালিকার দ্বারা সংযুক্ত।

সালোকসংশ্লেষের সময় পাতার কোষগুলির অভিস্রবণ চাপ বৃদ্ধি পায় কিন্তু এই চাপ মূলের কোষের অভিস্রবণ চাপ অপেক্ষা সর্বদাই অধিক। অতএব খাদ্যের দ্রবণ পাতা হইতে মূলে সংবাহিত হয়। এই স্থানে ইহা উদ্ভিদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় অথবা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত থাকে। ইহার ফলে মূল হইতে পাতায় অবিরাম জল পরিবাহিত হয় এবং ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়া পাতা হইতে মূলে জৈব খাদ্যের দ্রব সংবাহিত হইয়া থাকে।

সঞ্চয় (Storage)

আত্তীকরণের পর সকল দ্রব্যই একসঙ্গে ব্যবহৃত হয় না। অতিরিক্ত খাদ্য গাছের বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত থাকে। এই খাদ্য গাছের ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য অথবা চারা-গাছগুলির জন্য সঞ্চিত থাকে। এই সকল খাদ্য প্রধানতঃ কঠিন অবস্থায় সঞ্চিত থাকে এবং সময় সময় ইহারা আকৃতিবিহীন, দানাদার বা কেলাসিত অবস্থায় থাকে, এমন কি কখনও কখনও ইহাদের তরল অবস্থাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। সকল পোষক দ্রব্যই গাছের খাদ্য।

খাদ্য সঞ্চয়ের স্থান (Places of storage of food)

খাদ্য গাছের নিম্নলিখিত অংশে সঞ্চিত থাকে ঃ

1. Exalbuminous বা বহিঃসার বীজে খাদ্য বীজপত্রের মধ্যে এবং albuminous বা অন্তঃসার বীজে শস্যের মধ্যে সঞ্চিত থাকে ; (2) রাইজোম, করম্ প্রভৃতি মৃদ্গত কাণ্ডের মধ্যে ; (3) মূলা, গাজর, শালগম, শতমূলী প্রভৃতির রসাল মূলে ; (4) রসাল পাতায়, যথা—পাথরকুচি, ঘৃতকুমারী প্রভৃতি ; (5) বুলবিল যথা—চুপড়ী, আলু প্রভৃতি ; (6) শিমুল, আমড়া প্রভৃতি যে-সকল গাছের পাতা শীতের সময় ঝরিয়া পড়ে তাহাদের শাখার আগায় ; (7) অনেক ফুলের অঙ্গে ; যথা—গর্ভদণ্ড ; (8) পাতার ক্লোরোপ্লাস্টে ; (9) বর্ধনশীল কোষে ; (10) কর্টেক্সের প্যারেনকাইমা কোষে ; (11) এণ্ডোডারমিসে এবং (12) মজ্জাংশুতে।

খাদ্যের প্রকার (Forms of food)

খাদ্য তিন প্রকার—কার্বোহাইড্রেট, প্রোটীন ও স্নেহজাতীয় পদার্থ। ইহাদের বিবরণ নীচে দেওয়া হইল ঃ

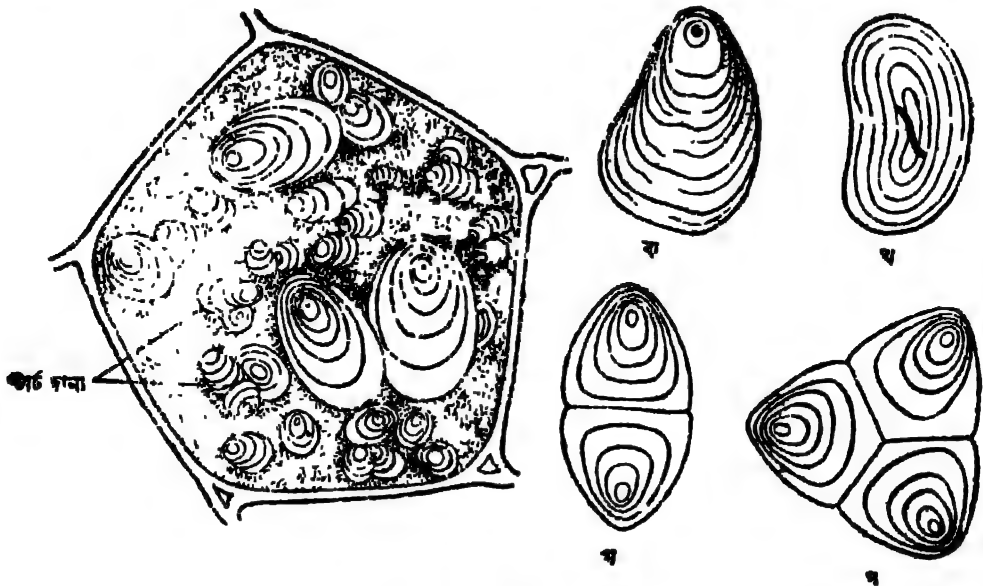
I, কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates)

এইপ্রকার পদার্থে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে ; হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত ঠিক জলের মত অর্থাৎ 2 ঃ 1। ইহা উদ্ভিদদেহে কঠিন অথবা তরল অবস্থায় থাকিতে পারে।

A. কঠিন কার্বোহাইড্রেট

1. স্টার্চ দানা (*Starch grains*) ২৪৭নং চিত্র— উদ্ভিদের প্রায় সকল অংশে ক্ষুদ্র আকৃতির স্টার্চ দানা থাকে। তবে রসাল মূলে, ভূনিম্নস্থ কাণ্ডে, সাবু গাছের মজ্জায় এবং ধান, গম, যব প্রভৃতি খাদ্যশস্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে। ইহার রাসায়নিক সংকেত $C_5H_{10}O_5$। পোষণের সময় ইহা শর্করায় পরিণত হয়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে স্টার্চ দানা পরীক্ষা করিলে ইহাকে স্তরীভূত (stratified) দেখায় ; কারণ স্টার্চ পদার্থ ও জল পর্যায়ক্রমে সজ্জিত থাকে। স্তরগুলি একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে স্থাপিত হয়। এই বিন্দুটিকে হাইলাম (hilum) বলে। হাইলাম খুব চকচকে ; ইহা গোলাকার, তারকাকার কোণ বিশিষ্ট বা খণ্ডিত হইয়া থাকে। হাইলাম দানা এক পার্শ্বে থাকিলে ইহাকে উৎকেন্দ্রীয় বা অপকেন্দ্রীয় (eccentric) বলে, যথা—আলু ; কিন্তু ইহা কেন্দ্রে থাকিলে এককেন্দ্রীয় বা সমকেন্দ্রীয় (concentric) দানা বলে, যথা—মটরবীজ। স্টার্চ দানা পরস্পর পৃথক



২৪৭নং চিত্র—স্টার্চ দানা
বাম দিকে আলুর প্রস্থচ্ছেদ করিয়া একটি কোষ দেখান হইয়াছে ; (ক) অযুক্ত (উৎকেন্দ্রীয়) ; (খ) অযুক্ত (এককেন্দ্রীয়), (গ) অর্ধযুক্ত দানা ; (ঘ) যুক্ত দানা

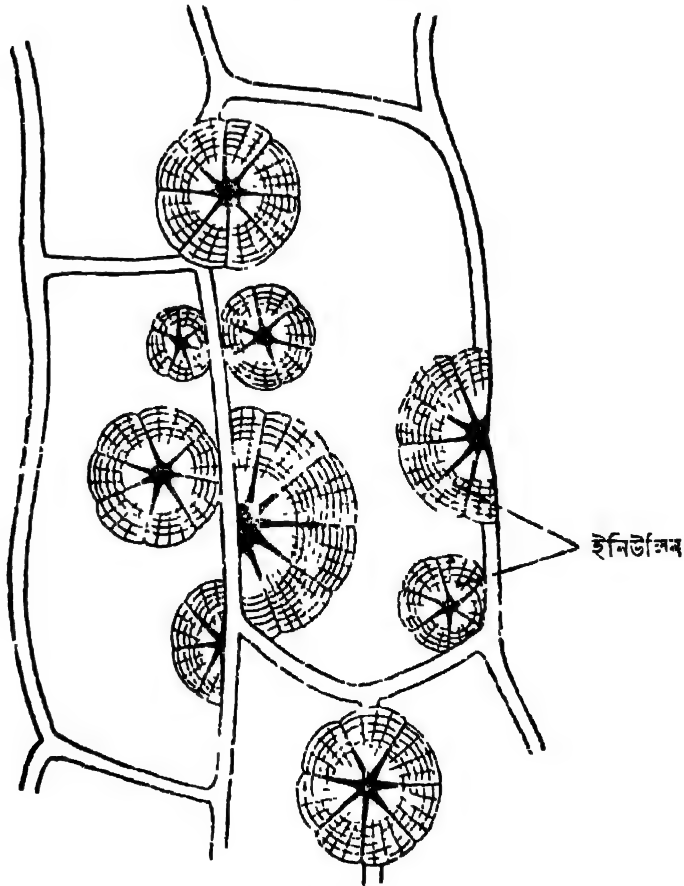
থাকিলে উহাদিগকে সরল বা অযুক্ত দানা (simple grain) বলে। সময় সময় দুই বা ততোধিক দানা একত্রে পুঞ্জীভূত থাকিলে উহাকে যৌগিক বা যুক্ত দানা (compound grain) বলে। দুই বা ততোধিক যুক্ত দানা একই আবরণে আবৃত থাকিলে উহাকে অর্ধযৌগিক বা অর্ধযুক্ত দানা (half-compound grain) বলে। বিভিন্ন উদ্ভিদে স্টার্চ দানা বিভিন্ন রকমের হয় ; যথা— আলুতে ডিম্বাকার ও উৎকেন্দ্রীয়, মটরে গোলাকার ও এককেন্দ্রীয়, চাউল ও ভুট্টায় বহুক্ষেত্রবিশিষ্ট, এবং ফণিমনসায় ডাম্বেলের মতন হইয়া থাকে।

2. সঞ্চিত সেলুলোজ (*Reserve cellulose*)—সেলুলোজ একপ্রকার কঠিন কার্বোহাইড্রেট পদার্থ। ইহার রাসায়নিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। ইহা স্টার্চ দানা অপেক্ষা কম দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ কোষপ্রাচীরে যে সেলুলোজ থাকে উহা সঞ্চিত খাদ্য নয়। খেজুর ও নারিকেলের শস্যে অতিরিক্ত সেলুলোজের প্রাচীর থাকে উহাই সঞ্চিত সেলুলোজ। পোষণের অন্য আবশ্যক হইলে ইহা এনজাইমের ক্রিয়ার দ্বারা শর্করায় পরিণত হয়।

3. গ্লাইকোজেন (*Glycogen*)—গ্লাইকোজেনও স্টার্চের মত একপ্রকার কার্বোহাইড্রেট পদার্থ। ইহাকে কেবলমাত্র ছত্রাকে, বিশেষতঃ ঈস্টে, দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ জ্যামিতিক আকৃতিবিহীন পদার্থরূপে ছত্রাকের অণুসূত্র (hyphae)-এর মধ্যে ছড়ান থাকে। কোনো কোনো শৈবালেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কার্যও শর্করার মত। ইহা এনজাইমের ক্রিয়ার দ্বারা শর্করায় পরিণত হয়।

B. তরল কার্বোহাইড্রেট

4. শর্করা (*Sugars*)—তরল কার্বোহাইড্রেট পদার্থকে শর্করা বলে। নানা



২৪৮নং—ইনিউলিন

প্রকার শর্করা আছে। দ্রাক্ষা শর্করা (Glucose or grapesugar) পাকা ফলে ও

পিঁয়াজের রসাল শল্কপত্রে থাকে ; ইহার রাসায়নিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$ । ইক্ষু শর্করা (Sucrose or canesugar) ইক্ষুর কাণ্ডে ও বীটের মূলে থাকে ; ইহার রাসায়নিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$ । আবশ্যক হইলে ইহা এনজাইমের ক্রিয়ারদ্বারা দ্রাক্ষা শর্করায় পরিণত হয় ।

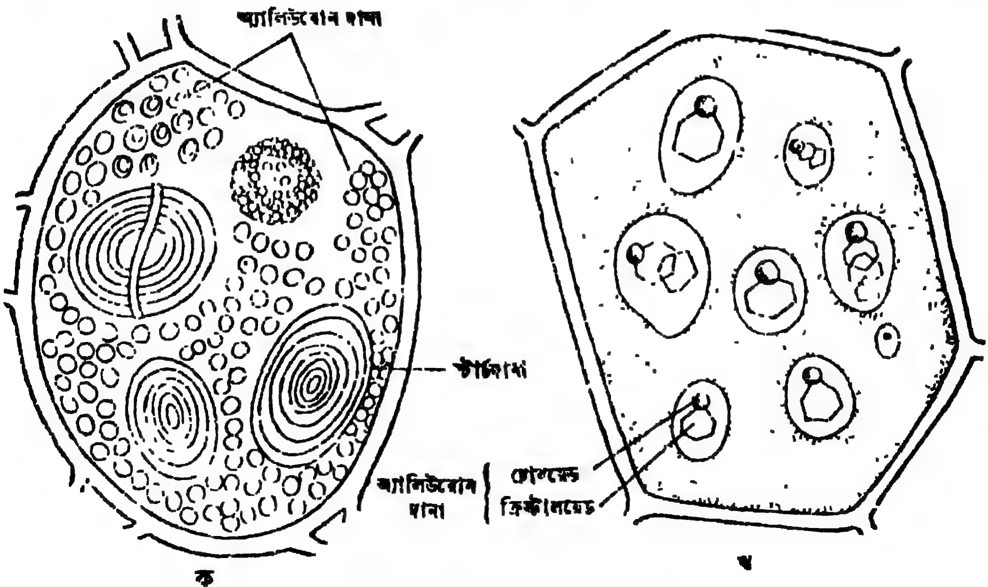
5. ইনিউলিন (*Inulin*) : ২৪৮নং চিত্র)—ইহা একপ্রকার তরল কার্বোহাইড্রেট পদার্থ । ইহা ডালিয়া, হাতীচোখ প্রভৃতির কন্দাল মূল (tuberous root)-এর কোষরসে থাকে। ইহার রাসায়নিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$ । আবশ্যক হইলে ইহা এনজাইমের ক্রিয়ার দ্বারা শর্করায় পরিণত হয় ।

II. প্রোটীন (Proteins)

প্রোটীন উদ্ভিদের অত্যাবশ্যক জটিল জৈব পদার্থ । ইহাও উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য ও প্রোটোপ্লাজমের প্রয়োজনীয় উপাদান । ইহাতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ব্যতীত সর্বদাই নাইট্রোজেন থাকে এবং কোনো কোনো সময়ে গন্ধক ও ফসফরাস থাকে। ইহা কঠিন অথবা তরল অবস্থায় সঞ্চয় কলা (storage tissue)-য় বর্তমান থাকে ।

A. কঠিন প্রোটীন (Solid Proteins) : ২৪৯নং চিত্র

কঠিন প্রোটীনকে প্রোটীড দানা (*Proteid grains*) বা অ্যালিউরোন দানা (*Aleurone grains*) বলে। ইহা প্রধানতঃ সেইসকল বীজের মধ্যে থাকে যাহাদের তৈলের পরিমাণ বেশি অথবা কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কম । ইহা মটরের বীজপত্রে



২৪৯নং চিত্র—অ্যালিউরোন দানা
(ক) মটর বীজের ; (খ) রেড়ি বীজের

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার আকারে থাকে । ভুট্টা, গম, যব প্রভৃতি খাদ্যশস্যের বীজত্বকের নিচের স্তরের মধ্যে ইহা দানাদার অবস্থায় থাকে । রেড়ি বীজের শস্য (endosperm)-এ

বড় বড় দানারূপে ভ্যাকুওলের মধ্যে থাকে। শেষোক্ত প্রকার অ্যালিউরোন দানার দুইটি অংশ আছে : (*a*) ক্রিস্টালয়েড (*crystalliod*), এই অংশটি বেশ বড় ইহা অ্যালবুমেন (albumen) নামক প্রোটীনের একপ্রকার কেলাস; (*b*) গ্লোবয়েড (*globoid*), এই অংশটি ক্ষুদ্র ও গোলাকার, ইহা গ্লোবিউলিন (globulin) নামক একপ্রকার প্রোটীন এবং ক্যালসিয়াম ফসফেট (calcium phosphate) ও ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট (magnesium phosphate) এর সংমিশ্রণে গঠিত। এইপ্রকার অ্যালিউরোন দানায় একাধিক ক্রিস্টালয়েড থাকিতে পারে।

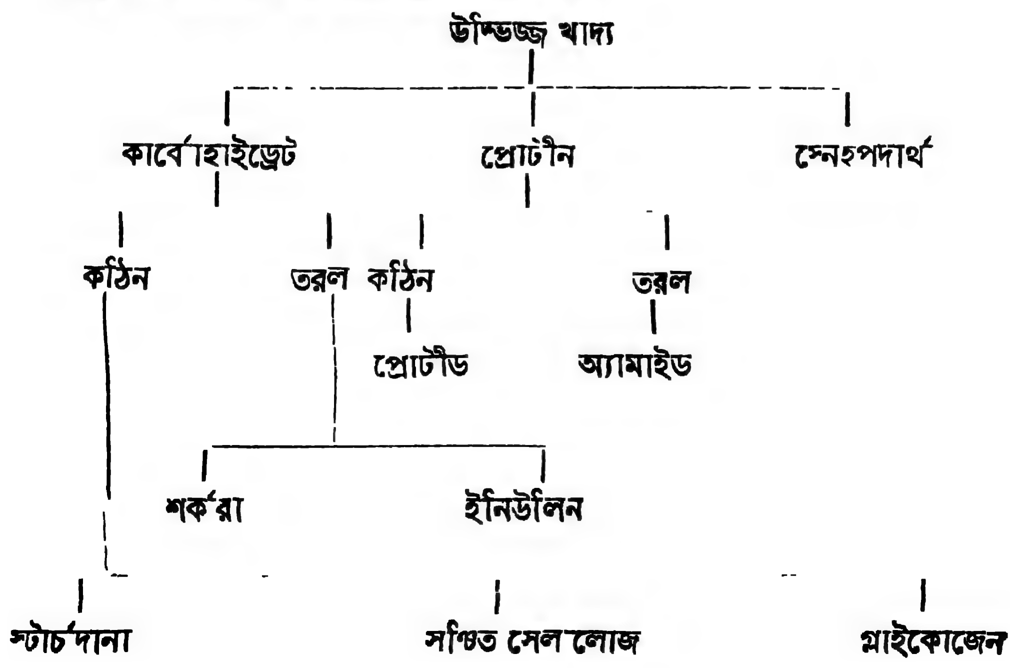
B. তরল প্রোটীন (Liquid Protein)

তরল প্রোটীনকে অ্যামাইড (*amide*) বলে। আবশ্যক হইলে অ্যালিউরোন দানা এনজাইমের ক্রিয়ার দ্বারা অ্যামাইডে পরিণত হয়। ইহাকে সাধারণতঃ শাখা-প্রশাখার অগ্রভাগের কোষে দেখিতে পাওয়া যায়।

III. স্নেহপদার্থ (Fates and oils)

স্নেহপদার্থ বিভিন্ন প্রকারের স্নেহঅম্ল (fatty acids) ও গ্লিসারল (glycerol) এর যৌগিক পদার্থ। সাধারণ তাপে স্নেহপদার্থ কঠিন অবস্থায় থাকে কিন্তু উত্তাপ প্রয়োগে তরল পদার্থে অর্থাৎ তৈলে পরিণত হয়। কার্বোহাইড্রেটের ন্যায় ইহারা কার্বন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত, তবে হাইড্রোজেন অক্সিজেন জলের অনুপাতে থাকে না। যেসকল বীজে (যথা—সরিষা, রেড়ি, তিসি প্রভৃতি) কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কম তাহাতেই ইহারা বেশি পরিমাণে থাকে। জলপাই-এর ফলে যথেষ্ট তৈল থাকে। ইহারা সাধারণতঃ প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে বিন্দুর মত অবস্থান করে।

নিম্নে উদ্ভিজ্জ খাদ্যের একটি ছক দেওয়া হইল :



১০ নাইট্রোজেন আত্তীকরণ
(Nitrogen Metabolism)

নাইট্রোজেন প্রোটোপ্লাজমের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। ইহা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সহিত রাসায়নিকভাবে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন গঠন, করে। এইরূপ প্রোটিন গঠনের প্রক্রিয়াকে **প্রোটিন সংশ্লেষ** (protein synthesis) বলে। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রোটোপ্লাজম কর্তৃক বাহিরের পরিবেশ হইতে নাইট্রোজেন অথবা অজৈব (অথবা জৈব) নাইট্রোজেন যৌগ শোষণ করিয়া নানাপ্রকার জটিল জৈব যৌগ পদার্থ গঠন করে ও নিজ পুষ্টি সাধন করে সেই প্রক্রিয়াকে **নাইট্রোজেন আত্তীকরণ** (Nitrogen assimilation) বলে।

ঊনবিংশতি শতাব্দির প্রথম অর্ধেই বিজ্ঞানী মহলে এইরূপ ধারণা বলবতি হয় যে উদ্ভিদ তাহার প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন মৃত্তিকা হইতে সংগ্রহ করে। পরবর্তীকালে রসায়নবিদ্যার অগ্রগতির সাথে সাথে উদ্ভিদ জীবনে নাইট্রোজেনের ভূমিকা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা এবং প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাইল। শুধু তাহাই নহে, নাইট্রোজেন উদ্ভিদের কি প্রয়োজনে লাগে, কিরূপ অবস্থায় এবং কি পদ্ধতিতে তাহা কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার জটিল যৌগ বস্তুতে পরিণত হয় এমনকি প্রথম সুস্থিত নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ বস্তুটি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জানিতে পারা যায়।

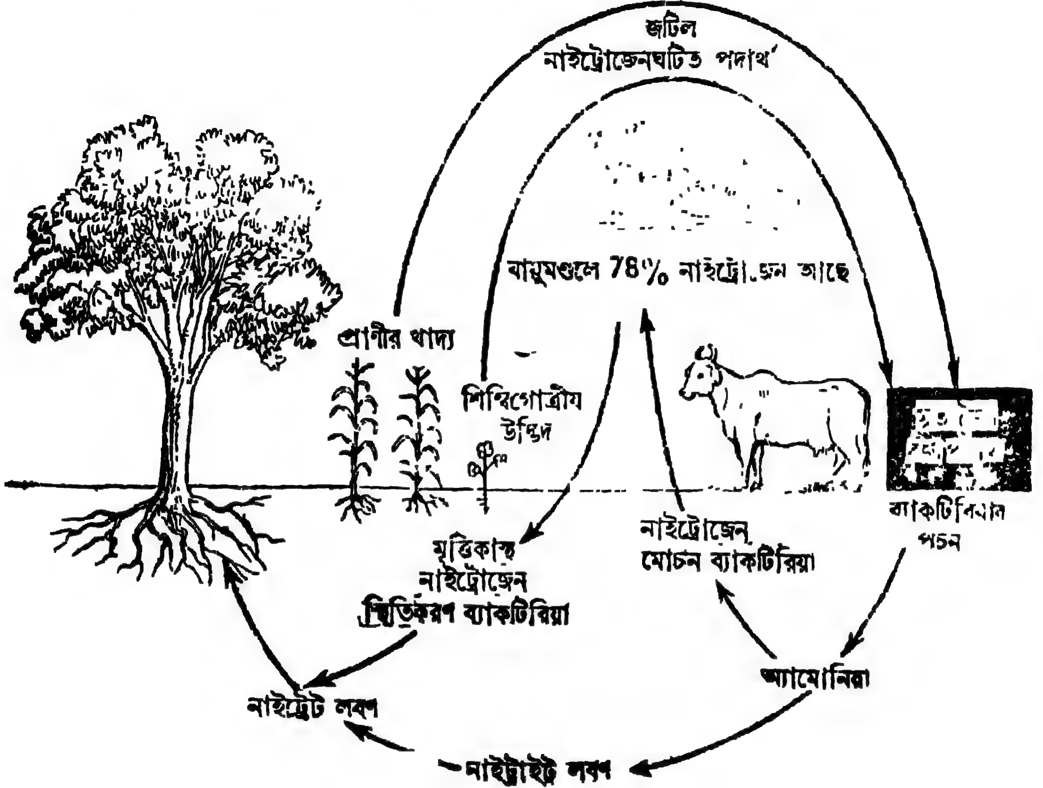
উদ্ভিদ দেহে নাইট্রোজেন প্রধানতঃ প্রোটিন, অ্যামিনো অ্যাসিড ও অন্যান্য যৌগ পদার্থের মধ্যে অবস্থান করে। ইহা শতকরা 12 হইতে 19 ভাগ পর্যন্ত থাকিতে পারে। এই পরিচ্ছেদে আমরা এই মৌল পদার্থটির উৎস, কার্যাবলী এবং আত্তীকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

উদ্ভিদের নিকট নাইট্রোজেন মৌলটির গ্রহণযোগ্য উৎস
(Available sources of Nitrogen to plants)

নাইট্রোজেন একটি মৌল পদার্থ। ইহার অণু (N_2) স্বাভাবিকরূপেই যথেষ্ট সুস্থিত (stable)। পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল-ই হইতেছে নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস। বায়ুমণ্ডলে ইহার অনুপাত প্রায় শতকরা 78 ভাগ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উদ্ভিদ এই মৌলটি সরাসরি নিজ কার্যে লাগাইতে পারে না (উদ্ভিদ জগতে অবশ্যই ইহার কিছু ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়)। উদ্ভিদ বায়ু মণ্ডল হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ; ঐ সময় এই গ্যাসের সহিত নাইট্রোজেন পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়া দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। দেহ কোষে CO_2 বিজারিত করিবার উপযোগী উৎসেচক আছে, কিন্তু নাইট্রোজেনকে বিজারিত করিয়া যৌগ বস্তুতে পরিণত করিবার মত রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত করিবার উপযোগী উৎসেচক না থাকার জন্য বায়ুমণ্ডলস্থিত নাইট্রোজেন উদ্ভিদের সরাসরি কোন কাজে লাগে না। সাধারণভাবে মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন খুব সামান্য পরিমাণ থাকে, এবং যাহা পাওয়া যায় তাহাও প্রধানতঃ জৈব যৌগ বস্তুরূপে। এই জৈব যৌগ বস্তুগুলি আবার পচনশীল জীবদেহ হইতেই আসিয়া থাকে। পালালিক

শিলা ও ইগনিয়াস (sedimentary and igneous rock) শিলায় সামান্য পরিমাণ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে বৃষ্টির জলের মাধ্যমে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন, নাইট্রাইট ও অ্যামোনিয়ারূপে মৃত্তিকায় আসিয়া মিশ্রিত হয়। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হইয়া নাইট্রেট উৎপন্ন হয়।



২৫০নং চিত্র—নাইট্রোজেন-চক্র

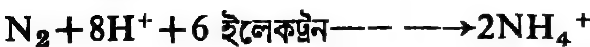
বজ্র-বিদ্যুৎ ও আলট্রাভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে এই বিক্রিয়াটি সংঘটিত হইয়া থাকে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে, জৈব বস্তুর দহনের ফলে, এবং বনে জঙ্গলে দাবানলের সৃষ্টির ফলে বায়ুমণ্ডলে অ্যামোনিয়া মিশ্রিত হইয়া থাকে

মৃত্তিকাস্থ নাইট্রোজেন যৌগ (Nitrogen compounds of the soil)—উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ মৃত্তিকায় মিশ্রিত হইয়া উহার নাট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। নানা ধরনের প্রোটিন, অ্যামিনো অ্যাসিড পিউরাইন, পিরিমিডিন, ইউরিয়া এবং অজৈব নাইট্রোজেন যৌগ, যেমন অ্যামোনিয়া, নাইট্রেট, এবং অ্যামোনিয়াম লবণ ইত্যাদি যৌগ সমূহ মৃত্তিকায় পাওয়া যায়। (ইহাদের অধিকাংশ অদ্রবণীয় অবস্থায় থাকে ফলে তাহা তখনই উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণীয় হয় না)। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্ভিদ যদিও সামান্য পরিমাণ অ্যামিনো অ্যাসিড শোষণ করিতে পারে, কিন্তু সাধারণ ভাবে ইহা অজৈব নাইট্রোজেন যৌগ অপেক্ষা অতি সামান্যই কাজে লাগে।

যে জৈব যৌগটি উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে নাইট্রোজেনের উৎসরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা হইল ইউরিয়া (urea); ইহা উদ্ভিদ সহজেই শোষণ করিতে পারে কোন কোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ইউরিয়া নাইট্রোজেনের প্রধান উৎসরূপে ব্যবহৃত হয়। যদিও নাইট্রোজেন ঘটিত জটিল যৌগ পদার্থ সমূহ যেমন, পিউরাইন, পিরিমিডিন এমন কি দ্রবণীয় প্রোটিন কিছু কিছু উদ্ভিদ সরাসরি মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া বিভিন্ন পরীক্ষায় দাবি করা হইয়াছে, তথাপি, পুষ্টিগত দিক হইতে মৃত্তিকায় অবস্থিত এই যৌগগুলির গুরুত্ব অতি সামান্য, কারণ, মৃত্তিকায় দ্রবণীয় অবস্থায় ইহাদের অবস্থান সম্পর্কীত বহু তথাই এখনও আমাদের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

যে অজৈব আয়নগুলি হইতে অধিকাংশ উদ্ভিদ সার্থকরূপে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহা হইল, যথাক্রমে নাইট্রেট ও অ্যামোনিয়াম আয়ন। উভয় আয়নই উদ্ভিদ অতি দ্রুত শোষণ করিতে পারে; তবে, এই দুইটি আয়নের মধ্যে, তুলনামূলক ভাবে, নাইট্রেট আয়নই অধিক মাত্রায় শোষিত হয়। অবশ্যই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন, আলু, আনারস ইত্যাদি এবং চারা অবস্থায় ধান, গম, রাই, ওট ইত্যাদি অ্যামোনিয়াম লবণ যুক্ত মৃত্তিকায় ভাল জন্মায়। কিন্তু এই শস্যল উদ্ভিদগুলির পরবর্তী পর্যায়, অর্থাৎ চারা হইতে যখন ইহারা পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন, নাইট্রেটের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়া যায়। সেই সময় অধিক মাত্রায় নাইট্রেট আয়ন শোষিত হইতে থাকে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, সাধারণভাবে যখন মৃত্তিকার pH সামান্য অম্লের দিকে থাকে (acidic soil) তখন অ্যামোনিয়া অপেক্ষা নাইট্রেট আয়ন অধিক মাত্রায় শোষিত হয়। অপর দিকে নিউট্রাল বা উদাসী (neutral soil) এবং অল্প খারীয় (alkaline soil) মৃত্তিকায় অ্যামোনিয়াম আয়ন অধিক শোষিত হয়।

বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনের ব্যবহার (Utilization of atmospheric nitrogen)—উদ্ভিদ জগতে কয়েক শ্রেণীর উদ্ভিদ দেখা যায় যাহারা বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনকে সরাসরি গ্রহণ করিয়া নিজ পুষ্টি সাধন করিতে পারে। বায়ুস্থিত নাইট্রোজেনকে সরাসরি জৈব যৌগতে পরিণত করার ঘটনাকে নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ (nitrogen fixation) বলা হয়। কয়েক প্রকার নীলাভ সবুজ শৈবাল, ব্যাকটেরিয়া (freeliving), শিম্বজাতী উদ্ভিদের মূলে বসবাসকারী (অন্যোন্যজীবিত্ব) ব্যাকটেরিয়া এই প্রক্রিয়া সংঘটিত করিতে পারে। নাইট্রোজেন স্থিতিকরণের সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটি নিম্নলিখিত রাসায়নিক সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়—



$$N_2 + 8H^+ + 6 \text{ ইলেকট্রন} \longrightarrow 2NH_4^+$$

(অ্যামোনিয়াম আয়ন)

নাইট্রোজেন স্থিতিকরণকারী অর্গানিজমগুলির শ্রেণীবিন্যাস
(Classification of N_2-fixing organisms)

1. **মুক্ত বা স্বাধীনরূপে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া** (Free living bacteria): নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাহা বিরূপে সংগৃহীত

হয় তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই সকল ব্যাকটেরিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, সবাত ব্যাকটেরিয়া (aerobic bacteria) এবং অবাত ব্যাকটেরিয়া (anaerobic bacteria)

পরভোজী ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে বহিঃ মাধ্যমে বিজারিত কার্বনের প্রয়োজন হয়। ঐ বিজারিত কার্বনকে জারিত করিয়া যে ইলেকট্রন পাওয়া যায় তাহার সাহায্যে পরভোজী ব্যাকটেরিয়াগুলি নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ করে। এইরূপ একটি অবাত ব্যাকটেরিয়ার নাম ক্লসট্রিডিয়াম প্যাসটুরিয়েনাম (*Clostridium pasteurianum*)। 1893 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী স. উইনোগ্রাড্স্কি (*S. winogradsky*) ইহা লক্ষ্য করেন। তাহার পর হইতে ক্লসট্রিডিয়ামের অন্যান্য প্রজাতির মধ্যেও নাইট্রোজেন স্থিতিকরণের ক্ষমতা লক্ষিত হয়! পরোভোজী সবাত ব্যাকটেরিয়া যাহার মধ্যে এইরূপ ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার নাম অ্যাজোটোব্যাকটার (*Azotobacter*)

স্বভোজী অর্থাৎ সালোক সংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়া, যেমন, রোডোস্পিরিলাম রুব্রাম (*Rhodospirilum rubrum*) নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রন, বিজারিত ফেরেডক্সিন ferredoxin) হইতে প্রাপ্ত হয়। এখনও পর্যন্ত যতগুলি সালোক-সংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়ার কথা জানিতে পারা গিয়াছে তাহারা সকলেই বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ করিতে পারে।



২৫১নং চিত্র—শিম্বজাতীয় উদ্ভিদের মূলের অর্বুদ

2. **নীলাভ সবুজ শৈবাল** (Blue green algae)—নীলাভ সবুজ শৈবালের প্রায় 9টি গণের মধ্যে এইরূপ ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে নসটক (*Nostoc*) অ্যানাবিনা (*Anabaena*) এবং অসিলেটোরিয়া (*oscillatoria*) প্রধান। ধানক্ষেতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে এই সকল শৈবালের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইহারা সকলেই স্বাধীন ভাবে বাঁচিয়া থাকে। তবে উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছত্রাকের সহিত যুক্ত হইয়া এক নূতন ধরনের উদ্ভিদ দেহ গঠন করে। ঐ সকল উদ্ভিদ দেহকে লাইকেন (Lichen) বলা হয় এবং এই প্রকার সংগঠনকে অন্যোন্য জীবিত্ব (symbiosis) বলা হয়।

সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জল বিশ্লিষ্ট হইলে যে ইলেক্ট্রনগুলি উৎপন্ন হয় তাহার দ্বারা কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন বিজারিত হয়।

3. **মূলের অর্বুদের মধ্যে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া** (Bacteria in root nodules) ঃ—শিম্বিগোত্রের কতকগুলি উদ্ভিদ (leguminous plants) রাইজোবিয়াম (*Rizobium*) নামক একপ্রকার ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে মৃত্তিকাস্থ বায়ু হইতে মুক্ত নাইট্রোজেন (free nitrogen) গ্রহণ করিতে পারে। এই

সকল উদ্ভিদের মূলে রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাহার ফলে মূলের গাত্রে কতকগুলি অর্বুদ (nodules ঃ ২৫১নং চিত্র) উৎপন্ন হয়। অর্বুদগুলির মধ্যে ব্যাকটেরিয়া বাস করে। তাহারা মৃত্তিকাস্থ বায়ু হইতে নাইট্রোজেন শোষণ করে এবং অ্যামোনিয়াম আয়ন প্রস্তুত করে। ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক নাইট্রোজেন স্থিতিকরণের ফলে যে অ্যামোনিয়াম ও অন্যান্য নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক বস্তু উৎপন্ন হয় তাহা উদ্ভিদ সহজেই প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ ব্যাকটেরিয়াকে কার্বোহাইড্রেট সরবরাহ করে। কার্বোহাইড্রেটের জারণের ফলে যে ইলেকট্রন উৎপন্ন হয় তাহার দ্বারা ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন বিজারিত করিয়া অ্যামোনিয়াম আয়ন উৎপন্ন করে।

নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ (Nitrogen fixation)

জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলস্থিত মুক্ত নাইট্রোজেন বিজারিত হইয়া অ্যামোনিয়াম আয়নে পরিণত হয়। অ্যামোনিয়াম আয়ন এই প্রক্রিয়ার প্রাথমিক সৃষ্ট বস্তু হইলেও পরবর্তী পর্যায় দ্বিতীয় সৃষ্ট বস্তুরূপে গ্লুটামেট ও গ্লুটামিন এবং তৃতীয় বস্তুরূপে অ্যাসপারটেট উৎপন্ন হইতে পারে।

স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যবান অর্বুদগুলি সাধারণতঃ পিঙ্ক অর্থাৎ কিছুটা লালচে বর্ণের হয়। বিজ্ঞানী H. kudo, 1939 খ্রীষ্টাব্দে দেখিয়াছিলেন যে অর্বুদের যে বর্ণ তাহা একপ্রকার লোহিত কণা হিমোগ্লোবিন (hemoglobin)-এর উপস্থিতির জন্য হইতেছে। পরবর্তীকালে এই লোহিত কণাটিকে লেগহিমোগ্লোবিন (leghemoglobin) নামে অভিহিত করা হয় (বিজ্ঞানী A. virtanen এবং তাহার সহকর্মী বৃন্দ)। শিম্বজাতীয় উদ্ভিদের মূলের অর্বুদে প্রাপ্ত হিমোগ্লোবিনের সহিত প্রাণীদেহের রক্তের হিমোগ্লোবিনের পার্থক্য করিবার জন্যই এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে। তবে লেগহিমোগ্লোবিন অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া বা নীলাভ সবুজ শৈবাল, যাহারা নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ করিতে সক্ষম তাহাদের দেহে দেখিতে পাওয়া যায় না। নাইট্রোজেন স্থিতিকরণে লেগহিমোগ্লোবিনের অবদান সম্বন্ধে এখনও সম্পূর্ণ জানা যায় নাই। তবে ইহা অনুমান করা হয় যে, এই বস্তুটি ইলেকট্রনের চলাচলে অংশ গ্রহণ করে। স্থিতিকরণের জন্য লৌহ অপরিহার্য। সুতরাং লৌহের জন্য সম্ভবতঃ এই রঞ্জকটির প্রয়োজন হয়। নাইট্রোজেন স্থিতিকরণে প্রথম ধাপ হিসাবে নাইট্রোজেন প্রথমে লেগ-হিমোগ্লোবিনের সহিত যুক্ত হয়। যে সকল ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিন নাই সেই সকল ক্ষেত্রে অন্য কোন উপায় অবলম্বিত হয়।

মলিবডেনাম ও কোবল্ট এই দুইটি মৌল নাইট্রোজেন স্থিতিকরণে অপরিহার্য। কোবল্ট ভিটামিন B_{12} এর অপরিহার্য অংশ। ভিটামিন B_{12} মূলের অর্বুদে হিমোগ্লোবিন প্রস্তুত করিতে সাহায্য করে। মলিবডেনাম সম্ভবত কো-এনজাইমরূপে কার্য করে। যখন ইলেকট্রন কোন দাতা বস্তুর (donor) নিকট হইতে বাহির হইয়া নাইট্রোজেন সমীপে উপস্থিত হয় তখন কো-এনজাইমটি একবার জারিত ও একবার বিজারিত হয় এবং পরিশেষে অ্যামোনিয়া গঠিত হয়।

উৎসেচক (*Enzyme*) ঃ—নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী উৎসেচক নাইট্রোজিনেজ, দুই প্রকার প্রোটিনের একটি জটিল যৌগ—(ক) অতিউচ্চ আনবিক ভর বিশিষ্ট Mo-Fe প্রোটিন অংশ এবং (খ) লঘু আনবিক ভর বিশিষ্ট Fe প্রোটিন অংশ। ইহার ক্রিয়া পরিচালন মূলক দুইটি অঞ্চল রহিয়াছে যথা, (i) ইলেক্ট্রন সক্রিয় করিবার অঞ্চল যাহা Mo-Fe প্রোটিন অংশে অবস্থিত। ঐ অঞ্চলে কোন দাতার নিকট হইতে ইলেক্ট্রন গৃহীত হয় ও ATP দ্বারা সক্রিয় হইয়া ওঠে এবং (ii) সাবস্ট্রেটের সহিত জটিল যৌগ গঠন করিবার অঞ্চল। ইহা Fe-প্রোটিনের উপর অবস্থিত। এই অঞ্চলে সাবস্ট্রেট প্রথম অঞ্চলের ইলেক্ট্রন দ্বারা বিজারিত হয় এবং জটিলতর যৌগে পরিণত হয়।

ইলেকট্রন এবং ATP-এর উৎস (*Source of* H^+ *or* e^- *and ATP*) ঃ—লেগুম জাতীয় উদ্ভিদের মূলের অর্বুদ এবং অ্যাজোটোব্যাক্টর-এর ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রন ও ATP শ্বসন এবং অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনের মাধ্যমে আসিয়া থাকে। স্বভোজী নাইট্রোজেন স্থিতিকারী ব্যাকটেরিয়া ও নীলাভ সবুজ শৈবাল সালোক-সংশ্লেষের আলোক বিক্রিয়া হইতে ইলেক্ট্রন প্রাপ্ত হয়।

নাইট্রোজেন স্থিতিকরণের মধ্যবর্তী বিক্রিয়াগুলি এবং যৌগ সমূহ যাহা এই প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে তাহাদের সকলকে চিহ্নিত করা সম্ভব না হইলেও মোটামুটি ভাবে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহা ক্লসট্রিডিয়াম প্যাসটুরিয়েনাম নামক অবাত শ্বসনকারী ব্যাকটেরিয়া হইতে। এই ক্ষেত্রে পাইরুভিক অ্যাসিড ইলেকট্রন দাতারূপে কার্য করে। পাইরুভিক অ্যাসিডের জারণ ক্রিয়ার ফলে ইলেকট্রন ও ATP উৎপন্ন হয়। ইলেকট্রন ফেরেডক্সিনে স্থানান্তরিত হয় এবং তথা হইতে অবশেষে নাইট্রোজিনেজ উৎসেচকের সহিত সংযুক্ত হয়। অতঃপর ঐ ইলেকট্রন নাইট্রোজেনের সহিত যুক্ত হইয়া তাহাকে বিজারিত করে। ইলেক্ট্রন ও ATP উৎপাদনের বিক্রিয়াটি নিম্নে দেখান হইল—

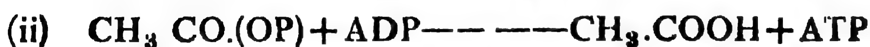
ক্লাসটিক উৎসেচক



(i) $CH_3.CO\,COOH + Pi \longrightarrow CH_3.CO.(OP) + 2H^+ + CO_2$

পাইরুভিক অ্যাসিড — অ্যাসিটিল ফসফেট

অ্যাসিটোকাইনেজ

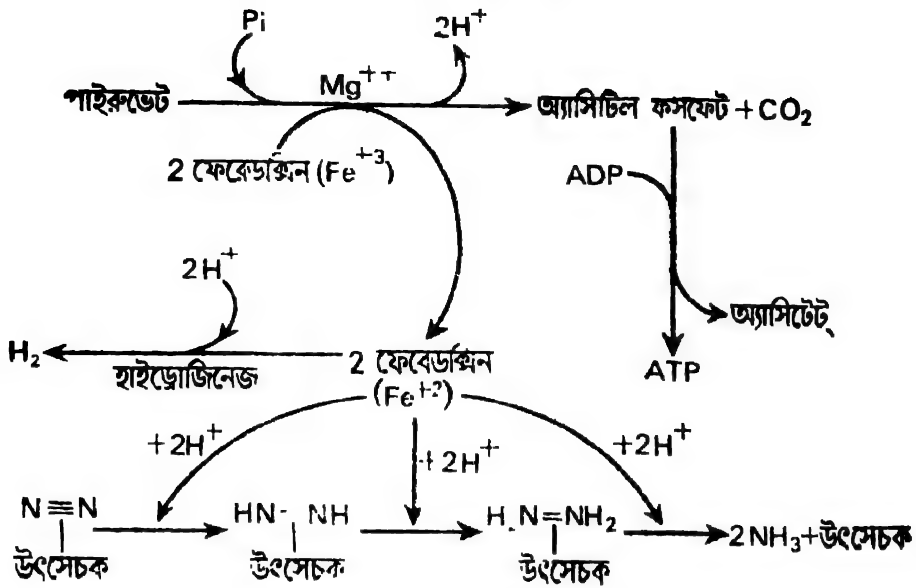


(ii) $CH_3\,CO.(OP) + ADP \longrightarrow CH_3.COOH + ATP$

অ্যাসিটিল ফসফেট — অ্যাসিটিক অ্যাসিড

ইলেকট্রনগুলি হাইড্রোজেন আয়নের সহিত যুক্ত হইয়া হাইড্রোজেন অণু গঠন করিতে পারে। ক্লসট্রিডিয়াম প্যাসটুরিয়েনামে নাইট্রোজেন স্থিতিকরনের সময় ইলেকট্রন স্থানান্তরের একটি নকশা ২৫২নং চিত্রে দেখান হইল।

শিম্বজাতীয় উদ্ভিদের পত্রে উৎপন্ন বস্তু সমূহ যেমন, সুকরোজ, গ্লুকোজ এবং জৈব অ্যাসিড ইত্যাদি পত্র হইতে নিচের দিকে বাহিত হইয়া মূলের অর্বুদে আসিয়া পৌঁছায়। তথায় সুক্রোজ ব্যাকটেরিয়াস্থিত উৎসেচক ইনভারটেজ দ্বারা ভাঙ্গিয়া গিয়া হেক্সোজ সর্করায় পরিণত হয়। হেক্সোজ সর্করা সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের মধ্যে জারিত



২৫২নং চিত্র নাইট্রোজেন স্থিতিকরণের সময় ইলেকট্রন স্থানান্তরের একটি রেখা চিত্র

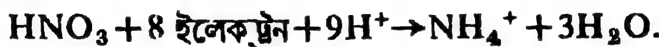
শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষের উৎপাদন
জৈব অ্যাসিড
গ্লুকোজ
সুক্রোজ
অর্বুদ
সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র
$NADH_2$
NAD
e
e
Fe-Mo
N≡N
নাইট্রোজিনেজ
Fe
অক্সালো অ্যাসিটেট
α–কিটো-গ্লুটারিক
অ্যাসপারটেট
গ্লুটামেট
গ্লুটামিন
$2NH_3$
অর্বুদে অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ

২৫৩নং চিত্র—শিম্বজাতীয় উদ্ভিদের অর্বুদে নাইট্রোজেন স্থিতিকরণের নক্সা চিত্র

(oxidized) হয়। ফলে NAD হইতে $NADH_2$ উৎপন্ন হয়। কিন্তু $NADH_2$ অণু পুনরায় O_2 দ্বারা জারিত হইয়া সর্বসময় ATP উৎপন্ন করিতে থাকে। অধিকাংশ $NADH_2$ অণু হইতে ইলেকট্রনটি নাইট্রোজিনেজ উৎসেচকের মাধ্যমে যাইয়া নাইট্রোজেনকে বিজারিত করে।

নাইট্রেট বিজারণ (Nitrate reduction)

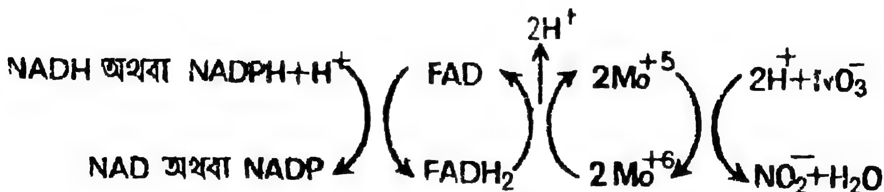
উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতে যে নাইট্রেট শোষণ করে তাহা মূলে বিজারিত হইয়া অ্যামোনিয়াম আয়নে পরিণত হয়। কিন্তু যখন অতিরিক্ত নাইট্রেট শোষিত হয়, অর্থাৎ যখন নাইট্রেটের রূপান্তরের হার শোষণ হার অপেক্ষা কম থাকে, তখন অতিরিক্ত নাইট্রেট প্রস্বেদন টানের সহিত জাইলেম কলার মধ্য দিয়া জলের সহিত উর্ধ্বে প্রবাহিত হয়, এবং পত্রে তাহার বিজারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। নাইট্রেট বিজারণের সাধারণ রাসায়নিক সমীকরণ নিম্নে দেখান হইল।



$$HNO_3 + 8 \text{ ইলেকট্রন} + 9H^+ \rightarrow NH_4^+ + 3H_2O.$$

সমগ্র বিজারণ বিক্রিয়াটি পর পর কয়েকটি মধ্যবর্তী বস্তু গঠনের মাধ্যমে ঘটিয়া থাকে। প্রতিক্ষেত্রে একটি অথবা দুইটি ইলেকট্রন যুক্ত হয়। প্রথমে $2H^+$ অথবা $2e^-$ দ্বারা নাইট্রেট বিজারিত হইয়া নাইট্রাইটে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়াটি Mo-ফ্ল্যাভো-প্রোটিন জাতীয় উৎসেচক, নাইট্রেট রিডাকটেজ দ্বারা পরিচালিত হয়। উৎসেচকের গাত্রে FAD দৃঢ়ভাবে প্রসথেটিক গ্রুপরূপে যুক্ত থাকে।

উদ্ভিদের মূলে উৎসেচকটি NADH অথবা NADPH এর সহিত বিক্রিয়া করে। তাহার ফলে উৎসেচকের FAD বিজারিত হইয়া $FADH_2$-এ পরিণত হয়। $FADH_2$ ইহার পর তাহার ইলেকট্রন দুইটি মলিবডেনাম আয়নে চালান দিয়া নিজে জারিত হয় (oxidized)। ইলেকট্রন দুইটি অবশেষে মলিবডেনাম হইতে নাইট্রেটে স্থানান্তরিত হয়। বিক্রিয়াটি নিম্নে দেখান হইল (২৫৪নং চিত্র)।

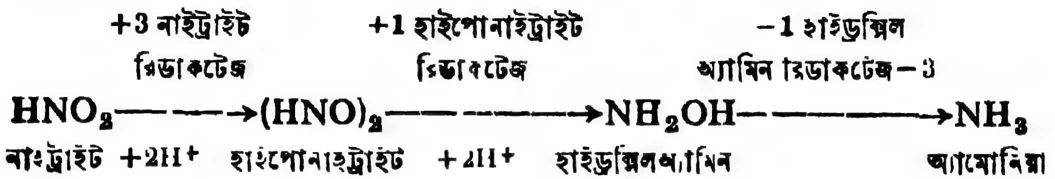


২৫৪নং চিত্র—নাইট্রেট বিজারণের বিক্রিয়া

নাইট্রেট বিজারিত হইয়া অ্যামোনিয়ামে পরিণত হইবার সময় কোন্ কোন্ মধ্য বস্তু উৎপন্ন হয় সেই সম্বন্ধে বিজ্ঞানী মহল এখনও সম্পূর্ণ একমত হইতে পারেন নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে, যে বস্তুগুলি উৎপন্ন হয় তাহা অত্যন্ত সক্রিয় থাকে। ফলে উৎপন্ন হইবার পরই অন্য বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিজারিত হয়। শুধু তাহাই নহে সম্ভবত

মধ্যবর্তী বস্তুগুলি উৎসেচকের সহিত যুক্ত থাকে বলিয়া তাহাদের পৃথক করা খুবই দুরূহ হয়। পূর্বে এইরূপ ধারণা ছিল যে হাইড্রক্সিল অ্যামিন (Hydroxylamin NH_2OH) সম্পূর্ণ মুক্ত মধ্যবর্তী বস্তুরূপে উৎপন্ন হয়। কিন্তু বর্তমানে যে সকল প্রমানাদি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে যে নাইট্রাইট ও অ্যামোনিয়ার মধ্যবর্তী বস্তুগুলি উৎসেচকের দ্বারা যুক্ত থাকে।

বিজ্ঞানী ইভান্স, ন্যাসন এবং নিকোলাস (Evans, Nason, and Nicholas) নাইট্রাইট বিজারনের একটি পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণিত পদ্ধতিটি নিম্নে দেখান হইল—

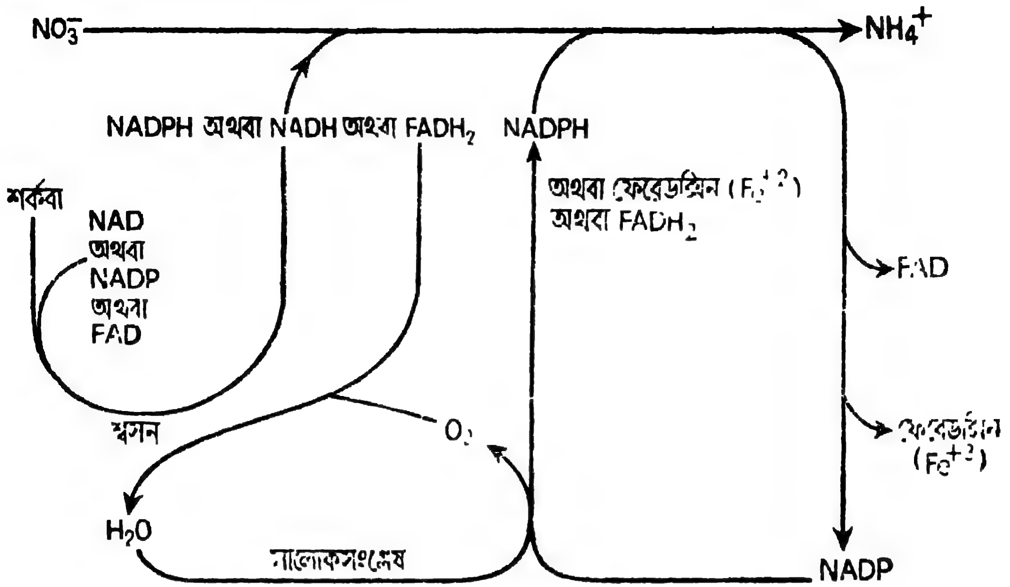


উপরি উল্লিখিতপদ্ধতিতে দেখা যাইতেছে যে নাইট্রাইট বিজারণ তিনটি ধাপে, দুইটি করিয়া ইলেকট্রন স্থানান্তকরনের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। প্রথম ধাপে নাইট্রাইট হইতে হাইপোনাইট্রাইট উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াটি উৎসেচক নাইট্রাইট রিডাকটেজ দ্বারা পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় ধাপে বিক্রিয়াটি উৎসেচক হাইপোনাইট্রাইট রিডাকটেজ দ্বারা পরিচালিত হইয়া হাইড্রক্সিল অ্যামিন উৎপন্ন হয় এবং তৃতীয় অর্থাৎ শেষ ধাপে হাইড্রক্সিল অ্যামিন বিজারিত হইয়া অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয়। এই স্থলে উৎসেচক হাইড্রক্সিল অ্যামিন রিডাকটেজ কার্য করে।

নাইট্রেট বিজারণের সহিত শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষের সম্পর্ক (*Nitrate reduction—its relation to respiration and photosynthesis*)—নাইট্রাইট এবং নাইট্রেট বিজারণের সহিত শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষের সহিত নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। কারণ, অ্যামোনিয়া প্রস্তুত হইতে যে NADH অথবা NADPH প্রয়োজন হয় তাহা উদ্ভিদ দেহে শ্বাসকার্যের ফলে উৎপন্ন হয়। শুধু তাহাই নহে, নাইট্রাইট বিজারণের সময় যে ATP প্রয়োজন হয় তাহাও শ্বসনের ফলে উৎপন্ন হয়।

পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে আলো, সবুজ পত্র ও কাণ্ডে অধিকমাত্রায় অ্যামোনিয়াম আয়ন উৎপন্ন হইতে সাহায্য করে। ক্লোরোফিলের উপর নির্ভরশীল $FADH_2$, NADPH (অথবা NADH) এবং বিজারিত ফেরেডক্সিন উৎপন্ন হইতে যে ইলেকট্রনের প্রয়োজন হয় তাহা জল হইতে পাওয়া যায়। উৎসেচক নাইট্রাইট রিডাকটেজ বিজারিত ফেরেডক্সিন হইতে ইলেকট্রন সংগ্রহ করে, এবং নাইট্রেট রিডাকটেজ NADPH (অথবা NADH) হইলে ইলেকট্রন সংগ্রহ করিয়া ফেরেডক্সিনের মাধ্যমে FMNকে দেয় এবং বিজারিত FMN ($FMNH_2$) হইতে নাইট্রেট ইলেকট্রনটি পায়, ফলে তাহা

নাইট্রাইটে পরিণত হয়। ২৫৫নং চিত্রে নাইট্রেট বিজারণের সহিত শ্বসন ও সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সম্পর্ক দেখান হইল।



২৫৫নং চিত্র—নাইট্রেট বিজারণের সহিত শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষের সম্পর্ক

অ্যামোনিয়া হইতে নানাপ্রকার জৈব যৌগ বস্তুর উৎপাদন (Synthesis of Organic Compounds from Ammonia)

অ্যামোনিয়াম আয়ন উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতে শোষণ করিতে পারে অথবা নাইট্রেট বিজারিত করিয়া কোষের অভ্যন্তরে উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই উহা কোষে সঞ্চিত হয় না। কারণ, উহা কোষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক (সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রন চলাচলের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে এবং মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে ATP উৎপন্ন হইতে বাধা সৃষ্টি করে)। সুতরাং উৎপন্ন হইবার পরই অ্যামোনিয়াম আয়ন কোন জৈব যৌগ পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

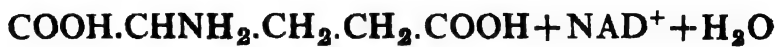
সম্ভবত অ্যামোনিয়ামের প্রথম এবং প্রধান পরিণতি হইল গ্লুটামিক অ্যাসিড। অ্যামোনিয়া, ∝-কিটো-গ্লুটারিক অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া গ্লুটামিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটি গ্লুটামিক ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

গ্লুটামিক ডিহাইড্রোজিনেজ



$$COOH.CO\ CH_2.CH_2.COOH + NH^+_4 + NADH \rightleftharpoons$$

(∝-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড)



$$COOH.CHNH_2.CH_2.CH_2.COOH + NAD^+ + H_2O$$

(গ্লুটামিক অ্যাসিড)

অ্যামাইড ও তাহাদের উৎপত্তি (*Amides and their biosynthesis*)—অ্যামাইড দুইটি কার্বক্সিল গ্রুপ যুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড হইতে উৎপন্ন হয়। দুইটি কার্বক্সিলের একটির পরিবর্তে সেখানে একটি অ্যামাইড গ্রুপ ($CO—NH_2$) যুক্ত হয়।

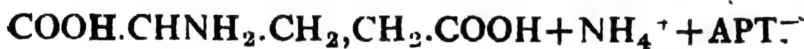
গ্লুটামিন ও অ্যাসপ্যারাজিন—দুইটি প্রধান অ্যামাইড যাহা সকল জীবের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

এই দুইটি অ্যামাইড ছাড়া বহু উদ্ভিদের মধ্যে আরও অন্যান্য অ্যামাইড দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা সকলেই উপরিউক্ত দুইটি প্রধান অ্যামাইড হইতে উৎপন্ন হয়। বহু অ্যান্টিবায়টিক যাহা উদ্ভিদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহারা সকলেই বিভিন্ন ধরনের অ্যামাইড।

উদ্ভিদ দেহে গ্লুটামিনের মাধ্যমেই প্রধানত নাইট্রোজেন সঞ্চিত হয়। উদ্ভিদের বিভিন্ন সঞ্চয় অংশে (storage organs), যেমন, আলুকন্দ (potato tuber), বীট মূল (beet root), গাজর, মূলা, ইত্যাদি, গ্লুটামিন সঞ্চিত থাকে। অ্যামোনিয়ার ক্ষতিকারক প্রভাবকে দূরীভূত করিবার জন্যই উদ্ভিদ গ্লুটামিন প্রস্তুত করিয়া তাহাকে সঞ্চয় করে।

গ্লুটামিক অ্যাসিড ও অ্যামোনিয়াম আয়ন যুক্ত হইয়া গ্লুটামিন উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াটি ATP-এর উপর নির্ভরশীল (সুতরাং Mg^{++} অথবা Mn^{++} আয়নের উপর ও নির্ভরশীল) এবং উৎসেচক গ্লুটামিন সিন্থেটেজ দ্বারা পরিচালিত হয়।

গ্লুটামিক সিন্থেটেজ


$$COOH.CHNH_2.CH_2,CH_2.COOH+NH_4^{+}+APT \xrightarrow[Mg^{+}]{}$$
(গ্লুটামিকঅ্যাসিড)


$$COOH.CHNH_2.CH_2CH_2\ CO—NH_2+ADP+Pi+H^{+}$$
(গ্লুটামিন)

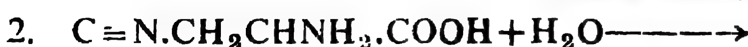
অ্যাসপ্যারাজিন প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় সম্ভবত গ্লুটামিন প্রস্তুত প্রনালীর ন্যায় এখানেও অ্যাসপারটিক অ্যাসিডের সহিত অ্যামোনিয়াম আয়ন যুক্ত হইয়া অ্যাসপ্যারাজিন প্রস্তুত হইতে পারে। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে এই প্রকার বিক্রিয়া সংঘটিত হয় কিনা সেই সম্বন্ধে এখনও কিছু সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে অন্য এক পদ্ধতিতে অ্যাসপ্যারাজিন প্রস্তুত হইতে পারে। পদ্ধতিটি নিম্নে দেখান হইল।

উৎসেচকবিহীন বিক্রিয়া


1. $CH_2OH.CHNH_2COOH+HC\equiv N \longrightarrow$
(L. সিরিন)


$$C\equiv N.CH_2CHNH_2COOH+H_2O$$
(β-সায়ানো অ্যালানিন)

উৎসেচক ঘটিত আর্দ্র বিশ্লেষণ


2. $C\equiv N.CH_2CHNH_2.COOH+H_2O \longrightarrow$
(β-সায়ানো অ্যালানিন)


$$CO.NH_2.CH_2CHNH_2COOH$$
(অ্যাসপ্যারাজিন)

উদ্ভিদের পুষ্টিতে অ্যামাইডের প্রয়োজনীয়তা (*Roll of amides in Plant mutrition*)—গ্লুটামিন ও অ্যাসপ্যারাজিন অ্যামাইডদ্বয় প্রোটিনের একটি অন্যতম

প্রধান অংশ। শুধু তাহাই নহে, অ্যামাইড গঠনের মাধ্যমে উদ্ভিদ অ্যামোনিয়ার ক্ষতিকারক প্রভাব অপসারিত করে। অধিকন্তু গ্লুটামিন সংশ্লেষ একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রায় সকল প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড ; ট্রিপ্টোফেন, হিস্টিডিন, পিউরাইন বেস সমূহ এমন কি এন-অ্যাসিটাইল গ্লুকোজ অ্যামিন ইত্যাদি গ্লুটামিন হইতে উৎপন্ন হয়। এন-অ্যাসিটাইল গ্লুকোজ অ্যামিন ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের (পেপটাইডো গ্লাইকন) একটি অন্যতম প্রধান রাসায়নিক দ্রব্য।

অ্যামিনো অ্যাসিড ও তাহাদের সংশ্লেষ (Amino acids and their synthesis)

অ্যামিনো অ্যাসিড একপ্রকার জৈব অ্যাসিড যাহাতে অন্তত পক্ষে একটি NH_2 গ্রুপ যুক্ত থাকে। অনেকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড একত্রে যুক্ত হইয়া একটি প্রোটিন অণু গঠন করে। 20টি বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিন গঠনে অংশ গ্রহণ করে। প্রোটিন আর্দ্র বিশ্লেষণে (protein hydrolysis) 26 প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। এই 6টি অতিরিক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড সম্পর্কে বলা হয় যে, উহারা ঐ 20টি অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্য হইতে আর্দ্র বিশ্লেষণের সময় উৎপন্ন হয়।

অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপাদনের জন্য প্রধানত দুইটি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বস্তুর আবশ্যক ; (ক) একটি জৈব অ্যাসিড এবং অন্যটি (খ) NH_2 গ্রুপ। জৈব অ্যাসিড TCA-চক্র, কেলভিন চক্র এমন কি বিভিন্ন জৈব অ্যাসিডের বিপাকীয় ক্রিয়া হইতে পাওয়া যায়। NH_2 গ্রুপ অ্যামোনিয়া হইতে আসে।

আইসোটোপিক নাইট্রোজেন ($N^{15}H_4$) আয়ন লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে যে অ্যামিনো গ্রুপ (NH_2) থাকে তাহা মূলত গ্লুটামিন হইতে আসে, এবং গ্লুটামিন ঐ অ্যামিনো গ্রুপ অ্যামোনিয়া হইতে প্রাপ্ত হয়।

অ্যামিনো অ্যাসিড গঠন পদ্ধতি (*Synthesis of amino acids*)—বিভিন্ন ধরনের বিক্রিয়ার দ্বারা অ্যামিনো অ্যাসিড গঠিত হইতে পারে। উহাদের মধ্যে দুই প্রকার বিক্রিয়া প্রধান, যথা, (ক) রিডাক্টিভ অ্যামিনেশান (reductive amination) এবং (খ) ট্রান্স অ্যামিনেশান (transamination)।

(ক) **রিডাক্টিভ অ্যামিনেশান**—এই পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া হইতে α-কিটো অ্যাসিডের α-কার্বনে যুক্ত হয়। α কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিড, অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং পাইরুভিক অ্যাসিডের সহিত যুক্ত হইয়া যথাক্রমে, গ্লুটামিক, অ্যাসপারটিক এবং অ্যালানিন গঠিত হয়। বিক্রিয়াগুলি নিম্নে দেখান হইল—



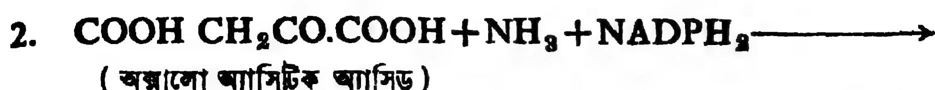
1. $COOH\,CH_2.CH_2.CO.COOH + NH_3 + NADPH_2 \longrightarrow$

(α-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড)



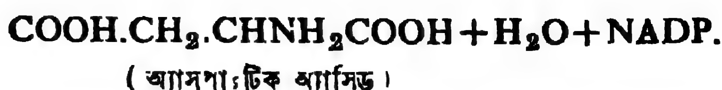
$COOH.CH_2,CH_2CH.NH_2COOH + H_2O + NADP.$

(গ্লুটামিক অ্যাসিড)



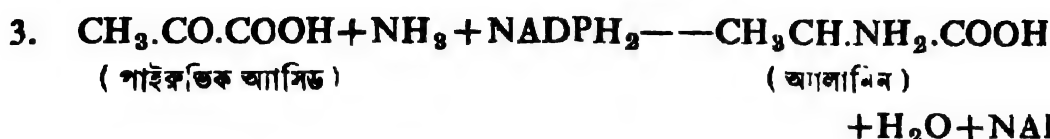
2. $COOH\ CH_2CO.COOH + NH_3 + NADPH_2 \longrightarrow$

(অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড)



$COOH.CH_2.CHNH_2COOH + H_2O + NADP.$

(অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড)



3. $CH_3.CO.COOH + NH_3 + NADPH_2 \text{——} CH_3CH.NH_2.COOH$

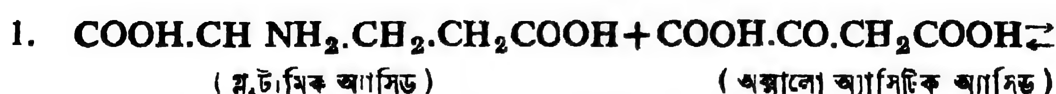
(পাইরুভিক অ্যাসিড) (অ্যালানিন)

$+ H_2O + NADP$

উপরিউক্ত তিনটি রিডাকটিভ অ্যামিনেশান বিক্রিয়া মাইক্রো-অর্গানিজমের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে কেবলমাত্র ∝-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিডের রিডাকটিভ অ্যামিনেশান বিক্রিয়াটি লক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে গ্লুটামিক অ্যাসিডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে, কারণ সেখানে এই অ্যামিনো অ্যাসিড হইতে ট্রান্স অ্যামিনেশান বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপন্ন হইয়া থাকে।

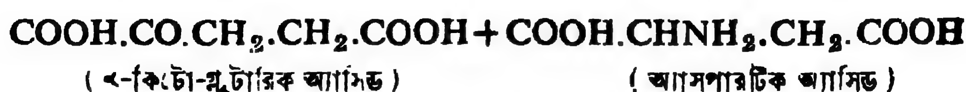
(খ) **ট্রান্স অ্যামিনেশান বিক্রিয়া**—ট্রান্স অ্যামিনেশান বিক্রিয়ায় অ্যামিনো গ্রুপটি কোন একটি দাতা—যৌগ বস্তু (donor compound) হইতে গ্রাহক যৌগ বস্তুতে (acceptor compound) সরাসরি স্থানান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড গঠিত হইয়া থাকে। ট্রান্স অ্যামিনেশান বিক্রিয়াটি বিজ্ঞানী ব্রনস্টেন এবং ক্রিট্‌জম্যান (Braunstein and kritzmann, 1937) 1937 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আবিষ্কার করেন। তবে ইহার ব্যাপকতা সম্বন্ধে সঠিক ধারনা করা 1950 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সম্ভব হয় নাই।

ট্রান্সঅ্যামিনেশান বিক্রিয়া, উৎসেচক ট্রান্সঅ্যামিনেজ দ্বারা পরিচালিত হয়। এই উৎসেচকটিতে কো-এনজাইম রূপে পাইরিডক্সাল ফসফেটের প্রয়োজন হয়। পাইরিডক্সাল ফসফেট ভিটামিন B_6 হইতে উৎপন্ন হয়। কয়েকটি ট্রান্সঅ্যামিনেশান বিক্রিয়া নিম্নে দেখান হইল :



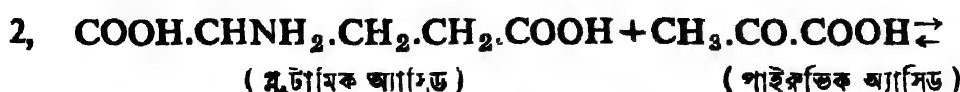
1. $COOH.CH\ NH_2.CH_2.CH_2COOH + COOH.CO.CH_2COOH \rightleftarrows$

(গ্লুটামিক অ্যাসিড) (অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড)



$COOH.CO.CH_2.CH_2.COOH + COOH.CHNH_2.CH_2.COOH$

(∝-কিটো-গ্লুটারিক অ্যাসিড) (অ্যাসপারটিক অ্যাসিড)



2, $COOH.CHNH_2.CH_2.CH_2.COOH + CH_3.CO.COOH \rightleftarrows$

(গ্লুটামিক অ্যাসিড) (পাইরুভিক অ্যাসিড)

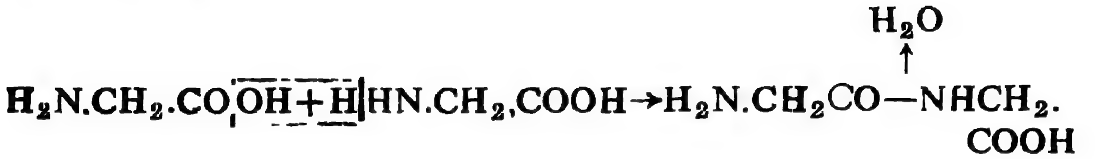


$COOH.CO.CH_2.CH_2.COOH + CH_3.CHNH_2.COOH$

(∝-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড) (অ্যালানিন)

প্রোটিন সংশ্লেষ এবং জেনেটিক কোড (Protein synthesis and Genetic Code)

প্রোটিন 20টি অ্যামিনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত। অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পরস্পর পেপটাইড লিংকেজ (-CO-NH) দ্বারা যুক্ত হয়। নিউক্লিক অ্যাসিডকে যেমন পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল বলা হয়, তেমনি প্রোটিনকেও পলিপেপটাইড শৃঙ্খল নামে অভিহিত করা যায়। একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বক্সিল গ্রুপ-এর সহিত আর একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের অ্যামিনো গ্রুপের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়াকে পেপটাইড লিঙ্কেজ বা বণ্ড বলে।



$$H_2N.CH_2.CO\,OH + H\,HN.CH_2.COOH \rightarrow H_2N.CH_2CO-NHCH_2.COOH \quad (\uparrow H_2O)$$

অধিকাংশ জীবকোষে প্রোটিন সংশ্লেষ ডি এন এ দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু যে সকল কোষে ডি এন এ অনুপস্থিত সেইক্ষেত্রে জেনেটিক আর এন এ প্রোটিন সংশ্লেষ পরিচালনা করে। কি ধরনের প্রোটিন গঠিত হইবে তাহা সকল সময় পূর্ব নির্দিষ্ট থাকে। এই নির্দেশ ডি এন এ পলিনিউক্লিওটাইড শৃঙ্খল হইতে আসে।

ডি এন এ যখন নিজের প্রতিলিপি গঠন করে সেই সময় সে আরও কিছু বস্তু গঠন করে। সেই বস্তুগুলি হইল বিভিন্ন ধরনের ননজেনেটিক আর এন এ (non genetic RNA), যেমন tRNA (transfer RNA), mRNA (mesenger, RNA) এবং rRNA (ribosomal RNA)। এই আর এন এ গুলি প্রোটিন সংশ্লেষে অংশ গ্রহণ করে।

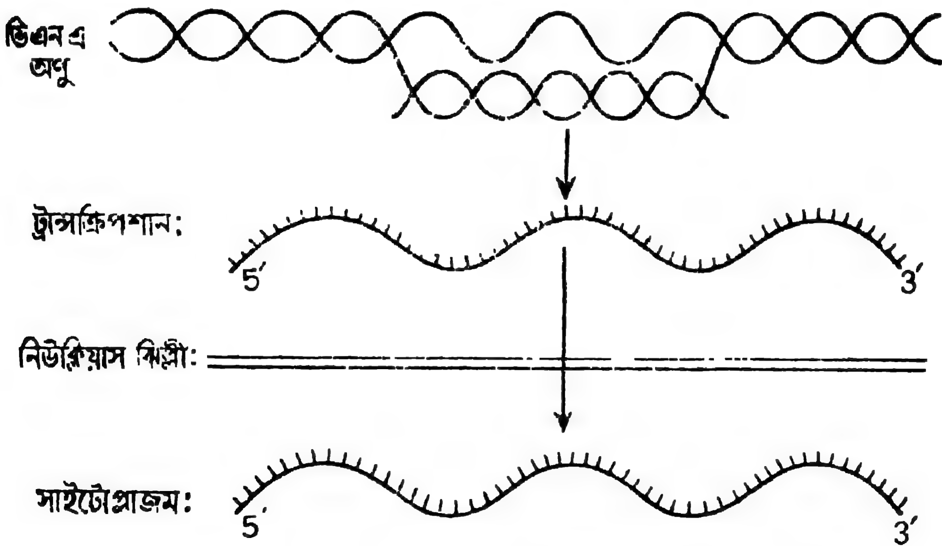
mRNA এবং tRNA সারাসরি অংশ গ্রহণ করে কিন্তু rRNA রাইবোজোমের মধ্যে থাকিয়া উহার দেহের গঠনের সহিত যুক্ত হইয়া প্রোটিন সংশ্লেষে অংশ গ্রহণ করে। mRNA এবং tRNA প্রোটিন গঠনে কিভাবে অংশগ্রহণ করে তাহা বর্তমানে সুস্পষ্ট রূপে জানিতে পারা গিয়াছে। কিন্তু rRNA-এর ভূমিকা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয় নাই। mRNA ও tRNA-এর মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট mRNA, একটি নির্দিষ্ট ধরনের প্রোটিন উৎপাদন করিতে পারে এবং একটি নির্দিষ্ট tRNA একটি নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করিতে পারে। কিন্তু rRNA-এর মধ্যে এরূপ কোন স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় না, তাহাদের কার্য কিছুটা ব্যাপক।

কোন্ প্রকার প্রোটিন গঠন করিতে হইবে সেই সংবাদ DNA হইতে মেসেঞ্জার RNA(mRNA) গঠিত হইবার সময় তাহার বেসের সজ্জাক্রমের মাধ্যমে DNA হইতে চলিয়া আসে। একটি mRNA-এর বেসক্রম অনুযায়ী (যাহা DNA-এর একটি পলি-নিউক্লিওটাইড শৃঙ্খলের পূরক) নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পরস্পর যুক্ত হইয়া

পলিপেপটাইড শৃঙ্খল গঠন করে। mRNA-এর মধ্যে যে সংবাদ (সাংকেতিক ভাষা) উহার সৃষ্টির সময় নিহিত হয় তাহা প্রোটিন গঠনের মাধ্যমে প্রকাশিত (প্রোটিনের ভাষায় অনুবাদ হয়) হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রোটিন সংশ্লেষ দুইটি প্রধান দশায় সম্পন্ন হয়, যথা: (ক) প্রথম দশা—DNA হইতে mRNA গঠন—ইহাকে ট্রান্সক্রিপশান বলে ; এবং (খ) দ্বিতীয় দশা—mRNA হইতে পলিপেপটাইড শৃঙ্খল গঠন—ইহাকে ট্রানশ্লেসান বলে।

DNA ——ট্রান্সক্রিপশান——→ mRNA ——ট্রান্সশ্লেসান——→ প্রোটিন

(ক) **ট্রান্সক্রিপ্শান (Trascription)**—DNA হইতে জেনেটিক তথ্য mRNA-এর উপর স্থানান্তরিত হওয়াকে ট্রান্সক্রিপ্শান বলা হয়। DNA অণুর একটি শৃঙ্খল হইতে mRNA গঠিত হয়। mRNA গঠন কালে DNA অণুর একটি নির্দিষ্ট স্থানের দুইটি শৃঙ্খলের মধ্যবর্তী হাইড্রোজেন বণ্ড খুলিয়া যায় এবং শৃঙ্খল দুইটি ঐ স্থানে পরস্পর হইতে বিযুক্ত হয় (২৫৬নং চিত্র)। তখন একটি শৃঙ্খল RNA-পলিমারেজ উৎসেচকের উপস্থিতিতে mRNA গঠন করিতে থাকে।



২৫৬নং চিত্র—ট্রান্সক্রিপশান পদ্ধতি. ডি এন এ অণুর একটি শৃঙ্খল হইতে mRNA গঠিত হইয়াছে। mRNA গঠিত হইবার পর তাহা সাইটোপ্লাজমে চলিয়া আসে এবং ডি এন এ শৃঙ্খলটি পুনরায় পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া যায়

প্রোক্যারিওটিক কোষে একটি RNA পলিমারেজ উৎসেচক সকল প্রকার RNA(tRNA, mRNA এবং rRNA) গঠন করে। কিন্তু ইউক্যারিওটিক কোষের মধ্যে এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে তিন প্রকার RNA-পলিমারেজের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহারা উপরিউক্ত তিন প্রকার RNA গঠন করে। ১নং অর্থাৎ 'A'-RNA-পলিমারেজ নিউক্লিওলাসের মধ্যে অবস্থান করে এবং rRNA গঠনে অংশগ্রহণ করে ; ২নং অর্থাৎ 'B' RNA-পলিমারেজ নিউক্লিও রসের (নিউক্লিওপ্লাজম) মধ্যে অবস্থান করে এবং

mRNA গঠনে অংশ গ্রহণ করে এবং ৩নং অর্থাৎ ‘C’ RNA-পলিমারেজ tRNA গঠনে অংশ গ্রহণ করে। এই উৎসেচকটিও নিউক্লিও রসের মধ্যে অবস্থান করে।

উৎপন্ন মেসেঞ্জার RNA নিউক্লিয়াস ঝিল্লীর মধ্য দিয়া সাইটোপ্লাজমে চলিয়া আসে এবং সেখানে প্রোটিন অণু গঠন করিতে থাকে।

(খ) ট্রানস্লেসান—এই দশায় নিউক্লিক অ্যাসিডের সাংকেতিক ভাষা প্রোটিন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ mRNA-র উপর বেসের ক্রম (তিনটি করিয়া বেস লইয়া একটি সংকেত বা “কোড” গঠিত হয়, এবং মেসেঞ্জার RNA-এর উপর অবস্থিত এক

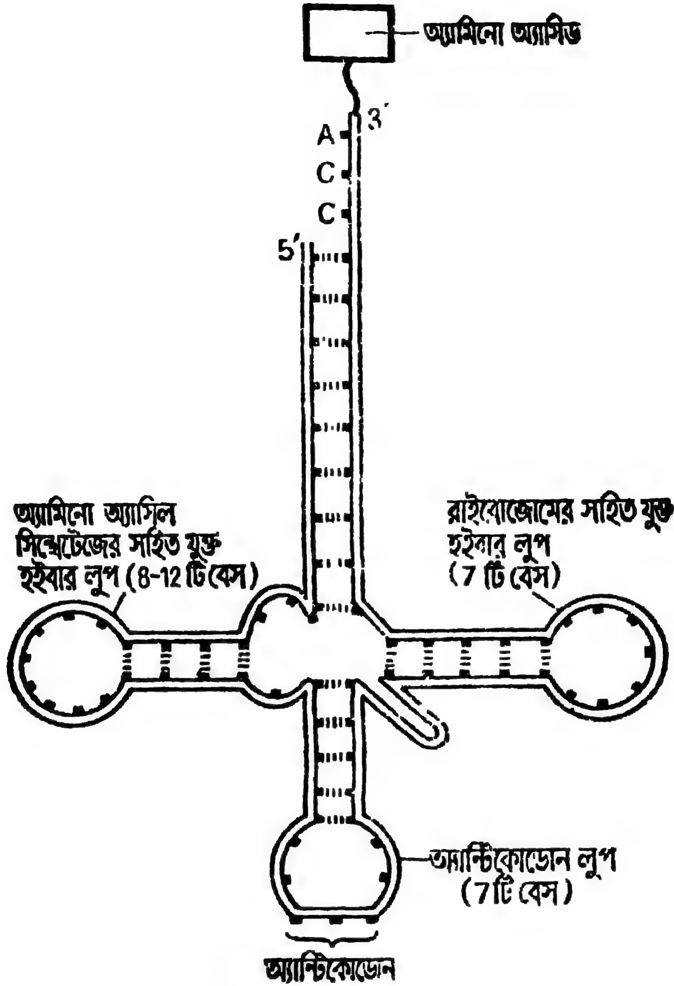
প্রথম অক্ষর	দ্বিতীয় অক্ষর: U	দ্বিতীয় অক্ষর: C	দ্বিতীয় অক্ষর: A	দ্বিতীয় অক্ষর: G	তৃতীয় অক্ষর
U	UUU, UUC } Phe UUA, UUG } Leu	UCU, UCC, UCA, UCG } Ser	UAU, UAC } Tyr UAA† UAG†	UGU, UGC } Cys UGA** UGG Tryp	U C A G
C	CUU, CUC, CUA, CUG } Leu	CCU, CCC, CCA, CCG } Pro	CAU, CAC } His CAA, CAG } GluN	CGU, CGC, CGA, CGG } Arg	U C A G
A	AUU, AUC, AUA } Ileu AUG* Met	ACU, ACC, ACA, ACG } Thr	AAU, AAC } AspN AAA, AAG } Lys	AGU, AGC } Ser AGA, AGG } Arg	U C A G
G	GUU, GUC, GUA, GUG* } Val	GCU, GCC, GCA, GCG } [illegible]	[illegible], [illegible] } Asp GAA, GAG } Glu	GGU, GGC, GGA, GGG } [illegible]	U C A G

২৫৭নং চিত্র—জেনেটিক কোড অভিধান। তিনটি করিয়া বেস লইয়া একটি কোড গঠিত হয়। সর্বমোট ৬৪টি কোড ২০ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য নির্দিষ্ট। *প্রোটিন শৃঙ্খল সূচনাকারী কোডন; †, ** শৃঙ্খল সমাপ্তি কোডন।

এক একটি “কোডকে” কোডন বলা হয়) অনুসারে অর্থাৎ কোডনের (codon) ক্রম অনুসারে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড ট্রান্সফার RNA দ্বারা বাহিত হইয়া রাইবোজোমের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত হয় এবং পরিশেষে নির্দিষ্ট প্রোটিন গঠিত হয়।

mRNA হইতে tRNA-এর গঠনে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। mRNA একটি সোজা শৃঙ্খল যাহার প্রতিটি বেস মুক্ত থাকে। কিন্তু tRNA যদিও একটি শৃঙ্খল দ্বারা গঠিত, তথাপি তাহা দ্বিশৃঙ্খলের ন্যায় আকৃতি গঠন করে। ইহাকে একটি ভাঁজ করা সুতার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে (২৫৮নং চিত্র)। বাঁকের দিকে তিনটি বেস মুক্ত থাকে তাহাকে অ্যান্টিকোডন (anticodon) বলে। এই অ্যান্টিকোডনের সাহায্যে ইহা mRNA-

র উপর অবস্থিত কোডনের সহিত যুক্ত হয়। tRNA-এর যে প্রান্তে অ্যান্টিকোডন থাকে াহার বিপরীত প্রান্ত মুক্ত হয় এবং ঐ প্রান্তে সে একটি অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করে।



২৫৮নং চিত্র—ট্রান্সফার আর এন এ (tRNA)-এর গঠন নমুনা

প্রকৃত পক্ষে এই দশা প্রথম দশা অপেক্ষা অনেক বেশী জটিল। ইহা সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। পর পর কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাপে এই দশাটি সম্পূর্ণ হয়। উহাদের নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

(i) অ্যামিনো অ্যাসিডের সক্রিয়তা (*Activation of amino acids*)—অ্যামিনো অ্যাসিড প্রথমে অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেটের (ATP) সহিত যুক্ত হইয়া সক্রিয় হয়। ইহার ফলে একটি অত্যন্ত সক্রিয় যৌগ অ্যামিনো অ্যাসিল অ্যাডিনাইলেট গঠিত হয়। যে উৎসেচক এই যৌগটি সৃষ্টি করে তাহা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট (highly specific)। সুতরাং প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য এক-একটি নির্দিষ্ট উৎসেচক কার্য করে। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

উৎসেচক + অ্যামিনো অ্যাসিড + ATP →

উৎসেচকের সহিত যুক্ত অ্যামিনো-অ্যাসিল অ্যাডিনাইলেট + PP (অজৈব ফসফেট)

(ii) **ট্রান্সফার RNA দ্বারা বাহিত হইয়া অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রোটিন অণু গঠনে সামিল হওয়া** (*Incorporation of amino acids into protein molecule via tRNA*)—উৎসেচকের সহিত যুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিডের জটিল যৌগটি একটি নির্দিষ্ট (specific) tRNA-এর সহিত যুক্ত হয়। এই সময় অ্যামিনো অ্যাসিডের সক্রিয়তা সৃষ্টিকারী উৎসেচকটি (যাহাকে এক্ষণে অ্যামিনো অ্যাসিল tRNA সিন্থেটেজ নামে অভিহিত করা হয়) দুইভাবে কার্য করে, যেমন (i) একদিকে অ্যামিনো অ্যাসিড ও ATP-কে একত্রে যুক্ত করা এবং অন্যদিকে, (ii) শুধুমাত্র অ্যামিনো অ্যাসিডকে tRNA-এর সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া।

উৎসেচকের সহিত যুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিল অ্যাডিনাইলেট + tRNA →
অ্যামিনো অ্যাসিড-tRNA + উৎসেচক + AMP

সুতরাং প্রোটিন সংশ্লেষে tRNA এর প্রধানত দুইটি ভূমিকা দেখা যায় ; একদিকে একটি অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করিয়া আনা এবং অন্য দিকে রাইবোজোমের সহিত যুক্ত হইয়া mRNA-এর উপর অবস্থিত নির্দিষ্ট কোডনের উপর বসা।

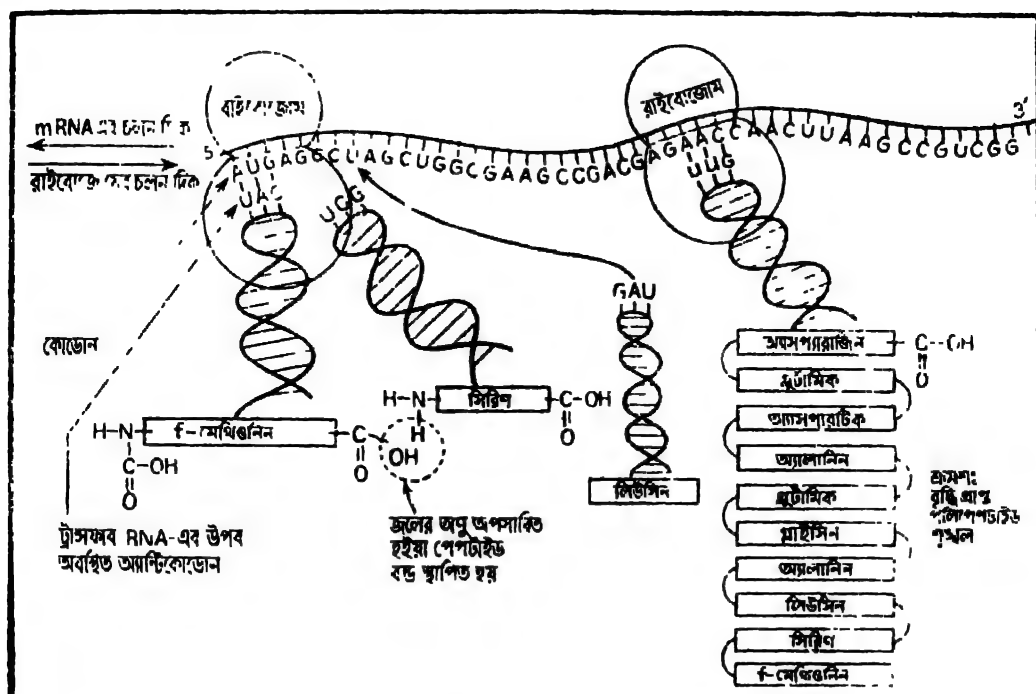
এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, উৎসেচকের ন্যায় tRNA-এও বিশেষভাবে নির্দিষ্ট থাকে। সুতরাং 20টি অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য কমপক্ষে 20টি tRNA থাকিতে হইবে। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য একাধিক tRNA কার্য করিতেছে (২৫৭নং চিত্র)। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না যে একটি বিশেষ tRNA একাধিক অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করিতেছে।

পেপটাইড লিঙ্কেজ গঠনে রাইবোজোম ও mRNA-এর ভূমিকা (Role of ribosomes and mRNA in the formation of peptide bond) :

শৃঙ্খল গঠনের সূচনা (*Initiation of chain*)— পলিপেপ্‌টাইড শৃঙ্খল গঠনের সূচনা সকল ক্ষেত্রেই অ্যামিনো অ্যাসিড মেথিওনিন দ্বারা ঘটিয়া থাকে কোডন AUG (কয়েকটি বিরল ক্ষেত্রে GUG)। অ্যামিনো অ্যাসিড মেথিওনিনের জন্যে নির্দিষ্ট। এই কোডনটি সকল mRNA-এর শুরুতে থাকে। প্রোক্যারিওটিক কোষে মেথিওনিনটি ফরমাইলেটেড হইয়া থাকে। কিন্তু ইউক্যারিওটিক কোষে সূচনার অ্যামিনো অ্যাসিড (মেথিওনিন) ফরমাইল যুক্ত হইতে পারে না, কারণ সেখানে উপযুক্ত $tRNA\left(tRNA_f^{met}\right)$ অনুপস্থিত।

শৃঙ্খল গঠন (*Chain formation*)— DNA হইতে উৎপন্ন হইয়া mRNA সাইটোপ্লাজমে চলিয়া আসে এবং সেখানে প্রোটিন অণু উৎপাদন শুরু করে। প্রথমে উহার একপ্রান্ত (5' প্রান্ত) একটি রাইবোজোমের সহিত যুক্ত হয় এবং নির্দিষ্ট tRNA (ইউক্যারিওটিক কোষে $tRNA^{met}$ যাহা শুধুমাত্র মেথিওনিন বহন করে) একটি নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করিয়া রাইবোজোমের বৃহৎ অংশে মিলিত হ

(রাইবোজোম তাহার ক্ষুদ্র অংশে mRNA-এর সহিত যুক্ত থাকে) এবং তাহার অ্যান্টিকোডনের সাহায্যে mRNA-এর কোডনের সহিত যুক্ত হয়।* (২৫৯নং চিত্র) ার পর রাইবোজোম ও mRNA পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে এবং দ্বিতীয় একটি নির্দিষ্ট tRNA একটি নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করিয়া আনিয়া প্রথম tRNA-এর পাশের কোডনের সহিত যুক্ত হয়।



২৫৯নং চিত্র—প্রোক্যারিওটিক কোষে mRNA-এর উপর রাইবোজোম ও tRNA-এর সাহায্যে পলিপেপ্‌টাইড্‌ শৃঙ্খল গঠনের একটি নকশা চিত্র

অতঃপর, কমপক্ষে দুইটি উৎসেচক ও একটি অত্যন্ত সক্রিয় ও ক্ষমতাসম্পন্ন অণু, গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেটের (guanosine triphosphate or GTP) সাহায্যে প্রথম tRNA দ্বারা বাহিত অ্যামিনো অ্যাসিডটি অপসারিত হইয়া দ্বিতীয় tRNA দ্বারা বাহিত অ্যামিনো অ্যাসিডের সহিত পেপটাইড বণ্ড দ্বারা যুক্ত হয়। প্রথম tRNAটি-মুক্ত হইয়া রাইবোজোম হইতে সরিয়া যায়। এই সময় রাইবোজোম ও mRNA পুনরায় পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন করে এবং নূতন আর একটি tRNA (অ্যামিনো

* কোডন অ্যান্টিকোডন মিলন নিউক্লিক অ্যাসিডের বেস যুগল যুক্ত হইবার নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যদি কোডন UUU হয় তাহা হইলে সেই স্থলে একমাত্র অ্যান্টিকোডন AAA বিশিষ্ট tRNA যুক্ত হইতে পারিবে।

রাইবোজোমের ভূমিকা : প্রোটিন সংশ্লেষে রাইবোজোমের ভূমিকা সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত যাহা জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে রাইবোজোম তাহার ক্ষুদ্র অংশের (smaller subunit) সাহায্যে mRNA-এর সহিত যুক্ত হয়। এই অংশের প্রোটিনের সহিত mRNA-এর ফসফেট গ্রুপের সংযোগ স্থাপন হয়। রাইবোজোমের অবশিষ্ট বৃহৎ অংশের (larger subunit) সহিত ঐ ধরনের সংযোগ tRNA-এর সহিত স্থাপিত হয়।

অ্যাসিড সহ) তৃতীয় কোডনের সহিত যুক্ত হয়। সেই সময় পূর্বেকার tRNA তাহার দুই ট সংযুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিডের শৃঙ্খলকে নূতন tRNA অণুতে স্থানান্তরিত করিয়া নিজে সরিয়া যায়।

এইরূপে mRNA ও রাইবোজোমের পারস্পরিক স্থান পরিবর্তনের সাথে পরবর্তী কোডন নূতন tRNA-এর নিকট লভ্য হয়। ফলে নূতন tRNA ঐ স্থানে আসিয়া বসিতে পারে। যাহাই হউক, যখন একটি রাইবোজোম mRNA উপর দিয়া প্রোটিন অণু গঠন করিতে করিতে শেষ প্রান্তের (3' প্রান্ত) দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন mRNA-এর অগ্রভাগ মুক্ত হয় এবং সেইস্থলে আর একটি রাইবোজোম যুক্ত হইয়া নূতন প্রোটিন অণু গঠন করিতে থাকে। সুতরাং একটি mRNA অণুর উপর একই সময়ে একাধিক রাইবোজোম কার্য করিয়া একাধিক একই প্রকৃতির প্রোটিন অণু গঠন করিয়া থাকে।

পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের শেষ (*Termination of polypeptide chain*)—প্রোটিন অণু গঠন করিতে করিতে রাইবোজোম ক্রমশ mRNA-এর শেষ প্রান্তে (3' প্রান্ত) আসিয়া উপস্থিত হয়। mRNA-এর শেষ প্রান্তে UAG, UGA অথবা UAA এই তিনটি কোডনের যে-কোন একটি উপস্থিত থাকে (২৫৭নং চিত্র)। এই কোডন শৃঙ্খলের শেষ নির্দেশ করে। R_1 ও R_2 নামক দুইটি ফ্যাকটর পলিপেপটাইড শৃঙ্খলকে সর্বশেষ RNA হইতে মুক্ত করিতে সাহায্য করে। সকল কার্য সমাধা হইলে, মুক্ত পলিপেপটাইড শৃঙ্খলটি নির্দিষ্ট প্রোটিন অণু গঠন করে এবং রাইবোজোম mRNA হইতে মুক্ত হইয়া অপসারিত হয়।

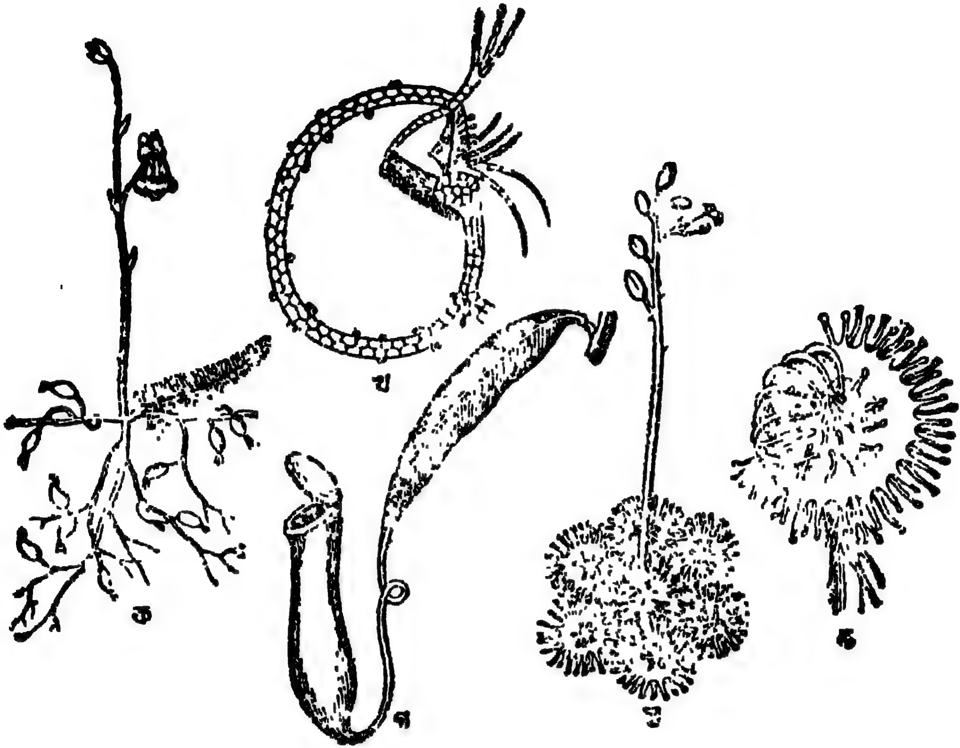
নাইট্রোজেন সংগ্রহের বিশেষ প্রণালী (Special means of obtaining nitrogen)

উদ্ভিদ জগতে এইরূপ কতকগুলি উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা তাহাদের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন প্রাণীদেহ হইতে সংগ্রহ করে। ইহাদের পতঙ্গভুক উদ্ভিদ (Insectivorous plants) বলা হয়। পতঙ্গভুক উদ্ভিদ নানা প্রকার ফাঁদের সাহায্যে পতঙ্গ ধরিয়া তাহাদের দেহ হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। যথা— কলস উদ্ভিদ (Pitcher plant), ঝাঁঝি (Bladderwort), সূর্যশিশির (Sundew) প্রভৃতি (২৬০নং চিত্র)। মনে রাখিবে, যে স্থানে স্বল্প নাইট্রোজেন থাকে তথায় এইপ্রকার উদ্ভিদ জন্মায়। ইহাদের স্বভোজী উদ্ভিদের ন্যায় পাতা ও মূল থাকে।

কলস উদ্ভিদ (Nepenthes or Pitcher plant)

এই প্রকার উদ্ভিদ সাধারণত আসামের খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, গারো প্রভৃতি পর্বতে জন্মায়। ইহার ফলক কলসের ন্যায় আকৃতিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। পাতার অগ্রভাগ কলসীর ঢাকনা গঠন করে। কলসীটি যখন পতঙ্গ ধরিবার উপযুক্ত হয়

তখন ঢাকনাটি উজ্জ্বল বর্ণের হয়। কীটপতঙ্গ উহার বর্ণে আকৃষ্ট হইয়া কলসীর উপরে আসিয়া বসে। কলসীর কিনারায় মিষ্টরস পান করিয়া ভাবে যে কলসীর ভিতরে আরও মিষ্টরস আছে। তখন উহা পাইবার জন্য কলসীর ভিতরে যাইবার চেষ্টা করে। এই সময় কলসীর ভিতরের গাত্রে যে পিচ্ছিল রোম থাকে তাহাতে পিছলাইয়া ডুবিয়া মরে। পরে কলসীর ভিতরের গাত্রস্থিত গ্রন্থি হইতে পাচকরস (engyme) নিঃসৃত হইয়া পতঙ্গের দেহ দ্রবীভূত করে। তখন কলস উদ্ভিদ উহা হইতে নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ শোষণ করে।



২৩০নং চিত্র —পতঙ্গভুক উদ্ভিদ (ক) ঝাঁঝি ; (খ) ঝাঁঝির একটি পোকা ধরার থলির লম্বচ্ছেদ, (গ) কলস উদ্ভিদের একটি কলস ; (ঘ) সূর্যশিশির (ঙ) সূর্যশিশির উদ্ভিদের একটি পোকা ধরার ফাঁদ

সূর্যশিশির (Drosera or Sundew)

ইহাকে শীতকালে প্রধানত বর্ধমান অঞ্চলে মাটির উপর জন্মাইতে দেখা যায়। উহার পাতা চামচের মত উহার উপর অনেক লাল রঙের কর্ষিকা (tentacles) আছে। প্রত্যেক কর্ষিকার আগা হইতে বিন্দুর মত তরল পদার্থ বাহির হয়। প্রত্যুষে যখন সূর্যের রশ্মি ইহার উপরে পড়ে তখন ইহা চকচক্ করিতে থাকে। তৃষ্ণার্ত কীটপতঙ্গ ইহা পান করিবার জন্য পাতার উপর আসিয়া বসে। তখন কর্ষিকাগুলি ঝুঁকিয়া পতঙ্গের উপরে বসে এবং উহাকে আবদ্ধ করে। পতঙ্গটি পালাইবার যত চেষ্টা করে ততই উহা কর্ষিকার দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়। পরে কর্ষিকাগুলি হইতে এনজাইম নিঃসৃত হইয়া পতঙ্গকে দ্রবীভূত করে। উদ্ভিদ এই দ্রবণ হইতে নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া থাকে।

ঝাঁঝি (Utricularia or bladderwart)

ইহা এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ। আমাদের দেশে পুরাতন পুকুরে জন্মাইতে দেখা যায়। ইহার নিমজ্জিত পাতাগুলি সুতার মত সরু সরু অংশে খণ্ডিত হয়। কয়েকটি খণ্ডিত অংশ থলি গঠন করে। প্রত্যেক থলির মুখে এক গোছা রোম ও ফাঁদ দুয়ার (trap door) আছে। ফাঁদ দুয়ারটি কেবলমাত্র ভিতরের দিকে খোলা যায়। ছোট ছোট জলজ কীটপতঙ্গ থলিকে সুন্দর অবস্থান মনে করিয়া ফাঁদ দুয়ার ঠেলিয়া থলির মধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু আর বাহিরে আসিতে পারে না। এই প্রকারে পতঙ্গটি থলির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে। এখন থলির ভিতরকার গাত্রের গ্রন্থি হইতে এনজাইম নিঃসৃত হইয়া পতঙ্গকে দ্রবীভূত করে। উদ্ভিদ এই দ্রবণ হইতে নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া থাকে।

১১

উদ্ভিজ্জ হরমোন
(Phytohormones)

উদ্ভিদের বৃদ্ধি একটি গতিময় ও জটিল প্রক্রিয়া, তথাপি ইহা কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে আবদ্ধ। অর্থাৎ একটি অঙ্গের অথবা একটি সম্পূর্ণ উদ্ভিদের বৃদ্ধি একীভূত হইয়া এবং সমন্বয় সাধন করিয়া ঘটিয়া থাকে। বর্তমানে ইহা জানা গিয়াছে যে, যদি অন্যান্য শর্তগুলি অপরিবর্তিত থাকে তবে উদ্ভিদের অধিকাংশ বিপাক-ক্রিয়া কতকগুলি বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। এই সকল রাসায়নিক দ্রব্যগুলিকে বলা হয় **হরমোন** (*hormones*) বা **রাসায়নিক দূত** (*chemical messengers*), **বৃদ্ধি কারক বস্তু** (*growth substances*) বা **বৃদ্ধি নিয়ামক** (*growth regulators*)। সংজ্ঞা হিসাবে বলা যাইতে পারে, যে রাসায়নিক দ্রব্য অতি অল্প পরিমাণে উদ্ভিদের কোন এক অঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় এবং অপর কোন অঙ্গে স্থানান্তরিত হইয়া তাহার প্রভাব বিস্তার করে তাহাকে হরমোন বলে। উদ্ভিদের হরমোন তত্ত্বকে অনেক সময় এণ্ডোক্রাইনোলজি (endocrynology)-ও বলা হয়। যদিও উদ্ভিদ দেহে কোন এণ্ডোক্রাইন গ্ল্যাণ্ড (endocryne gland) দেখা যায় না, তথাপি ইহা সত্য যে কিছু কিছু কোষ সমষ্টিগত ভাবে এই হরমোন সংশ্লেষের জন্য দায়ী।

উদ্ভিদদেহে যে সকল বৃদ্ধি কারক বস্তু পাওয়া যায় কার্যের ভিত্তিতে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যায়।

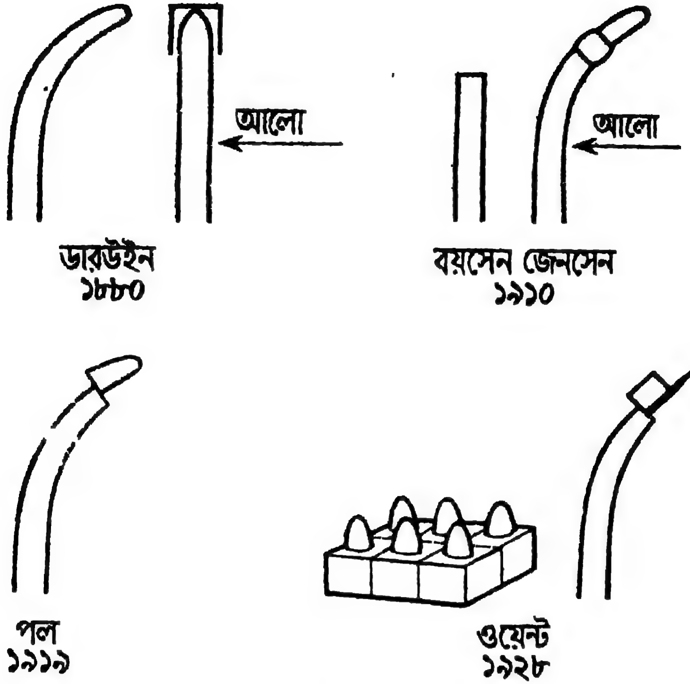
উদ্ভিজ্জ হরমোন

বৃদ্ধি সহায়ক	বৃদ্ধি রোধক
1. অক্সিন (auxin)	1. অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (Abscissic acid)
2. জিববারেলিন (gibberellin)	2. ইথিলীন (Ethylene)
3. সাইটোকাইনিন (Cytokinin)	

বৃদ্ধি সহায়ক হর্মোন (Growth promoting hormones)

উদ্ভিদের বৃদ্ধি যে হর্মোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেই মৌলিক ধারণা চার্লস ডারউনের (Charles Darwin) সর্বোৎকৃষ্ট গবেষণা হইতে উদ্ভূত। 1880 খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর "The power of movement of plants" পুস্তকে উদ্ভিদের আলোক ও অভিকর্ষ-জনিত প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাখ্যা করেন। উহার মধ্যে একটি অতি সূক্ষ্ম নিরীক্ষা হইল যে ঘাসের চারার আলোকের দিকে বাঁকিয়া যাওয়া। ঘাসের আলোকাভিমুখী চলন ঐ গাছেরই অন্তিম অগ্রভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি উহার অগ্রভাগ একটি অস্বচ্ছ ঢাকনি দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া যায় তবে চারাগাছটির আলোক সংবেদনশীলতা লোপ পায়। অর্থাৎ উহা তখন আলোকের

দিকে বাঁকিয়া যাওয়ার ক্ষমতা হারায়। ইহার বহু বৎসর পরে 1910 খ্রীষ্টাব্দে বয়সেন জেন্‌সেন্ (Boysen Jensen) কলিওপটাইলের অগ্রভাগ কাটিয়া পুনরায় জিলেটিন দ্বারা উহার উপর স্থাপন করিয়া দেখিলেন যে চারাগাছটির তখনও আলোক সংবেদনশীলতা বজায় রহিয়াছে (২৫৯নং চিত্র)। কিন্তু যদি অগ্রভাগটি সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করা হয়, তাহা হইলে উহা আর আলোকের দিকে বাঁকিতে পারে না। এই পরীক্ষা হইতেই বোঝা



২৫৯নং চিত্র—কোলিওপটাইল পরীক্ষা

গেল যে, কোন একটি উত্তেজক পদার্থ নিশ্চয় অগ্রভাগে উৎপন্ন হয়, যাহা উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। 1919 খ্রীঃ পল (Paal)-এর পরীক্ষা হইতে ইহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি আলোক বক্রতার পরিবর্তে কলিওপটাইলের অগ্রভাগ কাটিয়া উহাকে পুনরায়, কোলিওপটাইলেরই একপার্শ্বে স্থাপন করেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে অন্ধকারের মধ্যেই যেদিকে অগ্রভাগটি স্থাপন করা হইয়াছিল তাহার বিপরীত দিকে উদ্ভিদ চারাটি বাঁকিয়া যাইতেছে। এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কলিওপটাইলের অগ্রভাগ হইতে এমন কোন বৃদ্ধি সহায়ক বস্তু নিঃসৃত হয় যাহা নীচের দিকে ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানান্তরিত হইয়া দেহের বৃদ্ধি ঘটায় যাহার ফলে বক্রতার সৃষ্টি হয়।

বক্রতা সৃষ্টির কারণ হইল অসমবৃদ্ধি। তাহা হইলে প্রশ্ন হইল আলোক বক্রতার ক্ষেত্রে কিরূপে এই অসম বৃদ্ধি সম্ভব? যখন কোন বিটপের অগ্রভাগ কোন দিকে বাঁকিয়া যায় তখন বুঝিতে হইবে যে বিটপটি যে দিকে বাঁকিয়া যাইতেছে তাহার বিপরীত দিকের অংশের কোষগুলির দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এইরূপে হইবার কারণে বলা হয় যে কোলিওপটাইলের যে পার্শ্ব আলো পায় তাহার বিপরীত পার্শ্বে বৃদ্ধি সহায়ক

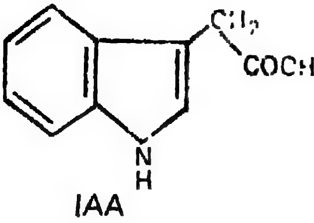
বস্তুর ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়, ফলে ঐ দিকে বৃদ্ধির হার বেশী হয় এবং আলোর দিকে বাঁকিয়া যায়। বিজ্ঞানী ওয়েন্ট (F F. Went) 1982 খ্রীষ্টাব্দে জইগাছের কলিওপটাইল (Avena coleoptile) লইয়া তাঁহার বিখ্যাত আগার ব্লক পরীক্ষা সম্পাদন করেন। তিনি কতকগুলি জই গাছের অগ্রভাগ ছেদন করিয়া তিন শতাংশ আগার দ্রবণের পাতলা স্তরের (যাহা পূর্বেই প্রস্তুত করিয়াছিলেন) উপর উহাদের স্থাপন করিলেন। পরে আগার স্তরের উপর হইতে কোলিওপটাইলের অগ্রভাগগুলি অপসারিত করিয়া কতকগুলি সম-আয়তন বিশিষ্ট ক্ষুদ্র আগার ব্লক (agar block) প্রস্তুত করিলেন। এখন আগার ব্লকগুলিকে কর্তিত কোলিওপটাইলের উপর স্থাপন করিয়া দেখিলেন যে অপসারিত অংশের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ইহা এক পার্শ্বে বাঁকিয়া যাইতেছে। তিনি ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে কর্তিত কোলিওপটাইলের একপার্শ্বে ব্লকগুলি রাখিলেই ঐ পার্শ্বটি বাঁকিয়া যায়।

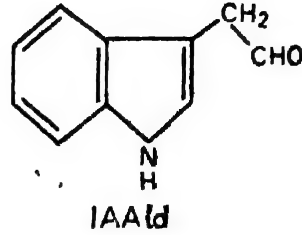
এই পরীক্ষার সাহায্যে ওয়েন্ট তুলনামূলক ভাবে দেখান যে একপার্শ্বীয় আলোক প্রাপ্ত কোলিওপটাইলের আলোক পার্শ্ব অপেক্ষা অন্ধকার পার্শ্বে বৃদ্ধি সহায়ক বস্তুর ঘনত্ব প্রায় দ্বিগুণ থাকে। এই পরীক্ষায় তিনি কোলিওপটাইলের অগ্রভাগকে লম্বালম্বি ভাবে দ্বিখণ্ডিত করিয়া নির্দিষ্ট সময় ধরিয়া পৃথকভাবে দুইটি আগার ব্লকের উপর স্থাপন করিলেন। অতঃপর উক্ত আগার ব্লক দুইটিকে পৃথকভাবে দুইটি কর্তিত কোলিওপটাইলের একপার্শ্বে স্থাপন করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে আলোক প্রাপ্ত বা আলোকের দিকে অবস্থিত খণ্ডটি যে আগার ব্লকের উপর স্থাপন করা হইয়াছিল সেই আগার ব্লকটি হইতে ব্যাপিত বৃদ্ধি সহায়ক বস্তু যত ডিগ্রী বক্রতার সৃষ্টি করে, অন্ধকার পার্শ্বের খণ্ডটি হইতে ব্যাপিত বৃদ্ধি সহায়ক বস্তু তাহার দ্বিগুন বক্রতার সৃষ্টি করে।

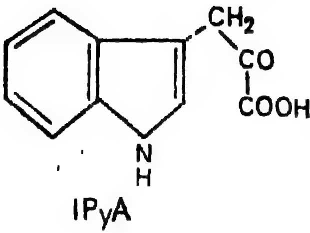
পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, এই বৃদ্ধিকারক বস্তু সকল উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের দেহে বর্তমান থাকে, এবং প্রয়োগে একই প্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদে ইহার ভূমিকা সুস্পষ্ট নয়। এইরূপে সমকার্যক্ষম একটি জটিল যৌগমণ্ডলী আবিষ্কৃত হয়। এই যৌগগুলিকে একত্রে বলা হয় অক্সিন (auxin)—উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী হর্মোন।

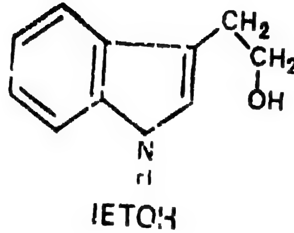
রাসায়নিক প্রকৃতি (*Chemical nature of hormone*)—অক্সিন নিষ্কাশিত ও পৃথকীকরণ দ্বারা উহার রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ধারণ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু অসুবিধা হইল উদ্ভিদের দেহে উহার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প, যাহার ফলে প্রাথমিক স্তরে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিন যৌগ পৃথক করিয়া কেলাসিত করা সম্ভব হয় নাই। 1935 খ্রীষ্টাব্দে থিম্যান (Thimann) রাইজোপাস সুইনাস (*Rhizopus suinus*) নামক একটি ছত্রাকের দেহ হইতে এবং হ্যাজেন স্মিট (Haagen Smit 1942) ভুট্টার বীজ হইতে অক্সিন কেলাসিত করিয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেন

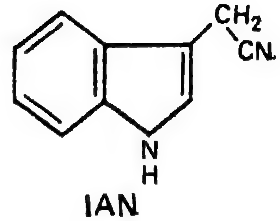
যে উহা প্রকৃতপক্ষে ইনডোল—3—অ্যাসিটিক অ্যাসিড (Indole—3—acetic acid or IAA)











২৬০নং চিত্র—বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক হরমোন

বর্তমানে ইহা নির্দিষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইনডোল-3-অ্যাসিটিক অ্যাসিড সার্বজনীন ভাবে প্রায় সকল উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদেই পাওয়া যায় এবং ইহা একটি প্রধান অক্সিন হর্মোন।

IAA ব্যতীত উদ্ভিদ দেহে সমকার্যক্ষম কিছু যৌগ পাওয়া গিয়াছে। যেমন, ইনডোল-3-অ্যাসিটাল্ডিহাইড (indole—3—acetaldehyde, or IAAld), ইনডোল-3-পাইরুভিক অ্যাসিড (indole-3-pyruvic acid, or IPyA), ইনডোল-3-অ্যাসিটোনাইট্রাইল (indole 3-acetonitrile, or IAN), এবং ইনডোল-3-ইথানল (indole-3-ethanol, or IEtOH) ইত্যাদি (২৬০নং চিত্র)। এই সকল যৌগগুলি উদ্ভিদ দেহে প্রয়োগ করিলে কমবেশী একই ধরনের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। তবে ইহা সত্য যে এই সকল যৌগগুলি উৎসেচক দ্বারা IAA-তে পরিণত হয় বলিয়া একই ধরনের কার্য করিতে সক্ষম। এই অক্সিন যৌগগুলি উদ্ভিদের দেহে পাওয়া যায় বলিয়া উহাদিগকে প্রাকৃতিক অক্সিন (natural auxin) বলা হয়। ইহাদের যৌগ প্রকৃতি অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) অ্যাসিডিক অক্সিন (acidic auxin) এবং (খ) নিউট্রাল অক্সিন (neutral auxin)।

আবার, কতকগুলি রাসায়নিক যৌগ আছে যেগুলি উদ্ভিদ দেহে পাওয়া যায় না অথচ অক্সিনের ন্যায় কার্য করিতে সক্ষম, সেই সকল যৌগগুলিকে কৃত্রিম অক্সিন (synthetic auxin) বলা হয় ; যেমন, ইনডেন-3,অ্যাসিটিক অ্যাসিড (indene-3-

acetic acid), বেনজোফিউরেন-3-অ্যাসিটিক অ্যাসিড (benzofurane-3-acetic acid), ন্যাপথালিন-1-অ্যাসিটিক অ্যাসিড (napthalene-1-acetic acid), ইনডোল-3-বিউটিরিক অ্যাসিড (indole-3-butyric acid), 2,4 ডাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড (2, 4-dichlorophenoxy acetic acid or 2, 4-D), 2, 4, 5-ট্রাই-ক্লোরোফেনক্সি বিউটিরিক অ্যাসিড (2, 4, 5-trichlorophenoxy butyric acid or 2, 4, 5-T) ইত্যাদি।

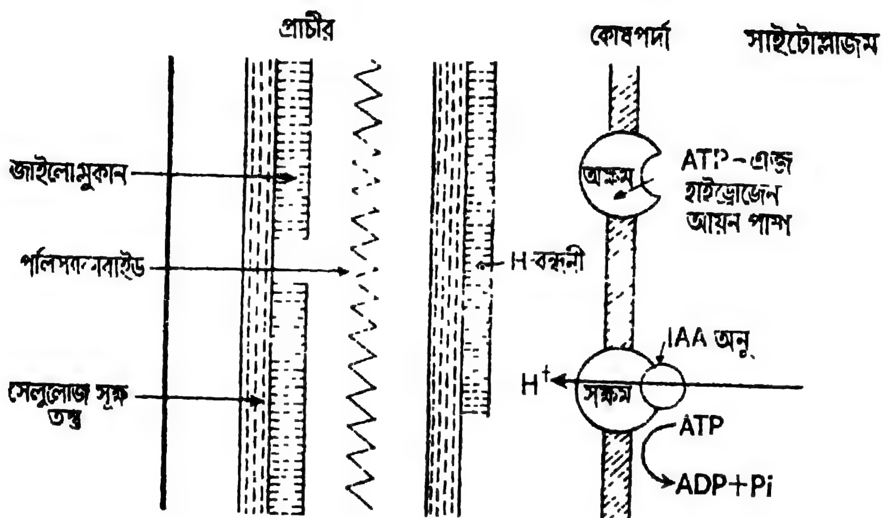
অক্সিনের কার্য প্রণালী (The mode of action of auxin)

অক্সিনের কার্য প্রণালী প্রকৃতপক্ষে আজও সম্পূর্ণ জানা সম্ভব হয় নাই। তথাপি নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এই ধারণা করা সম্ভব হইয়াছে যে অক্সিন মূলত কোষ প্রাচীরের প্রসারণ ঘটাইয়া থাকে। বিভাজনের পর অপত্য কোষগুলির সমষ্টিগত প্রসারণই বৃদ্ধির প্রাথমিক স্তর। যেহেতু উদ্ভিদ কোষের চারিদিকের প্রাচীরটি একটি মৃত ও দৃঢ় কাঠাম, সেইহেতু কোষের প্রসারণের পূর্বে প্রাচীরের প্রসারণের প্রয়োজন। কোষ-প্রাচীর প্রধানত সেলুলোজের সূক্ষ্মতন্তু দ্বারা গঠিত (গ্লুকোজ অণুর পলিমার)। অনেকগুলি গ্লুকোজ অণু পরস্পর যুক্ত হইয়া সেলুলোজ তন্তু গঠন করে। সেলুলোজের এই সূক্ষ্ম তন্তুগুলি আবার নিজেদের মধ্যে আড়াআড়ি ভাবেও যুক্ত হয় ; এই সকল লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি বন্ধনী থাকার জন্য সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত হয়। সেলুলোজ ছাড়া কোষ প্রাচীরে হেমি-সেলুলোজ, পেক্‌টিক অ্যাসিড ও অন্যান্য যৌগ বস্তু থাকে। অক্সিন প্রভাবিত কোষ বৃদ্ধিতে প্রধানত এই সকল বন্ধনীগুলি ভাঙ্গিয়া যায় বা পরিবর্তিত হয়। ফলে, কোষপ্রাচীর খুব নরম ও প্রসারণের উপযোগী হইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অক্সিন প্রভাবিত কোষ বৃদ্ধিতে মূলত দুইটি জিনিসের প্রয়োজন, যথা, (ক) বিপাক ক্রিয়া ও (খ) চাপ।

অক্সিন প্রয়োগের পর নানাবিধ বিপাক নিরোধক (metabolic inhibitors) পদার্থ প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহাতে কোষের প্রসারণ সম্ভব হয় না। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে কোষ প্রসারণের প্রারম্ভে বন্ধনীগুলি ভাঙ্গার জন্য বিপাক ক্রিয়ার প্রয়োজন। ইহা ছাড়া অক্সিন প্রযুক্ত কোষে রসস্ফীতির চাপ সকল সময় অধিক মাত্রায় থাকে যাহা কোষ-প্রাচীরের উপর ক্রিয়া করে এবং নরম প্রাচীরকে প্রসারিত করিয়া তোলে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে অক্সিন কতকগুলি জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাইয়া কোষ প্রাচীরের আড়াআড়ি বন্ধনীগুলি ভাঙ্গিয়া পরিবর্তিত করে যাহা পরে রসস্ফীতির চাপের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া প্রসারিত হয়।

অক্সিন কতকগুলি উৎসেচকের সাহায্যে বন্ধনীগুলি ভাঙ্গিয়া থাকে। উৎসেচকগুলি হইল, সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ ইত্যাদি ; উৎসেচকগুলি অ্যাসিড মাধ্যমে কার্য করিয়া

থাকে। প্রাচীর প্রান্তে অ্যাসিড মাধ্যম প্রস্তুত করে কোষ পর্দায় অবস্থিত অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফাটেজ (ATP-ase) নামক উৎসেচক। ইহাকে ATP-ase হাইড্রোজেন আয়ন পাম্প (ATP-ase H^+ ion pump) বলা হয়। ইহা কোষস্থিত সাইটোপ্লাজম হইতে H^+ আয়ন পাম্প করিয়া প্রাচীরের দিকে পাঠায়, ফলে প্রাচীর প্রান্তে H^+ আয়নের আধিক্য ঘটে এবং মাধ্যম অ্যাসিডিক হইয়া পড়ে। উপরিউক্ত হাইড্রোজেন আয়ন পাম্প অক্সিন অণু ব্যতীত কার্য করিতে পারে না। অক্সিন অণু ঐ উৎসেচকের সহিত যুক্ত হইলে তবে উহা কার্যক্ষম হয়। এবং পাম্প কার্য করিয়া প্রাচীর প্রান্তে অ্যাসিডিক মাধ্যম প্রস্তুত না করিলে সেলুলেজ, হেমিসেলুলেজ ইত্যাদি উৎসেচকগুলি কার্য করিতে পারে না। সুতরাং সকল কার্যই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত যাহার সূচনা করে অক্সিন অণু (২৬১নং চিত্র)।



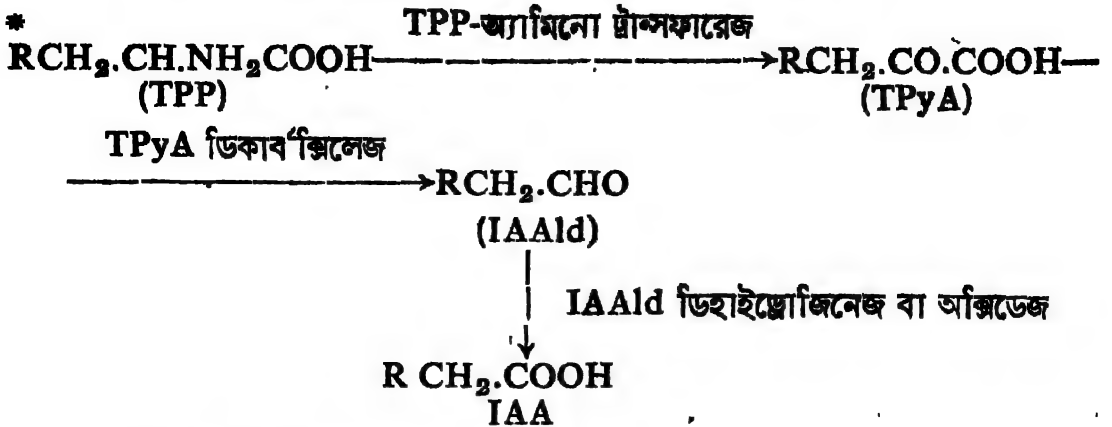
২৬১নং চিত্র—হাইড্রোজেন আয়ন পাম্প

অক্সিন প্রয়োগের সাথে সাথেই কোষের মধ্যে RNA ও প্রোটিন সংশ্লিষ্ট হইতে থাকে। সকল প্রকার RNA যেমন, mRNA, tRNA, rRNA এবং RNA-পলিমারেজ এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সেলুলেজ ও হেমিসেলুলেজ উৎসেচকগুলির সংশ্লেষও বৃদ্ধি পায়।

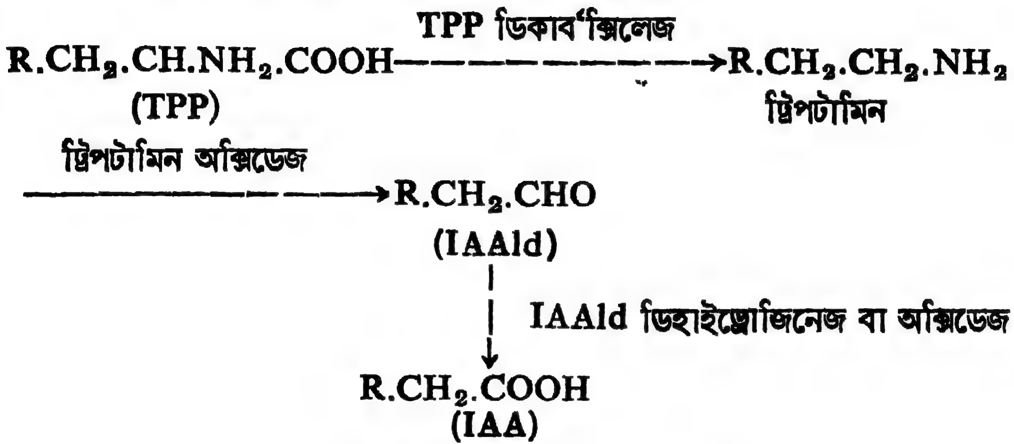
IAA-এর জৈব সংশ্লেষ (Bio-synthesis of IAA)

ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত যে ট্রিপটোফেন (TPP) নামক অ্যামিনো অ্যাসিড হইতে IAA উৎপন্ন হইয়া থাকে। চারি প্রকার বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে TPP হইতে IAA উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দুইটি প্রধান সংশ্লেষ পথ নিম্নে দেখান হইল—

(1) ইনডোল পাইরুভিক অ্যাসিড পথ ঃ



(2) ট্রিপটামিন পথ ঃ



*R = ইনডোল নিউক্লিয়াস. (২৬০নং চিত্র)

অক্সিনের ব্যবহারিক প্রয়োগ (Practical application of auxin)

কোষের প্রসারণ ব্যতীত কৃত্রিম অক্সিনের অন্যান্য জৈবনিক ক্রিয়া-কলাপের উপর বিশেষ ভূমিকা আছে। সেই সকল ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতেই কৃত্রিম অক্সিনকে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন,

(2) অনেক শস্য উদ্ভিদ আছে যেমন, জই, শন ইত্যাদি যাহাদের পর্বমধ্য অত্যন্ত দীর্ঘ ও নরম হওয়ার জন্য ভূমি-শায়িত হইয়া পড়ে। ঐ সকল উদ্ভিদের উপর ∝-ন্যাপথাইল অ্যাসিটামাইড প্রয়োগ করিলে পর্বমধ্যগুলি কাণ্ঠল ও শক্ত হয় এবং ঋজু-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।

(2) নিষেকের পর গর্ভাশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ফলে পরিণত হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় নিষেক ব্যতীত গর্ভাশয় হইতে ফল উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে নিষেক না হইলেও গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়। এই সকল ফলকে বলা হয় পার-

থেনোকারপিক ফল (Perthenocarpic fruit)। পারথেনোকারপিক ফলের বৈশিষ্ট্য হইল ইহা বীজহীন। বীজহীন ফল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত লাভজনক। ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর ল্যানোলীন সহযোগে IAA অথবা IAN প্রয়োগ করিয়া পারথেনো-কারপিক ফল উৎপাদন করা সম্ভব।

(3) উদ্ভিদের দেহে অক্সিনের পরিমাণের ঘাটতি হইলে অনেক সময় দেখা যায়, অপরিণত পাতা বা ফল ঝরিয়া পড়িতেছে। আপেল, ন্যাসপাতি, লেবু ইত্যাদি গাছে এই অপরিণত ফল ও পাতা খসিয়া পড়িতে দেখা যায়। 2, 4-D, IAA, NAA, ইত্যাদি অক্সিনের লঘু দ্রবণ প্রয়োগ করিলে এইরূপ পতন রোধ করা যায়। 2, 4-D প্রয়োগ করিয়া বাঁধাকপির অপরিণত পাতা ঝড়িয়া পড়া বন্ধ করা যায়।

(4) অধিকাংশ উদ্ভিদে দেখিতে পাওয়া যায় যে শুধুমাত্র অগ্রমুকুলের বৃদ্ধি হইতেছে, উহার কাক্ষিক মুকুলগুলি অবিকশিত অবস্থায় থাকিয়া যাইতেছে। যদি অগ্রমুকুলটিকে কাটিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে কাক্ষিক মুকুলগুলি বিকশিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অগ্রমুকুলে অক্সিনের পরিমাণ বেশী থাকায় উহা নিম্নবর্তী মুকুলগুলির বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করে। ইহাকে অগ্রপ্রকটত্ব বা অ্যাপিক্যাল ডমিন্যান্স (apical dominance) বলা হয়। অগ্রমুকুল কাটিয়া লইয়া অক্সিন প্রয়োগ করিলেও দেখা যায় কাক্ষিক মুকুলগুলির বৃদ্ধি হইতেছে না। অক্সিনের এই ধর্মকে কৃষিক্ষেত্রে নানা কাজে লাগান হয়। আলুর কন্দের অগ্রমুকুলে ইনডোল বিউটিরিক অ্যাসিড, α-ন্যাপথালিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং ম্যালিক হাইড্রাজাইড প্রয়োগ করিয়া পার্শ্বমুকুলগুলির বৃদ্ধি বন্ধ করা হয়, অর্থাৎ কন্দের সুপ্ত অবস্থাকে বর্ধিত করা হয়। কারণ, সকল মুকুল-গুলি বর্ধিত হইতে থাকিলে কন্দে সঞ্চিত খাদ্যের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং নষ্ট হইয়া যায়।

(5) আপেল ও ন্যাসপাতি উদ্ভিদে দুই রকমের শাখা দেখা যায়। তন্মধ্যে খর্ব শাখাগুলিতে ফল হয়। যদি লম্বা শাখাগুলির অগ্রভাগে অধিক মাত্রায় α-ন্যাপথেলিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে ঐ শাখাগুলি খর্ব হইয়া পড়ে এবং উহাতে ফল উৎপন্ন হয়। এইভাবে ফল উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

(6) অক্সিনের মূল সৃষ্টির ক্ষমতাকে নার্শারীতে নানা প্রকার উদ্ভিদের অঙ্গজ জননে কাজে লাগান হয়। যে সকল উদ্ভিদের স্বাভাবিক জনন অতি ধীর গতিতে হয়, সেই সকল উদ্ভিদের শাখা কাটিয়া, কর্তিত স্থানে অক্সিন প্রয়োগ করিলে অতি সহজেই অস্থানিক মূল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ফেনিল অ্যাসিটিক অ্যাসিড, α-ন্যাপথালিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড, IAA, 2,4-D ইত্যাদি এই কার্যে ব্যবহৃত হয়।

(7) শস্যক্ষেত্রে আগাছা বিনাশ করা হয় অক্সিন প্রয়োগ করিয়া। বিশেষ মাত্রায় 2,4-D প্রয়োগ করিলে দেখা যায় উগ্র চওড়া পাতা যুক্ত দ্বিবীজপত্রী আগাছাগুলিকে নির্বাচিত করিয়া বিনষ্ট করিতেছে, কিন্তু একবীজপত্রী শস্যের কোন ক্ষতি না করিয়া উহার বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। 2,4-D-এর সহিত 2,4,5-T মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ইহা গাছের উপর ছিটাইয়া অথবা মৃত্তিকার

সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যায়। মৃত্তিকায় প্রয়োগ করিয়া রাখিলে আগাছা গুলিকে বীজ হইতে অঙ্কুরীত হইবা মাত্র বিনষ্ট করে।

(৪) বর্তমানে টিস্যুকালচার (tissue culture) করিয়া গাছের বৃদ্ধি ও বিভিন্ন অঙ্গের উদ্ভব সম্বন্ধীয় নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হইতেছে। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে নানা ভাবে উন্নতমানের উদ্ভিদ তৈয়ারী করার চেষ্টা করা হয়। যে সকল উদ্ভিদের স্বাভাবিক জনন অত্যন্ত ধীর গতিতে হয় অথচ উহাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে সেই সকল উদ্ভিদের টিস্যু কালচার করিয়া জনন হার বাড়ান হয়। যে মাধ্যমে টিস্যু কালচার করা হয় তাহাতে অক্সিন ও সাইটোকাইনিন এই দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য হরমোন। সাধারণত IAA, 2,4-D, IAN এবং NAA এই প্রকার টিস্যু কালচারে ব্যবহৃত হয়।

জিব্বারেলিন (Gibberellin)

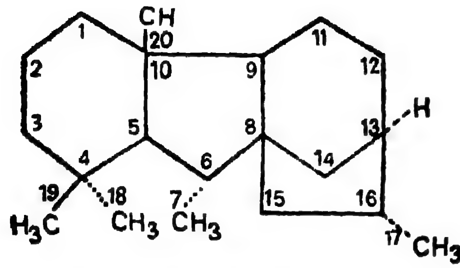
আবিষ্কৃত হওয়ার পর দীর্ঘদিন ধরিয়া অক্সিনই ছিল একমাত্র উদ্ভিদ হরমোন। অন্য কোন হরমোনের কথা জানা ছিল না। সুতরাং তখন বিজ্ঞানীগণ উদ্ভিদের বৃদ্ধি সংক্রান্ত যা কিছু সকলই অক্সিন দ্বারা ব্যাখ্যা করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে বৃদ্ধি জনিত সকল বিষয় অক্সিন দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, যেমন, দীর্ঘ ও খর্বাকৃতি উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার ইত্যাদি। জাপানের কুরোসাবা (Kurosawa) নামক এক তরুণ বিজ্ঞানী অনুসন্ধান করিতেছিলেন কেন ধানের চারাগাছ একটি বিশেষ ছত্রাক জিব্বারেল্লা ফুজিকুরোই (*Gibberella fugikuroi*) দ্বারা সংক্রামিত হইলে অস্বাভাবিকরূপে লম্বা হইয়া যায়। ইহাকে ধানের বেকনী (Bekoni) রোগ বলা হইত। 1926 খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেখাইলেন যে ছত্রাকের পরিবর্তে যদি তাহার নির্যাস উদ্ভিদের উপর প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে চারা উদ্ভিদটি বেকনী রোগাক্রান্তের ন্যায় দীর্ঘ হইতে থাকে। সুতরাং এই পরীক্ষা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে ছত্রাকটি এমন কোন বৃদ্ধি সহায়ক পদার্থ নিজ দেহে উৎপাদন করে যাহা ধানের চারাটির দীর্ঘতা প্রাপ্ত হইতে সাহায্য করে। ইহার অল্পকাল পরেই এই বৃদ্ধি সহায়ক বস্তুটিকে পৃথক করা হয় এবং জিবুরেলিন বলিয়া উহার নামকরণ করা হয়। 1938 খ্রীষ্টাব্দে ইয়াবুতা (Yabuta) এবং সুমিকি (Sumiki) জিবুরেলিন স্ফটিকীকরণ (Crystalization) করিতে সক্ষম হন, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ করিতে না পারায় তখন উহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্ভব হয় নাই। ত্রিশ ও চল্লিশের দশক ধরিয়া জাপানের বিজ্ঞানীগণ জিবুরেলীনের নানা প্রকার জৈবনিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে কাণ্ডের প্রসারণ ছাড়া ইহা বৃদ্ধি জনিত আরও নানাপ্রকার কার্য প্রভাবিত করিয়া থাকে।

এই সকল গবেষণার বিষয়বস্তু ফলাফল জাপানী পত্রিকাগুলিতেই প্রকাশিত হইত। ফলে ইহা জাপানেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে পৌঁছাইত না। 1955 খ্রীষ্টাব্দে ব্রেন (Brain) এবং তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ ঐ ছত্রাক হইতে যে জিব্বারেলীন সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল যে উহা জিব্বারেলীক

অ্যাসিড। ক্রস ও তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ (Cross et al, 1961) ইহার রাসায়নিক গঠন আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে দেখা গেল যে জিব্বারেলীন সকল উন্নত ও উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের দেহে বর্তমান। ক্রমে ইহা উদ্ভিদ দেহের দ্বিতীয় হর্মোনপুঞ্জ রূপে বর্ণিত হয়।

রাসায়নিক প্রকৃতি *Chemical nature*)—উন্নত কলা-কৌশলের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত উদ্ভিদ দেহে সর্বমোট 57 প্রকার জিব্বারেলিক অ্যাসিড (GA) আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যেকটি GA-এর একটি নির্দিষ্ট কাঠামো আছে তাহাকে জিব্বারেলেন কাঠামো (Gibberelane skeleton) বলা হয় (২৬২নং চিত্র)।

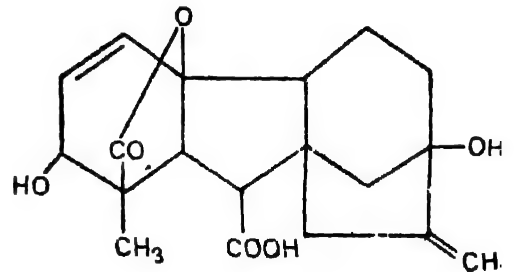
সকল GA-এর রাসায়নিক গঠনে দুইটি বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়—(ক) 19 এবং 20 সংখ্যক কার্বন পরমাণু এবং (খ) 3 এবং 13তম স্থানে OH এর উপস্থিতি।



২৬২ নং চিত্র—জিব্বারেলীন কাঠামো

যে সকল GA-এর 20টি কার্বন থাকে (20-C GAs) তাহাদের 7, 18, এবং কখনও কখনও 20 তম স্থানে COOH গ্রুপ থাকে। সকল 19 কার্বন যুক্ত GA(19-C GAs) হইল মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড। ইহাদের 7 তম স্থানে COOH গ্রুপ অবস্থিত থাকে। ছত্রাক হইতে প্রাপ্ত সকল GA-এর 3 তম স্থানে OH গ্রুপ থাকে কিন্তু উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ হইতে প্রাপ্ত GA-এর 13 তম স্থানে OH থাকে। অর্থাৎ ইহা সুস্পষ্ট যে ছত্রাক এবং উন্নত উদ্ভিদ দেহে GA সংশ্লেষ পথ ভিন্ন। GA-যৌগ মণ্ডলীর সদস্যাদের আবিষ্কারের ক্রম অনুযায়ী GA_1 GA_2, GA_3, GA_4···ইত্যাদি ভাবে নামকরণ করা হয়। তন্মধ্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে GA_3 সকল উদ্ভিদ দেহে বর্তমান এবং অত্যন্ত ক্ষমতাশালী একটি যৌগ।

কার্যপ্রণালী (*mode of action*)—GA-এর প্রতি গাছের প্রতিক্রিয়াগুলিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়—(I) অঙ্গসংস্থানজাত প্রতিক্রিয়া (morphological response) এবং (II) জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া (bio-chemical response)।



২৬৩নং চিত্র—GA_3-এর রাসায়নিক গঠন

তবে ইহা সত্য যে সকল অঙ্গ সংস্থানজাত প্রতিক্রিয়াই জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

I, অঙ্গসংস্থানজাত প্রতিক্রিয়া (Morphological response)

উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গম হইতে ফল উৎপাদন পর্যন্ত সকল বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশ জনিত ক্রিয়া কলাপই GA-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফুল উৎপাদন ব্যতিত

GA-এর সকল কার্যকেই কোষের প্রসারণ ও বিভাজনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। উদ্ভিদের এই সকল অঙ্গসংস্থান-জাত বৃদ্ধির কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) **উল্লম্ব বৃদ্ধি** (*Longitudinal growth*)—GA প্রয়োগ করিলে সম্পূর্ণ উদ্ভিদের অথবা উহার কোন অঙ্গের উল্লম্ব বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এই ধরনের বৃদ্ধি কোষ বিভাজন না কোষ প্রসারণ জনিত তাহা জানার জন্য নানা ধরনের পরীক্ষা করা হয়। *(i)* গমের চারা গাছের উপর *y*-রশ্মি প্রয়োগ করিয়া কোষ বিভাজন বন্ধ করিয়া, GA প্রয়োগ করিলে দেখা যায় যে উহার পুনরায় উল্লম্ব বৃদ্ধি হয়। এই স্থলে GA কোষ প্রসারণের মাধ্যমে কার্য করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ইহা কোষ বিভাজন ঘটাইয়া থাকে। (ii) পিঁয়াজের মূলের অগ্রভাগগুলি যদি GA দ্রবণে ডুবাইয়া রাখা হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে, অগ্রভাগের কোষগুলিতে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাত্র (mitotic index) বাড়িয়া যায়। সুতরাং ইহা প্রমানিত হয় যে GA কোষ বিভাজন ও প্রসারণ উভয় ঘটাইতে পারে।

(খ) **যৌন পরিবর্তন** (*Modification of sex expression*)—কুমড়া জাতীয় গাছের উপর GA প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহা অত্যন্ত শক্তিশালী যৌন পরিবর্তক (sex modifier), অর্থাৎ ইহার প্রয়োগ কুমড়া গাছের পুং পুষ্পের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। আবার কিছু কিছু খর্বাকৃতি দীর্ঘ দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ (long day plant) আছে যাহাদের উপর GA প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে আলোক পর্যায়ে (photoperiod) উহাদের ফুল হয় না, সেই পর্যায়ে ফুল ফুটিতেছে। এই ক্ষেত্রে খর্বাকৃতি উদ্ভিদ প্রথমে লম্বা হয় এবং তাহার পর পুষ্প ধারণ করে। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে যে, কোষ বিভাজন ও প্রসারণের মাধ্যমে GA কার্য করিয়া থাকে।

II. জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া (Biochemical response)

(ক) **শস্য বীজের সুপ্তাবস্থার লঙ্ঘন** (*breaking of dormancy of cereal seeds*) ঃ—শস্যবীজ, উৎপাদনের অব্যবহিত পরেই অঙ্কুরিত হইতে পারে না। কিছু দিন সুপ্ত অবস্থায় থাকিবার পর উপযুক্ত পরিবেশে উহার অঙ্কুরোদ্গম হয়। ইহার কারণ হইল সুপ্ত অবস্থায় ভ্রূনের মধ্যে GA সংশ্লিষ্ট হইয়া একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পোঁছাইলে তবেই উহা অঙ্কুরিত হইতে পারে। ভুট্টা বীজের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে ভ্রূণাক্ষের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হইয়া স্কুটেলামের মাধ্যমে অ্যালিউরোনস্তরে আসিয়া GA, ঐ স্তরের কোষগুলিকে α-অ্যামাইলেজ নামক উৎসেচক সংশ্লিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত করে। অ্যামাইলেজ, সঞ্চিত খাদ্যবস্তুকে (স্টার্চ) গ্লুকোজে পরিণত করে। উৎপন্ন গ্লুকোজ স্কুটেলামের মাধ্যমে ভ্রূণে আসিয়া উপস্থিত হয়। অঙ্কুরোদ্গমের জন্য গ্লুকোজ অপরিহার্য। এইরূপে GA উৎসেচক অ্যামাইলেজ সংশ্লেষ ত্বরান্বিত করিয়া অঙ্কুরোদ্গমে সাহায্য করে।

(খ) **রাইবোজোম উৎপাদন** (*Production of ribsome*)—GA কোষের মধ্যে রাইবোজোম সংশ্লেষকে উদ্দিপ্ত করে। GA_3 প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে অ্যালউরোন কোষস্তরে রাইবোজোমের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে উহা সম্ভবত rRNA সংশ্লেষের হার বৃদ্ধি করে।

(গ) **পলিজোম সংশ্লেষ** (*Polysome synthesis*)—রাইবোজোম সংশ্লেষ ব্যতীত GA পলিজোম গঠিত হইতে সাহায্য করে। রাইবোজোম এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকার (endoplasmic reticulum, or ER) উপর অবস্থিত mRNA-এর সহিত যুক্ত হইয়া পলিজোম গঠন করে। GA_3 প্রয়োগ প্রকৃত পক্ষে লেসিথিন সংশ্লেষ পথের কয়েকটি উৎসেচকের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, ফলে অধিক পরিমাণ লেসিথিন উৎপন্ন হয়। লেসিথিন এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার একটি উপাদান। সুতরাং GA_3 লেসিথিন সংশ্লেষের মাধ্যমে ER-এর সংখ্যা বাড়ায় এবং অবশেষে পলিজোম সংশ্লেষ বৃদ্ধি পায়।

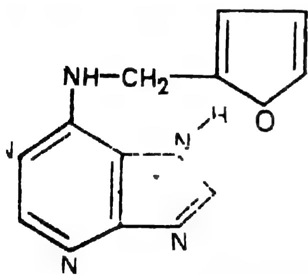
GA-**সংশ্লেষ** (*biosynthesis of GA*)—GA সংশ্লেষ পথ অত্যন্ত জটিল এবং দীর্ঘ। সংক্ষেপে ইহার একটু বিবরণ দেওয়া হইল। মেভালনিক অ্যাসিড হইতে GA সংশ্লেষ সূচনা হয়। ইহা প্রথমে আইসোপেণ্টানীল পাইরোফসফেটে (isopentanyl pyrophosphate) পরিণত হয়। অতঃপর চারিটি আইসোপেণ্টানীল পাইরোফসফেট ঘনীভূত হইয়া জেরানীল পাইরোফসফেটে (geranylpyrophosphate) পরিণত হয়। এই জেরানিল পাইরোফসফেট পরবর্তী পর্যায়ে কাউরেন কাঠামো গঠন করে কাউরেন হইতে অতঃপর সকল GA প্রস্তুত হয়।

জিব্বারেলীনের ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, যদিও ইহা উদ্ভিদের বৃদ্ধি নানাভাবে প্রভাবিত করিয়া থাকে তথাপি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া কৃষিক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ অতি অল্প।

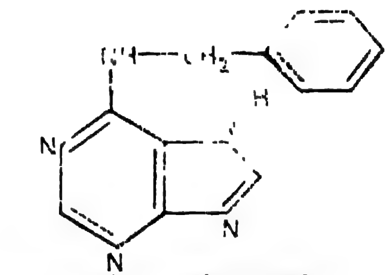
সাইটোকাইনিন (Cytokinin)

অক্সিন ও জিব্বারেলীন প্রধানত কোষ প্রসারণ ঘটাইয়া থাকে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে উহারা কোষ বিভাজনও ঘটাইয়া থাকে। তবে উহা ব্যতিক্রম মাত্র। উদ্ভিদ-দেহে অপর এক হরমোন পুঞ্জ পাওয়া যায়। যাহাদের প্রধান কার্য কোষ বিভাজন সূচনা করা। 1892 খ্রীষ্টাব্দে ওয়েস্নার (Weisner, 1892) সর্বপ্রথম উদ্ভিদ দেহে একটি বিশেষ ধরনের কোষ বিভাজনের সত্ত আছে বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। হ্যাবারল্যাণ্ড (Haberlandt, 1913) প্রথম পরীক্ষামূলক ভাবে উদ্ভিদ দেহে এই ধরনের পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণ করেন। তিনি দেখান যে আলুর প্যারেনকাইমা কোষে ফ্লোয়েম রস প্রয়োগ করিলে কোষ বিভাজন বৃদ্ধি পায়। ইহার অনেক কাল পরে, 1941 খ্রীষ্টাব্দ, ভ্যান ওভারবিক (Van Overbeek et al 1941) ও তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ দেখান যে ডাবের জলের কোষ বিভাজন সূচনা করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে। 1946 খ্রীষ্টাব্দ হইতে উইসকন্সিন্ (Wisconsin) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক স্কুগ (Skoog)-এর গবেষণাগারে এই ধরনের হরমোন আবিষ্কারের কার্য

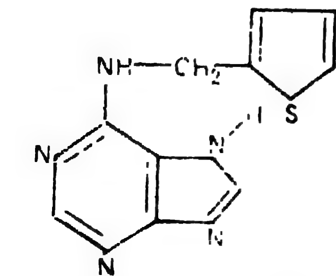
আরম্ভ হয়। 1948 খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা জানাইলেন যে তামাক গাছের কাণ্ডের খণ্ড অক্সিন যুক্ত পুষ্টি মাধ্যমে রাখিলে উহার মজ্জার কোষগুলি প্রসারিত ও বিভাজিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু কেবল মাত্র মজ্জাকলা, ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল (নালিকা বাণ্ডিল) ও কর্টেক্স হইতে পৃথক করিয়া একই মাধ্যমে রাখিলে উহার কোষগুলি প্রসারিত হয় কিন্তু বিভাজিত হয় না। সুতরাং ভ্যাস্কুলার বাণ্ডিল ও কর্টেক্স হইতে এমন কোন পদার্থ মজ্জার কোষগুলিতে আসে যাহা কোষ বিভাজন সূচনা করে। 1954 খ্রীষ্টাব্দে মিলার (Miller) হোরং নামক এক সামুদ্রিক মাছের শুক্রাণু হইতে নিষ্কাশিত DNA 'অটোক্লেভ করিয়া ঐ কোষ বিভাজনের সর্ত' (cell division inducing factor) কেলাসিত করিতে সক্ষম হন। এই যৌগ কোষ বিভাজনে অর্থাৎ সাইটোকাইনেসিস সংঘটিত করিয়া থাকে বলিয়া ইহার নামকরণ করা হয় **কাইনেটিন** (Kinetin)। কাইনেটিন আবিষ্কারের পর আরও অনেক যৌগের সন্ধান পাওয়া যায় যাহাদের একই প্রকার কার্য ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। এই যৌগ মণ্ডলীকে লেথাম (Letham, 1963) সাইটোকাইনিন্ (cytokinine) বলিয়া অভিহিত করেন। 1963 খ্রীষ্টাব্দে লেথাম সর্বপ্রথম উদ্ভিদ দেহ হইতে সাইটোকাইনিন্ কেলাসিত করিতে সক্ষম হন। তিনি ভুট্টার বীজ হইতে এই সাইটোকাইনিন পৃথকীকরণ করিয়া কেলাসিত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নামকরণ করেন জিয়াটিন (Zeatine)। জিয়াটিনের রাসায়নিক সংকেত সাইটোকাইনিন হইতে ভিন্ন।



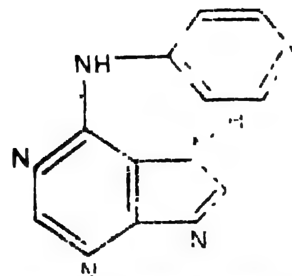
কাইনেটিন
(6-ফিউরফিউরিল অ্যামিনোপিউরিন)



6-বেনজাইল অ্যামিনোপিউরিণ্
(BAP)



6-(2-থেনিল অ্যামিনো) পিউরিণ্



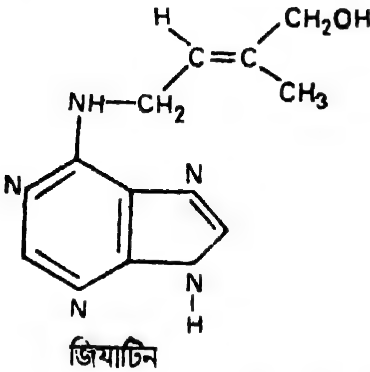
6-ফেনিল অ্যামিনো পিউরিণ্

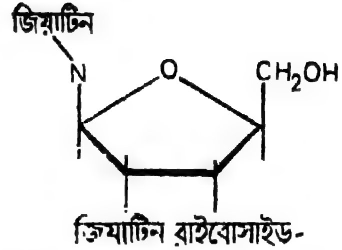
২৬৪নং চিত্র—কয়েক প্রকার কৃত্রিম সাইটোকাইনিন

রাসায়নিক প্রকৃতি (*Chemical nature*)—সকল সাইটোকাইনিন-ই পিউরিন-

এর সঞ্জাত যৌগ। ইহাদের প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। (ক) কৃত্রিম (synthetic) এবং (খ) প্রাকৃতিক (natural)। (ক) কৃত্রিম উপায়ে পিউরিনের 6নং স্থানে নানা পরিবর্তন করিয়া বিভিন্ন সাইটোকাইনিন প্রস্তুত করা সম্ভব। যেমন 6-বেনজাইল অ্যামিনো পিউরিন (6-benzyl-amino purine or BAP), 6-ফেনিল অ্যামিনো পিউরিণ (6-phenylamino purine), 6-(2-থেনিল অ্যামিনো)-পিউরিন (6-[2-thenyl amino] purine) ইত্যাদি (২৬৪নং চিত্র)।

(খ) **প্রাকৃতিক সাইটোকাইনিন**—(i) জিয়াটিন—লেথাম 1964 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অপরিণত ভুট্টা দানা হইতে পৃথকীকরণ ও কেলাসিত করিয়া রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ধারণ করেন। ইহা 6—(4-হাইড্রক্সি 3-মিথাইল ট্রান্স 2-বিউটেনিল অ্যামিনো) পিউরিণ।





২৬৫নং চিত্র—দুইটি প্রাকৃতিক সাইটোকাইনিন

(ii) **রাইবোসিল জিয়াটিন** (ribosyl zeatin)—ইহা জিয়াটিনের একটি সঞ্জাত যৌগ। মিলার (Miller, 1965) সর্বপ্রথম ভুট্টার দানা হইতে পান এবং পরবর্তী কালে, 1967, রাইজোপোগন রোসিওলাস (*Rhizopogon roseolus*) নামক ছত্রাকের দেহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া কেলাসিত করেন। ইহাকে জিয়াটিন রাইবোসাইড-ও বলা হয়।

(iii) **জিয়াটিন রাইবো নিউক্লিওটাইড** (Zeatin ribonucleotide)—ইহাও 1965 খ্রীষ্টাব্দে মিলার প্রথম ভুট্টার দানা হইতে আবিষ্কার করেন। জিয়াটিন রাইবোসাইডের সাথে একটি ফসফোরিক অ্যাসিড যুক্ত হইয়া জিয়াটিন রাইবো নিউক্লিওটাইড গঠন করে।

(iv) **ডাই-হাইড্রো জিয়াটিন** (Dihydro zeatin)—কোসিমিজু ও সহকর্মী-বৃন্দ (Koshimizu et al 1967) প্রথম ইহা আবিষ্কার করেন *Lupinus tutenus* এর বীজ হইতে।

(v) আইসোপেন্টেনিল অ্যাডেনিন (Isopentenyl adenine, or 2-iP)-1978 খ্রীষ্টাব্দে ভ্যানস্টাডেন ওয়েলউইট্‌সিয়ার (*welwitschia* sp.) পাতা হইতে প্রথম আবিষ্কা রকরেন।

(vi) জিয়াটিন গ্লুকোসাইড (Zeatin glucoside)—জিয়াটিনের সহিত এক

অণু গ্লুকোজ যুক্ত হইয়া জিয়াটিন গ্লুকোসাইড গঠন করে। ভ্যানস্টাডেন 1976 খ্রীঃ প্রথম ইহা আবিষ্কার করেন।

tRNA-সাইটোকাইনিন (tRNA-Cytokinin)—tRNA পৃথকীকরণ করিয়া হাইড্রোলিসিস করিলে কতকগুলি পিউরিন যোগ পাওয়া যায়, যেগুলি সাইটোকাইনিনের ন্যায় কার্যক্ষম, যেমন, 2-আইসোপেণ্টেনিল অ্যাডিনোসিন, মিথাইল থায়ো আইসোপেণ্টেনিল অ্যাডিনোসিন, জিয়াটিন রাইবোসাইড, মিথাইল থায়ো-জিয়াটিন রাইবোসাইড ইত্যাদি। ব্যাকটিরিয়া হইতে মানুষ পর্যন্ত যে কোন জীব বা উদ্ভিদের দেহ হইতে tRNA লইয়া হাইড্রোলিসিস করিলে এই সকল সাইটোকাইনিন পাওয়া সম্ভব। বস্তুতপক্ষে tRNA-এর অ্যাণ্টিকোডোনের পার্শ্বে এই সকল অসাধারণ নিউক্লিওটাইডগুলি থাকে।

কার্যপ্রণালী (Mode of action)

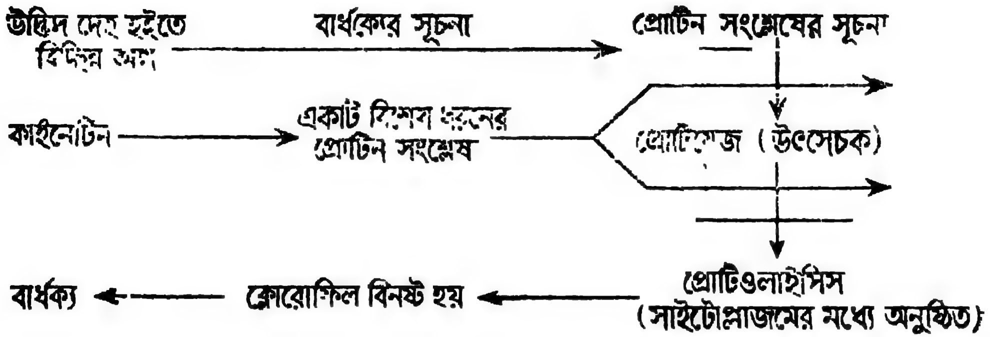
(ক) কোষ বিভাজন (Cell division)—সাইটোকাইনিনের প্রধান কার্য কোষ বিভাজন সূচনা করা। টিস্যু কালচারে দেখা গিয়াছে যে সাইটোকাইনিন ব্যতীত কোন টিস্যু পুষ্টি মাধ্যমে (culture medium) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। যে কোন স্থায়ী কলা সাইটোকাইনিনের উপস্থিতিতে পুষ্টি মাধ্যমে বিভাজিত হইতে পারে।

(খ) অঙ্গের উৎপত্তি (Morphogenesis)—টিস্যু কালচারে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে পুষ্টি মাধ্যমে অক্সিন ও সাইটোকাইনিন একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকিলে কোষ বিভাজিত ও প্রসারিত হইয়া একটি অবিকাশিত কোষ-পিণ্ড গঠন করে, যাহাকে ক্যালাস (callus) বলা হয়। এখন, যদি ঐ মাধ্যমে সাইটোকাইনিনের মাত্রা বাড়ান হয় তখন দেখা যায় যে ঐ ক্যালাস হইতে বিভিন্ন অঙ্গের ক্রমবিকাশ হইতেছে। সুতরাং ইহা প্রমাণিত হয় যে সাইটোকাইনিন বিভিন্ন অঙ্গ উৎপাদনের জন্য দায়ী। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে শুধুমাত্র সাইটোকাইনিন নহে, সাইটোকাইনিন ও অক্সিনের একটি বিশেষ অনুপাত এইরূপ ঘটিতে সাহায্য করে।

(গ) সুপ্তাবস্থা লঙ্ঘন (Breaking of dormancy)—সাইটোকাইনিন বীজের অঙ্কুরোদগমে সাহায্য করে। লেটুস বীজের সুপ্তাবস্থা লাল আলো প্রয়োগ করিয়া অতিক্রম করা যায়। কিন্তু লাল আলোর পরিবর্তে যদি সাইটোকাইনিন প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলেও উহার সুপ্তাবস্থা লঙ্ঘন করা সম্ভব হয়। লাল আলো ও সাইটোকাইনিন একত্রে প্রয়োগ করিলে আরও ভালো ফল পাওয়া যায়। তামাক, জ্যান্থিয়াম ইত্যাদি গাছের বীজের উপর পরীক্ষা করিয়া একই প্রকার ফল পাওয়া গিয়াছে।

(ঘ) বার্ধক্যের বিলম্ব (Delay of senescence)—সাইটোকাইনিন প্রয়োগ করিলে উদ্ভিদের বার্ধক্য দেরী করিয়া আসে, অর্থাৎ বার্ধক্যকে কমাইয়া দেয়। ইহা প্রথম 1957 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানীদ্বয় রিচমণ্ড (Richmond) এবং ল্যাং (Lang) ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই কারণে ইহাকে বলা হয় রিচমণ্ড-ল্যাং-এর প্রতিক্রিয়া

(Richmond-Lang effect)। বার্ধক্য শুরু হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পত্রের সবুজ বর্ণ ক্রমশ পরিবর্তন হইয়া হলুদ বর্ণ হইতেছে, অর্থাৎ ক্লোরোফিল অণুগুলি বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে ; এবং ইহার সাথে সাথে কোষস্থিত প্রোটিন অণুগুলিও ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে। সাইটোকাইনিন কি উপায়ে ক্লোরোফিল অণুর হ্রাস রোধ করে তাহার ব্যাখ্যা করিবার জন্য (1970 খ্রীঃ) ম্যান (Mann) একটি তত্ত্ব প্রদান করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, সাইটোকাইনিন একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিন প্রস্তুত করিতে সাহায্য করে, যে প্রোটিন ক্লোরোফিল অণুর হ্রাস প্রাপ্তি রোধ করে (২৬৬নং চিত্র)।



২৬৬নং চিত্র—রিচমণ্ড-ল্যাং-এর প্রতিক্রিয়া। কাইনেটিন একটি বিশেষ ধরণের প্রোটিন গঠনের মাধ্যমে প্রোটিওলাইসিস বোধ করিয়া বার্ধক্য রোধ করে।

জৈব সংশ্লেষ (Biosynthesis)

সাইটোকাইনিনের জৈব সংশ্লেষ আজও সঠিকরূপে জানা সম্ভব হয় নাই। যেহেতু সকল প্রাকৃতিক সাইটোকাইনিনই পিউরিন জাতের যৌগ সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, পিউরিন যে ভাবে সংশ্লিষ্ট হয় সেই ভাবে সাইটোকাইনিনও সংশ্লিষ্ট হয়। তবে এই ব্যাপারে অনেক মতভেদ আছে কারণ, tRNA হইতেও সকল প্রকার সাইটোকাইনিন পাওয়া যায়। সুতরাং প্রশ্ন হইল, মুক্ত সাইটোকাইনিন (free cytokinines) গুলির নিজস্ব কোন সংশ্লেষ পথ আছে, না, উহারা tRNA বিনষ্ট হইলে উৎপন্ন হয় ? ইহা আজও জানা সম্ভব হয় নাই। দেখা গিয়াছে যে, সাইটোকাইনিন সাধারণত মূলের অগ্রভাগে এবং বর্ধনশীল ফল ও বীজের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে।

ব্যবহারিক প্রয়োগ (Practical application)—সাইটোকাইনিনের ব্যবহারিক প্রয়োগ খুব বেশী হয় নাই। কারণ, ইহাও জিব্বারেলীনের ন্যায় অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য।

বৃদ্ধি-রোধক হর্মোন

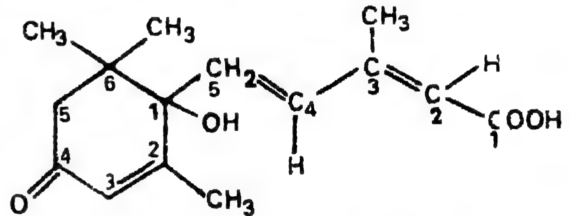
অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (Abscissic acid or ABA)—অ্যাবসিসিক অ্যাসিড একটি বৃদ্ধি নিষেধক বা-বৃদ্ধি-রোধক উদ্ভিদ হর্মোন। পঞ্চাশের দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে বার্ধক্য, সুপ্তাবস্থা ও অঙ্কুরোদগমের সহিত সম্পর্ক যুক্ত নিষেধক (inhibitors) পদার্থ লইয়া নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতে থাকে।

1964 খ্রীষ্টাব্দে কার্ন্স (Carns), অ্যাডিকট (Addicott) এবং ওকুমা (Ohkuma প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ প্রথম ABA পৃথকীকরণ করেন এবং উহার নামকরণ করেন অ্যাবসিসিন I এবং অ্যাবসিসিন II। ইহাদের প্রয়োগ গাছের পাতা ঝড়িয়া পড়ে অর্থাৎ পত্রমোচন হয়।

উক্ত বছরে রথওয়েল (Rothwell) এবং ওয়েন (Wain) লিউপিন হইতে আরও একপ্রকার পদার্থ পৃথক্ করেন যাহা ফুল ও ফল ঝড়িয়া পড়িতে সাহায্য করে। অতঃপর ওয়ারিং (Waring) এবং কর্ণফোর্থ (Cornforth) সিকামোর (Sycamore) উদ্ভিদের দেহ হইতে এই জাতীয় আর একপ্রকার পদার্থ নিষ্কাশণ করেন যাহা প্রয়োগ করিলে মুকুলের সুপ্তাবস্থা বাড়িয়া যায়। তাঁহারা এই পদার্থটিকে ডরমিন (Dormin) বলিয়া অভিহিত করেন।

1965 খ্রীষ্টাব্দে কর্ণফোর্থ ডরমিন পৃথকীকরণ করিয়া বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম হন। ওকুমা এবং তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ (Okuma et al) এই পদার্থটির রাসায়নিক গঠন নির্ধারণ করেন। বিভিন্ন গবেষণাগারে যে তিনটি পদার্থ আবিষ্কৃত হয় দেখা যায় যে ঐ তিনটি পদার্থ একই। 1967 খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে ওটাওতে উদ্ভিদ হর্মোন সম্বন্ধে ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে ঐ পদার্থের নূতন নামকরণ, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (Abscissic acid or ABA) করা হয়।

রাসায়নিক প্রকৃতি (Chemical nature)—ABA একটি মনোকার্বক্সিলিক অ্যাসিড, অর্থাৎ ইহাতে একটি মাত্র কার্বক্সিল গ্রুপ আছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা পেণ্টাডিনইক অ্যাসিডের একটি সঞ্জাত যৌগ। ইহার রাসায়নিক নাম হইল 3-মিথাইল-5-(1 হাইড্রক্সি-4-অক্সো-2, 6, 6-ট্রাইমিথাইল-2 সাইক্লোহেক্সেন-আইল) সিস-ট্রান্স-2, 4-পেণ্টাডিনইক অ্যাসিড [3-methyl-5-(1-hydroxy-4-oxo-2, 6, 6-trimethyl-2-cyclohexene-1-yl) cis-trans-2, 4-pentadenoic acid]



২৬৭নং চিত্র—অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (ABA)

ABA-এর সহিত সম্পর্ক যুক্ত কতকগুলি প্রাকৃতিক যৌগ (Naturally occuring substances related to ABA)—ABA-এর সহিত সম্পর্ক যুক্ত তিনটি প্রাকৃতিক যৌগ পাওয়া যায়। যেমন, (ক) **ফ্যাসিক অ্যাসিড** (Phascic acid)—ইহা ফ্যাসিওলাস মালটিফ্লোরাস (*Phaseolus multiflorus*) নামক উদ্ভিদের বীজ হইতে পৃথক করা হইয়াছে। (খ) **অ্যাবসিসিল গ্লুকোসাইড** (Abscisyl glucoside) লুপিনাস লুটিয়াস (*Lupinus luteus*)-এর ফল হইতে ইহা পাওয়া যায়। (গ) **থিয়াসপিরোন** (Theaspirone) চাগাছের পাতা হইতে নিষ্কাশিত করা হয়।

এই যৌগগুলি ABA-এর ন্যায় কার্য-ক্ষমতা সম্পন্ন।

কার্য প্রণালী (*Mode of action*)—ABA-এর প্রতি উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়াগুলিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, (১) জৈবনিক প্রতিক্রিয়া (Physiological responses) এবং (২) জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া (Biochemical responses)।

I. জৈবনিক প্রতিক্রিয়া (Physiological responses)

(i) বার্ধক্য এবং অঙ্গের পতন (senescence and abscission)—ABA প্রয়োগ করিলে উদ্ভিদের কোন অঙ্গের বিশেষ করিয়া পাতার কোষগুলির রসস্ফীতির চাপ কমিয়া যায় এবং ক্লোরোফিলের ধ্বংস দ্রুততর হয়, ফলে সত্বর বার্ধক্য আসিয়া যায় এবং অবশেষে ঐ অঙ্গ মাতৃদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং যখন কোন বিশেষ ঋতুতে কোন গাছের পাতা ঝড়িয়া পড়ে তখন দেখা যায় উহার বৃন্তে ABA-এর আধিক্য ঘটে এবং অপর বৃদ্ধি সহায়ক হর্মোনগুলির মাত্রা কমিয়া যায়।

(ii) **বৃদ্ধির বিলম্ব ও বাধা** (Growth retardation and inhibition)—ABA গাছের প্রায় সকল অঙ্গের বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করিয়া বৃদ্ধি রোধ করে। ABA-এর মাত্রা যত বাড়ান যায় ততই বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি হয়। তবে ইহা সাময়িক, কারণ উদ্ভিদের এই বাধা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু ক্লোরোফিল যুক্ত কোন কোষ যখন বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন তাহার বাধা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা আর থাকে না। আলুর কন্দে ABA প্রয়োগ করিলে তাহার সুপ্তাবস্থা বাড়িয়া যায়।

(iii) **অঙ্কুরোদগম** (Germination)—ABA-এর উপস্থিতিতে কোন বীজের অঙ্কুরোদগম হয় না। অর্থাৎ ABA বীজের সুপ্তাবস্থাকে বর্ধিত করে। বীজে ABA এর মাত্রা কমিলে তবেই উহা অঙ্কুরিত হয়। সেই কারণেই বিজ্ঞানী ওয়ারিং এই বস্তুটির নামকরণ করিয়াছিলেন "ডরমিন"।

(iv) **পুষ্প উৎপাদন** (Flowering)—"Long day" উদ্ভিদের পুষ্প উৎপাদনে ABA বাধা সৃষ্টি করে। আবার কিছু কিছু "Short day" উদ্ভিদ আছে যাহাদের উপর প্রতিকূল আলোক পর্যায়ে ABA প্রয়োগ করিলে পুষ্প উৎপাদন ত্বরান্বিত হয়। ইহাকেও বৃদ্ধির বাধা হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ABA প্রয়োগ মাত্র ঐ সকল উদ্ভিদের অঙ্গজ মুকুলগুলিকে পুষ্প মুকুলে পরিণত করিয়া অঙ্গজ বৃদ্ধি রোধ ঘটে।

(v) **বাষ্পমোচন কার্যে বাধা** (Antitranspirant activity)—ABA-এর বাষ্প মোচন কার্যেও বাধা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে। ABA প্রয়োগ করিলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হইয়া যায়, ফলে বাষ্পমোচন কার্য ও অন্যান্য গ্যাসীয় আদান প্রদান বন্ধ হইয়া যায়।

II. জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া (Biochemical responses)

পরীক্ষায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে ABA স্টার্চ হইতে গ্লুকোজ উৎপাদনে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। GA অ্যালিউরোন স্তরে ⍺-অ্যামাইলেজ উৎসেচকের সংশ্লেষ সূচনা করে কিন্তু ABA ঐ উৎসেচকের সংশ্লেষ কার্যে বাধা দিয়া উহার উৎপাদন বন্ধ করে।

ABA ফেনিল অ্যালানিন অ্যামোনিয়া লায়েজ (phenyl alanine ammonia lyase or PAL) উৎসেচকের কার্যক্ষমতা বাড়াইয়া দেয় ফলে ফেনিল অ্যালানিন অ্যামিনো অ্যাসিড সত্বর ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে।

ABA ফ্যাটি অ্যাসিড (fatty acid) সিন্থেটেজ উৎসেচকের কার্যে বাধা প্রদান করিয়া ফ্যাটি-অ্যাসিড উৎপাদনে ব্যাঘাত করে।

IAA, GA এবং সাইটোকাইনিন দ্বারা নিউক্লিক অ্যাসিডের সংশ্লেষ উদ্দীপ্ত, ত্বরান্বিত ও বর্ধিত হয়, কিন্তু ABA-এর উপস্থিতিতে তাহা হয় না। উপরন্তু, বার্ধক্যের সময় ABA রাইবোনিউক্লিয়েজ (যাহা RNAকে ভাঙ্গিয়া দেয়) এবং ডি-অক্সি-রাইবো-নিউক্লিয়েজ (যাহা DNAকে ভাঙ্গিয়া দেয়)—এই সকল উৎসেচকের সংশ্লেষ বর্ধিত করে, ফলে বার্ধক্যে উপনীত অঙ্গের মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিডের মাত্রা অত্যন্ত কমিয়া যায়।

———

১২ বৃদ্ধি
(Growth)

আয়তনে স্থায়ী প্রসারণ ও আকৃতির পরিবর্তনকে বৃদ্ধি বলে। বৃদ্ধি সজীব পদার্থের বৈশিষ্ট্য। প্রাণীর দেহের সকল অংশই একসঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহা উদ্ভিদের নির্দিষ্ট স্থানে (মূল বা কাণ্ডের আগায়) নিবেশিত থাকে।

বৃদ্ধির দশা (Phases of growth)

বৃদ্ধির তিনটি দশা আছে ; যথা—

(*a*) আদিদশা বা কোষবিভাগ দশা (*Embryonic phase or phase of cell division*)—এই দশায় ভাজক কোষগুলি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া নূতন কোষ গঠন করে।

(b) দীর্ঘকরণ দশা (*Phase of elongation*)—এই দশায় বিভক্ত কোষগুলি ক্রমশ দীর্ঘ হইয়া পূর্ণ আয়তন প্রাপ্ত হয় ও ভ্যাকুওল উৎপন্ন হয়।

(c) বিভেদ দশা (*Phase of differentiation*)—এই দশায় পূর্ণ আয়তনপ্রাপ্ত কোষগুলি বিভিন্ন কলায় বিভেদিত হয় এবং কোষপ্রাচীরের লিগ্নীভবন (lignification সুবারীভবন (suberization) ও কিউটিনযুক্ত (cutinization) হয়।

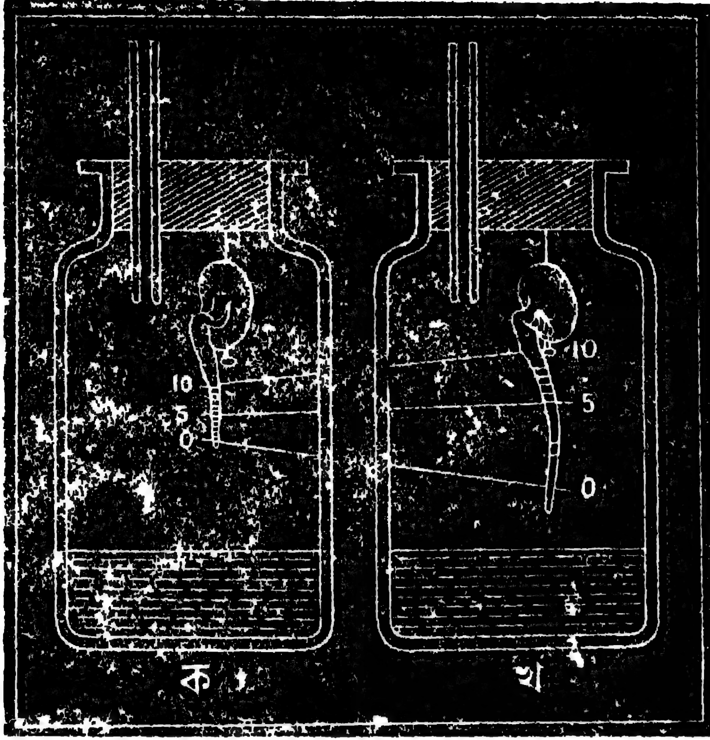
বর্ধিষ্ণু অঞ্চল (Regions of growth)

কাণ্ড ও মূলের অগ্রে বৃদ্ধি বেশি হয়, অবশ্য মূলাগ্রের কিছু নিচের অংশটি সর্বাপেক্ষা বেশি বৃদ্ধি পায়। ইহা নিম্নের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে :

৪৪নং পরীক্ষা (২৬৮নং চিত্র)—এক ইঞ্চি লম্বা মূলবিশিষ্ট শিম, মটর বা ছোলার চারাগাছ লও। মূলের অগ্রভাগ স্পেস মার্কার চক্র (space marker wheel)-র সাহায্যে কালি দিয়া সমান অংশে দাগ দাও। এখন একটি বোতলে কিছু জল লও এবং ইহার মুখটি একটি ছিদ্রযুক্ত কর্কের ছিপি দিয়া বন্ধ কর। ছিদ্রের মধ্যে একটি কাচনল প্রবেশ করাও, যাহাতে বায়ু বোতলের মধ্যে সহজে যাইতে পারে। এইবার একটি লম্বা পিনের সাহায্যে চারাগাছটিকে ছিপির নিচের দিকে আবদ্ধ কর। 2-3 দিন পরে দেখিবে যে, মূলের অগ্রের ও উপরের দিকের দাগমধ্যস্থ স্থানগুলি সমান আছে, কিন্তু মূলাগ্রের নিচের দাগমধ্যস্থ স্থানগুলি বেশ লম্বা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, মূলেতে মূলত্রাণের ঠিক নিচের অংশটি সর্বাপেক্ষা বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কাণ্ডে অগ্রস্থ মুকুলের নিম্নস্থ পর্বমধ্যটি সর্বাপেক্ষা বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা পূর্বোক্ত পরীক্ষার ন্যায় প্রমাণ করা যাইতে পারে। লক্ষ্য করিবে, কেবলমাত্র উপরের দুইটি বা তিনটি পর্বমধ্য কিছু লম্বা হয় কিন্তু অপরিবর্তিত থাকে।

পত্রবৃন্তের অগ্রভাগে সর্বাধিক বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু অবৃন্তক পাতায় ইহা ফলকের তলে অবস্থিত। ইহা সহজেই স্পেস মার্কার চাকতি (space marker



২৬৮নং চিত্র—বর্ধিষ্ণু অঞ্চল
(ক) পরীক্ষার পূর্বে ; (খ) পরীক্ষার পরে

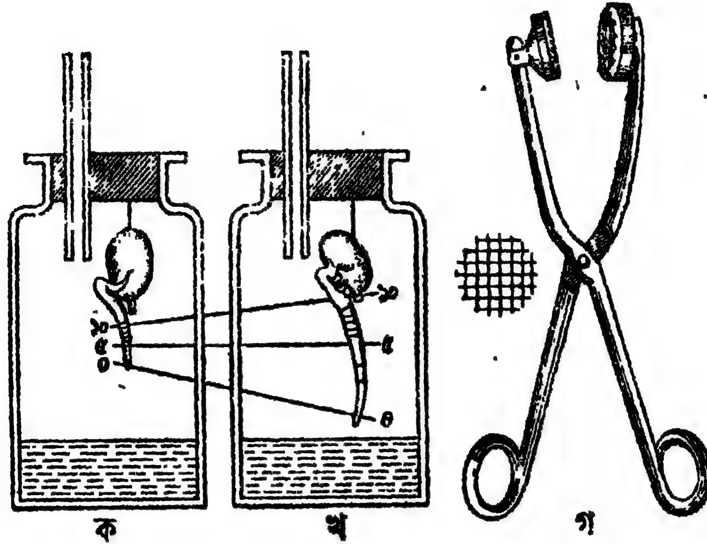
disc) নামক যন্ত্রের সাহায্যে (২৬৯-গ-নং চিত্র) নিরূপণ করা যায়। দেখা যাইবে যে, পাতার যে অংশের বৃদ্ধি অধিক, সেই স্থানের চতুষ্কোণ চিহ্নগুলির আয়তন বৃদ্ধি পাইবে।

বর্ধনশীল অগ্রের বিশেষ ধর্ম (Properties of growing points)

1. রসস্ফীতি (*Turgidity*)—বর্ধনশীল অগ্রের কোষগুলি সর্বদাই রসস্ফীত থাকে। পোষক রস আস্রাবণ প্রক্রিয়া দ্বারা দ্রুত কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রোটোপ্লাজমের তৎপরতার জন্য প্রত্যেক নূতন কোষে অভিস্রবণ পদার্থ গঠিত হয়। ইহা এই সকল পদার্থের উপস্থিতির জন্য আন্তঃ অভিস্রাবণ প্রক্রিয়ার দ্বারা নিকটবর্তী কোষ হইতে জল শোষণ করিয়া রসস্ফীত হয়। রসস্ফীতির জন্য স্থিতিস্থাপক সেলুলোজ কোষপ্রাচীর বিস্তৃত হয় এবং কোষটি আয়তনে বাড়ে। নূতন সেলুলোজ কণিকা বিস্তৃত কোষপ্রাচীরের উপর জমা হয় এবং কোষটি স্থায়ী আকার প্রাপ্ত হয়।

2. বৃদ্ধিহার (*Rate of growth*)—বৃদ্ধিহার সকল সময়ে সমান হয় না। প্রথমে বৃদ্ধি মন্থর গতিতে হয়, ক্রমশ ইহা বাড়িয়া সর্বাপেক্ষা অধিক হয় এবং শীঘ্রই

মন্থর হইয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর অঙ্গটি স্থায়ী আকৃতি প্রাপ্ত হয়। উক্ত প্রকার পরিবর্তন ঘটিতে যে সময় লাগে, তাহাকে মুখ্যবৃদ্ধিকাল (*grand period of growth*) বলে।



২৬৯নং চিত্র—স্পেস মার্কার চাকতি

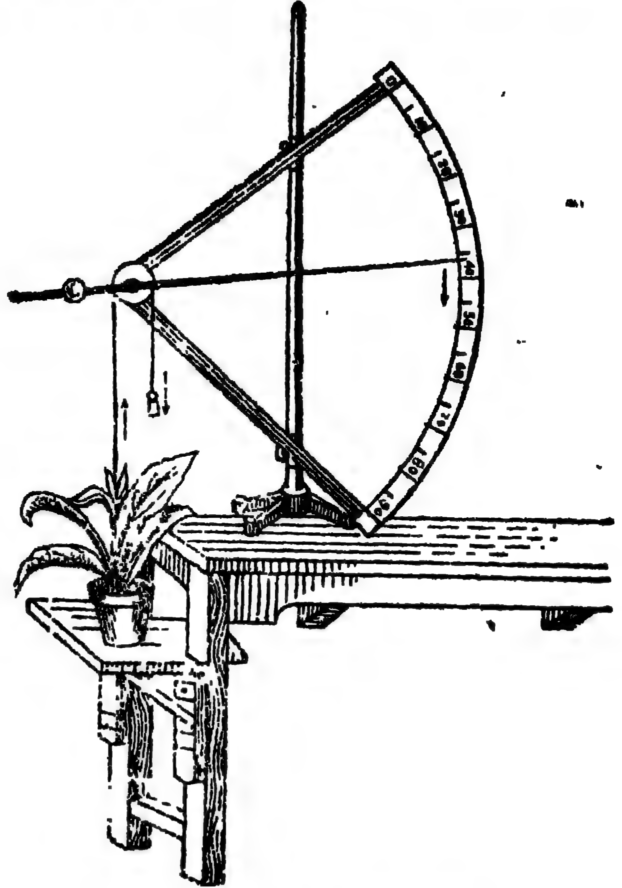
3. বৃদ্ধিজ চলন (*Growth movements*)—কাণ্ড বা মূলের বর্ধনশীল অগ্র কখনও সরলরেখায় দীর্ঘ হয় না। দীর্ঘ হইবার সময় ইহা প্রথমত একদিকে যাইয়া পরে বিপরীত দিকে বক্রভাবে বর্ধিত হয়; এইরূপে ইহা আঁকাবাঁকাভাবে অগ্রসর হয়। বিপরীত দিকে অসমান বৃদ্ধির জন্য এইপ্রকার চলন হয়। যখন অগ্রটির একটি পার্শ্ব অপর পার্শ্ব অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন উহা অপেক্ষাকৃত কম বৃদ্ধি-প্রাপ্ত পার্শ্বের দিকে বাঁকিয়া যায়। শীঘ্রই বিপরীত পার্শ্বটি দীর্ঘ হয় এবং অপর দিকে বক্র হয়। এইরূপে কাণ্ডের অগ্রভাগটি ধীরে ধীরে মাথা আন্দোলন করে; এইপ্রকার চলনকে **বলন** (*nutation*) বলে। কাণ্ডের এইপ্রকার চলন বল্লীতে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। কিন্তু যদি বর্ধনশীল অগ্রটির চলন অবিরাম সর্পিলভাবে হইতে থাকে তাহা হইলে তাহাকে **পরিবলন** (*circumnutation*) বলে। পরিবলন নবগঠিত আকর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। এইপ্রকার চলনের জন্য আকর্ষ কোনো অবলম্বনের সংস্পর্শে আসিয়া উহাকে জড়াইয়া ধরে। পাতাতে বলনের ন্যায় চলন দেখা যায়। বৃদ্ধির প্রথম অবস্থায় নিম্নপৃষ্ঠের কোষগুলি উপরিপৃষ্ঠের কোষগুলি অপেক্ষা বেশি বাড়ে, সুতরাং পাতাটি গুটাইয়া যায়। এই বৃদ্ধিদশাকেই **হাইপোন্যাস্টি** (**hyponesty**) বলে। হাইপোন্যাস্টির জন্যই ফার্নগাছের পাতার কুণ্ডলীকৃত মুকুলপত্রবিন্যাস হয়। পরে উপরিপৃষ্ঠের কোষগুলি নিম্নপৃষ্ঠের কোষগুলি অপেক্ষা বেশি বাড়ে এবং পাতাটি বিস্তৃত হয়। এই বৃদ্ধিদশাকে **এপিন্যাস্টি** (**epinasty**) বলে।

রেখাকার বৃদ্ধির মাপ (Measurement of linear growth)

নিম্ন প্রকার উপায়ে কাণ্ডের বৃদ্ধিহার মাপিতে পারা যায় :

1. সাধারণ অংশাঙ্কিত স্কেল দ্বারা (*By ordinary scale*)—কাণ্ডের অগ্রভাগের কোনো অংশে একটি দাগ দাও এবং নিয়মিতভাবে আগা হইতে এই দাগের ব্যবধান একটি সাধারণ অংশাঙ্কিত স্কেল দ্বারা মাপিলে বৃদ্ধির মাপ জানা যাইবে।

2. আর্ক ইণ্ডিকেটর (*Arc indicator*) বা অক্সানোমিটার (*Auxanometer*) দ্বারা (২৭০নং চিত্র) —ইহা একটি লৌহনির্মিত অংশাঙ্কিত বৃত্তের চতুর্থাংশ মাত্র। কেন্দ্রস্থলে একটি ছোট চক্র আছে এবং উহার সহিত যে লম্বা নির্দেশক (pointer) সংযুক্ত আছে, তাহা বৃত্ত-খণ্ডের উপর বা নিচ দিকে যাতায়াত করে। ইহার সাহায্যে নিম্নলিখিতভাবে সরল বৃদ্ধি মাপিতে পারা যায়।

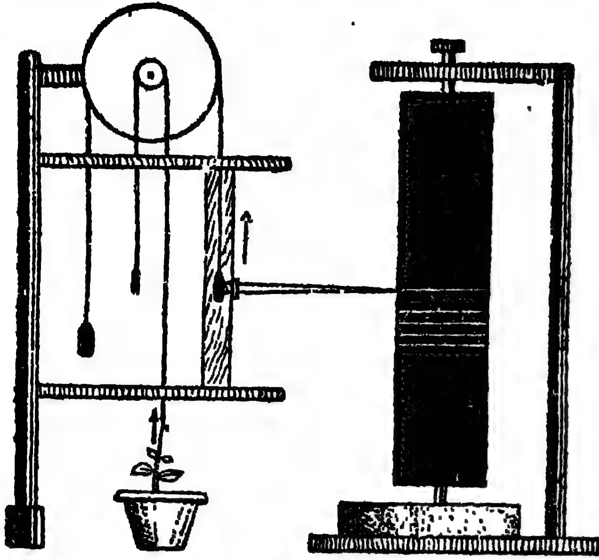


২৭০নং চিত্র—আর্ক ইণ্ডিকেটর

৪৫নং পরীক্ষা—চক্রের উপরে একটি সূতা রাখ। ইহার এক প্রান্ত কাণ্ডের আগার সহিত বাঁধ ও অন্য প্রান্তের সহিত এরূপ একটি ছোট ভার (weight) বাঁধ, যাহাতে সূতাটি সম্পূর্ণ টান থাকে অথচ ছিঁড়িয়া না যায়। এখন নির্দেশকটির অবস্থান লক্ষ্য কর। গাছটি যখন দৈর্ঘ্যে বাড়িতে থাকে তখন সুতার টানে চক্রটি ঘুরিতে থাকে এবং নির্দেশকটি স্কেলের উপর বৃদ্ধির মান নির্দেশ করে। পরীক্ষার আরম্ভে ও শেষে নির্দেশকের অবস্থান লক্ষ্য কর। দুই অবস্থানের পার্থক্য হইতে কাণ্ডের বৃদ্ধির পরিমাণ জানিতে পারা যায়।

3. অক্সোগ্রাফ দ্বারা (*Auxograph*—২৭১নং চিত্র)—ইহা একটি স্বলিখন যন্ত্রবিশেষ। কপিকল ও চক্রের সাহায্যে, কাণ্ডের অগ্রস্থানের যে পরিবর্তন হয় তাহা একটি ঘূর্ণায়মান ধূমায়িত ড্রামের উপর নির্দেশক কাঁটার সাহায্যে নিরূপিত হয়। সাধারণত বৃদ্ধির পরিমাণ 20-40 গুণ হয় এবং প্রত্যেক অর্ধ বা এক ঘণ্টায় বৃদ্ধির প্যার্থক্য জানিতে পারা যায়।

৪৬নং পরীক্ষা—ছোট চক্রের উপর একটি সূতা রাখ। ইহা এক প্রান্ত কান্ডের অগ্রভাগের সহিত যুক্ত কর ও অপর প্রান্তের সহিত এইরূপ একটি ভার (weight) বাঁধ যাহাতে সূতাটি সম্পূর্ণ টান থাকে অথচ ছিঁড়িয়া না যায়। আর একটি সূতা বড় চক্রের উপর রাখ। সূতাটি টান রাখিবার জন্য ইহার দুই প্রান্তে সমান ভার বাঁধ। এখন একটি ভারের সহিত নির্দেশক কাঁটা একটি ধূমায়িত ড্রামের সহিত স্পর্শ করাও। এখন ড্রামটিকে যন্ত্র (clockwork)-এর সাহায্যে নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরাও। যখন কান্ডটি বর্ধিত হয়, ছোট চক্রটি ঘুরিতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে বড় চক্রটিও ঘুরে। সুতরাং নির্দেশকটি ধূমাইত কাগজের উপর আঁচড় কাটে। এখন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আঁচড়ের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ হইতে কান্ডের বৃদ্ধি মাপিতে পারা যায়।



২৭১নং চিত্র অকসোগ্রাফ

দেখা গিয়াছে যে, দিবারাত্রের পরিবর্তনের ফলে বৃদ্ধির পরিমাণও পরিবর্তিত হয়। বৃদ্ধি সন্ধ্যার সময়ে আরম্ভ হয়, রাত্রিকালে ক্রমশ বাড়ে, প্রত্যুষে সর্বাপেক্ষা বেশি হয় এবং দিনের বেলায় শীঘ্র মন্থর হইয়া যায়। প্রত্যেক 24 ঘণ্টার বৃদ্ধির পরিবর্তনকে দৈনিক বৃদ্ধি (daily period of growth) বলে।

বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কারণ (Factors influencing growth)

A. বহিঃস্থ কারণ (External Factors)

1. **উষ্ণতা** (*Temperature*)—বিভিন্ন উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার বিভিন্ন তাপমাত্রার সীমার উপর নির্ভর করে। সাধারণত উষ্ণতা 0°-35° সেন্টিগ্রেড হইলে উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সকল ক্ষেত্রেই এইরূপ হয় না। কোনো কোনে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উষ্ণতা বর্ধিত হইলেও বৃদ্ধিহার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। 25°-30° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ এবং ইহাই বৃদ্ধির জন্য পরিমিত তাপমাত্রা। আবার 5°-10° সেন্টিগ্রেডেতে বৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা কম। অত্যধিক উষ্ণতায় বৃদ্ধিহার ব্যাহত হয় এবং উষ্ণতা আরও বর্ধিত হইলে প্রোটোপ্লাজমের ক্রমে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

দেখা গিয়াছে যে, উদ্ভিদকে উচ্চ তাপমাত্রায় অধিকক্ষণ রাখিলে প্রথমে বৃদ্ধির হার

অধিক হইয়া থাকে এবং ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কোনো কোনো জীববিজ্ঞানীর মতে এইরূপ একটি উচ্চ তাপমাত্রা আছে যাহাতে উদ্ভিদকে বহুক্ষণ রাখিলেও বৃদ্ধির হার সমান থাকে। ইহাকেই বিজ্ঞানীগণ পরিমিত তাপমাত্রা (optimum temperature) বলেন এবং ইহার মান প্রায় 20° সেণ্টিগ্রেড।

2. আলোক (*Light*)—উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে আলোক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। আলোকের কয়েকটি বিশেষ চরিত্রের উপর উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ভর করে। ইহাদের বিবরণ নিম্নে বর্ণিত লইল ঃ

(*a*) আলোকের গতি (*Direction of light*)—সাধারণত উদ্ভিদের কাণ্ড আলোকের দিকে যায় এবং মূল আলোকের বিপরীত অভিমুখে যায়। আলোক হইতেই উদ্ভিদ শক্তি আহরণ করিয়া সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে। আলোকের অভাবে উদ্ভিদের কাণ্ডগুলি নরম ও দীর্ঘ হয় এবং পাতাগুলি পাণ্ডুর হইয়া থাকে।

সূর্যমুখী, বিলাতী বেগুন প্রভৃতি উদ্ভিদ উন্মুক্ত সূর্যালোকে সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি পায় কিন্তু আলোকবিহীন স্থানে উহাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এইপ্রকার উদ্ভিদকে আলোকবিলাসী উদ্ভিদ (photophilic plant) বলে। মস, ফার্ন প্রভৃতি উদ্ভিদ ছায়াযুক্ত স্থানে উত্তমরূপে বৃদ্ধি পায় কিন্তু অত্যধিক সূর্যালোক ইহাদের বৃদ্ধি বিঘ্নিত হয়। এইপ্রকার উদ্ভিদকে আলোকবিমুখী উদ্ভিদ (photophobic plants) বলে। পরন্তু, গোলাপ, ফ্লক্স (fiox) প্রভৃতি ফুল আলোকের প্রভাবকে উপেক্ষা করে ; এইপ্রকার উদ্ভিদকে আলোকনিরপেক্ষ উদ্ভিদ (photoindifferent plants) বলে।

(*b*) দীপনমাত্রা (*Intensity of light*)—স্যাক্স (Sachs) প্রভৃতি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর মতে ম্লান আলোকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি দ্রুত হইয়া থাকে ; আবার কেহ কেহ বলেন যে, আলোকের দীপনমাত্রার সহিত বৃদ্ধির হারের কোনো সম্বন্ধ নাই। কিন্তু সচরাচর দেখা যায় যে, আলোকের দীপনমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পাইলে কোষ-বিভাজন দ্রুত হইয়া থাকে, সুতরাং পরোক্ষভাবে বৃদ্ধির হার দ্রুত হয়।

যদি কোনো উদ্ভিদকে হঠাৎ অন্ধকার স্থান হইতে প্রখর আলোকিত স্থানে স্থানান্তরিত করা হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে, উদ্ভিদটির বৃদ্ধি হঠাৎ কমিয়া যায় এবং পরে ধীরে ধীরে বৃদ্ধির হার বাড়িয়া ক্রমে স্বাভাবিক হইয়া আসে। ইহাকে আলোক-বৃদ্ধি প্রতিক্রিয়া (light-growth reaction) বলে। দীপনমাত্রার হঠাৎ পরিবর্তন করিলে কোষগুলি আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং উদ্ভিদের এইরূপ অনুভূতিকে light eaergetic shock বলে।

(*c*) আলোকের প্রকার (*Quality of light*)—আলোক বিশ্লেষণ করিলে সাতটি রং দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে লাল এবং নীল রং উদ্ভিদের কোষ-বিভাজনের হার বৃদ্ধি করে কিন্তু কোষের আয়তনের বৃদ্ধি হয় না। আবার কেবলমাত্র আলোকের লাল রং প্রয়োগ করিলে কোষের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কিন্তু বিভাজন প্রক্রিয়া ব্যাহত

হয়। নীল রং প্রয়োগ করিলে উদ্ভিদের কোষগুলি আয়তনে বর্ধিত হয় না কিন্তু কোষবিভাজন-হার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

(*d*) আলোকের স্থিতিকাল (*Duration of ligh'*)—আলোকের স্থিতিকাল উদ্ভিদের পুষ্প উৎপাদনে সহায়তা করে। এই সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে ফোটোপিরিয়ডিজম (photoperiodism)-এর বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

3. আঘাত (*Wounding*)—উদ্ভিদের কোনো অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হইলে ঐ স্থানে হরমোন (hormone) নামক একপ্রকার পদার্থ গঠিত হয় যাহার ফলে উক্ত স্থানের বৃদ্ধিহার বর্ধিত হয়। হরমোন সম্বন্ধে বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইয়াছে।

4. অক্সিজেন (*Oxygen*)—উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অক্সিজেন পরোক্ষভাবে ক্রিয়া করে। শ্বাসকার্যের দ্বারা শক্তি সঞ্চারিত হইবার জন্য বর্ধনশীল অঙ্গের অক্সিজেন আবশ্যক হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, অতিমাত্রায় অক্সিজেন সরবরাহ হইলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

5. কার্বন ডাই-অক্সাইড (*Carbon dioxide*)—উদ্ভিদের বৃদ্ধি কার্বন ডাই অক্সাইডের উপর পরোক্ষভাবে নির্ভর করে, কারণ ইহা সালোকসংশ্লেষের জন্য আবশ্যক। তবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অধিক হইলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

6. মৃত্তিকাস্থ দ্রবণের ঘনত্ব (*Concentration of soil solution*)—মৃত্তিকাস্থ দ্রবণের ঘনত্ব অধিক হইলে শোষণহার হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ইহার ফলে বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়।

7. বিষাক্ত পদার্থ (*Toxic substances*)—বিষাক্ত পদার্থের প্রকৃতি এবং ঘনত্বের উপর বৃদ্ধিহার নির্ভর করে। দেখা গিয়াছে যে, কোনো বিষাক্ত পদার্থের অতি লঘু দ্রবণে উদ্ভিদ সুষ্ঠুভাবে বর্ধিত হয়।

B. অন্তস্থ কারণ (Internal Factors)

I. হরমোন (*Hormones*)—অধুনা বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, উদ্ভিদকোষে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয় যাহার ফলে নির্দিষ্ট অঙ্গটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইপ্রকার পদার্থকে হরমোণ (Hormones), বৃদ্ধিসহায়ক পদার্থ (Growth pro moting substances), ফাইটোক্রোম (Phytochromes), বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক পদার্থ (Growth regulators) প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়।

প্রোটোপ্লাজম জীবিত থাকিলেই এইসকল বৃদ্ধিসহায়ক পদার্থ ক্রিয়া করে। সমগ্র প্রক্রিয়াটির সহিত শ্বাসকার্যের নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে এবং যে সকল পদার্থের উপস্থিতির দ্বারা শ্বাসকার্য বিঘ্নিত হয় তাহাদের উপস্থিতিতে বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়।

বৃদ্ধিসহায়ক পদার্থগুলি কোষপ্রাচীরের সম্প্রসারণশীলতা (Plasticity) বৃদ্ধি করে।

বৃদ্ধিসহায়ক পদার্থের কৃষিকার্যে বহু প্রকার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহা হইতে নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয় যাহা সার, ছত্রাক নিরোধক ঔষধ ও কীটপতঙ্গ নিরোধক ঔষধ অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী। ফেনক্সি

অ্যাসিটিক অ্যাসিড (Phenoxyacetic acid) নামক একপ্রকার বৃদ্ধিসহায়ক পদার্থ স্বল্প খরচে প্রস্তুত করা সম্ভব এবং অতি সামান্য ঘনত্বে ইহা অধিকতর ক্রিয়াশীল। ইনডোল-বিউটিরিক অ্যাসিড (Indole-butyric acid) প্রভৃতির প্রয়োগে যে-সকল উদ্ভিদের মূল খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় তাহারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কয়েক প্রকার বৃদ্ধি সহায়ক পদার্থের প্রয়োগে বীজবিহীন ফল উৎপাদন সম্ভবপর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার সাহায্যে পুষ্প উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে।

2. জল (*Water*)—একটি জীবিত কোষে শতকরা প্রায় 40 ভাগ ওজনের জল থাকে। জলশোষণে কোষপ্রাচীর প্রসারিত হয়। বৃদ্ধির সময় উদ্ভিদ শুধু যে জল শোষণ করে তাহাই নহে, রসস্ফীতির দ্বারা উহা ধারণ করিয়া রাখে। সেইজন্য জল-শোষণ-হার প্রস্বেদন হার অপেক্ষা অধিক। জলের সরবরাহ কম হইলে উদ্ভিদের বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে।

3. পুষ্টি (*Nutrition*)—উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঞ্চলের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, কারণ পুষ্টিকর খাদ্য হইতে ইহা শুধু যে গঠনমূলক পদার্থ সংগ্রহ করে তাহাই নহে, বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিও আহরণ করে।

4. বিয়স (*Bios*)—উদ্ভিদের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর পদার্থের প্রয়োজন হয়। ইহারা প্রাণীর ক্ষেত্রে ভিটামিন (vitamins)-এর সমতুল্য। ইহা অতি জটিল রাসায়নিক পদার্থের সমষ্টি।

5. উৎসেচক (*Enzymes*)—বৃদ্ধির সময় বিপাকীয় পরিবর্তন ঘটাইতে বিভিন্ন প্রকার উৎসেচকের প্রয়োজন।

———

১৩ চলন

(Movements)

পূর্বে মনে করা হইতে উদ্ভিদের কোনো গতি নাই। এই বিশিষ্ট ধর্মের জন্যই প্রাণীর সহিত উদ্ভিদের পার্থক্য গণ্য করা হইত। কিন্তু আধুনা নিশ্চিত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে, উদ্ভিদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চলন আছে এবং কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদ্ভিদটির স্থানান্তরে যাইবার ক্ষমতা আছে।

উদ্ভিদের চলনকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(I) গমন (movements of locomotion) ও (2) বক্রচলন (movements of curvature)।

I. গমন (Movements of locomotion)

উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ মূলদ্বারা মৃত্তিকাতে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে, সুতরাং ইহাদের চলচ্ছক্তি চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র নগ্ন প্রোটোপ্লাজমের ও এককোষী উদ্ভিদের মন্থর গমন আছে। গমন দুই প্রকার—প্রোটোপ্লাজমিক (protoplasmic) ও ট্যাক্টিক (tactic)।

1. প্রোটোপ্লাজমিজ গমন (*Protoplasmic movements*)—প্রোটোপ্লাজমিক গমন তিন প্রকার—আবর্তন (cyclosis), সিলিয়ারী (ciliary) ও অ্যামিবয়েড (amoeboid)। ইহাদের বিষয়ে কলাস্থানের প্রথম অধ্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

2. ট্যাক্টিক গমন বা ট্যাক্সিজম (*Tactic movements or taxism*)—এইপ্রকার গমনে মুক্ত গাছটি বাহিরের উত্তেজনাবশত একস্থান হইতে অপর স্থানে যায়। আলোক রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি কারণে গমন হইতে পারে এবং গমনকে যথাক্রমে ফোটোট্যাক্সি (phototaxy), কেমোট্যাক্সি (chemotaxy) ইত্যাদি বলা হয়।

A. ফোটোট্যাক্সি (Phototaxis)

এইপ্রকার গমনে মুক্ত উদ্ভিদটি আলোকের উত্তেজনাবশত এক স্থান হইতে অপর স্থানে যায়। সকল গতিবিশিষ্ট শেওলা কম-বেশি ফোটোট্যাক্টিক। ইহারা ক্ষীণ আলোক আকৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রখর আলোকে দূরে চলিয়া যায়।

B. কেমোট্যাক্সি (Chemotaxy)

এইপ্রকার গমনে মুক্ত উদ্ভিদটি রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে উত্তেজনাবশত এক স্থান হইতে অপর স্থানে যায়। স্ত্রীধানী (Archegonium) হইতে নিঃসৃত রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা শুক্রাণু (spermatozoids) আকৃষ্ট হয়। এইরূপে ফার্নগাছের শুক্রাণু ম্যালিক অ্যাসিড দ্বারা ও মসগাছের শুক্রাণু দ্রাক্ষা শর্করা দ্বারা আকৃষ্ট।

II. বক্রচলন (Movements of curvature)

যদিও উচ্চশ্রেণী উদ্ভিদের এক স্থান হইতে অপর স্থানে গমন করিবার শক্তি নাই, তথাপি তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আংশিক চলন আছে। তাহাদের অঙ্গগুলি যথাযথ কার্য

করিবার জন্য বক্র হয়। উদ্ভিদ অঙ্গের এইপ্রকার চলনকে বক্রচলন (*movements of curvature*) বলে। বক্রচলন বাহিরের উত্তেজনাবশত হইতে পারে অথবা নাও হইতে পারে। এই চলন দুই প্রকার—(1) স্বতশ্চলন (autonomous movements) (2) আবিষ্ট চলন (induced movements)।

1. স্বতশ্চলন (Autonomous movements)

এইপ্রকার চলন বাহিরের উত্তেজনাবশতঃ হয় না। সকল চারাগাছে, তরুণ আকর্ষ, পাতা প্রভৃতিতে এইপ্রকার চলন দেখা যায়। স্বতশ্চলন দুই প্রকার—বৃদ্ধিজ চলন (movements of growth) ও প্রকরণ চলন (movements of variation)।

A. বৃদ্ধিজ চলন (*Movements of growth*)—বৃদ্ধির সময় কতকগুলি অঙ্গের যে চলন দেখা যায়, তাহাকে বৃদ্ধিজ চলন (*growth movements*) বলে। ইহা চারি প্রকার—হাইপোন্যাস্টি (hyponasty), এপিন্যাস্টি (epinasty), বলন (nutation), ও পরিবলন (circumnutation)। ইহাদের সম্বন্ধে পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

B. প্রকারণ চলন (*Movements of variation*) সময় সময় কোষের রস-স্ফীতির ব্যতিক্রমের জন্য সম্পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পত্রের চলন হয়। এইপ্রকার চলনকে প্রকারণ চলন (*variation movement*) বলে। ইহা বনচাঁড়াল বা গোরাচাঁদ (Telegraph plant) নামক উদ্ভিদে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ত্রিফলক পত্রের পার্শ্ববর্তী ফলক দুইটি পর্যায়ক্রমে উঠা-নামা করে।

2. আবিষ্ট চলন (Induced movements)

আবিষ্ট চলন বাহিরের উত্তেজনাবশত হয়।

(সজীব প্রোটোপ্লাজমের বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার ধর্মকে উত্তেজিত্ব (*irritability*) বলে। এই ধর্মের জন্য উদ্ভিদ বা ইহার কোনো অঙ্গ বাহিরের উত্তেজনার সহিত একতা সহকারে বাস করিতে সক্ষম।)

আবিষ্ট চলন দুই প্রকার—(A) ট্রোপিক (tropic) ও (B) ন্যাস্টিক (nastic)

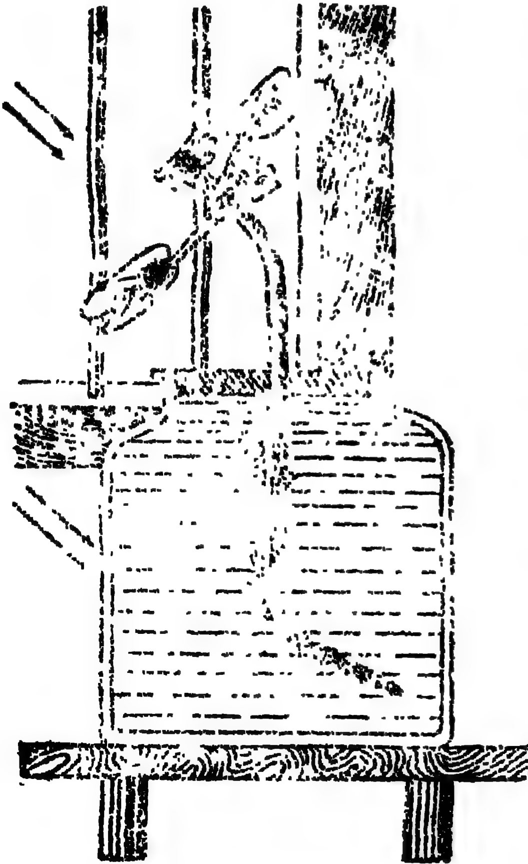
A. ট্রোপিক চলন বা ট্রোপিজম (Tropic movements or tropism)

যে চলনে উদ্ভিদ অঙ্গের গতিপথ উত্তেজনার গতিপথ অনুসারে হয়, তাহাকে ট্রোপিক চলন বা ট্রোপিজম (*tropic movements or tropism*) বলে। আলোক, অভিকর্ষ, জল, সংস্পর্শ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির নানা প্রকার উত্তেজনা আছে এবং ইহাদের দ্বারা যে চলন হয়, তাহাদিগকে যথাক্রমে ফোটোট্রোপিজম (phototropism), জিওট্রোপিজম (geotropism), হাইড্রোট্রোপিজম (hydrotropism), হ্যাপটোট্রোপিজম (haptrotropism), কেমোট্রোপিজম (chemotropism) ইত্যাদি বলে।

1. ফোটোট্রোপিজম (*Phototropism*)—যে চলনে উদ্ভিদ অঙ্গের গতিপথ আলোকের গতিপথ অনুসারে হয় তাহাকে **ফোটোট্রোপিজম** বা **আলোকবৃত্তি** বলে। কাণ্ড সাধারণত আলোকের দিকে যায় ও আলোকরশ্মির সহিত সমান্তরাল থাকে। মূল, বিশেষত তরুণ মূল, আলোকের উৎসের বিপরীত দিকে যায় কিন্তু আলোকরশ্মির সহিত সমান্তরাল থাকে। পত্রগুলি আলোকরশ্মির সহিত লম্বভাবে থাকে। এইপ্রকারে অভিভূত অঙ্গগুলিকে আলোকবর্তী (phototropic) বলে। কাণ্ড আলোর দিকে যায় বলিয়া ইহাকে অভীগ আলোকবর্তী (*positively phototropic*) বলে। মূল আলোকের উৎস হইতে দূরে চলিয়া যায় বলিয়া ইহাকে প্রতীপ আলোকবর্তী (*negatively phototropic*) বলে। পত্রগুলি আলোকরশ্মির সহিত লম্বভাবে থাকে বলিয়া ইহাকে তির্যক আলোকবর্তী (*transversely phototropic*) বলে।

এইপ্রকার চলনের জন্য মূল মৃত্তিকার নিচে যাইয়া উদ্ভিদকে মাটির সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে ও প্রচুর জল শোষণ করিতে সাহায্য করে। কাণ্ড উপরের দিকে যাইয়া পাতাগুলিকে উপযুক্ত আলোকে ধারণ করে এবং সালোকসংশ্লেষ করিতে সাহায্য করে।

৪৭নং পরীক্ষা (২৭২নং চিত্র)—ফোটোট্রোপিজম ঃ একটি কাচের বোতল লও এবং ইহাতে উপযুক্ত পোষক দ্রবণ (normal culture solution) ঢাল। একটি ছিদ্রযুক্ত ছিপির দ্বারা ইহার মুখ বন্ধ কর এবং পরে ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটি সরিষা বা ভুট্টার চারাগাছ এরূপভাবে প্রবেশ করাও, যাহাতে মূলটি পোষক দ্রবণের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। এইবার বোতলটিকে একটি আলোকিত জানালার নিকটে রাখ। কয়েক দিন পরে দেখিবে কাণ্ডটি জানালার দিকে বাঁকিয়াছে, মূল উহার বিপরীত দিকে বাঁকিয়াছে এবং পাতাগুলি আলোকরশ্মির সহিত লম্বভাবে আছে।



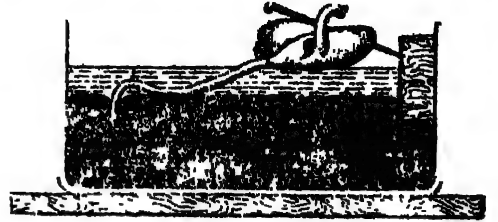
২৭২নং চিত্র—ফোটোট্রোপিজম

বোতলটিকে একটি বড় ছিদ্রযুক্ত কালো রং-এর বাক্সের মধ্যে (phototropic chamber) রাখিলেও উক্ত প্রকার ফল পাওয়া যাইবে।

2. জিওট্রোপিজম (*Geotropism*)—যে চলনে উদ্ভিদ অঙ্গের গতিপথ অভিকর্ষের গতিপথ অনুসারে হয় তাহাকে **জিওট্রোপিজম** বা **অভিকর্ষাবৃত্তি** বলে। প্রধান মূলকে অভীগ অভিকর্ষাবর্তী *positively geotropic*) বলে, কারণ ইহা অভিকর্ষের দিকে যায় এবং উহার

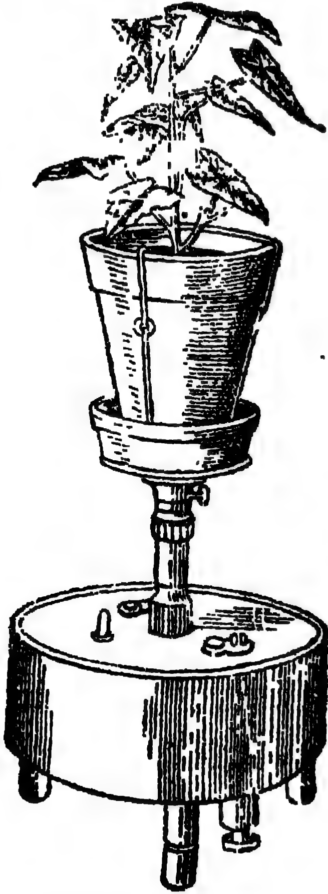
গতিপথের সহিত সমান্তরাল থাকে। কাণ্ডকে প্রতীপ অভিকর্ষাবর্তী (*negatively geotropic*) বলে; কারণ ইহা অভিকর্ষের উৎসের (অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রের) বিপরীত দিকে যায় কিন্তু উহার গতিপথের সহিত সমান্তরাল থাকে। পার্শ্বীয় মূল ও শাখাকে তির্যক অভিকর্ষাবর্তী (*transversely geotropic*) বলে, কারণ ইহারা অভিকর্ষের সহিত লম্বভাবে থাকে।

এই প্রকার চলনের জন্য মূল মৃত্তিকার ভিতরে যথাসম্ভব স্থান অধিকার করে এবং উদ্ভিদকে মৃত্তিকার সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে।



২৭৩নং চিত্র—জিওট্রোপিজম

৪৮নং পরীক্ষা: জিওট্রোপিজম (২৭৩নং চিত্র)—একটি ছোট চারিকোণা কাচপাত্রের ভিতর দিকে একটি কর্ক প্যারাফিনের সাহায্যে সংলগ্ন কর এবং ইহার মধ্যে কিছু পারদ ঢাল। এখন একটি অঙ্কুরিত শিম বীজকে আলপিনের সাহায্যে কর্কের সহিত এরূপভাবে আটকাও যেন ভ্রূণমূলটি পারদ তলের সহিত সমান্তরাল থাকে। এইবার পারদের উপর কিছু পরিমাণে জল ঢাল এবং কাচপাত্রটি অন্ধকারে রাখ। 2-3 দিন পরে দেখিবে, ভ্রূণমূলের আগাটি বাঁকিয়া পারদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।



২৭৪নং চিত্র—ক্লিনোস্টাট

৪৯নং পরীক্ষা: জিওট্রোপিজম: ক্লিনোস্টাট (*klinostat or clinostat*) দ্বারা (২৭৪নং চিত্র)—ক্লিনোস্টাট যন্ত্র একটি ধাতব দণ্ড, যাহার উপর টবের গাছ রাখিবার জন্য একটি ধাতব পাত্র আছে। পাত্রটিতে টবের গাছটিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিবার এইরূপ বন্দোবস্ত আছে যাহাতে দণ্ডটি খাড়াভাবে বা ভূমিতলের সহিত সমান্তরাল রাখিলেও ইহা পড়িয়া যায় না। দণ্ডটির নিচে ঘড়ির ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র (**clock-work arrangement**) আছে যাহার সাহায্যে দণ্ডটিকে ঘুরান যায়। এই প্রক্রিয়াটিকে দণ্ড লগ্ন একটি স্ক্রু-এর সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়। ঘড়িযন্ত্রটি তিনটি লেবেল স্ক্রু (**labelling screw**)-এর উপর দণ্ডায়মান থাকে।

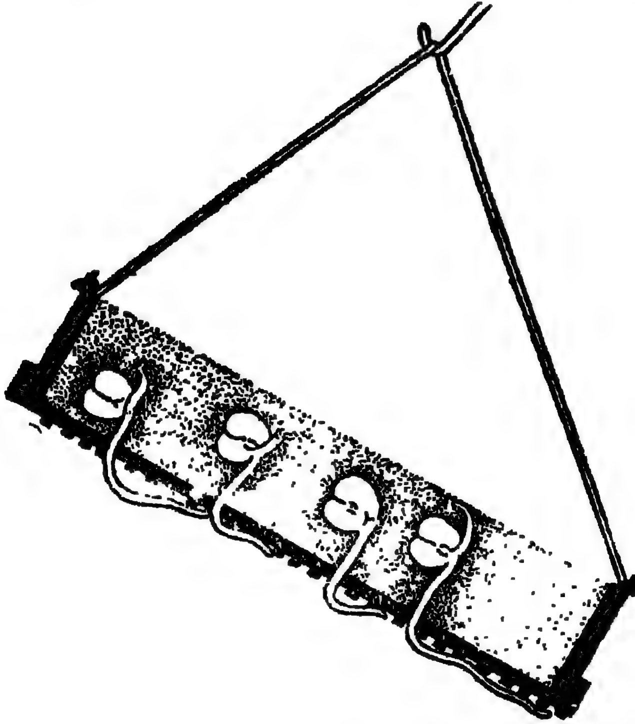
প্রথমে টবের গাছটিকে ভূমিতলের সহিত সমান্তরাল রাখিয়া যন্ত্রটিকে দ্রুত ঘুরাও। দেখিবে, গাছটি সমান্তরালভাবে বৃদ্ধি পায়, কারণ ইহার প্রত্যেক অংশের উপর অভিকর্ষ (**gravity**) সমভাবে ক্রিয়া করে। এখন গাছটিকে খাড়াভাবে রাখ এবং যন্ত্রটিকে

মন্থরগতিতে ঘুরাও। দেখিবে, গাছটি খাড়াভাবে বর্ধিত হয়। এইবার যন্ত্রটিকে দ্রুত ঘুরাও। দেখিবে, কাণ্ড ও মূল উভয়েই বক্রভাবে থাকে, কারণ এখন অভিকর্ষ ও অপকেন্দ্র বল (centrifugal force) কার্যকরী হয়।

3. হাইড্রোট্রোপিজম (*Hydrotropism*)—যে চলন উদ্ভিদ অঙ্গের গতিপথ জলের প্রভাব অনুসারে হয় তাহাকে হাইড্রোট্রোপিজম বা জলবৃত্তি বলে। মূলকে অভিগ জলাবর্তী (*positively hydrotropic*) বলে ; কারণ, ইহা জলের দিকে যায়। কাণ্ডকে প্রতীপ জলাবর্তী (*negatively hydrotropic*) বলে ; কারণ, ইহা জলের উৎসের বিপরীত দিকে যায়।

এইপ্রকার চলনের জন্য মূল মৃত্তিকা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে জল শোষণ করিতে পারে।

৫০নং পরীক্ষা : হাইড্রোট্রোপিজম (২৭৫নং চিত্র)—একটি চালুনিকে কাঠের গুঁড়াদ্বারা পূর্ণ কর এবং ইহাতে কতকগুলি মটর বীজ বপন কর। এখন কাঠের গুঁড়াকে ভিজাও ও চালুনিটিকে হেলানভাবে একটি পেরেক হইতে ঝুলাও। কয়েকদিন



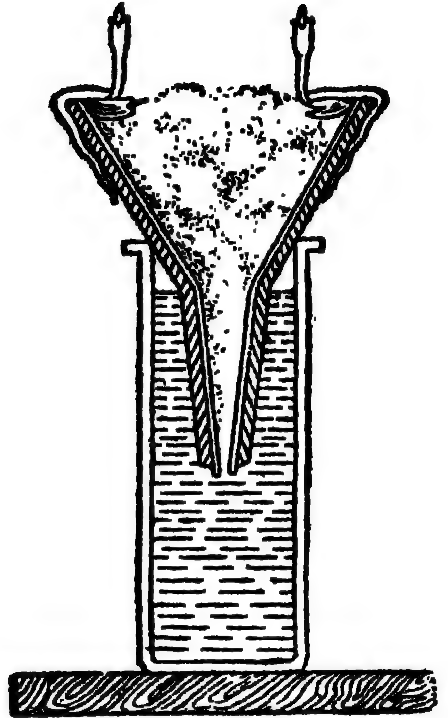
২৭৫ নং চিত্র—হাইড্রোট্রোপিজম

পরে দেখিবে চারাগাছগুলির মূলাগ্র চালুনির রন্ধ্রের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া নিচের তলে প্রবেশ করে ও উপরে উঠিতে থাকে। কিন্তু শীঘ্রই উপর দিকে উঠে ও চালুনির নিচের তলে তলাইয়া যায়

৫১নং পরীক্ষা : হাইড্রোট্রোপিজম (২৭৬নং চিত্র)—কতকগুলি বড় চৌকা ফিলটার কাগজ লইয়া একটি ফানেলের বহির্ভাগ আবৃত কর। আর একটি ফিলটার কাগজ ভাঁজ

করিয়া ফানেলের মধ্যে রাখ। এখন ফানেলটি ভিজা তুলা দিয়া পূর্ণ কর এবং কতগুলি অঙ্কুরিত ভুট্টার দানা ফানেলের কিনারার নিকটে স্থাপন কর। এইবার ফানেলটিকে একটি জলপূর্ণ বীকারের উপর রাখ এবং ফানেল সমেত বীকারটিকে কোনো আর্দ্র স্থানে রাখ, তবে ভিজা মস্‌গাছপূর্ণ বেলজারের মধ্যে রাখা বাঞ্ছনীয়। কয়েকদিন পরে দেখিবে, মূলগুলি প্রথমে ফানেলের বাহিরের গাত্র বাহিয়া যায় এবং পরে জলের মধ্যে প্রবেশ করে।

4. হ্যাপটোট্রোপিজম (*Haptotropism*)—যে চলনে উদ্ভিদ অঙ্গের গতিপথ কোনো দ্রব্যের স্পর্শের প্রভাব অনুসারে হয়, তাকে হ্যাপটোট্রোপিজম বা স্পর্শাবৃত্তি বলে। আরোহী মূল ব্যতীত সকল মূল সংস্পর্শের তল হইতে দূরে যায় বলিয়া ইহাকে প্রতীপ স্পর্শাবর্তী (*negatively haptotropic*) বলে। বল্লী ও আকর্ষ সংস্পর্শের তল বাহিয়া বৃদ্ধি হয় বলিয়া ইহাকে অভিগ স্পর্শাবর্তী (*positively haptotropic*) বলে। এইসকল চলন অঙ্গের বৃদ্ধি দুই পার্শ্বের অসমান বৃদ্ধির জন্য হয়। ইহা আকর্ষ, কাণ্ডবেষ্টক প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে উদ্ভিদ অঙ্গের যে পার্শ্বটি প্রকৃতপক্ষে স্পর্শ করে তাহা বিপরীত পার্শ্ব অপেক্ষা স্বল্প বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যাহার ফলে ক্রমশ অঙ্গটি কোনো পদার্থকে বেষ্টন করিতে থাকে।



২৭৬নং চিত্র—হাইড্রোট্রোপিজম

5. কেমোট্রোপিজম (*Chemotropism*)—যে চলনে উদ্ভিদ অঙ্গের গতিপথ রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাব অনুসারে হয়, তাহাকে কেমোট্রোপিজম বলে। ডিম্বক হইতে নিঃসৃত মিষ্টরসের প্রভাবে পরাগনল উহার দিকে যায়। বায়ুর অক্সিজেনের প্রভাবে শ্বাসমূল মৃত্তিকার উপরে উঠে।

B. ন্যাস্টিক চলন (Nastic Movements)

উত্তেজনার তীব্রতা অনুসারে উদ্ভিদ অঙ্গের এই প্রকার চলন হয়; কিন্তু ইহাতে উত্তেজনার গতিপথে কোনো প্রভাব থাকে না। ন্যাস্টিক চলন তিন প্রকার—(1) নিক্‌টিন্যাস্টিক (nyctinastic), (2) কেমোন্যাস্টি (chemonasty) ও (3) সিস্‌মোন্যাস্টি (seismonasty)।

1. নিক্‌টিন্যাস্টিক চলন (*Nyctinastic movements*)—এইপ্রকার চলন আলোক, তাপ অথবা উভয়ের তীব্রতার ব্যতিক্রমের জন্য হয়। ইহা সাধারণত পত্রে ও পুষ্পে দেখিতে পাওয়া যায়। এইপ্রকার চলন তিন রকমের—(*a*) ফটোন্যাষ্টি (photonasty), (*b*) থারমোন্যাষ্টি (thermonasty) ও (*c*) নিক্‌টিন্যাষ্টি (nyctinasty)।

(*a*) ফোটোন্যাষ্টি (*Photonasty*)—পদ্ম, সূর্যমুখী প্রভৃতি ফুল আলোকে উন্মুক্ত হয়, কিন্তু অন্ধকারে মুদিয়া যায়। পরন্তু হাস্নাহানা, যুঁই প্রভৃতি ফুল বিপরীতভাবে কার্য করে।

(*b*) থারমোন্যাস্টি (*Thermonasty*)—কতকগুলি ফুলের এইপ্রকার চলন আছে। তাপ বর্ধিত হইবার সময় পাপড়ির ভিতরের পৃষ্ঠ দ্রুত বর্ধিত হয়, সুতরাং ফুলগুলি উন্মুক্ত হয়। কিন্তু তাপ কম হইলে উহারা মুদিয়া যায়।

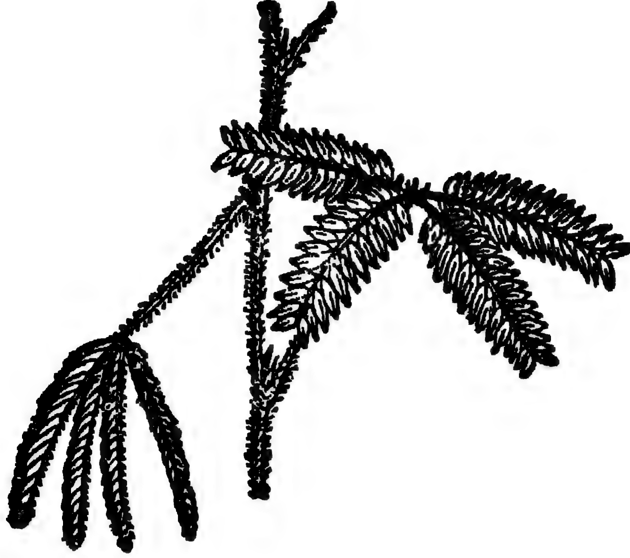
(*c*) নিক্‌টিন্যাস্টি (*Nyctinasty*)—আলোক ও তাপের, বিশেষত আলোকের, প্রভাবে অনেক পর্ণরাজির এইপ্রকার চলন হয়। দিনের বেলায় পাতাগুলি ভূমিতলের সহিত সমান্তরাল থাকে কিন্তু রাত্রিকালে উহারা উপরের বা নিচে যাইয়া খাড়াভাবে থাকে। শেষোক্ত অবস্থায় পাতাগুলির উপর আলোক প্রয়োগ করিলে উহারা পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অত্যধিক তাপ বা দীপনমাত্রার জন্য পাতার এইপ্রকার চলন হয়।

নিক্‌টিন্যাস্টিক চলনের আবশ্যকতা (*Use of nyctinastic movements or sleep movements*)—এইপ্রকার চলনের জন্য ফুল উহার ভিতরকার অংশগুলিকে তাপ, শৈত্য, শিশির ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করে। প্রখর সূর্যরশ্মির প্রভাবে যাহাতে ক্লোরোফিল বিশ্লিষ্ট না হয়, সেইজন্য পাতা দিনের বেলায় সমান্তরাল থাকে। রাত্রিকালে যাহাতে অধিক পরিমাণে তাপ বিকীরণ না হয় সেইজন্য পাতা খাড়াভাবে থাকে।

2. কেমোন্যাস্টি (*Chemonasty*)—রাসায়নিক দ্রব্যের তীব্রতার প্রভাবে যে চলন হয় তাহাকে কেমোন্যাস্টি বলে। তরুণ আকর্ষের যে স্থানে ঈথার, ক্লোরোফর্ম, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের বাষ্প প্রয়োগ করা হয় উহা সেই দিক বক্র হয়। রৌদ্রশিশির (Sundew)-এর পাতার কেন্দ্রস্থানে কোনো দ্রবীভূত প্রোটিন স্থাপন করিলে উহার কর্ষিকাগুলি (tentacles) সেই দিকে যায়।

3. সিস্‌মোন্যাস্টি (*Seismonasty*)—স্তম্ভক উত্তেজনার (যথা—আঘাত ইত্যাদি) প্রভাবে যে চলন হয়, তাহাকে সিস্‌মোন্যাস্টি বলে। লজ্জাবতী লতা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহার পাতা স্পর্শ করিলে পত্রকগুলি হঠাৎ বন্ধ হইয়া ঝুলিয়া পড়ে (২৭৭নং চিত্র)। আঘাতের উত্তেজনা সঙ্কোচন অঙ্গে প্রেরিত হইয়া চলন প্রদর্শিত হয়। বাঘনখ (*Martynia*), বিগোনিয়া (*Begonia*) প্রভৃতির গর্ভমুণ্ডের খণ্ড দুইটি উত্তেজিত হইলে উহারা হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়। দারুহরিদ্রা (*Barbery*), নুনেশাক (*Portulaca*) প্রভৃতির পুংকেশর অত্যন্ত অনুভব-শক্তিবিশিষ্ট। কোনো পতঙ্গ ইহাকে

স্পর্শ করিলে পরাগকোষ ফাটিয়া গিয়া উহার দেহ রেণুদ্বারা আবৃত হয়। ইহা হইতে বলা যায় যে, সিস্‌মোন্যাস্টি হ্যাপটোট্রোপিজমের চরম অবস্থা।



২৭৭নং চিত্র — সিসমোন্যাস্টি

- চলন
  - গমন
    - প্রোটোপ্লাজমিক
    - ট্যাক্টিক
      - ফোটোট্যাক্সি
      - কেমোট্যাক্সি
  - বক্রচলন
    - স্বতশ্চলন
      - বৃদ্ধিজ চলন
      - প্রকারণ চলন
    - আবিষ্ট চলন
      - ট্রোপিক
        - ফোটোট্রোপিজম
        - জিওট্রোপিজম
        - হাইড্রোট্রোপিজম
        - হ্যাপটোট্রোপিজম
        - কেমোট্রোপিজম
      - ন্যাস্টিক
        - নিকটিন্যাস্টিক
          - নিকটিন্যাস্টি
          - থারমোন্যাস্টি
          - ফোটোন্যাস্টি
        - কেমোন্যাস্টি
        - সিস্‌মোন্যাস্টি

১৪ জনন

(Reproduction)

পুরাতন জীব হইতে নূতন জীবের উৎপত্তিকে জনন বলে। জীব চিরকাল বাঁচে না সুতরাং বংশবৃদ্ধির জন্য জনন আবশ্যক। জনন তিন প্রকার—অঙ্গজ (vegetative), অযৌন (asexual), ও যৌন (sexual)।

A. অঙ্গজ জনন (Vegetative Reproduction)

এই প্রকার জননে উদ্ভিদদেহের এক অংশ (যথা, মূল, কাণ্ড, পাতা) পৃথক হইয়া নূতন গাছের জন্ম হয়। নিম্নলিখিত প্রকারে অঙ্গজ জনন হয়ঃ

1. অস্থানিক মুকুলের দ্বারা (*By adventitious buds*)—অস্থানিক মুকুল ; (*a*) পত্রাশয়ী ; যথা—পাথরকুচি বা পাথরচুর, হিমসাগর প্রভৃতি ; (*b*) মূলজ, যথা—পটোল, কচুরিপানা প্রভৃতি ; ও (*c*) কাণ্ডজ হয়। এই সকল মুকুল হইতে নূতন গাছ উৎপন্ন হয়।

2. রসাল মূলদ্বারা (*By fleshy roots*)—ডালিয়া, শতমূলী প্রভৃতি রসাল মূলের দ্বারা নূতন গাছ উৎপন্ন হয়।

3. মৃদগত কাণ্ডের দ্বারা (*By underground stems*)—রাইজোম, কর্‌ম্‌ প্রভৃতি মৃদগত কাণ্ডের দ্বারা নূতন গাছ উৎপন্ন হয়।

4. অর্ধবায়ব কাণ্ডের দ্বারা (*By subaerial stems*)—রানার, স্টোলন প্রভৃতি অর্ধবায়ব কাণ্ডের দ্বারা নূতন গাছ উৎপন্ন হয়।

5. বুলবিলের দ্বারা (*By bulbils*)—চুপড়ি আলুর কন্দপুষ্প (*Globba*) প্রভৃতি গাছ বুলবিলের সাহায্যে নূতন গাছ উৎপন্ন করে।

উক্ত প্রকার স্বাভাবিক উপায় ব্যতীত নিম্নলিখিত কৃত্রিম উপায়ে নূতন গাছ উৎপন্ন হইতে পারেঃ

6. শাখাকলম দ্বারা (*By cutting*)—গাঁদা, জবা প্রভৃতি গাছের শাখা কাটিয়া মাটিতে রোপণ করিলে নূতন গাছ উৎপন্ন হয়।

7. জোড়কলম দ্বারা (*By grafting*)—অনেক ফলবান গাছের বীজের দ্বারা নূতন গাছ ভালোরূপে উৎপন্ন হয় না। অনেক ক্ষেত্রে বীজ হইতে যে চারাগাছ জন্মায় তাহার ফলের গুণ (আস্বাদ, গন্ধ প্রভৃতি) মাতৃগাছের ফলের ন্যায় হয় না। সুতরাং জোড়কলম দ্বারা নূতন গাছ উৎপন্ন করিতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় যে গাছের জোড় কলম বাঁধিতে হইবে তাহার একটি শাখা বক্রভাবে কাটিয়া একই প্রকার চারাগাছের কাণ্ড

বক্রভাবে কাটিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করাইতে হয়। এই ক্ষেত্রে চারাগাছটিকে স্টক্ (stock) বলে এবং মূল গাছটিকে সীয়ন (scion) বলে। উভয় শাখার ক্যাম্বিয়ামের সংযোগ ভালো হইলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

৪. দাবাকলম দ্বারা (*By layering*)—এই প্রক্রিয়ায় একটি শাখা বাঁকাইয়া উহার পর্বটি বালুকাময় মৃত্তিকার সহিত আবদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে জলসিঞ্চন করিতে হয়। শাখাটিকে বাঁকাইয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে না পারিলে উহাকে ভাঙ্গা টব পূর্ণ বালুকাময় মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন করিয়া জলসিঞ্চন করিতে হয়। যথাকালে পর্ব হইতে অস্থানিক মূল বাহির হয়। এখন শাখাটিকে কাটিয়া মাটিতে রোপণ করিলে নূতন গাছ উৎপন্ন হয়।

B. অযৌন জনন (Asexual Reproduction)

রেণুদ্বারা অযৌন জনন হয়। যে এককোষী অযৌন জননকোষ হইতে নূতন গাছ উৎপন্ন হয় তাহাকে রেণু (spore) বলে। ছত্রাকে লিঙ্গধর (gametophyte) উদ্ভিদের রেণুস্থলী (sporangia) নামক কোষগুলির মধ্যে রেণু উৎপন্ন হয়। শেওলার রেণু সাধারণত ফ্ল্যাজেলাযুক্ত হয় বলিয়া ইহাকে চলরেণু (zoospore) বলে। ব্রাইওফাইটা, টেরিডোফাইটা ও সবীজ উদ্ভিদে রেণু কেবলমাত্র রেণুধর উদ্ভিদ (sporophyte)-এর উপর উৎপন্ন হয়। থ্যালোফাইটা, ব্রাইওফাইটা এবং অধিকাংশ টেরিডোফাইটায় রেণু একই প্রকারের হয় এবং উদ্ভিদদিগকে সমরেণুপ্রসূ (homosporus) বলে। কয়েকটি টেরিডোফাইটায় ও সবীজ উদ্ভিদে রেণু বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং উদ্ভিদদিগকে অসমরেণুপ্রসূ (heterosporous) বলে। পুং-রেণুকে মাইক্রোস্পোর (microspore) বা পুং-রেণু এবং স্ত্রীরেণুকে মেগাস্পোর (megaspore) বা স্ত্রী-রেণু বলে। মনে রাখিতে হইবে যে রেণু লিঙ্গধর উদ্ভিদের প্রারম্ভিক অবস্থা।

C. যৌন জনন (Sexual reproduction)

গ্যামেট বা জননকোষ দ্বারা যৌন জনন হয়। যে সকল এককোষী কোষ পরস্পর মিলিত হইয়া যৌন জনন সম্পন্ন করে তাহাদের গ্যামেট (gamete) বা জননকোষ বলে। কিন্তু ইহা অঙ্কুরিত হইয়া কোনো নূতন উদ্ভিদ উৎপন্ন করিতে পারে না। তবে দুইটি গ্যামেটের মিলনে নূতন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। জননকোষগুলি অবিভিন্ন থাকিলে মিলিত কোষটিকে জাইগোস্পোর (zygospore) এবং প্রক্রিয়াকে সংশ্লেষ (conjugation) বলে। কিন্তু জননকোষগুলিকে, পুং-ও স্ত্রী-জননকোষে বিভেদ করিতে পারিলে মিলিত কোষটিকে ভ্রূণাণু বা উস্পোর (oospore) বলে এবং প্রক্রিয়াকে নিষেক (fertilization) বলে। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে পুং জননকোষটি জলের সাহায্যে স্ত্রী-জননকোষের সন্নিকটে আসে কিন্তু উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ইহা পরাগ নালিকার সাহায্যে সম্পাদিত হয়। একই গাছের জননকোষগুলির মিলন

ঘটিলে প্রক্রিয়াটিকে স্বনিষেক (self-fertilization) বলে ; কিন্তু বিভিন্ন গাছের জননকোষগুলির মধ্যে মিলন ঘটিলে ইহাকে পরনিষেক (crossfertilization) বলে।

উদ্ভিদের গঠনমূলক পদ্ধতি (Developmental processes in plants)

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও গঠন হইল বিভিন্ন ঘটনা এবং প্রতিটি ঘটনাই নিজ নিজ কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এইসকল কারণগুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইতে পারে কিন্তু কোনো একটি ঘটনার কারণগুলি অপর ঘটনার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না। রুশদেশীয় বিজ্ঞানী লাইসেঙ্কো (Lysenko) মনে করেন যে, উদ্ভিদের গঠন পাঁচটি বিভিন্ন দশার উপর নির্ভর করে। এইসকল দশাগুলি ক্রমপর্যায়ে সংঘটিত হয় অর্থাৎ একটি দশার সমাপ্তি ঘটিলে পরবর্তী দশার সূচনা হয়। অধুনা পাঁচটি দশার মধ্যে তিনটির বিষয় জানা গিয়াছে। ইহারা হইল যথাক্রমে—(*a*) প্রথম দশা বা উষ্ণতা দশা (the first phase or thermophase) ; (*b*) দ্বিতীয় দশা বা আলোক দশা (the second phase or photophase) ; এবং (*c*) তৃতীয় দশা বা গ্যামেটোজেনেসিস্ (the third phase or gametogenesis)। তৃতীয় দশার প্রয়োজনীয় কারণগুলি সম্বন্ধে জানা যায় নাই। জানা গিয়াছে যে অঙ্কুরিত চারাগাছে ক্লোরোফিল উৎপন্ন হইবার সাথেই দ্বিতীয় দশার সূচনা হয়।

লাইসেঙ্কো মনে করেন যে উদ্ভিদের অঙ্গজ বৃদ্ধিকাল সকল সময়েই স্থির নহে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি বলিতে উহার আকার এবং ওজনের বৃদ্ধি এবং ইহার সহিত বিভিন্ন অঙ্গের আকৃতির পরিবর্তন বুঝায়। যে-সকল কারণের জন্য উদ্ভিদের এইপ্রকার গঠন-মূলক পরিবর্তন ঘটে বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তাহাদের প্রকৃতি ও পরিমাণও বিভিন্ন। লাইসেঙ্কোর মত অনুযায়ী উদ্ভিদের এইপ্রকার গঠনমূলক কারণগুলিকে অঙ্কুরিত বীজ অথবা চারাগাছের উপর প্রয়োগ করা যায়। উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রয়োগকাল এবং পরিমাণ নির্ভর করে। এইসকল নিরীক্ষার দ্বারা লাইসেঙ্কো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বীজের অঙ্কুরোদ্গম অথবা চারা অবস্থায় উদ্ভিদের গঠন দশার পরিবর্তন করা সম্ভবপর। অধিকন্তু তিনি এই অভিমত পোষণ করিতেন যে, অঙ্কুরিত বীজের ক্ষেত্রেই উদ্ভিদের যৌন গঠন সম্পর্কে জানিতে পারা যায় এবং ইহা পরবর্তী বৃদ্ধির দশা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও গঠন নিয়ন্ত্রণ করিতে যে-সকল পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রয়োজন হয় তাহাদের মধ্যে আলোক ও উষ্ণতা প্রধান।

ভার্নালিজেশন (Vernalization)

সুপ্ত অবস্থা হইতেই উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও গঠন উষ্ণতার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। রুশদেশীয় বিজ্ঞানী লাইসেঙ্কো এবং তাঁহার সহকর্মিগণ প্রথমে এই তথ্য নির্ণয় করেন। পরবর্তী কালে ইহাই ভারনালিজেশন (vernalization) নামে অভিহিত হইয়াছে।

উষ্ণতা দশায় অথবা ভারনালিজেশন দশায় উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুযায়ী উহাদের সিক্ত বীজগুলিকে কয়েকদিন ধরিয়া নিম্ন উষ্ণতায় রাখা হয়। বীজগুলিতে জলের পরিমাণ এইরূপ হওয়া আবশ্যক যাহাতে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া কেবলমাত্র কার্যক্ষম থাকে। এই দশায় উদ্ভিদের বহিঃ আকৃতির কোনোরূপ লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় না। খাদ্য, জল ও অক্সিজেন সরবরাহ অপ্রচুর হইলে এইরূপ উষ্ণতা প্রয়োগে কোনো সুফল পাওয়া যায় না।

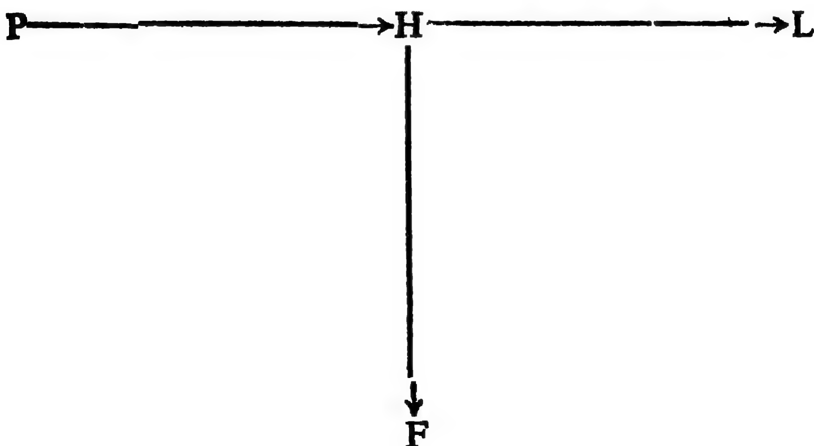
উষ্ণতা দশায় প্রয়োগকালও কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদে অথবা নির্দিষ্ট প্রকারের উদ্ভিদে নির্দিষ্ট নহে ইহা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে এবং বপনকালের সহিত পরিবর্তিত হয়। উপরোক্ত উক্তি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ভারনালিজেশন প্রক্রিয়ায় বীজগুলি স্বাভাবিকের তুলনায় বিভিন্ন ক্রিয়া করে।

1937 খ্রীষ্টাব্দে পারভিস ও গ্রেগরী (Purvis and Gregory) নামক-বিজ্ঞানীদ্বয় ভারনালিজেশন বুঝাইতে নিম্নলিখিত ধারণা পোষণ করেন।

তাঁহারা উদ্ভিদে একপ্রকার পুষ্প উৎপাদনকারী পদার্থের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে বীজে বিশেষত ভ্রূণের মধ্যে একপ্রকার প্রকল্পিত পূর্বগামী পদার্থ (hypothetical precursor) থাকে এবং এইপ্রকার পূর্বগামী পদার্থ গঠনে একপ্রকার জারণক্রিয়া সংঘটিত হয়।

ভারনালিজেশনের সময় উপরোক্ত পূর্বগামী পুষ্প উৎপাদনকারী পদার্থের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইয়া একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছায়। ইহা বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে সঞ্চিত হইতে থাকে। ভারনালিজেশনের পরবর্তী পর্যায় দিবস কালের উপর নির্ভর করে যাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

ভারনালিজেশনের ফলে পুষ্প উৎপাদনকারী হরমোন যাহাকে ফ্লোরিজেন (florigen) বলে অথবা উহার পূর্বগামী পদার্থের পরিমাণ কোনো নির্দিষ্ট ঘনত্বে পৌঁছায় যাহার ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই পুষ্প উৎপাদিত হয়। নিম্নে ইহা বুঝান হইয়াছে। ইহা হরমোন H এর পূর্বগামী পদার্থ P নির্দেশ করে যাহা



ভারনালিজেশন প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়। এখন H হইতে ফ্লোরিজেন F অথবা পাতা

উৎপাদনকারী পদার্থ L উৎপন্ন হয়। ইহা দিবালোকের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। স্বল্পদিবালোকপ্রাপ্ত উদ্ভিদ (Short day plants) এর ক্ষেত্রে স্বল্পকালীন আলোক পাইলে ফ্লোরিজেন গঠিত হইয়া যথা সময়ের পূর্বেই পুষ্প উৎপন্ন করে ; অন্যথায় অঙ্গজ বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। অনুরূপে দীর্ঘ দিবালোকপ্রাপ্ত উদ্ভিদ (long day plants) এর ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোক পাইলে H হইতে ফ্লোরিজেন উৎপন্ন হইয়া যথাসময়ের পূর্বেই পুষ্প উৎপন্ন হয়।

লাইসেঙ্কো উপরিলিখিত মতের বিরূপ ধারণা পোষণ করেন। তাঁহার মতে ভারনালিজেশন প্রক্রিয়া অনেকগুলি গঠনমূলক কারণের পারস্পরিক কার্যের উপর নির্ভর করে।

ফোটোপিরিয়ডিজম (Photoperiodism)

উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং পুষ্প মঞ্জরীর আবির্ভাব আলোকের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। আলোকের এইরূপ স্থিতিকালকে অর্থাৎ দিবাভাগের পরিমাণকে ফোটোপিরিয়ড (photoperiod) বলে। ফোটোপিরিয়ডের দ্বারা উদ্ভিদের যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তাহাকে ফোটোপিরিয়ডিজম বলে।

1920 খ্রীষ্টাব্দে গার্নার ও অ্যালার্ড (Garnar and Allard) নামক বিজ্ঞানীদ্বয় তামাক গাছের উপর পরীক্ষা করিয়া একটি অতি মূল্যবান তথ্য নির্ণয় করেন। তাঁহাদের মতে নিম্নলিখিত তিন প্রকার উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায় :

1. দীর্ঘ দিবালোকপ্রাপ্ত উদ্ভিদ (*Long day plants*) অর্থাৎ যে-সকল উদ্ভিদ স্বাভাবিক দিবালোক অপেক্ষা অধিক মাত্রায় আলোক পাইলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই পুষ্প উৎপন্ন করে ; যথা গম, শীতকালীন বার্লি গাছ ইত্যাদি।

2. স্বল্প দিবালোকপ্রাপ্ত উদ্ভিদ (*Short day plants*)—অর্থাৎ যে-সকল উদ্ভিদ স্বাভাবিক অপেক্ষা স্বল্পমাত্রায় আলোক পাইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুষ্প উৎপাদন করে ; যথা জ্যানথিয়াম, ডালিয়া, কস্‌মস্‌ প্রভৃতি।

3. দিবালোক নিরপেক্ষ উদ্ভিদ (*Day neutral plants*)—অর্থাৎ যে-সকল উদ্ভিদের পুষ্পধারণ ক্ষমতা অধিক অথবা স্বল্প আলোকপ্রাপ্তির উপরে নির্ভর করে না ; যথা সূর্যমুখী, তুলা, টমেটো প্রভৃতি।

অধিক অথবা স্বল্প দিবালোকপ্রাপ্তির দ্বারা উদ্ভিদের অঙ্গজ অঙ্গের ও জনন অঙ্গের পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ ফোটোপিরিয়ডিজমের ফলে প্রধানত খাদ্য শস্যের (cereals) জনন অঙ্গের যে পরিবর্তন হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন।

1933 খ্রীষ্টাব্দে গার্নার এবং অ্যালার্ড পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, বর্ধিষ্ণু উদ্ভিদ প্রাথমিক অবস্থায় আলোক দশার প্রভাবে যৌন গঠনের সূত্রপাত করিয়া ফুল এবং ফল উৎপাদন করিবার ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে ফোটোপিরিয়ডের পরিবর্তন ঘটিলেও প্রাথমিক আলোক দশার দ্বারা অর্জিত কালের কোনোরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি

করে না। এই ঘটনাকে ফোটোপিরিয়ডীয় আবেশ (photoperiodic induction) বলা হয়। এই ফোটোপিরিয়ডীয় আবেশের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন : গোত্র (family), গণ (genus) এবং এমন কি বিভিন্ন প্রকার (varieties)-এর উদ্ভিদের মধ্যেই বিভিন্ন হইতে দেখা যায়। 1940 খ্রীষ্টাব্দে হ্যামার (Hammar) নামক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, ফোটোপিরিয়ডীয় আবেশ বলিতে একটি আবেশীয় চক্র বুঝায় যাহাতে স্বল্প ফোটোপিরিয়ডের স্থায়িত্ব ও স্বল্প আলোকের তীব্রতার সাথে আলোকবিহীন কালের স্থায়িত্বও স্বল্প হওয়া প্রয়োজন। পরন্তু লাইসেঙ্কো মনে করেন যে, দীর্ঘ দিবালোকপ্রাপ্ত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যৌন জনন সম্পন্ন করিতে আলোকের প্রয়োজন হয় কিন্তু স্বল্প দিবালোকপ্রাপ্ত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ইহার জন্য স্বল্প আলোকের প্রয়োজন।

কখনও কখনও ফোটোপিরিয়ডীয় আবেশ দ্বারা যে পরিবর্তন ঘটে তাহা উষ্ণতা প্রভৃতি বাহিস্থ কারণ দ্বারা বিঘ্নিত হইতে পারে। আলোক এবং উষ্ণতা উভয়েরই মিলিত প্রভাবকে থারমোফোটোপিরিয়ডীয় আবেশ (thermophotoperiodic induction) বলা হয়। দৈনিক উষ্ণতার পরিবর্তনের সাথে ফোটোপিরিয়ডিজমের ন্যায় উদ্ভিদের গঠনের পরিবর্তন ঘটে; ইহাকে থারমোপিরিয়ডিসিটি (thermoperiodicity) বলে।

বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (wave-lengths)-এর আলোক প্রয়োগ করিলে দেখা যায় যে পুষ্প গঠনের জন্য লোহিত বর্ণের রশ্মি অন্যান্য রশ্মির তুলনায় অধিকতর ফলপ্রদ।

হেন্ডরিক্স (*Hendricks*), বেলট্স্ ভিল (Belts vile) এবং তাঁহাদের অন্যান্য সহকর্মিগণ (1942-1963) অন্ধকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কতকগুলি উদ্ভিদের কলা হইতে ফাইটোক্রোম (phytochrome) নামক একপ্রকার রঞ্জক পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন যাহা ফোটোপিরিয়ডিজমে অংশ গ্রহণ করে। ইহা একপ্রকার প্রোটীন এবং R-ফাইটোক্রোম (R-*phytochrome*) ও *F*-ফাইটোক্রোম (*F-phytochrome*) নামক পরস্পর পরিবর্তনশীল দুইটি রঞ্জক পদার্থের সমষ্টি। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের অনুপাতের উপর গঠন নির্ভর করে এবং ইহা বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পাতাই ফোটোপিরিয়ডের প্রধান প্রাথমিক অঙ্গ এবং ইহাতে প্রথমে আলোকের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে যাহার ফলে ফ্লোরিজেন (florigen) নামক পুষ্প উৎপাদনকারী হরমোনের সৃষ্টি হয়। এই তথ্য 1937 খ্রীষ্টাব্দে ক্যাজলাথজ্যান (Cajlachjan) নির্ণয় করেন। ফ্লোরিজেন অগ্রস্থ ভাজক কলায় সঞ্চারিত হয় এবং প্রাথমিক অঙ্গজ কোষকে প্রাথমিক পুষ্প উৎপাদনকারী কোষে পরিণত করে। ইহার দ্বারা প্রথম দর্শনীয় পরিবর্তন হইল যে অঙ্গজ কোষের দ্বারা গঠিত গোলাকার অগ্রভাগটি ক্রমে সমতল আকার ধারণ করে। গ্রেগারী মনে করেন যে ফোটোপিরিয়ডিজম বলিতে পুষ্প উৎপন্ন করা বুঝায় না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে-সকল কারণ পুষ্প উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি করে তাহাদের অপসারণ করাকে বুঝায়।

নির্ঘণ্ট

F

M

Q

R

———